শারদীয়া ১৪২৯
আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা

শারদীয়া ১৪২৯

সূচিপত্র

উপন্যাস

প্রবন্ধ

গল্প

ভ্রমণ

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

প্রচ্ছদ

পরেশ মাইতি

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা : বিষ্ণুপুরের প্রাচীন পটচিত্র

প্রাকৃতিক, শিল্পী: নন্দলাল বসু

অলঙ্করণ

সুব্রত চৌধুরী
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, কুনাল বর্মণ,
রৌদ্র মিত্র, অসীম হালদার, প্রসেনজিৎ নাথ,
সৌমেন দাস, বৈশালী সরকার

সম্পাদক: ঈশানী দত্ত রায়

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সিপি-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

অতিমারির ছায়া কাটেনি। বরং বারে বারে ফিরে আসছে সে। প্রকট হয়ে উঠেছে আর-এক অসুখ। অসততার অসুখ। সেই আবহেই শারদোৎসব। আনন্দ এবং হৃদয় প্রসারি দেখার সময়। উতলা কাশ, মনের মতো নীল আকাশ এবং ত্রিনয়নের অন্তরদৃষ্টিতে নিজেকে খুঁজে নেওয়ার সময়ও। খুঁজে নেওয়া অন্যের মধ্যে, সহবাসিন্দার মধ্যে, চেতনার উৎসবের মধ্যে। আনন্দ— অন্যকে দেওয়ার মধ্যে, বিষাদ— প্রতিমাকে কন্যাস্নেহে দেখা এবং বিদায় দেওয়ার মধ্যে, বিসর্জন— যাকে পাঁচ দিনের জন্য কাছে পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দেওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে, অপেক্ষা— আবার এসো বলার মধ্যে। বারে বারে এই খুঁজে পাওয়াই তো শারদোৎসব।

এই উৎসব নিছক ধর্মসর্বস্ব দেবী আরাধনা নয়, বৈভবের প্রতিযোগিতা নয়। সে কথা আমরা ভুলেছি অনেক বছর। এটুকুই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, মূর্তি এবং মণ্ডপের উচ্চতার প্রতিযোগিতা, আড়ম্বর এবং ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রদর্শনই পূজা। যারা এ কাজের কান্ডারি, আমরা, সাধারণ মানুষ তাদের উৎসাহ দিয়েছি সাবেক পুজোর বদলে ধন-ক্ষমতার পুজোয় জনজোয়ার ঘটিয়ে। এই বে-পথ থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটুক। সত্যের এবং অন্তরদেবীর আরাধনা হোক সকলের সঙ্গে মিলে। ধর্মান্ধের কবল থেকে, ক্ষমতাধারীর নিয়ন্ত্রণ থেকে, ঐশ্বর্যের প্রদর্শন থেকে মুক্তি হোক মায়ের কাছে ফেরা একটি মেয়ের। বছর বছরই সে আসবে, আর তার পথে হৃদয় পেতে দিতে বিসর্জন হোক সব কলুষতার, সব ধর্ম-অন্ধ দৃষ্টির। উৎসব হোক স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সতর্ক থেকে। আত্মসর্বস্ব বেপরোয়া মনোভাবে নয়। আর সেই উৎসবে আনন্দের পাঠ হয়ে থাক আমাদের সাহিত্যনিবেদন। পাঠক তা গ্রহণ করুন।

প্র ব ন্ধ

বাণভট্ট : সত্য এবং অপ্রিয়

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সেই মহাকবি, প্রাবন্ধিক এবং ঐতিহাসিক বাণভট্টের কথা। তিনি সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। বাংলায় যে প্রবাদ তির্যক ভাবে উচ্চারিত হয়—'রতনে রতন চেনে'—এই প্রবাদের সবচেয়ে সরল অর্থ পাওয়া যায় বাণভট্ট এবং হর্ষবর্ধনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। আমরা এটা বলে থাকি যে, কবিতার একটা অবলম্বন লাগে সর্বত্রগামিনী হওয়ার জন্য। অর্থাৎ কবি যদি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ কোনও ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন হিসেবে পান, তা হলে এক দিকে যেমন তাঁর ধন-মান-ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা ঘটত, তেমনই তাঁর কবিতার প্রচার হয়ে যেত দূর থেকে দূরান্তে। অন্য দিকে যে রাজা কবিকে এবং কবিতাকে মাথায় করে রাখতেন, সেই কবিতার কবিও কিন্তু বিগলিত করুণায় রাজার কীর্তিখ্যাপন করতেন— কখনও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, কখনও-বা সরাসরি স্থূল রাজস্তুতিতে— তাতে এক-একজন ব্যক্তি রাজা—তিনি একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা হলেও তাঁর মহিমা জেনে ফেলত লক্ষ লক্ষ লোক।

বস্তুত এটা একটা পারস্পরিক প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের জায়গাটা যদি এমন হয় যে, কবি অর্থলোভে, যশোলোভে রাজাশ্রয় লাভ করার জন্যই রাজস্তুতি করছেন, এবং রাজাও আপন স্তুতিতে মোহিত হয়ে কবির কবিত্বখ্যাপন করছেন সর্বত্র, তা হলে কবির কবিত্বের মাহাত্ম্যও আহত হয়, অন্য দিকে রাজারও কবিত্ববোধের মান্যতা নষ্ট হয়। কিন্তু এমনটা না হয়ে যদি এমনতর হয় যে, কবির কবিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব দুই-ই বেশ প্রখর, আবার রাজাও খুব অল্পখ্যাত, অল্পসত্ত্ব মানুষ নন, সেক্ষেত্রেও এঁদের কাছাকাছি আসার প্রবণতাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে, তাঁরা খুব কাছাকাছিও এলেন, এরকম ক্ষেত্রে কুলীন কবিরাও তাঁদের স্বাধীন মতামত বজায় রেখেও রাজার স্তুতি-প্রশংসা করেন এবং রাজারাও বড় কবির মুখে সামান্য আত্মপ্রশংসা শুনেই মহাকবির গুণখ্যাপন করেন সর্বত্র। উপরন্তু তাঁকে অর্থ-মান দিয়ে ভরিয়েও দেন নিঃশেষে।

হর্ষবর্ধন এবং বাণভট্টের মধ্যে পরস্পরের গুণপ্রখ্যাপন তো অবশ্যই ঘটেছিল। রাজা হর্ষ, বাণভট্টকে ধনৈশ্বর্য এবং গৌরব দুটোই দিয়েছিলেন

মাত্রার অতিরেকে এবং বদলে বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের কীর্তিখ্যাতি এমনভাবেই প্রখ্যাপন করেছেন তাঁর হর্ষচরিত গ্রন্থে যে, আজ দু'হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও হর্ষবর্ধনের কীর্তিগাথা বাণভট্টের মুখেই শুনতে হয়। দুই পক্ষের এই স্বেচ্ছা-বিনিময়, পরস্পরের পূরণ-প্রতিপূরণ কেমন ছিল, কতটা পরিমাণ ছিল, সে সম্বন্ধে অসামান্য একটি প্রাচীন শ্লোক পাওয়া যায় বল্লভ দেবের সুভাষিতাবলীতে। শ্লোকটি কার লেখা, সে কথা বলা নেই, কিন্তু সুভাষিতাবলীর কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাতে এটা ভীষণই অনুমানযোগ্য হয়ে ওঠে যে, পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দের অনেক আগে থেকেই এই শ্লোক মানুষের মুখে মুখে ফিরত। তা না হলে বল্লভদেবের কবিতা-সংকলনে এ শ্লোক ঢুকতে পারত না।

এই শ্লোকটির মর্মার্থ জানানোর আগে এটা বলা দরকার যে, দশম খ্রিস্টাব্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাশ্মীরি আলঙ্কারিক মম্মটাচার্য লিখেছিলেন— কবিরা কাব্য রচনা করেন কিসের জন্য? কোনও কবি কাব্য লিখে যশ-খ্যাতি চান, কেউ-বা কাব্য লিখে অর্থ উপার্জন করতে চান—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে। মম্মটাচার্য কাব্য লেখার উদ্দেশ্য হিসেবে আরও তিন-চারটে কারণের অবতারণা করেছেন। সেগুলি আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব। আমাদের আপাতত সেগুলিতে প্রয়োজন নেই খুব একটা। আসলে স্থুল প্রয়োজন ওই অর্থের জায়গাটা, যেখানে মম্মটাচার্যের গদ্যে লেখা আপন ভাষাটির পাঠ এবং পাঠান্তর পণ্ডিত গবেষকদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। আর সেই বিভ্রান্তির জায়গাটাই আমাদের প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে অতি উপাদেয় হয়ে ওঠে।

মম্মট নিজে লিখেছেন—কাব্য লিখে যশ কত পাওয়া যায়, তার উদাহরণ হলেন কালিদাস। আর অর্থ কত পাওয়া যায়, সেটার দৃষ্টান্ত হলেন ধাবক নামে সেই কবি, যিনি শ্রীহর্ষের কাছ থেকে অর্থ লাভ করে ধনী হয়ে গিয়েছিলেন— শ্রীহর্ষাদেঃ ধাবকাদীনামিব ধনম্। এই ধাবক নামের কবিটিকে নিয়েই যত সমস্যা। প্রথমে এটা বুঝে নেওয়া দরকার যে, সপ্তম খ্রিস্টাব্দের প্রথম দশকের রাজা হর্ষবর্ধন নিজেই কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নিন্দুকেরা তো চিরকালই ছিলেন, তাঁরা বললেন—হর্ষের নামে যে রত্নাবলী নাটিকাখানি চলে, ওটা আসলে হর্ষের লেখা নয়। ধাবক নামে এক ভাড়াটে কবি হর্ষবর্ধনের নাম দিয়ে ওই নাটিকাখানি লেখেন এবং তার বদলে হর্ষের কাছ থেকে বিপুল অর্থ লাভ করেন। ধাবক এতই অর্থ লাভ করেছিলেন যে, রসশাস্ত্রকার মম্মটাচার্য তাঁকেই দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন স্বলিখিত শ্লোকের স্বলিখিত 'সোপজ্ঞ' টীকায়।

ধাবক নামটি নিয়ে হর্ষের নামে এই নিন্দাবীজটি ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ সপ্তদশ খিস্টাব্দের এক টীকাকার নাগোজি ভট্ট। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের ওপর টীকা করার সময় এই জায়গায় তিনি লিখলেন— ধাবক নামে এক কবি শ্রীহর্ষের নামে রত্নাবলী নাটিকা লিখে বহু ধনলাভ করেছিলেন শ্রীহর্ষদেবের কাছ থেকে—এইরকমই প্রসিদ্ধি আছে— ধাবকঃ কবিঃ। স হি শ্রীহর্ষনাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহু ধনং লব্ধবান্ ইতি প্রসিদ্ধম্। সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দের নাগোজি ভট্ট এই লোকশ্রুত কাহিনিতে যদি ধুনোর গন্ধ যোগ করে থাকেন, তা হলে এ ব্যাপারে 'একে মা মনসা' হলেন কাব্যপ্রকাশের বাঙালি টীকাকার পরমানন্দ চক্রবর্তী। তিনি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ—মনসার কাজটা তিনিই করেছেন। পরমানন্দ চক্রবর্তী মম্মটের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন— পুরাতনদের মধ্যে এইরকমই একটা কথা চলতি আছে। কথাটা হল—ধাবক নামে এক কবি তাঁর নিজের লেখা নাটিকাটি শ্রীহর্ষ নামে এক রাজার কাছে বিক্রি করে তাঁর কাছ থেকে অনেক ধন-সম্পদ লাভ করেছিলেন—

ধাবক-নামা কবিঃ স্বকৃতিং রত্নাবলী-নাম নাটিকাং বিক্রীয় শ্রীহর্ষ-নাম্নো রাজ্ঞঃ সকাসাদ্ বহুধনমবাপেতি পুরাবৃত্তম্।

কাব্যপ্রকাশের মধ্যে মম্মটাচার্যের সামান্য একটা রসশাস্ত্রীয় উক্তি— অর্থাৎ কাব্য-কবিতা লিখে যেমন যশ হতে পারে, তেমনই টাকাও হতে পারে—কাব্যং যশসে'র্থকৃতে—যেমনটা কালিদাসের যশ আর ধাবক কবির টাকা। এখানে 'ধাবক' নামটাই সব গন্ডগোলের মূলে। কেননা, গবেষণায় এটা সঠিকভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, ধাবক নামে কোনও কবিই নেই, যিনি একখানি চূর্ণ শ্লোকও কোথাও লিখেছেন। দ্বিতীয়ত, হর্ষবর্ধন নিজে খুব কম কবি ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষা এবং অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর যথেষ্টই আয়ত্ত ছিল। আর নাটকও তো একটা নয়। নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা এবং রত্নাবলী—তিন তিনটি নাটক লিখেছিলেন হর্ষবর্ধন। সেখানে হঠাৎ করে রত্নাবলী তাঁর লেখা নয়, আর অন্য দু'টি নাটক তাঁর লেখা—এই দাবিটা টিকবে কী করে?

Buhler সাহেবের মতো বিখ্যাত গবেষক অনেক আলোচনা করে এই মত দিয়েছেন যে, কাব্যপ্রকাশের ওই পাঠটিই আসলে ভ্রান্ত পাঠ। ওই যে লেখা হচ্ছে—যথা শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্—এই জায়গায় আসল পাঠ হল—যথা শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনম্—**Buhler** আবার ধাবকের বদলে নতুন একটা ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, মম্মটাচার্য এবং আরও বহুতর আলঙ্কারিকের পীঠস্থান কাশ্মীরে এইরকম একটা লোককথা বাণের নামেই চালু আছে যে, রত্নাবলী নাটিকাটি বাণভট্টই লিখে দিয়েছিলেন এবং তার বদলে বাণভট্ট বিপুল অর্থ লাভ করেছিলেন হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে।

কথাটা **Buhler** সাহেবই বলুন অথবা কথাটা লোকশ্রুতিই হোক, এটা কেউ ভাবলেন না যে, হর্ষবর্ধনের মতো এক রাজা এবং বাণের মতো পোড় খাওয়া এক গদ্যকবি, যিনি নিজের জীবনের একটি কথাও লুকিয়ে রাখেননি এবং রাজা হিসেবে হর্ষবর্ধনের সামান্যতম অপব্যবহারও যিনি প্রকট করে দিয়েছেন—সেই তিনি যদি এরকম একটা 'ফেয়ার ডিল' করতেন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে, তা হলে সেটা তিনি হর্ষচরিতের মধ্যে না লিখে পারতেন না। কাজেই ধাবক তো ননই, এমনকি বাণও নন—যে-কেউই যদি হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বই বিক্রি করতেন, তা হলে সেটা কোনও এক খণ্ডদেশের জনশ্রুতি হত না। বাণের জন্যই হর্ষের জীবনের সব কথা সারা দেশে চাউর হয়ে গেছে, অতএব এটাও হত। কাজেই টাকা-পয়সা, কিংবা বলা উচিত অর্থ-খ্যাতি যেটুকু হর্ষের কাছে লাভ করেছেন বাণভট্ট, তা একেবারেই অন্য ভাবে এবং সেখানে রাজার প্রীতি এবং সম্মানবোধ যতখানি, ঠিক ততখানি বাণভট্টের মনে রাজার সম্বন্ধে গরিমা বোধ।

হর্ষবর্ধন এবং বাণভট্টের পারস্পরিক পোষণ-তোষণের ব্যাপারটা অন্য কোনও রাজা এবং কবির সঙ্গে মেলে না বলেই বল্লভদেবের সুভাষিত শ্লোকে বাণের প্রতি হর্ষের দানের পরিমাণ এবং হর্ষের প্রতি বাণের স্তুতিগরিমা সার্থক মূল্যায়ন করে সুভাষিতের সম্পাদিত **Peter Peterson** শেষ পর্যন্ত **Buhler** সাহেবের অনুমানগুলিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাশে সরিয়ে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন— **Mammata's words do not exclude a relation between poet and patron more honourable to both: and it is possible that Harshadeva is the real author of the book in question, his gifts to Bana having been made on other grounds.**

এটাই সবচেয়ে সত্যি কথা এবং এটাই সাধারণ্যে প্রচলিত তৎকালীন রাজকীয় সমাজ, যেখানে কবির মোহিনী কবিতা শুনে, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আবিষ্কার করে রাজা তাঁকে সম্মান করবেন, সাম্মানিক দেবেন, আপন রাজসভায় কবি-পণ্ডিতকে রাজকীয় পদবি দান করে কখনও দেবেন রাজছত্র, কখনও-বা কনক-কলশে কনক-স্নান, কখনও-বা একটি ঘোড়া অথবা তাম্বুল। এই সব দান-মানের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু বাণভট্টের ব্যাপারে হর্ষবর্ধনের দানের বহর এতটাই ছিল যে, পঞ্চদশ খিস্টাব্দের বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে হর্ষবর্ধন এবং বাণভট্টের পারস্পরিক পরিপোষণার কথা সাড়ম্বরে বর্ণিত হয়েছে। নাম না-জানা সেই কবির লেখায় প্রথমে যেন একটু আক্ষেপই ফুটে উঠছে। কবি বলছেন—কোথায় গেল সেই সব দিন! দিন ছিল, যখন বাণভট্টের মতো গুণী মানুষকে হর্ষবর্ধনদেব অন্তত একশো ভার সোনা দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন একগুচ্ছ উৎকৃষ্ট-মানের দাঁতালো হাতি, যেগুলি মদবারি ক্ষরণ করে। এমন এক বিরাট সম্মানের পরিবর্তে বাণ কী দিলেন হর্ষদেবকে? তিনি আপন প্রতিভায় তাঁর শব্দসূক্তি বিস্তার করে রাজা হর্ষের সমস্ত কীর্তিরাশি এই জগতের কাছে এমনভাবেই প্রখ্যাপন করলেন যে, কল্পকালে প্রলয় হয়ে গেলেও সেই কীর্তি-খ্যাতি কোনও দিন মলিন হবে না এতটুকুও—

যা বাণেন তু তস্য সূক্তি-বিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্তয়—
স্তাঃ কল্পপ্রলয়ে'পি যান্তি ন মনাঙ্‌মন্যে পরিম্লানতাম্॥

এখানে কবি বোধহয় লেখক-কবি হিসেবে বাণভট্টেরই প্রশংসা করছেন বেশি। কেননা, হর্ষদেবের দেওয়া শত সোনার ভার ব্যবহৃত হয়ে গেছে, কোথায় চলে গেছে সেই সব মদবারিক্ষরণকারী হাতির পাল—কোথায় সেই হর্ষ-দত্ত দান-মানের বস্তুপিণ্ড, যা বাণভট্টকে দিয়েছিলেন তিনি। কোথায় সে সব—শ্রীহর্ষেণ সমর্পিতামি গুনিনে বাণায় কুত্রাদ্য তৎ? কিন্তু বাণ শ্রীহর্ষকে যা দিয়েছিলেন দান-মান-লাভের কৃতজ্ঞতায়, সেই বাণের লেখা হর্ষের খ্যাতিকীর্তি ধারণ-করা হর্ষচরিতের মহিমা কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে হর্ষবর্ধনের রাজকীয় সমৃদ্ধির তুলনায় মহাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিত প্রবন্ধ হর্ষের চেয়েও মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আমরা বারবার বাণভট্টের কথা বলতে চাইছি, অথচ বারবার অন্য কথা অন্য প্রসঙ্গ চলে আসছে—এই টালবাহানার কারণ আসলে বাণভট্টই। কারও সঙ্গে তাঁর মেলে না। তিনি একাধারে গদ্য-প্রবন্ধকার, অন্যাধারে তিনি কবি, অথচ আরও এক আধার আছে তাঁর, যেখানে তিনি চরম এক

বুদ্ধিজীবী। তিনি আপন সাহিত্যের আলম্বন খোঁজার জন্য নিজে কোনও দিন রাজদ্বারে দাঁড়াননি গিয়ে, বরঞ্চ রাজার আহ্বান পেয়েই তাঁকে রাজদ্বারে প্রবেশ করতে হয়েছে—তাও নিজের সম্বন্ধে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য। তিনি কোনও স্বার্থচিন্তায় রাজস্তুতি লিখতে যাননি, কিন্তু রাজানুরোধে তাঁকে ‘হর্ষচরিত’ নামে রাজা হর্ষবর্ধনের জীবনী রচনা করতে হয়েছে। রাজসভায় শত ষড়যন্ত্রের মধ্যেও তিনি রাজস্তুতি করেছেন ঐতিহাসিক কাব্যিকতায়, অথচ রাজনির্ভরতা, রাজদেয় অর্থ এবং অজস্র দান-মান লাভ করেও রাজার ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে কঠিন সমালোচনা করতে ছাড়েননি বাণভট্ট।

বাণভট্টকেই আমরা এক অর্থে শ্রেষ্ঠ এক প্রাবন্ধিক-বুদ্ধিজীবী বলে মনে করি— যিনি রাজনির্ভরতায় তাঁর কবিজীবন কাটানো সত্ত্বেও রাজনীতির মধ্যে অংশগ্রহণ করেননি, অথচ সার্থক বিদ্বান যেমন রাজকীয় ঐশ্বর্যবাদ এবং তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার সমালোচনা করেন রাজার তোয়াক্কা না করে, বাণভট্টও তেমনই তাঁর রাজপ্রশস্তিমূলক গদ্যকাব্যের মধ্যেই রাজার সমালোচনা করেছেন ক্রান্তদর্শী কবির স্বচ্ছতায়। ঠিক এই কারণেই রতনে রতন চেনার ব্যাপারও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কেননা, রাজার নাম হর্ষবর্ধন, আর কবির নাম বাণভট্ট। এমন দুই বিরাট প্রতিভার পারস্পরিক অন্বেষণ চিরকাল সমাজ-মানসের অন্তর্গত আবেগের মধ্যে সুপ্তাকারে থাকে, এঁদের দেখা হওয়াটা এইরকমই কবিতায়— একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে; কী ছিল বিধাতার মনে।

সম্রাট হর্ষবর্ধন নিজেই অত্যন্ত গুণী কবি ছিলেন। অন্তত তিনখানি সংস্কৃত নাটক তিনি নিজেই লিখেছিলেন, যে নাটকগুলি আলঙ্কারিকদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে। অথচ বাণভট্ট বোধহয় সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সেই পণ্ডিত-কবি, যাঁর জীবন সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা ছক ছিল না। এমনও নয় যে, ছোটবেলা থেকে তিনি কাব্য-নাটক লেখায় হাত পাকাচ্ছেন, কিংবা এমন কোনও স্থির উদ্দেশ্যও ছিল না তাঁর জীবনে যে, তাঁকে এমনটা হতে হবে, তেমন হতে হবে, অথবা নিদেনপক্ষে অর্থ উপার্জন করতে হবে জীবন চালানোর জন্য। এইরকম একটা অদ্ভুত জীবন পরিচালনা করার ভার স্বয়ং ঈশ্বরের ওপরেই ছিল যেন।

বাণভট্টের বাড়িটি সপ্তম খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় ব্রাহ্মণ্যের তেজস্বিতা আত্মসাৎ করে নির্মিত হয়েছিল শোন নদীর তীরে, সে নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবাহু। বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে শোন-হিরণ্যবাহুর পশ্চিম পারে প্রীতিকূট নামে একটি গ্রামের মধ্যে ছিল বাণভট্টের বিরাট পরিবার। বাণের শৈশব-কালেই তাঁর মা রাজদেবী মারা যান। এই ঘটনায় বাণের পিতাই তাঁর মা হয়ে উঠেছিলেন স্নেহপূরণ করার জন্য—জাতস্নেহস্তু পিতৈবাস্য মাতৃতাম্ অকরোৎ। তবে বাণভট্ট খুব বেশিদিন পিতার স্নেহসুখও ভোগ করতে পারলেন না। বাণভট্টের বয়স যখন মাত্র চোদ্দো, তখন তাঁর পিতাও স্বর্গত হলেন। পিতার মৃত্যু বাণের মনে গভীর দুঃখ সৃষ্টি করল, একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, তবু ঘরের মধ্যে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

কিছুদিন এইভাবে চলার পর হঠাৎ একটা বিপরীত পরিবর্তন এল বাণভট্টের জীবনে। আমরা এই পরিবর্তনের সামান্যতম বর্ণনা এইজন্যই দিচ্ছি—কেননা এই সময়টুকুই বাণভট্টকে এক চরম সংবেদনশীল ঐতিহাসিকে পরিণত করেছে, যে-ঐতিহাসিক অদ্ভুত এক অনাসক্তিতে রাজা, রাজসভা এবং রাজনীতি দেখতে পান। আর কী অসামান্য এই সত্যস্বীকারের স্বগতোক্তি—বাণ লিখছেন—কিছুদিন এইরকম দুঃখতপ্তহৃদয় খানিক শান্ত হওয়ার পর আমার ভিতরের স্বতন্ত্রবোধ আমাকে কিছুটা অসংযত করে তুলল। তা ছাড়া বাল্যভাবের মধ্যে তো অদ্ভুত কিছু কৌতূহল থাকে অদেখাকে দেখার অচেনাকে চেনার—সেটা যেন আরও বেড়ে গেল যৌবনারম্ভের তাড়নায়—বাণ কেমন একটু লাগামছাড়া বাউন্ডুলে গোছের মানুষ হয়ে উঠলেন—অস্থির, চপল, যথেচ্ছ—বাণের নিজের ভাষায়—ইত্বরো বভূব।

প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত নৃপতি সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে এক পণ্ডিত কবির দেখা হবে—অথচ কবি তাঁর কাব্যও শোনাতে চাননি সম্রাটকে, এমনকী সামান্যতম চেষ্টাও করেননি রাজসভায় পরিচিত হওয়ার। তা হলে অন্য সমস্ত কবি-মহাকবিদের বিপ্রতীপে বাণের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-রচনার পথ কী ভাবে তৈরি হচ্ছে, সেটা না বললে এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়—কবিতা এবং ক্ষমতা— দুই-ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। অতএব বাণভট্টের কথায় এসে বলি—বাণ ঠিক করলেন—তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরেও তাঁর পিতৃগৃহে বিশেষ কোনও অর্থাভাব ছিল না, ছিল না জীবন যাপনের কোনও অর্থযন্ত্রণা। বাণ নিজেই বলেছেন—এক জন ব্রাহ্মণ যে ভাবে জীবন কাটায়, সেই বিত্ত-বিভব তাঁর বাপ-ঠাকুরদা রেখে গিয়েছিলেন। আর, এক জন ব্রাহ্মণ যে ধরনের বিদ্যা-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে, সেই বিদ্যাগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগেরও তাঁর অভাব ছিল না কোনও। কিন্তু সব ছেড়ে বাণভট্ট শুধু দেশ দেখা আর মানুষ দেখার তাড়নায় বেরিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্ত আবাস ছেড়ে—সৎস্বপি পিতৃ-পিতামহোপাত্তেষু ব্রাহ্মণজনোচিতেষু বিভবেষু সতি চাবিচ্ছিন্নে বিদ্যাপ্রসঙ্গে গৃহান্নিরগাৎ।

বাণভট্ট যে বিশাল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সেই অন্তর্গত প্রতিভার সঙ্গে সমাজ এবং লোকদৃষ্টি যুক্ত হয়েছে তাঁর বহু দেশে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতায়। তাঁর লেখার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-ভাবিত ভারতীয় উপাদানের অভাব নেই, কিন্তু আরও অনন্ত যেহেতু দেশজ লৌকিক উপাদান—সেটা বুঝেই সার্থক চিত্রকরের মতো বাণভট্ট তাঁর বহুদেশদর্শিতা মিশিয়ে দিয়েছেন লেখ্যবস্তুর পরতে পরতে। জীবনের চোদ্দো বছর বয়স থেকে ভ্রমণের ফলে মহামানবের সাগর হয়ে উঠেছে বাণভট্টের হৃদয়, কিন্তু এই হৃদয় তৈরি হয়েছে ভ্রমণ-পর্বের আগে থেকে এবং সেটা বোঝা যায় তাঁর বন্ধুবান্ধবের বিচিত্র বিষম চরিত্র থেকে। আরও আশ্চর্য হল—বিখ্যাত বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণ পরিবারে—যেখানে বাড়ি থেকে একবার বেরোতে গেলেও বৈদিক আচরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই পরিবারের জাতক বাণভট্টের বন্ধুবান্ধবের পরিচয় আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, ভবিষ্যতে হর্ষবর্ধনের মতো খ্যাতকীর্তি সম্রাটের সভায় বাণভট্ট কী ভাবে রাজসেবা করেও আপন ব্যক্তিত্ব সপ্রমাণ রেখেছেন।

সাধারণভাবে বন্ধুবান্ধব জুটে যায় সমপ্রাণতা এবং সমান হৃদয়তার লক্ষণে—কথাতেই বলে—সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়। অথচ বাণভট্ট নিজেই তাঁর চোদ্দো বছর বয়সে যে বন্ধুবান্ধবের কথা বলেছেন, তার মিশেল দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বাণ লিখেছেন—আমার এই বানজারা-বাউন্ডুলে হয়ে ওঠার সময় আমার সমবয়সি সুহৃদ এবং সহায়ও ছিলেন অনেকে— ইত্বরো বভূব। অভবংশ্চাস্য বয়সা সমানাঃ সুহৃদঃ সহায়াশ্চ। এই বন্ধুবান্ধবের তালিকায় বাণ প্রথম যাঁদের নাম করেছেন—তাঁরা হলেন তাঁর দুই ভাই—চন্দ্রসেন এবং মাতৃষেণ। এই দু'জন তাঁর কাকার ছেলে, যদিও সেই কাকা বোধহয় ব্রাহ্মণী ধর্মপত্নীর পরেও ভালবেসেছিলেন এক শূদ্রা রমণীকে এবং ব্রাহ্মণ পুরুষের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের সংজ্ঞা পারশব। তাঁরা সমাজে যত হীনই হোন না কেন, এই ভাই-দু'টির সঙ্গে বাণের গভীর বন্ধুত্ব ছিল বলেই প্রথমে তাঁদের নাম করে বাণ বলেছেন—আমার দুই পারশব ভাই চন্দ্রসেন এবং মাতৃষেণ—ভ্রাতরৌ পারশবৌ চন্দ্রসেন-মাতৃষেণৌ।

দুই শূদ্র ভাইয়ের পরেই বাণভট্টের বন্ধু হলেন ‘ভাষাকবি’ ঈশান। এখানে ভাষাকবি মানে হল—যিনি ‘লোকাল ডায়ালেক্ট’-এ কবিতা লেখেন। এই ঈশান তাঁর পরম বন্ধু। যে-কোনও বিষয় বা দৃশ্য বলা মাত্র বর্ণনা করতে পারেন, আদেশ মাত্র প্রশস্তি রচনা করতে পারেন, এই রকম এক জন, যাঁকে সেকালে বলা হত ‘বর্ণকবি’, সেই রকম এক বন্ধু ছিলেন বেণীভারু, এক জন প্রাকৃত-কবি ছিলেন, যাঁর নাম ছিল বায়ুবিকার, এ ছাড়াও ছিল দুই রাজপ্রশস্তি-রচনাকার অনঙ্গবাণ এবং সূচীবাণ।

বাণের ‘অ্যাকাডেমিক’ জগৎ মোটামুটি এইরকম, কিন্তু এ কীরকম ‘অ্যাকাডেমিকস’। বেদবেদান্ত-তত্ত্ববিৎ নন, বৈশেষিক-নৈয়ায়িক কিংবা মীমাংসাশাস্ত্রের পণ্ডিতও নন। যে কালে সংস্কৃত ভাষার বিপরীতে অন্য কোনও ভাষাকে আমলই দেওয়া হত না। সেই কালে এক দেশিভাষার কবি তাঁর পরম বন্ধু, এক বর্ণকবি তাঁর বন্ধু, বামুনের ঘরে দুই শূদ্রাপুত্র তার বন্ধু—এই সব মানুষ বাণভট্টের মানসলোক তৈরি করেছে। শুধু এঁরাই নন, সাপের খেলা দেখায় এমন এক জন, এক জন প্রৌঢ়া বিয়ে-না-করা মহিলা, গল্পকার, ম্যাজিশিয়ান, মৃদঙ্গ বাজায় সেই জীমূত নামের মানুষটি, বাঁশি বাজায়, অভিনয় করে, এমনকি হরিণীকা নামে এক নর্তকীও বাণের বন্ধু।

আমরা এখানে তালিকাটি শেষ করতে পারলাম না। কিন্তু বাণ লিখেছেন—এরাই সব আমার বন্ধু ছিল। এদের সঙ্গে মিলেমিশেই হোক, কিংবা বয়সকালের অভিসন্ধিতেই হোক অথবা দেশ দেখার কৌতূহল—আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

খুব ছটফট করে বেরোলেন বটে, কিন্তু দেশে দেশে যে সব ব্যাপার নিয়ে বাণ মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন এবং হয়তো-বা এক-এক জায়গায় আটকেও গেলেন, সেগুলি হল বহু বহু রাজকুল দেখার কৌতূহল এবং দেশে দেশে যে সব শ্রেষ্ঠ বিদ্বান-পণ্ডিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যার পাঠ নেওয়া। অর্থাৎ যৌবন বয়সে দেশ ঘুরতে গিয়ে বাণভট্ট বখে গেলেন না। গুণী মানুষের সংস্পর্শ, তাঁদের সঙ্গে ওঠা-বসা, গোষ্ঠীসুখ, বিদগ্ধ মানুষের বিপুল সঙ্গসুখ—বাণভট্ট লিখেছেন—এগুলি আমাকে

শেষ পর্যন্ত আমারই বংশের উপযুক্ত একজন জ্ঞানী মানুষের প্রকৃতি তৈরি করে দিল আমার মধ্যে। দেশে দেশে ঘুরে অনন্ত জ্ঞান আহরণ করে আরও বড় এক গম্ভীর-বিদগ্ধ পণ্ডিত হয়ে ফিরে এলেন একান্ত আপন বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণাবাসে। বাড়ির সব লোক বাণভট্টকে গৃহে সুস্থিত করলেন পরম সমাদরে।

বাণভট্ট তাঁর নিজের জীবনের এই সব কথা লিখেছেন কিন্তু হর্ষচরিতের মধ্যে—যে হর্ষচরিত সম্রাট হর্ষবর্ধন পাঠ করে আপ্লুত হবেন, সেই রাজকাহিনির প্রথমাংশে সবটাই কবির নিজের কথা—কী ভাবে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল এবং কেন শেষ পর্যন্ত হর্ষের কথা লিখতে রাজি হলেন তিনি। বাণ লিখছেন—মনে আছে, তখন গ্রীষ্মকাল চলছে। প্রচণ্ড গরম। আমি সে দিন বাড়িতেই ছিলাম। খাওয়াদাওয়া সারা হয়েছে। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণ-বেলা। হঠাৎই আমার পারশব ভাই, আমার কাকার ছেলে চন্দ্রসেন, সে হঠাৎই আমার ঘরে ঢুকে বলল—মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীহর্ষবর্ধনের ভাই কৃষ্ণ এক জন মানুষকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। মানুষটি অনেক জানে-শোনে। দূর পথ অতিক্রম করে এসেছে এবং এখন অপেক্ষা করছে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। পরাশব ভাইয়ের কথা শুনেই বাণ তাকে অবিলম্বে প্রবেশ করাতে বললেন।

বার্তাবহ দূত বাণের কাছাকাছি আসতে দূর থেকেই বাণ তাঁকে বললেন—কেমন আছেন আমার সেই বন্ধু কৃষ্ণ? দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সঙ্গে তাঁর নিঃস্বার্থ নিষ্কারণ বন্ধুত্ব। তো, কেমন আছেন তিনি? বার্তাবহ শ্রান্ত পথিক বলল—বেশ ভাল। খানিক বসে জিরিয়ে নিয়ে বিশ্রান্ত দূত এবার বাণভট্টকে বলল—আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন মাননীয় কৃষ্ণ। বাণ সাদরে বার্তাবাহকের হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে মনে মনে পড়লেন—বার্তাবাহক মেখলকের কাছে আমার বক্তব্য বুঝে নেওয়ার পর আপনার একটাই কাজ—সেটা হল, এতটুকু সময় নষ্ট না করা। ঈপ্সিত ফলের কোনও বিঘ্ন যাতে না ঘটে, সেই উদ্দেশে, সময় যাতে নষ্ট না হয়, সেটা দেখা—সন্দিষ্টমবধার্য্য ফলপ্রতিবন্ধী শ্রীমদ্ভিরপহরণীয়ঃ কালাতিপাতঃ।

হর্ষচরিতে বাণভট্টের এই বয়ান থেকে দু'টি তথ্য উঠে আসে। প্রথমত বহু দেশ ঘুরে এসে বাণভট্ট বেশ বিদ্যাগম্ভীর আলস্যে গ্রীষ্মের দুপুর কাটাচ্ছিলেন খাওয়াদাওয়া সেরে। তাঁর মনের মধ্যে এতটুকুও উচ্চকিত ভাব নেই, যাতে রুজি-রোজগার জীবিকা-নির্বাহের জন্য তিনি সচেষ্ট হতে পারেন। রাজবাড়িতে রাজার কাছে গিয়ে নিজেকে খানিক সপ্রমাণ করে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা বাণের মতো এক পণ্ডিত কবির পক্ষে কঠিন কাজ হত না। কিন্তু বাণ এ সবের মধ্যে নেই। তিনি বাড়িতে বসে আছেন।

দ্বিতীয়ত যেটা প্রমাণ হয়, সেটা হল—সাপুড়ে থেকে মৃদঙ্গ-বাদক, জুয়াড়ি থেকে নর্তকী—বাণের এই সব বন্ধুর সঙ্গে সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভাই কৃষ্ণও যে বাণের এক কালের বন্ধু, সেটা বাণের কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি কতটা বন্ধু যে, হর্ষবর্ধনের ভাই হিসেবে বাণকে তিনি রাজসভায় ডাকছেন এবং তাঁর সঙ্গে কোনও প্রকার স্বার্থ-সম্বন্ধ নেই বলেই বাণ তাঁকে নিষ্কারণ বন্ধু বলছেন। যাই হোক, বাণভট্ট কৃষ্ণের চিঠি পড়ে চোখ উঁচু করে উন্মুখ হতেই বার্তাবহ মেখলক বলতে আরম্ভ করল—আমার প্রভু কৃষ্ণ আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষের উদ্দেশে এই কথা বলেছেন—মান্যবর বন্ধু! আপনি তো জানেন যে, স্নেহ-ভালবাসার কারণ তো একটা নয়, বহু কারণে তা হয়ে থাকে। সাধারণত স্নেহ-ভালবাসা হয় একই গোত্রের মানুষের মধ্যে, একই জাতির বিভিন্ন মানুষের মধ্যে, এক বাড়িতে ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, এমন দু'টি বা তিনটি বা চারটি মানুষের মধ্যে, অথবা একই জায়গায় বড় হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে, অথবা এমন যদি হয় যে, মাঝে-মাঝেই পরস্পরের মধ্যে দেখা হচ্ছে, মাঝে-মাঝেই পরস্পরের কথা শুনছে, একজন জানে না এবং তার অজান্তেই অপরে তার উপকার করছে, আর যদি এমন হয়, দু'জনের স্বভাব-চরিত্র একই রকম, তা হলেও কিন্তু পরস্পরের ভালবাসা হয়। কিন্তু আপনি এক জন মানুষ, যেখানে কোনও কারণ ছাড়াই আপনার প্রতি এক গভীর ভালবাসা আছে আমার। যদিও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, যদিও আপনি অনেক দূরে আছেন আমার থেকে, তবুও মনে হয়—আপনার সঙ্গে আমার কোথাও একটা গভীর সম্পর্ক আছে, আমার পক্ষপাত আছে আপনার ব্যাপারে—এটা অনেকটা চাঁদ আর কুমুদিনীর অলক্ষ্য বন্ধুত্বের মতো—বন্ধাবিব বদ্ধপক্ষপাতং কিমপি স্নিহ্যতি মে হৃদয়ং দূরস্থেপি ইন্দোরিব কুমুদাকরে। কত দূরে আছে চাঁদ, কিন্তু সারা দিন তার মুখ খোলে না, কিন্তু চাঁদ উঠলেই সরোবরে কুমুদিনী ফুটে ওঠে!

এ কেমন অদ্ভুত বন্ধুত্ব! আকাশের চাঁদের সঙ্গে শাপলা ফুলের (কুমুদিনীর) সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু অকারণ এবং দূরস্থ এক রাজপুরুষ এক 'বোহেমিয়ান' পণ্ডিত-কবিকে এতটাই পছন্দ করেন, যেখানে সম্পর্কের মধ্যে এক অকারণের আনন্দ আছে—দূরগত চন্দ্রের কিরণ-কর-স্পর্শে পুলকিত কুমুদিনীর উন্মীলিত হয়ে ওঠার মতো এই সম্পর্ক। হর্ষবর্ধনের ভাই কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের ভণিতা করেছেন এই কারণেই, যাতে মেখলকের মুখে তাঁর পরবর্তী কথাগুলি বাণভট্ট আঘাত হিসেবে না নেন। মেখলক এবার কৃষ্ণের পরবর্তী বার্তা দিয়ে বললেন—বন্ধু!

আপনি যখন এখানে ছিলেন না, তখন কতগুলি দুর্মুখ দুর্জন মানুষ আপনার সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা খারাপ কথা বলে আপনার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা তৈরি করে দিয়ে গেছে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মনে—অন্যথা চায়ং চক্রবর্তী দুর্জনৈর্গ্রাহিত আসীৎ। কিন্তু আমি তো জানি যে, ব্যাপারটা একেবারেই সে রকম নয়। তবে হ্যাঁ, এটাও আবার ঠিক যে, ওরা যদি আপনার সম্বন্ধে ভাল কথাও বলে যেত, তা হলেও বলি—যত ভালই আপনি হোন, এমনকি সৎ মানুষের চেয়েও আরও বেশি সৎ মানুষ, তাঁরও কিন্তু তেমন বন্ধু থাকবে, তার ব্যাপারে উদাসীন মানুষও তেমন থাকবে, তেমনই শত্রুও কিন্তু থাকবে।

বাণভট্ট কিন্তু নিজের জীবন-কথার সূত্রে একটা গভীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক সত্য উচ্চারণ করেছেন। সবচেয়ে অদ্ভুত এটাই যে, অকারণে একজন ব্যক্তির বহিরঙ্গ-মাত্র বিচার করে রাজনৈতিক মুখ্য রাজার অথবা গণতান্ত্রিক মুখ্য নেতা-মন্ত্রীর কান-ভাঙানোর কাজটা প্রাচীন রাজতন্ত্র এবং আধুনিক গণতন্ত্রে একই রকম। আর এই দুর্মুখ-দুর্জনেরা কিন্তু সব সময় নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য অথবা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় ওপরতলার কান ভাঙানোর চেষ্টা করেন, তা নয়। এঁরা হলেন খল মানুষ, যাঁরা বিনা কারণেই অন্য গুণী মানুষের দোষ আবিষ্কার করে প্রচার করতে ভালবাসেন, আরও আশ্চর্য হল—এই ধরনের মানুষ শুধুমাত্র গ্রাম্য সাধারণ নন, শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, এমনকি রাজা কিংবা সরকারের কাছ থেকে সমস্ত সুবিধা পেয়েও এঁরা সমাজের উচ্চ, উচ্চতর কিংবা উচ্চতম ব্যক্তির সম্বন্ধেও নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হন না, অথবা রাজনৈতিক মুখ্যের কান ভাঙিয়ে উপযুক্ত বিদ্বান মানুষকে খাটো করে রাখতেই ভালবাসেন এই তথাকথিত শিক্ষিত গুণিজনেরা, বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা আজও আছেন এই বৃন্দাবনে। হর্ষবর্ধনের ভাই বার্তাবহ দূতের মুখে বাণভট্টকে আরও জানাচ্ছেন—কৈশোর-যৌবনসন্ধিতে আপনার জীবনধারণের মধ্যে খানিক যে চপলতা ছিল, সেই সময়কার কথা উচ্চারণ করেই কতগুলি ঈর্ষাপরায়ণ অসহিষ্ণু মানুষ সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাছে আপনার সম্বন্ধে খারাপ-খারাপ কতগুলি কথা বলে গেছে। আর কতগুলি সাধারণ ইতর জন তো থাকেই, যারা সম্রাটের কাছে ওই কথাগুলি বার বার পরমানন্দে বলে গেছে—ভবতঃ কেনচিদ্ অসহিষ্ণুনা যৎ কিঞ্চিদ্ অসদৃশম্ উদীরিতম্ ইতরো লোকঃ তথৈব তদ্ গৃহ্ণাতি ব্যক্তি চ। আর এটা তো আপনি জানেনই যে, এই ধরনের গতানুগতিক রাজকীয় মানুষের অবিবেকী মন কখন কোন দিকে জলের মতো গড়ায়, তা কেউ বলতে পারে না। আর একই সঙ্গে অনেকগুলি লোক যখন নানা কথা বলতে থাকে, তখন এই মহীপতি রাজার কোনও না-কোনও একটা সিদ্ধান্ত তো তৈরি হয়েই যায় মনে মনে। তাঁকেই-বা দোষ দিই কী করে, তিনি কী করবেন—বহুমুখ-শ্রবণ-নিশ্চলীকৃত-নিশ্চয়ঃ কিং করোতু পৃথিবীপতিঃ?

এই যে সব মানুষের কথা কৃষ্ণ বলছেন, এই চিরন্তন খল সব মানুষ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র সর্বত্র থাকেন। আর ওই যে
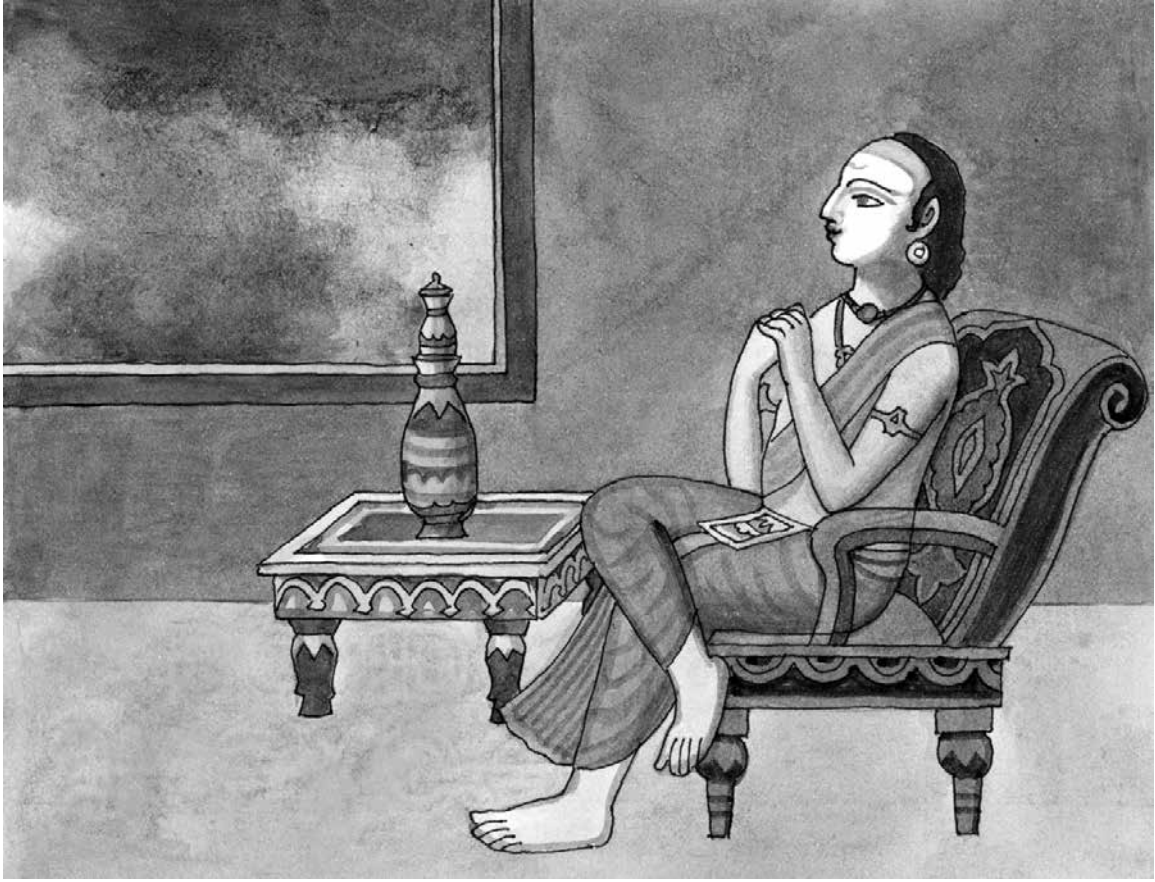
কথাটা বলেছেন কৃষ্ণ—কেনচিদ্ অসহিষ্ণুনা—অর্থাৎ যারা সইতে পারে না, তারা অকারণেও দোষ আবিষ্কার করে। বাণভট্ট তো রাজার কাছে অনুগ্রহও চাইতে যাননি, তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে বাড়িতে ভাল খাওয়া-দাওয়া সেরে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন এবং তাঁর ধারণাও ছিল না যে, তিনি শুধু দেশে ফিরে এসেছেন বলেই তাঁর যদি রাজ-সম্ভাবনার জীবন তৈরি হয়, তা হলে আগে থেকেই এক ঈর্ষাপরায়ণ অসহিষ্ণু বাণভট্টের নামে কুষ্টি কেটে রাখলেন খানিক। আর এক জন যখন খানিক 'কু' গাইল, তো আর কিছু লোক কিছু না বুঝেই আরও খানিক গাইল। বেচারা কবি-পণ্ডিত—তিনি ভাল খেয়ে বিশ্রামের কথা ভাবছিলেন। আর তখনই কৃষ্ণ বাণভট্টকে জানাচ্ছেন—

আপনি দূরে ছিলেন তখন, কিন্তু আপনার ব্যাপারে যথাসাধ্য আমরা জানার চেষ্টা করেছি যে, আসল সত্যটা কী। সম্রাট হর্ষবর্ধনকে এই কথাটা বলেছি যে, দেখুন, প্রথম বয়সে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে অনেক মানুষেরই অনেক ধরনের চপলতা তৈরি হয়, কিন্তু সে জন্য দায়ী ওই বয়সটাই। সম্রাট কিন্তু কথাটা মেনেছেন। ঠিক এইটুকু যেখানে হয়ে আছে, সেখানে আপনার কাজ হল—এতটুকুও কালবিলম্ব না করে এই রাজকুলে চলে আসা—অতো ভবতা রাজকুলম্ অকৃত-কালক্ষেপেন আগন্তব্যম্।

রাজদরবারে হর্ষবর্ধনের ভাই কৃষ্ণ এক বার্তাবহের মাধ্যমে যে খবর পাঠাচ্ছেন, সেটা থেকেই কিন্তু আমরা বাণভট্টের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং তাঁর মাহাত্ম্যের অনুমান করতে পারি। তিনি যখন দেশ দেখতে বেরিয়েছেন এবং দেশে অনুপস্থিত, তখন তাঁকে নিয়ে রাজসভায় নানা আলোচনা হচ্ছে। সেখানে কেউ তাঁর কুৎসা ছড়িয়ে রাজার কান ভারী করছে, অনেকে তাতে মদত জোগাচ্ছে, আবার রাজার ভাই কৃষ্ণের মতোও অনেকে রয়েছেন, যাঁরা বাণভট্টের মতো এক পণ্ডিত কবিকে 'ডিফেন্ড'ও করছেন। সেই 'ডিফেন্ড' করাটাও এমন যে, স্বয়ং রাজার ভাই সেখানে এই অভিমান করছেন যে, বাণভট্টের মতো এক গুণী মানুষকে হর্ষবর্ধনের মতো এক সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন গুণগ্রাহী সম্রাট চিনে নেবেন না কেন? যদি না-ই চেনেন, তবে তাঁকে চেনাতে হবে নিজেকে। বাণভট্টের মতো এক বিরাট পণ্ডিতকে রাজকীয় বৃত্তের বাইরে রাখতে চান না হর্ষের ভাই কৃষ্ণ। তিনি বলছেন—আপনার এই অদ্ভুত অভ্যেসটা আমার ভাল লাগছে না। পরম ঈশ্বরের মতো এই রাজার দৃষ্টির মধ্যে না এসে আপনি যে এখনও এই ভাবে আত্মীয় এবং বন্ধুজনের মধ্যে শুয়ে-বসে-গপ্পো করে কাল কাটাচ্ছেন, এটা মোটেই ভাল লাগছে না আমাদের। যে গাছে কোনও ফল ধরে না, সূর্যরশ্মির স্পর্শ রহিত বন্য সেই গাছের মতো আপনি অবস্থান করবেন, এটা আমি মানতে পারছি না—অবকোশীব অদৃষ্ট-পরমেশ্বরো বন্ধুমধ্যম্ অধিবসন্ নাসি মে বহুমতঃ। আর এটাও আপনি ভাববেন না যে, রাজসভায় রাজার সেবায় নানান বিপরীত সমস্যা থাকে, অতএব ও দিকটা না যাওয়াই ভাল। বিশেষত রাজার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আপনার মনে যেন কোনও ভয় না থাকে—ন চ সেবাবৈষম্য-বিষাদিনা বা পরমেশ্বরোপসর্পণ-ভীরুণা বা ভবতা ভবিতব্যম্। বাণভট্টের কাছে এই ভাবে আর্জি জানানোর পর বন্ধু হিসেবে বাণভট্টকে শুধু সতর্ক করে দিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন যে, এটাই একেবারে উপযুক্ত সময়, যখন বাণ এসে রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এর পরেই কৃষ্ণ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন হর্ষবর্ধনের। অনেক প্রশংসা করে শুধু এটাই বুঝিয়েছেন কৃষ্ণ যে, সম্রাট হর্ষ অন্য রাজাদের মতো নন, তিনি গুণী-মানীর গুণ-মান বোঝেন এবং এই রাজার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বাণভট্টের মতো এক অসামান্য গুণিজনের পক্ষে অসম্ভব জরুরি।

বার্তাবহ মেখলকের মুখে একাধারে হর্ষের ভাই এবং তাঁর পরমহিতৈষী কৃষ্ণের বার্তা শুনে বাণের মনস্বী হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া হল, সেটাই এই প্রবন্ধের সবচেয়ে জরুরি অংশ। কৃষ্ণ তো এ সব কথাও

বলেছেন—অনেকেই আছেন যাঁরা সময় বোঝেন না, অথচ রাজার কাছে এটা চাই ওটা চাই বলে অনুরোধ করতে থাকেন, আবার সেই লোকও আছে, যার পূর্ণ সুযোগ এসে গেছে, অথচ সেই সময় নিজের ইচ্ছেটুকু মুখ ফুটে বলতেই পারল না রাজার কাছে—স্বেচ্ছোপযাত-বিষয়ো'পি ন যাতি বক্তুম্। কিন্তু বাণভট্টের ভাবনা হচ্ছে যে, তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ মনে করছেন—এই সময়টাই খুব উপযুক্ত, কিন্তু তাঁর এত সময়-অসময় বিচারের প্রয়োজন কী, তিনি তো জীবিকা বা জীবনের জন্য রাজার কাছে যেতেই চান না। এদিকে বিপদ একটা হয়েইছে। কেননা, কুৎসিত খলজন তাঁর নামে কুৎসা করে এসেছে রাজার কাছে, তাঁর বন্ধু কৃষ্ণ আবার কোমল প্রতিযুক্তিতে রাজাকে খানিকটা অনুকূলও করে রেখেছেন—এখন আবার ত্বরিতগতির বার্তা তো সেই বন্ধুরই কাছ থেকে—বাণভট্টের মনের মধ্যে আলোড়ন চলতে থাকল।

এই আলোড়নের মধ্যেই এক জন সার্থক বিদ্বান, যাঁরা আজকাল বুদ্ধিজীবী বলে সম্বোধিত হন, সেই বুদ্ধিজীবীর মানসিক যন্ত্রণা ধরা পড়ে এখানেই। হর্ষের ভাই কৃষ্ণ বলেছিলেন—নিষ্ফল গাছের কোনও মূল্য নেই। রাজার কাছে যাওয়ার দরকার নিজের সফলতা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু বাণভট্ট রাজার কাছে যাবেন কোন সুবাদে! বার্তাবহ মেখলক চলে গেছে। সন্ধ্যা নামছে ধীরে। আনমনে বাণভট্ট সায়ংসন্ধ্যা আহ্নিক সেরে ঘরের মধ্যে আরামদায়ক একটা জায়গায় বসে আছেন। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে—চাঁদের দেখা পায়নি বলে রাত্রি যেন অন্ধকারের চুল এলিয়ে বসে আছে। বাণভট্টের মনের মধ্যে আলোড়ন। বাণভট্ট সংকল্পে-বিকল্পের মাঝখানে বসে ভাবছেন—

কী করি এখন? দেশের রাজা আমাকে ভুল বুঝে বসে আছেন। এদিকে নিঃস্বার্থ বন্ধু কৃষ্ণ এই রকম একটা খবর পাঠিয়ে দেখা করতে বলল রাজার সঙ্গে। আমার কাছে কিন্তু এই রাজসেবা ব্যাপারটা ভীষণই কষ্টকর। এই ভাবে দাসত্ব করার মধ্যে তো স্থিরতা-স্থায়িত্ব নেই। আর রাজার বাড়ি, রাজসভা—এর মধ্যে যে কত কী আছে, তার কূল-কিনারা নেই।

বোঝা যায়, রাজা কিংবা রাজসভা, রাজার সান্নিধ্য অথবা রাজসভার ষড়যন্ত্র—এক জন বিদ্বান-বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাণভট্ট এগুলির কোনওটাই পছন্দ করছেন না। বিশেষত রাজসভায় গিয়ে একজন রাজার সন্তুষ্টিবিধান কী ভাবে করতে হবে, বাণভট্ট সেটাও ভাল বোঝেন না। বিশেষত রাজার সঙ্গে একটা সদ্ভাব গড়ে ওঠার কারণগুলিও তিনি সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। যে সব কারণ থাকলে রাজার সঙ্গে সদ্ভাব তৈরি হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে বাণ বলছেন—

এমন তো নয় যে, আমার পূর্বপুরুষদের পরম্পরায় রাজার সঙ্গে এক ধরনের কুলানুক্রমিক প্রীতি-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে আমার। কেননা, আমার তিন কুলে কারও সঙ্গে রাজাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এমনও তো নয় যে, এই রাজা এক কালে আমার অনেক উপকার করেছেন এবং এখন আমাকে সেই উপকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আবার এমনও নয় যে, ছোট থেকে এই রাজার সেবা-শুশ্রূষা করেছি, অতএব এখনও করতে হবে। আমার পরিবারে গৌরবও এমন কিছু নেই যে, রাজার সঙ্গে আমার বেশ মেলে। এই রাজার সঙ্গে আগে আমার কখনও দেখাও হয়নি, যাতে করে পূর্বপরিচয়ের সুবাদে তিনি অনুকূল হতেন আমার প্রতি। আর আমি এটাও দাবি করতে পারি না যে, আমার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যগুণ আছে, অতএব আপনি আমার প্রশংসা করুন। অনেক বিদ্যাবত্তা থেকে এমন কোনও কৌতূহলও আমার জন্মায়নি যে, এবার রাজার কাছে গেলেই আমাকে তিনি বেশ খাতির করবেন। আবার রাজার সেবা করা ভৃত্যেরা রাজার মন পাওয়ার জন্য যে ভাবে গলার সুর পাল্টে পাল্টে নানা কাকুবাক্যে রাজার মন ভেজানোর চেষ্টা করে, আমার সে কৌশলও জানা নেই। অনেক বিদ্বান মানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীসুখে থাকলে যে বৈদগ্ধ্য জন্মায়, তাও আমার নেই। অনেক টাকাপয়সা খরচা করার ফলে যে বশীকরণের ক্ষমতা জন্মায়, তাও আমার নেই। আবার রাজসভায় রাজার যে সব ঘনিষ্ঠ রাজপুরুষ আছেন, তাঁদের সঙ্গেও কোনও পরিচয় নেই আমার। অথচ আমাকে এই রাজসভায় যেতে হবে। আমার এই যাত্রাপথে ভগবানই ভরসা।

পরের দিনই সকালে উঠে স্নানাহ্নিক করে শুচিশুভ্র বাসে আপন গৃহের সমস্ত ব্রাহ্মণ্য যাত্রা-মঙ্গল শিরোধার্য করে বাণভট্ট চললেন রাজার বাড়ি। কিন্তু যাওয়ার আগে রাজসভায় যাওয়ার যে মানসিকতা তিনি বিশ্লেষণ করলেন, তাতে এটা বেশ বোঝা যায় যে, তিনি খুব অস্বস্তিতে আছেন হর্ষের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে। অনেক পথ পেরিয়ে রাজসভার দরজা পর্যন্ত আসার পথ হর্ষচরিতে লিখেছেন বাণভট্ট। রাজদ্বারে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী, তাঁদের আনা উপহার হাতি-ঘোড়া, আরও শত কিছু দেখে বাণভট্ট যখন ভাবছেন—একশোটা মহাভারত লিখলেও এই সমৃদ্ধির বর্ণনা করা যাবে না—ঠিক তখনই সেই পুরাতন বার্তাবহ মেখলক বাণভট্টকে দেখতে পেল এবং তাঁকে বলল—আপনি এখানেই একটু সময় দাঁড়ান, আমি এই ভিতর থেকে আসছি।

এই মুহূর্তটি আসার আগে পর্যন্ত বাণভট্ট কিন্তু রাজদ্বারে প্রতীক্ষমাণ সামন্ত রাজাদের বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই বর্ণনার মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী সত্যটা হল এইখানে যে, সেটা আজও একই রকম। গণতান্ত্রিক সরকারের একজন মন্ত্রী, এমনকি একজন বড় আমলার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও আপনি দেখবেন—আপনারই মতো আরও জনা কতক বড় মানুষও অপেক্ষা করছেন মন্ত্রী-আমলার দেখা পাওয়ার জন্য। সেখানে অন্যতর এক বড় মানুষের মতোই আপনিও লজ্জা পাবেন পরস্পরকে দেখে। অর্থাৎ সেই ইগো-তে আঘাত লাগে যে, আমার মতো আরও একজন মানুষও এখানে দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছে এবং সেই ব্যাপারটা এই লোকটা দেখে ফেলল। আপনি বুঝবেন না যে, অপর বড় মানুষটিও একই রকম লজ্জা পাচ্ছেন, আপনি তাঁকে দেখে ফেলেছেন বলে। অবশেষে আমরা সকলে এখানে প্রার্থীর সমতায় বসে থাকি এবং বাণভট্টের দেখা সেই সামন্ত রাজাদের মতো দ্বাররক্ষীকেই কত সম্মান দিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকি—আচ্ছা ভাই, রাজা খাওয়াদাওয়া সেরে রাজসভায় এসে আমাদের দর্শন দেবেন কি? নাকি তিনি একেবারে বাইরের কক্ষায় এসে সর্বসমক্ষে বসবেন—ভদ্র, অদ্য ভবিষ্যতি ভুক্তাস্থানং দাস্যতি দর্শনং পরমেশ্বরঃ? আজকেই হয়ে যাবে তো?

এটা বোঝার দরকার যে, সেই মন্ত্রী-আমলা অথবা রাজাই-বা কী করবেন এখানে! যাঁরা দেখা করতে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বড় মানুষ, যদিও তাঁদের প্রয়োজন এবং যাচনার বিষয় নিতান্তই পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজের কথাটুকু অন্য বড় মানুষের আড়ালেই বলতে চায়। কিন্তু বাণভট্টের কথা হল—এত এত বড় মানুষ একসঙ্গে দেখে মনে হচ্ছে যেন—তিন ভুবনের বাইরে এটা যেন এক চতুর্থ ভুবন, যেখানে অন্য তিন ভুবনের সেরা লোকগুলিকে একত্রে উপস্থিত করা হয়েছে—লোকত্রয়-সারোচ্চয় রচিতং চতুর্থমিব লোকম্।

এত সব দেখে বাণভট্ট যেন খানিক শান্তি পেলেন, নিজেকে বুঝি আর অত খাটো মনে হল না। সেই যে মেখলক বাণভট্টকে খানিক দাঁড়াতে বলেই রাজদ্বার-পথে ভিতরে প্রবেশ করল, সে কিন্তু বেশি দেরি করল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরে এল এবং তার পিছন পিছন এল লম্বা সুগঠিত দেহের একটি লোক। বহু ব্যক্তিত্বময় এই লোকটির পরিচ্ছদ-সৌকর্য যেমন, তেমনই পরিশীলিত ব্যক্তিত্বময় তার ব্যবহার। মেখলক তাকে বাণের সামনে এনে বললেন—দ্বাররক্ষী মানুষগুলির মধ্যে ইনিই হলেন রাজা হর্ষের সর্বপ্রধান দৌবারিক এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এঁর নাম পারিযাত্র। মেখলক পারিযাত্রকে বলল—যাতে বাণভট্টকে ভিতরে প্রবেশ করানো যায়। তবে আমাদের মনে হয়—বাণের ব্যাপারে রাজাকে আগেই বলা হয়েছিল এবং এই মানুষটির অনুপস্থিতিতে এত লোক এত বেশি চর্চা করছে বাণভট্ট সম্পর্কে, যেখানে ঈর্ষাসূয়া মন্দ কথা বেশি হলেও তাঁর সম্বন্ধে চরম ভালও বলেছে দু'চার জন। হয়তো বাণভট্ট নিয়ে একটা কৌতূহল তো ছিলই হর্ষের মনে। হয়তো তারই প্রতিফলন ঘটছে দৌবারিক পারিযাত্রের ব্যবহারে।

পারিযাত্র মেখলকের আঙ্গুলি-সঙ্কেতে বাণভট্টকে দেখেই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মধুর স্বরে সবিনয়ে বাণকে বলল—আসুন আমার সঙ্গে। রাজদর্শনের জন্য রাজসভায় প্রবেশ করি চলুন। রাজা খুশি আছেন দর্শন দেওয়ার জন্য—আগচ্ছত। প্রবিশত দর্শনায়। কৃতপ্রসাদো দেবঃ। এটা অনেকটা 'গভর্নর ইজ় প্লিজ়ড টু ডিরেক্ট ইউ'—ধরনের কথা। কোথায়

কোন বংশদণ্ড লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। রাজা দর্শন দিয়ে খুশি হচ্ছেন। তবে সম্রাট হর্ষবর্ধনের ব্যাপার কিছু আলাদা। বন্ধু কৃষ্ণ আগে জানিয়েছিলেন—বিদ্বান-বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বিদগ্ধ হর্ষদেব রত্নবুদ্ধি করেন, নইলে লোকে যাকে রত্ন বলে, সেগুলিতে তাঁর প্রস্তর-বুদ্ধি কাজ করে। বাণভট্টও এত চটজলদি ডাক পেয়ে অবাক হয়ে গেছেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রাজা-রাজড়াদের দুর্বিপাকী অপেক্ষা তিনি কবিজনোচিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেছেন, সাধারণ মানুষ যারা রাজবাড়ির কাজে ভিতর-বার করছে, তাদের কাছেও ছুটে ছুটে যাচ্ছেন সামন্ত রাজারা। জিজ্ঞেস করছেন—আজকেই দর্শন হবে তো—ভদ্র! অদ্য... দাস্যতি দর্শনং পরমেশ্বরঃ।

অবস্থার এই নিরিখে বাণ এত তাড়াতাড়ি রাজদর্শনের ডাক পেয়ে দৌবারিক পারিযাত্রের সামনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—ধন্যি মানি নিজেকে, রাজা হর্ষ আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য ভেবেছেন বলে। বাণভট্ট দৌবারিকের পথ-নির্দেশে চলতে আরম্ভ করলেন। যেতে যেতে দেখলেন, মহারাজ হর্ষের ঘোড়াশালে অদ্ভুত সব ঘোড়া, আর হাতিশালে হাতি। বিশেষ করে হর্ষদেবের নিজস্ব বাহন হাতিটিকে দেখে বাণ এমন অবাক বিস্ময়ে তার বর্ণনায় মুখর হলেন মনে মনে যে, দৌবারিক বাণকে বলল—আবার পরে এসে দেখবেন এটাকে, এবার রাজাকে দেখবেন চলুন—পুনরপ্যেনং দ্রক্ষ্যসি। পশ্য তাবদ্দেবম্।

মোটামুটি তিনটি বিস্তীর্ণ বিস্ময়-চত্বর দেখার পর বাণভট্ট রাজসভার ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রথম দেখায় রাজা হর্ষ কোথায়, কোন মহার্ঘ আসনে কোন ভঙ্গিতে বসেছিলেন হর্ষদেব, তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা হর্ষচরিত গ্রন্থে এমন ভাবেই দিয়েছেন বাণভট্ট যে, সে বর্ণনা শোনামাত্র চিত্রকর ছবি এঁকে ফেলতে পারে একটা বিরাট ক্যানভাস জুড়ে। আর হর্ষের সামনে এসে দাঁড়ানোর পর বাণভট্টের মনের ভিতরে যে আন্দোলন হচ্ছিল, তা এক জন কবি-সাহিত্যিক, বিদ্বান, বুদ্ধিজীবীর একেবার উপযুক্ত। আসলে এটা একটা অভিজ্ঞতা, যা ওপর-চালাকিতে বা অতিপ্রগল্‌ভতা দিয়ে বোঝা যায় না।

অবশ্য এমন দেখার জন্যও এক সরল, অবিমিশ্র মন লাগে, শত রকমের চাওয়া-পাওয়া অথবা ইটের বদলে পাটকেল ছোড়ার মন নিয়ে এমন রাজদর্শনের অনুভূতি হয় না। বাণভট্ট বলছেন—সম্রাট হর্ষকে দেখেই নিজেকে যেন বেশ এক অনুগৃহীত ব্যক্তি বলেই মনে হল। এত সব বড় মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ আমাকেই তিনি আগে ডেকেছেন, এই দুরূহ সৌভাগ্য তো অনুগ্রহেরই নামান্তর। বাণ বলছেন—আবার যেন খানিক নিগৃহীতও লাগছে আমার, কেমন যেন খালি চোখে আমাকে পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে, তাই নিগৃহীত। কেমন যেন এই রাজাকে দেখে সাভিলাস হয়ে উঠছে আমার মন; মনে হচ্ছে যেন আরও দেখি তাঁকে, অথচ দেখেছি বলে বেশ তৃপ্তও বোধ করছি যেন। কথা বলার সময় মুখের ওপর রোমাঞ্চ অঙ্কুরিত হচ্ছে, বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এই সেই সম্রাট হর্ষবর্ধন, যাঁর কীর্তিখ্যাতির কথা এত শুনেছি—সো'য়ং... দেবঃ পরমেশ্বরো হর্ষঃ! হর্ষকে এত কাছ থেকে দেখার সেই অলৌকিক বিস্ময়ের মধ্যে বাণভট্ট হর্ষের বহুশ্রুত গুণ এবং তাঁর বিরাটত্বের কথায় পঞ্চমুখ হয়েছেন এবং সেই মহাগুণের বিপ্রতীপে নিজেকে স্থাপন করেই অবশেষে নিজের পৈতেখানি স্পর্শ করে হর্ষের উদ্দেশে বাণভট্ট বললেন—ওঁ স্বস্তি।

লক্ষণীয়, রাজা বলেই একান্ত সংবৃত হর্ষবর্ধন তাঁর আপন বিস্ময়ভাব স্পষ্ট প্রকট না করলেও তাঁরও কথার মধ্যে খানিক বিস্ময় ছিল বলেই তিনিও গম্ভীর স্বরে দৌবারিক পারিযাত্রকে শুধোলেন—এই সেই বাণভট্ট নাকি? দৌবারিক বলল—যেমন আপনি বলছেন—হ্যাঁ মহারাজ! ইনিই সেই বাণভট্ট। হর্ষদেব বললেন—এর সঙ্গে তো আমি দেখাই করব না। এখনও পর্যন্ত এই মানুষটি কিন্তু আমাকে সেই সম্মানটুকু প্রদর্শন করেনি, যাতে আমি বলতে পারি—আমি সন্তুষ্ট এবং আমি দেখা করতে পারি এঁর সঙ্গে।

বাণ লিখেছেন—এই কথা বলেই খানিক হেলে বসে থাকা মহারাজ হর্ষ একটু আড়চোখে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখার আয়াসে তাঁর চোখের সাদা অংশটিকে মনে হচ্ছিল যেন সাদা এবং কালো রেশমি কাপড়ের ওপর কিছু একটা যেন ঝাঁকানো হচ্ছিল। তার পর হর্ষদেব পাশে বসা মালব-দেশের রাজার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন—এই সেই মহান ভুজঙ্গ।

কথাটার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কার আছে, একটা কৃত্রিম কৌতুক আছে, আবার 'মহান' বলার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত গুণগুলিও অস্বীকার করছেন না। সংস্কৃতে ভুজঙ্গ মানে যেমন সাপ, তেমনই ভুজঙ্গ শব্দের অর্থ অতিরসিক লম্পট ধরনের মানুষ। হর্ষ তির্যকভাবে খোঁচা দিয়ে বলেছেন—মহান অয়ং ভুজঙ্গ। এটা ঠিক যে, হর্ষ নিজে একজন সফল কবি-নাট্যকার, তিনি যাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন, সেই মানুষটিও বিদ্বান-পণ্ডিত এবং কবিও। এই অবস্থায় বাণের প্রসঙ্গে হর্ষের মন্তব্যটুকু একটা হালকা রসিকতাও হতে পারে। বিশেষত, বাণের পূর্বজীবন সম্বন্ধে হর্ষের কাছে যাঁরা নিন্দাবাদ করেছেন, তাঁরা হয়তো এককালে বোহেমিয়ান স্বভাবী বাণের জনপ্রিয়তা অথবা স্ত্রী-সমাজে তাঁর আকর্ষণের ঘটনাগুলিই রং মাখিয়ে বলেছেন হর্ষদেবের কাছে। বাণকে যাঁরা সঠিক চিনতেন, তাঁরা রাজার ভুল ধারণা দূর করতে চাইলেও যৌবন-স্পর্শী বয়সে খানিক স্বচ্ছন্দচারী বাণের স্ত্রী-বিষয়ক চপলতা যতটুকু রাজার কাছে অপব্যাখ্যাত হয়েছে, সম্রাট হর্ষবর্ধন, সেই জনপ্রবাদটুকুই খানিক তির্যকভাবে প্রকাশ করলেন মালবরাজের দিকে তাকিয়ে, বাণের দিকে স্পষ্ট সোজাসুজি তাকিয়ে নয়।

তবু প্রথম আলাপেই রাজার মুখে এই তির্যক মন্তব্য বাণের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলল। রাজার মন্তব্য মালবরাজের দিকে তাকিয়ে হলেও তিনি তো চুপ করে রইলেনই, নিস্তব্ধ হয়ে থাকলেন অন্যেরাও। কিন্তু বাণভট্ট রাজার কথাটাকে বিনা প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হতে দিলেন না। প্রথমত, তিনি রাজার কাছে কোনও সাহায্য চাইতে আসেননি। নিজের প্রতিভা প্রকট করে কোনও সম্মানও যাচনা করতে আসেননি। অতি নির্ভীক এক চরম বিদ্বান-বুদ্ধিজীবী বলেই অসাধারণ বাগ্মিতায় বাণভট্ট, সভাস্থলে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশে করা রাজার মন্তব্য প্রতিহত করে বললেন—

মহারাজ! মনে হচ্ছে যেন আপনি আসল তত্ত্বটা জানেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে—আমার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই আপনার। সঙ্গে কিন্তু এটাও মনে হচ্ছে যে, এটা আপনার নিজের কথা নয়, আপনি পরের কথায় চলেন, নানান লোকের মধ্যে নানা কথা হয়, কিন্তু তার পূর্ণ বৃত্তান্ত না জেনেই আপনি সিদ্ধান্তের মতো একটি মন্তব্য 'আজ্ঞা' করলেন কী করে—দেব, অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ইব, অশ্রদ্দধান ইব, নেয় ইব, অবিদিত- লোকবৃত্তান্ত ইব চ কস্মাদ্ এবম্ আজ্ঞাপয়সি?

সপ্তম খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় এই ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক রাজাকে তাঁর মুখের ওপর এই কথাটা বলা যে, আপনি কিচ্ছু না জেনে কথা বলছেন, আপনাকে যেন অন্য লোক চালায় বলে মনে হচ্ছে—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ইব, নেয় ইব—এই কথাগুলি বলা অত সহজ ছিল না। বিশেষত সেই প্রাবন্ধিক, বুদ্ধিজীবী কিংবা কবি যদি রাজার কাছে সুবিধা পেতে চাইতেন কিছু, তা হলে সামনা-সামনি রাজার মুখের ওপর এ কথা বলা অত সহজ ছিল না। বাণভট্ট অবশ্য এইটুকুতেই ছেড়ে দেননি। রাজা যেরকম ঝটিতি বলেছেন, বাণও তেমনই ঝটিতি জবাব দিয়ে প্রথমে খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজাকেই উল্টো প্রশ্নে বিব্রত করেছেন। কেননা, এক জন রাজার পক্ষে বোধহয় এমন সূক্ষ্ম অপমান আর কিছু নেই যাঁকে শুনতে হয় যে, তিনি পরের কথায় চলেন। মহাকবি কালিদাস একজন মূঢ় ব্যক্তির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই ভাবে যে, মূঢ় অর্থাৎ বোকা লোকেরাই শুধু পরের কথায় চলে—মূঢ়ঃ পর-প্রত্যয়-'নেয়'-বুদ্ধিঃ। নিজে এক জন কবি-নাট্যকার হিসেবে হর্ষদেব কালিদাসের এই নাটকীয় সংলাপ নিশ্চয়ই জানতেন বলেই বাণভট্টও 'নেয়' কথাটা উচ্চারণ করেছেন। রাজাকে রাজার মুখের কথা মুখের ওপর ফিরিয়ে দিয়েই বাণ বলেছেন—

মহারাজ! লোকের স্বভাব তো বিচিত্র এবং তারা নিজের ইচ্ছেয় চলে, ফলে কখন কী করে তার যেমন ঠিক নেই, তেমনই কখন কী বলে তারও ঠিক নেই—স্বৈরিণো বিচিত্রাশ্চ লোকস্য স্বভাবা প্রবাদাশ্চ। কিন্তু মহান বড় মানুষ যাঁরা তাঁরা তো যথার্থদর্শী হবেন, যেমনটা ঘটেছে

তেমনটা তেমন করেই তো বোঝার চেষ্টা করেন তাঁরা। আপনি তো এক জন অবিশিষ্ট সাধারণবুদ্ধি লোকের মতো আমাকে অন্য রকম ভেবে নিতে পারেন না—নার্হসি মাম্ অন্যথা সম্ভাবয়িতুম্ অবিশিষ্টমিব।

আমরা এতক্ষণ অনেক কবি-পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছি। তাঁদের কেউ যদি রাজার প্রসাদ ভিক্ষা না-ও করে থাকেন, তবুও কি রাজার মুখের ওপর এই ভাবে কথা বলতে পেরেছেন কেউ! আর বাণের এই কথাগুলি তাঁর মনগড়া কথা, এমন ভাবার কারণ নেই। কেননা, হর্ষদেবের ইচ্ছেতেই বাণভট্ট হর্ষচরিত গ্রন্থটি লিখেছেন এবং হর্ষদেব গ্রন্থটি একাধিক বার পড়েওছেন নিশ্চয়ই। তা হলে একজন বুদ্ধিজীবী কবি-পণ্ডিতের এটা চরমতম ব্যক্তিত্ব এবং সাহস যে, আপন রাষ্ট্রমুখ্যের কথার প্রতিবাদ করে তাঁকে তিনি 'পরের দ্বারা চালিত' বলে মানসিক আঘাত করছেন। লোকে কী বলে গেল সেটা তাঁর শোনার কথা নয়, বরঞ্চ নিজে বিচার করে তার পর মন্তব্য করা উচিত—এই কথাটাই প্রমাণ করার জন্য বাণ এবার নিজের কথা শুনিয়ে হর্ষকে বললেন—

আমি বিখ্যাত বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণদের ঘরে জন্মেছি, আমার পূর্বপুরুষেরা রাজা-রাজড়াদের বৃহৎ যজ্ঞগুলিতে সোমপান করতেন—দেবাহুতির অবশেষ হিসেবে। বামুন ঘরের উপযুক্ত উপনয়নাদি সমস্ত সংস্কার আমি লাভ করেছি। শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি বৈদিক ষড়ঙ্গ-সহ পূর্ণ বেদ আমি অধ্যয়ন করেছি। শাস্ত্র যত আছে, আমি উপযুক্ত গুরুমুখে সব শাস্ত্র শ্রবণ করেছি আমার সাধ্য মতো। বিবাহাদি করে এখন পুরোপুরি এক সংসারী মানুষ আমি। এবারে বলুন—কোথায় আমার লম্পট্য ভুজঙ্গতা—কা মে ভুজঙ্গতা? (ভুজঙ্গতা) যদি কিছু থাকে, তা কামদেবের মধ্যেই আছে—কামে ভুজঙ্গতা। তা নইলে বলতে হবে কে সেই রমণী, যে আমার এই দুই বাহুর (ভুজ) মধ্যিখানে এসেছে—কা মে ভুজংগতা? কামে ভুজঙ্গতা? এই বাক্যটি হর্ষের সেই অসাবধানী মন্তব্যের উত্তর এবং সেটা বাণভট্ট শব্দভঙ্গে উত্তর করেছেন এমনই শ্লেষানুপ্রাসে যে, হর্ষকথিত শ্লেষোক্তিটিকে তিনি আপন বৈদগ্ধ্যে স্বপক্ষে অনুবাদ করেছেন। বাণ বলেছেন, শৈশবকালেও আমি যদি কোনও চপলতা করে থাকি, তা হলে সেগুলিও ইহলোক কিংবা পরলোকের নিয়মকানুন অতিক্রম করেনি। আমার লুকনোর মতো নেই কিছু। যৌবনে যা করেছি, তা এমন কিছু নয়, যাতে আমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট হবে। নিজের কথাগুলি যথেষ্ট জোর দিয়েই বললেন বাণভট্ট এবং এতটাই সে জোর, যাতে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মতো এক মহামান্য রাজাও বিনা শাসনে সেটা শুনতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশেষে বাণভট্ট শেষ আঘাত করলেন রাজাকেই। বললেন—আর এখন তো আপনি আছেন মাথার ওপর—

এখন আপনার মতো এক জন মানুষ, যেখানে সুগত বুদ্ধের মতো শান্ত মানস নিয়ে অসামান্য শক্তিতে রাজ্য শাসন করছেন, সেখানে একটি মানুষেরও সাধ্য নেই যে, কেউ মনে-মনেও অসংযমের অভিনয় করে। আপনার শাসনের প্রভাব এমনই যে, মৌমাছিরাও যেন ভয়ে ভয়ে মধু খায়, বানরেরাও যেন উচ্চকিত হয়ে চপলতা করে, হিংস্র শ্বাপদেরাও যেন খানিক দয়ালু হয়ে মাংস খায়। আপনার এই শাসনে এখন তো কারও পক্ষে অন্যায় করা সম্ভবই নয়।

আর আমার ব্যাপারে কথা হল—সময় চলতে থাকুক, আপনি নিজেই আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে সব জানতে পারবেন। বাণের এই ভাষণ, এমনকি ভাষণের মধ্যে খানিক তির্যক তিরস্কার শুনেও হর্ষ কিন্তু খুব রেগে গেলেন না। বরঞ্চ খানিক রাজোচিত ঔদাসীন্যে হর্ষ বাণকে বললেন—ঠিক আছে সব শুনলাম আমরা। কিন্তু হর্ষ আর কোনও সাদর সম্ভাষণও করলেন না, কিংবা এক বার বসতেও বললেন না বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণকে। কিন্তু এমন ভাবেই একটা প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তিনি এক বার বাণভট্টের দিকে তাকালেন, যেন ভিতরে ভিতরে হর্ষ বেশ খুশি হয়েছেন বাণের ওপর—স্নেহগর্ভেণ দৃষ্টিপাত-মাত্রেণ অন্তর্গতাং প্রীতিমকথয়ৎ।

সন্ধ্যা নামছিল বলে হর্ষ রাজসভা শেষ করে ভিতরে গেলে বাণও নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিন্তু এই পুলকটুকু কাজ করছিল—রাজা হর্ষ যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছেন তাঁর প্রতি। কেননা, তাঁর যৌবনসন্ধির নানান চপলতার গল্প শুনিয়ে রাজার কান ভারী করা হলেও হর্ষদেব মনে-মনে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি স্নেহভাব পোষণ করেন। আসলে বাণভট্ট অনুমানে এইটুকু রাজচরিত্র বোঝেন যে, এক জন রাজা যদি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীকে পছন্দ না করেন, তা হলে তাঁর সঙ্গে দেখাও করতেন না এবং অতক্ষণ ধরে তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষণও শুনতেন না বসে বসে। হ্যাঁ, রাজা হর্ষ এটাই চান যে, তাঁর মধ্যে যেন লোক-প্রচারিত দোষগুলি না থাকে। রাজা তাঁকে গুণবান মানুষ হিসেবে দেখতে চান এবং এতক্ষণ ধরে তাঁর কথা ধৈর্য ধরে শুনে তিনি এইটুকুই বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিজে কোনও কথা না বলে—ইচ্ছতি মাং তু গুণবন্তম্। উপদিশন্তি হি বিনয়মনুরূপ-প্রত্যুপপাদনেন বাচা বিনাপি ভর্তব্যানাং স্বামিনঃ।

বাণের সঙ্গে হর্ষের সাক্ষাৎকারের প্রক্রিয়াটুকু ভাল করে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, বাণের সম্বন্ধে হর্ষদেবের কানে যতই নিন্দেমন্দ করা হোক, সেই কালে এক বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণের জীবন-বৈচিত্র এবং পাণ্ডিত্য তাঁকে মনে মনে মুগ্ধ করেছিল। আমাদের তো মনে হয়—বাণের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি নিজেই বেশি ব্যগ্র ছিলেন এবং তাঁর কথার বিচিত্র বিশ্লেষণ শোনার জন্য হর্ষ ইচ্ছে করেই ওই রকম একটি তির্যক শ্লিষ্টপদ ব্যবহার করে বলেছিলেন—এই সেই ভুজঙ্গ! এই সেই লম্পট!

আমাদের সঙ্গে বাণেরও অনুমান মিলে যায়। বাণ সেই যে বেরিয়ে এলেন রাজভবন থেকে, তার পর সময় দিলেন পরিস্থিতি স্থিত হওয়ার জন্য। কিছু দিন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতেও দিন কাটালেন। রাজাকে সময়ও দিলেন যেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। কিন্তু বাণের আচরণ থেকে এটাও বেশ পরিষ্কার যে, এই মুহূর্তে নিজেকে সপ্রমাণ করার জন্য তাঁরও যেন এক মানসিক তাগিদ আসছে। সবার সামনে অত্যদ্ভুত ভাবে অত খারাপ একটা কথা বলা মানুষটাকে তাঁরও যেন 'কালচার' করতে ইচ্ছে করছে। দিন কতক পরেই তিনি রাজভবনে ঢুকলেন আবার। এবার একেবারেই অন্যরকম হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাণভট্ট সম্রাট হর্ষবর্ধনের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। অনেক ভালবাসা, বহুল প্রসন্নতা এবং বহুল সম্মানে বাণভট্ট রাজার বিচিত্র প্রসাদ লাভ করতে আরম্ভ করলেন। বাণভট্টের বিরাট প্রভাব তৈরি হল রাজদরবারে—প্রভাবস্য চ পরাং কোটিমানীয়তে নরেন্দ্রেণ।

লক্ষণীয়, রাজার কাছে বহুল মান-সম্মান এবং অর্থ লাভ করেও বাণভট্ট যে রাজসভায় বসে রইলেন, তা নয়। তিনি ফিরে এলেন বিন্ধ্যপর্বতের স্পর্শযোগ্য ভূমি ব্রাহ্মণাবাস প্রীতিকূটে। বন্ধুবান্ধব, ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁকে নিয়ে মত্তোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। বন্ধু-গোষ্ঠীতে বন্ধুরা সব তাঁর কাছে সম্রাট হর্ষবর্ধনের নানান কীর্তি-কাহিনি শুনতে চাইতেন। তিনি তা বলতেনও রসিয়ে রসিয়ে। এরই মধ্যে একদিন শ্যামল নামে বাণের এক ভাই বাণকে হর্ষদেবের জীবন নিয়ে লেখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বললেন—এতটাই তুমি জেনেছ, এত সুন্দর করে তুমি বলছ, তা হলে কার না ইচ্ছে হয় দ্বিতীয় একটা মহাভারত শুনতে—কস্য ন দ্বিতীয়-মহাভারতে ভবেদস্য চরিতে কুতুহলম্। আচষ্টাংভবান্। তুমি হর্ষের কথা লেখো।

হর্ষবর্ধনের বিচিত্র বহুমুখী রাজ-জীবনের কথা ভেবে বাণ প্রথমত খানিক বিনয় দেখালেন বটে, কিন্তু পরের দিনই হর্ষচরিত লিখতে আরম্ভ করলেন। এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্যের কোনও বর্ণনা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু আমরা শুধু জানাতে চাই বাণ কিন্তু কোনও স্বার্থলাভের আশায় হর্ষের জীবনচরিত লেখা আরম্ভ করেননি এবং রাজা হর্ষও তেমন কোনও প্ররোচনা জাগাননি মহাকবির মনে, যাতে তিনি রাজাদেশে হর্ষচরিত লিখতে বাধ্য হন। এক রাজা এবং এক মহাপণ্ডিত কবি—দু'জনেই দু'জনের অনন্তগুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিকভাবে দু'জনেই এত নিরপেক্ষ, যাতে একে অপরের পালন-পোষণ করতে পারছেন, অথচ কবি হিসেবে রাজসভায় স্বার্থসিদ্ধিকারী মানুষেরা কী কী করেন, সেটা বলতে বাণভট্টের এতটুকুও বাধছে না। আমি নিঃসন্দেহ যে, রাজা হিসেবে হর্ষও বাণভট্টের এই তিরস্কারগুলি জানতেন, কিন্তু তাই বলে কোনও দিন তিনি কবির প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেননি।

এক জন সার্থক বিদ্বান-বুদ্ধিজীবী অথবা আত্মবোধসম্পন্ন কবি-

সাহিত্যিকের সমস্যা হল যে, তিনি ভাবেন, তাঁর শিরদাঁড়া সোজা থাকবে, তিনি সত্য বস্তুটাকে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও বলেই ছাড়বেন। এই মানসিকতা যে দু'-চার জায়গায় সত্য হয় না তা-ও নয়। কিন্তু রাজনীতির জটিলতম সূক্ষ্মতার মধ্যে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই যেহেতু আত্মলাভের কৌশলগত সুযোগ পান, তাই সরাসরি এবং সোজাসুজি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রমুখ্যকে সমালোচনার আবর্তে নিয়ে আসতে পারেন না। কারণ, এটা তো অবশ্যই একটা ঘটনা যে, কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা যখন রাজার কাছ থেকে অথবা গণতান্ত্রিক মন্ত্রী-আমলাদের কাছ থেকে প্রশংসা বা সাভিনন্দন উচ্ছ্বাস লাভ করেন, তখন তাঁরা বেশ বিগলিত হন সরলতার কারণেই, তাঁরা বেশ ভাবতেই থাকেন যে, তাঁদেরও একটা প্রভাব তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মধ্যে।

কিন্তু এই তথাকথিত 'প্রভাব' বুদ্ধিজীবীদের সরল আত্মীয়স্বজনকে খানিক উল্লসিত করে হয়তো, হয়তো-বা সাধারণ মানুষও খানিক ভাবতে থাকে যে, লোকটা বেশ প্রভাবশালী, কিন্তু বাস্তব-জানা পোড়-খাওয়া বুদ্ধিজীবী এটাও জানেন যে, এই 'প্রভাব' একেবারেই মূল্যহীন এবং অনেকটাই মায়াময়। আসলে বুদ্ধিজীবী হিসেবে সার্থক মানুষের মধ্যে সব সময়েই এক ধরনের 'ইনসিকিওরিটি' কাজ করে, সেখানে রাজার প্রশংসা অথবা গণতান্ত্রিক মুখ্য পুরুষদের মুখে নিজের শংসা-সমর্থন বুদ্ধিজীবীকে এমনই এক স্বমেহনী আত্মতৃপ্তির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে সরকারি মহলে তাঁর স্বভাবিত 'প্রভাব'টা যে এক মায়াময়ী মিথ্যে, সেটা সেই বুদ্ধিজীবীরাই বোঝেন, যাঁদের বুদ্ধি আছে। অন্তত বুদ্ধিটা যাঁদের জীবিকা নয়, সেই বিদ্বান-বুদ্ধিমানেরা তো অবশ্যই সেটা বোঝেন।

বুদ্ধিজীবীদের এই বৌদ্ধিক নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রভাব-লাভের ইচ্ছে দিয়ে যে রসায়ন-যৌগ তৈরি হয়, এইখানে সবচেয়ে বুদ্ধিমান পণ্ডিত-কবি হিসেবে বাণভট্টের সচেতনতা ছিল অসামান্য। আগে যে বলেছি—রাজারা এবং কবিরা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক—অর্থাৎ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-পণ্ডিতেরা যেমন আত্মলাভ করতেন, তেমনই কবিকৃত রাজস্তুতির মাধ্যমে একজন অত্যাচারী অপ্রতিষ্ঠ রাজাও প্রচারের মহিমায় সাংস্কৃতিক পদবি লাভ করতেন—এই সত্যটা বাণভট্টের সম্বন্ধেও প্রচারিত হয়েছে—এখানে রাজাও ব্যতিক্রম, কবিও ব্যতিক্রম। এখানে রাজা হলেন হর্ষবর্ধন, বাণভট্টের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয়েছে, তখনই তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত এবং একবারের জন্যও তিনি বাণভট্ট কিংবা অন্য কাউকে এমন কোনও ইঙ্গিত দেননি যে, তাঁর জীবনী লিখে দিতে হবে। আবার বাণও তেমন পণ্ডিত কিংবা কবি-বুদ্ধিজীবী নন, যিনি রাজমান, অর্থ কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর জন্য হর্ষের কাছে গেছেন লালায়িত হয়ে অথবা জীবিকার জন্য।

ফলে এমন একটা জুটির জন্য খুব সাধারণ অথচ অপূর্ব একটি শ্লোক রচনা করলেন নাম-না-জানা এক কবি। তাঁর কবিতাটি এতটাই বিখ্যাত হয়েছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় বল্লভদেব তাঁর সংকলিত কবিতার মধ্যে এই কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে— কোথায় গেল সে সব দিন, যখন সম্রাট হর্ষবর্ধন বানভট্টের মতো কবিপণ্ডিতের মর্যাদা বুঝে একশো ভার সোনা আর কত শত হাতি দিয়েছিলেন তাঁকে। আবার বাণভট্ট তেমনই এক মানুষ, যিনি হর্ষের কীর্তিগাথা আখ্যাপন করে এমন সুন্দর একটি গ্রন্থ লিখলেন, যা হাজার বছর কেটে গেলেও এখনও এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি— যা বাণেন তু তস্য সূক্তি-বিসরৈরুট্টঙ্কিতাঃ কীর্তয়ঃ। সত্যিই তো, এত বছর কেটে গেলেও ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এখনও বাণভট্টের হর্ষচরিত-এর কথা বলতেই হয়।

আমাদের কথাটা হল— হর্ষ এবং বাণভট্টের এই পারস্পরিক মান-বিনিময় এবং পারস্পরিক প্রতিপূরণ, এটা একেবারেই সাধারণ কথা। রাজার কাছ থেকে শত সম্মান পেয়েও বাণভট্ট কিন্তু সেই সব সাধারণ মানুষের কথা ভুলে গেলেন না, যাদের প্রতিনিয়ত হেনস্তার মুখে পড়তে হয় রাজার অধস্তন মন্ত্রী-অমাত্য এমনকি, একজন দৌবারিকের কাছেও। রাজদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকা পরাজিত রাজা-রাজড়াদের অবস্থা কী হয়, সে কথা আমরা বাণের জবানিতে আগেই দেখিয়েছি। আসলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে বাণভট্টের আপন অনুভূতিগুলি কেমন হত, বাণ কিন্তু সেটাই লিখেছেন রাজদ্বারে নিজে দাঁড়িয়ে দেখার পর।

আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, রাজার দান-মান অনেক পেলেন বাণভট্ট, কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি যে, রাজসভায় যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। আর যে সব গুণ থাকলে রাজার আনুকূল্যময়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সে সব গুণ তাঁর এতটুকুও নেই বলে দাবি করেছেন বাণভট্ট। এতে বোঝা যায়— সাধারণ মানুষ থেকে বড় মানুষ, যে ভাবে রাজ-রাজড়াদের কাছে নত হয়, সেই বিনতি তিনি দেখাতে পারবেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে রাজা তাঁকে দান-মান দিয়ে মাথায় তুলে দিলেন, তার পরের ইতিহাস খানিক বিনীত হওয়ারই ছিল বাণভট্টের পক্ষে। তিনি বিনীত হলেনও অনেক, কেননা তিনি হর্ষের গুণগ্রাহী হয়েই হর্ষচরিত লিখতে বসলেন। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকৃত এক বিদ্বান-বুদ্ধিজীবীর মতো তাঁর শিরদাঁড়াটি সোজাই রয়ে গেল।

খোদ হর্ষচরিতের প্রথম আরম্ভেই যিনি রাজসভায় যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল রাজানুগ্রহ প্রার্থীদের সম্বন্ধে মর্মঘাতী কথা বলা। আর রাজা বা অনুরূপ গণতান্ত্রিক মুখ্যের কাছে যাঁরা প্রার্থী হন— বাণভট্ট তাঁদের একটিমাত্র শ্রেণি বলেই জানেন। এখানে গ্রাম্য সাধারণ থেকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক সকলে একাকার হয়ে যান, শুধু ব্যক্তিভেদে তাঁদের প্রার্থনা, নীতি-কৌশল এবং স্বরূপ আলাদা হয়। বিশেষ করে বাণভট্ট যখন নিজের মর্যাদা-স্থান থেকে খুব আন্তরিক ভাবে নিজেই রাজানুগ্রহজীবীদের সম্বন্ধে তিক্ত কথা বলেন, তখন বোঝা যায় যে, তিনি নিজেকে রাজার অনুগ্রহ-প্রার্থী হিসেবে 'প্রোজেক্ট' করে তাঁর ঘৃণা-তিরস্কার জানাচ্ছেন। এখানে তার শিরদাঁড়া সোজা, কেননা খোদ হর্ষচরিতের মধ্যেই তিনি তার কঠিন মন্তব্যগুলি করে যাচ্ছেন।

ঘটনার সূত্র এই রকম যে, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক তখনকার কামরূপ অর্থাৎ আসামের বেশ খানিকটা দখল করে নিয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা অর্থাৎ আসামের তৎকালীন রাজা ভাস্করবর্মা হংসবেগ নামে এক দূতকে হর্ষবর্ধনের কাছে পাঠিয়েছিলেন সামরিক মিত্রতার উদ্দেশে। হর্ষবর্ধন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে হংসবেগকে ডেকে রাজপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে অত্যন্ত মান্যতা দিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজার সঙ্গে একত্রে চলার প্রস্তাব মেনে নিলেন। যে আর্জি জানাতে এসেছে, তার মান-সম্মান খেয়াল করে হর্ষবর্ধন এমন একটা বিনয় প্রদর্শন করেছেন, যাতে অভিভূত হয়ে হংসবেগ রাজানুগ্রহপ্রার্থীদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করে নিজেকে পৃথকভাবে এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হংসবেগ যে ভাবে অনুগ্রহপ্রার্থীদের দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনার উপলব্ধি কিন্তু বাণভট্টের। রাজার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে হর্ষের সামনেই হংসবেগের উচ্চারিত আক্ষেপ ধিক্কার স্বয়ং বাণভট্টকেই একজন পণ্ডিত-কবি-বুদ্ধিজীবী হিসেবে পৃথক এবং কঠিন অথচ আত্মসম্মান-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। হংসবেগ আপন কার্যসিদ্ধির পর হর্ষবর্ধনকে বলেছেন— আমার রাজার আভিজাত্য মাথায় রেখে আপনি যে অভিজাত উপায়ে আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন, তার পর আমার কী বলার থাকতে পারে! আসলে কী জানেন তো— ভদ্র জনের স্বভাবটাই এমন যে, অপরের সেবা-পরিচর্যা করতে ভয় পায় অর্থাৎ দাসত্বের ভাব তার ভাল লাগে না; তার মধ্যে আবার মহারাজ ভাস্করবর্মা এমন বংশে জন্মেছেন, যেখানে তাঁর একটা অহঙ্কার কাজ করে।

বস্তুত 'অহঙ্কার' শব্দটা এখানে আত্মম্ভরী কোনও ভাবের দ্যোতক নয়, অহঙ্কার এখানে আত্মসম্মানবোধ— যেখানে অভিলাষ পূরণ করার জন্য নিচু হওয়াকে আত্মসম্মানবোধের চরম বিরুদ্ধ একটা বৃত্তি বলে মনে করা হয়। বিশেষত শুধুমাত্র এই অহঙ্কার বংশের মর্যাদা দিয়ে তৈরি হয় না, ব্যক্তিবিশেষে সেই আত্মসম্মানবোধ বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থপুষ্টি এমনকি শারীরিক শক্তি কিংবা রূপ নিয়েও হতে পারে। কিন্তু কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর যে আত্মসম্মানবোধ— সেটা প্রতিভা এবং তপস্যার যোগে তৈরি হয় বলেই সেটা খুব সূক্ষ্ম এবং অল্প আঘাতেই হন্যমান, ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। হংসবেগের অন্য কথাগুলোর মধ্যে তাই

বাণভট্টের নিজস্ব আবেগটুকু ধরা পড়েছে। তিনি হর্ষবর্ধনের মতো এক রাজার সামনে দাঁড়িয়ে হংসবেগের মুখ দিয়ে বলছেন—

ঠাকুর! তোমার পায়ে নমো নমো। দূর থেকে পেন্নাম জানাই ওই রাজার দেওয়া সুখ আর ঐশ্বর্যকে— নমো ভগবদ্ভ্যঃ সুখেভ্যঃ। তস্যায়মঞ্জলিরৈশ্বর্যস্য— ওরকম টাকাপয়সা, ওরকম ধনলক্ষ্মী দূরে থাকুন আমার, শত হাত দূরে, বিদায় জানাই অমন দামি পোশাক-পরিচ্ছদকে, যেগুলির জন্য আমার শরীরের ওপরটা নোয়াতে হবে মাটিতে— তিষ্ঠতু দূরে এব সা শ্রীঃ, শিবং স পরিচ্ছদঃ করোতু, যদর্থম্ উত্তমাঙ্গ গাং গমিষ্যতি।

আজ রাজতন্ত্র নেই। রাজানুগ্রহ পেতে গেলে রাজস্তুতিও করতে হয় না। কিন্তু জনগণের এই গণতন্ত্রে শিক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিভা এবং প্রতিভার যোগ্য সম্মান যেখানে গাণিতিক ভাবে দুয়ে-দুয়ে চার হওয়ার কথা ছিল, সেখানে অনেক প্রতিভাবান ও উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও মন্ত্রীর পায়ে মাথা ঠুকতে দেখেছি এবং এটা এখনকার নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, গণতন্ত্রের কালানুক্রমিত বৈশিষ্ট্য। এঁরা চাটুকারিতা করে পদ, অর্থ, গাড়ি-বাড়িও জোগাড় করেছেন। বাণভট্ট এঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন—

চাটুকারিতায় এরা পুরুষ-কোকিল, সুখকর আওয়াজ করার ব্যাপারে এরা ময়ূর, সাষ্টাঙ্গ হয়ে বুক রগড়ে চলার ব্যাপারে একেবারে স্থলকচ্ছপ, শব্দের মূর্ছনায় এরা নিজেরাই বাঁশি হয়ে ওঠে। এঁরা হলেন এক জাতের বিড়াল বা কচ্ছপ যাদের ‘জাহক’ বলা হয়— এঁরা সময়মতো শরীর গুটিয়ে নিতে জানেন আবার সময় মতো মাথা হেলানো এবং মাথা দোলানোর সময় এঁরা কাঁকলাশ বা কৃকলাসের মতো—পুংস্কোকিলঃ কাকুক্বণিতেষু, শিখী সুখকরকেকাসু, স্থলকূর্মক্রোড়কষণেষু, বেণুর্মূর্ছনাসু, কৃকলাসঃ শিরোবিড়ম্বনাসু, জাহকঃ আত্মসঙ্কোচনেষু।

বাণভট্ট নিজে রাজার সম্মাননীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও রাজার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের চরিত্র চিনিয়ে দিতে পারছেন রাজাকে। তিনি বলেছেন— এই রকম যারা অনুগ্রহজীবী, দাস-প্রায় মানুষ, তারাও যদি মানুষের মধ্যে গণ্য হয়, তা হলে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপও কালসাপের মধ্যে গণ্য হবে, আর চালের মধ্যে সেরা হল শুকনো মরা চাল, শালি ধানের মূল্য নেই, মরা চালই আদরের হয়ে উঠবে। এর পরই বাণভট্টের শেষ ধিক্কার—

এক মুহূর্তের জন্য হলেও মানুষ মনুষ্যত্ব দেখাক। এই তিন ভুবনের রাজ্যপাট পাওয়ার লোভেও এক জন মনস্বী মানী মানুষ যেন অবনত না হয়— ক্ষণমপি মানবতা মানবতা ন মতো নমতস্ত্রৈলোক্যাধিরাজ্যোপভোগো’পি মনস্বিনঃ।

বাণভট্ট কিন্তু সেই রকমই এক জন মানী মনস্বী, যিনি রাজা হর্ষবর্ধনের সর্বাঙ্গীণ পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও কোথাও এতটুকু মাথা নোয়াননি। এমনকি, প্রত্যক্ষে রাজচরিত্রের সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি। প্রত্যক্ষে মানে, রাজা হর্ষবর্ধনের প্রত্যক্ষে, কেননা তাঁর লেখা গ্রন্থ তিনি পড়েননি, এটা হতে পারে না। হয়তো হর্ষ নিজে নিশ্চিত ছিলেন যে, বাণের সমালোচনার পাত্র তিনি অবশ্যই নন এবং এটাও অবশ্যই সত্য যে, বাণভট্ট নিজে যেচে কোনও দিন রাজার প্রসাদ ভিক্ষা করেননি।

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

উপন্যাস

এক্কা দোক্কা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
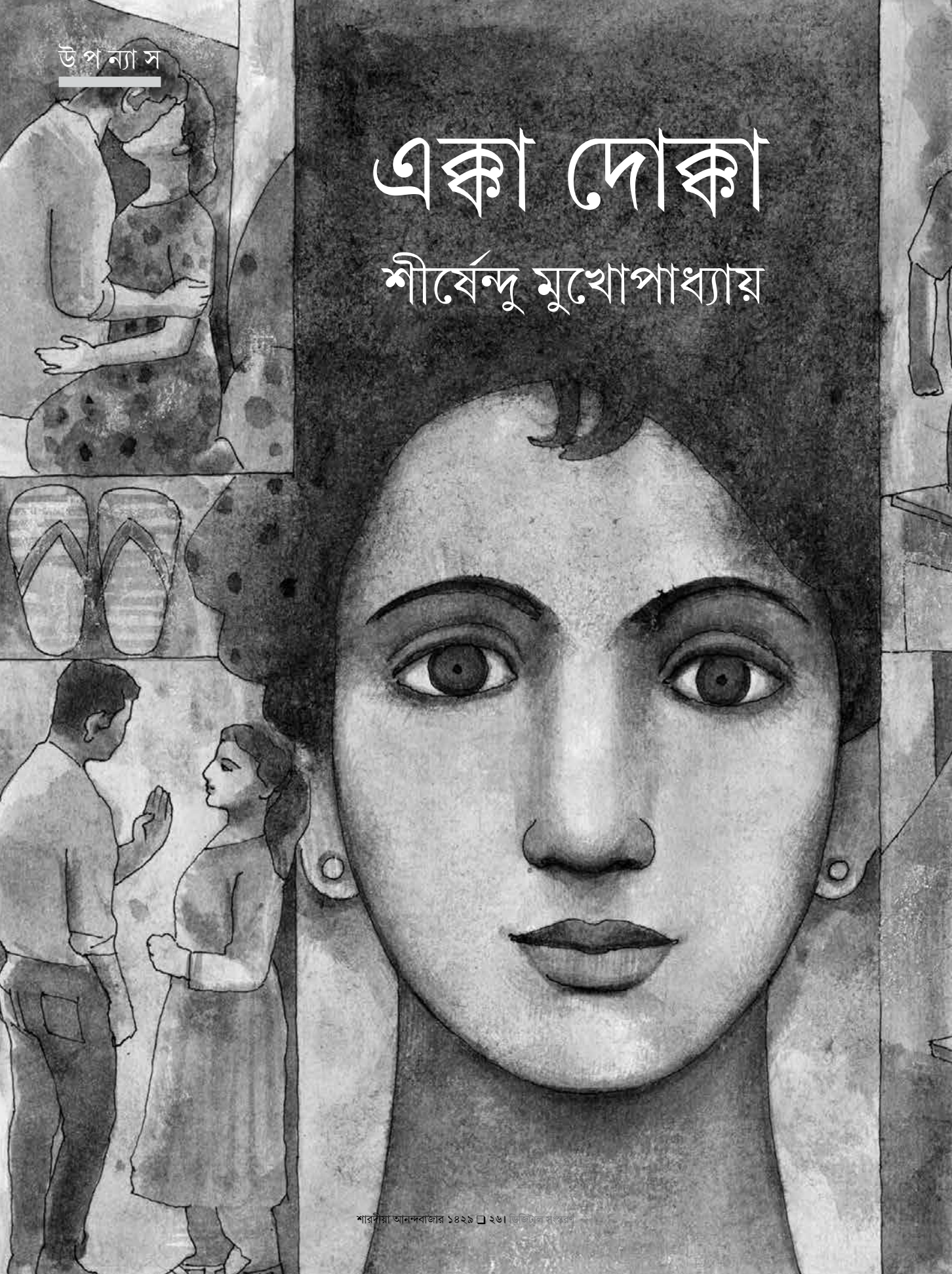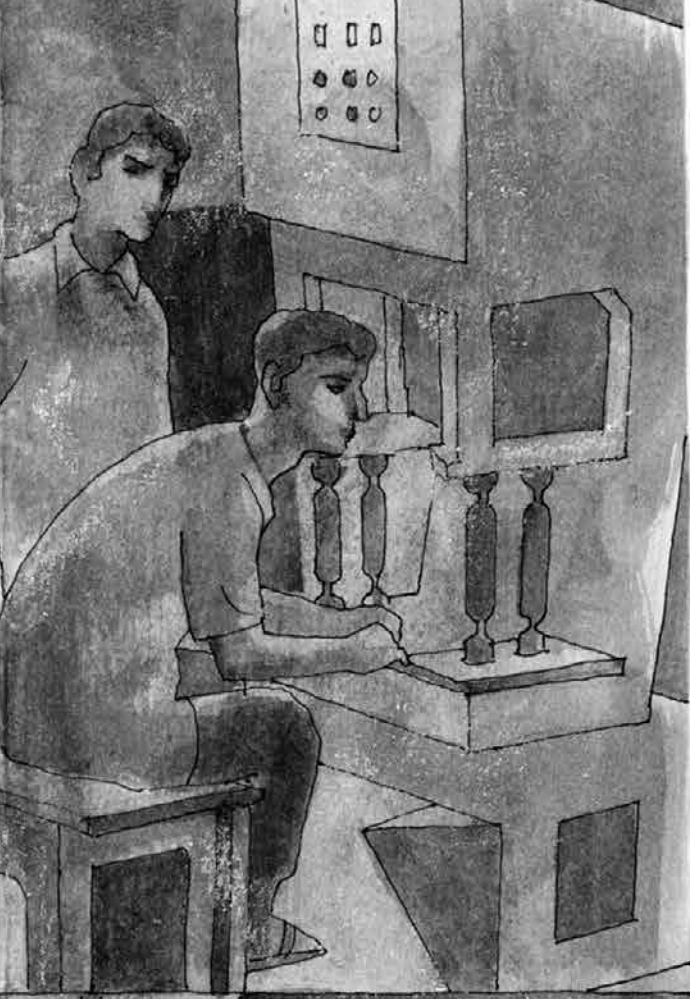
॥ ১ ॥

নহুষ ব্যানার্জির ডায়েরি থেকে

হাই! আমি নহুষ।

আমি এখন এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। পা দুটো বুকের কাছে জড়ো করা, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থুতনির নীচে। আমার চোখদুটো বোজা, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখার কিছু নেইও। তবে আমি একটা শব্দ শুনতে পাই, ধুকপুক ধুকপুক। ওটা আমার মায়ের হার্টবিট। আমি বেশ আছি, আরামে। খিদে তেষ্টা নেই। শীত বা গরম নেই। একটা ওম আছে। আমি একজন বিজয়ী। একটা মাতৃগর্ভের জন্য কি ভীষণ হুড়োহুড়ি! কত জন যে ছুটেছিল, কে আগে পৌঁছবে বলে! তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম এক দৌড়বাজ। জঠরে সবাই আমরা জড়ো হয়ে ডোরবেল বাজিয়েছিলাম, দরজা খোলো, দরজা খোলো! কী ভীষণ আশা ও হতাশায়। একটা লটারি খেলা তো! কে যে সুযোগ পাবে! কত যে উৎকণ্ঠা! অবশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার দরজা গেল খুলে। তার পর থেকে এই আমার ঘরদোর, এই আমার অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার জায়গা।

বড় সুন্দর একটা সিক্ত, নরম, মায়াবী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। জন্ম কি সোজা! কত বার যে বিফল হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। কত মাতৃগর্ভের প্রত্যাখ্যান সইতে হয়েছে তার হিসেব নেই। বারবার নষ্ট হয়ে গেছি। অনেক ব্যর্থতার পর এই একটা সাকসেস। জন্ম যে কত কষ্টের তা যদি মানুষ জানত তা হলে আর মরতে চাইত না। আমি এখন মাতৃগর্ভে।

ভারী শান্তিতে ছিলাম। নিস্তরঙ্গ, চিন্তাহীন, লম্বা ঘুমে। একটু আধটু পাশ ফিরতাম কখনওবা, একটু হাত পা ছুড়তে ইচ্ছে হত। তার পর হঠাৎ এক দিন একটা ওলটপালট শুরু হয়ে গেল। বড্ড বিরক্তিকর। আমার ছোট্ট ঘরখানা যেন ভাড়াটে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। কে যেন তাড়া দিয়ে বলছে, ওঠো! ওঠো! সময় হয়েছে, এ বার যে বেরিয়ে পড়তে হবে! ঠেলেঠুলে আমাকে কোন অচেনায়, কোন অজানায় যেন পাঠিয়ে দিতে চাইছে! কিন্তু আমি তো আর কোথাও যেতে চাইছি না! এই তো বেশ আছি, এ ভাবেই কেন থেকে যাই না!

কিন্তু না, আমাকে উল্টেপাল্টে, ধাক্কা দিয়ে আমার কবোষ্ণ ঘরটি থেকে কে যেন তাড়িয়ে দিচ্ছে, কিছুতেই তিষ্ঠোবার উপায় নেই। অবশেষে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে এক পিছল গুহাপথ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হল এক আশ্চর্য জগতে। আলো আর আলো! চোখ ঝলসে গেল আমার, হাত পা হঠাৎ যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে ড্যাং ড্যাং করতে লাগল, আমি তো হাত পায়ের ব্যবহারই জানি না! আর আমার সেই আরামের কোলকুঁজো অবস্থা থেকে কেমন একটা অনিশ্চয়তায়, নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে গেলাম আমি। আমার ঘর কই? আমার সেই নিশ্চিন্ত ঘুম কোথায় গেল? এ আমি কোথায় এলাম? তারস্বরে কেঁদে উঠলাম আমি।

সেই আমার প্রথম কান্না।

যখন পরিষ্কার করা হচ্ছিল আমায়, তখন কী যে ব্যথা আর বেদনা। কত যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আমি! কেউ পাত্তা দেয়নি। তার পর ঢাকাঢুকি দিয়ে কে যেন কোলে তুলে নিল আমায়। মুখে মাতৃস্তন্য। এই প্রথম জিহ্বায় কোনও স্বাদ পেলাম আমি। সে এক আশ্চর্য স্বাদ! তার পর ঘুম আর ঘুম।

একটা লাল বল গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে, আমি প্রবল হামা দিয়ে সেটাকে ধরতে যাচ্ছি। মেঝে থেকেই একটা টিকটিকি মাথা তুলে দেখল আমাকে, পুঁতির মতো চোখ। না আমি তাকে ভয় পাই না, হাত বাড়াতেই টিকটিকিটা সুড়ুত করে উঠে গেল দেয়ালে। বলটা গড়িয়ে গেল খাটের নীচে। খাটের নীচে অন্ধকার, আমি অন্ধকার ভয় পাই। কুকুর ডাকলে ভয় পাই, বাজ

পড়লে ভয় পাই, বাজি ফাটলে ভয় পাই, নিজের বাতকর্মে চমকে উঠি। আমি গম্ভীর মুখ ভালবাসি না, তেতো স্বাদ ভালবাসি না, অচেনা কোল ভালবাসি না। এক বার গরম চায়ের কাপে হাত দিয়ে ফেলেছিলাম, সে কী কান্না! ভালবাসি জল, যখন আমাকে একটা বড় গামলায় বসিয়ে চান করানো হয় তখন জল থাবড়াতে সে কী আনন্দ!

সবচেয়ে বেশি চিনি মাকে। আমাকে সবেচেয়ে বেশি নাড়াঘাঁটা করে আমার মা। চান করায়, খাওয়ায়, জামা পরায়, চুল আঁচড়ায়, ঘুম পাড়ায়, আর আদরও করে খুব। আমি মায়ের গায়ের গন্ধ খুব চিনি।

সব কিছু মুখে দিতে আমার ভারী ভাল লাগে। চিরুনি, পুতুলের ঠ্যাং, নিজের বুড়ো আঙুল, দিদির হাওয়াই চটি, এক বার একটা কেন্নোকে ধরে মুখে পুরে চিবিয়ে ফেলেছিলাম আমি, খেতে মোটেই ভাল লাগেনি, মা দৌড়ে এসে কী বকুনি আমাকে, "বদমাশ ছেলে, কেন্নো খেতে আছে?"

কী খেতে আছে আর কী নেই, তা কি আমি জানি! গোঁফওয়ালা লোকটা আমার বাবা। মাঝে মাঝে আমাকে দু'হাতে তুলে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লুফে নেয়, কাঁধে চড়ায়, চুমু খাওয়ার সময় বাবার গোঁফের খোঁচা লাগে আমার গালে। আমার দিদিটা রোগা, পারে না, তবু টেনে হিঁচড়ে আমাকে তার কোলে নেওয়া চাই। তবু তাকে আমার ভালই লাগে। অন্যদের চেয়ে সে ছোট তো, অনেকটা আমার কাছাকাছি। আর তার খেলনাবাটি আছে, পুতুল আছে, পেনসিল আছে, খাতা আছে, মাঝে মাঝে নিজের খাবারের ভাগ সে আমাকে চুপিচুপি খাইয়ে দেয় একটু-আধটু।

যে দিন হঠাৎ দেয়াল ধরে আমি প্রথম উঠে দাঁড়ালাম, সে দিন বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। আমি যেন কী একটা করে ফেলেছি অশৈলী কাণ্ড! তার পর টলতে টলতে এক পা দু' পা করে হাঁটা। কত যে বাহবা পেলাম! একটা দুটো কথাও বলে ফেলি মাঝে মাঝে, তাতেও সকলের কী আনন্দ! "দেখ দেখ, ওই বলল দিদি, ওই বলল বাবা, ওই বলল মা!" বিস্ময় আর বিস্ময়! চার দিকটা দেখে আমার যেমন বিস্ময়, তেমনই আমার কাণ্ডকারখানা দেখে চার দিকে বিস্ময়, যেন এমন কাণ্ড কেউ, কোনও শিশু কখনও করেনি!

আমি যখন হাঁটতে বা দৌড়তে পারি, যখন কথা বলতে পারি, যখন যুক্তাক্ষর পড়তে পারি তখন আর বিস্ময় নেই। আমাকে ঘিরে যে নিত্যনতুন বিস্ময় ছিল, তা উধাও হয়ে গেল। সাইজে ছোট বলে তখনও কিছু অ্যাডভান্টেজ পাই বটে, কিন্তু নবাগতের যে খাতির, তা আর নেই। একটু আধটু মারধর আর বকুনিও জুটে যায় মাঝে মাঝে।

প্রথম দিন স্কুলে যেতে ঘোর আপত্তি ছিল আমার। একটা অচেনা জায়গায় কেন আমাকে যেতেই হবে! সেখানে তো আমার কেউ নেই! না মা, না বাবা, না দিদি। অচেনা জায়গাকে তখন কী যে ভয়! কিন্তু বড়রা আর কে কবে ছোটদের দুঃখ বুঝেছে! হাপুস কাঁদতে কাঁদতে স্কুলে যেতেই হল এক দিন। তার পর দু' দিন, তিন দিন, তার পর আর তেমন খারাপ লাগত না। কত বন্ধু হয়ে গেল!

আমার খুব বন্ধু হল বুধো। মাথায় ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল, ঝলমলে চোখ, গম্ভীর আর সিরিয়াস। সে পাঁইপাঁই করে দৌড়ে ইস্কুলের স্পোর্টসে ফার্স্ট হয়। আমিও দৌড়োই বটে, কিন্তু ওর সঙ্গে পারি না, আরও অনেকের সঙ্গেই পারি না। আমি দৌড় শেষ করি চার-পাঁচ জনের পরে, আমার পিছনেও থাকে আরও তিন-চার জন। মানে দৌড়ে আমি মাঝারি। আমাদের ফার্স্টবয় হল অমূল্য। সব দিক থেকেই গুডবয়। তার জামার সব বোতাম আঁটা থাকে, জুতো চকচকে, ক্লাসে গোলমাল করে না কখনও। কিন্তু আমি বড্ড অগোছালো, চুল প্রায়ই আঁচড়ানো থাকে না, জামার বোতাম লাগানো থাকে না, জুতো নোংরা। আমি তার ধারে কাছেও নই। আর পড়াশুনোতেও আমি মাঝারি। পরীক্ষায় আমার আগে থাকে পনেরো-ষোলো জন, আমার পরেও পনেরো-ষোলো জন। অমূল্য ফার্স্টবেঞ্চার, আমি আর বুধো ব্যাকবেঞ্চার।

একটু বড় হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমার ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল নয়। কথাটা আমার বাড়ির লোকেরাও বলাবলি করে। কিন্তু আমাকে ঠিক কী বা কী রকম হয়ে উঠতে হবে সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। পৃথিবীতে নাকি খুব কম্পিটিশন, টিকে থাকতে গেলে নাকি কিছু একটা হয়ে উঠতেই হবে। আর এখানেই আমার মুশকিল। খুব ভেবেও আমি নিজের ভিতরে কোনও স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পাইনি। মনে হয় আমার ভিতরে কোনও বিস্ফোরকও নেই। শুধু একটা খোল দেওয়া হয়েছে আমাকে, ভিতরসে দেখো প্যায়ারে, বিলকুল ফোলমফোল হ্যায়।

আদিম মানবদের কিছু একটা হয়ে ওঠার তাগিদ থাকত না। তারা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ে উঠত, শিকারটিকার করত, গাছের ফলটল খেত, সন্তান উৎপাদন করে যেত, তার পর এক দিন বুড়ো হয়ে মরে যেত। ল্যাটাহীন জীবনযাপন। ওই রকম হলে আমার পক্ষে বেশ হত কিন্তু। টেনশন থাকত না। কুকুর, বেড়াল, পাখি, ইঁদুর বা বাঁদরদেরও কিছু হয়ে ওঠার বালাই নেই। বেশ তো আছে ওরা!

কথাটা এক দিন বুধোকে বললাম। ও শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ, খুব ঠিক কথা। কিন্তু আমাকে জিনিয়ার জন্য অলিম্পিক থেকে একটা মেডেল আনতেই হবে।"

আমি হাঁ। জিনিয়া ওর পাশের বাড়ির মেয়ে, ওর চেয়ে দু'-এক বছরের বড়ই হবে, দেখতেও আহামরি নয়। বুধোর সব দৌড়, আরও জোরে দৌড়োনোর জন্য কষ্টকর প্র্যাকটিস, অলিম্পিক থেকে মেডেল আনার চেষ্টা, সবই তা হলে শুধু জিনিয়ার জন্য?

তা হলে আমারও কি এক জন জিনিয়া দরকার? যার জন্য কিছু হয়ে ওঠার চেষ্টা করা যায়!

কিন্তু মুশকিল হল, আমার চেহারা নিতান্তই সাধারণ। তেমন লম্বাচওড়া নই, গায়ের রং ফর্সা নয়, মুখশ্রী মোটেই সুন্দর নয়, আমি প্রবল আনস্মার্ট, ভিতু, বেশ বোকা, দাঁত একটু উঁচু, কেউ আমার দিকে দু'বার তাকায় না। আমার তেমন কোনও গুণও নেই। তা হলে আমার কোনও জিনিয়া জুটবে কী করে?

যে মফস্সল শহরে আমরা থাকি, তা একটু প্রাচীনপন্থী। প্রেমটেম হয় বটে, তবে তা নিয়ে কূটকচালিও হয়, ফিসফাসও হয়, নিন্দেও হয়। তা না হয় হল, কিন্তু একটা প্রেম বা রোম্যান্টিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কী করতে হবে, তা আমি আকাশপাতাল ভেবেও খুঁজে পেলাম না। মনে হল, এটা খুবই শক্ত একটা কাজ। প্রায় অসম্ভব। তার ওপর মা বাবা এবং দিদির কড়া নজর আছে আমার ওপর।

সান্ত্বনার কথা এই যে, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই এই আমার মতো সাধারণ, মাঝারি বা আরও পিছড়ে বর্গের। আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ বলে তপনের একটু খ্যাতি আছে। তপন অনেক কিছু জানে। কুইজ় কন্টেস্টে নাম দেয় তো! সেই তপনই আমাকে এক দিন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। বলল, "বেশির ভাগ মানুষই অ্যাভারেজ, বুঝলি! হাই আই কিউওয়ালা লোক সংখ্যায় অনেক কম, পুয়োর মাইনরিটি, তবু তারাই দুনিয়াটা চালায়। আর আমরা, তারা যেমন চালায় তেমনি চলি। এটাই হল সিস্টেম। আমরা হলাম ঝড়তিপড়তি মাল। তবে ভাবিস না, দুনিয়া কিন্তু এই অ্যাভারেজ মানুষের কাঁধে ভর দিয়েই চলছে। কুলি, ঝাড়ুদার, কেরানি, ট্র্যাফিক পুলিশ, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, বাসের কন্ডাকটর, বুকিং ক্লার্ক, গাড়ির ড্রাইভার, দারোয়ান, দালাল, দোকানদার ইত্যাদি অ্যাভারেজ মানুষদের ছাড়া দুনিয়া কিন্তু অন্ধকার। এই সব লোকদের দিয়েই বিপ্লব করায় লেনিন বা মাও। আবার ক্যাপিটালিস্টদেরও এই সব লোককেই দরকার হয়। আবার মঠ, মিশন, তীর্থক্ষেত্রও এই কমন পিপল ছাড়া অচল। এই আমরা ছাড়া সব ফক্কা।"

শুনে আমার একটু ভরসা হল।

জয়তীর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। জয়তী আমার মায়ের বান্ধবী লাবণ্যমাসির মেয়ে। হামা দেওয়া বয়স থেকে তার

সঙ্গে আমার চেনা। সে দেখতে-শুনতে বেশ ভাল। মাজা রং, মুখশ্রী চমৎকার, কোঁকড়া চুল। শহরে অনেকেই তাকে লাইন দেয়। কিন্তু এত চেনাজানা কারও সঙ্গে কি প্রেম হয়? তার পুতুলের বিয়েতে আমি অনেক বার নেমন্তন্ন খেয়েছি। পাথরকুচি পাতার লুচি, কাঁকরের তরকারি, কাদামাটির পায়েস। মিছিমিছির নেমন্তন্ন। খেলনা নিয়ে ঝগড়া আর মারপিটও হয়েছে। একটু ছিঁচকাঁদুনে আছে। তুইতোকারি সম্পর্ক। কয়েক দিন তার ওপর মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে দেখলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে না। রোম্যান্টিক ভাবটাই আসছে না আমার। জয়তীও এক দিন বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই আজকাল আমার দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখিস রে বোকার মতো? হনুমান কোথাকার!"

আমিও রেগে গিয়ে বললাম, "দেখলাম তোর মধ্যে দেখার মতো কিছু আছে কি না। কিন্তু তুই তো একেবারেই হোপলেস! ক্যাঙারুও তোর চেয়ে ভাল।"

এ কথায় জয়তী আমাকে হাতের কাছে পাওয়া একটা কাঁচি নিয়ে তাড়া করেছিল।

মিনুকে সুন্দরী বলা যায় কি না, তা তর্কের বিষয়। কিন্তু সে সোজাসাপটা তেজি একটি মেয়ে এবং অহঙ্কারী। বেশ লম্বা, শ্যামবর্ণ, এক বিনুনি, বড় বড় টানা চোখ। আর ওই চোখদুটোই হল মারকাটারি। কয়েক দিন তার পিছু নিলাম এবং আমি যে পিছু নিয়েছি সেটা সে অচিরেই টেরও পেল। কোনও রিঅ্যাকশন দেখা গেল না তার মধ্যে। কিন্তু মাসখানেক বাদে কাঁঠালতলার নিরিবিলি রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে সে ফিরে দাঁড়াল এবং সটান আমার কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে বলল, "কি, আমার প্রেমে পড়েছ বুঝি! আচ্ছা, তোমার মতো ছেলেদের কি প্রেমে পড়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই ? পাহাড়ে চড়তে পারো না ? ইংলিশ চ্যানেল পেরোতে ইচ্ছে করে না ? ফাস্ট বোলার হওয়ার সাধ হয় না? আইএএস বা ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করতে পারো না ? না হয় তো মাদার টেরিজ়ার মতোও তো এক জন হওয়া যায়! মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করা তো পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা কাজ! এমন হয়ে দেখাও তো, যাতে আমার মতো মেয়েরাই তোমার পিছনে ঘুরঘুর করবে!"

অনুশোচনায় আমার কাঁচা প্রেমটা ওখানেই আত্মহত্যা করে ফেলল।

মিনুকে আমার বলতে ইচ্ছে করে যে, আমার ওই সব হওয়ারও খুব ইচ্ছে হয়। ক্লাইম্বার, আইএএস বা ডাক্তার, লং ডিসট্যান্স সুইমার, কিন্তু তার জন্যই তো এক জনকে দরকার! বুধোর যেমন জিনিয়া। শুধু জিনিয়ার জন্যই বুধো আজকাল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পার হয়ে স্টেট লেভেলে দৌড়োয়, এর পর ন্যাশনাল লেভেলে, তার পর বলা যায় না, এক দিন সত্যিই হয়তো অলিম্পিকেও যাবে।

আমাদের আশপাশে বিজ্ঞ লোকের কখনও কোনও অভাব হয় না। যেমন কামুদাদা। কামুদাদা রোজ সকালে কঠিন ইংরেজি কাগজ পড়ে। ও সব কাগজ যারা পড়ে, তারা তো সোজা পাত্র নয়, অন্যদের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে থাকা মানুষ। আমার সমস্যাটা শুনে কামুদাদা বলল, "ইনস্পিরেশন! তুই কি ইনস্পিরেশন খুঁজছিস! তা হলে তো বুড়ো হয়ে যাবি, কিস্যু হবে না। আজকাল কেউ কাউকে ইনস্পায়ার করে না, বুঝলি! বরং কাউকে উঠতে দেখলে তার কাছা ধরে টেনে নামায়। তুই বরং পলিটিক্স শুরু করে দে। প্রথমে ছাত্র রাজনীতিতে ছোট করে নাম লেখা। তার পর ক্রমে ক্রমে স্ট্রিট কর্নার, কর্মিসভা এই সব করতে করতে এক দিন দেখবি তোকে ইনস্পায়ার করতে মেলা লোক জুটে গেছে। লোকে বলতে থাকবে, 'নহুষ, তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' ব্যস, তখন আর তোকে পায় কে!"

তিনি শহরের নামকরা অ্যাস্ট্রোলজার। তাঁর বৌ আছে, দুটো বয়সের মেয়েও আছে, তবু ব্রজবাবু রোজ বেলা এগারোটায়, যখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়, তখন মেয়ে দেখতে রাস্তায় বেরোন। ফের বিকেলে কলেজ ছুটি হওয়ার পর, ওই মেয়ে দেখতেই। না কাউকে আওয়াজ দেন না, পিছু নেন না। শুধু দেখার আনন্দ। ওই আনন্দে ঘন ঘন নস্যি টানেন, মুখ রসস্থ হয়ে ওঠে, চোখ জ্বলজ্বল করে, লাইফ স্প্যান রিনিউ হয়। পঞ্চান্ন বছর বয়সে এটাই তাঁর টনিক বলে তাঁর ধারণা। আর হ্যাঁ, বারো পাওয়ারের ক্যালি ফস, দু'বেলা পাঁচটা করে বড়ি, আর রোজ এক ফোঁটা করে নাক্স ভোমিকা। আমাকে এক দিন পাকড়াও করে বললেন, "রঞ্জাবতীকে আজকাল দেখা যায় না কেন রে?"

"কী করে দেখা যাবে! দিদি তো এখন এম এ পড়তে বাইরে গেছে।"

খলখল করে হেসে বললেন, "তাই বল। সেই জন্যই কিছু দিন যাবৎ দেখছি না! শহরের প্রতিটি মেয়েই আমার নখদর্পণে, একটিও এ-দিক ও-দিক হওয়ার জো নেই। বুঝলি!"

"বুঝলাম।"

উনি দু'হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, "কচু বুঝেছিস! কিছুই বুঝিসনি! আমি যে এই বয়সেও কেন এত ইয়ং তা জানিস? ওই জন্যেই!" বলে কী জন্যে সেটা আর ব্যাখ্যা করলেন না। তবে বুঝতে আমার কোনও অসুবিধেও হল না। ওই ইনস্পিরেশন আর কী। ওটা নিয়ে আমি আজকাল খুব ভাবি তো!

তার সঙ্গে আমার দেখা হল, এক বৃষ্টির দিনে। কলেজ থেকে ফিরছিলাম। একা। হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি নামল। ভিজতে অসুবিধে ছিল না, কিন্তু বইখাতা বাঁচাতে একটা আবডাল দরকার ছিল। তাই দৌড়ে গিয়ে মধুরামের পরিত্যক্ত ঘানিকলের চালার নীচে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সেখানে আরও এক জন দাঁড়িয়ে আছে। সে চেনা লোক নয়। আবার অচেনাই বা বলি কী করে! না চিনেও যেমন অনেককে চেনা চেনা লাগে, সেই রকম। পরনে একখানা সবুজের ওপর খয়েরি রঙের ডুরেকাটা শাড়ি, খয়েরি ব্লাউজ়, কাঁধে মেয়েদের ব্যাগ। আর হ্যাঁ, কপালে খয়েরি রঙেরই বড় টিপ ছিল। বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভারী খুশিয়াল হাসি হাসছিল সে, যেন এমন আজব কাণ্ড আর কখনও দেখেনি। আর কী ঝকঝকে দাঁত তার! বৃষ্টিকে ছুঁয়ে দেখতে মাঝে মাঝে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। বাচ্চারা যেমন করে। আমার দিকে না তাকিয়েই ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, "দেখছেন কেমন বৃষ্টি পড়ছে! বৃষ্টি ভারী ভাল জিনিস, তাই না!"

আমার হাত পা শিথিল লাগছিল। তা হলে কি এই সেই মেয়ে, যার অপেক্ষায় আমি নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি! ইনিই কি সেই ঈশ্বরীয় ইচ্ছা! স্বর্গের খাতায় এঁর নামের পাশে কি আমারই নাম লেখা হয়ে আছে? হারানিধি পাওয়ার আবেগে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আমি তাই এক জন ক্রিটিকের চোখ দিয়ে মেয়েটিকে দেখতেই পারিনি। দেখলে হয়তো চোখে পড়ত যে, মেয়েটার মুখটা একটু বেশি লম্বাটে, মাথায় তত চুল নেই, ঠোঁট একটু বেশি পুরু,আর গালে মাংস কম। আমি শুধু ধরা ধরা গলায় বলে ফেললাম, "এত দিন কোথায় ছিলেন?"

মেয়েটি আমার দিকে একটুও না তাকিয়েই বলল, "বালুরঘাটে। বাবার তো বদলির চাকরি, এই তো মোটে পনেরো দিন হল এখানে এসেছি।"

আমি শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, "থাকবেন তো!"

"থাকব, নিশ্চয়ই থাকব, যত দিন বাবা আবার না বদলি হচ্ছে।"

দেখলাম সে আমাদের কলেজেই আমার এক ইয়ার নীচে ভর্তি হয়েছে। নাম ইছামতী সরকার। কলকল করে সবার সঙ্গে কথা কয়, কোনও বাছবিচার নেই। কিন্তু যে কোনও ছেলেছোকরার সঙ্গে কি

তার কথা বলা উচিত? সে কি ঈশ্বরীয় ইচ্ছা বুঝতে পারছে না? যত বারই কোনও ছেলেছোকরার সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখি, তত বারই আমার মন গর্জন করে ওঠে, কথা কয়োনাকো অই যুবকের সাথে! কি কথা তাহার সাথে, তার সাথে? কিন্তু সে শুনলে তো। এতই বদান্যতা তার যে, নির্বিচারে তার কথা আর হাসি সে সবাইকে বিলি করে যায়। টপাটপ যুবকেরা তার প্রেমে পড়ে যেতে লাগল। তাদের মধ্যে স্পোর্টসম্যান, বডি বিল্ডার, কবি, গায়ক, সুপুরুষ, ডিবেটার, ধনীপুত্র সবাই আছে। আমি এক ডিস্ট্যান্ট সিগনাল। ভিড়ে হারিয়ে যেতে আমার বেশি সময়ও লাগল না। প্রতিপক্ষ কঠিন হলে আমার ভারী অসুবিধে হয়। আমার মোটো হল, যারা চোখে দেখতে পায় না, দুধভাত খায়, কাউকে ঢুসঢাস মারে না, ছোটে না কি কাটে না, 'সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন তো, তেড়েমেড়ে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা!'

শহরের সকলেই জানে যে, তপন রায় নিয়মিত লটারির টিকিট কেনেন, টিউশনি করেন, তাঁর পেটে গ্যাস হয় এবং বহুদিন যাবৎ সাধনা গুহর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। লটারির টিকিটে একটা মোটা প্রাইজ় পেলেই তিনি বিয়ে করবেন, এটাও শহরের সবার জানা। কিন্তু লটারিটা কিছুতেই লাগছে না। এক বার পাঁচ হাজার টাকা লেগেছিল, তা সেটা লোককে বিরিয়ানি খাওয়াতেই উড়ে গেল। আর এ কথা কে না জানে যে পাঁচ হাজার টাকায় আর যাই হোক, বিয়ে হয় না। ও দিকে সাধনা গুহর মুখে মেচেতা পড়ছে, মাথার চুল কমে আসছে, দু'-একটা পাকতেও লেগেছে বোধহয়, গত বছর কষের একটা দাঁতও তুলে ফেলতে হল। যৌবন কিছুতেই আর থাকতে চাইছে না, পারলে পরের ট্রেনেই বিদায় হয়। সাধনা গুহ 'যেতে নাহি দিব' বলে হাতেপায়ে ধরে তাকে আটকে রেখেছেন। তপন রায়ের মেজাজ ক্রমে তিরিক্ষি হচ্ছে, চশমার পাওয়ার দিনদিন বাড়ছে, আর বাড়ছে উদগার। আমাকে এক দিন সন্ধেবেলা বড় চৌপথীর কাছে সাইকেল থেকে নামিয়ে বললেন, "শোপেনহাওয়ার কী বলেছেন জানিস! বলেছেন, মানুষের বেঁচে থাকাটা অর্থহীন, সব মানুষের উচিত এক্ষুনি সুইসাইড করা।"

আমি শোপেনহাওয়ারের নামও শুনিনি, তিনি কী বলেছেন তাও জানি না। অবাক হয়ে বললাম, "তাই নাকি?"

তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ গলায়, যেন অনেক দূরের কোনও একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে বললেন, "শোপেনহাওয়ার ঠিকই বলেছেন। বেঁচে থাকাটা কেমন জানিস! ধর পাঁচ কোটি টাকা, একখানা দোতলা বাড়ি, এক জন লক্ষ্মীমন্ত বৌ আর এক জন ভাল গোছের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট। এটুকুও না হলে বেঁচে থাকার মানে কী বল তো! না, শোপেনহাওয়ার তো ভুল কিছু বলেননি!"

আমি তপনবাবুর টিউটোরিয়ালে এক সময়ে পড়েছি, অঙ্ক আর ইংরেজি উনি দারুণ পড়ান। আমি সভয়ে বললাম, "ওই লোকটার কথা শুনে আপনি সুইসাইড করবেন না স্যর, শুনেছি সুইসাইড করলে লোকে মরে যায়।"

উনি বিরক্ত হয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "গাধা কোথাকার! সুইসাইড মানেই তো মরা রে আহাম্মক!"

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, "আপনি না থাকলে স্যর, এই শহরে ইংরেজি আর অঙ্কও থাকবে না। ও দুটো সাবজেক্ট সিলেবাস থেকে উঠে যাবে।"

"চুলোয় যাক ইংরিজি আর অঙ্ক। মানুষ মরে গেলে আর অঙ্ক ইংরেজি দিয়ে কী হবে রে মর্কট! মুখের ফেকো তুলে এত দিন টিউশনি করে আমার হয়েছে তো লবডঙ্কা।"

"কিন্তু আপনি মারা গেলে সাধনাদির কী হবে স্যর?"

"ওকেও রাজি করিয়েছি, দু'জনে এক সঙ্গেই মরব। সামনের মাসের ছ'তারিখে।"

খবরটা শুনে চারদিকে হইহই পড়ে গেল। সবাই উথালপাথাল। অনেক দিন পরে শহরে একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তপন রায় এবং সাধনা গুহ গলায় দড়ি দেবেন, নাকি বিষ বা ঘুমের ওষুধ খাবেন, এই নিয়ে তুমুল আলোচনা হতে লাগল ক্লাবে, রকের আড্ডায়, চায়ের দোকানে, স্কুল-কলেজে, আদালতে, অফিসে। মরালবাবু সুজনপুরের হাট থেকে একটা বই পর্যন্ত কিনে এনে তপনবাবুকে উপহার দিয়ে ফেললেন, 'আত্মহত্যা করিবার একশো সাতটি উপায়'। অনেকেই স্বীকার করল, না, লোকটার বুকের পাটা আছে। সামন্ত উকিল ঘোষণা করলেন, আত্মহনন ক্রিমিনাল অফেন্স, এর সাজা ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উদয়ন ক্লাবের ছেলেরা চাঁদাও তুলে ফেলল। আর ওই দিন সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য আবেদন নিবেদনও হতে লাগল।

কিন্তু সকলের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে পরের মাসের ছ'তারিখে উলুধ্বনি আর সানাইয়ের তুমুল শব্দ তুলে তপন রায় আর সাধনা গুহ বিয়ে বসলেন। নেমন্তন্ন খেতে ঝেঁটিয়ে লোক এল, আর মেনুও হয়েছিল চমৎকার। তপন স্যর ম্লান হেসে বললেন, "উদ্বাহ বন্ধন আর উদবন্ধনের মধ্যে বিশেষ তফাত নেই কি না। এ এক রকমের আত্মহত্যাই।"

তবে আত্মহত্যার পর তপন স্যরের পেটের গ্যাস কমে গেল, চেহারাটা আর তেমন তিরিক্ষি রইল না। টিউটোরিয়ালটার আরও একটা ব্রাঞ্চ খুলে ফেললেন। দোহাত্তা রোজগার। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি লটারির টিকিট কেনা ছেড়ে দিয়েছেন। কথা উঠলে বিজ্ঞের মতোই বলেন, "না, সাধনা লটারি একদম পছন্দ করে না কিনা! সাধনা ঠিকই বলে, লটারির প্রাইজ়ে অনেক মানুষের দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকে তো, তাই লটারি জিতে কারও ভাল হয় না।"

কিন্তু লটারি না লাগলে আমা হেন মানুষের উপায় কী! আমার লটারির টিকিট কেনার পয়সা নেই ঠিকই, কিন্তু লটারি তো নানা রকমের হয়ে থাকে। ধরা যাক নাহাটাবাবুর মেয়ে, শহরের সবচেয়ে সুন্দরী কুসুমকুমারী হঠাৎ এক বৃষ্টির দিনে আমাকে সাইকেল চালাতে দেখে মুগ্ধ হয়ে পুটুস করে প্রেমে পড়ে গেল! হয় না এ রকম? কিংবা দাঁ-বাবুদের পরিত্যক্ত এবং পোড়ো বাড়িটার দেওয়াল খসে একটা সোনার কলসিভরা মোহর বেরিয়ে এল আর সেটা পেলুম কিনা আমিই। হয় না এ রকম? আরও কত কিছুই তো হতে পারে। যেমন, আমার ভিতর থেকে হঠাৎ এক দিন সুপ্ত সিংহ জেগে উঠে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এল, অর্থাৎ আমার কোনও সুপ্ত প্রতিভা। সেটা গান বা কবিতা হতে পারে, শরৎবাবুর মতো সাহিত্য হতে পারে, মারাদোনার মতো ফুটবলের প্রতিভা হতে পারে, মহম্মদ আলির মতো বক্সিংয়ের ক্ষমতা হতে পারে, নিদেন এক জন বিচক্ষণ উকিল বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট? হয় না এ রকম? কিংবা হঠাৎ এক জন ফিল্ম ডিরেক্টর তার কোনও ভাল মুডে আমাকে রাস্তায় দেখে ভারী পছন্দ করে ফেলল এবং পরের ছবিতেই আমাকে নায়কের ভূমিকায় কাস্টিং করে ফেলল। হয় না এ রকম? এ রকম কিছু না হলে আমার খুবই মুশকিল। বাদলার দিনে ন্যাতানো দেশলাই যেমন কিছুতেই জ্বলতে চায় না, বেশি ঠুকলে বারুদ খসে যায়, আমারও হুবহু সেই অবস্থা। বারুদ খসে যাচ্ছে, অর্থাৎ বয়স বাড়ছে, কিন্তু দপ করে কাঠিতে আগুন লাগছে না মশাই!

আচ্ছা, ভগবান বলে এক জনের নাম সেই কবে থেকে শুনে আসছি। তাঁর পুজোয় অঞ্জলি কিছু কম দেওয়া হয়নি। দুর্গা বলো, কালী বলো, সরস্বতী বলো, লক্ষ্মী বলো, শ্রীকৃষ্ণ বলো, সত্যনারায়ণ বলো, শিবঠাকুর বলো, নমো কিছু কম ঠোকা হয়নি। আমার জন্য তাঁদেরও কি কিছু করণীয় নেই? তাঁদের এ রকম গা-ছাড়া ভাব আমার মোটেই পছন্দ হয় না। আমি শেষে বিমলকৃষ্ণবাবুর মতো নাস্তিক হয়ে গেলে কি ভাল হবে?

বিমলকৃষ্ণবাবু অবশ্য খুবই নরমসরম মানুষ, মোটেই তেমন গলাবাজি করেন না। খুব সমবেদনার সঙ্গেই এক দিন বললেন, "তোর কি এক জন ভগবান দরকার? তা হলে বানিয়ে নে না! কে

আটকাচ্ছে বল তো? লোকে তো বরাবর দরকারমতো ভগবান বানিয়ে নিয়েছে। নিজেরা যখন পেরে ওঠে না, সাধ্যে কুলোয় না, তখন এক জন ভগবানের ওপর বরাত দেওয়াটা মানুষের বহুকালের অভ্যেস। বুঝলি কিছু?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "একটু একটু।"

"আমার মেয়ের একটা পুতুল আছে, তাকে ও স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, বকাঝকা করে। ও না হয় ছেলেমানুষ, তাই পুতুলকে জ্যান্ত বলে ভাবে। কিন্তু বড়রাও যদি ও রকম করে তা হলে কী করার আছে বল। এই যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী নিয়ে বড়রাও তো পুতুলই খেলছে, তাই না?"

"আপনি কি বলতে চান, ভগবান নেই?"

"বার্ট্রান্ড রাসেল কী বলেছেন জানিস? বলেছেন, ভগবানই যদি থাকবে তা হলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ক্যানসার হয় কেন? ভগবান বলে কারও থাকার কথাই নয়। ভগবান যে নেই তার একশো আটটা প্রমাণ আছে, কিন্তু ভগবান যে আছে, তার একটাও প্রমাণ নেই। এখন বুঝে দেখ, ভগবান খুঁজতে সময় নষ্ট করবি কি না।"

বিমলকৃষ্ণবাবু যাই বলুন, আমি কিন্তু ভগবানকে এক দিন ঠিক ধরে ফেললাম। লাল সিংয়ের গারাজের পিছনেই ঝিল। গারাজ আর ঝিলের মাঝমধ্যিখানে দিব্যি বাঁশের বেড়া দেওয়া একটা জায়গা, পিছনে খোড়ো একটা ঘর, সামনে একটা উঠোন। সেইখানে বুড়োসুড়ো মানুষটির বাস। আদুল গা, পরনে হেঁটো ধুতি, হাতে হুঁকো। ভারী ব্যস্তসমস্ত মানুষ। ঘুড়ি বানাচ্ছেন, লাটাই তৈরি করছেন, ছেনি দিয়ে চেঁছে কাঠের লাট্টু বানাচ্ছেন, পুতুল গড়ছেন, আরও কত রকমের যে কাটুমকুটুম তার হিসেব নেই।

আমি গিয়ে ভারী রাগ করে বললাম, "আপনি আমাকে কী একটা বানিয়েছেন বলুন তো! কিছুই তো দেননি আমাকে!"

উনি তটস্থ হয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "কেন রে, তোর কি নিজেকে পছন্দ হয় না?"

"একটুও হয় না।"

"কিন্তু আমার তো তোকে বেশ লাগে!"

"ভাল করে ভেবে দেখুন, আমাকে কী দিয়েছেন। না চেহারা, না কোনও গুণ, না কোনও পার্সোনালিটি। কেউ তো পোঁছেও না আমাকে!"

উনি মাথা চুলকে ভারী অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "আহা, ভাল করে একটু খুঁজে দেখ না! আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখ, নিজের ভিতর কিছু পাস কি না। খুব ডুব দিয়ে খোঁজ, তলিয়ে গিয়ে খোঁজ।"

"আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন। খুঁজে দেখেছি, আমার ভিতরে তেমন কিছুই নেই।"

উনি ভারী অসহায় মুখে বললেন, "কাকে যে কী দিই তা কি আর আমার মনে থাকে! তবে মনে হয় তোকেও কিছু না কিছু দেওয়া আছে, খুঁজলে হয়তো পেয়ে যাবি।"

॥ ২ ॥
নহুষ ব্যানার্জির ডায়েরি থেকে নয়

প্রথম চুরিটা সে করেছিল একটা মাকড়ি। তার বন্ধু বাবলির। ঘটনাটা ঘটেছিল দুপুরবেলায়। বাবলির সঙ্গে খেলবে বলে ওদের বাড়ি গিয়েছিল ময়না। গিয়ে দেখে বাবলি তার ঘরে ঘুমিয়ে কাদা। বিছানায় বাঁ কাত হয়ে শুয়ে আছে, দু' ডাকেও সাড়া দিল না। বাবলির ঘুম যে খুব গাঢ়, তা জানা ছিল ময়নার। ডান কান থেকে মাকড়িটা আলগোছে খুলে নিয়ে এক দৌড়ে মায়ের কাছে।

মা একটু অবাক হয়ে বলে, "কোথায় পেলি?"

"বাবলির কান থেকে খুলে এনেছি। ঘুমোচ্ছিল, টের পায়নি।"

"ওর ঘরে তোকে ঢুকতে দেখেনি তো কেউ!"

"না, কেউ দেখেনি, মান্তিমাসি রান্নাঘরে ছিল।"

তার মা মাকড়িটা আঁচলে গিঁট দিয়ে রেখে বলল, "যা, খেলগে যা।"

দু'নম্বর চুরিটা ছিল খুব সোজা। তার বড় পিসেমশাই মথুরাপুর থেকে একটা মামলার সাক্ষী দিতে এসেছিলেন। তা দুপুরে তাদের বাড়িতেই স্নান খাওয়া সারলেন। যখন জামাপ্যান্ট ছেড়ে মায়ের দেওয়া একটা ধুতি পরে স্নান করতে গেছেন, তখনই তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে একটা দশটাকার নোট হাতিয়ে নিল সে।

মা টাকাটা পেয়ে বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, "বেশি বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। কুটুম মানুষ।"

ময়না বলল, "অনেক টাকা ছিল কিন্তু।"

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কত লোকের কত টাকা থাকে, আমাদের মতো হাড়হাভাতে তো নয় সবাই!"

তিন নম্বর চুরিটা, তার সাত বছর বয়সের পক্ষে একটু শক্তই ছিল। হয়েছে কি, গন্ধসাবানের ওপর তার খুব লোভ। কিন্তু তাদের বাড়িতে গন্ধসাবান মোটে আসেই না। সস্তা বাংলা সাবান দিয়েই তাদের মাঝে মধ্যে কাচাকুচি হয়, তাও কালেভদ্রে। স্নানের সময়ে সাবান মাখার মতো বাবুগিরি তাদের হয়ে ওঠে না। পায়খানা করেও তারা হাতমাটি করেই শুদ্ধ হয়। সাহাবাবুদের মেয়ে ঝিনুকের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে ছোট বাইরে পাওয়ায় ওদের বাথরুমে গিয়েছিল সে। তখন দেখে, সোপকেসে আস্ত একটা মস্ত বড় লাল রঙের সাবান। কী সুন্দর যে তার গন্ধ! সাবানটা নিয়ে সে বাথরুমের বাইরে এসে বাগানের কামিনী ফুলের ঝোপটার দিকে ছুড়ে দিয়ে আবার এক্কাদোক্কা খেলতে লেগে গেল। একটু পরেই বাড়িতে একটু শোরগোল উঠল, বাথরুমে নাকি সাবান পাওয়া যাচ্ছে না। একটু খোঁজাখুঁজিও হল। তাকে কেউ সন্দেহ করেনি, কারণ সে তো তখনও খেলছিল, পালিয়ে তো আর যায় নি! অনেক পরে দুপুরটা ঝিম ধরলে সে চুপিসাড়ে গিয়ে সাবানটা এনে মাকে দেয়। মা অমন দামি সাবান পেয়ে ভারী খুশি। বলল, "সাবানের কথা তো ভুলতেই বসেছি।"

তার বাবা শ্যামল রায় বদ্রীনাথ পাড়িয়ার মুদির দোকানে কর্মচারী। রোজ রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে, তার পর অনেক অশান্তি হয়। রোজ। চেঁচামিচি, মারধর, গালাগাল। সাত বছর বয়সেই ময়না অনেক খারাপ খারাপ কথা শিখে গেছে, তার বাবা আর মায়ের কাছ থেকে। শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে এ সব কথা কেন খারাপ তা অবশ্য সে জানে না। কিন্তু সব তার মুখস্থ। তার মা অবশ্য তাকে বলেছে, "ওই সব কথা কান দিয়ে ঢুকবে, কিন্তু মুখ দিয়ে যেন না বেরোয়!"

নয় বছর বয়সে সে রঞ্জিত ঘোষের বাড়িতে কাজে ঢুকল। তার টুলটুলে মুখ আর করুণ চোখ দেখে রঞ্জিত ঘোষের বউ ললিতা ঘোষের বড্ড মায়া হয়েছিল, তাই তার মাকে ধরে পড়ল, "তোমার মেয়েটাকে কাজে দাও না, বাড়ির মেয়ের মতোই ব্যবহার পাবে।"

ও সব অবশ্য মুখের কথা, কাজের মেয়েকে আবার কে কবে বাড়ির মেয়ের মতো দেখেছে! তবে তারা বড়লোক হলেও মানুষ তেমন খারাপ নয়, এই যা। প্রথম দিন কাজে ঢুকতেই তাকে বাসন মাজতে বসিয়ে দেওয়া হল। তা বাসন মাজতে সে ভালই পারে, নিজেদের বাড়িতে বাসন তো সেই মাজে। কিন্তু তাকে বাসন মাজতে দেখে রঞ্জিত ঘোষের বুড়ি মা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওম্মা গো! এ কী সব্বোনাশের কথা! ও যে বামুনের মেয়ে! ওর কি আমাদের এঁটো বাসন মাজতে আছে! মস্ত পাপ হয়ে যাবে যে! শিগগির ওকে বিদেয় করো।"

ললিতা ঘোষ অবশ্য একবার বলার চেষ্টা করেছিলেন, "ওরা কি আর তেমন বামুন আছে! নুন আনতে পান্তা ফুরোয়!"

ঘোষবুড়ি তাতে গর্জন করে উঠেছিলেন, "দাঁত ভাঙলেই কি আর গোখরো ঢোঁড়া হয়ে যায়?"

শেষ অবধি অবশ্য তাকে তাড়ানো হল না, ওই বুড়ির ফাইফরমাশ খাটবার জন্য রেখে দেওয়া হল। তা সেই দিদা বড্ড মোটাসোটা মানুষ, নড়াচড়াতেই কষ্ট। এটা দে, ওটা দে, বাথরুমে নিয়ে চল, চুলগুলো আঁচড়ে দে তো, এইসব আর কি। ময়না রোগা, চালাক আর চটপটে। তাকে দু'দিনেই ভারী পছন্দ হয়ে গেল ঘোষদিদার, আর ময়নারও ভারী সুবিধে হয়ে গেল। দিদার পেয়ারের কাজের লোক বলে তার বেশ খাতির, কারণ বুড়ির অনেক টাকা, অনেক গয়না, আর রঞ্জিত ঘোষ খুব মাতৃভক্ত মানুষ। আর সব চুলোয় যাক, মায়ের যেন কোনও অযত্ন না হয়। তা যত্ন করত বটে ময়না, কারণ সে জানত বুড়ি হাতে থাকলে আর সবাইও হাতে থাকবে।

তা হয়েছিল কী, দিদার হাতে পুরোনো সোনার চুড়িগুলো বড্ড আঁট হয়ে বসেছে, খোলা দরকার। এমনিতে খোলা যাচ্ছিল না। স্যাঁকরা ডেকে খোলানোর কথা হচ্ছিল। ময়না বলল, "আমি কিন্তু খুলে দিতে পারি।"

ললিতা বললেন, "পারবি? দেখ তা হলে, ব্যথা যেন না পায়, দেখিস।"

ময়না খুব যত্ন করে গরম জল আর সাবানে বুড়ির হাত ডুবিয়ে অনেক ক্ষণ সময় নিয়ে চাম চুরি করে করে চুড়িগুলো খুলে দিল। মোট আটগাছা। দিদা তখন তাকেই চুড়িগুলো গয়নার বাক্সে তুলে রাখতে বলল। ময়না আর যাই হোক বোকা নয়। সে গয়নার বাক্সে চুড়িগুলো রাখার সময় হাতছিপ্পু করে শুধু একটা কুট্টি নাকছাবি সরিয়ে ফেলেছিল। জানে যে ওই জিনিসের তেমন খোঁজ হবে না। গয়নার বাক্সে গয়নার গাদি, তার মধ্যে ওই নাকছাবির খোঁজ করবে কে?

তার মা নাকছাবিটা দেখে চোখ কপালে তুলল, "ওরে, এতে যে এক কুঁচি হিরেও আছে দেখছি! এর তো অনেক দাম হওয়ার কথা! এখানে এটা বিক্রি করা ঠিক হবে না। স্যাঁকরার সন্দেহ হবে।"

"তা কেন? গোপাল স্যাঁকরা তো চোরাই জিনিস কেনে!"

"সে কেনে দাগি চোরদের কাছ থেকে। ওদের বন্দোবস্ত থাকে। আমরা কি দাগি চোর? আমরা বেচতে গেলে পাঁচটা কথা উঠবে, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তার ওপর বদনামের ভয় আছে না!"

বুদ্ধিমতী বলেই সে এমন কিছু চুরি করে না, যা সহজেই ধরা পড়ে যায়। সে সরায় ছোটোখাটো জিনিস, খুচরো পয়সা, অনেক চামচের ভিতর থেকে একটা চামচ, একটুখানি সর্ষের তেল, অল্প করে মশলা বা দুটো আলু, এক থাবা চিনি, এই সব। যখন যেমন সুবিধে হয়। ওইটুকুই তাদের সংসারে অনেক কাজে লাগে। বেশি লোভ করলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। সন্ধেবেলায় তারা দু'জন কাজের মেয়ে রাতের জন্য রুটি বানাতে বসে। তাদেরও রুটির বরাদ্দ আছে। ওই নিজের ভাগে কয়েকটা রুটি বেশি নিয়ে যায় সে, তাতে তাদের রাতের রুটিটা মোটামুটি হয়ে যায়। এই সব ছোটোখাটো চুরি ধরা পড়লেও তেমন কিছু হবে না।

বাড়ির বড় ছেলে সুপর্ণ ঘোষ মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়া চুল, গম্ভীর মুখের মানুষ। একটু আনমনা বলে মনে হয়। নিজের ঘরে বসে প্রায়ই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। খারাপ গায় না।

যখন তার তেরো বছর বয়স তখন একটা ঘটনা ঘটল। সকালে ললিতামাসি তাকে ডেকে বলল, "সুপুর ঘরটা বড্ড অগোছালো হয়ে আছে। দশটায় বেরিয়ে যাবে, তার পর গিয়ে ওর ঘরটা একটু সিজিল মিছিল করে দিয়ে আসিস তো! ঘর গোছাতে গেলে রেগে যায়। আজ অতি কষ্টে রাজি করিয়েছি।"

সেইমতোই গিয়েছিল ময়না। ঘরে ঢুকে দেখল, সত্যিই দাদাবাবুটা খুবই অগোছালো। বিছানাতেই ছাড়া জামাকাপড়, গানের খাতা, স্বরলিপি, হারমোনিয়াম। আলনায় কোনও জামাকাপড় পাট করে সাজানো নেই। ওয়ার্ডরোব হাঁ হাঁ করছে খোলা, টেবিলে রাজ্যের

কাগজপত্র, দুটো মোবাইল ফোন, ডটপেন, হাতঘড়ি, টিভির রিমোট, বডি স্প্রে, আরও কত কী! ধুলোও জমেছে অনেক। ঘরের কোণে কোণে ঝুল। দেখলে থতমত খেতে হয়। খুব যত্ন করে ধীরে ধীরে ঘরটা সাজাচ্ছিল সে। কাজটা সহজ ছিল না মোটেই। প্রচুর পরিশ্রমের কাজ। তবে ময়না পরিশ্রমকে ডরায় না। কাজ করতে তার ভালই লাগে।

ওই কাগজপত্র গোছাতে গিয়েই একটা সাদা খামের মধ্যে দশখানা পাঁচশো টাকার নোট পেল সে। প্রথমটায় কী করবে বুঝতে পারছিল না। টাকাটা ললিতামাসিকে দিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু তার মনে হল, এটা হিসেবের টাকা নয়, মনের ভুলের টাকা। দাদাবাবুটা যেমন ভুলো মনের মানুষ তাতে এই টাকাটার কথা নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা নয়। বাজে কাগজপত্রের মধ্যে ঢুকে ছিল। তাই একটু রিস্ক নেওয়া যেতেই পারে। সে নোটগুলো ফ্রকের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। এ সব কাজের জন্য তার ফ্রকের ভিতরে পকেট করাই আছে।

রাতে যখন মায়ের হাতে টাকাগুলো দিয়েছে তখন মা ভয় পেয়ে বলল, "এতগুলো টাকা! ধরা পড়বি না তো!"

"না মা, সুপর্ণবাবু তো ন্যালাখ্যাপা মানুষ। এই টাকার কোনও হিসেবই নেই। বাজে কাগজপত্রের সঙ্গে ফেলেই তো দেওয়ার কথা। ভাগ্যিস খুলে দেখেছিলাম।"

"দেখিস বাপু, রয়েসয়ে এগোস। মানসম্মান যেন না যায়।"

"ইস, মানসম্মান গেলেই হল! অত সোজা নয় মা।"

পরদিন পড়ন্ত দুপুর। বাড়ির সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে ভাতঘুমে। পুরুষদের প্রায় সবাই কাজে বেরিয়ে গেছে। শুধু সুপর্ণদাদাবাবু ঘরে কী যেন করছিল। বেরোবে। ময়না সবে খেয়ে উঠে বেসিনে মুখ ধুচ্ছিল। পিঠে একটা নরম হাত টের পেয়ে ফিরে দেখল, সুপর্ণ ঘোষ। গম্ভীর মুখে বলল, "একটু আমার ঘরে আয় তো।"

বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল ঠিকই। আগে কখনও ধরা পড়েনি তো!

ঘরে যেতেই সুপর্ণ বলল, "তুই কাল আমার ঘর গুছিয়েছিলি?"

ময়না লোকমুখে শুনেছে, তার হাসি নাকি খুব সুন্দর। 'হাসি দিয়ে তুই মানুষও খুন করতে পারিস,' কথাটা বলেছিল বটে মান্তিমাসি। কেউ কেউ বলে, হাসলে সে নাকি আর মানুষ থাকেনা, হুরিপরি হয়ে যায়। সেই বিশ্বাসে সে যতটা সুন্দর করে সম্ভব, হাসল, আর ভারী আদুরে গলায় বলল, "হ্যাঁ তো দাদাবাবু, কাল তো আমিই আপনার ঘর গুছিয়েছি!"

সুপর্ণ তার দিকে খুব একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। বলল, "হ্যাঁ, গোছানো বেশ ভালই হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি আমার অনেক কাজের জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কী জিনিস বলুন, বের করে দিচ্ছি।"

"পারবি?"

"কেন পারব না? কোথায় কী রেখেছি সব আমার মনে আছে।"

"আমার লবঙ্গর কৌটো, সাদা রঙের লম্বাটে, প্লাস্টিকের তৈরি।"

"ও মা, এই তো আপনার শিয়রের কাছে, ছোট টেবিলটায় রেখেছি," বলে কৌটোটা বের করে দিল ময়না।

"বেশ। তুই পেনড্রাইভ চিনিস?"

"কেন চিনব না! আপনার পেনড্রাইভটা আমি ওই কাশ্মীরি কাজ করা বাক্সটায় রেখেছিলাম। বের করে দিচ্ছি।"

পেনড্রইভটা মুঠোয় নিয়ে তার দিকে এ বার আরও একটু ঘনীভূত চোখে চেয়ে দেখল সুপর্ণ। তার পর আলতো করে বলল, "আর একটা সাদা খামে পাঁচ হাজার টাকা ছিল টেবিলের ওপর। সেটা কোথায় রেখেছিস?"

ময়না এ বার একটু কেঁপে আর একটু দুলে উঠল। সব মানুষই অল্পবিস্তর অভিনয় জানে, জানতে হয় বলে, তাই সেও খুব বিস্ময়ের একখানা ভাব মুখে ফুটিয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলে, "পাঁচ হাজার টাকা! ওমা, না তো! পাইনি তো দাদাবাবু!"

সুপর্ণ একটা সাদা খাম বাঁ হাতে তুলে তাকে দেখিয়ে বলল, "খামটা কিন্তু ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছিল। শুধু টাকাটা নেই।"

ময়না ভেবে পাচ্ছিল না এর জবাবে কী বলবে। কিছু ক্ষণ চেয়ে থেকে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা ছাড়া আর কোনও পালানোর পথ পাচ্ছিল না। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল, "আপনি কী ভাবছেন আমি টাকাটা চুরি করেছি?"

সুপর্ণ তার চোখের জল বা কান্না দেখে একটুও নরম হল না, ঘাবড়েও গেল না। কঠিন চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "তা হলে টাকাটা গেল কোথায়?"

"বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। আমি কোনও টাকা চোখেও দেখিনি।"

"তুই কি চোখে কম দেখিস?"

ময়না চুপ করে শুধু কাঁদতে লাগল। কান্নাটাই এখন তার সবচেয়ে বড় ঢাল। জীবনে এই প্রথম ধরা পড়ল সে। ধরা পড়লে কী করতে হয় সেটা শেখা হয়নি এখনও। কিন্তু শিখে নেবে সে, না শিখলে চলবে কেন! আপাতত বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর!

একটু সময় নিল সুপর্ণ। তার পর ঠান্ডা গলাতেই বলল, "চোখ মোছ। কাঁদতে হবে না।"

ভরসা পেয়ে চোখ মুছল ময়না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে, চোখের জলে হয়তো কাজ হয়েছে। তার কান্নাও হয়তো সুন্দর। অবশ্য কান্নার জন্য আজ পর্যন্ত কোনও কমপ্লিমেন্ট পায়নি সে।

তার পর সুপর্ণ বিছানায় তার পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে আরও একটু নরম গলায় বলল, "আয়, আমার পাশে এসে বোস।"

খুব অবাক হয়ে ময়না বলে, "আপনার পাশে! কী ভাবে বসবে? বসতে নেই তো!"

"আমি বলছি তো! আয়।"

কী করবে বেচারা ময়না! বিপদ তো এখনও কাটেনি। সে সসঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে এগিয়ে গিয়ে আলগোছে বসল। শরীর কাঠ। তার মুখে চোখে চুলে সুপর্ণর শ্বাসের বাতাস লাগছিল। তার এত কাছে কোনও পুরুষমানুষ আসেনি তো আগে! অস্বস্তি হচ্ছে খুব।

তাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ সুপর্ণ তাকে জড়িয়ে ধরে আচমকা তার পুরু ঠোঁটদুটো তার ঠোঁটে চেপে ধরল। ভেজা, লালাসিক্ত, গরম দুটো ঠোঁট যেন তার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। আর ঘেন্নায়, লজ্জায়, বমিবমি ভাবে তার গা গুলিয়ে উঠছিল। চুমু জিনিসটা যে এত খারাপ, এত জঘন্য, এত গা-গুলোনো জিনিস, তা জানত না সে। কিন্তু জোর করে ছাড়াতেও পারছিল না। অত জোর তো তার নেই! কত ক্ষণ যে ব্যাপারটা চলেছিল তার হিসেব নেই ময়নার। তবে ছাড়া পেয়েই ছিটকে উঠল সে। কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

সুপর্ণই প্রথম কথা বলল, "পাঁচ হাজার টাকা অনেক টাকা। একটা চুমুতেই সেটা শোধ হয়ে গেল বলে ভাবিস না। তৈরি থাক, পুরোটা শোধ দিতে হবে কিন্তু।"

কথাটা বুঝতে পারল না ময়না, বুঝবার মতো অবস্থাও নয় তখন। মাথাটা গোলমাল লাগছিল। পুরুষদের স্পর্শ এত খারাপ, জানা ছিল না তার। দৌড়ে পালিয়ে এল সুপর্ণর ঘর থেকে।

রাতে মাকে সব বলে দিল সে। মা শুনে জুলজুলে অসহায় চোখে চেয়ে রইল তার দিকে কিছু ক্ষণ। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা কী করবি! ওরা মান্যিগন্যি লোক।"

"আমি ও বাড়িতে আর কাজ করব না মা!"

"তা হলে যদি পুলিশে দেয়?"

"তুমি বুঝছ না মা, শুধু চুমু খেয়েই ছাড়বে না! এর পর তো আরও কিছু চাইবে, বলেই রেখেছে!"

মা প্রথমটায় কিছু ক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, "তা আমাদেরই বা শরীর ছাড়া আর কী আছে বল!"

সে রেগে গিয়ে বলল, "আমরা কি বেশ্যা নাকি?"

"তাই কী বললাম! হয়তো তোকে মনে ধরেছে। সেটা তো আর খারাপ কিছু নয়!"

"খুব খারাপ মা, আমার মোটে তেরো বছর বয়স, ভুলে যেয়ো না।"

"ও বাড়ির দিদা তো তোকে ভীষণ ভালবাসে।"

"বাসুকগে। ও ভালবাসা তো কাজের জন্য। ভাল কাজ করি বলে কদর, নইলে পুছতও না।"

"তা বলে কি ভাল কাজটা ছেড়ে দিবি?"

"নিশ্চয়ই। কাল থেকে আমি আর ও বাড়িতে যাচ্ছি না।"

"তা হলে অন্য কাজ দেখি! কিন্তু ওরা যদি জানতে চায় কেন যাচ্ছিস না, তা হলে কী বলব?"

"বলবে আমি এখন থেকে লেখাপড়া করব।"

"সত্যি করবি নাকি? দু'বছর হল তো ইস্কুল ছেড়েছিস!"

"তাতে কী! দু'ক্লাস নিচু থেকেই পড়ব।"

ঘোষবাড়ির লোকেরা অবশ্য খুব একটা ঝুলোঝুলি করেনি। লেখাপড়া করবে শুনে মেনে নিয়েছে। আর মাইনের বাকি টাকাটাও দিয়ে দিয়েছে।

পরদিনই তার বিনোদিনী স্কুলে গিয়ে সে দিদিমণিদের ধরেকরে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়ে গেল। বিনোদিনী গরিবদেরই স্কুল, অবৈতনিক এবং ছাত্রীসংখ্যা বেশ কম। তাই ভর্তি হতে অসুবিধে হল না। সুপর্ণর ওই চুমুটাই তাকে হঠাৎ সচেতন করে দিয়েছে যে, এই ভাবে তার জীবন চলবে না। পরের বাড়িতে গতর খাটিয়ে পয়সা রোজগারে কোনও বাহাদুরি নেই, আর চুরি করাটা যে মোটেই নিরাপদ কাজ নয়, সেটাও সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে। আরও একটা জিনিসও টের পেয়েছে ময়না, সে মেয়েমানুষ, আর তার একটু হলেও চটক আছে।

তাদের কপাল হঠাৎ খুলল, যখন তার বাবা শ্যামল রায় হুট করে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালানোর চাকরি পেয়ে গেল। পুরোনো ড্রাইভার সতীশের হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় সে বসে যায়। তখন জরুরি ভিত্তিতে খোঁজ শুরু হয় এক জন ড্রাইভারের। শ্যামল যে গাড়ি চালাতে পারে এবং এক সময়ে গারাজে কাজ করত বলে টুকটাক রিপেয়ারের কাজও জানে, সেটা জানতেন ডাক্তার মনোতোষ সেন। তিনিই শ্যামলকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাকরিতে জুতে দিলেন। শুধু বলে দিলেন, "যদি এক দিনও মাতাল অবস্থায় ধরা পড়িস, তা হলেই কিন্তু চাকরি যাবে। তখন হাতেপায়ে ধরেও কিছু লাভ হবে না।"

শ্যামল কথাটা বুঝল। মদ খাওয়া ছেড়ে দিল, এমন নয়, তবে বুঝেসুঝে অল্পস্বল্প খেত।

ঠাকুরদেবতাদের মধ্যে শনিঠাকুরই হলেন সবচেয়ে 'ডেঞ্জার' ঠাকুর। আর হলেন মা শীতলা। আরও সব ভগবান আছেন বটে, কিন্তু গরিবের বন্ধু হলেন এই দু'জন। এঁদের সন্তুষ্ট করতে পারলে আর ভয় নেই। তা সেই শনিঠাকুরেরই পুজো হচ্ছিল সে দিন। কয়েক জন এসেছিল পুজোয়। তার মধ্যে তার বাবার বন্ধু মহেশ পালও ছিল। তার সঙ্গে একজন হাট্টাগাট্টা বেঁটে, কালো গেঞ্জি আর টাইট জিনস পরা ষণ্ডাগুন্ডার মতো দেখতে ইয়ং ছেলে। ছেলেটা হাঁ করে যেন গিলছিল তাকে। কয়েক বার এক ঝলক করে তাকিয়ে ময়নার মনে হল, ছেলেটাকে সে যেন আগেও দেখেছে, তবে কোথায় দেখেছে সেটা মনে আসছিল না। মহেশ তার মায়ের কাছে ঘেঁষে বসে অনেক ক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কী যেন বলছিল। আর তাতে মায়ের মুখটা বেশ হাসিহাসি হয়ে উঠছে। এ সব বেশ চেখে পড়ে যায় তার। প্রায় যুবতী হয়ে উঠছে তো, তাই তার মন একটু সন্দিহান। তাকে নিয়ে চার দিকে কথা হয়, লোকে তাকায় এবং তাকানোর মধ্যে লকলকে জিব দেখতে পায় সে। পুরুষদের সম্পর্কে একটা স্থায়ী ঘেন্না তার মনে তৈরি হয়ে গেছে, ওই সুপর্ণ ঘোষের চুমুটার পর থেকে। ভাবলেই ওয়াক আসে, মনটা যেন সব কপাট বন্ধ করে দিতে চায়। জীবনে আর যেন পুরুষমানুষের দরকারই হবে না তার।

লোকজন চলে গেলে বাড়িটা যখন শুনশান তখন তার মা খুব হাসিহাসি মুখ করে তোয়াজের গলায় তাকে ডেকে বলল, "শোন না! একটা ভাল প্রস্তাব আছে। তোর মহেশকাকু একটা খবর এনেছে।"

শুনে মোটেই পুলকিত হল না ময়না, তার কারণ খবরটা কী হতে পারে তা সে খানিকটা আন্দাজে বুঝতে পেরে গেছে। বিরস মুখে বলল, "তোমার ভাল খবর তো বোধহয় আমাকে নিয়ে!"

মা হাসিমুখ করেই বলল, "তা তোকে নিয়ে নয় তো কাকে নিয়ে! তুই-ই তো আমাদের অন্ধের নড়ি। তোর ভালতেই আমাদেরও ভাল।"

"বুঝলাম। মহেশকাকুর সঙ্গে ওই ছোকরাটা কে এসেছিল বলো তো! দেখলে তো ভদ্রলোক বলে মনে হয় না। চোখেমুখে বদমাইশি।"

"ছিঃ, ও রকম ভাবে বলতে আছে? ছেলেটা তো কত বিনয়ী, আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম পর্যন্ত করল।"

"তা করবে না কেন? সে কি আর ভক্তি থেকে করেছে? কোনও মতলব নিয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই, তাই দেখনদারি প্রণাম করেছে। তুমি এত বোকা কেন মা? এত সহজে গলে গেলে হয়?"

মা অভিমানের গলায় বলে, "না জেনেশুনে এক জন সম্পর্কে বাজে কথা বলে দিলেই হল? পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, ওদের বিরাট বিজ়নেস। কত্ত বড় একটা মোটরবাইকে চেপে এসেছিল দেখিসনি! হাতে চার-পাঁচটা আংটি।"

ময়না তেতো গলায় বলে, "মোটরবাইক আমি অনেক দেখেছি মা, আর সংসারে আংটিরও অভাব নেই। ল্যালা তো নই যে, মোটরবাইক আর আংটি ধুয়ে জল খাব।"

"অত দেমাক কিন্তু ভাল নয় রে মেয়ে! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে পরে পস্তাতে হবে।"

"ওই বখাটে ছোকরাই বুঝি এখন তোমার হাতের লক্ষ্মী? পয়সা থাকলেই বুঝি সব দোষ সারে?"

"ও মা! ওর দোষের কী দেখলি তুই? ভাল করে তো তাকাসওনি! এর মধ্যেই বুঝে গেলি যে ছেলেটা খারাপ!"

"আমার যা বুঝবার তা এক বার তাকিয়েই বুঝে গেছি। এ সব ছেলেছোকরাদের চিনতে এক লহমাও লাগে না মা!"

"তোর কিন্তু বড্ড দেমাক বাপু! অত দেমাক ভাল নয় কিন্তু, এই বলে দিলাম। ও হচ্ছে বিশ্বনাথ সাহুর মেজো ছেলে, ওরা মস্ত কালোয়ার।"

ভ্রু কুঁচকে ময়না বলে, "আমরা যে বামুন, তা কি ভুলে গেলে মা?"

মা অবাক হয়ে কিছু ক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "বামুন! আহা, কী আমার বামুন রে! তোর বাবার তো পৈতেও নেই! গায়ত্রী মন্ত্রও তো বোধহয় মুখস্থ বলতে পারবে না। সমাজের নীচের তলায় নেমে গেলে আর কে বামুন আর কে কায়েত! সব তো একাকার হয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে! আমাদের বামনাইয়ের কি কিছু আর আছে অবশিষ্ট?"

"আমি অত সব জানি না। তবে ঘোষদিদা আমরা বামুন বলে আমাকে তাদের এঁটো বাসন মাজতে দেয়নি।"

"ওরা সেকেলে মানুষ, ওদের কথা অত ধরতে আছে!"

"কার কথা যে ধরব তাই তো বুঝতে পারি না। তবে দিদা সে দিন বামুন বলে একটু সম্মান দিয়েছিল তো, তাতে মনে হয়েছিল নিজেদের অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করলেও পারি আমরা। মরে গেছি

বটে, কিন্তু পচে তো যাইনি!"

"মুখে মুখে অত চোপা কোরো না মা। এই ছেলে হাতছাড়া করা যাবে না। তোমার বাবা বাড়িতে এলেই আমি তার কানে কথাটা তুলব কিন্তু!"

"তা তুলতেই পারো। কিন্তু আমি বলেই দিচ্ছি, ওই ছেলেকে আমার একটুও পছন্দ নয়। জবরদস্তি করলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।"

"কোন চুলোয় যাবি শুনি!"

"চুলোর অভাব নেই মা।"

ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেলে ময়নার পক্ষে ভাল হত। কিন্তু জয়দীপ সাহু নামের সেই হাট্টাগাট্টা ছেলেটা দু'দিন পরেই মিষ্টির বাক্স নিয়ে এক সন্ধেবেলায় এসে হাজির। লেখাপড়া বেশি দূর নয়, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। মাথায় লম্বা চুল, রক মিউজ়িকের ভক্ত, খুব বিনয়ী। পয়সার দেমাকও তেমন নেই। এই দ্বিতীয় বার দেখে ছেলেটাকে ততটা খারাপ লাগল না ময়নার। তার দিকে মিটিমিটি চাইছিল বটে, তবে কামগন্ধ নাহি তায়। বরং একটু ভিতু ভিতু চোখ। তাদের মধ্যে কথাবার্তাও হল একটু।

জয়দীপ জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি তো এ বার মাধ্যমিক দেবেন, তাই না!"

"হ্যাঁ।"

বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "আমি লেখাপড়ায় তো তেমন ভাল ছিলাম না, তাই হায়ার সেকেন্ডারির পর বাবুজির সঙ্গে ব্যবসায় ঢুকে গেলাম। আপনি কি অনেক পড়বেন?"

কথাটা শুনে হাসল ময়না, বলল, "আমিও ভাল স্টুডেন্ট নই। পড়ার ইচ্ছে থাকলেই তো হবে না, ভাল রেজ়াল্ট না করলে কলেজেই তো নেবে না।"

"সে তো ঠিক কথা। কিন্তু লেখাপড়া শিখে আজকাল কিছু হচ্ছে না, শুধু টেকনিক্যাল এডুকেশন ছাড়া। আপনি কি চাকরি করবেন?"

"পেলে তো করব।"

"দরকার পড়লে বলবেন। আমাদের অনেক পাওয়ারফুল ক্লায়েন্ট আছে, চাকরি হয়ে যেতে পারে।"

ময়না বুঝতে পারল না, এটা টোপ কি না। অবশ্য সরল বিশ্বাসের সঙ্গেও বলে থাকতে পারে। মানুষকে আগে থেকেই খারাপ ভাবা ঠিক নয়।

প্রথম দিন এই পর্যন্ত। মা তো আহ্লাদে আটখানা, সে জয়দীপের সঙ্গে ভদ্র ভাবে কথা বলেছে বলে। মায়ের ধারণা প্রথম আলাপেই তাদের সেটিং হয়ে গেছে, আর চিন্তা নেই। কিন্তু আজকাল যে ছেলেতে মেয়েতে অত সহজে সেটিং হয় না, সে খবর মায়ের জানা থাকার কথাই নয়। জয়দীপ চা এবং সন্দেশ খেয়ে বিদায় নিল এবং বলে গেল আবার আসবে। কেন আসবে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না ময়নার, তবে সংবাদটিতে সে খুব একটা খুশিও হল না। আসতে চাওয়া কেন বাবা?

এর পর এক দিন দু'খানা সিনেমার টিকিট নিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাদের বাড়িতে এল এক জন উর্দিপরা ড্রাইভার। টিকিটের সঙ্গে একটা চিরকুট, 'প্লিজ় আসবেন কিন্তু।' কোনও নাম নেই। ড্রাইভার সবিনয়ে জানিয়ে গেল, শোয়ের দিন সে গাড়ি নিয়ে ম্যাডামকে তুলে নিতে আসবে।

ময়না বিরক্ত বোধ করল। এটা একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

মা অবশ্য বেজায় খুশি, আহ্লাদের হাসি চাপতে পারছে না। বলল, "কত্ত বড় চকচকে গাড়ি বাবা! এ তো রাজপুত্তুর!"

ময়না গোমড়া মুখে বলল, "অত আহ্লাদ কিসের মা? যদি খবর পাও যে, ওই ড্রাইভারটা আমার বাবার চেয়ে বেশি মাইনে পায় তা হলে কি আর আহ্লাদটা থাকবে?"

"ও মা! মেয়ের কথা শোনো! তোর বাবা কি একটা মনিষ্যি! তার মুরোদ আমার চেয়ে ভাল কে জানে! তা জয়দীপের ড্রাইভারের মাইনে তোর বাবার চেয়ে বেশি হলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে কেন রে! কোন সুখে তার ঘর করছি শুনি!"

"তোমার গায়ে ফোস্কা না পড়লেও আমার কিন্তু গায়ে চিড়বিড়িনি হয়।"

"ওঃ এলেন বড় বাপসোহাগী মেয়ে! তবু যদি বাপের মতো বাপ হত। বাপ না পাপ!"

গাড়িটা যে খুবই দামি, তা ময়না জানে। সে ইহজন্মে চড়তে পারবে বলে কখনও ভাবেনি। সে ল্যালা নয় ঠিকই, কিন্তু এত মর্যাদা এবং সমাদরও সে কোনও দিন পায়নি। তাই দোনোমোনো একটু রয়েই গেল। শোয়ের দিন ওই দ্বিধা নিয়েই সে গাড়িতে চেপে সিনেমা দেখতে গেল। সবচেয়ে দামি সিটে পাশাপাশি বসে একটা হিন্দি সিনেমাও দেখল তারা। না, জয়দীপ কোনও অসভ্যতা করার চেষ্টা করেনি, দূরত্ব বজায় রেখেছে, কথাও বলেছে কম। তবে হল থেকে বেরিয়ে তারা একটা রেস্তরাঁয় মোগলাই খাবার খেল। তখন বেশ অনেক কথা হল। কোনও প্রেম ভালবাসার কথা নয়। বাড়িতে তাকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় জয়দীপ বলল, "আপনি অসাম বিউটিফুল, সেটা কি আপনি জানেন?"

ময়না আর যাই হোক বোকা নয়। সে জানে সে দেখতে খুব একটা মন্দ নয়, তবে আহামরিও বলা যায় না মোটেই। তার রং চাপা এবং আরও নানা খামতি আছে, থাকবারই কথা। জয়দীপ মোহগ্রস্ত, তাই তার সব কিছু ভাল দেখছে। এক বার কারও প্রেমে পড়লে এ রকমই হয়। তবে জয়দীপ সত্যিই বেশ ভদ্র ছেলে, বেশি উৎপাত করে না। মাঝেসাঝে আসে, তাদের সস্তা ব্র্যান্ডের চা খেয়ে যায়, সিনেমাতেও কালেভদ্রে যায় তারা। শহরের লোক জেনেও গেছে যে তাদের মধ্যে রিলেশন হয়েছে। বন্ধুরা তো জানেই। শুধু ময়নাকে জিজ্ঞেস করলে সে নির্লিপ্ত মুখে বলে, "না, সে রকম কোনও ব্যাপারই নেই।"

ব্যাপার নেই, এটা ঠিক। কারণ ময়না কিছুতেই, চেষ্টা করেও তার মনটাকে জয়দীপের দিকে বিন্দুমাত্র ঘোরাতে পারেনি, অথচ ছেলেটাকে তার খারাপও লাগে না। মনে মনে জয়দীপকে বর হিসেবে ভাববার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছে, ব্যাপারটা হচ্ছে না। কিছুতেই ভাবটা আসছে না। বিরলে নানা কথা মনে আসে, কিন্তু কখনও জয়দীপের কথা ভাবে না সে! এ এক ঝঞ্ঝাটেই পড়েছে সে।

সেকেন্ড ডিভিশনে মাধ্যমিক ডিঙিয়ে গেল ময়না, স্কুলেই বারো ক্লাসে ভর্তি হল পিওর আর্টসে। লেখাপড়া করতে তার ভালই লাগে, কিন্তু রেজ়াল্ট তেমন ভাল হয় না কেন যে! এই সময়েই এক দিন জয়দীপ তাকে সাঁওতালদের গ্রামে একটা ট্রিপ দিতে নিয়ে গেল। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ বলল, "আমাদের রিলেশনটা নিয়ে কিছু ভেবেছ ময়না?"

"কী ভাবব বলো তো!"

"আমার বয়স এখন সাতাশ,আমাদের ফ্যামিলিতে আর্লি ম্যারেজের রেওয়াজ। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি বাবুজি আর মাকে তোমার কথা বলতে পারি।"

ময়না মনে মনে প্রমাদ গুনল, এই রে! দ্রুত একটা অজুহাত খুঁজতে গিয়ে সে বলে বসল, "অসুবিধে আছে।"

"কী অসুবিধে বলো তো!"

"আমরা কিন্তু ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণ! তো কী হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছি। নো প্রবলেম।"

অবাক হয়ে ময়না বলে, "কনভার্ট হয়ে যাবে! কী করে?"

"আরে আমাদের ঠাকুরমশাই আছেন না! ওঁকে বললেই ব্যবস্থা করে দেবেন। দেয়ার মাস্ট বি সাম ওয়ে।"

ময়না অবশ্য জানে না যে, যে কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারে কি

না। তাই সে শঙ্কিত হয়ে বলে, “ও রকম হয় নাকি?”

“আলবাত হয়। ওই সব প্রায়শ্চিত্তটিত্ত আছে না! ঠাকুরমশাই সব জানেন। ইসকনের এক সাহেব সাধু তো আমাকে বলেছিল, সে ব্রাহ্মণে কনভার্ট হয়ে গেছে। ইজ়ি ব্যাপার। আর আমি তো গায়ত্রী মন্ত্রও জানি। আমার ফোনের রিংটোনও তো গায়ত্রী মন্ত্রই।”

ময়না ভারী বিপন্ন বোধ করতে লাগল। তার আর কোনও অজুহাত মাথায় আসছে না। সে নিপাট ভালমানুষের মতো বলল, “লেখাপড়া শেষ করার আগে বিয়ের প্রশ্নই নেই।”

“তুমি আর কত দূর পড়বে? তবে তাতেও অসুবিধে নেই, তুমি আফটার ম্যারেজ পড়া চালিয়ে যেতে পারো। তোমাকে তো আর ঘরের কাজ করতে হবে না!”

“তুমি কি জানো যে, আমার বাবা এক জন সামান্য অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার! আমরা ক্লাস অ্যাপার্ট। এ রকম বিয়ে হওয়া উচিত নয়।”

“ও সব আমরা মাইন্ড করি না। ঠাকুরমশাই বলেন, সুকন্যা দুষ্কুলাদপি।”

“আমি সুকন্যা, কী করে বুঝলে? আর আমাদের কুলও কিন্তু খারাপ নয়, আমার বাবা তেমন কিছু নন বটে, কিন্তু আমার দাদু ছিলেন প্রফেসর। আর আমার জেঠু গেজেটেড অফিসার। তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই।”

“সরি ফর দ্য স্লিপ অব টাং।”

“আমাকে ভাবতে সময় দাও।”

“টেক ইয়োর টাইম। কিন্তু ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, মাসিমা কিন্তু আমাকে বলেছেন যাতে আমি বিয়েতে দেরি না করি।”

ময়না মুখটা কঠিন করে বলল, “জীবনটা তো আমার, আমার মায়ের নয়।”

এই পর্যন্ত হয়ে রইল সে দিন। কথাটা আর এগোয়নি।

তবে ময়না বুঝে গেল, জয়দীপ সিরিয়াস। আবার কথা উঠবে এবং উঠতেই থাকবে এবং বারবার জ্বালাতন হবে সে, টেনশনে পড়তে হবে। মা তাকে তিষ্ঠোতে দেবে না। কিন্তু সে পালাবে কোথায়? জয়দীপকে এতটা প্রশ্রয়ই বা দিল কেন সে? না দেওয়াই উচিত ছিল, এখন মনে হচ্ছে। পুরুষদের ওপর তার বিরাগটা এখনও যায়নি। সুপর্ণর ওই পুরু লালাসিক্ত গরম ঠোঁটদুটোর ভয়ঙ্কর স্মৃতি তাকে এখনও তাড়িত করে। মাঝে মাঝে রাতে ওই ধরনের নানা দুঃস্বপ্নও সে দেখতে পায়। সে কি কোনও পুরুষের ঘর করতে পারবে কোনও দিন? তার ভয় হয়, সে ধীরে ধীরে লেসবিয়ান হয়ে যাবে না তো?

ঠিক এই সঙ্কটকালে তার এক জন ভগবানের দরকার হল। হাতের কাছে অবশ্য ভগবানের অভাব নেই। শনিঠাকুর আছেন, শীতলা মা আছেন, শিবঠাকুর আছেন, দুষ্টুমিষ্টি কেষ্টঠাকুর আছেন, মা দুর্গা আছেন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সন্তোষী মা, ষষ্ঠী ঠাকরুন, গণেশবাবা, মনসা মা... কে নেই! তবে এমনিতে যদিও সে পুরুষমানুষদের তেমন পছন্দ করে না, কিন্তু ভগবানের বেলায় ঠিক উল্টো। তার কেন যেন মনে হয়, মেয়ে ভগবানদের চেয়ে ছেলে ভগবানদের ক্ষমতা যেন একটু হলেও বেশি। মেয়েরা হিংসুটে হয়, কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। ছেলে ভগবানদের মধ্যে কার কাছে ধর্না দেওয়া যায়, তা নিয়ে সে এক দিন খুব গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসল। শনিঠাকুর রাগী মানুষ, কোন কথায় কী বুঝে কুপিত হয়ে উঠবেন কে জানে বাবা! সুতরাং শনিকে বাদ দিল সে। ভোলেবাবা শিবঠাকুরকেই বা বিশ্বাস কী, নেশাখোর মানুষ, ব্যোমভোলা, কান শুনতে ধান শুনে বসবেন কি না কে জানে। আর কেষ্টঠাকুর তো নিজেই ফস্টিনস্টির রাজা, রাধাকে কম ঘোল খাইয়েছেন নাকি! তা হলে বাকি থাকে কে? ভেবেচিন্তে সত্যনারায়ণকে তার খারাপ লাগল না। মান্তিমাসিরা সত্যনারায়ণের পুজো করে, আর তাদের অবস্থাও বেশ ভাল। সে যত দূর জানে, সত্যনারায়ণ রাগী নন, ভুলোমনের মানুষ নন, দুষ্টুও নন। সে দিন দুপুরে একা ঘরে অনেক ক্ষণ কাঁদল সে। কান্নাটাকেই উচ্ছুগ্যু করল সত্যনারায়ণ বাবাঠাকুরকে।

সে দিন স্কুল থেকে ফেরার সময়ে লাল সিংয়ের গারাজের কাছে এসে ডান পায়ের চটিটার স্ট্র্যাপ ছিঁড়ল তার। কী যে মুশকিল! ধারেকাছে কোনও জুতো সারাইকর নেই। গারাজেরই এক জন ছোকরাকে জিজ্ঞেস করল, “ভাই, এখানে জুতো সারাইয়ের কেউ আছে?”

ময়লা গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটো একটা টায়ারের লিক সারাচ্ছিল। গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, “না। তবে গারাজের পিছনে এক জন আছেন, তিনি হয়তো জানতে পারেন।”

ময়না অবাক হল। গারাজের পিছনে আবার কে থাকবে! পিছনে তো ঝিল! তবু হাতে ছেঁড়া চটি নিয়ে সে গারাজের পিছন দিকটায় গিয়ে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা উঠোন আর খোড়ো ঘরটা দেখতে পেল। আদুল গায়ে এক জন বুড়ো মানুষ, হেঁটো ধুতি পরা, এক মনে করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করছেন। গোটা জায়গাটা ম ম করছে তামাকের মিষ্টি গন্ধে। জায়গাটায় পা রেখেই কেন যেন মনটা ভাল হয়ে গেল তার। চটির কথা মনেও রইল না। সে দিব্যি থেবড়ে উঠোনের মাটিতেই বসে পড়ল।

বুড়ো লোকটা তার দিকে তটস্থ হয়ে জুলজুলে চোখে চেয়ে একটু দেখলেন। তার পর যেন খানিকটা অসোয়াস্তি নিয়েই ইতিউতি চাইলেন। আরও খানিক ক্ষণ পর যেন একটু ভয়ে ভয়ে বললেন, “কিছু বলবি নাকি?”

বেশ সাহস পেল ময়না, ঝগড়া করার জন্য গলা চুলকোতে লাগল। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, “বলতেই তো আসা! ওই সব বামুন কায়েত শুদ্দুর এই সব কি আপনি বানিয়েছেন?”

লোকটি একটু মাথা চুলকে, ভাবিত হয়ে বললেন, “কেন বল তো! তাতে কি কোনও বখেরা লেগেছে?”

“লেগেছেই তো! অত জাতপাতের দরকারটা কী ছিল! সব সমান করে দিতে পারেননি?”

“তাতে ভাল হত বলছিস?”

“হতই তো! তা হলে আমাকে সমস্যায় পড়তে হত না।”

বুড়োমানুষটি টালুমালু করে চার দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, “কী জানি বাপু, ভাল ভেবেই তো করলুম!”

“তাতে কী ভাল হয়েছে?”

“হয়নি বুঝি?”

“কোথায় আর হল বলুন।”

বুড়োমানুষটি একটু ম্লান হেসে বললেন, “সে এক বার হয়েছিল এক কাণ্ড। বুঝলি! সে বার সব মানুষ আর মেয়েমানুষকে এক ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হল। সব মানুষ দেখতে হবহু এক রকম, এক চুল তফাত নেই। সবাই সমান লম্বা, সমান ফর্সা, সবার গলার স্বর এক, সবারই একই রকম মেধা, সমান গায়ের জোর, সবার মনও এক রকম। দৌড়লে সবাই ফার্স্ট হয়, কুস্তিতে কেউ কাউকে হারাতে পারে না, ফুটবল খেলা হলে শুধু ড্র হয়, কেউ কারও চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়। মেধা সমান হওয়ার ফলে সবাই ডাক্তার, সবাই ইঞ্জিনিয়ার, সবাই দার্শনিক, সবাই অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সবাই মেকানিক, সবাই কবি, সবাই গায়ক হয়ে গেল। বুঝলি তো! একঢালা ব্যবস্থা। প্রভু ভৃত্য নেই, রাজা প্রজা নেই, নেতা জনতা নেই, ধনী গরিব নেই, সবল দুর্বল নেই, ওপরওয়ালা অধীনস্থ নেই। তাতে হল কি জানিস! মানুষ মোটেই খুশি হল না, বেজায় কাঁইমাই শুরু করে দিল। এ কী, আমরা তো বুঝতেই পারছি না আমি কে বা ও কে। আমি গোবিন্দ না হরিদাস তাই তো গুলিয়ে যাচ্ছে মশাই! আমি বৃন্দা না অতসী, তাই তো বুঝতে পারছি না। আমি হারছি না জিতছি তাও তো বোঝা যাচ্ছে না! কে রাজা আর কে প্রজা, কে পুলিশ আর কে চোর, সব যে খিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে! আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, বুঝলি তো! তখন আমার ওপর সে কী রাগ তাদের! এই মারে কি সেই মারে!”

“হি হি, তার পর কী করলেন?”

“ওই তো, তোর যা পছন্দ নয় তাই করতে হল। চানাচুর খেয়েছিস তো!”

“তা আবার খাইনি!”

“কত রকম লাগে বল তো! ডালমুট, ঝুরিভাজা, বাদাম, গাঠিয়া। অনেক ভ্যারিয়েশন নিয়ে তবে না ফিউশন! একঢালা হলে কি হত ও রকম! রোজ যদি শুধু মিষ্টি খাস তবে জিব অসাড় হয়ে যাবে। একটু টক ঝাল তেতোও তো লাগে। নাকি ভুল বললুম! আমাকে আর মানছে কে বল!”

“ও সব শক্ত কথা বুঝি না, এখন আমি কী করব বলে দিন তো!”

“কী করতে ইচ্ছে করে তোর?”

“ধরুন যদি বিয়ে করি?”

“তা করবি। সবাই করছে, তোকে আটকাচ্ছে কে?”

“কিন্তু কাকে?”

“খোঁজ না, খুঁজতে থাক। সময় হলে পেয়ে যাবি কাউকে।”

॥ তিন ॥
নহুষ ব্যানার্জির ডায়েরি থেকে

ভূলুণ্ঠিত! আপাতত এই শব্দটা নিয়েই আমার সমস্যা। আমার জনা দশেক কর্মচারীর মধ্যে দু’জন গোলমেলে। এক জন মদ্যপ, অন্য জন ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। মানকুমার আর লঙ্কেশ কাহার। আর তাদের তাড়াতে আমার সমস্যা হল ওই ভূলুণ্ঠিত শব্দটা।

এখন দুপুর দুটো বেজে ছত্রিশ মিনিট। আমার ছোট্ট কারখানাটা এখন ব্যস্ত। রাবার শিট কেটে নানা ডিজ়াইনের এবং নানা মাপের হাওয়াই চটি তৈরি হচ্ছে। খুবই ব্যস্ততার মধ্যে এখন আমি। কিন্তু মানকুমার এখন ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় আমার চেয়ারের সামনে। সুমুখে বাড়ানো হাতদু’টিকে এখন বলা যায় করজোড়। সে কাঁদছে এবং বলছে, “আর কক্ষনো এ রকম হবে না স্যর, এ বারটা মাপ করে দিন। মা কালীর দিব্যি বলছি...”

যা সে হামেশাই বলে বা চাকরি রাখতে বলতে হয়। এ পর্যন্ত তাকে বার তিনেক তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও কেন যে তাড়াতে পারিনি, তার মধ্যেই আমার দুর্বল চরিত্রের পরিচয় নিহিত আছে। লঙ্কেশকে দু’বার তাড়াতে চেষ্টা করেছি। সেই ভূলুণ্ঠিত এবং করজোড়। সেই একই শপথবাক্য, “আর হবে না স্যর, মায়ের দিব্যি, আমার মেয়ের দিব্যি।” তাদের ভোকাবুলারি পুয়োর, বেশি শব্দ তাদের স্টকে নেই, তাই একই কথা যত বার ধরা পড়ে তত বার বলে যায়। ভারী বিরক্তিকর।

বাবা বলেন, দিদি বলে, মা বলে, জামাইবাবু বলে, নীতা বলে, “তুমি আরও একটু শক্ত হও। কঠিন সিদ্ধান্ত নাও।”

নেওয়াই উচিত, আমি জানি। এক দিন হয়তো নিতেই হবে। কিন্তু এক দুর্মর মায়া, এক যুক্তিহীন সমবেদনা, একটা ‘আহা রে, ওর বৌ-বাচ্চা কী খাবে’ এই ধরনের পাতি সেন্টিমেন্ট আমাকে প্রতি বার পেড়ে ফেলে। কিছুতেই এই দু’টি দুষ্টব্রণকে সরাতে পারছি না, আর মনে মনে নিজেকে বকাঝকা করে যাচ্ছি, ‘তোমার মতো অপদার্থকে দিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য হওয়ার নয়! তুমি কি নপুংসক যে, দু’জন বেয়াদব কর্মচারীকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারছ না! মগনলাল আগরওয়ালা হলে এত ক্ষণে লাথ মেরে বের করে দিত। মানকুমার বিনা নোটিশে সাত দিন কামাই করেছে, আর পাতাখোর লঙ্কেশ ভুল দোকানে ডেলিভারি দিয়েছে অন্তত তিন বার। অ্যাডভান্স বেতন নিয়ে শোধ করেনি, হাতে-পায়ে ধরে মকুব করিয়েছে। তোমার ব্যবসা তো লাটে উঠবে দেখতে পাচ্ছি।’

ব্যাপারটা তাই। কর্মচারীরা মালিকের দোষদুর্বলতা চট করে টের পেয়ে যায়, আর তার ফায়দা লুটতে থাকে, তার পর সেটা হক হয়ে যায়। মালিককে একটু শক্ত হতেই হয়, নইলে ব্যবসা গজব হওয়াই ভবিতব্য।

তবে কথা হল, আমার ব্যবসাটা খারাপ চলছে না। আর কর্মচারীরা খুব একটা খারাপও নয়। এমনকি ওই দু’টি দুষ্টব্রণ যতই ইরেগুলার হোক, আমাকে বোধহয় একটু হলেও মায়া করে। কেন বলছি, লঙ্কেশের চার বছরের ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছিল। প্রথমে ধরা পড়েনি, জ্বর কিছুতেই নামছে না বলে এক দিন আমাকে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “স্যর, আমার ছেলেটা বোধহয় বাঁচবে না।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “কেন রে, বাঁচবে না কেন?”

“মনে হয় খারাপ বাতাস লেগেছে, জ্বর নামছে না। মরে গেলে কী হবে স্যর? আমার তো একটাই ছেলে!”

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, “কী যা তা বলছিস? এখন কত ভাল চিকিৎসা বেরিয়েছে! মরলেই হল? চল তো দেখে আসি!”

ওর ঝুপড়ির ঘরে গিয়ে দেখি, হাইজিনের চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঘরেই শোওয়া বসা রান্নাবান্না সব কিছু। আগাপাশতলা নোংরা, চামসে গন্ধ, ড্যাম্প। তার মধ্যেই বিছানায় মিশে শুয়ে আছে রোগা একটা ছেলে, জ্বরে ঘোর হয়ে। প্রায় বেহুঁশ। গায়ে তখনও একশো চারের ওপর জ্বর। চেনা এক জন ডাক্তারকে আনালাম। তিনি দেখেটেখে বললেন, “মনে হচ্ছে টাইফয়েড। এখানে তো চিকিৎসা হবে না, হাসপাতালে রিমুভ করুন।”

তাই করতে বলতেই লঙ্কেশ আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলল, “আমার অনেক পাপ স্যর, আমি আপনার টাকা খেয়ে ফেলেছি, আমার তো ছেলেটা যাবেই। আপনি ওকে একটু আশীর্বাদ করুন স্যর, আপনার আশীর্বাদেই ও ভাল হয়ে যাবে।”

অতি কষ্টে ওর হাত থেকে পা ছাড়িয়ে বুঝিয়েসুজিয়ে ওর ছেলেকে হাসপাতালে পাঠাই। ছেলেটা ভালও হয়ে যায়। লঙ্কেশ মাঝেমাঝে বলে, “স্যর, আমাকে তাড়াবেন না। আমি দরকার হলে বিনা পয়সায় কাজ করে দেব।”

যাই হোক, আপাতত আমার সমস্যা মানকুমারকে নিয়ে। গত পাঁচ দিন সে হোলির আনন্দে এতই ভেসে গেছে যে, বস্তুজগতের কোনও চেতনা ছিল না। তাতে অন্য সব কর্মচারীর ওপর প্রেশার বেড়েছে। অর্ডারের মাল সাপ্লাই দিতে না পারলে গুডউইল যাবে।

আমি যথেষ্ট কঠোর গলায় বললাম, “আর হয় না রে! তোকে যথেষ্ট লাই দিয়েছি। আর তোকে রাখলে আমার ব্যবসার বদনামও হবে। এ বার বিদেয় হ।”

“আর একটা চান্স দিয়ে দেখুন স্যর, আমি না হয় সাত হাত নাকে খত দিচ্ছি।”

আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। এই চাপানউতোরের পরিণাম আমার জানা। মানকুমার এ বার তার বাড়ি গিয়ে বৌকে নিয়ে এসে হাজির করবে, এবং সেও একচোট পায়ে ধরাধরি করে কান্নাকাটি জুড়বে। সে আর এক অশান্তি। তার চেয়ে বখেরা মিটিয়ে ফেলা ভাল। কিছু ক্ষণ বাদে দুর্বলচিত্ত এই আমাকে বলতেই হল, “যা গিয়ে মেশিনে বোস।”

মানকুমার তাড়াতাড়ি উঠে আমাকে একটা প্রণাম করে ড্রিলিং মেশিনে গিয়ে হাত লাগাল।

পাঁচ বছর আগে আমি প্রথম একটা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলাম। হঠাৎ এক দিন সভয়ে মনে হল, বিএ পাশ করে আমি দেশের অনেক ভ্যাগাবন্ডের মধ্যে আরও এক জন ভ্যাগাবন্ড হতে চলেছি! সামনে সাহারা মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু উট চলেছে মুখটি তুলে। আর সামনে ‘উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা’। আমি বেজায় ভয় পেলাম। এক মনখারাপের মেঘলা দিন ছিল, নতমুখে কী যেন ভাবতে ভাবতে বাজার থেকে ফিরছিলাম। তখনই কানে আসছিল

একটা অদ্ভুত শব্দ। ফ্লিপ ফ্লপ ফ্লিপ ফ্লপ। চোখ পড়ল মানুষের পায়ের দিকে। হাওয়াই চটি! এ তো সমবেত হাওয়াই চটির শব্দ! এ তো আমজনতার জাতীয় পাদুকা! কিন্তু কী আশ্চর্য! হাওয়াই চটির ওই ফ্লিপ ফ্লপ শব্দ আমাকে কী যেন একটা বলতেও চাইছে! তখন আমি হঠাৎ যেন দিব্যকর্ণে শুনতে পেলাম, 'মার ঝাঁপ, মার ঝাঁপ!'

তাই আমি আর দেরি করিনি। লোনের জন্য উঠে-পড়ে লাগা শুরু হল, জায়গা খোঁজা হতে লাগল, মা বাবা এবং আরও অনেকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, ওজর-আপত্তি সামাল দেওয়ার চেষ্টা জারি রইল এবং বইপত্র জোগাড় করে হাওয়াই চটি সম্পর্কে পিএইচ ডি হওয়ার প্রয়াসও চলতে লাগল। সঙ্গে গুগল সার্চ তো আছেই। আর গুগলে কী নেই, হাতি থেকে ছুঁচ অবধি সব কিছুই লভ্য। এ হল সব পেয়েছির দেশ। আর হাওয়াই চপ্পল তো আর রকেট সায়েন্স নয়! তাই প্রায় এক বছর পরে আমার 'জনতা হাওয়াই' সৃষ্টিসুখের উল্লাসে জন্মদিনের মুখ দেখে ফেলল। প্রথম জোড়া বাবাকে আর দ্বিতীয় জোড়া মাকে দিয়ে তাদের ইমপ্রেস করার একটা চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের মুখ গোমড়া ছিল বটে, কিন্তু নিষ্কর্মার চেয়ে বৃথাকর্মা ভাল বলে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই চটি পায়েও দিলেন।

প্রথম প্রথম কিছু দিন বিস্তর ঝামেলা ছিল। বিক্রি ছিল না, লোকে হাসত, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। কিছু কমপ্লেনও আসতে লাগল। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। সব বাধাবিঘ্নেরই মুখোমুখি হয়েছি। বছরখানেকের মধ্যেই কিন্তু আমার জনতা হাওয়াই সুখের মুখ দেখে ফেলেছিল। এখন আমাকে হাওয়াই চটির এক জন সমঝদার বলা যায়। এক জন ডক্টরেটও। আমার ক্রেতাবলয় হল গরিব মানুষেরা, তাই আমার জনতা হাওয়াইয়ের দাম কম, টেঁকসই এবং বাহারি। এই জনতা হাওয়াই নিয়ে আমি এখন নানা স্বপ্নও দেখি। লোকে লাইন দিয়ে কিনছে, বিদেশে চালান যাচ্ছে, জনতা হাওয়াই ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আমাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি।

নীতা একদিন প্রেস্টিজের কথা তুলেছিল। খুব পেলব, মধুঝরা কণ্ঠেই বলেছিল, "কিন্তু আফটার অল, জিনিসটা তো হাওয়াই চটি, তাই না!"

আমিও অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, এ তো হাওয়াই চটিই!"

একটু বাধো বাধো গলায় বলল, "হ্যাঁ, তাই বলছিলাম আর কী, ইজ় ইট প্রেস্টিজিয়াস? কেমন যেন হালকা পলকা, কেমন যেন বিজ়ার, কেমন যেন আনঅ্যারিস্টোক্র্যাটিক, তাই না! আফটার অল, ইট ইজ় হাওয়াই চপ্পল ডিয়ার, ইট হ্যাজ় নো পেডিগ্রি।"

আমি একটু ভাবিত হয়ে বললাম, "ঠিক তাই। হাওয়াই চপ্পল এক গণতান্ত্রিক প্রোডাকশন, অফ দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল। মিনিমাল, ইজ়ি অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল।"

নীতা একটু শুকনো মুখে চুপ করে রইল। আমি ওর সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

একটু পরে নীতা নিজেই কুণ্ঠিত গলায় বলল, "বাবাও বলছিল।"

"কী বলছিলেন?"

"খুব শকড হয়ে বলছিল, 'হাওয়াই চটি! হোয়াই হাওয়াই চটি? আর কিছু ছিল না!'"

আমি উদাস হয়ে বললাম, "ছিল। বুলডোজার, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ি।"

"রাগ করলে?"

নীতা ইংরেজির প্রফেসর শাক্যসিংহ সেনের মেয়ে। একটু মোটাসোটা, ফর্সা, আহ্লাদি চেহারা, মুখশ্রী আহামরি নয়। খুব পড়াকু মেয়ে, দিনরাত বই নিয়ে থাকে, ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী। চোখে ভারী চশমা। যখন এক জন মেয়েকে পটানো লটারি লাগানোর মতো ব্যাপার ছিল তখনই এক দিন নীতা হারানিধির মতো এসে জুটে গিয়েছিল। বিস্ময়ের কথা হল, আমি তাকে লাইন দিইনি, সে নিজেই এসে এক দিন ভাব করেছিল, বলেছিল, "আপনার মুখটা এত করুণ কেন বলুন তো! খুব নেগেটিভ চিন্তা করেন বুঝি!"

এই সমবেদনায় আমি কাহিল হয়ে বলেছিলাম, "অবস্থার চাপে।"

ব্যস, ওই শুরু। একটা প্রেম যে কত ভাবে শুরু হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। তাকাতাকি থেকে হয়, ঝগড়া থেকে হয়, অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হয়, সমবেদনা থেকে হয়, দয়া থেকে হয়, ফেসবুক থেকে হয়, হয় হয় জা(Z)নতি পারো না থেকেও হয়। আমারও হল। তবে তাতে তেমন শিহরন বা বুক দুরুদুরু ছিল না বটে, কিন্তু একটা ট্রফি তো ছিল! নীতা হল আমার সেই ট্রফি।

বললাম, "আরে না, রাগ করব কেন? বাবারা তো সব সময়েই কাবাব মে হাড্ডি।"

"হ্যাঁ, সেটাই তো প্রবলেম!"

আমি নিপাট ভালমানুষের মতো বললাম, "তা হলে আমাদের মধ্যে কে প্রথম আত্মহত্যা করছে? আমি, না তুমি!"

"ভ্যাট! কী যে বলো না! এখন ঠাট্টা-ইয়ার্কি ভাল লাগছে না! আমার প্রবলেমটা তুমি বুঝতে পারছ না।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, আসলে তোমার প্রবলেমটা তুমিই বুঝতে পারছ না। তোমার আর আমার মধ্যে এখন হাওয়াই চপ্পলের ব্যারিকেড। কমরেড, ভাঙবে না ব্যারিকেড?"

নীতা নতমুখী, চিন্তাকুল এবং বিষাদগ্রস্ত। আর আমি, কী জানি কেন, একটা গোধূলি দেখতে পাচ্ছিলাম।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কয়েক জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে আমি দুঃসাহসের সঙ্গেই আমার জনতা হাওয়াই চপ্পল উপঢৌকন পাঠিয়েছিলাম, সঙ্গে এ রকম নোট ছিল, "এক জন সামান্য বেকার যুবক হাওয়াই চপ্পলের রূপকথা লিখতে চাইছে। আপনারা কি আশীর্বাদ করবেন না?"

জবাবের আশা করিইনি, কিন্তু তাঁদের দফতর থেকে প্রাপ্তিসংবাদ এবং ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি এসেছে। আমি সেগুলি বাঁধিয়ে আমার কারখানায় যত্ন করে টাঙিয়ে রেখেছি। শহরে একটা হতদরিদ্র দৈনিক পত্রিকা বেরোয় 'জনমত'। আমাকে ধরে পড়েছিল বলে আমি তাতে দু'-তিন বার বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হই। সেই বিজ্ঞাপনে ওই চিঠিগুলিও ছাপিয়ে দিই। তাতে অনেকের চোখ কপালে ওঠে। বাবার বন্ধু শিবকালীবাবু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এসে এক দিন কারখানায় হাজির। চার দিকে চেয়ে দেখে অতিশয় অবাক হয়ে বললেন, "তোকে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টারও চিঠি দেয়! তা হলে তো...!"

বাক্যটা তিনি শেষ করেননি। তবে সব বাক্যই শেষ করবার দরকার হয় না। অনেক অসমাপ্ত বাক্য পুরো বাক্যের চেয়েও বেশি অর্থবহ।

নীলু আর আমি বন্ধু ছিলাম। এক সঙ্গে টেনিস বলের ক্রিকেট আর ফুটবল খেলেছি। সেটাকে অবশ্য পুরাকাল হিসেবে ধরতে হবে। কারণ এখন নীলু আর সেই নীলু নেই। বিএ পাশ করার পর সেও নিশ্চয়ই আমার মতোই সামনে সাহারা মরুভূমি এবং উটের গ্রীবা দেখতে পেয়েছিল। সবাই দেখে। তবে আমি যেমন এক মেঘলা দিনে বাজার থেকে ফেরার পথে হাওয়াই চপ্পলের আহ্বান শুনেছিলাম, তেমনই অন্যতর কোনও আহ্বান নীলুও শুনে থাকবে নিশ্চয়ই। নইলে নিতান্ত সাদামাটা একটা ছেলে কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এক দিন দল পাকিয়ে তোলা তুলতে লাগবে কেন! ওর ভিতরে মস্তান হওয়ার কোনও এলিমেন্ট ছিল বলে আমার জানা নেই। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কে যে কী হয়ে দাঁড়াবে, আজকাল তার কিছু ঠিক নেই কি না।

সেই নীলু একদিন এসে চার দিক দেখেটেখে নাক সিঁটকে বলল, "এই তোর কারখানা! এ তো ভুখখা পার্টির ঠেক দেখছি! সামু বলছিল তুই নাকি মাল ভালই কামাচ্ছিস!"

আমি বললাম, “সতীনের ছেলেকে সব মেয়েই মোটাসোটা দেখে।”

সে ভূমিকা ছেড়ে বলল, “আমার দুটো ছেলেকে কাজে নিবি?”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “আমার আর জায়গা কোথায়! অলরেডি দশ জন কাজ করছে।”

নীলু হাত নেড়ে কথাটাকে মাছির মতো উড়িয়ে দিয়ে বলল, “আরে জায়গা হয়ে যাবে।”

“কী করে হবে?”

“শুনেছি মানকুমার আর লঙ্কেশের সঙ্গে তোর খিঁচ হচ্ছে! আমি সব খবর পাই, বুঝলি! আমার নেটওয়ার্ক খুব ভাল। ও দুটোকে রিট্রেঞ্চ করলেই তো হয়ে যায়।”

আমি মাথা নেড়ে বললাম, “সেটা অন্যায় হবে নীলু, ওরা গরিব মানুষ, তা ছাড়া পুরনো লোক।”

“ওদের আমি চিনি নহুষ। একটা মাল খেয়ে দিনরাত গড়াগড়ি যায়, অন্য জন পাতাখোর, দিনরাতের ঠিক নেই। তুই বল না, আমি ওদের ব্যবস্থা করছি।”

আমি সভয়ে বললাম, “কী করবি?”

“তা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমার ওপর ছেড়ে দে।”

“মারধর করবি নাকি?”

নীলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, “আরে দূর! ভড়কালেই কাজ হয়ে যাবে।”

এ কথা ঠিক যে, আমার ওই দু’টি কর্মচারী আমার যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ, তবু ওদের প্রতি আমার এক ধরনের মায়াও তো আছে! ওদের ওপর কোনও অত্যাচার হোক, এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তাই বললাম, “কেন এ সব করছিস নীলু? ওদের ছেড়ে দে না!”

নীলু খুব অভিমান মেশানো গলায় বলে, “আমি কখনও তোর কাছে কিছু চেয়েছি, বল! আমার ছেলেরা তোর কাছ থেকেও মাল তুলতে চেয়েছিল, আমি অ্যালাও করিনি। বলেছি নহুষ আমার জিগরি দোস্ত, ওর কাছে গেলে কেটে ফেলব। এটা একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, রাখবি না?”

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। নীলু না হয় আমার কাছে তোলা তোলে না, কিন্তু আমায় দুটো ক্লাবকে বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে হয়, এবং আরও কিছু দেবতাকে নিয়মিত সন্তুষ্ট রাখতে এই ছোট্ট ভুখখা কারখানার মালিককেও বেশ গুনাগার দিতে হয়। বললাম, “তুই ছাড়াও তোলাবাজ আছে, ভুলে যাস না। জায়গামতো তেল না দিলে এই কারখানা কি চালানো যেত?”

“মাল কামাতে হলে মাল ছাড়তেও হয়, এটাই এখন দস্তুর। প্লিজ় দোস্ত, দুটো বেকার ছেলেকে নিয়ে নে। ওদের এক জনের মায়ের ক্যান্সার।”

আমি “ভেবে দেখব,” বলে তখনকার মতো ওকে বিদায় করলাম। তার পর পড়লাম দুশ্চিন্তায়। নীলু যে দু’জনকে আমার কারখানায় ঢোকাতে চাইছে তাদেরও ভাল লোক হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদি ষণ্ডাগুন্ডা হয় তা হলে তো হয়েই গেল।

নীলুর এই আগমনটা হয়তো আমার কর্মচারীরা ভাল ভাবে নেয়নি। নীলুকে তারা চেনে। কথাবার্তা শুনতে না পেলেও তারা যে খুশি হয়নি সেটা বোঝা গেল, যখন নীলু চলে যাওয়ার পর শহীদ দাস এসে বলল, “ওই হারামিটা কেন এসেছিল, স্যর?”

আমি মোলায়েম গলায় বললাম, “ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু।”

“মহা হারামি কিন্তু স্যর। টাকা আর মেয়েছেলে ছাড়া কিছু বোঝে না। সাবধানে থাকবেন। দরকার হলে আমাকে বলবেন।”

“আরে না, ও সব কিছু নয়। বন্ধু হিসেবে দেখা করতে এসেছিল।”

“ওই হারামি কারও বন্ধু নয় স্যর, ও শুধু ওর নিজের বন্ধু।”

দিন দুই পরে খবর পেলাম, মানকুমার আর লঙ্কেশ বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। এ সব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? আমার কি আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল না! নীলুকে ঠেকানো কি এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল?

টেনশন থেকে আমার ডিপ্রেশন শুরু হয়ে গেল। হাসপাতালে গিয়ে দু'জনের মুখোমুখি হতেই তারা প্রায় এক বাক্যে বলল, তাদের মেরেছে নীলুর দলবল। বলেছে, আর যেন তারা কারখানামুখো না হয়, তা হলে জানে মেরে দেবে। আমার কান্না পাচ্ছিল। এরা প্রায় চার বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে, অনেক ঝড়জল পার করেছে, অনেক সঙ্কটে সঙ্গ দিয়েছে, কখনও এমনও হয়েছে যে, দু'মাসের বেতন দিতে পারিনি, তবু দাঁতে দাঁত চেপে কাজ তো তুলে দিয়েছে! এরা খানিকটা কর্মচারী, আর খানিকটা বন্ধুও।

লঙ্কেশ বলল, "স্যর, পুলিশকে আমরা নামধাম সব বলেছি, কিন্তু পুলিশ অ্যাকশন নেবে না স্যর, আমরা জানি। আপনি যদি হায়ার অথরিটি বা পলিটিক্যাল লিডারদের কাছে যান তা হলে কিছু হতে পারে।"

তা তো বুঝলাম। কিন্তু শত হলেও তো নীলু আমার অতীতের বন্ধু। ওকে ফাঁসাতেও বাধো-বাধো লাগছে, বিবেক মানতে চাইছে না। এক ধর্মসঙ্কটে পড়ে আমি আবার বুঝতে পারলাম, আমার দ্বারা কিচ্ছু হওয়ার নয়।

দিন সাতেকের মাথায় এক দিন দু'টি ছেলে নীলুর চিরকুট নিয়ে দেখা করতে এল। না, মস্তানের মতো চেহারা নয়, নিরীহদর্শনই বলা যায়।

আমি তাদের বললাম, "ভাই, আমার দু'জন কর্মচারী এখন হাসপাতালে। তারা ভাল হলে আবার কাজ করতে আসবে। তোমরা কি তাদের কাজ কেড়ে নিতে চাও?"

তারা একটু অবাক হয়ে বলে, "আমরা তো তা জানতাম না! আমরা তো জানি আপনার এখানে ভেকেন্সি আছে।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "ভেকেন্সি নেই, তবে ভেকেন্সি ক্রিয়েট করার চেষ্টা হয়েছে। নীলুকে বোলো কাজটা ভাল হয়নি। আই অ্যাম সরি, তোমাদের আমি কোনও কাজ দিতে পারছি না।"

আমি এই প্রথম একটু কঠিন হতে পেরেছিলাম।

নীলু ফোন করে রীতিমতো চড়া গলায় বলল, "কী হল দোস্ত, তুই ওদের নিলি না কেন? ওদের কাছে আমার কমিটমেন্ট ছিল!"

আমি বললাম, "তুই ওদের মারধর করলি কেন? তোকে বারণ করেছিলাম!"

"দুশশালা! দুটো পচা আলুর জন্য এত প্যাথোস কেন তোর!"

শহীদ দাস নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ফোন রাখতেই কঠিন গলায় বলল, "ওই হারামির বাচ্চাটা না?"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "ও আমার বন্ধু ছিল শহীদ।"

"এখন তো আর নেই! যে দুটো ছেলে চাকরি চাইতে এসেছিল স্যর, ওদের মধ্যে লম্বা জন হল বিষ্ণু, ওর বোনের সঙ্গেই এখন নীলুর লাইন চলছে।"

রোজই একটু বেশি রাত হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। একা হাতে ল্যাপটপে হিসেবনিকেশ সারতে অনেকটা সময় লাগে। তবে এই যে একটা নিজস্ব, নিজের হাতে গড়ে তোলা একটা কিছু, যত সামান্যই হোক, যত তুচ্ছই হোক, মাঝে মাঝে যেন একটা পতাকা তুলে দিয়ে বলতে চায়, 'দেখ, একটু কিছু তো করেছি। নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।'

অন্যমনস্কতা আমার চিরকালের সঙ্গী। সেই অন্যমনস্কতাকেই পিলিয়নে বসিয়ে আমি স্কুটার চালিয়ে রোজ বাড়ি ফিরি। সে দিনও ফিরছিলাম। পালপাড়ার রাস্তাটা একটু অন্ধকার মতো ছিল। কী একটা স্কুটারের চাকায় বাধক হল বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে স্কুটার নিয়ে বাঁ কাত হয়ে পড়ে গেলাম। হকচকিয়ে গেছি, এমন তো বড় একটা হয় না! অবস্থাটা বুঝে উঠবার আগেই হঠাৎ গোটা চারেক ছেলে উদয় হয়ে কাঁচা খিস্তি দিতে দিতে কী দিয়ে যেন আমাকে বেজায় পেটাতে লাগল। বোধহয় রড আর লাঠি। হেলমেট ছিল বলে মাথাটা বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু শরীরটা বাঁচল না। আমি "কী হচ্ছে, কী হচ্ছে" বলে চেঁচাচ্ছিলাম। একটা ছেলে বলল, "তোকে কাচাকুচি করা হচ্ছে। ভাল চাস তো শুধরে যা।"

আমি চেতনা হারাচ্ছিলাম, এত মার তো কখনও কেউ আমাকে মারেনি। আর কেন মারছে সেটাও বোঁদা মাথায় ঢুকছিল না।

না, একেবারে অজ্ঞান হইনি, খুব ক্ষীণ চেতনা ছিল। আবছা আবছা বুঝতে পারছিলাম, আমাকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল। কেউ এক জন আর কাউকে বলছিল, "আরে, এ তো জনতা হাওয়াই চপ্পলের মালিক!"

সেই বীভৎস অবস্থার মধ্যেও কথাটা শুনে আমার ভারী ভাল লাগল। যত যাই হোক, আমি তো এই দুনিয়ায় কিছু একটার মালিক হতে পেরেছি! সেটা কম কথা নাকি! পৃথিবীর সব লোকের পায়ে পায়ে আমার জনতা চপ্পল ঘুরছে, এটাই তো আমার স্বপ্ন!

আরও গৌরবের কথা হল, সরকারি হাসপাতালের তুমুল অব্যবস্থার মধ্যেও, আমি জনতা হাওয়াই চপ্পলের মালিক বলে, মেঝের বদলে একটা বেডের ব্যবস্থা হয়েছিল, তা সে যত নোংরাই হোক। আর ডাক্তারবাবুরাও তেমন দুচ্ছাই করেননি, যত্ন করেই সেলাই এবং ব্যান্ডেজ করেছিলেন। নীতা অবশ্য নার্সিংহোমে শিফট করার জন্য জোরাজুরি করছিল। আমি তাকে বললাম, "জনতা চপ্পলের মালিককে জনতার হাসপাতালেই মানায় ভাল।"

খুব রেগে গেল নীতা, তবে রোজই নিয়মিত আমার পরিবারের সঙ্গেই আমাকে দেখতে এসেছে। পুলিশ জানতে চেয়েছে, আক্রমণকারীদের আমি চিনতে পেরেছি কি না।

আমি বললাম, "না স্যর, তাদের আমি চিনি না।"

"কেন অ্যাটাক করল তার কোনও কারণ অনুমান করতে পারেন?"

"না স্যর।"

"ক্যান ইট বি আ প্রফেশনাল রাইভ্যালরি?"

"না স্যর, এই শহরে যারা হাওয়াই চটি তৈরি করে তারা সব আমার মতোই গরিব লোক। কেউ কারও শত্রু নয়।"

"তা হলে আপনার ওপর অ্যাটাকটা হল কেন? কিছু তো একটা কারণ থাকবে!"

"নো আইডিয়া স্যার।"

"কারও সঙ্গে রিসেন্টলি কি কোনও ঝামেলা হয়েছে?"

"না স্যর।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনার এমপ্লয়িদের মধ্যে কারও আপনার ওপর খার থাকতে পারে কি না!"

"না স্যার, ওরা এ রকম করবে না।"

দিন তিনেক পরে ডাক্তার জয়ন্ত বোস রাউন্ডে এসে আমাকে বললেন, "হাসপাতালের এনভায়রনমেন্ট কি আপনার ভাল লাগছে? ভাল লাগার তো কথা নয়!"

"লাগছে না ডাক্তারবাবু।"

"তা হলে আপনি বাড়ি চলে যান। এখানে থাকলে আপনার ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। আপনার হাড়টাড় ভাঙেনি। ইনজুরি অবশ্য সিরিয়াস। তবে তার ট্রিটমেন্ট বাড়িতেও হতে পারে। ড্রেসিং চেঞ্জ করার জন্য এক জন নার্স রেখে নেবেন। ওষুধপত্র ঠিকমতো খাবেন। যান আপনার ছুটি, আমি রিলিজ় অর্ডার লিখে দিচ্ছি।"

"হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।"

আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে যে অ্যাম্বুলেন্স এল, তার ড্রাইভারের নাম শ্যামল রায়। একটু বকাবাজ। প্রথমেই বলল, "আরে আপনাকে তো আমিই পালপাড়ার রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলাম! প্রথমে ভেবেছিলাম মাতালের কেস, তার পর দেখলাম তা নয়। আপনি যে জনতা হাওয়াই চটির মালিক তা আমি জানি স্যর, আমরা তো বাড়িতে আপনার হাওয়াই চটিই পরি।"

কথাটা আমাকে খুশি করার জন্যেও বলে থাকতে পারে। তবে আমি তাতে খুশিই হলাম।

"কপালের ফেরে ড্রাইভারি করতে হচ্ছে স্যর, নইলে আমি ভদ্রঘরের ছেলে। আমার বাবা হিস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন, আর আমার দাদা গেজেটেড অফিসার।"

আমি যথেষ্ট ইমপ্রেসড হওয়ার ভাব করে বলি, "তাই নাকি!"

"হ্যাঁ স্যর, আমরা কাঞ্জি ব্রাহ্মণ, এখন রায় লিখি বটে, তবে আসলে আমরা কাঞ্জিলাল।"

"তাই নাকি!" যেন বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

লোকটা উৎসাহ পেয়ে বলল, "আপনার কারখানায় হিসেবনিকেশ বা লেখালেখি করতে লোক লাগে না স্যর?"

"কেন বলুন তো!"

"আমার একটা মেয়ে আছে স্যর, বিএ পড়ছে, ভাল ছাত্রী। তাকে চাকরিতে নেবেন স্যর! খুব ভাল মেয়ে, নিজের মেয়ে বলে বলছি না স্যর, সত্যিই ভাল মেয়ে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে একটু ভাবলাম। আমার দুটো হাতই আপাতত অকেজো। ল্যাপটপে কাজ করার মতো অবস্থা নয়। আমার সত্যিই এক জন লোক দরকার। বললাম, "ল্যাপটপে কাজ করতে পারবে?"

"কেন করতে পারবে না স্যর, পয়সা খরচ করে কম্পিউটার শিখিয়েছি, সব পারে।"

"আমি কিন্তু স্যালারি বেশি দিতে পারব না।"

"ও নিয়ে ভাববেন না, হাতখরচটুকু হয়ে গেলেই যথেষ্ট।"

"ঠিক আছে, যদি ছ'হাজার টাকায় আপত্তি না থাকে, তা হলে আসতে বলবেন। সন্ধেবেলা দু'-আড়াই ঘণ্টা কাজ করলেই চলবে।"

"আজকেই পাঠাব স্যর?"

"আরে না, আজ শনিবার, দু'দিন পরে পাঠালেই হবে।"

নীতা আজকাল ভাল মুডে নেই। যখনই দেখা হয় মুখ ভার। তবে রোজই সন্ধেবেলায় আসে। কিছু ক্ষণ এলোমেলো কথা হয়। তবে লক্ষ করছি ওর কথাবার্তাও ইদানীং কমে গেছে। প্রগল্‌ভতা একেবারে নেই। অনেক সিরিয়াস। এক দিন বলল, "ইজ় ইট নট ডেঞ্জারাস অলসো?"

"কিসের কথা বলছ?"

"ইয়োর জব, মাই ডিয়ার। তোমার ওই ডিলাপিডেটেড হাওয়াই চপ্পলের বিজ়নেস!"

"এটা তো পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবসাগুলোর একটা।"

"তা হলে তোমার ওপর অ্যাটাক হল কেন?"

"সেটা পুলিশ দেখছে।"

"পুলিশ কী বলেছে জানো! বলেছে ইট হ্যাজ় সামথিং টু ডু উইথ ইয়োর বিজ়নেস। দেয়ার ইজ় সাম বিজ়ার কানেকশন।"

"পুলিশ এখনও কিছুই খুঁজে পায়নি নীতা। বোধহয় পেটি কেস বলে ক্লোজ় করে দেবে।"

"এটা কি পেটি কেস? তুমি তো মার্ডারও হয়ে যেতে পারতে!"

"আমার যতদূর মনে হয়, ওরা আমাকে খুন করতে চায়নি, সবক শেখাতে চেয়েছিল।"

নীতা মাথা নেড়ে বলে, "আমার তা মোটেই মনে হয় না। দে ওয়্যার আপটু মার্ডার, লোকজন এসে গিয়েছিল বলে পালিয়ে যায়।"

"মার্ডার করতে চাইলে বোমা চার্জ করতে পারত, গুলি করতে পারত বা ছুরি চালিয়ে দিত। লাঠি বা রড ঠিক মার্ডার ওয়েপন নয় নীতা।"

"বোকার মতো কথা বোলো না, আমি হাতুড়ি দিয়েও মানুষ খুন করার কথা শুনেছি।"

আমি ফের গোধূলি দেখতে পাচ্ছি কেন কে জানে! তবে নীতা কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে সৌজন্যে বাঁধছে, আমার এমনতরোই মনে হচ্ছে।

আজকাল মা আমাকে খাইয়ে দেয়, কাজের লোক হরুয়া জামাকাপড় বদলে দেয়। পটি করার পর কমোড শাওয়ারে শুদ্ধ হতে হয়, হাত ব্যবহার করতে পারি না। এক জন নার্সের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, মাঝে মাঝে এসে ড্রেসিং পাল্টে দিয়ে যায়।

এক রোববার সকালে মেয়েটি এল। বলল, "আমি শ্যামল রায়ের মেয়ে।"

কে শ্যামল রায় তা মনে পড়ছিল না। বললাম, "কে শ্যামল রায় বলুন তো!"

"আমার বাবা অ্যাম্বুলেন্স চালান।"

মনে পড়ে গেল। এ বার আমি মেয়েটিকে ভাল করে দেখলাম। ছিপছিপে শ্যামলা এক নাতিদীর্ঘ সদ্য যুবতী। মুখখানা করুণ এবং মায়ামমতায় ভরা। ব্যাপক সুন্দরী যদি নাও বলতে চাই, মুখশ্রী যে চমৎকার সেটা বলতেই হবে। আর বিপুল তার চুলের রাশি, যেন এক কালো ঝরনা মাথা থেকে কোমর ছাড়িয়ে নেমে আসছে। শুধু একটা সাদা রিবন দিয়ে চুলগুলো হর্সটেলে বাঁধা। চুল যত বেশি, সিঁথি তত সরু। এ মেয়েটার সিঁথি প্রায় দেখাই যায় না এত সরু। মেয়েরা কপালে টিপ পরলে আমি ভাল দেখি। এই মেয়েটা মেজেন্টা রঙের ওপর নানাবিধ জ্যামিতিক নকশাওয়ালা একটা কামিজ পরেছে, কপালে ওই মেজেন্টা রঙেরই টিপ, নীচে সাদা সালোয়ার। রাস্তায় বেরোলে মেয়েটাকে হঠাৎ নজরে পড়বে না, কিন্তু এক বার পড়লে আরও এক বার তাকাতে ইচ্ছে হবে।

"কম্পিউটার?"

"জানি স্যর।"

"ইংরেজি?"

"মোটামুটি।"

"ডেবিট ক্রেডিট?"

"না স্যর।"

"কয়েক দিন একটু শিখে নিতে হবে কিন্তু।"

ঘাড় কাত করে বলল, "ঠিক আছে স্যর।"

তার পর হঠাৎ একটু করুণ গলায় বলে উঠল, "গুন্ডারা আপনাকে খুব মেরেছে স্যর?"

একটু হেসে বললাম, "হ্যাঁ, খুব মেরেছে।"

॥ ৪ ॥

নহুষ ব্যানার্জির ডায়েরি থেকে নয়

সকালে ডোরবেল শুনে দরজা খুলে ভারী অবাক হয়ে গেল ময়না, এক জন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাড়া মাথা এবং মুখে বোকা হাসি। লোকটা অচেনা বটে, আবার তেমন অচেনাও মনে হচ্ছে না। বেশ কয়েক সেকেন্ড লাগল দৃশ্যটা হজম করতে।

"কী হয়েছে বলো তো! তুমি ন্যাড়া হয়েছ কেন?"

খুব যেন মজার ব্যাপার, এমন ভাবে হেসে-টেসে জয়দীপ বলল, "ঠাকুরমশাই বললেন মুণ্ডন ইজ় আ মাস্ট, তাই আর কী!"

"হঠাৎ মুণ্ডনই বা কেন?"

"আরে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি না!"

মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে ময়না ভ্রু কুঁচকে বলে, "প্রায়শ্চিত্ত! কিসের প্রায়শ্চিত্ত?"

"আমি যে ব্রাহ্মণে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছি!"

ময়নার হঠাৎ ভীষণ রাগ হল, বলল, "তুমি কি বুদ্ধু? এভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় নাকি? আর তোমার ব্রাহ্মণ হওয়ার দরকারটাই বা কী?"

"বাঃ, তুমিই তো বললে!"

"আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ হতে বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম, আমরা ব্রাহ্মণ। তুমি যা করছ এ তো পাগলামি!"

জয়দীপ বিপন্ন মুখে বলে, "তা হলে এখন কী করব?"

"এখন তুমি যাও জয়দীপ, এ সব আমার ভাল লাগছে না।"

জয়দীপ ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "ইজ় ইট ব্রেকআপ?"

ময়না অবাক হয়ে বলে, "ব্রেকআপ! ব্রেকআপ তো হয় রিলেশনের পরে! তোমার সঙ্গে আমার তো কোনও রিলেশনই হয়নি! ব্রেকআপ কিসের?"

আসলে জয়দীপকে এত খারাপ দেখাচ্ছে যে, একটা দৃশ্যদূষণ বলে মনে হচ্ছে ময়নার। যাদের মাথার শেপ ভাল বা মুখশ্রী সুন্দর, তারা ন্যাড়া হলে ভারী ভাল দেখায়, যেমন ইউল ব্রাইনার। কিন্তু জয়দীপ ন্যাড়া হওয়ায় ওর ঘামে ভেজা মাংসল মুখটা যেন আরও প্রকট হয়েছে। আততায়ী বলে মনে হচ্ছে ওকে। কোথায় যেন সুপর্ণ ঘোষের একটা ছায়া পড়েছে ওর চেহারায়। ময়না বিবমিষায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি এখন যাও জয়দীপ। আমার কাজ আছে।"

ভারী ম্লান মুখে জয়দীপ বলল, "বিকেলে আসব? কোথাও একটু আউটিংয়ে যাওয়া যাবে!"

"না। বিকেলে আমার কাজ আছে।"

"তুমি এত রেগে যাবে জানলে আমি মুণ্ডন করাতাম না। আই অ্যাম স্যরি।"

ময়না ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "একটা মেয়েকে ইমপ্রেস করার জন্য যখন কোনও ছেলে উঠেপড়ে লাগে, তখন আমার ভীষণ রাগ হয়। ছেলেরা এত নালঝোল ফেলবে কেন? কোনও পার্সোনালিটি থাকবে না! এই জন্যই আমি পুরুষদের পছন্দ করি না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি বাবা, ডোন্ট বি ক্রস উইথ মি।"

প্রায় ওর মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ময়না। রাগে ফুঁসছে সে। ধরেই নিয়েছে যে, ময়না ওকে ভালবেসে গলে গেছে। এত বোকা আর হ্যাংলা পুরুষ তার সহ্য হয় না। শুধু টাকা থাকলেই কি হয়!

ময়নার মাথাটা হঠাৎ এত গরম হয়ে গেল কেন, সেটা সে নিজেই বুঝতে পারছিল না। জয়দীপকে তার পছন্দ নয় ঠিকই, তবু সে তো ওর সঙ্গে সিনেমায় বা আউটিংয়ে গেছে, একটু হলেও প্রশ্রয় দিয়েছে। তা হলে ও ন্যাড়া হয়েছে বলেই এত রেগে যাওয়ার কোনও মানে হয়! এতটা দূরছাই না করলেও হত। একটু মায়া হচ্ছিল। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে যেটা তার হয়।

একটু বাদেই অবশ্য জয়দীপের ফোন এল, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি। মাপ করে দাও ময়না।"

"মাথায় আবার চুল গজালে যোগাযোগ কোরো, তার আগে নয়। আমি ন্যাড়ামাথা সহ্য করতে পারি না।"

"তাতে তো অনেক দিন লেগে যাবে!"

"তো! যত দিন লাগবে লাগুক, তাড়া কিসের?"

"তিন-চার মাস আমি তোমাকে না দেখে থাকব কী করে?"

"সেটা তোমার প্রবলেম, আমার নয়।"

বলেই ফোন কেটে দিল সে। আবার তার রাগ হচ্ছে, অস্থির লাগছে। জয়দীপের গলার স্বরও এখন তার ভাল লাগছে না। এই এক অদ্ভুত মুশকিল! ছেলেটাকে তার খারাপ লাগে না, আবার বয়ফ্রেন্ড বা হবু বর হিসেবেও ভাবা যাচ্ছে না। তার পর তাকে খুশি করার জন্য এই ন্যাড়া হওয়াটা আরও অসহ্য। এত বোকা কেন ছেলেটা?

থার্ড পিরিয়ড অফ ছিল বলে সে আর অপরাজিতা জামতলার ছায়ায় বসে গল্প করছিল। তার চাকরির খবর শুনে অপা বলল, "নীতা সেনের বয়ফ্রেন্ড?"

"হ্যাঁ রে!"

"কী জানি বাবা, কোন কেমিস্ট্রিতে হাওয়াই চটির সঙ্গে ইংরেজি অনার্স মিলে গেল কে জানে! মানছি নীতা একটু গাবলুগুবলু, একটু দেমাকি, বেশ নেকু, তবু তো লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট! হাওয়াই নহুষের সঙ্গে কী করে পট খেল বল তো!"

"খেয়ে যায়। দুনিয়ায় কত রকমের কম্বিনেশন হচ্ছে!"

"যা বলেছিস। শাক্যস্যর নাকি মেয়ের রিলেশনশিপে খুব আপসেট! ওদের তো আবার জমিদার ফ্যামিলির লিনিয়েজ আছে।"

"তাই বুঝি!"

"নহুষকে মারল কে বল তো! শাক্যস্যর লোক লাগিয়ে প্যাঁদায়নি তো!"

ময়না ঠোঁট উল্টে বলে, "কে জানে! তবে খুব মেরেছে, সারা গায়ে কালশিটে আর কাটাছেঁড়া। দেখলে কষ্ট হয়।"

"তোর ইন্টারভিউ নিল বুঝি?"

"সে রকম কিছু নয়, কম্পিউটার জানি কি না জিজ্ঞেস করল, আর সামান্য দু'-একটা প্রশ্ন।"

"তোর গরিলাটা ন্যাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন রে? একটা লম্বা টিকিও রেখেছে দেখলাম! মা গো!"

"আর বলিস না, আমার এমন রাগ হচ্ছে!"

"দেখাচ্ছেও তো আনকুথ। তুই তো বলছিলি কাটিয়ে দিবি!"

"দেবই তো! কিন্তু এমন জোঁকের মতো লেগে আছে যে, কিছু বুঝতে চাইছে না। অপমান-টপমান গায়ে মাখে না। মনে হয় আমার জন্য শহিদও হতে পারে। আর সেই জন্যই আমার গা জ্বালা করে আজকাল। এত আঠা কিসের বাবা!"

"ছেলেরা প্রেমে পড়লে সবাই ওই একই রকম, যাকে মনে ধরল তার জন্য পাহাড় থেকে লাফ দিতে পারে, সাঁতরে সমুদ্দুর পার হতে পারে, হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কিন্তু যেই শরীরটরির হয়ে গেল, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় করে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিল, ঘরবসা হয়ে গেল, তখন সব ফুস। আর ফিরেও তাকাতে ইচ্ছে করে না। তখন আবার অন্য সব মেয়ের দিকে ছোঁকছোঁক। একটাতে কি ওদের হয়! ওই জন্যই তো আগে রাজাবাদশাদের অতগুলো করে বৌ-বিবি থাকত। তাতেও হত না। দাসীবাঁদিগুলোকে ধরে ধরে প্রেগন্যান্ট করে ছাড়ত।"

"আমিও ভাবি জানিস! পুরুষদের জন্য ওই কারণেই প্রস কোয়ার্টার আছে, মেয়েদের জন্য তো সেই ব্যবস্থা নেই! অনেক ম্যারেড লোকও নাকি প্রস কোয়ার্টারে যায়!"

"তা যাবে না! নতুন নতুন না পেলে যে ওদের ইরেকশনই হয় না! পুরুষ জাতটা এত বজ্জাত, তবু সিস্টেমটাই এমন যে, পুরুষ ছাড়াও চলবে না। ভগবান বলে যদি সত্যিই কেউ থেকে থাকে তা হলে আমি গিয়ে তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করতুম।"

"তা হলে চল, এক দিন দু'জনে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করি। ঝগড়ায় কিন্তু ভগবান লোকটা আমাদের সঙ্গে পেরে

উঠবে না।”

খুব হিহি করে হাসল দু’জনে।

অপা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, “পছন্দ না হলে এ বার গরিলাটার সঙ্গে ব্রেকআপ করে নে।”

ময়না উদাস গলায় বলে, “ব্রেকআপ হয়েই আছে। এত বোকা যে, বুঝতেই পারছে না বা চাইছে না।”

“যা করবি সাবধানে করিস। বেশির ভাগ পুরুষই আসলে কাপুরুষ, অ্যাসিড-ফ্যাসিড ছুড়ে না মারে! ওর সঙ্গে শুয়েছিস নাকি?”

“খেপেছিস!”

“ছবিটবি তুলেছিস?”

“কয়েকটা সেলফি। অনেক কাকুতিমিনতি করার পর।”

“ফটোশপ করে আবার সোশাল মিডিয়ায় ছেড়ে না দেয়। আজকাল দেখেছিস, সব সিস্টেমটাই যেন অ্যান্টিউইমেন। যা কিছু গ্যাজেটস, ইলেকট্রনিকস সব কিছুই মেয়েদের এগেনস্টে ইউজ় করা হয়। দেখ না দেখ, পুটুস করে মোবাইলে ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে যা খুশি করে ফেলল! আমরা মেয়েরা বড্ড ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন। তাই বড্ড ভয় করে।”

“হুঁ। তবে জয়দীপ অত কিছু করবে বলে মনে হয় না। একটু কান্নাকাটি করতে পারে।”

“ল্যাজে পা পড়লে কী রূপ ধরে তা আগে দ্যাখ।”

নহুষ ব্যানার্জির জগৎটা কয়েক দিনেই চিনে গেছে ময়না। সেই জগতে গাছে গাছে হাওয়াই চপ্পল ফলে থাকে, বাড়িঘর তৈরি হয় হাওয়াই চপ্পল দিয়ে, আকাশে চপ্পলের মতো চাঁদ ওঠে, বর্ষাকালে চপ্পলের বর্ষণ হয়। স্বপ্নে চপ্পল, জাগরণে চপ্পল। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, ‘স্যর, পৃথিবীতে চপ্পল ছাড়াও যে আরও কিছু আছে, সেটা আপনার চোখে পড়ে না কখনও? এই যে আমি একটা যুবতী মেয়ে, হ্যাক-ছি করার মতোও নই, রোজ আপনার সামনে এত স্মার্টলি বসে কাজ করি, আপনার একটু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না? না হয় রোম্যান্টিক ভাবে নাই তাকালেন, লোকে তো একটা ফুলে ভরা গাছের দিকেও তাকায়! আমার গাছেও তো ফুল কিছু কম ফোটেনি স্যর!”

মাত্র চার দিনে নহুষবাবুর বাড়ির সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে ময়নার। নহুষবাবুর বাবা জয়ন্ত ব্যানার্জি সরকারি অফিসার ছিলেন, নস্যি নেন, বৌকে ভয় পান, মিষ্টি খেতে ভালবাসেন আর সুযোগ হলেই টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখেন। নহুষবাবুর মা কুন্তিদেবীর হাঁটুতে বাত, বেশি চলাফেরা করতে পারেন না, কিন্তু চতুর্দিকে নজর। দু’জনের সঙ্গেই তার দিব্যি জমে যায়। দিন পনেরোর মাথায় একদিন কাজ তুলতে একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় কুন্তিদেবী বলে বসলেন, “রাত হয়েছে, এখানেই দু’টি খেয়ে যা তো মেয়ে।”

জোর করে রুটি মাংস খাইয়ে দিলেন। বাঙালি বাড়িতে এ রকম হামেশাই হয়ে থাকে। জয়ন্তবাবু মাঝে মাঝে তাকে গোপনে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, “হ্যাঁ রে, তুই তো ওর হিসেবনিকেশ সামলাস, আয়পয় কেমন হচ্ছে বলে মনে হয়?”

ময়না বলে, “চিন্তা করবেন না মেসোমশাই, স্যরের ইনকাম খুব ভাল।”

জয়ন্তবাবু চিন্তিত মুখে বলেন, “তা না হয় হল, কিন্তু দিনরাত চটিজুতোর চিন্তা নিয়ে থাকলে মনটা নিম্নগামী হয়ে যাবে না তো! আফটার অল জিনিসটা তো ঠিক গ্ল্যামারাস নয় কিনা!”

ময়না সেটা জানে। কিন্তু নহুষের অগাধ পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর ডেডিকেশন দেখলে তার ভারী অবাক লাগে। ভদ্রলোক নিয়মিত দাড়ি কামান না, চুলে চিরুনি ছোঁয়াতে ভুলে যান, চুল কাটতেও ভুল হয়ে যায়। তাই ময়নার খুব ইচ্ছে করে এক দিন লোকটাকে কষে বকুনি দেয়।

এক দিন সন্ধেবেলা নহুষবাবু বাথরুমে গেছেন, এমন সময়ে নীতা ম্যাডাম এসে হাজির। তাকে দেখে খুব অবাক হয়ে বলল, “তুমি কে বলো তো!”

ময়না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি ময়না রায়। স্যরের হিসেবপত্রের কাজ করি।”

“তুমি কলেজে পড়ো না! মুখটা চেনা লাগছে!”

দিদি ডাকবে না ম্যাডাম, তা নিয়ে একটু ধন্দ হচ্ছিল। তার পর ঠিক করল, অহঙ্কারী মহিলাদের ম্যাডাম ডাকাই ভাল।

“হ্যাঁ ম্যাডাম, ফার্স্ট ইয়ার।”

ভ্রু কুঁচকে বিরক্তি মাখা মুখে নীতা বলল, “তা হলে পড়াশুনো ছেড়ে এ কাজ করছ কেন? ইট ইজ় ইয়োর স্টাডি টাইম!”

“হ্যাঁ ম্যাডাম, তা তো ঠিক। কিন্তু কাজ না করলে আমাদের চলে না যে!”

ভ্রু কুঁচকে রেখেই নীতা ঝাঁঝের গলায় বলে, “কাজ করতে এসেছ তো অত সেজেগুজে এসেছ কেন?”

ময়না ভারী অবাক হল। সে তো মোটেই সাজেনি! আর সাজগোজ করার মতো যথেষ্ট রূপটানও তো তার নেই। মুখে একটু পাউডার, সে তো সব মেয়েই দেয়, সস্তা লিপস্টিকের একটু ছোঁয়া, চুলে বিনুনি। পরনে নিতান্তই সেল-এ কেনা সালোয়ার কামিজ, একটু রংচঙে এই যা!

সে থতমত খেয়ে বলে, “স্যরি ম্যাডাম, কিন্তু আমি তো বেশি সাজিনি!”

“ফের মুখে মুখে তর্ক!”

ময়না নিবে গিয়ে শুধু বলতে পারল, “স্যরি ম্যাডাম, এর পর থেকে আর এটুকুও সাজবে না।”

নীতা তার ওপর কেন খুশি নয়, সেটা আবছা বুঝতে পারছিল ময়না। ম্যাডাম জেলাস? সত্যি? এ রকমও হয় নাকি? শাক্যস্যরের মেয়ে, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী, অত ফর্সা, জমিদার ফ্যামিলি, এক ড্রাইভারের মেয়েকে জেলাসি করছে, এটা তো ময়নার বিশ্বাসই হতে চাইছে না! তা হলে ম্যাডাম বরং একটু জ্বলুক, একটু পুড়ুক, একটু ভাজাভাজা হোক, ময়না তা হলে খুশিই হবে। গুবলুগাবলু, নেকু, হিংসুটি, জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাও! বেশ হবে তা হলে, খুব ভাল হবে।

নহুষবাবু ঘরে আসতেই নীতা প্রায় বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, “এই মেয়েটাকে রেখেছ কেন?”

নহুষ থতমত খেয়ে বলে, “আরে, ও তো আমাকে কম্পিউটারে হেল্প করতে আসে। আমার আঙুলগুলো এখনও অসাড়।”

“বাট শি ইজ় ইয়ং অ্যান্ড সেক্সি, নহুষ। এটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না।”

ম্যাডাম ধরেই নিয়েছে যে, ময়না ইংরেজি জানে না। ইংরিজি ময়না ততটা জানে না ঠিকই, কিন্তু এ সব কথা আজকাল কে না বোঝে বাবা!

এক রকম ঝগড়া করতে করতেই ওরা পাশের ঘরে চলে গেল। তবে সেখানেও যে সব কথাবার্তা হতে লাগল, তাও ময়নার কানে চলে আসতে লাগল দিব্যি।

নীতা বলছিল, “তুমি তো আমাকে এক বার বলতে পারতে, তা হলে আমিই তো এক জন কম্পিউটার জানা ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম! বাবার কত ছাত্র আছে!”

“আচ্ছা ভুল হয়ে গেছে। মানছি। মেয়েটা তো বেশি দিন কাজ করবে না। আমার হাতটা একটু ঠিক হলেই ও চলে যাবে। জাস্ট স্টপ গ্যাপ।”

“ও সব আমি শুনতে চাই না। ওকে এখুনি বিদেয় করে দাও। দরকার হলে ডবল পে দিয়ে দাও। বাট শি মাস্ট গো।”

অসহায় নহুষ কাহিল গলায় বলে, "সেটা কী করে হয়! কমিটমেন্টের একটা দাম আছে না! ও মেয়েটা কাজ করলে তোমার প্রবলেম হচ্ছে কেন একটু বলবে?"

"প্রবলেম হচ্ছে নহুষ। অত ভেঙে বলা যাবে না। আমি ব্যাপারটা পছন্দ করছি না, ব্যস! ওকে বিদেয় করো।"

"মেয়েটা কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছে নীতা!"

"সো হোয়াট! শুনলাম তো ড্রাইভারের মেয়ে! তোমার রুচিরও বলিহারি বাবা!"

মনে মনে হাসছিল ময়না। চাকরি গেলেও তার দুঃখ নেই, ম্যাডাম নীতা সেন যে তাকে রাইভ্যাল মনে করছে এটাই তো তার মস্ত জিত! এ তো বিজয়মঞ্চে ওঠার মতো ঘটনা!

এর পর অবশ্য ও ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং বন্ধ দরজার ওপাশে তাকে নিয়ে একটা লম্বা বাগ্‌বিতণ্ডা চলতে লাগল। নহুষবাবুকে মজ্জায় মজ্জায় চিনে গেছে ময়না। লোকটা মুখচোরা, ভিতু, উচিত কথা বলতে পারে না। সে এও বুঝে গেল যে, নীতা ম্যাডাম সারা জীবন ওকে নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাবে, যদি বিয়ে পর্যন্ত সম্পর্ক গড়ায়। আজকাল তো আবার ব্রেকআপের ছড়াছড়ি! ময়না নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছিল ল্যাপটপে। কত ক্ষণ চাকরি আছে তা বুঝতে পারছিল না। জবাব দিলে চলে যেতে হবে। গেল মাসে মাসে ছ'হাজার টাকা!

কিন্তু চাকরিটা যেতে যেতেও রয়ে গেল। কারণ জয়ন্তবাবু আর কুন্তিদেবী দু'জনেই মাঠে নেমে পড়লেন। ডিটেলস অবশ্য ময়না জানে না। আবছা আবছা মতো শুনেছে, দু'জনে নাকি নীতাকে বুঝিয়ে বলেছেন। কী বুঝিয়েছেন কে জানে বাবা। তবে কুন্তিমাসি তাকে এক দিন কাছে বসিয়ে বললেন, "ও বড়লোকের মেয়ে তো, তাই একটু মেজাজি। ওর কথায় কিছু মনে করিস না যেন। যেমন আসছিলি তেমনই আসবি।"

মজা হল মাসখানেক বাদে নহুষস্যরের হাতটাত ঠিক হয়ে গেল, ক্ষত নিরাময় হল এবং উনি নিয়মমতো কারখানায় যেতে লাগলেন। কিন্তু তবু ময়নাকে জবাব দেওয়া হল না। নহুষস্যর তাকে বললেন, "এখন থেকে তুমি সন্ধেবেলায় আমার কারখানায় চলে যাবে। আমার কাজ বেড়ে গেছে, তাই লোক দরকার।"

ময়না হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সংসারে বাড়তি ছ'হাজার টাকা যে কত কাজে লাগে, তা গরিব ছাড়া কেউ বুঝবে না।

আর সত্যি বলতে কী, কারখানাটা তার বড্ড ভাল লাগল। ডাইস মেশিনে রাবার শিট মাপমতো কাটা হচ্ছে, ড্রিলিং মেশিনে ফুটো করে স্ট্র্যাপ লাগানো হচ্ছে, ফিনিশিং হচ্ছে। ভারী মজার ব্যাপার। সারা ক্ষণ একটা কিছু হচ্ছে, কিছুই থেমে থাকছে না। একটা জঙ্গম, একটা গতি, একটা সৃজনও তো! তা হোক না গরিবের হাওয়াই চটি, সেও তো কাজেরই জিনিস। বেশি কাজ না থাকলে সে ঘুরে ঘুরে মেশিনের হুলস্থুলু দেখে মুগ্ধ হয়। আর মেশিন চলার মিষ্টি শব্দটা মন দিয়ে শোনে। মেশিনও যেন কথা কয়, কিছু কইতে চায়, তাকে।

সে দিন রাতে বাড়ি ফিরে দেখল সামনের ঘরে তাদের একমাত্র কাঠের নড়বড়ে টেবিলটার ওপর একটা রংচঙে, জরির কাজ করা মস্ত গোলাকার বারকোষ। তাতে প্লাস্টিকে ঢাকা দেওয়া বিভিন্ন খোপে নানা রকম শুকনো ফল। কাজু, আখরোট, পেস্তা, আমন্ড, কিসমিস। খুবই দামি জিনিস। সে অবাক হয়ে বলল, "এ সব কী মা! কোথা থেকে এল?"

তার মা বিষাক্ত গলায় বললেন, "কেন, এই গুষ্টির পিন্ডি এখন তুমি বসে বসে গেলো। তোমার গেলার জন্যই তো পাঠিয়েছে। এখন গিলে আমাদের উদ্ধার করো।"

কিচ্ছু বুঝতে না পেরে সে বলে, "ওরকম করছ কেন! কে পাঠিয়েছে বলবে তো!"

মা একটা বিচ্ছিরি গলায় বলে, "বুঝতে পারছে না, ন্যাকা কোথাকার! অত ভাল সোনার টুকরো ছেলেটা হাতছাড়া হয়ে গেল! বিয়ে হলে সোনাদানায় মুড়ে রাখতে পারত।"

বারকোষের তলা থেকে একটা দামি বিয়ের কার্ড উঁকি দিচ্ছিল। সেটা টেনে বের করে দেখল ময়না। পড়ার আগেই তার মা বলল, "ভাল করে পড়ো। জয়দীপের বিয়ে, ওদের সমাজের মেয়ের সঙ্গে। অত যে দেমাক দেখালি, এখন হল তো শিক্ষে! নাকের ডগা দিয়ে অমন ভাল পাত্র বেহাত হয়ে গেল! উনি এখন কোন হাড়হাভাতে চটিদাদার হয়ে ফ্যাক খাটছেন! বড় উদ্ধার করেছেন আমাদের!"

খুব বড়লোকেরা বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠির সঙ্গে উপহারও দেয় বলে শুনেছে ময়না। তা হলে এই সব শুকনো দামি ফলের বারকোষ সেই উপহার! নাকি এটা শুধু ময়নাকে ইমপ্রেস করার জন্য পাঠানো? কিছু একটা হবে। তবে জয়দীপের এই বিয়ের সংবাদে তার কোনও হেলদোলই হচ্ছে না, বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো একটা রিলিফ বোধ করছে ময়না। চিঠিটা আর পড়ল না ময়না, কেমন যেন কৌতূহলই হল না। জয়দীপ নামের এক জন এ বি সি ডি কাউকে বিয়ে করছে। তাতে তার কী এসে গেল? রোজ চার দিকে কতই তো বিয়ে হচ্ছে!

একটা মস্ত পুকুর! কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাতে জল নেই, শুধু হাওয়াই চটি। রাশি রাশি লাল সাদা নীল হলুদ কালো কমলা রঙের হাওয়াই চটি। আর তার মধ্যেই আকণ্ঠ ডুবে আছেন নহুষবাবু। এবং ধীরে ধীরে আরও ডুবে যাচ্ছেন! ময়না পুকুরপাড় থেকে আতঙ্কে চেঁচিয়ে বলছে, "উঠে আসুন স্যর, উঠে আসুন! ডুবে যাবেন যে! এই যে, আমি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমার হাতটা শক্ত করে ধরুন, আমি টেনে তুলে নিচ্ছি আপনাকে!"

নহুষস্যার অবাক হয়ে বললেন, "উঠে আসব! উঠে আসব কেন? বেশ করছি ডুবে যাচ্ছি। আমি তো ডুবে যেতেই চেয়েছি বরাবর। এই রাশিরাশি হাওয়াই চটির মধ্যেই তো আমার শান্তি, আমার নির্বাণ!"

ময়না আকুল হয়ে বলতে লাগল, "তা হলে আমার মাসে মাসে ছ'হাজার টাকার কী হবে স্যর?"

এক রাতে এই রকম স্বপ্ন দেখল ময়না। তার অবশ্য হাসিও পেল, আবার একটু দুশ্চিন্তাও হল।

'রহিল তোমার এ ঘরদুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো' ঠিক এই রকমই বা অনেকটা এ রকম একটা মনোভাব দেখিয়ে এক দিন নীতা ম্যাডাম ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কলকাতায় এম এ পড়তে চলে গেলেন। চলে যাওয়াটা ভবিতব্যে ছিলই। কিন্তু নীতা ম্যাডামের এই চলে যাওয়াটা যেন একটা মুখঝামটার মতো।

এক দিন সন্ধেবেলায় কারখানায় গিয়ে ময়না দেখে, স্যর কেমন যেন ঝুব্বুস হয়ে বসে আছেন। চোখের দৃষ্টিতে কোনও ফোকাসই নেই, মুখটায় অবোধ এক বিস্ময়, মাথার চুল থেকে থুতনি অবধি প্যাথোস আর প্যাথোস।

"কী হয়েছে স্যর?"

নহুষস্যার অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বললেন, "চলে গেল!"

"কে স্যর?"

"নীতা।"

"উনি তো হায়ার এডুকেশন নিতে গেলেন স্যর, আপনি অত ভেঙে পড়ছেন কেন?"

নহুষস্যার যেন বিষাদসিন্ধুতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে বললেন, "ওর যে হাওয়াই চপ্পলে অ্যালার্জি!"

"কিন্তু উনি তো আপনাকে ভালবাসেন স্যর।"

নহুষস্যার উদ্‌ভ্রান্তের মতো ময়নার দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু ও যে হাওয়াই চপ্পলকেই ভালবাসতে পারল না! তার কী হবে?"

"এক দিন উনি হাওয়াই চপ্পলেরও প্রেমে পড়বেন স্যর, আপনি দেখে নেবেন!"

নহুষ একটা নেতিবাচক মাথানাড়া দিয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলে, "নীতা আর আসবে না।"

এই সংবাদে ময়না মনে মনে ভারী খুশি হলেও মুখে খানিকটা বিষণ্ণতার ছাই মেখে নিয়ে বলল, "সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে স্যর। আই অ্যাম স্যরি (মিথ্যুক! মিথ্যুক!)"

নহুষের মাথায় তিন-চার মাসের আছাঁটা চুল, গালে অন্তত সাত দিনের না কামানো দাড়ি, আঙুলে কয়েক মাস না কাটা নখ, সব মিলিয়ে বনমানুষের মতো চেহারা, তার ওপর এক বিরহের হড়পা বান! লোকটা টালমাটাল, পুরনো বাড়ির মতো ভগ্নপ্রায় এবং বিপজ্জনক। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে যেতে পারে।

ময়না খুব সতর্ক গলায় নরম করে বলে, "কাল সকালে এক জায়গায় যাবেন স্যর?"

স্বপ্নোত্থিতের মতো মুখ তুলে নহুষস্যর বলেন, "কোথায়?"

"কাছেই স্যর, লাল সিংয়ের গারাজের পিছনে।"

"ওঃ! সেই লোকটা! তার কথা তো মনেই ছিল না!"

পরদিন একটু সকাল সকালই তারা লাল সিংয়ের গারাজের পিছনে গুটিগুটি গিয়ে হাজির হল। বুড়ো লোকটা দাওয়ায় বসে বাঁশবাখারি দিয়ে কী যেন তৈরি করছিলেন। তাদের দেখে জুলজুল করে চাইলেন।

বগল থেকে খবরের কাগজে মোড়া একজোড়া সাদা ফটফটে হাওয়াই চপ্পল বের করে নহুষ বলল, "আপনার জন্য এনেছি। দেখুন তো পায়ে ফিট করে কি না!"

চটি দেখে বুড়ো মানুষটির কী খুশির হাসি! হাসি যেন থামতেই চায় না, "আমার জন্য এনেছিস! আমার জন্য! উরিব্বাস রে! কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!"

"আপনার জন্যই।"

চটিজোড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে ভারী আহ্লাদের গলায় বললেন, "জিনিসটা দিলি নাকি আমাকে! সত্যিই দিলি?"

"পায়ে দিয়ে দেখুন, ফিট হয় কিনা!"

"ও নিয়ে ভাবিস না, সব সাইজ়ই আমার ফিট হয়। এ যে বড় বাহারে জিনিস রে! বাঃ বাঃ!"

পায়ে দিয়ে উঠোনে একটু হাঁটাহাঁটি করে বললেন, "বড্ড সরেস জিনিস হয়েছে রে, বড় সুন্দর! তবে কী জানিস, পায়ের জিনিস পায়ে থাকলেই ভাল, মাথায় উঠতে দিস না যেন! বুঝেছিস তো!"

"যে আজ্ঞে। বুঝেছি।"

তার পর তাদের দিকে টালুমালু করে খানিক ক্ষণ চেয়ে থেকে ভারী খুশিয়াল হাসি হেসে বললেন, "তোদের দু'জনকে তো মানিয়েছেও ভারী ভাল!"

ময়না ভীষণ লজ্জা পেয়ে ভারী রাগ করে বলে, "আপনার মুখে কি কিছু আটকায় না?"

"কেন রে, কিছু ভুল বললুম নাকি! আজকাল সবাই কেবল আমার ভুল ধরে। আমি সারাদিন ভেবে মরি আমার ভুলটা কোথায় হল। ভাল ভেবেই তো যা কিছু বলি আর যা কিছু করি।"

ময়না ঝঙ্কার দিয়ে বলে, "আপনার সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া আছে।"

বুড়োমানুষ বলেন, "সে হবে'খন। এখন দু'টিতে মিলে বিয়ে করে ফ্যাল গে যা। ল্যাটা চুকে যাক।"

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

দেওয়াল ভাঙা বড় কঠিন

সমরেশ মজুমদার

হাঁটতে কষ্ট হয় অঞ্জনার। কিন্তু এখন তো ভোর পাঁচটার আগেই আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য দেখা দেওয়ার আগেই যে সে আসছে, তা পৃথিবী টের পেয়ে যায়। তখন বিছানায় শুয়ে থাকতে খুব অসুবিধে হয়।

পুরো বাড়িটা এখন শব্দহীন। অঞ্জনা ধীর পায়ে বাথরুমে গেলেন। আজকাল ওষুধ খেয়ে কোনও লাভ হচ্ছে না। কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সারাক্ষণ একটা ব্যথা পাক খায়। ঠান্ডা জল পায়ে পড়লে, সেইটুকু সময় একটু আরাম বোধ হয়। তাই বলে চব্বিশ ঘণ্টা বাথরুমে ঢুকে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকা যায় না!

এই চার ঘরের ফ্ল্যাটের দুটো ঘর খোলার প্রয়োজন হয় না। কয়েক বছর আগেও তিনি এ-ঘর ও-ঘর করতেন। এখন পারেন না। পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজের ঘরে যখন ফিরলেন, তখনও পাশের ঘরের দরজা ভেজানো। আগে অভ্যেস ছিল রাতে শোওয়ার আগে দরজায় ছিটকিনি তুলে শোওয়ার। কিন্তু যে বার বুকে ব্যথা হল, ডাক্তার এসে সব দেখে ওষুধ দিয়ে

বলে গেলেন ঘরের দরজা খুলে ঘুমোতে। তার পর থেকে দরজা বন্ধ করা হচ্ছে না। তাতে প্রথম কিছু দিন ভদ্রলোকের ঘুম আসছিল না সহজে। এই নিয়ে ডাক্তারকে অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু দরজা বন্ধ হয়নি। তিনি মহিলা হয়েও দরজা খুলে ঘুমোতে পারলে, উনি এত আব্রু খোঁজেন কেন? এখন ওঁর যা বয়স, তাতে কারও সঙ্গে দরজা বন্ধ করে প্রেমালাপ করতে পারবেন না। কারণ, কাছাকাছি বয়সের কোনও মহিলা আদৌ উৎসাহী হবেন বলে মনে হয় না। এক সময় মদ্যপান করতেন। পার্টিতে গেলে, কখনও-বা বাড়িতে। কিন্তু কখনওই মাত্রা ছাড়াতেন না। কিন্তু ওই বুকে ব্যথা হওয়ার পর মদ্যপান একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তারের উপদেশে। তা হলে লুকনোর যখন কিছুই নেই, তখন দরজা বন্ধ করতে হবে কেন?

নিজের বিছানা নিজেই তোলেন অঞ্জনা। কোনও কারণ নেই, তবু নিজের পাতা বিছানায় শুলে বেশি আরাম লাগে। এখন এই বাড়িতে রাতদিনের কোনও কাজের লোক নেই। সুজাতা ছিল। প্রায় তেরো বছর কাজ করেছে। কিন্তু স্বামী অসুখে পড়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছে। সে চলে যাওয়ার পর আর রাতদিনের লোক রাখা হয়নি। এখন সকালে দু'জন আসে। এক জন রান্না ছাড়াও পাড়ার বাজার থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। অন্য জন ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাপড় কাচার কাজগুলো করে দিয়ে যায়। এতে সুবিধে যেমন, অসুবিধেও তেমনই। কিন্তু কিছু করার নেই। অসুবিধেগুলো মেনে নিলে ওরা যখন থাকে না, তখন কিন্তু স্বস্তিতেই থাকা যায়।

বিছানা তুলে, পোশাক বদলে পায়ে পায়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে এলেন অঞ্জনা। যত্ন করে চা করলেন দু'কাপ। নিজের জন্য কাপে ঢেলে নিয়ে বাকিটা পটে রেখে দিলেন টি-কোজ়ির আড়ালে। তার পর একটা বিস্কুট নিয়ে চায়ের কাপ হাতে সামনের হলঘরের চেয়ারে বসলেন। এখন তিনি চায়ে দুধ-চিনি মেশানো বন্ধ করে দিয়েছেন। অভ্যেস হয়ে যাওয়ায় খারাপ লাগে না। সামনের জানলাটা সেই সন্ধে থেকেই বন্ধ। অঞ্জনা জোর করে শরীরটাকে তুলে জানলা পুরোপুরি খুলে দিলেন। ভোরের ঠান্ডা বাতাস শরীরে লাগতেই চোখ বন্ধ করে খুশির হাসি হাসলেন। তার পর চার তলা থেকে কলকাতার আকাশ দেখতে দেখতে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

এখন ঘড়িতে ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট। কোথাও কোনও শব্দ নেই। আলো আছে, কিন্তু তার বিন্দুমাত্র তেজ নেই। কী ভাল লাগে এই সময়টা। প্রথম কাজের মেয়েটি, যে ঘর পরিষ্কার করে, কাপড় কাচে, আসে সকাল সাতটায়। ঢের দেরি আছে তার আসার। দ্বিতীয় জন আসবে আটটার সময়। জলখাবার এবং দুপুরের খাবার তৈরি করে এগারোটার মধ্যে চলে যাবে। একেবারে যন্ত্রের মতো কাজ করে যায় সে।

ফোন বাজছে। এত সকালে এই বাড়িতে ফোন নীরবই থাকে। একটু বিস্মিত হলেন অঞ্জনা। তাঁর মনে হল, এটা যে করেছে, সে নিশ্চয়ই ভুল নম্বর ডায়াল করেছে, না হলে এই সময় ফোন আসার কোনও কারণ নেই। চায়ের কাপ রেখে চেয়ার থেকে শরীর তুলে, কোনও মতে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে অঞ্জনা বললেন, "হ্যালো!"

"ফুলমাসি? তোমার ঘুম ভাঙালাম না তো?"

মিষ্টি গলাটা কানে আসতেই অঞ্জনার মুখে খুশি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "ও মা! মিমি, তুই?"

"ঘুমোচ্ছিলে নাকি? আমি কি সময়টা কাউন্ট করতে ভুল করেছি?"

"না, না। আমার ঘুম অনেক আগে ভাঙে। চা খাচ্ছিলাম আমি। তুই কিন্তু অনেক দিন পরে ফোন করলি। কী ব্যাপার বল," বললেন অঞ্জনা।

"বাবলিকে তুমি ওর দশ বছর বয়সে দেখেছিলে। এখন তো সে রীতিমতো লেডি। বাবলি কলকাতায় যাচ্ছে। ও যে কোম্পানিতে কাজ করছে, তারাই কয়েক জনের সঙ্গে ওকেও নিয়ে যাচ্ছে একটা সার্ভে করার জন্য।"

"বাবা! এত বড় হয়ে গিয়েছে!" অঞ্জনা হাসলেন।

"আর বোলো না। ওরা বড় হচ্ছে, আমরা বুড়ি হচ্ছি। বাবলিদের কোম্পানি ওদের হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করবে। তা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আমি ওকে বলেছি, কলকাতায় গিয়ে যেন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।"

"সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু তোর মেয়ে বাইরে থাকবে কেন! এই বাড়িতে তো দুটো ঘর খালি পড়ে থাকে, এখানেই থাকবে!" অঞ্জনা বললেন।

"না ফুলমাসি, ওকে কাজের প্রয়োজনে কখন বেরোতে হয় তার ঠিক নেই। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে থাকলেই সুবিধে হবে। শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছে শনিবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। ঠিক আছে?"

"যা ভাল বুঝিস তুই। ওর ভাল নাম কী?"

"উপমা।"

হাসলেন অঞ্জনা, "বাঃ! এই নাম তো আগে শুনিনি!"

"মেসোকে বলে দিয়ো তা হলে..."

কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল মিমি।

ভাল লাগল অঞ্জনার। তাঁর বিয়ের বহু পরে কলেজে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যায় মিমির। সেই আমেরিকার ওহিয়ো কলম্বাসে থেকে গিয়েছে ওরা। প্রথম দিকে দু'বছর অন্তর অন্তর কলকাতায় আসত। প্রথম বার জোড়ে এসেছিল। তার পর থেকেই এক জন আসে, অন্য জন আসে পরের বারে। বোধ হয় খরচ বাঁচানোর জন্য। কিন্তু বাবলিকে নিয়ে মিমি কলকাতায় শেষ বার এসেছিল, যখন ওর মেয়ের বয়স দশ। বেশ মিষ্টি মেয়ে। আমেরিকায় জন্ম, লেখাপড়া, তবু ঝরঝরে বাংলা বলেছে সেই সময়। তার পর মিমি অথবা ওর বরের ভারতে আসা বেশ কমে গিয়েছিল। তবে পয়লা জানুয়ারি, পয়লা বৈশাখ বা বিজয়া দশমীতে নিয়ম করে ফোন করত। মিমি বলত, মেয়ের পড়ার চাপ এত বেড়ে গেছে যে, কলকাতা যাওয়ার ছুটি পাচ্ছে না।

ঠিক সময়ে দু'জন কাজের মেয়ে এসে গেল। যে চেয়ারে বসে চা খেয়েছেন, সেই চেয়ারে বসেই ওদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে কথা বলছিলেন। ন'টা বেজে গেল। ও-পাশের ভেজানো দরজার দিকে তাকালেন অঞ্জনা। একটা লোক এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় কী করে! সকালে করা চা, এতক্ষণে জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে। রোজ এক কাণ্ড হয়, তবু নিজের চা করার সময় কেন যে ওঁর চা করে ফেলেন! এদিকে জিভে স্বাদ আছে খুব! কয়েক বার সেই চা গরম করে দিয়েছিলেন, কয়েক চুমুক খেয়েই কাপ সরিয়ে রেখে বলেছেন, "পোড়া চা কেন দিলে!"

একবার গরম করা চা কী করে পোড়া চা হয়? শুনলে গা জ্বলে যায়। কিন্তু আজকাল আর ঝগড়া করেন না। ডাক্তার বলেছেন, "একদম উত্তেজিত হবেন না। কোনও কিছু পছন্দ না হলে সেখান থেকে সরে গিয়ে দশবার জোরে জোরে শ্বাস নেবেন। আপনারা দু'জনেই যে হার্টের ওষুধ খান, সেটা ভুলে যাবেন না।" নিজেকে শক্ত করতে তিনি ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোক তো চিরকাল নিজে যা ভাল বুঝেছেন, তাই করে এসেছেন। ঝাঁটা হাতে নিয়ে পদ্ম ও ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকল, "বাবু!"

"রোজ রোজ ডাকার কী আছে! দরজা তো খোলাই থাকে..." ভিতর থেকে গলা ভেসে আসতেই পদ্ম ঘরে ঢুকে গেল। তার পর তিনি দরজার বাইরে এলেন। ঘুম-জড়ানো গলার স্বরে বললেন, "এ বাড়িতে শান্তিতে একটু ঘুমোব, তার জো নেই..." বলে ঢুকে গেলেন বাথরুমে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা ডাকলেন, "সবিতা!"

রান্নার মেয়ে রান্নাঘর থেকেই জবাব দিল, "বুঝেছি।"

মাথা নাড়লেন অঞ্জনা। এ বাড়ির কাজের লোকরা পর্যন্ত তিনি না বললেও কথা বুঝে যায়, কিন্তু যাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ বছর ধরে আছেন, তাঁকে বোঝানো এ জীবনে সম্ভব হবে না। নিজের ঘরে গিয়ে শাড়ি-জামা বদলে ঠাকুরের আসনের সামনে যে টুল রেখেছেন, তাতে বসলেন তিনি। মিমিটাও কত বড় হয়ে গেল! সেই ছোটবেলায় যখন ওর মুখে তিনি

‘ফুলমাসি’ ডাকটা শুনতেন, তখন কী যে ভাল লাগত! জানাশোনা কোনও মহিলাকে তাদের বোনঝিরা ফুলমাসি বলে ডাকে না। বেশির ভাগই ডাকে মাসিমণি বলে। তার চেয়ে ফুলমাসি শব্দটায় অন্য আনন্দ আছে। সেই মিমির মেয়ে বাবলি চাকরি করছে এবং সেই সূত্রে আমেরিকা থেকে কলকাতায় আসছে। এখন ওর য়া বয়স, তাতে প্রেমট্রেম করা খুব স্বাভাবিক। এ দেশেই সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েরা এই বয়সেই ঠিক নিজের সঙ্গী বেছে নেয়, বিদেশে তো অনেক আগেই ওই কম্মের শুরু। বাবলি নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নয়। অঞ্জনার মনে পড়ল, আমেরিকা থেকে যখন প্রথম দিকে মিমি আসত, তখন বাঙালি মেয়েদের প্রেমের গল্প করত। কলকাতার বাঙালি বাবা-মায়েদের মতো ওখানকার বাবা-মায়েরা আদৌ মাথা ঘামাত না মেয়ে কার সঙ্গে প্রেম করছে তা নিয়ে। বিয়ে করতে চাইলে একটা সামাজিক অনুষ্ঠান করে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াত। মিমি বলত, “জানো ফুলমামি, পার্টিতে বাবা-মা হাসিমুখ করে থাকত বটে, কিন্তু অনেককেই বলতে শুনেছি, ‘কী করব বলো! জাত ধর্ম ভাষা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তো লাভ নেই, কপাল ভাল থাকলে কোনও ছেলেকে বাড়িতে এনে বলবে, মা, এই তোমার হবু জামাই!’” মিমি এখনও জানায়নি ওর মেয়ে বাবলি এখন কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আছে কি না।

পুজো শেষ করে হলঘরে এসে দেখলেন, ডাইনিং টেবিলে খবরের কাগজ রেখে চা খাচ্ছে সুবিমল। টেবিলের উল্টো দিকে বসে অঞ্জনা গলা তুললেন, “সবিতা!”

“দিদি!”

“পদ্ম চলে গেছে?”

“আর থাকে!”

ব্রেকফাস্ট মানে টোস্ট, ডিমসেদ্ধ আর একটা ফল। বেশির ভাগ দিনই একটা আপেল দু’টুকরো করে দেয় সবিতা, আর সঙ্গে কোনও একটা হেল্‌থ ড্রিঙ্ক।

খাওয়া শুরু করলেন অঞ্জনা। খেতে খেতে দেখলেন, টেবিলের উল্টো দিকে বসা মানুষটা গম্ভীর মুখে কাগজ পড়ে যাচ্ছেন। অঞ্জনা একটু জোরে বললেন, “শুনছ?”

“শুনছি,” সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল।

“একটু আগে মিমি ফোন করেছিল।”

“অ।”

“মিমির মেয়ে বাবলি অফিসের কাজে কলকাতা আসছে।”

“অ্যাঁ! সে কী! তার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল?”

“না হলে চাকরি পাবে কী করে!”

“বাঃ! কত বড় হয়ে গেল! ওকে আনতে কি এয়ারপোর্টে যেতে হবে?”

“বাব্বা! এই চিন্তা যে মাথায় এসেছে, তাই অনেক! সে যখন অফিসের কাজে আসছে, তখন তার থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব অফিসই নেবে। বাবলি সামনের শনিবার এ বাড়িতে দেখা করতে আসবে।”

“ভাল!” কাগজ ভাঁজ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “কলকাতার কোথায় সে উঠবে, তা কি জানিয়েছে?”

“না।”

অঞ্জনা দেখলেন, ভাঁজ করা কাগজ হাতে নিয়ে ভদ্রলোক নিজের ঘরে চলে গেলেন। এই বাড়িতে একটাই কাগজ আসে। কিন্তু তিনি পড়ার আগে কাগজের ভাঁজ খোলা চলবে না। প্রতিটি শব্দ বোধহয় গিলে গিলে খান তিনি। এই বাড়িতে আর-এক জন যে আছে, সেও যে কাগজ পড়বে, সে কথা ভদ্রলোকের মাথায় থাকে না।

এই বাড়িতে দুটো টিভি। একটায় বাংলা সিরিয়াল চলে একের পর এক। অঞ্জনা মাঝে মাঝে দেখেন, অথবা দেখেন না। কিন্তু ধারাবাহিকের চরিত্রগুলো যখন কথা বলে, তখন তাঁর মনে হয় তিনি ঘরে একা নন। এর এক রকম সমস্যা, ওর আর-এক রকম... দিব্যি সময় কেটে যায়। কোনও কোনও সমস্যা কানে নিলে মনে পড়ে যায়, এটা তিনি আগেও কোনও ধারাবাহিকে শুনেছেন। তখন অন্য কাজে মন দিতে অসুবিধে হয় না।

দ্বিতীয় টিভিটা বন্ধ থাকে সারাটা সকাল। দুপুর থেকে যতগুলো নিউজ় চ্যানেল আছে, সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই সব চ্যানেল ধরেন একের পর এক। দুপুরের খাওয়ার পর যখন একটু চোখ বন্ধ করেন, তখনও টিভি খোলা থাকে। তন্দ্রার মধ্যেও শব্দ কানে যায়। টিভি বন্ধ হয় সেই রাতের ওষুধ খাওয়ার পরে।

আজ ওষুধের নতুন প্যাকেটটা খুলে অবাক হলেন অঞ্জনা। যে দোকান থেকে তাদের বাড়িতে ওষুধ দিয়ে যায়, তারা এবার ভুল করেছে। অঞ্জনার নাম লিখে যে প্যাকেটটা দিয়েছে, তার মধ্যে ওই ঘরের ভদ্রলোকের ওষুধ রয়েছে। গতকালই এসেছে প্যাকেটগুলো। তা হলে তাঁর ওষুধগুলো নিশ্চয়ই ওই ঘরে চলে গিয়েছে।

অঞ্জনা উঠলেন। প্যাকেটটা নিয়ে স্বামীর ঘরের দরজায় পৌঁছে গলা তুলে বললেন, “ভুল করে তোমার ওষুধ আমার নামের খামে ভরে দিয়ে গেছে।”

টিভি দেখছিলেন। উঠে টেবিল থেকে একটা প্যাকেট তুলে ওষুধ বের করে মাথা নাড়লেন, “ননসেন্স! এদের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করা উচিত!” প্যাকেটটা একটু এগিয়ে টেবিলের প্রান্তে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, “ওটা কি আগেরটা?”

“হ্যাঁ।”

অঞ্জনা প্রথম প্যাকেট টেবিলে রেখে দ্বিতীয়টা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

রাত তখন ন’টা। টিভিতে বামফ্রন্টের এক জন নেতা বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। এই সময় টেলিফোন বাজল। এই বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা দুটো মোবাইল ছাড়াও একটা ল্যান্ডফোন রয়েছে। সুবিমল অবাক হলেন। এই সময় খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ তাঁকে ফোন করে না। সুবিমল রিসিভার তুললেন, “হ্যালো...”

“আপনি কি সুবিমল?” মেয়েলি গলা ভেসে এল।

“হ্যাঁ। আপনি?”

“বলুন তো আমি কে?” প্রশ্নের সঙ্গে হাসি জড়ানো।

“বুঝতে পারছি না। নামটা বললেই তো হয়।”

“দিদা কোথায়? ফোনটা ওঁকে দিন প্লিজ়।”

“দিদা? ও, তিনি নিজের ঘরে আছেন। আপনি কে?”

“কী যে বলি! আমার মায়ের নাম মিমি। আমি বাবলি। চিনতে পারছ?”

“আরে! হোয়াট আ সারপ্রাইজ়! আজই কলকাতায় এসেছ, তাই তো! আমি কে নিশ্চয়ই তা বুঝে কথা বলছ?”

“শিওর! সুন্দর হাসি ভেসে এল, “আমি ভাবতেই পারিনি তোমার গলার স্বর এত রোম্যান্টিক। এই যা, আমি যে তুমি বলে ফেললাম!”

“আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কখন দেখা পাচ্ছি?”

“কাল সকালে। তোমাদের ঠিকানা ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেই হল, তাই তো?”

“হ্যাঁ। অসুবিধে হলে আমায় ফোন করবে।”

“থ্যাঙ্কস। ও হো, ফোনটা দিদাকে দাও।”

“দাঁড়াও দেখি, শুয়ে পড়েছে কি না।”

“তা হলে থাক, বিরক্ত করার দরকার নেই। বাই।”

রিসিভার নামিয়ে সুবিমল হাসলেন। আজ অবধি কখনও যে কথাটা শোনেননি, সেই কথাটা শুনে বেশ আনন্দ হচ্ছিল। অঞ্জনা কখনও তাঁকে বলেনি এ কথা। শুধু অঞ্জনা কেন, চেনাজানা কেউই বলেনি, তাঁর গলার স্বর রোম্যান্টিক। গান গাইতে গেলে অঞ্জনা থামিয়ে দিয়ে বলেছে, “আচ্ছা, বাথরুমটা কী জন্য আছে? ওখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে যত খুশি গাও, প্লিজ়।” তাঁর গলায় সুর নেই শুনে এসেছেন এত কাল, আজ জীবনে প্রথম বার শুনলেন তাঁর কণ্ঠস্বর রোম্যান্টিক। গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে সুবিমল আয়নার দিকে তাকালেন। এই বয়সে কি কেউ রোম্যান্টিক গলায় কথা বলতে পারে? সারা জীবন কত চরিত্রে রোম্যান্টিক সংলাপ উচ্চারণ করেই মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন উত্তমকুমার, বেঁচে থাকলে একশো বছরের কাছাকাছি এসে কি সেই গলায় সংলাপ বলতে পারতেন! ওই বয়সে পৌঁছতে তাঁর অবশ্য অনেক দেরি, কিন্তু এখনও যদি তাঁর গলার স্বর... তা ছাড়া বলছে কে? একটা হাঁটুর বয়সি মেয়ে। ওর মা তাঁকে ফুলমেসো বলে ডাকে। তার জন্মানোর

পর থেকেই দেখে এসেছেন তাকে। আর এই পুচকেটা তো সেদিন জন্মাল। এখন বাড়ির বাইরে সে আর বাবলি নয়, সবাই উপমা বলেই ডাকে। দিনগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে।

স্ত্রীর ঘরের ভেজানো দরজার সামনে গিয়ে সুবিমল গলা তুললেন, "শুনছ?"

রেডিয়োর শব্দ কমে গেল, "বলো।"

"মিমির মেয়ে ফোন করেছিল। ও কলকাতায় এসে গেছে।"

"ও।"

"কাল এই বাড়িতে আসবে।"

"কখন?"

"সময় বলেনি।"

"আশ্চর্য! মেয়েটা এই প্রথম আসবে। দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কি না জেনে নেবে না! ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো।"

"খেলে খাবে, নইলে খাবে না, অত চিন্তা করার কী আছে!" গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে এলেন সুবিমল। মেয়েটা যে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে, এটাই পছন্দ হয়নি মহিলার। এটুকু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তাঁর। অদ্ভুত!

যাকে বলে সুদর্শন, হয়তো যৌবনে তা ছিলেন না সুবিমল। সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন ভাল করে চাকরি করে ওপরে ওঠার। জীবনে কখনও মদ্যপান তো দূরের কথা, সিগারেটও খাননি। স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তরের শুরু হয়েছিল চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে। অনেক দিন থেকেই মতান্তর হচ্ছিল, হঠাৎই দু'জন একই বাড়িতে যে যার মতো জীবনযাপন করতে লাগলেন। এখন দু'জনেরই মনে হয় বেশ ভাল আছেন। শুধু একটা ব্যাপার একটু অসুবিধে হয় অঞ্জনার। তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক বলেছেন, "এসব নিয়ে বেশি ভাববেন না। রাস্তা থেকে বর্ষার পরে পিচ সরে গেলে গাড়ি গতি বাড়াতে পারে না বটে, কিন্তু থেমে তো যায় না। একটু হেলেদুলে, সামান্য লাফিয়ে এগিয়ে যায়। এই বয়সে বেশির ভাগ মানুষেরই এই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। ওষুধ খেয়ে যাবেন, আর কী!"

তাই তাঁরা ওষুধ খান। পরিমাণে অঞ্জনা অনেক বেশি। স্কুলে পড়িয়ে সারা জীবন যা সঞ্চয় করেছেন, তা এখন ওষুধের পেছনে যাচ্ছে। তুলনায় শুধু রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ ছাড়া আর কিছু খেতে হয় না সুবিমলকে। নিজের ওষুধ নিজেই কিনে আনেন তিনি। যাওয়ার সময় অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলেই শোনেন, তাঁর ওষুধ এখনও শেষ হয়নি। ওষুধের দোকানটি বাড়ির কাছাকাছি। বেশ বড় দোকান। অঞ্জনা ফোন করে ওষুধের নাম বলে দিলে তারা বাড়িতে ওষুধ পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে যায়। আগের বার অঞ্জনার সঙ্গে সুবিমলের ওষুধও আনানো হয়েছিল, তখনই গুলিয়ে গেছে। পাড়ার ব্যাঙ্কের সঙ্গেও ব্যবস্থা করে নিয়েছে অঞ্জনা। অল্প পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী বাড়িতে এসে চেক নিয়ে টাকা দিয়ে যান।

কিন্তু শনিবার যদি মিমির মেয়ে এই বাড়িতে আসে, তা হলে তো আটপৌরে খাবার তাকে খাওয়ানো যাবে না। কিন্তু কী খাওয়াবেন? দুপুরে খাওয়ার টেবিলে কথাটা তুললেন অঞ্জনা। খেতে খেতে মাথা নাড়লেন সুবিমল, "এটা কোনও প্রবলেম নয়।"

"মানে!" বিরক্ত হলেন অঞ্জনা। আজকাল এই মানুষটার সঙ্গে কথা বলা যায় না।

"যে মেয়ে ও-দেশে জন্মেছে, তার ফুড হ্যাবিট কী, তা তো আমরা জানি না। অনেক কিছু রান্নার পর যদি শোনো যে, সে ও-সব খায় না, তখন কি ভাল লাগবে? এখন তো সে মেমসাহেব। দুটো পথ আছে, হয় মিমিকে ফোন করে বাবলির ফুড হ্যাবিট জেনে নাও, নয়তো ও এলে কোনও রেস্তরাঁয় অর্ডার দিয়ে দিতে হবে।"

কথাটায় যুক্তি আছে বলে মনে হল অঞ্জনার।

বিকেলে মিমিকে ফোন করলেন। মিমির গলায় তখনও ঘুম। প্রশ্ন শুনে হো হো করে হাসল ও, বলল, "দূর! ও সব খায়। তোমরা বাড়িতে যা খাবে, তাই ওকে দিয়ো। এ নিয়ে একদম চিন্তা কোরো না।"

সবিতাকে ডেকে পরামর্শ দিলেন তিনি। সবিতা অভয় দিল।

শনিবারের সকাল যাই-যাই করছে, এমন সময় সুবিমলের ফোন বেজে উঠল। "হ্যালো" বলতেই ও-পারে বাবলির গলা, "এসে গেছি!"

"বাঃ! এখন কোথায়?" সুবিমল জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রায় এসে গেছি। ড্রাইভারদাদু তো তাই বললেন।"

দাদু! অবাক হলেন সুবিমল। ড্রাইভারকে দাদু বলে সম্বোধন করতে কাউকে শোনেননি এর আগে।

টেলিফোন রেখে স্ত্রীর উদ্দেশে গলা তুললেন, "উপমা এসে গেছে।"

উপমা! মিমির মেয়ে বাবলিকে আবার উপমা বলার কী দরকার! ঘরের মেয়েকে ডাকনামে ডাকতেই ভাল লাগে। এই লোকটার সব ব্যাপারেই বেশি বেশি।

অঞ্জনা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে এলেন। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল পদ্ম। জিজ্ঞেস করলেন, "তোর সব কাজ হয়ে গেছে?"

"আর একটু..." পদ্ম বলল।

"ভাল, তবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যা।"

এই সময় রান্নার মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে অঞ্জনা বললেন, "বাবলি এসে গেছে। এলেই প্রথমে চা বা কফি দিস। দুধ বা চিনি খায় কি না জিজ্ঞেস করে নিবি।"

মেয়েটি হাসল, "এর আগে এই কথা অন্তত দু'বার বলেছ। আর পদ্ম তো আজ দশটা পর্যন্ত থাকবে। কখন কী লাগে দোকান থেকে আনতে হবে, আগেই তো কথা হয়ে গেছে।"

মনে পড়ল অঞ্জনার। এই হয়েছে মুশকিল। আজকাল অনেক কথাই বেশিক্ষণ মনে থাকে না। চেয়ারে বসলেন তিনি। পদ্মর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরের ঘরের সোফাগুলো ভাল করে ঝেড়ে দিয়েছিস তো?"

পদ্ম শব্দ করে হাসল, "আসছে তো কয়েক ঘণ্টার জন্য। তবু যা করছ, যেন নতুন জামাই প্রথম আসছে। যদি এসে এ বাড়িতে কয়েক দিন থাকত, তা হলে যে কী করতে!"

"বাজে বকিস না। শোন, যাওয়ার সময় আমার ব্যথার ওষুধটা এনে দিয়ে যাস।"

"কেন? ব্যথা বাড়ল নাকি?"

"না, এখনও বাড়েনি। তবে বাবলি আসার পর যদি বাড়ে!"

এই সময় কেউ ডোরবেলে চাপ দেওয়ায় বাড়িতে মিষ্টি বাজনার শব্দ ছড়িয়ে গেল। এই বাজনাটা অঞ্জনা নিজেই পছন্দ করেছিলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পদ্ম বলল, "আমি দেখছি।"

"দাঁড়াও..." বলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুবিমল, বললেন, "থাক, আমি দেখছি।"

তাঁকে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে চোখ ছোট হয়ে গেল অঞ্জনার। এই সাতসকালেই সুবিমল যে পোশাক পরে ফেলেছেন, তা শেষ বার কবে পরেছেন, অঞ্জনার মনে পড়ছে না। নিজেই পছন্দ করে কিনেছিলেন, কিন্তু পরে বলেছেন, "এ বয়সে এ পোশাক ঠিক..."

সেই পোশাকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। তার পর একগাল হেসে বললেন, "ম্যাডামের নাম নিশ্চয়ই উপমা?"

"একদম ঠিক!" বলতে বলতে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল, তার খানিকটা দূরের চেয়ারে বসে অঞ্জনার মনে হল, একে রাস্তার ভিড়ে দেখলেও চিনতে পারতেন। ততক্ষণে বাবলি তাঁকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাঁর পাশে পৌঁছে গিয়েছে। এসে বলল, "আমি বাবলি।"

ডান হাত বাড়িয়ে বাবলিকে জড়িয়ে ধরে অঞ্জনা বললেন, "বলার দরকার নেই।"

"একেবারে মায়ের মুখ বসানো, তাই?"

"হুবহু। আয়, আমার পাশে বোস।"

"বাঃ! আমি যে দরজা খুললাম, আর পাত্তাই পেলাম না!" সুবিমল এগিয়ে আসে।

সোজা হল বাবলি, "আসলে এটার জন্য আমার মাকে দায়ী করতে হবে।"

"কী রকম? মিমি কী করল?" অঞ্জনা জিজ্ঞেস করেন।

"মা আমাকে মিসগাইড করেছে। তোমাদের বয়স যা যা বলেছে, তাতে আমার মনে হয়েছিল সুবিমল এক জন বৃদ্ধের নাম। এ রকম টানটান স্মার্ট মানুষের কথা তো বলেনি!" একগাল হাসল বাবলি।

“কী যে বলো! এই বয়সে কি আর ও রকম থাকা যায়! সে সব পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সের কথা। আচ্ছা, ওইটি আমার ঘর, তোমাদের কথা শেষ হলে এসো, গল্প করব।”

সুবিমল নিজের ঘরে চলে গেলেন।

“অল্প বয়সে খুব স্মার্ট ছিলেন, না?” অঞ্জনাকে প্রশ্ন করল বাবলি।

“কী জানি! অত কাল আগের কথা, মনে নেই। এখন বলো, ক’দিন এখানে আছ?”

“এই সামনের সপ্তাহটা। খুব ইচ্ছে ছিল দার্জিলিংয়ে বেড়াতে যাওয়ার। সময় হবে না। তুমি নিশ্চয়ই দার্জিলিং গিয়েছ?”

“নাঃ! যাওয়া হয়নি। তুমি কি এখানে ক’দিন থাকতে পারবে না?”

“না, আমার সঙ্গে রুম শেয়ার করছে এক জন স্প্যানিশ মেয়ে, আমার সঙ্গে কাজ করে। ওকে একা রেখে এলে খুব খারাপ ভাববে।”

“এখানে এসে মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?”

“হয়নি মানে! তিন-তিনবার। আমি যেন একটা বাচ্চা মেয়ে! মা একেবারে যাচ্ছেতাই!”

“যখন মা হবে, তখন বুঝতে পারবে কেন ফোন করেছে।”

“জানি বাবা, জানি। তবে আমি মা হব না।”

“সে কী! তুমি বিয়ে করবে না?”

“নিশ্চয়ই করব। আর দেড় বছর পরে করব। কিন্তু কখনওই মা হব না।”

“ও মা! কী বলছ তুমি!” হাঁ হয়ে গেলেন অঞ্জনা।

“ঠিক বলছি। দু’জনে প্রেম করছি, চাকরি করছি, সংসারের খরচ ফিফটি ফিফটি শেয়ার করছি। আর, বাচ্চাকে পৃথিবীতে আনতে নয়-সাড়ে নয় মাস আমাকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে বাচ্চাটাকে বহন করতে হবে। কেন? তার পর অন্তত তার তিন বছর বয়স অবধি তাকে লালন করতে হবে, অসুখ হলে রাত জাগতে হবে। কেন? যে বাচ্চার বাবা, সে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে, আর মাকে বোঝা টেনে বেড়াতে হবে?” স্পষ্ট গলায় বলল বাবলি।

“কী যে বলিস তুই! তা হলে যে পৃথিবীটা মানুষশূন্য হয়ে যাবে!”

“তার দায় তো আমার নয়। আমি যাকে বিয়ে করব, সে এগুলোর কোনওটাই শেয়ার করবে না বলেছে। সে নাকি শুধু আমাকে ভালবাসে! আমি কেন গাধার মতো বোঝা বইব? আচ্ছা, তোমাদের তো কোনও ইস্যু হয়নি। এতগুলো বছর তোমরা একসঙ্গে কাটালে, কোনও অসুবিধে হল? আমি মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি, ওঁদের কোনও আপত্তি আছে কি না। দু’জনেই বলেছে, না। তা হলে তো আর কোনও সমস্যা রইল না,” হাসল বাবলি।

“তুই যে ভাষায় কথা বলছিস, তা আমি বুঝতে পারছি না,” অঞ্জনা মাথা নাড়লেন।

“বাঃ! কী দারুণ!” হাততালি দিল বাবলি।

“মানে?” অবাক হলেন অঞ্জনা।

“সেই কবে, বোধহয় একশো বছর আগে, যে কথা এক জন লিখে গিয়েছিলেন, সেই কথা তুমি প্রায় হুবহু উচ্চারণ করলে!” হাসল বাবলি।

“সে কী রে! তুই ‘চণ্ডালিকা’ শুনেছিস?”

“শুধু শুনিইনি, পড়েওছি। তুমি আমাকে কী ভেবেছিলে বলো তো?”

হাত বাড়িয়ে বাবলির চিবুক স্পর্শ করলেন অঞ্জনা, “সত্যি, আমি ভাবতেই পারিনি।”

“অনেকেই অনেক কিছু পারে না। আমি যেমন প্লেন চালাতে পারি না!” বলে শব্দ করে হেসে উঠল বাবলি। তার পর বলল, “আচ্ছা, এবার বলো, তোমার প্রবলেম কী?”

“প্রবলেম! মানে?”

“মানে, তোমার কোনও শারীরিক সমস্যা আছে কি, যা ইন্ডিয়ার ডাক্তাররা ঠিক করতে পারছে না? একটু ভেবে বলো...” জিজ্ঞেস করল বাবলি।

“ওসব শুনে কী করবি?” হাসলেন অঞ্জনা, “বয়সের রোগ।”

“হ্যাঁ, সেই রোগটা কী?”

“হাঁটু। বহু ডাক্তার দেখিয়েছি, কিন্তু দু’পা সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না।”

“ডাক্তাররা কী বলছেন?”

“ওই একই কথা, রিপ্লেস করতে হবে। কিন্তু আমার খুব ভয় হয়। অনেকেই করেছেন। কিন্তু যেমন ছিলেন তেমনই রয়ে গেছেন।”

“আগে হার্ট অপারেশন করাতে লোকে ভয় পেত, এখন তো জলভাত হয়ে গেছে। হাঁটু রিপ্লেস করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার পেশেন্টকে হাঁটাচ্ছেন। পাসপোর্ট আছে?” আচমকা জিজ্ঞেস করল বাবলি।

“অ্যাঁ! হ্যাঁ। সেই কবে করানো হয়েছিল। ফুরিয়ে যাওয়ায় আবার রিনিউ করিয়ে রাখা হয়। কেন?”

“ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব। ও ব্যাপারে যা যা দরকার, আমি তার ব্যবস্থা করব। তোমাকে মাসখানেকের জন্য ও-দেশে যেতে হবে।”

“পাগল!” হাসলেন অঞ্জনা।

“একদম না। এখানে যা খরচ হয়, ওখানে তার চেয়ে খুব বেশি হবে না। কিন্তু তোমার হাঁটু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার হাঁটু সংক্রান্ত যত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, রিপোর্ট, এক্সরে প্লেট আছে, সব রেডি রেখো, আমি যাওয়ার আগে এসে নিয়ে যাব, ” জোর দিয়ে বলল বাবলি।

“হ্যাঁ রে, এটা কথার কথা নয় তো!”

হাত বাড়িয়ে অঞ্জনার হাত ধরল বাবলি। কথা না বলে মাথা নেড়ে বলল, না। তার পর জিজ্ঞেস করল, “আর কিছু জানার আছে?”

“আমি অত টাকা দেব কী করে?” গলায় অসহায়তা স্পষ্ট অঞ্জনার।

“দাঁড়াও, আগে জেনে নিই কত টাকা, তার পর তো দেওয়ার জন্য চিন্তা করবে। ও হো! কয়েকটা পাসপোর্ট সাইজ়ের ছবি দরকার। না থাকলে করিয়ে নিয়ো। আমি এবার ওই ঘরে যাই, উনি কী সুন্দর হেঁটে গেলেন, ওঁর হাঁটতে নিশ্চয়ই সমস্যা নেই?”

মাথা নাড়লেন অঞ্জনা, “আছে বলে তো শুনিনি।”

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাবলি জিজ্ঞেস করল, “আসতে পারি?”

“ওয়েলকাম, ওয়েলকাম... এসো এসো, মা কেমন আছেন?” সুবিমল চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। রঙিন শার্টে তাঁর বয়স বেশ কমে গিয়েছে।

“মা খুব ভাল আছেন।”

এই সময় রান্নার মেয়েটি দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল, “দিদি, আপনি চায়ে দুধ-চিনি খান?”

“না না ভাই, আমি চা খাই না। একটু আগে ব্রেকফাস্টে কফি খেয়ে এসেছি, ” বলেই বাবলি সুবিমলের দিকে তাকাল, “আচ্ছা, আমরা তো বাইরের ঘরে সবাই এক সঙ্গে বসতে পারি। সবাই মিলে গল্প করতে পারব।”

“ঠিক আছে, চলো...” বললেন বটে, কিন্তু সুবিমলের মুখ দেখে বোঝা গেল, প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

অঞ্জনা অবাক হলেন, “কী ব্যাপার?”

“আলাদা নয়, এক সঙ্গে বসে গল্প করব। শোনো, আমি হ্যারিকেন ট্যুরের কথা ভাবছি। সোমবার এখানে ছুটি আছে। আমরা যদি কাল, মানে রবিবার সকালের ফ্লাইটে যাই, সে ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ে একটা রাত থেকে সোমবারে চলে আসতে পারব। তা হলে তৈরি হয়ে নিয়ো। আমি আজই টিকিট করে তোমাদের সময়টা জানিয়ে দেব,” বলল বাবলি।

“তুমি জানো না তাই বলছ। এ ভাবে শুধু যাওয়াই হবে, কিছু দেখতেই পাবে না,” সুবিমল বললেন, “বাগডোগরা থেকে দার্জিলিং পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যাবে।”

“যাক না! এক ঝলক তো দেখা যাবে!” অঞ্জনাকে বাবলি বলল, “তুমি তো দার্জিলিং যাওনি বললে। চলো, এক ঝলক দেখা হয়ে যাবে। পা নিয়ে একটুও চিন্তা করবে না। এয়ারপোর্ট ক্যারিয়ার বলব। আর ওখানেও তোমায় হাঁটতে হবে না, গাড়িতে ঘুরবে।”

সুবিমল একটু থিতিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দার্জিলিংয়ে তিন-তিন বার গিয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে। প্রত্যেক বারই ভেবেছিলেন, পরের বার অঞ্জনাকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু তালেগোলে সেটা হয়ে ওঠেনি। এখন এই এক রাতের মধ্যে বাবলির উদ্যোগে সেখানে গেলে নিজের মান থাকবে? মাথা নাড়লেন সুবিমল, “আমার একটু অসুবিধে আছে। ডাক্তার আমাকে পাহাড়ি শহরে না যেতে অ্যাডভাইস করেছেন। হার্টের জন্য। তাই জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না।”

“ও! তা হলে তুমি যেয়ো না, আমরা দু’জনেই যাব। খুব মজা হবে। আমি আজই

টিকিট কেটে জানিয়ে দেব। একটা রাতের ব্যাপার তো, টুকটাক জিনিস গুছিয়ে নিলেই হবে,” কথা শেষ করে বাবলি বলল, “আমি এবার উঠি?”

“সে কী রে! তুই এই বাড়িতে প্রথম বার এলি, না খেয়ে চলে যাবি?” বেশ জোরে বলে উঠলেন অঞ্জনা।

তাঁকে জড়িয়ে ধরে বাবলি বলল, “দার্জিলিং থেকে ফিরে আসি, পেটভরে খাব,” তার পর সুবিমলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুমি সত্যি যেতে চাইছ না?”

“না না... আমার প্রেশারটা... তোমরাই ঘুরে এসো বরং,” বললেন সুবিমল।

নিজের ঘরে জানলার পাশে বসে ছিলেন অঞ্জনা। এর আগে যত বার সুবিমল দার্জিলিং গিয়েছেন, সঙ্গী ছিলেন বন্ধু, তাঁকে নিয়ে কোনও দিন যাননি। আজ বাবলির সঙ্গে তিনি যাবেন, সুবিমলকে না নিয়ে। কিন্তু এতে তো তাঁর তেমন আনন্দ হচ্ছে না। তিনি যদি না যান, তা হলে কী এমন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন? ওই তো বিকেলে পৌঁছে বুড়ি ছুঁয়ে সকালে চলে আসা। শুধু বলা যাবে, দার্জিলিং গিয়েছিলাম... তবু...

মন স্থির করতে পারছিলেন না অঞ্জনা। এই তাঁর অভ্যেস। চট করে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। বিয়ের দু’বছর পরেও যখন সন্তান আসছিল না, তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, তিনি শারীরিক অক্ষমতার জন্য মা হতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার বদলে গিয়েছিল তাঁর শাশুড়ির, স্বামীরও। বিয়ে ভেঙে দিয়ে আবার বিয়ের তোড়জোড় যখন চলছিল, তখন এক বিবাহিতা ননদের চাপে সুবিমল ডাক্তারের কাছে গেলেন। গেলেন অঞ্জনাও। দেখা গেল, অঞ্জনার কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, কিন্তু সুবিমল বাবা হতে পারবেন না। বিয়ে ভাঙার চেষ্টা আর হল না। অপমানে অঞ্জনার মনে হয়েছিল, তিনি বাবার কাছে ফিরে যাবেন। কিন্তু শাশুড়ি গত হওয়ায় অপেক্ষা করতে হল। আর সেটাই তাঁকে সমস্যায় ফেলল। আলাদা ঘর, নিজের মতো জীবনযাপন করতে করতে তাঁর মনে হয়েছিল, কী হবে খেয়োখেয়ি করে। আর যাওয়া হয়নি। হ্যাঁ, অনেকগুলো বছর চলে গেল।

ফোন এল বাবলির, বলল, “টিকিট পাওয়া যাবে, চিন্তা নেই।”

“তা তো নেই, কিন্তু...”

“কিন্তু কী?” হাসল বাবলি, “বরকে একা রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না?”

“কাউকে ছেড়ে নয়, না গিয়ে না গিয়ে যাওয়ার মনটাই মরে গেছে। একদম ইচ্ছে করছে না।”

শুনে একটু চুপ করে রইল বাবলি, তার পর জিজ্ঞেস করল, “কাল দুপুরে কষ্ট করে আসবে? আমিই নিয়ে আসব।”

“সে কী! তুই যাবি না?”

“না। আসবে? এসো না, দুপুরে কোনও হোটেলে আমরা খাওয়াদাওয়া করব। প্লিজ়, না বোলো না...” বাবলি বলল।

চোখের কোণে জল জমছিল, সেটা মুছে নিয়ে গাঢ় গলায় অঞ্জনা বললেন, “বেশ, যাব।”

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী
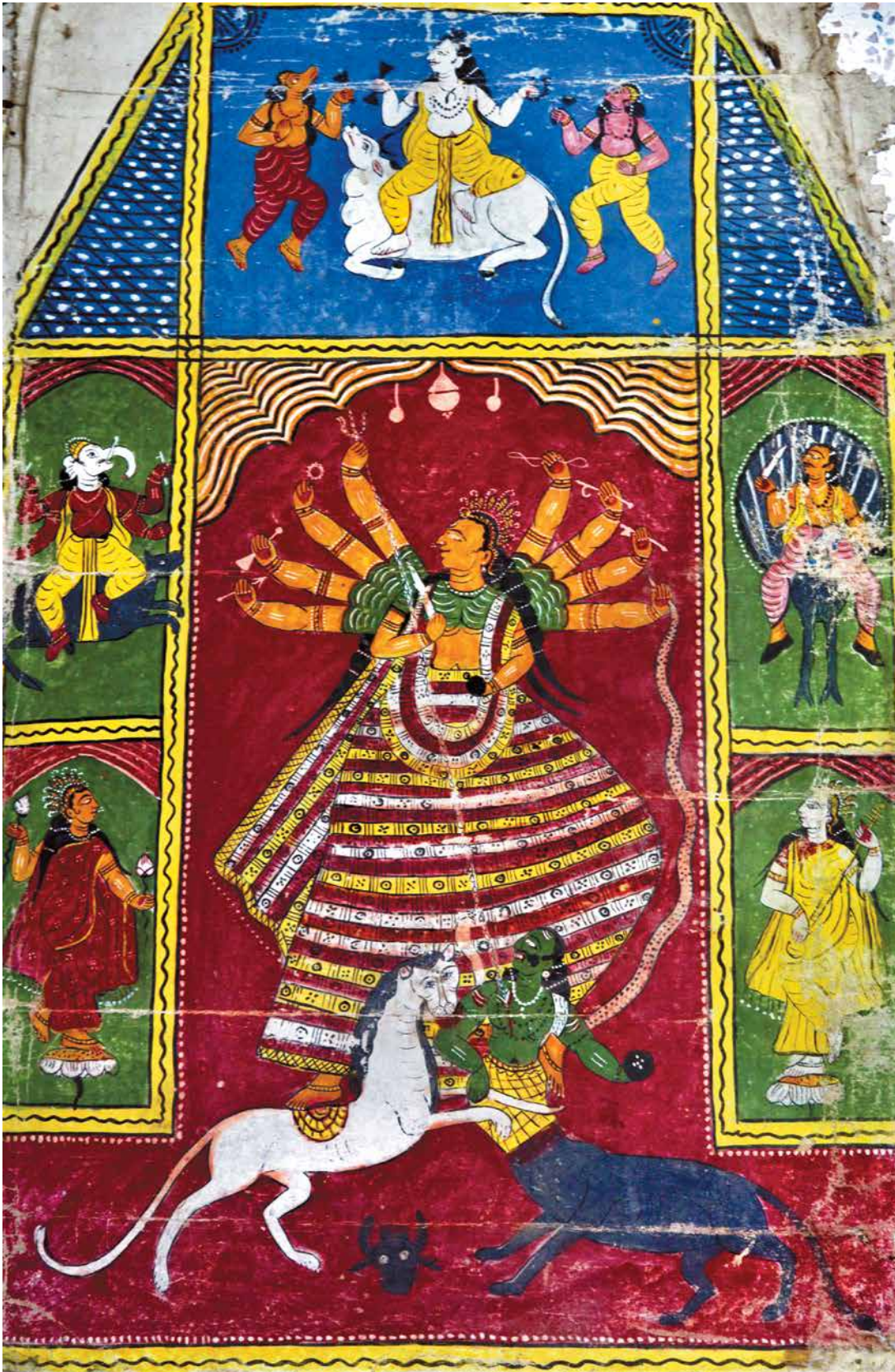
শ্রীশ্রীদুর্গা, বিষ্ণুপুরের প্রাচীন পটচিত্র

সৌজন্য: সুশোভন অধিকারী

প্র ব ন্ধ

পণ্য উৎপাদনকারীরা থেকে যান অন্তরালেই

এ জগৎ মহা পণ্যশালা

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝেই দৃশ্যটা দেখি। নামজাদা পোশাক বিপণি, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রাজধানী দিল্লিতে ওঁদের প্রথম দোকানটি খুলেছিল, এখন সারা দেশে তিনশোর বেশি দোকান চলে। এ-কালে অবশ্য জামাকাপড়, গয়নাগাটি, মোটরগাড়ি থেকে হাতঘড়ি পর্যন্ত অনেক কিছুর দোকানকেই দোকান বললে লোকে ভুরু এবং নাক দুটোই কুঁচকে তাকায়, বলতে হয় আউটলেট, কিংবা শোরুম। তো, ওঁদের দোকানে ঢুকলেই দেওয়ালে সাঁটা বিরাট পর্দাটিতে চোখ পড়ে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কয়েকটি বিজ্ঞাপনী ভিডিয়ো চলতেই থাকে, নিঃশব্দে, তবে পর্দায় নানা তথ্য জানানো হয় ওঁদের কারবার সম্পর্কে। একটি অংশ কয়েক বার মন দিয়ে দেখে বেশ মুখস্থ মতো হয়ে গেছে। সেখানে দেখা যায় পোশাক তৈরির কারিগরদের। তাঁরা পোশাকে রং করছেন, নকশা আঁকছেন, আরও সব কাজ করছেন, নিপুণ হাতের সুচারু ছন্দে দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে উঠছে সুদৃশ্য সব পরিধেয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় লেখা বিবরণীতে জানানো হয়, উত্তর ভারতের ওই মেয়েরা আগে ঘরের কাজ ছাড়া কিছুই করতেন না, ‘বোরড’ হতেন, নিজেদের আয়ও ছিল না; এখন নিজেদের জায়গায় বসেই এই বিপণির জন্য কাজ করছেন, রোজগার হচ্ছে, আনন্দও হচ্ছে। এই ছবি শেষ হলেই দেখা যায় আর-একটি প্রচার-চিত্র, দৃশ্যত একটি হস্টেলে কয়েক জন তরুণী, নির্মল আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁদের মুখ, হাসি, খেলা, খুনসুটিতে ভাসানো সুসময়, তাঁদের পোশাকেও সেই খুশির তাজা হাওয়া। একটু বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলেই আবার পর্দায় ঘুরে আসেন শ্রমজীবী মেয়েরা, যাঁরা এখন ‘বোরড’ হন না, উপার্জন করেন।

প্রচার-ভিডিয়োর সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তেমন আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-পরিসংখ্যানও জানা নেই। অবশ্য দেখলেই এই কথাটা অনায়াসে বোঝা যায় যে, নিজেদের ব্যবসাকে একটা সামাজিক কল্যাণের মোড়ক পরানোর

উদ্দেশ্যেই এই দৃশ্যগুলি পরিবেশন করছেন ওঁরা। কিন্তু সেটা তো নেহাতই অনিবার্য; বাণিজ্যিক প্রচারের জন্য তৈরি করা ছবিতে আত্মপ্রশস্তি থাকবে, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী-ই বা হতে পারে? ওঁদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ সাধারণ ঘরের মেয়েদের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে, তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সক্ষমতা বাড়ছে, এই কথাটি জানিয়ে ওঁরা ক্রেতাদের কাছে নিজেদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরছেন— 'ব্র্যান্ড' নির্মাণ এবং লালনের চেনা ছক। ঝকঝকে ছবিতে, অল্প কথায়, সংযত ভঙ্গিতে এই কৌশল ব্যবহার করতে পারলে অনেকের চোখেই ভাবমূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বই কী। ক্রেতার মনে হয়তো একটা অনুভূতির সুবাতাস খেলা করে। ওই শ্রমজীবী মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর অনুভূতি। চেতনায় কিংবা অবচেতনে হয়তো সঞ্চারিত হয় এক ধরনের পরিতৃপ্তির বোধ, হয়তো-বা সেই বোধ জড়িয়ে থাকে ওই বিপণিতে কেনা পোশাকটিতেও, পণ্য লেনদেনের পরিসর ছাড়িয়ে পণ্যের নির্মাতাদের সঙ্গে সংযোগের একটা রেশ থেকে যায় ক্রেতার হৃদয়ে। এই সংযোগের অনুভূতিই পোশাক বিপণিটিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়, তার নামমাহাত্ম্য বাড়ে। অন্যরাও পোশাক বেচছে, ওঁরাও বেচছেন, কিন্তু ওই অনুভূতিটাই ওঁদের পোশাকের সঙ্গে একটা বিশেষ আবেগ যোগ করছে, যার ফলে প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে ক্রেতার মনে তার বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন-অতিরিক্ত বাড়তি মূল্যটাই তো বিপণন-বিশারদদের ভাষায় ব্র্যান্ড-ভ্যালু। প্রয়োজন ব্যাপারটা অবশ্য বেশ অনির্দিষ্ট এবং জঙ্গম— গতকাল আমাদের মনে যে প্রয়োজনের অস্তিত্ব ছিল না, আজ সেটি মেটাতে না পারলে জীবন বৃথা, এমন তো কতই হচ্ছে। 'অমুক ব্র্যান্ড না হলে আমার চলে না', এই বহুশ্রুত নির্ঘোষটি বুঝিয়ে দেয়, ব্র্যান্ড-ভ্যালুর মহিমা সত্যিই অপার।

কিন্তু সে-প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রেখে এক পা পিছিয়ে দাঁড়ানো যাক। আরও এক বার মন দিয়ে দেখা যাক শ্রম-চর্যার ওই দৃশ্যগুলিকে। সেই ভাবে দেখতে দেখতে মনে পড়ে গিয়েছিল ডেভিড হার্ভে-র কথা। মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্রুত পণ্ডিত ও শিক্ষক ডেভিড চার দশক ধরে প্রায় প্রতি বছর কার্ল মার্কসের *ক্যাপিটাল*-এর উপর ক্লাস নিয়ে এসেছেন। ইউটিউবে তার সুনির্বাচিত এবং পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় মার্কসীয় তত্ত্বের আরও নানা বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনা। সেই ভিডিয়োগুলি, বিশেষ করে *ক্যাপিটাল* পাঠের বিশদ ভিডিয়ো-সিরিজ়টিকে মার্কস-চর্চায় আগ্রহীদের কাছে সোনার খনি বললে কম বলা হবে। ডেভিড পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তেমনই একটি অভিজ্ঞতা— অনেক বছর আগের একটি ক্লাসে তিনি ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা সকালে যা খেয়ে এসেছ, সেই সব খাবারদাবার কোথা থেকে এসেছে, কে সেগুলি তৈরি করেছে, কী দিয়ে তৈরি করেছে, যারা সেই সব উপকরণ তৈরি করেছে, তাদের সম্পর্কে কী জানো, কতটা জানো?" উত্তর দিতে গিয়ে সবাই স্বাভাবিক ভাবেই নাজেহাল, ব্রেকফাস্টের খাবার সবই তো সুপারমার্কেট বা দোকান থেকে কেনা জিনিস দিয়ে তৈরি, কর্নফ্লেক্স, দুধ, ফল, ডিম, কফি, সবই। তাদের হাঁড়ির খবর কী করে জানা যাবে? শেষকালে ওরা বলতে শুরু করল, আজ আমি ব্রেকফাস্ট করিনি! প্রবীণ শিক্ষকের ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখেও।

যাদের তৈরি করা খাবার খাও, তাদের সম্বন্ধে যাহা জানো বলো— এ-প্রশ্ন নিছক রসিকতা নয়, ছাত্রছাত্রীদের বোকা বানানোর কৌশলও নয়। এই প্রশ্নের ভিতরে আছে এক আশ্চর্য প্রদীপ, যার আলোয় দৈনন্দিন জীবনের চেনা পরিসরে দাঁড়িয়েই অর্থনীতির গভীর সত্যকে চিনে নিতে পারি, ওই প্রদীপটি আয়ত্তে না থাকলে যে সত্য আমাদের বোধের আড়ালেই থেকে যায়। সত্যটা এই যে, এ-কালের দুনিয়ায় যারা নানান সামগ্রী তৈরি করে আর যারা তা ভোগ করে, সচরাচর দুই তরফের কেউ কাউকে চেনে না, চেনার কোনও উপায় নেই, প্রশ্নও নেই। প্রতিদিন যে ভাত খাই, কে সেই ধানের বীজ বুনেছিল, কে পাকা ধান গোলাঘরে তুলেছিল, কে-ই বা তা থেকে চাল তৈরি করে বাজারে পাঠিয়েছিল, তার খবর কে রাখে? কেনই-বা রাখবে? এ-সব নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে হয়, তা হলে বাজার আছে কেন? উৎপাদক আর উপভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক বলতে যা কিছু, তা তো ওই বাজারেই মিটে যাচ্ছে, রকমারি পণ্যের কেনাবেচার মধ্য দিয়েই দুই তরফের যাবতীয় আদানপ্রদান। যাঁরা শ্রম দিয়ে সেই সব পণ্য তৈরি করেছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশও তো বাজারের বিক্রেতা। কারণ, তাঁরা নিজের নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করেছেন, বিক্রয় করেছেন এমন কারও কাছে যিনি তা কাজে লাগিয়ে পণ্য তৈরি করতে পারেন, যে পণ্য অতঃপর বাজারে বেচা হবে। *বিসর্জন*-এর রঘুপতির কথাটাকে ঈষৎ পাল্টে নিয়ে বলা যেতেই পারে: এ জগৎ মহা পণ্যশালা। এখানে মানুষে মানুষে

ঝকঝকে বস্ত্রবিপণিতে ক্রেতার পণ্য নির্বাচন ও সেল্‌স পার্সনদের সহযোগিতা নগর-সভ্যতার পরিচিত দৃশ্য

উৎপাদন-সংক্রান্ত পরিশ্রম বা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকে না অধিকাংশ ক্রেতার

সামাজিক সম্পর্ক পর্যবসিত হয়েছে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্কে। কারা আমার খাবার তৈরি করেছে, তাদের খবর আমি কোথা থেকে জানব? তারা আছে বলেই, খাবার তৈরি করেছে বলেই আমি খাচ্ছি, কিন্তু তাদের উপর এই নির্ভরতাকে আমি কখনওই মানবিক নির্ভরতা বলে ভাবি না, ভাবার কারণও নেই, আমাদের নির্ভরতা কেবল ক্রয়ক্ষমতার উপরে, সেই ক্ষমতা থাকলেই খাবার কিনে নিতে পারব।

অথচ আমরা অনেকেই, অন্তত এখনও, বিশেষ করে আমাদের মতো 'অনুন্নত' দেশে, বিলক্ষণ জানি যে, এর বাইরে অন্য রকম বাস্তবও হতে পারে। এমনকি, নিজেদের খেতে নিজেদের হাতে চাষ করা ধান থেকে নিজেরা চাল নিষ্কাশন করে সেই চালের ভাত রেঁধে খান বা পরিবারের এবং আশপাশের মানুষকে খাওয়ান, এমন মানুষ এখনও হয়তো সম্পূর্ণ বিরল হয়ে যাননি। এবং, বাজারের কেনাবেচাও উৎপাদক আর উপভোক্তার প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ককে সব সময় পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পারে না। শহরের বাজারেও পরিচিত ক্রেতার জন্য আনাজ-মাসি নিজের খেতের কচি পটল আলাদা করে রেখেছেন, এই দৃশ্য মোটেই বিরল নয়। এ নিয়ে কোনও আদিখ্যেতা করার দরকার নেই— ঠাকুরমা পটলের দাম ঠিকঠাক বুঝে নেবেন, নাতি বেশি দরদাম করতে চাইলে হাঁকিয়েও দিতে পারেন, কিন্তু সেটা অপ্রাসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক এই সত্যটুকুই যে, কে খাবার জোগাচ্ছে সেটা এই ক্রেতার অজানা নয়। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, বাজারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা ক্রমশই পাল্টে যাচ্ছে। সব রকমের পণ্য ক্রমশই আমাদের সামনে নিরালম্ব এবং নিঃসঙ্গ মূর্তিতে নিজেকে পেশ করছে। যে-কোনও শপিং মল-এ গিয়ে দাঁড়ালেই মূর্তিগুলি থরে থরে উদ্ভাসিত হয়। আনাজ-মাসি দূরস্থান, প্রায়শই তাদের কোনও বিক্রেতা নেই, আছে কেবল স্টিকারে লেখা দামের অঙ্ক আর পণ্যের খাদ্যগুণ ইত্যাদির বিবরণ, যেন-বা তাদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। শুধু কি তা-ই? উন্নততর দেশের পাড়ার দোকানেও এখন নানান তাক থেকে দরকারি জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ক্রেতা নিজেই ডিজিটাল যন্ত্রকে বারকোড পড়িয়ে নেন এবং তার পরে কার্ড ছুঁইয়ে দাম মিটিয়ে সওদা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। অর্থাৎ, পণ্যময় ভুবনে ক্রেতাই একমাত্র মানুষ! তবু বাঁচোয়া, আমাদের যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠতে এখনও অনেকটা বাকি, তত দিন অন্তত মাছের বাজারে হই-হট্টগোল চলবে, ফুটপাথ জোড়া পোশাকের দরদাম নিয়ে ক্রেতা আর বিক্রেতার অনন্ত কথোপকথনও থামবে না।

কিন্তু বাজারের ও-পারে যে উৎপাদনের ভুবন, যেখানে খাবারদাবার থেকে পোশাক-আসাক, গয়নাগাঁটি থেকে চেয়ার-টেবিল, সব কিছু তৈরি হয়, সেটি সাধারণ ভাবে অনেক দিনই ক্রেতার দৃষ্টি ও চেতনার একেবারে বাইরে। যে-কোনও পণ্যেই নিহিত থাকে শ্রমিকের শ্রমশক্তি, কিন্তু পণ্যের উপভোক্তা তা দেখেন না, যেমন পোশাকের ক্রেতা দেখেন পোশাকের নকশা, তার রং, তার কাপড়ের টেক্সচার, দেখেন তার ব্র্যান্ড এবং, অবশ্যই, তার দাম। যে শ্রমিকরা নিজের হাতে কিংবা কারখানার যন্ত্রে কাপড় বুনেছেন, পোশাক বানিয়েছেন, রং করেছেন, নকশা কেটেছেন, তাঁরা পণ্যের বিপণিতে সম্পূর্ণ অ-দৃশ্য। এ এক সর্বময় অন্তর্ধান রহস্য। শ্রমশক্তির অন্তর্ধান। শ্রমজীবীর অন্তর্ধান। আমাদের ওই পোশাক বিপণির পরিচালকরা সেই অন্তর্হিত বাস্তবটিকেই উপভোক্তার চোখের সামনে আনতে চেয়েছেন। বাস্তব অন্তর্হিত না হলে তাকে চেষ্টাচরিত্র করে চোখের সামনে আনার দরকার হত না, পয়সা খরচ করে প্রচার-চিত্র বানাতে হত না। বস্তুত, শ্রমজীবী মেয়েদের কাজ করার ওই দৃশ্যগুলিই খেয়াল করিয়ে দেয়, তাঁরা কেবল আমাদের চোখের আড়ালে কাজ করেন না, কাজ করেন আমাদের মনের আড়ালে। সেই আড়াল সরিয়ে তাঁদের সামনে আনা হলে দর্শকরা আনন্দ পান। সংযোগের আনন্দ।

কেন? কী আছে এই আনন্দের পিছনে? এ-প্রশ্নের কোনও নিশ্চিত উত্তর জানা নেই। সেটা স্বাভাবিক, কারণ এর নিশ্চিত উত্তর হয় না। একটা স্তরে কেউ খুব সহজেই এ-সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বলতে পারেন, দৃশ্যটা দেখতে ভাল, এত রং, এত নকশা, তাই মানুষ আনন্দ পান, তার সঙ্গে হয়তো এক ধরনের পরিতৃপ্তির বোধও হয় তাঁদের যে, পোশাক কিনতে যে টাকা তাঁরা খরচ করছেন তার থেকেই ওই শ্রমজীবী মেয়েদের আয় হচ্ছে। অর্থাৎ, ঠিক যে উদ্দেশ্যে এই প্রচার-চিত্রটি তৈরি

করা হয়েছে, সেটাই ক্রেতাদের অনুভূতিতে চরিতার্থ হচ্ছে। হতেই পারে। তবে কিনা, এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা কিংবা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ দেখি না। এমনও তো হতে পারে যে, পণ্যসর্বস্ব দুনিয়ায় ক্রেতাসর্বস্ব জীবন যাপন করতে করতে আমাদের মনের গভীরে একটা বিচ্ছেদের বোধ কাজ করে, এমনিতে আমরা তার খেয়াল রাখি না, কিন্তু মাঝে মাঝেই কোনও না কোনও উপলক্ষে বা অনুষঙ্গে সেই অন্তর্গত বোধের তন্ত্রীতে টান পড়ে, তখন আমরা বিচ্ছেদটাকে উপলব্ধি করি। শ্রমজীবনের মধ্য দিয়ে একে অপরের সঙ্গে যে সংযোগ এক দিন ছিল, আজ তা বেবাক হারিয়ে গেছে, এই উপলব্ধি থেকে এক ধরনের বেদনা জেগে ওঠে, যাকে আমরা পুরোপুরি বুঝতেও পারি না, কিন্তু আমাদের পোশাক তৈরির জন্য শ্রমিক মেয়েদের কাজ করার দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে তার আভাস পাই। তখন হয়তো-বা আমাদের কারও কারও অন্দরে অন্তরে আর্তিময় প্রশ্ন ওঠে: 'তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার'। তখন নদীর জলে কান পেতে থাকলে পাতার মর্মরে সে-প্রাণ কাঁপে। তখন মনে হয়, ফুলের ভাষা যদি বুঝি, তা হলে সেই ফেলে আসা পরশমানিক খুঁজে পাব আবার। তখন খেয়াল হয়, কেবলই নিজের চার পাশে ঘুরতে ঘুরতে যে আত্মময় চেতনার দাস হয়ে পড়েছি আমরা, তার ঠিক নীচেই নীরবে অপেক্ষা করে থাকে এক গভীর নৈরাশ্যের অন্ধকার, যা সেই চেতনাকে যে-কোনও সময় অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী আশিস নন্দীর 'রেজিমস অব নার্সিসিজ়ম' এবং 'রেজিমস অব ডেসপেয়ার'-কে স্মরণ করে বলতে পারি, আমরা একই সঙ্গে আত্মমগ্ন এবং আশাহত। অনন্ত এবং অবিরত প্রসরণশীল পণ্য-রতি দিয়ে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিকে ক্রমাগত ঢেকে রাখি, কিন্তু মাঝে মাঝেই সেই অনুভূতি মাথা তোলে, নাড়া দেয়, বেদনাও দেয়।

তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এইখানে এসে জারি করা দরকার সতর্কবাণী: অতীতবিলাস হইতে সাবধান! তা না হলে চোখে ফেলে-আসা দিনের ঘোর লেগে যেতে পারে, মনে হতেই পারে যে, আগে কেমন সুখে দিন কাটাইতাম— শ্রমজীবী আর উপভোক্তাদের মধ্যে তখন মানবিক সংযোগ ছিল, চাষি তাঁতি কামার কুমোর থেকে শুরু করে চিনিবাস ময়রা অবধি সবাই আমাদের কাছের মানুষ ছিল, আজ আমরা তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আমাদের সংযোগ কেবল পণ্যের সঙ্গে, যে সংযোগ হৃদয়হীন, অ-মানবিক— তাই, আগের মতো সুখ নাই। এ-ঘোর ভাঙাতে স্মরণ করা দরকার— অতীতের যে সংযোগ আমাদের স্মৃতিকাতর করে, তার পরতে পরতে ছিল বৈষম্য আর আধিপত্যের লীলা, মোটেই মানবিক বলা যায় না তাকে। এমনকি, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্কের বহিরঙ্গ মানবিকতায় টইটম্বুর, সেখানেও ওই বহিরঙ্গে একটু আঁচড় দিলেই অন্য ছবি বেরিয়ে আসে, সে ছবি স্বস্তিদায়ক নয়। যেমন ধরা যাক ছোটবেলার মুড়ি-বৌয়ের কথা। বাড়ির বড়রা ওই নামেই ডাকতেন তাঁকে, সুতরাং ওই নামেই তাঁকে চিনতাম। মাসে বারদুয়েক আসতেন মুড়ি নিয়ে। মাঝবয়সি, রোগা চেহারা, শীর্ণ পিঠে মুড়ির বস্তাটি আরও বিশাল দেখাত। বারান্দায় সেই বস্তা রেখে বসতেন কিছুক্ষণ, গল্প করতেন একটু, এক কাপ চা-ও আসত তাঁর জন্য, লেনদেন সেরে পিঠে বস্তাটি ফেলে চলে যেতেন। মুখটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে, আরও বেশি মনে আছে এই কথাটা যে, কোনও বার কোনও কারণে তিনি সময়মতো না এলে বাড়িতে একটা হালকা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখতাম— 'কী হল মুড়ি-বৌয়ের, কিছু বিপদ-আপদ হল না তো, এমন তো করে না!' সেই দুশ্চিন্তার শরিক হতাম, এমন দাবি করতে পারব না, কিন্তু মনটা একটু উতলা থাকত। কারণ, তাঁর নিয়ে-আসা গল্পগুলো কান খাড়া করে শুনতে বড় ভাল লাগত। নেহাতই সাংসারিক গল্প, এ-পাড়ার ও-পাড়ার নানা বৃত্তান্ত, মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর নেমে যেত। কারণ, পাশে ছোট ছেলে বসে আছে, আর তাতেই ছোট ছেলের রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ় আরও জমজমাট। গভীর সংযোগ বই কী। কিন্তু সেই অনেক দূরের গ্রামে নিয়মিত বস্তা বস্তা মুড়ি ভেজে দীর্ঘ মেঠো পথ পার হয়ে প্রচণ্ড ভিড় বাসে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এক-এক দিন এক-এক পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গ্রাসাচ্ছাদনের যে জীবনযাপন, তার যন্ত্রণাকে কি এক কাপ চা আর ঘরোয়া গল্পের আত্মীয়তা দিয়ে এতটুকু আড়াল করা যায়? সোজা কথা সাফ সাফ বলা দরকার— শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আমাদের যেখানে যেটুকু সংযোগ ছিল বা আছে, তার ভিত্তিতে সমতার কোনও প্রশ্ন আগেও ছিল না, এখনও নেই, অসম ক্ষমতার কাঠামোয় সমতার সংযোগ তৈরি হতে পারে না। তাই সে-কালের সংযোগ নিয়ে রোম্যান্টিক হওয়ার কিছুমাত্র কারণ দেখি না।

সেজে উঠছে সুপারমার্কেটের শস্যভান্ডার

কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মানতেই হবে যে, সংযোগটা মিথ্যে ছিল না। দিনানুদৈনিক জীবনে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এমন অনেক মানুষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল, যাঁরা তাঁদের শ্রম দিয়ে আমাদের নানা প্রয়োজন মেটাতেন, পণ্যের আকারে, পরিষেবার আকারে, যে পণ্য বা পরিষেবা তাঁরা সরাসরি উৎপাদন করতেন অথবা বিক্রেতা হিসেবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এই যোগাযোগ বহুলাংশে হারিয়ে গেছে, সেই দিক থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে হা-হুতাশ অর্থহীন, কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারি না।

এখান থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, পুরনো সংযোগের বদলে নতুন সংযোগ তৈরি হচ্ছে না কি? যদি ওই পোশাক বিপণির প্রচার-চিত্রটিতে ফিরে যাই, তা হলে তো আমরা বলতেই পারি যে, ওই ছবিটির মধ্যে দিয়েই অনেক দূরের কারিগর মেয়েদের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে, এবং প্রযুক্তি আর বাণিজ্যের কল্যাণে সেই সম্পর্কের পরিধিতে শামিল হচ্ছেন অগণন মানুষ, যাঁরা দেশের ও দুনিয়ার নানা প্রান্তে বসে ওই শ্রমিকদের দেখছেন, তাঁদের কাজের ধরন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। একে সংযোগ বলব না কেন? যদি বলা হয় এটা একতরফা সংযোগ, তা হলে পাল্টা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েই তো এই সংযোগকে দ্বিমুখী করে তোলা যায়, নানা ধরনের 'ইন্টারঅ্যাক্টিভ' যোগাযোগের উদ্যোগ তো অহরহ চলছে, তেমন ব্যবস্থায় ক্রেতারা ওই শ্রমজীবীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন, তাঁদের কথা শুনতে পারেন। নানা পরিসরে তেমন নানা উদ্যোগ হচ্ছেও।

বিচ্ছিন্নতার সমস্যার এই 'সমাধান' নিয়ে আপত্তি করার কিছু নেই, কিন্তু সেই সমাধান কতটুকু সম্ভব? প্রযুক্তি তার উপায় করে দিতে পারে, কিন্তু অর্থনীতি সেই উপায় কাজে লাগাবে কেন? সংযোগটাকে একতরফা রাখলেই তো বাজারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়— প্রচারের উদ্দেশ্য, প্রচারের মধ্য দিয়ে দর্শক তথা ক্রেতা তথা উপভোক্তার দৃষ্টি এবং মন কাড়ার উদ্দেশ্য। ওই শ্রমিক মেয়েরা তো দৃশ্য হিসেবেই উপযোগী, তার বাইরে তাঁদের কোনও ভূমিকা এই বাজারে থাকবে কেন? এই সূত্রটিকে

উপভোক্তাদের সঙ্গে মানবিক নৈকট্যটুকুও আর নেই নিঃসঙ্গ শ্রমজীবীর

অনুসরণ করেই পৌঁছে যেতে পারি গভীরতর একটি প্রশ্নে। বাজার এবং প্রযুক্তির যৌথ ক্রিয়ায় আমাদের সংযোগের ধারণাটিই কি পাল্টে যাচ্ছে না? উজ্জ্বল পর্দায় কর্মরত মেয়েদের ঝকঝকে ছবি দেখেই আমরা নিজেদের জনসংযোগ সম্পন্ন হয়েছে বলে বিশ্বাস করছি না তো? ঠিক যে ভাবে সমাজমাধ্যমের 'ফ্রেন্ড লিস্ট' আমাদের অনেকের চেতনায় বন্ধুত্বের স্থান করে নিয়েছে? এই সম্ভাবনা যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে নদীর জলে কান পেতে থাকার প্রয়োজনটাই ফুরিয়েছে, প্রযুক্তি-বাহিত নানা মাধ্যমের দর্শক এবং শ্রোতা হিসেবেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের স্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। একে দুধের স্বাদ পিটুলিগোলায় মেটানো বলে কটাক্ষ করলে তার জবাবে আমরা হয়তো বলব: পিটুলিগোলাই হল প্রকৃত পানীয়, দুধটাই বিষ। হয়তো-বা নির্মম ঔদাসীন্যে জানিয়ে দেব, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের প্রয়োজনই আমরা বোধ করি না।

কয়েক বছর আগে এক ঘরোয়া আলোচনাসভায় এই কথাটিই জানিয়েছিলেন এক তরুণী। আমাদের সামাজিক জীবন কী ভাবে পাল্টে যাচ্ছে, তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পাড়ার বাজারের সঙ্গে শপিং মলের তুলনা করে বলেছিলাম, পুরনো বাজারের সেই দৈনন্দিন আত্মীয়তা এই নতুন দুনিয়ায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না, সেটা ভাল-খারাপের ব্যাপার নয়, কিন্তু পুরনো ব্যাপারটা মিস করি। শুনে সেই মেয়েটি খুব সহজ করে এবং খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, "কিন্তু আমি তো মিস করি না, আমার কাছে তো ওই আত্মীয়তার কোনও মানে নেই। কারণ, আমি গোড়া থেকেই শপিং মলে কেনাকাটা করি।" কথাটা ভাবিয়েছিল, এখনও ভাবায়। সত্যিই তো, যাকে সংযোগ বলছি তার কোনও ধারণাই যদি কারও না থাকে, তা হলে সে ওই সংযোগ হারিয়ে যাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? আমার কাছে তার এই 'অনুভূতি-হীনতা' পীড়াদায়ক হতে পারে, এমনকি মানবিকতার একটা অসম্পূর্ণতা বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু সেটা তো নিতান্তই একপেশে একটা ধারণা, আমার জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে যে ধারণার জন্ম, যাঁর অভিজ্ঞতা অন্য রকম, তিনি সেই ধারণার শরিক হবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক। তবে কি সংযোগ আর বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এই চিন্তাগুলো নেহাতই একটা বিশেষ যুগের চিন্তা? যুগ যত পাল্টাবে, চিন্তাগুলোও ক্রমশ হারিয়ে যাবে? হতেই পারে।

তবু, অতীতবিলাস সম্পর্কিত সতর্কীকরণের কথা মনে রেখেও, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ হারিয়ে ফেলা বিষয়ক রোম্যান্টিক আক্ষেপের চৌকাঠ না মাড়িয়েও, বিচ্ছিন্নতার এই বাস্তবকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে মেনে যায় না, একটা খটকা থেকেই যায়। খটকাটা ওই বিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন নিয়ে, সেই জীবনের সার্থকতা নিয়ে, তার সৃষ্টিশীলতা নিয়ে। আমরা যত পণ্যসর্বস্ব অস্তিত্বের মধ্যে নিজেদের সঁপে দিচ্ছি, পণ্যের উৎপাদক এবং বিক্রেতার সঙ্গে তার উপভোক্তা ও ক্রেতার সম্পর্ক যত দূরবর্তী হচ্ছে, আমাদের চিন্তাভাবনার দৈন্য কি ততই প্রকট হয়ে উঠছে না? আমাদের কল্পনাশক্তি কি ততই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে না? এই আশঙ্কার নানা কারণ প্রতিনিয়ত প্রকট হয়ে উঠছে। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, এক কথায় সংস্কৃতির ভুবনে যে দৈন্য এবং জড়তা নিয়ে ইদানীং আমাদের এত হা-হুতাশ, তার পিছনে এই বিচ্ছিন্নতাই কি বহুলাংশে দায়ী নয়? বেশ কয়েক বছর আগে প্রখর রাজনীতি-সচেতন এক প্রবীণ অভিনেতা, নাট্যকার তথা কবি কথোপকথনের সূত্রে বলেছিলেন, "আমাদের ভাষা দুর্বল হয়ে গেছে বলে এত আক্ষেপ শুনি; আচ্ছা, কেন দুর্বল হবে না বলো তো? যাঁরা ভাষা নিয়ে কাজ করেন, সাহিত্যিক বলো, সাংবাদিক বলো, তাঁদের সঙ্গে কাজের জগতের যোগ কতটুকু? শ্রম ছাড়া ভাষা এগোতে পারে কি? কাজের দুনিয়া থেকে যদি দূরে থাকি, কী নিয়ে কথা বলব আমরা? ওই তো সকালে 'ব্রেকফাস্টে আজ কী আছে' আর রাত্রে 'ডিনার করবে তো' গোছের কথাই সার, বাকিটা মোবাইল কিংবা টেলিভিশনের সামনে। ভাষার অ্যানিমিয়া রুখবে কার সাধ্য?" এই অভিমত নিয়ে তর্ক বিস্তর হতে পারে, কিন্তু মূল সঙ্কটটি সম্ভবত তিনি একেবারে মোক্ষম ধরেছিলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্কট কেবল ভাষার নয়, সঙ্কট আমাদের সামাজিক জীবনের। তার সুরাহা করতে চাইলে মানুষের সঙ্গে মানুষের, উপভোক্তার সঙ্গে উৎপাদকের, শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের সঙ্গে সেই শ্রমের ফসল যাঁরা ভোগ করেন তাঁদের যথার্থ সংযোগ তৈরি করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ আছে বলে মনে হয় না। কী ভাবে তা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হোক। সমাজমাধ্যমের তরজা নয়, যথার্থ সামাজিক আলোচনা।
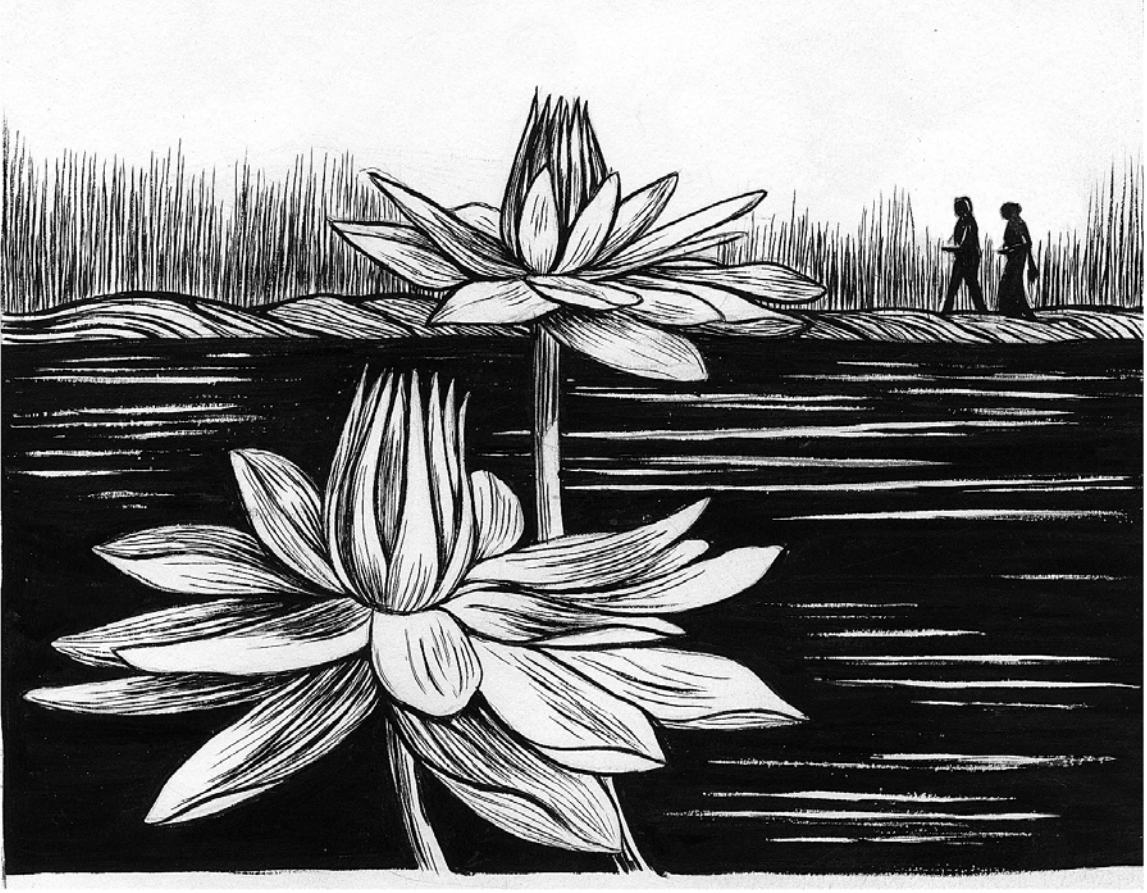
শালুক ফুল

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সকালে যা মেঘ করেছিল, মনে হচ্ছিল বৃষ্টি হবেই। হয়নি। এখন বেলা দশটা। রোগী দেখছি হাসপাতালের আউটডোরে। লাইন কতটা বাড়ল দেখার জন্য চোখ তুললাম। দৃষ্টি থমকে গেল। লাইনের একদম শেষের দিকে একটি বৌকে ভীষণ চেনা চেনা লাগছে! পুরোটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। অন্যান্য পেশেন্টের আড়ালে পড়ে গেছে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে যে পেশেন্টকে দেখছিলাম, তার সঙ্গে কথা বলতে থাকি। হাসপাতালটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামকৃষ্ণপুরে। ডাক্তারি পাশ করে এখানেই আমার প্রথম পোস্টিং। গঞ্জ এলাকা। গ্রামাঞ্চলে পোস্টিং পেয়ে মনটা প্রথমে খারাপ হয়েছিল। মা বলেছিল, “এইবেলা বিয়েটা সেরে নে। বৌকে নিয়ে ওখানে থাক। নয়তো একা লাগবে।”...এখনই বিয়ের কোনও ইচ্ছে নেই আমার। এখানে এসে একাও লাগেনি। আশপাশের প্রকৃতি, মানুষজনকে বেশ ভাল লেগে গেছে। হাসপাতাল থেকে দেওয়া যে কোয়ার্টারটায় থাকি, পিছনেই বিশাল একটা দিঘি। ফুটে থাকে পদ্ম, শালুক। মাছরাঙা, বক ছোঁ মারে দিঘিতে। সামান্য জোর হাওয়ায় ঢেউ খেলে দিঘির জলে। ওই দিকে তাকিয়ে ব্যাচেলর জীবনের একাকিত্ব অনেকটা ভরাট যায়। ঘুম থেকে উঠে আজ সকালে ওই দিঘির ওপরেই মেঘ দেখেছিলাম ঘন। এখান থেকে পাঁচ-ছ'কিলোমিটার গেলেই সুন্দরবন।

হাসপাতালের চারপাশে এক-ফসলি গরিব গ্রাম। এখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ডাক্তার প্রায় পাওয়াই যায় না। সরকারি হাসপাতালটার ওপরেই সকলে নির্ভরশীল। আর এখন তো শুধু মনোরোগ নয়, আমাকে সব রকম পেশেন্টই দেখতে হয়। এখন আমি জেনারেল ফিজ়িশিয়ান। তাই আউটডোরে ভিড় হয় বেশি। আজও হয়েছে। যে বৌটিকে ভীষণ চেনা লাগল আমার, তার কিন্তু এই ভিড়ে থাকার কথা নয়। সে ছিল খোদ কলকাতার বাসিন্দা। বৌটির সঙ্গে আমার কলকাতার হাসপাতালে দেখা হয়েছিল।

সামনের রোগীটিকে হাসপাতাল থেকে দেওয়া টিকিটের কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলাম। কখন কোন ওষুধ খেতে হবে বলে দিলাম। রোগীটি চলে গেল। এল পরের পেশেন্ট। এই এলাকায় রোগ মোটামুটি কমন, গা-ব্যথা, সর্দিজ্বর, শ্বাসকষ্ট, পেটখারাপ। ইদানীং ব্লাড প্রেশার, শুগারের রোগী এক-দুটো দেখা দিচ্ছে। এদের চিকিৎসা করতে করতে দিব্যি অন্য কথা ভাবা যায়। যেমন, আমি এখন ভাবছি বৌটিকে নিয়ে। মহিলা আমাকে বড় বোকা বানিয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে আবার যেন কোথাও কখনও দেখা হয়। খুব করে কথা শোনাব। আবার এটাও মনে হয়েছিল, এত বড় দুনিয়ায় আর কি কখনও দেখা হবে? আশ্চর্য রকম সমাপতন ছাড়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

ফের পেশেন্ট দেখার মাঝে মুখ তুলি। না, কোনও ভুল হচ্ছে না। সেই মহিলাই। প্রায় তিন বছর পর দেখছি। তিন বছরে শরীর থেকে যতটা চাকচিক্য কমার কথা, তেমনটা কিন্তু কমেনি। সামান্য রোগা হয়েছে হয়তো। তার ফলেই তামাটে লাগছে গায়ের রং। মুখের আদল আগের চেয়েও শার্প, সুন্দর দেখাচ্ছে। শরীরের আঁকেবাঁকে আবেদন যেমন ছিল, তেমনই... কী যেন নাম বৌটির, দু'অক্ষরের। এখন আর মনে পড়ছে না।

বৌটি এখন চলল দেওয়াল ধারে রাখা বেঞ্চের দিকে। টানা তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। রেস্ট নিতে লাইনের লোকেরা ওই বেঞ্চে গিয়ে বসে। বৌটি মনে হচ্ছে একা এসেছে। একা গেল বসতে। লাইনের ভিড়ের কারণে আমাকে সম্ভবত এখনও দেখতে পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই লাইন ছেড়ে পালাবে। মুখোমুখি হতে চাইবে না। আবার এমনও হতে পারে, ভাববে আমি নির্ঘাত ওকে ভুলে গেছি। গত তিন বছরে কত পেশেন্ট দেখেছি, আলাদা করে কি কাউকে মনে রাখা সম্ভব? বৌটি যে ধরনের ধোঁকা দিয়েছিল আমাকে, তাতে অবশ্যই সম্ভব মনে রাখা। ধোঁকা দিয়েছিল ওর স্বামীকেও। যদি মুখোমুখি হয়, আমি কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। জবাব চাইব সেই ধোঁকাবাজির।

সামনের পেশেন্ট উঠে গেল। এল পরের পেশেন্ট, এক বৃদ্ধা। এর সঙ্গে বাড়ির লোক আছে। সম্ভবত বৃদ্ধার ছেলে। মায়ের হয়ে সে সিমটমগুলো বলছে।

মিলিও তার বরকে নিয়ে এসে সিমটমগুলো বলছিল। এই তো মনে পড়ল বৌটার নাম। বরের নাম সুদেব। ওদের সঙ্গে আর-এক জন ছিল। ওদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। নাহ্, তার নামটা মনে পড়ছে না। আমি তখন ডাক্তার হওয়ার শেষ পর্যায়ে। হাউস-স্টাফশিপ করছি নানা হাসপাতালে, বিভিন্ন বিভাগে। সে বার ছিলাম কলকাতার সরকারি মনোরোগ হাসপাতালে। এক দিন আউটডোরে রোগী দেখছি, এক মহিলা-সহ দু'জন পুরুষ এসেছিল। এক জন পুরুষ বাকি দু'জনের চেয়ে বয়সে খানিকটা বড়। তিন জনের চেহারায় নিম্নবিত্তের ছাপ। বড় জনকে ওদের মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক লাগছিল। বাকি দু'জনের মুখে উদ্বেগ। হাসপাতালের দেওয়া টিকিটে রোগীর নাম ছিল সুদেব দাস।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পেশেন্ট কে?"

বয়সে বড় লোকটা টেবিলের ও পারের চেয়ারে বসতে বসতে বলেছিল, "আমি। আমিই সুদেব দাস।"

অবাক হয়ে বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়েছিলাম। দু'জনেই মাথা নেড়ে সুদেবের কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। আমি তখন সুদেব দাসকে জিজ্ঞেস করি, "কী সমস্যা আপনার?"

"কোনও সমস্যাই নেই। এরা মনে করে আমি মানসিক রোগী। তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছে," বলেছিল সুদেব।

সাধারণত মেন্টাল পেশেন্টরা এমনটা বলে থাকে, তাই সুদেবের কথায় কান না দিয়ে বৌটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ওঁর সিমটমগুলো বলুন?"

"প্রচণ্ড সন্দেহবাতিক," বলেছিল বৌটি।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী ধরনের সন্দেহ? সব ব্যাপারে সকলকেই সন্দেহ করেন কি?"

"না, শুধু আমাকে সন্দেহ করে। আমার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ," বলেছিল সুদেবের স্ত্রী।

অপাঙ্গে এক বার দেখেছিলাম বৌটিকে, চেহারায় বেশ একটা চটক আছে। বাতিকগ্রস্তদের জন্য এই সৌন্দর্যটুকু যথেষ্ট। এর পর যে প্রশ্নটা আমরা করে থাকি সেটাই করেছিলাম সুদেব দাসকে, "আপনি কী করেন? আর্থিক অবস্থা কেমন আপনার?"

সুদেব চুপ করেছিল। টাকাপয়সার অবস্থাটা আমরা প্রথমেই জেনে নিই। হঠাৎ আর্থিক অনটন অনেক মনোরোগের উৎস।

সুদেব উত্তর দিচ্ছে না দেখে বৌটি বলেছিল, "ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। এই লাইনে নাম আছে। টাকাপয়সা যা আয় হয়, চলে যায়। দুটো তো পেট। বাচ্চাকাচ্চা এখনও আসেনি আমাদের।"

সুদেব বলে উঠেছিল, "আসেনি নয়, আসতে দেয়নি ও। বাচ্চা হলেই শরীর ভাঙবে, 'মিলি, মিলি বৌদি' বলে ছুটে আসবে না পাড়ার ছেলেছোকরা, আধদামড়ারা। বাচ্চা সমেত ওকে কেউ বিয়েও করতে চাইবে না।"

কথা শুনে আমি আন্দাজ করতে পারলাম সুদেব সত্যিই রোগী। সন্দেহ মাত্রাছাড়া না হলে এই কথাগুলো বলা যায় না সর্বসমক্ষে।

এর পর আমি চলে গিয়েছিলাম সুদেবের শারীরিক অবস্থা জানতে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "রাত্তিরে ঘুমটুম হয়? খিদে আছে শরীরে?"

সুদেবের বদলে মিলি উত্তর দিতে থাকল, "না না, রাত্তিরে প্রায় ঘুমোয়ই না। নিজের মনে বকবক করে, কথায় কান পেতে বুঝতে পারি, ঘুরে-ফিরে আমাকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। আমাকে বিয়ে করা নাকি বিরাট ভুল হয়েছে তার। খিদে একদম কমে গেছে। খাবারে আমি বিষ মেশাচ্ছি, এমন সন্দেহও করে। হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ রেগে ওঠে। মারধর করতে আসে।"

"মেরেছে কি এখনও পর্যন্ত?" জানতে চেয়েছিলাম।

মিলি বলেছিল, "আমাকে মারেনি। ক'দিন আগে পাড়ার এক জনকে মেরে দিয়েছে।"

"কারণ?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে বৌটি বলেছিল, "ছেলেটার নাম হাবুল। ওর বাবার বড় বিজ়নেস আছে। রাস্তাঘাটে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যেচে গল্প করতে আসে। আমিও যতটা পারি অল্প কথা বলে এড়িয়ে যাই। পুরোপুরি এড়াতে পারি না, পাড়ায় বেশ হাঁকডাক আছে ওর। দিন চারেক আগে তেমনই হাবুল আমার সঙ্গে কথা বলছে রাস্তায়, কোথা থেকে ও চলে এল। আড়াল থেকে লক্ষ রাখছিল হয়তো। আমাকে ধমকে বাড়ি যেতে বলল আর হাবুলের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, 'আমার বৌয়ের সঙ্গে তোর এত কথা কিসের রে ভাই!' ...আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। ভয়ে ভয়ে আছি, ঝগড়া কত দূর গড়াবে, কে জানে! হাবুলকে মারধর না করে বসে। আমার আন্দাজই ঠিক হল। পাড়ার একটা ছোট ছেলে এসে খোঁজ দিল, সুদেব মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে হাবুলের। পুলিশ এসে তুলে নিয়ে গেছে তাকে।"

"হাবুল আমায় কী বলেছিল, সেটা বলো!" বৌয়ের কথা কেটে বলে উঠেছিল সুদেব দাস।

মিলি চুপ করে আছে। আমি সুদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী বলেছিল হাবুল?"

"বলেছিল, তোমার বৌ কেন কথা বলে আমার সঙ্গে? নিশ্চয়ই খিদে আছে তার। তুমি মেটাতে পারছ না," বলে সুদেব প্রশ্ন করেছিল, "আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, এর পর কি কারও মাথা ঠান্ডা থাকতে পারে?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি মিলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তার পর কী হল? আপনি থানায় গেলেন?"

"আমি একা নই, পল্লব ছিল সঙ্গে," বলে ওদের সঙ্গে আসা ছেলেটার দিকে তাকাল মিলি। অর্থাৎ ছেলেটির নাম পল্লব। আমি

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আপনি কী করেন? মানে আপনার পেশা?”

পল্লব বলেছিল সে-ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। কাজ শিখেছে সুদেবের থেকেই। থাকে এক পাড়াতে। একই সঙ্গে পল্লব বলে যাচ্ছিল, “যত দিন যাচ্ছে বৌদির প্রতি সন্দেহ বাড়ছে সুদেবদার। কাজে মন নেই। রোজগার কমছে, সংসারে টানাটানি...”

বৌটি বলে উঠেছিল, “সংসারে টানাটানি নিয়ে ততটা ভাবছি না। আমি না হয় ছোটখাটো কিছু রোজগারের চেষ্টা করব। কিন্তু বাইরের লোকজনকে এ রকম মারধর করতে গেলে তো মুশকিল। আমরা যখন থানায় পৌঁছই, দেখি, পুলিশের হাতে ভালই মার খাচ্ছে ও। পায়ে পড়ে গেলাম বড়বাবুর। বললাম, ওর মাথার ঠিক নেই। ওকে এ ভাবে মারবেন না।... বড়বাবু কিছু একটা বুঝলেন। কনেস্টবলকে মারতে বারণ করে আমাকে বললেন, ‘তুমি একে সরকারি মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে যাও। আউটডোরে দেখাও। ডাক্তার যদি বলে একে হসপিটালে রেখে চিকিৎসা করতে হবে, তাতে রাজি হয়ে যাবে। ওরা তখন ওখানে ভর্তির জন্য কোর্টের সুপারিশ চাইবে। আমি ব্যবস্থা করে দেব।’”

কথা শেষ করে বৌটি জানতে চেয়েছিল, “আপনার কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু, এখানে রাখতে হবে?”

তখনই কোনও উত্তর দিইনি। এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আরও কিছু পরীক্ষা বাকি। সুদেব দাসের ক্লিনিকাল টেস্ট শুরু করলাম। প্রেশার মাপার ব্যান্ড বাঁধলাম হাতে। সুদেব দাস বলতে থাকল, “ডাক্তারবাবু, এত ক্ষণ আপনি ওদের কথা শুনলেন। মানে এক পক্ষ। আমার কথাও আপনার শোনা উচিত। নয়তো চিকিৎসায় ভুল থেকে যাবে।”

প্রেশার একটু উপরের দিকে। সুদেবের চোখ টেনে টর্চ মেরে বলেছিলাম, “বলুন, আপনার কথা বলুন।”

বলতে থাকল সে, “বিয়ের আগে মিলির কোনও একটা সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে ফোন আসে তার। মিলি তখনই আমার সামনে থেকে সরে যায়। ওই ফোনে এত আস্তে কথা বলে, আপনি এক হাত দূর থেকেও কিছু শুনতে পাবেন না।”

“যত সব বাজে কথা। ফোনে আমি সবার সঙ্গেই আস্তে কথা বলি। কী দরকার চেঁচানোর, ও পারের লোক যখন সব শুনতেই পাচ্ছে,” বলেছিল মিলি।

বৌয়ের কথা কানে নিল না সুদেব। বলে যাচ্ছিল, “একটু চকচকে লোক দেখলেই মিলির হাবভাব সব পাল্টে যায়। আদুরে গলায় কথা বলা, শরীর দুলিয়ে হাঁটা... এখন আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। আমাকে পাগল প্রমাণ করতে এসেছে তো, তাই একেবারে সাধু সেজে আছে। আপনার সঙ্গে কখনও একা দেখা হলে বুঝতে পারবেন।”

কথা শুনতে শুনতে হ্যামার দিয়ে শরীরের জয়েন্টগুলোতে টোকা মেরে বুঝে নিলাম সুদেবের নার্ভের রিফ্লেক্স। তার পর দু’হাত সামনের দিকে সোজা করে রাখতে বললাম। কাঁপছিল হাত দুটো। সব মিলিয়ে যা বুঝলাম অ্যাংজাইটি লেভেল কমাতে হবে। ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে আছে পেশেন্ট।

হাসপাতালের টিকিটে প্রেসক্রিপশন লিখতে থাকলাম। একই সঙ্গে সুদেবকে বললাম, “আপনি যে মানসিক ভাবে অসুস্থ তা নিজেও জানেন। তাই তো সুস্থ হতে এসেছেন আমার কাছে। এটা ভাল লক্ষণ। আশা করি ওষুধগুলো খেলে এবং একটা শ্বাসের ব্যায়াম দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা নিয়মিত করলে আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন।”

“আমি পুরোপুরি সুস্থ। আপনার কাছে এসেছি পুলিশের ভয়ে। বেধড়ক মেরেছিল আমাকে। বড়বাবুর নেক্সট প্ল্যানটাও আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমাকে পাগল প্রমাণ করে হয় আপনার এখানে, নয়তো অন্য কোনও পাগলাগারদে চালান করে দেবে। তার পর আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবে মিলির সঙ্গে দেখা করতে। চোখে চোখে মিলির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে বড়বাবুর। থানায় বসে আমি সব খেয়াল করেছি।”

“তার মানে যা বোঝা যাচ্ছে, আপনি আমার চিকিৎসা নেবেন না। খাবেন না ওষুধগুলো,” বলেছিলাম আমি।

উত্তরে সুদেব বলল, “না, আপনার ওষুধ আমি খাব। ব্যায়ামও করব। তাতে যদি মিলির চরিত্র ভাল হয়, সে তো আমারই লাভ।”

অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে ছিলাম। মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত রোগীকে নিয়ে উপহাস করতে নেই। শ্বাসের ব্যায়ামটা দেখালাম সুদেবকে। প্রেসক্রিপশন লেখা টিকিটটা নিয়ে মিলি দাসকে দিলাম। বললাম, “ওষুধের সঙ্গে কিছু প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট দিয়েছি। রিপোর্ট নিয়ে পনেরো দিন পরে আসুন।”

তিন জনই আমাকে নমস্কার জানিয়ে চলে গিয়েছিল। পনেরো দিন হয়তো কাটেনি। তেরো-চোদ্দো দিনের মাথায় সুদেব দাস এল, একা। আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “বাড়ির লোক কেউ আসেনি?”

কোনও উত্তর এল না। হাত নির্দেশ করে টেবিলের ও পারের চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কেমন আছেন এখন? রিপোর্টগুলো এনেছেন?”

এ বারও কোনও উত্তর নেই। কাঁধের ঝোলাব্যাগ থেকে সে দিনের টিকিট, প্যাথোলজিকাল রিপোর্টের কাগজ আর বেশ ক’টা ট্যাবলেট ভর্তি স্ট্রিপ বের করে টেবিলে রেখেছিল সুদেব দাস। তার পর বলতে থাকে, “আপনি তো বলেছিলেন আমি অসুস্থ। বৌকে সন্দেহ করাটা আমার রোগ। কিন্তু সে তো পালাল।”

বেশ থতমত খেয়েছিলাম আমি। বুঝতে পারছি কে পালিয়েছে। জানতে চেয়েছিলাম, “কার সঙ্গে পালাল, কবে?”

“আগের বার যে ছেলেটা আমাদের সঙ্গে এসেছিল, পল্লব। ওর সঙ্গেই পালিয়েছে।”

সুদেবের কথা শুনে চুপ করেছিলাম। বাড়িতে আমার বিয়ে নিয়ে তখন কথা ওঠা শুরু হয়েছে, বিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আমি সেই মুহূর্তে বেশ সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। সুদেব দাসকে কী বলব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফের সুদেবই বলতে শুরু করল, “আপনি এখন বলুন, আপনার দেওয়া ওষুধগুলো আমি আর খাব কি না?”

উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি। সুদেব বলে যাচ্ছিল, “সম্পূর্ণ ভুল চিকিৎসা করছিলেন আপনি। জানি না ঘুষ দিয়ে ডাক্তারি পাশ করেছেন কি না। তবে আপনি বেশি দিন চিকিৎসা করতে পারবেন না। ঠিক ধরা পড়ে যাবেন। জেলের ঘানি আপনাকে টানতেই হবে।”

বলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল সুদেব দাস। ওষুধ, রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশন টেবিলে রেখেই চলে গেল। আমি সেই মুহূর্ত থেকে চাইতে শুরু করি, মিলির সঙ্গে এক বার অন্তত দেখা হোক আমার।

পেশেন্ট দেখতে দেখতে আবার চোখ তুললাম। থতমত খেলাম বেশ। দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি, চার জন রোগীর পরেই মিলি। সে ঠায় আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চিনতে পেরেছে কি? মনে হচ্ছে পারেনি। চোখাচোখি হল, অথচ পরিচিতের হাসি হাসল না। চিনলে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকত না লাইনে। কখন লাইন হঠাৎ এত ছোট হয়ে গেল? কত রোগী দেখলাম রে বাবা!

চারটে পেশেন্ট দেখার পর চেয়ারে এসে বসল সুদেব দাসের বৌ। ওর পরে আরও তিনটে পেশেন্ট। মহিলা এগিয়ে দিল টিকিট। না, আমার একটুও ভুল হয়নি। টিকিটে নাম লেখা মিলি দাস। অপরিচিতের দৃষ্টি নিয়ে মিলি বলল, “ডাক্তারবাবু, চার-পাঁচদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর। খিদে নেই। গা পিঠে ব্যথা।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আমি প্রথমে ওর কব্জি ধরে নাড়ি দেখলাম। বেশ চঞ্চল। জিভ দেখলাম। তার পর স্টেথোস্কোপ ওর পিঠে লাগিয়ে শ্বাস নিতে বললাম। না, বিশেষ কোনও সমস্যা নেই। বুকে সামান্য সর্দি জমেছে। চেয়ারে ফিরে এসে ওর টিকিটে ওষুধ লিখতে লিখতে বললাম, “ঠান্ডা লেগে এমনটা হয়েছে। সাত দিনের ওষুধ লিখলাম। আশা করি ভাল হয়ে যাবেন। আর জোর করে হলেও খাওয়া-দাওয়াটা করবেন। নয়তো দুর্বলতা কাটবে না।”

কথা শেষ করে টিকিটের কাগজটা বাড়িয়ে ধরে বললাম, “আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন?”

ঘাড় হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝাল মিলি দাস। আমি অবাক। বৌটার বেশ মনের জোর আছে বলতে হবে। সাহস করে আমার সামনে এসে বসেছে! একটু ঘুরিয়ে আঘাত করার চেষ্টা চালালাম। বললাম, "আপনি আমাকে চিনতে পেরেও দেখালেন? মানে, চিকিৎসা করালেন!"

"কেন? না করানোর কী আছে?"

"না, আসলে আমি তো ভাল ডাক্তার নই। আপনার স্বামীর ভুল চিকিৎসা করেছিলাম।"

"কে বলল আপনাকে, ভুল চিকিৎসা করেছিলেন?"

"সুদেববাবু বলেছেন। আমি ওঁকে রোগী ভেবে ওষুধ দিলাম। আর আপনি পল্লবের সঙ্গে পালালেন। প্রমাণ হয়ে গেল আমি ভুল চিকিৎসা করছিলাম।"

এত ক্ষণে বোধহয় আমার বক্তব্য বুঝল মিলি দাস। বলতে থাকল, "আমি পালাইনি। সুদেব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ও কাজে বেরোত না। সংসারে টাকার অভাব। পল্লব খবর আনল বেলঘরিয়ায় একটা রেডি চা-গুমটি বিক্রি আছে। সুদেবকে বলেই আমরা দোকানটা দেখতে গিয়েছিলাম সন্ধেবেলা। দোকান মালিক ওই সময়টায় যেতে বলেছিল। গুমটি পছন্দ হল। বাসে চেপেছি বাড়ি ফেরার জন্য। হাতার বালা জোড়া বিক্রি করে দোকান কিনব ঠিক করাই ছিল। বাস দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। রাস্তার গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। কোনও এক নেতা কী সব বলেছে টিভিতে। বিরোধী পক্ষরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা বাস থেকে নেমে পড়লাম আমি আর পল্লব। আমার ফোনের চার্জ শেষ। পুরনো ফোন। পল্লব বার কয়েক রাস্তার অবস্থা জানাতে ফোন করল সুদেবকে। ফোন ধরছেই না সে। হাঁটতে থাকলাম দু'জনে। বাড়ি পৌঁছতে রাত একটা। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল সুদেব। চেঁচামেচি শুরু করল, 'ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছি। অফ করে রেখেছ কেন? একদম ঢুকবে না বাড়িতে। যার সঙ্গে এত ক্ষণ ছিলে, তার সঙ্গে বাকি রাতটুকু কাটাও। আর কোনও দিন এ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা কোরো না।'...অনেক করে বোঝালাম। বললাম, 'ফোনে চার্জ ছিল না। তুমি তো জানো আমার ফোনে চার্জ থাকে না বেশি ক্ষণ। পল্লবের ফোন ধরলে না কেন?' বলল, 'ওর ফোন ধরে কী হবে! কালপ্রিট কখনও সত্যি কথা বলবে! কিছু একটা ঢপ মেরে দেবে।' সুদেবকে তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা বললাম। পল্লব ওকে টিভি দেখতে বলল। কোনও কথা কানে নিল না। শুধু বলে যাচ্ছে, 'বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। যার চরিত্রের ঠিক নেই তার সঙ্গে ঘর করব না আমি,'" একটানা কথা বলে থামল মিলি দাস।

আমি বললাম, "তার পর আপনি পল্লবের সঙ্গে পালালেন। পালিয়ে এখানে এসে উঠলেন।"

আমি যেন অচেনা ভাষায় কিছু বললাম, এমন ভাবে মিলি তাকাল আমার দিকে। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল, "মানে! কী সব বলছেন আপনি!"

আমি ভেঙে ব্যাপারটা বোঝাতে যাব, এমন সময় দরজার চৌকাঠে যে এসে দাঁড়াল, তাকে আমি স্বপ্নেও আশা করব না, এসেছে সুদেব দাস। সে আমার দিকে না তাকিয়ে বৌকে বলতে থাকল, "তোমার কেন এত ক্ষণ লাগছে? কাজ সেরে এসে বসে আছি তখন থেকে! কী এত গল্প ডাক্তারবাবুর সঙ্গে? সব পেশেন্টের কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল!"

বরের দিকে ঘাড় না ঘুরিয়ে মিলি বলল, "ডাক্তারবাবুকে তুমি চিনতে পারছ?"

সুদেব দাস এবার আমার দিকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নিয়ে সরে গেল দরজার সামনে থেকে।

আমি মিলিকে বললাম, "আপনি তার মানে পল্লবের সঙ্গে পালাননি? নাকি পালিয়েছিলেন, পরে আবার ফিরে এসেছেন বরের কাছে?"

কপালে ভাঁজ ফেলে মিলি বলে, "হঠাৎ পল্লবের সঙ্গে পালাতে যাব কেন? সে আমার কে হয়? যে রাতে আমায় তাড়িয়ে দিল সুদেব, ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম পল্লবদের বাড়িতে। তার পর চলে গেলাম বাপের বাড়ি। পল্লবকে বলে গেলাম, কোথায় যাচ্ছি ওকে একদম জানাবে না। কত দিন আমাকে ছাড়া থাকতে পারে দেখি!...বাপের বাড়িতে গিয়ে বললাম, ক'টা দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।... দিন চারেকও কাটেনি পল্লব উপস্থিত, বলছে, 'বৌদি, তুমি ফিরে চলো। সুদেবদা তো আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। দু'বেলা ধর্না দিচ্ছে আমার বাড়িতে। বলছে, আমি নাকি তোমায় কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, যেন বের করে দিই... ও তোমায় ছাড়া বাঁচবে না...' পল্লব যত বার ওকে বলেছে, 'আমি জানি না তোমার বৌ কোথায়? তুমি থানায় যাও।' সে থানায় না গিয়ে ফের পল্লবের কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করেছে। পল্লবের মাকে গিয়ে বলছে, 'ও কাকিমা, তোমার ছেলেকে বলো না মিলিকে কোথায় রেখেছে বলে দিতে।'... এ রকম কিছু একটা হবে আমি জানতাম। সেই দিনই পল্লবের সঙ্গে ফিরে এলাম বাড়ি।"

আমি খানিক ক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম মিলির দিকে। ওর পিছনের তিন পেশেন্ট উসখুস করছে। গলা খাঁকারি দিচ্ছে। সত্যিই আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আর-একটা কথা শুধু জানার বাকি আছে। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা এখানে কেন চলে এলেন?"

"এখানে একটা বিরাট রিসর্ট হচ্ছে। ইলেকট্রিকের কাজের বরাত পেয়েছে ও। এখন মাস পাঁচেক এখানেই থাকতে হবে আমাদের। ঘরও দিয়েছে কোম্পানি," বলল মিলি।

ওষুধ লেখা টিকিটের কাগজটা ওকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, "কখন কোন ওষুধ খেতে হবে সব লেখা আছে। দোকানদারের কাছ থেকে ভাল করে বুঝে নেবেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মিলি। পরের পেশেন্ট চেয়ারটার দখল নিল। আমি তাকে বললাম, "একটু বসুন। এক্ষুনি আসছি।"

হাসপাতালের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সকালের মতোই আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। মাঠ ধরে হাসপাতালের ওষুধের দোকান লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে সুদেব আর মিলি। কেন যেন মনে হল, সামনের দৃশ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আমার কোয়ার্টারের পিছনের জলাশয়টা। এক আকাশ সন্দেহের মেঘ, তার তলায় দুটো সাদা শালুক ফুল, অথবা প্রেম!

শিল্পী: বৈশালী সরকার

উ প ন্যা স

বোতামঘর

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আজ পাগল হাওয়ার দিন। লেকের ওই পার থেকে ভেসে আসছে হাওয়া। আর তাতে গাছপালা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে দুষ্টু বাচ্চার চুলের মতো। বিকেলের দিকটায় দোকান ছেড়ে এসে এই লেকের ধারে কিছুক্ষণ বসে মুসাফির। দেখে, জলে হাওয়ার ভাঁজ খেলছে। পাখিরা একে একে ফিরে আসছে বাসায়। সূর্য ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে টালিনালার দিকে। আর ওই দূর দিয়ে ঝমঝম করে চলে যাচ্ছে লোকাল ট্রেন। ওটা শিয়ালদা-বজবজ লাইন।

এই তিরিশ বছরের জীবনে বাবা ছাড়া মুসাফিরের আর কেউ নেই। মেনকা সিনেমার পাশের গলিতে ছোট্ট টেলারিংয়ের দোকান ওদের। সেখানে বাবার সঙ্গে মুসাফির বসে। বাবাই মূলত কাটিং আর সেলাই করে। আর মুসাফিরের কাজ হল বোতামঘর তৈরি করা।

এই কাজে মুসাফিরের নাম আছে বেশ। নিপুণ হাতে জামার কাপড়ে মাপ মতো ছোট্ট ফুটো করে সেটা সুতো দিয়ে বাঁধাই করে বোতামঘর তৈরি করে মুসাফির। কাজটা করতে ভাল লাগে ওর।

বাবা বলে, দেখতে সামান্য আর ছোট হলেও বোতামঘর খুব প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। মাপ মতো না হলে গোটা জামাটাই বৃথা হয়ে যায়। বলে, "মানুষে মানুষে সম্পর্কের মতো ব্যাপার হল, বোতাম আর তার বোতামঘরের সম্পর্ক। ছোট-বড় হয়েছে কী, মিলই হবে না!"

"দাদাভাই দাদাভাই দেখ, পানকৌড়িগুলো দেখ!"

পাশ থেকে গলা পেয়ে ঘুরে তাকাল মুসাফির। ওই দুই ভাই এসে গিয়েছে। প্রায় রোজই আসে। আর এসে এই সবুজ বেঞ্চটাতেই বসে।

মুসাফির একটু সরে দুই ভাইকে বসার জায়গা করে দিল। মুসাফিরের সঙ্গে ভাল আলাপ আছে দু'জনের। বড় ভাইয়ের নাম সৌরসেন আর ছোটটা অঞ্জল। যদিও সৌরকে ওকে জুলু বলেই ডাকে।

জুলু এসে বেঞ্চে বসেই বলল, "মুসাফিরদা, তুমিও দেখছ পানকৌড়িগুলোকে? দারুণ না?"

মুসাফির হাসল। বলল, "এই লেকে কত পাখি যে আছে তার ইয়ত্তা নেই! তুমি আর কোন কোন পাখি চেনো?"

জুলু উজ্জ্বলভাবে বলল, "কাক, টিয়া, মাছরাঙা, কাকাতুয়া, দোয়েল, বুলবুলি... আর... আরও কয়েকটা।"

মুসাফির হাসল। তার পর পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে জুলুর হাতে দিল।

জুলু লজেন্স দুটো নিয়ে পাশে বসা সৌরর দিকে দিয়ে বলল, "দাদাভাই এই নে তোর।"

সৌর সামান্য অস্বস্তিতে পড়ল যেন। বলল, "আরে মুসাফিরদা তোকে দিয়েছে! তুই রাখ।"

জুলু মাথা নাড়ল, "তোকে না দিয়ে আমি নিই করে? তুই জানিস না আমি তোর রবিন!"

মুসাফিরের ভাল লাগল খুব। দুই ভাই সম্পর্কে জ্যাঠতুতো খুড়তুতো। জুলুর বয়স বছর এগারো আর সৌর আঠারো। কিন্তু দু'জনে খুব মিল!

সৌর লজেন্সটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "আমি কিন্তু ব্যাটম্যান হতে চাই না!"

জুলু বলল, "আরে, তা বললে হবে?"

সৌর হাসল। বলল, "আমার অত সাহস নেই। গায়ের জোরও নেই। আমি কী করে ব্যাটম্যান হব? তা ছাড়া সবার বড্ড এক্সপেকটেশন এসে যায়!"

জুলু উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল, "আমার গায়ে তো জোর আছে, তা হলেই হবে। কেউ তোকে কিছু করে দেখুক তো, আমি তাকে মেরে শেষ করে দেব!"

সৌর হেসে উঠল শব্দ করে। মুসাফিরও হাসল। জুলু বেশ রোগা।

ওদের হেসে উঠতে দেখে জুলু যেন রেগে গেল সামান্য। তার পর বলল, "ও, কেউ বিশ্বাস করছে না, না? এই দেখ তবে, লিখে দিলাম, দেখ।"

বলেই একটু দূরে একটা সদ্য বানানো বেদির কাঁচা সিমেন্টে, মাটি থেকে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে জুলু লিখল, 'প্রমিস'!

মুসাফির জিজ্ঞেস করল, "ব্যাটম্যানকে কেউ কিছু করলে, রবিন বদলা নেবে?"

জুলু কোমরে হাত দিয়ে বলল, "হ্যাঁ নেব দেখো!"

হাওয়াটা বাড়ল যেন আরও। সূর্য আরও নামল আকাশ থেকে। আরও অনেক পাখি ফিরে আসতে লাগল গাছের বাড়িতে। ঝমঝম করে বিকেলের ট্রেন চলে গেল বালিগঞ্জের দিকে। মুসাফির হেসে আরও দুটো লজেন্স বের করে এগিয়ে দিল জুলুর দিকে।

ছ'বছর পর, ১৯৮৩

॥ ১ ॥

জুলু

ট্রামের জানলা দিয়ে কলকাতাকে দেখলে কেমন যেন অচেনা শহর বলে মনে হয় আমার। এই রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, মানুষজন সব কেমন যেন পাল্টে যায়! ট্রামের বাঁ দিকে যে-সিঙ্গল সিটটা থাকে, সেখানে বসতে দারুণ লাগে। তাই স্যারের কাছ থেকে পড়া শেষ করে আমি দ্রুত বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোতে চলে আসি। বিকেল পৌনে ছ'টা নাগাদ ট্রাম এসে দাঁড়ায় একটা। তাড়াতাড়ি এলে অমন সিঙ্গল সিটটা পাওয়া যায়। দেরি করলে আর পাওয়া যায় না। কারণ, বালিগঞ্জে তখন এক সঙ্গে দুটো তিনটে ট্রেন ঢোকে। আর লোকে ট্রেন থেকে নেমেই ট্রাম ধরতে দৌড়য়।

আজ স্যারের বাড়িতে লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল বলে স্যার একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। আমার তাই ট্রামের ওই সিটটা পেতে অসুবিধে হয়নি।

"তুই কি বাড়িতে যাবি?" পাশের ডাবল সিট থেকে বুচা জিজ্ঞেস করল আমায়। বুচাও আমার সঙ্গে পড়ে। থাকে চারু মার্কেটের কাছে।

আমি বললাম, "কেন, শুনলি না আলোজেঠুর বাড়ি যেতে হবে? স্যারের মা টিফিন বাক্সটা পাঠিয়েছেন! শালা, আমি যেন পিওন! আজ এই নিয়ে যাও, কাল ওই নিয়ে যাও! আলোজেঠুকে এত তেল মারার কী আছে বল তো?"

বুচা হাসল। বলল, "আরে, স্যারের স্কুলের চাকরিটা আলোজেঠুই করিয়ে দিয়েছিলেন, না? সঙ্গে স্যারের ভাইকেও নিজেদের ফ্যাক্টরিতে চাকরি দিয়েছেন। লোকটার পলিটিকাল ইশে বিশাল! বুঝিস না?"

"রাখ তোর ইশে! কথায় কথায় ইশে!" আমি বিরক্ত হলাম।

আসলে আলোজেঠুর বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই আমার। যেতেই হয়। আলোজেঠুর এক ডিভোর্সি বোন ওই বাড়িতেই থাকে। তার ক্লাস টু-এ পড়া ছেলেকে আমাকে পড়াতে হয়। সপ্তাহে পাঁচ দিন। অল সাবজেক্ট। দেড়শো টাকা মাইনে! মানে অনেকই টাকা! তাই সেটা তো অগ্রাহ্য করতে পারি না। বাচ্চাটার নাম টুবলু। হাড় বজ্জাত। সারাক্ষণ কিছু না কিছু ত্যাঁদড়ামো করেই চলেছে। মনে হয় দিই কানের গোড়ায় একটা। কিন্তু পারি না। টিউশনের টাকাটাই আমার হাতখরচ যে! আসলে সিলভার টনিকের মহিমা অপার!

"বাঙাল চিনবে কিসে? যখন বলবে ইশে! বুঝলি? আমরা বাঙালরা এমন একটু বলে থাকি। পদ্মার জলের ইনফ্লুয়েন্স!" বুচা ভুরু তুলে বিজ্ঞের মতো বলল।

"তা, ওই দেশেই থাকতে পারতিস! পদ্মা মেঘনা আরও সব খাল-বিলের মধ্যে ঘুরতে পারতিস! এখানে এসে আমাদের মাথা খাওয়া কেন?" আমি রাগের সঙ্গে বললাম।

"সারাক্ষণ আজকাল এমন ফর্টি নাইন হয়ে থাকিস কেন বল তো? ইশে করিস না নাকি? বেরিয়ে গেলে দেখবি মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে!"

বুচা কোনও কথা আস্তে বলতে পারে না। ওর এই কথাটাও সারা ট্রাম শুনল। কী ইডিয়ট! এমন করে কেউ বলে! আমি কটমট করে তাকালাম ওর দিকে।

বুচা বুঝল। কান ধরে বলে, "আমরা আসলে বড় খেত, বড় নদীর ধারে মানুষ তো, তাই আস্তে, ঘটিদের মতো মিনমিন করে কথা বলতে পারি না!"

আমি ঘটি বলে মাঝে মাঝে বুচা এমন টুকটাক চিমটি কাটে আমায়। আমিও যে ছেড়ে দিই তা নয়। তবে আজ আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে আজ ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান আছে। দাদাভাই সবাইকে খাওয়াচ্ছে। বলেছিল, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসতে। কিন্তু আমার কপাল তো কর্পোরেশনের রাস্তার কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে তৈরি করিয়েছে ভগবান।

এক সপ্তাহ হল দাদাভাই চাকরি পেয়েছে। তাই বাড়ির সবাই ধরেছিল "খাওয়া খাওয়া" বলে। সেই জন্য আজ খাওয়াবে দাদাভাই। দাদাভাই জানে আমি চাইনিজ় খেতে ভালবাসি, তাই গড়িয়াহাটের কাছে নন্দী স্ট্রিটের ওখানে 'ক্যাপিটল' বলে যে চাইনিজ় রেস্তরাঁটা, আছে সেখান থেকে খাবার আনা হবে।

দাদাভাই আমায় বলেছিল তাড়াতাড়ি চলে আসতে। তার পর দুই ভাই গিয়ে নিয়ে আসব খাবার। কিন্তু এই আলোজেঠুর বাড়িতে গেলে কখন যে ছাড়া পাব কে জানে! আমি আজকের দিনটা টিউশন থেকে ছুটি নিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন গেলে বিচ্ছুটার মা না আবার বসিয়ে দেয়! এরা টাকা দেয় বলে মনে করে মাথা কিনে নিয়েছে! আমরা টিউশনি করি বলে কি দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি? ক্লাস টু-এর বাচ্চা এক সন্ধে না পড়লে কি দেশের অর্থনীতি গোঁত্তা খাবে?

আমার বাবারা চার ভাই। বড় জেঠুর ছেলে হল সৌরদা মানে দাদাভাই। মেজো জেঠুর এক মেয়ে বিন্নিদি। আমার বাবা সেজো। আর ছোটকাকা বিয়ে করেনি। করবেও না বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। সে সারা দিন ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। কলকাতার মাঠে একটা ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। সঙ্গে সরকারি চাকরি করে। আমাদের দোতলা বাড়িটা ক্যাওড়াতলা শ্মশানের কাছে, সাহানগর অঞ্চলে। জায়গাটা পুরনো। ভাঙাচোরা বাড়িঘরে ঠাসা। আমাদের বাড়িটাও পুরনোই। তবে মোটামুটি মেনটেন করা হয় বলে এখনও ঠিকঠাক রয়েছে।

আমি ক্লাস টুয়েলভে পড়ি এখন। সামনের বছর উচ্চ মাধ্যমিক। তাই পড়াশোনার চাপ আছে খুব। সেখানে এরকম বাড়ির সবাই মিলে এক সঙ্গে কাটানোর মতো দিন পাওয়াই যায় না! কিন্তু সেখানেও ঝামেলা! কী? না স্যারের মা আলোজেঠুর জন্য পায়েস করে পাঠিয়েছে!

আমি বললাম, "তুই চুপ করবি? ফালতু হ্যাজাস না!"

বুচা দমল না। বলল, "সৌরদা খাওয়াবে আর আমায় বাদ দিলি! এই বালিগঞ্জ থেকে পড়ে ফিরে আবার সৌরদার সঙ্গে গড়িয়াহাটে যাবি খাবার কিনতে? তোর খাটনি পোষাবে?"

আমি বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালাম বুচার দিকে। বুচা এবার চুপ করল। আশ্চর্য ছেলে। বাংলা বোঝে না!

ট্রামটা রাসবিহারী মোড় থেকে টংটং করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে টালিগঞ্জের দিকে বাঁক নিল। একটা লাল দোতলা বাস পাশ দিয়ে হাজরার দিকে বেরিয়ে গেল।

এই রাস্তাটা বেশ চওড়া। মাঝে আইল্যান্ড আছে। তাতে কী সুন্দর ঘাস। তার মধ্যে দিয়ে স্টিমারের মতো ভাসতে ভাসতে ট্রাম চলে।

মুদিয়ালি মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে গেলাম আমি। নামার সময় বুচা বলল, "বেলাকে আজকের নোটসটা দিয়ে দিস। মেয়েটা পড়তে আসেনি তো!"

আমি উত্তর দিলাম না। মুদিয়ালি মোড়ের কাছেই লেকের সামনের রাস্তায় পেল্লায় একটা বাড়িতে থাকে আলোজেঠুরা। আলোজেঠুর বাবা ভবানীপ্রসাদ উপাধ্যায় ছিলেন রায়বাহাদুর। ওই বাড়িটা সেই ভবানীপ্রসাদেরই করা। তাঁর পাঁচ ছেলে পাঁচ মেয়ে। সবার বড় দুই দিদি তার পর পাঁচ ভাই তার পর তিন বোন। ভাইদের মধ্যে আলোকপ্রসাদ উপাধ্যায় মানে আলোজেঠু সবার বড়। আর শুধু বয়সে নয় প্রভাব

প্রতিপত্তি, টাকাপয়সা সব কিছুতেই বড়।

আলোজেঠুদের হাওড়ায় দুটো লোহার কারখানা রয়েছে। সঙ্গে বেলঘড়িয়াতে আছে দেশলাই বানানোর ফ্যাক্টরি। এ ছাড়াও আরও কী সব ব্যবসাও আছে। পাঁচ ভাই মিলে সব দেখাশোনা করে। তবে তাদের মধ্যে আলোজেঠুই মুখ্য। তার কথাতেই ওই বাড়ির সব কাজকম্ম হয়। লোকটা সবাইকে বিয়েশাদি দিলেও নিজে বিয়ে করেননি। লোকটার রাজনীতির যোগ আছে ভাল। লোকজনকে টুকটাক সাহায্যও করেন। তাই সবাই খুব মান্যিগন্যি করে। এই আমাদের অঙ্ক-টিউশনের স্যারকেও তো স্কুলের চাকরিটা উনিই করিয়ে দিয়েছেন!

আমার বড় জেঠু আর মেজো জেঠু খুব ভাল ফুটবল খেলত। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনেও খেলেছে। সেই খেলার সূত্রেই আলোজেঠুর সঙ্গে আলাপ। আর আলোজেঠু বিশেষ ভাবে পছন্দ করে দাদাভাইকে। করারই কথা। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফোর্থ হয়েছিল দাদাভাই। তার পর যাদবপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে। তার ওপর ক্রিকেটে ইউনিভার্সিটি ব্লু। দাদাভাইকে ভালবাসে না এমন কাউকে আমি দেখিনি। দাদাভাই আমাদের এই অঞ্চলে একটা ছোটখাটো হিরো যেন। দাদাভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরলে আমার কী যে গর্ব হয়! দাদাভাই আমার জীবনের সত্যিকারের ব্যাটম্যান!

গুন্ডাদা তো বলে, "জুলু বুঝলি, সৌর আমাদের সবার গর্ব। আমি তো ভাবতেই পারি না ওর সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে! এমন ছেলে আমাদের বাড়ির জামাই হবে? মাইরি?"

গুন্ডাদা আমাদের অঞ্চলের বেশ ক্ষমতাশালী মানুষ। ব্র্যাকেটে পড়ুন মস্তান! আর সেই ক্ষমতার উৎস গুন্ডাদার বন্দুক। এমন সার্থকনামা লোক খুব একটা দেখা যায় না। ছোটবেলায় যে গুন্ডাদার এমন নামটা দিয়েছিল সে বুঝতে পারেনি যে, গুন্ডাদা বড় হয়ে তার মর্যাদা রাখবে।

পলিটিকাল মারামারির সঙ্গে আরও নানান অন্ধকার কাজে জড়িয়ে থাকে গুন্ডাদা। এখানকার ক্ষমতাশীন নেতার রাইট হ্যান্ড ম্যান। তবে ইদানীং গুন্ডাদা সমাজসেবক হিসেবে নিজের ইমেজ পাল্টানোর চক্করে আছে। তার সঙ্গে প্রোমোটারি শুরু করেছে। কলকাতায় টুকটাক করে হাইরাইজ়ার বাড়ি হওয়া শুরু হয়েছে। গুন্ডাদার বক্তব্য হল, এটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে তাই আগে থাকতেই এই লাইনে ঢুকে পড়তে হবে।

আমাদের সাহানগরে নারুদার স্টেশনারি কাম চায়ের দোকানের পাশে গুন্ডাদার ঠেক। সেখানে সন্ধেবেলা গুন্ডাদা বসে। পাশে ক্যারম বোর্ড পাতা থাকে। খেলা চলে। আমি ক্যারমটা ভালই খেলি বলে গুন্ডাদার ওখানে মাঝে মাঝে খেলতে যাই!

গুন্ডাদা আর যার সঙ্গে যাই করুক আমাকে আর দাদাভাইকে খুব ভালবাসে। মনে আছে যেদিন গুন্ডাদা জেনেছিল যে ওর বোন মিঠুদি দাদাভাইকে পছন্দ করে, সে দিন গুন্ডাদার সে কী আনন্দ!

নিজেই বাবা-মাকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে বড় জেঠু-জেঠিমার সঙ্গে ওদের বিয়ের কথা বলে গিয়েছিল।

দাদাভাই তখন সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। কী আর এমন বয়স? ফলে জেঠু একটু বিরক্তই হয়েছিল। কিন্তু গুন্ডাদার উৎসাহকে আটকাতে পারেনি।

গুন্ডাদা বলেছিল, "কাকু আমরা এখনই বিয়ে দিতে বলছি না। কথাটা জাস্ট ফাইনাল হয়ে থাক। আমি ফ্যামিলির ব্ল্যাকশিপ। তাই ভুলভাল কাজে জড়িয়ে গিয়েছি। আমাদের বাড়ির সকলে কিন্তু এমন নয়। আমার বাবা-মা-বোন বা অন্যরা খুবই ভাল। আমার খারাপ কাজের দোষ আমার বোনের ওপর পড়বে কেন বলুন? আর-একটা কথা, আমিও ক্রমে সরে আসছি এসব আনসান কাজ থেকে। সিভিলের কাজকম্ম করব এবার থেকে। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আপনারা একটু হ্যাঁ বলে দিন শুধু!"

মিঠুদিকে দেখতে বেশ ভাল। পড়াশোনাতেও ভাল। মেয়ের দিক থেকে জেঠু-জেঠিমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাও জেঠিমা বলেছিল, "ছেলেরও তো একটা মত আছে। এখনকার দিনের ছেলে... মানে..."

গুন্ডাদা সে দিন ভিভিয়ান রিচার্ডসের ফর্মে ছিল। কাউকে খেলতেই দিচ্ছিল না। জেঠিমাকেও কথা শেষ করতে দেয়নি। বলেছিল, "আরে, আমি ওদের কথা বলিয়ে দেব। দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়াতে আমাদের পাড়াতেই তো যায় সৌর। সেখানেই তো মিঠু ওকে দেখে ক্লিন বোল্ড হয়েছিল। সেখানেই আমি ওদের কথা বলিয়ে দেব। আপনারা জাস্ট আপনাদের থেকে সিগনালটা দিন! প্লিজ়!"

দাদাভাই ব্যাপারটাকে সেভাবে গুরুত্বই দেয়নি। জেঠু, জেঠিমাকে বলেছিল, "তোমরা যা ভাল বোঝো করো। এ ব্যাপারে আমার কোনও মতামত নেই।"

সে দিন মতামত দেয়নি দাদাভাই। তাই সবাই ধরে নিয়েছে যে, দাদাভাইয়ের সঙ্গে মিঠুদির বিয়ে হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা!

আলোজেঠুর বাড়ির গেটে সব সময় একজন দারোয়ান থাকে। নাম মনোহর। আমায় দেখেই গেটটা খুলে দিল। গেট পেরিয়ে একটা বাগান, তার পর বাড়ি।

বিশাল বড় বাড়িটা জাহাজের আকারে বলে সবাই একে জাহাজবাড়ি বলে। বাড়ির উল্টোদিকেই লেক। দোতলায় যে-ঘরে আমি পড়াই, সেখান থেকে লেকের জল আর জলের মাঝে দ্বীপের মতো জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

আমি জানি এই সময় আলোজেঠু বা আলোজেঠুর অন্য ভাইরা কেউ বাড়িতে থাকবে না। থাকার মধ্যে সেই বোন, তার ছেলে, ভাইদের স্ত্রী যাদের আমি কাকিমা বলি তারা আর বেলা ও বেলার মা থাকবে।

বেলারা এই বাড়িতে আশ্রিতা। কোথা থেকে এখানে এসেছে সেটা আমি জানি না। কিন্তু ছোট থেকেই ওদের আমি দেখে এসেছি! অদ্ভুত মেয়ে এই বেলা। আমার সঙ্গেই এইচ এস পড়ে। পড়াশোনায় মাঝারি। দেখতে-শুনতে ভালই। কিন্তু মেয়েটা একটু অদ্ভুত। কম কথা বলে। পোকামাকড় কীট পতঙ্গ নিয়ে খুব আগ্রহ। তার সঙ্গে নানান রকম মডেল বানায়। মানে যাকে ডায়োরামা বলে আর কী! এমন উদ্ভট শখ আমি কারও কোনও দিন দেখিনি।

আমি ঠিক করে নিলাম যে, মূল বাড়িতে ঢুকব না। এই বাড়িতে ছ'-সাতজন কাজের লোক আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো যে, সেই গৌরীমাসির হাতে টিফিন বক্স দিয়ে চলে যাব।

বাগান থেকে গাড়িবারান্দা হয়ে বাড়ির মূল দরজার সামনে দাঁড়ালাম। এই দরজাটা খোলাই থাকে। তাও হুট করে তো আর ঢুকে যাওয়া যায় না! আমি কলিংবেল টিপলাম। বাড়িটা আজ যেন একটু বেশিই খাঁ খাঁ করছে? সবাই কি দোতলা-তিনতলায় রয়েছে নাকি!

এবার চটির শব্দ শুনলাম। এই বাড়িতে সবাই ঘরের মধ্যেও চটি পরে থাকে। আমাদের বাড়িতে কিন্তু কেউ এমন থাকে না। বিন্নিদি বলে, "বড়লোকরা অমন করে, বুঝলি?"

বড় হলঘরের অন্য প্রান্ত থেকে আমি বেলাকে আসতে দেখলাম। বেলা তো এই বাড়ির আশ্রিতা। বড়লোক নয়! তা হলে ও ঘরের মধ্যে চটি পরে থাকে কেন?

বেলা আজ পড়তে যায়নি। কেন যায়নি কে জানে! মেয়েটাকে দেখে একটু চমকে গেলাম। একদম কদম ছাঁট করে চুল ছেঁটেছে! ব্যাপারটা কী!

বেলা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। আমিও ইতস্তত করে একটু হাসলাম! তার পর হাতের টিফিন বক্সটা দিয়ে বললাম, "স্যারের মা আলোজেঠুর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। পায়েস আছে।"

বেলা টিফিন বক্সটা নিল। তার পর বলল, "আজকের নোটটা দেবে আমায়? স্যার কী অঙ্ক করিয়েছেন সেটা... রেখে গেলে আমি সোমবার দিয়ে দেব।"

আমি কথা না বাড়িয়ে কাঁধের ঝোলা থেকে খাতাটা বের করে দিলাম।

বেলা খাতাটা নিয়ে বলল, "আমার মাথায় উকুন হয়েছে। তাই মা এমন করে কেটে দিয়েছে চুল। আগেকার দিনে বিধবা বুড়িদের মতো লাগছে আমায়, না?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন স্টিলের বাসন পড়ল ঝনঝন করে। সেই শব্দ

যেন আমাদের দু'জনের মধ্যেকার নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে তুলল।

বেলা আবার বলল, "মাথায় উকুনের ওষুধ দিয়েছি বলে পড়তে যেতে পারলাম না। আচ্ছা, এতে উকুন না গেলে কি মাথায় গ্যামাক্সিন মাখতে হবে? মা রাগ করে বলছিল।"

মেয়েটা সত্যিই উদ্ভট! এসব কেউ কাউকে বলে?

বেলা আবার বলল, "বাড়িতে সবাই আজ ব্যস্ত। এক জন নতুন মানুষ আসছে সন্ধেবেলা। আলোজেঠুর বড়দি মানে রেখাপিসির মেয়ে। শ্বোয়েতলানা! জানো তো, রেখাপিসি রাশিয়ানকে বিয়ে করেছিল! শ্বোয়েতলানা তারই মেয়ে। শ্বোয়েতলানা নিজেও বিয়ে করেছিল একজন ব্রিটিশকে। সে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে ওকে। বড়পিসিরা যেহেতু আর কেউ বেঁচে নেই তাই শ্বোয়েতলানা এখন এই বাড়িতেই থাকবে। ওর একটা বেবি আছে। জাস্ট চার মাস বয়স।"

এই মেয়েটা আজ এত কথা বলছে কেন? ও তো এত কথা বলে না! আর এসব শুনে আমিই-বা কী করব বুঝলাম না। বললাম, "আমি আসি। আমার একটু কাজ আছে।"

বেলা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তার পর বলল, "জানো, মমিদের মাথাতেও উকুন পাওয়া গিয়েছে! আচ্ছা আমার মাথায় উকুন পাওয়া গিয়েছে বলে কি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না!"

মেয়েটার কি মাথার গোলমাল আছে!

আমি বললাম, "আরে, কী সব বলছ! তা কেন?"

"না, আমি আজ ওপার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও আমায় বলল এ সব নিয়ে যেন ওর বাড়িতে না যাই। তুমিও কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?" বেলা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

"আমি আজ ওপার বাড়িতে গিয়েছিলাম," ব্যস এইটুকু শোনার পরেই আমার বাকিটা আবছা হয়ে গিয়েছে। এই নামটা শুনলেই আমার মনে হয়ে বুকের মধ্যে মালগাড়ি উলটে পড়ে গিয়েছে! এই একটা নাম আমার সব কিছু তছনছ করে দেয়! মনে হয় অক্সিজেন কমে এসেছে কলকাতায়!

আমি কষ্ট করে মুখ তুললাম। দেখলাম বেলা এখনও তাকিয়ে আছে। তার পর আচমকা ও দু'পা এগিয়ে এল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করল, "ওপার কথা শুনলে তোমার কষ্ট হয়, না জুলু?"

॥ ২ ॥
বেলা

দোকানটার নাম 'এপিক'। লেক মার্কেটের ফুটপাথে একটা চৌকি পেতে বই বিক্রি করা হয় এই দোকানটায়। মাঝে মাঝে আমি এই দোকানে এসে বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি। দোকানের যে মালিক, বৃন্দাবনদা, আমায় খুব ভালবাসে। যেদিন বই না দেখে দোকানের পাশ দিয়ে চলে যাই, বৃন্দাবনদা বলে, "কী রে পাগলি, আজ বই দেখবি না?"

আসলে রোজ রোজ তো আর বই দেখার সময় থাকে না। বাড়ি থেকে আমাকে নানান জিনিসপত্র কিনতে লেক মার্কেটে পাঠানো হয়। যেদিন তাড়া থাকে সে দিন জিনিস কিনেই সাইকেলে চাপিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু যেদিন সময় থাকে, সে দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নানান রকম বই ঘেঁটে দেখি।

এই যেমন আজ আমার তাড়া আছে। বড় কাকিমা স্যানিটারি প্যাড কিনতে দিয়েছে। সেটা কেনা হয়ে গিয়েছে। যাওয়ার পথে মুসাফিরদার থেকে অল্টার করতে দেওয়া চারটে ব্লাউজ় নিতে হবে। তবে তার আগে এখন কুড়িটা শিঙাড়া কিনতে হবে। লুনাদিদি আজ শিঙাড়া খেতে চেয়েছে!

লুনাদিদি মানে শ্বোয়েতলানা! ক'দিন হল এসেছে এখানে। একদম পাকাপাকি ভাবে থাকবে বলেই এসেছে। প্রথম দেখাতেই লুনাদিদিকে ভাল লেগে গিয়েছে আমার।

লুনাদিদি কী লম্বা! হালকা বাদামি চুল! নীল চোখ! লুনাদিদির মা বাঙালি হলেও আমি বুঝতে পারছি, লুনাদিদিকে ওর বাবার মতোই দেখতে হয়েছে। তবে লুনাদিদির চেয়েও সুন্দর ওর মেয়ে। ছ'মাসের রেচেল! এমন একটা মাখনের দলার মতোও যে কোনও বাচ্চা হতে পারে, সেটা ওকে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। এইটুকু মেয়ে এই ক'দিনেই আমায় কী চিনে গিয়েছে! আমি গিয়ে দাঁড়ালেই হাত বাড়ায় আমার দিকে। ফাঁকা মাড়ি দেখিয়ে খিলখিল করে হাসে!

লুনাদিদি কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে বেশ উদাসীন। আমার মাকে বলা হয়েছে বাচ্চাটাকে যেন দেখাশোনা করে। মায়ের কাছেই তাই বেশির ভাগ সময় থাকে রেচেল। লুনাদিদিকে বাড়ির পূর্ব দিকের বড় অংশটায় দুটো বড় বড় ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে। এখানে লুনাদিদি নাকি আবার পড়াশোনা শুরু করবে। বিএসসি-তে ভর্তি হবে। তাই বাচ্চার দিকে বেশি মন দিতে পারবে না।

আমি জানি আমরা এই বাড়ির আশ্রিতা হলেও আসলে কাজের লোক ছাড়া কিছু নই। আমার মাকেই তো সারা বাড়ির কাজের লোকদের পরিচালনা করতে হয়। সংসারের সব কিছু দেখাশুনো করতে হয়। এখন তার সঙ্গে আবার যোগ হয়েছে রেচেলের ভার।

তবে তাতে মায়ের যেন অসুবিধে নেই! আসলে মায়ের আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়েই অসুবিধে নেই। আমাকে দেখলেই মা কেমন যেন রেগে যায়। খিটখিট করে। আচ্ছা, সেটা কি এই জন্য যে, আমাকে আমার বাবার দেখতে! এই জন্য কি যে, আমাকে দেখলেই মায়ের মনে পড়ে, কী করে বাবা আমার আসল মাকে বেল্ট দিয়ে মারত! গরম লোহার শিক চেপে ধরত পিঠে! রাতে খেতে বসলে খাবার থালা লাথি মেরে সরিয়ে দিত! তাই কি আমাকে মা সহ্য করতে পারে না?

এই মা আমার আসল মা নয়। আমার মায়ের বোন। অর্থাৎ মাসি। মা মারা যাওয়ার পর বাবা মাসিকে বিয়ে করেছিল। আর ক'দিন পর থেকে একইরকম ভাবে টর্চারও করত! তবে বাবাও তার পর আর বেশি দিন বাঁচেনি! এই মা রেহাই পেয়ে গিয়েছে। তার পর থেকে আমাকে নিয়েই আছে। আমিও মাসিকেই মা বলেই ডাকি।

সেই মায়েরই আমাকে নিয়ে হাজার প্রবলেম।

মা আমায় বলে, "কবে তুই নরমাল হবি? এমন একা একা থাকিস! সারাক্ষণ রাস্তা থেকে ছাইপাঁশ তুলে এনে সেগুলো দিয়ে এমন ঝুলনের মতো সাজাস! ঘর বাড়ি নোংরা করিস! কেন? পাগলি তুই? বেলা-পাগলি?"

বেলা-পাগলি! মায়ের কাছে শুনেছি তার কথা। বর্ধমানে, যে-গ্রামে মায়ের ছোটবেলা কেটেছিল, সেখানে থাকত বেলা নামে একজন মধ্যবয়সি মহিলা! সে নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। যাকে-তাকে রাস্তায় ধরে বলত, "আমায় বিয়ে করবে? আমি তোমায় হেভি সেক্স দেব! করবে বিয়ে?"

তাকে সবাই খেপাত। ডাকত বেলা-পাগলি বলে! মা বলত, সেই বেলার মা নাকি খুব কষ্ট পেত মেয়ের জন্য! মেয়েকে শেষের দিকে মাঝে মাঝেই বন্ধ করে রাখত ঘরে! তার পর কে বা কারা বেলার অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওকে প্রেগন্যান্ট করে দেয়! বেলা কিছুতেই বলতে পারেনি কে এটা করেছে! মাথাই কাজ করত না যে! সেই লজ্জায়, কষ্টে বেলার মা কুয়োয় লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

আমার মা বলে, "তোর জন্য দেখবি আমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হল! বুড়ো ধাড়ি মেয়ে এখনও ছাইপাঁশ পুতুল নিয়ে খেলাঘর সাজাস! হাবিজাবি পোকামাকড় নিয়ে পড়ে থাকিস! লজ্জা করে না তোর?"

আমার সত্যি লজ্জা করে না। কীটপতঙ্গ নিয়ে আমার যে খুব আগ্রহ। সেই ছোট থেকেই। মনে আছে বাবা যখন মায়ের ওপর অত্যাচার করত, তখন আমায় একটা ছোট্ট ঘরে আটকে রাখত। কত বয়স ছিল তখন আমার? পাঁচ কিংবা ছয়! সেই ঘরটা ছিল স্যাঁতসেঁতে, ঘুপচি মতো! সেখানে বসে থাকতে থাকতে আমি দেখতাম জানলার গোবরাট দিয়ে পিঁপড়েরা হেঁটে যাচ্ছে। রোগা চুলের মতো হাত-পা-ওলা মাকড়সারা কেমন যেন সিল্কের সুতোর মতো জাল ধরে নেমে আসছে মাটিতে। দেখতাম দেওয়ালের ফুটো দিয়ে কাঠপোকা তার ছোট্ট লেজটাকে টিউবওয়েলের হাতলের মতো ওপরে নীচে পাম্প করতে করতে এখানে ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভাঙা জানলা দিয়ে ঢুকে আসছে নীলচে চকচকে

বড় বড় মাছি।

এমন কত কী দেখতে দেখতে আমি যেন অন্য কোথাও চলে যেতাম। বাইরে থেকে ভেসে আসা মারের আওয়াজ, মায়ের চিৎকার, জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ আস্তে আস্তে সব কেমন যেন মুছে যেত। আমার বাহ্যজ্ঞান থাকত না! মনে হত ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে এই খারাপ পৃথিবীর বাইরের অন্য আশ্চর্য এক পৃথিবীতে নিয়ে চলে যাচ্ছে! ওরা আমার রেসকিউয়ার! সেই ভাল লাগাটা আমার এখনও থেকে গিয়েছে। হাজার শাসনেও যায়নি।

বাবা মদ খেয়ে ট্রেন লাইন পার করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছিল। আর মা বেঁচে গিয়েছিল। তার পরেই আলোজেঠু মাকে নিয়ে আসে নিজেদের বাড়িতে। মায়ের দাদার সঙ্গে একসময় আলোজেঠুর নাকি খুব বন্ধুত্ব ছিল।

এই মন সব যখন ঘটছিল তখন আমার বয়স ছয় কী সাত। তার পর থেকে এই বছর দশেক আমি এই বাড়িতেই আছি। সবাই ভাবে আমরা বাড়ির লোকের মতো আছি, কিন্তু আমরা জানি আমরা সফিস্টিকেটেড ঝি ছাড়া আর কিছু নই। তবে তাতে মায়ের আপত্তি নেই! মায়ের মতে, এখানে থাকতে পাচ্ছি, খেতে পাচ্ছি। তার বিনিময়ে শ্রম তো দিতেই হবে!

"কী রে, এমন করে চুল কেটেছিস কেন?" এপিকের সামনে যেতেই বৃন্দাবনদা জিজ্ঞেস করল।

আমি থমকে গেলাম। এই হয়েছে এক সমস্যা। মা এমন করে আমায় কদমছাঁট দিয়েছে তো কী হয়েছে? দেখা হলেই সবাই এই নিয়ে কেন যে জিজ্ঞেস করে! কারও কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই কোনও? সারাক্ষণ অন্যের ব্যাপারে গলাবে বলে নাকটা যেন সুড়সুড় করছে!

কিন্তু লোকটা বৃন্দাবনদা বলেই আমি হাসলাম। কড়া উত্তর দিলাম না। এখানে উকুনের ব্যাপারটা বলা যে ঠিক হবে না সেটা আমি জানি। সবাই তো আর জুলু নয় যে, তাকে সবটা বলে দেব!

আমি বললাম, "এমনি। গরম পড়েছে বলে দিলাম কেটে। নতুন স্টাইল!"

"সাধে তোকে পাগলি বলি?" বৃন্দাবনদা হাসল, "তা আজ বই দেখবি না?"

আমি মাথা নাড়লাম। তার পর জিজ্ঞেস করলাম, "পোকামাকড়ের আর কিছু এল?"

"না রে। এলে আমি সরিয়ে রাখব। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের কিছু পুরনো পত্রিকা পাব। তার মধ্যে দেখব কিছু আছে কি না। দু'-চার দিন পরে আসিস।"

আমি মাথা নাড়লাম। আর দেরি করা যাবে না। লেক মার্কেটের পাশের গলিতে পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডারে শিঙাড়া অর্ডার করে এসেছি। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভাজা হয়ে গিয়েছে।

আমি রাস্তার পাশে রাখা সাইকেলটা নিলাম। কালো রঙের লজ্ঝরে দোতলা সমান উঁচু সাইকেল। বুচা বলে কলকাতায় যেমন বিপজ্জনক বাড়ি থাকে, সেরকম তোর সাইকেলটাও বিপজ্জনক সাইকেল! কোনও দিন চালাতে চালাতে দেখবি, পার্টস খুলে আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে! সার্কাসে যেমন পটল মুলোরা চালায় না, সেরকম!"

বুচা ছেলেটা খুব ভাল। টিউশনে এক সঙ্গে পড়ি আমরা। একটু বেশি বকবক করে, কিন্তু ঠিক আছে। মনটা পরিষ্কার!

পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে শিঙাড়াগুলো তুলে নিলাম। এই ক'দিনেই লুনাদিদি বেশ বাঙালি খাবারের ভক্ত হয়ে পড়েছে! আমি তো কাল বলেছিলাম, "তুমি যে রেটে ভাজা-পোড়া আর মিষ্টি খাচ্ছ না, এমন পরভিন ববির মতো ফিগার দু'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে!"

"পরভিন ববি! হু ইজ শি?" লুনাদিদি জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি আর সাতকাহন করে পরভিন ববি কে সেটা জানাতে চাইনি। শুধু হেসে চলে এসেছিলাম। যখন যা জানার, লুনাদিদি নিজেই জেনে যাবে।

শিঙাড়া নিয়ে আমি বাড়ির পথ ধরলাম। এই সন্ধের দিকে পাড়ার ভেতরের রাস্তাগুলো বেশ নির্জন থাকে। মেনকা সিনেমার শো ভাঙলে শুধু যা একটু ভিড় হয়। এখন মেনকাতে 'অন্ধা কানুন' নামে একটা সিনেমা চলছে। বুচা জিজ্ঞেস করেছিল ওর সঙ্গে আমি দেখতে যাব কি না! আমি না করে দিয়েছি। অন্ধকার ঘরে বসে অমন হাউ-হাউ শব্দের মধ্যে সিনেমা দেখতে জঘন্য লাগে আমার! তবে সেটাও দেখতাম যদি জুলু বলত!

জুলু আমায় কিছু বলে না। বরং আমি বুঝি জল জমা রাস্তায় লোকে যেমন পা টিপে টিপে, ইট-কাঠ খুঁজে, তাতে পা দিয়ে কোনও মতে পেরিয়ে যায়, ও-ও আমাকে সেইভাবে এড়িয়ে যায়! আমি জানি ওপালিনার জন্য জুলু পাগল!

ঠিক আছে, কী করা যাবে! এই পৃথিবীতে কার যে কাকে ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে সেটা কেউ জানে না। এই নিয়ে মন খারাপ করলে, হিংসে করলে, রাগ করলে কোনও লাভ নেই। বেকার নিজের মনটাই কুঁকড়ে ছোট হয়ে ঝুলকালি মাখা হয়ে থাকে। তাই জুলুর ব্যাপারে আমার মনখারাপ করলেও আমি সেটাকে আমল দিই না।

মুসাফিরদা দোকানেই ছিল। একটা ষাট পাওয়ারের হলদে বালব জ্বলছে। দেখলাম, মুসাফিরদার বাবা সেলাই মেশিনে বসে আছে আর মুসাফিরদি একটা শতরঞ্চির ওপর বসে বোতামঘর সেলাই করছে।

আমি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে টিংটিং করে ঘণ্টি বাজালাম। মুসাফিরদা আমায় দেখে খবর কাগজে মোড়ানো ব্লাউজ়গুলো নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

আমি মোড়কটা নিয়ে সাইকেলের হাতলে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখলাম। তার পর দাম মিটিয়ে বললাম, "আমার লজেন্স?"

মুসাফিরদা পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে আমায় দিল।

আমি তার থেকে একটা বের করে মুখে পুড়ে দিয়ে বললাম, "কই তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না কেন চুল কেটেছি?"

মুসাফিরদা বলল, "জিজ্ঞেস করার কী আছে? ঠিক করেছিস, কেটেছিস। সুন্দর লাগছে!"

"আমায় মোটেও সুন্দর দেখতে নয়," আমি জোরের সঙ্গে বললাম, "ওপাকে দেখতে সুন্দর। আমি খুব সাধারণ।"

"তোকে যে ভালবাসবে তার চোখে তুই-ই হবি সবচেয়ে সুন্দর, বুঝলি?" মুসাফিরদা হাসল, "জুলু কথা বলছে না সে ভাবে?"

জুলুর ব্যাপারটা একমাত্র মুসাফিরদা জানে। আসলে জুলু ছাড়া এই লোকটাকেও সব বলা যায়!

আমি বললাম, "রেড উইডো মাকড়সার মধ্যে যারা মেল, তারা কী করে জানো?"

"তুই বল," মুসাফিরদা আগ্রহ নিয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, "ওদের মধ্যে ছেলেগুলো নিজেরাই ইচ্ছে করে ফিমেল স্পাইডারদের মুখের মধ্যে মাথা দিয়ে দেয়। মেয়েগুলো ওদের খেতে না চাইলেও বারবার দিতেই থাকে। তার পর একসময় মেয়ে মাকড়সাগুলো বিরক্ত হয়ে ছেলেগুলোকে খেয়ে নেয়! বুঝলে কিছু?"

মুসাফিরদা বলল, "মানুষ তো মাকড়সা নয়।"

"মাকড়সা, মুসাফিরদা। মাকড়সা," আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আসি। শিঙাড়া ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি গালি খাব।"

এখান থেকে বাড়ির পথ একটুখানি। মনোহরদা গেটে বসেছিল। আমায় দেখে হাসল। পাশে রাখা রেডিয়োতে আমিন সায়ানির গলা শুনতে পেলাম। ফরমায়েশি গানের আসর শুনছে। আমি সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলাম। শুনলাম, মহম্মদ রফির গান শুরু হয়েছে— 'বড়ি দূর সে আয়ে হ্যায় পেয়ার কা তোফা লায়ে হ্যায়।'

আমি সাইকেলটা কাঠালচাঁপা গাছের কাছে রেখে জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, রেচেলকে কোলে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমায় দেখেই ঝনঝন করে উঠল, "এত দেরি করলি! লুনার খিদে পেয়েছে না!"

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা-টা কার? কিন্তু কিছু বললাম না। জিনিসপত্রের ব্যাগটা একটা চেয়ারে রেখে নিজের ঘরের দিকে এগোতে যাব, তখনই শুনলাম হরিকাকা ডাকল, "বেলা, বাবু ডাকছে।

ওপরে যা।”

হরিকাকা আলোজেঠুর ব্যক্তিগত কাজের লোক। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। বদের বাসা। লোকটাকে আমার অসহ্য লাগে!

আমি চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রইলাম।

হরিকাকা কাছে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “যা বলছি শোন। ওপরে যা। অনেকদিন পরে ডাকলেন। দেরি করবি না। যা।”

ভয়, কষ্ট আর ঘৃণায়, আমার সারা গায়ে কাদা মাখা সরীসৃপ হেঁটে গেল যেন। আমার চোখে জল এল আচমকা। আমি মায়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম, মা আমার চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে, কোলে রেচেল আর হাতে ব্যাগ নিয়ে চলে গেল অন্য ঘরের দিকে!

আমি একা! আমি অসহায়! শুনেছিলাম, নরক মাটির নীচে হয়। কিন্তু এ বাড়িতে নরক তিনতলায়। আমি নরকের দিকে উঠে যাওয়া সিঁড়ির দিকে তাকালাম। তার পর উঠতে লাগলাম।

জীবন মূল্য নেয়! একটু বেঁচে থাকতে গেলে অনেক মূল্য চোকাতে হয়!

সৌরর ডায়েরি থেকে

॥ ক ॥

...আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল সে! এ কে? এত দিন কোথায় ছিল? এমন চোখ তুলে কেন এত বছর পরে সে এসে তাকাল আমার দিকে? আমার সমগ্র বেঁচে থাকা আজ এই বিন্দুতে এসে এক লহমায় পালটে গেল! এতদিন অন্ধ ঘোড়ার মতো ছুটে যাচ্ছিলাম আমি। ভাল হয়ে থাকার অযৌক্তিক নেশায় আচ্ছন্ন ছিলাম। কিন্তু এবার থেকে আমি শুধু আমার! আমি শুধু তার! আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই। আর কিছু আসবে না কোনও দিন...

॥ ৩ ॥

জুলু

গরমের ছুটি পড়ছে কিছুদিন হল। আমাদের ক্লাস টুয়েলভে যদিও এ সব ছুটিছাটা নামেই। সারাক্ষণ শুধু পড়াশোনা আর পড়াশোনা। তাও বিকেলের দিকটায় আমি বেরোই। লেকের মাঠে যাই। ফুটবল আর ক্রিকেট দুটোই চলে। আসলে গ্রীষ্ম আর বর্ষাকালটা ফুটবলের সময়, কিন্তু সামনে বিশ্বকাপ ক্রিকেট, তাই সবাই একটু ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকেছে এখন। যদিও আমরা জানি, আমাদের এবারেও কোনও চান্স নেই! ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এরাই ফেভারিট। তবু বিশ্বকাপ বলে কথা!

আমি আজ সারা দুপুর ক্যালকুলাস করেছি। এখন মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। দাদাভাই পড়াশোনায় ভাল হয়ে আমার বিপদ বাড়িয়েছে। সবাই ভাবছে আমিও সাংঘাতিক কিছু করব। আমি জানি ফার্স্ট ডিভিশন হয়তো আমার হবে, কিন্তু তার বেশি কিছু না। এমনকি, জয়েন্টেও চান্স পাওয়ার মতো মাথা আমার নেই!

কিন্তু লোকজন তো আছেই ভুলভাল এক্সপেক্টেশন নিয়ে বসে থাকতে। আমার বাবা-মাও মাঝে মাঝে এমন কথা বলে যেন আমি স্ট্যান্ড করেই গিয়েছি! আরে, ওরা কি ভুলে গিয়েছে মাধ্যমিকে আমি মাত্র দুটো লেটার পেয়েছিলাম?

বিন্নিদির এ সবের ঝামেলা নেই। আর্টস নিয়ে পড়ে। ইংরেজি সাহিত্য। ওর কেমন রেজাল্ট হল, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মেজো জেঠু-জেঠিমা জানে যে, এমএ করার পরে বিন্নিদির বিয়ে দিয়ে দেবে।

আমিও কেন যে মেয়ে হয়ে জন্মালাম না! এক দিন বিন্নিদিকে বলেওছিলাম এই ব্যাপারে।

আমরা ছাদে বসেছিলাম সে দিন। বিন্নিদি একটা বই পড়ছিল। আমার কথা শুনে বইয়ের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বইটা বন্ধ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার পর বলেছিল, “তোর মনে হয় মেয়ে হওয়া খুব সহজ, না রে?”

“নয়?” আমি অবাক হয়েছিলাম, “দেখ, তোর প্রতি কারও এক্সপেক্টেশন নেই। তোকে রোজগার করতে হবে সেই চাপ নেই! হ্যাঁ, বাচ্চা হতে শরীরে কষ্ট হয় খুব। কিন্তু সেটা বাদ দিলে দেখ, জীবনে সেভাবে কোনও টেনশনই নেই!”

“নিজে কিছু হতে চাওয়া, সেটা বুঝি খারাপ। একটা কথা ভাব জুলু, তোর প্রতি কারও এক্সপেক্টেশন নেই মানেটা বুঝিস? মানে, তোকে কেউ মানুষ বলেই ধরে না। তুই জাস্ট আছিস আর কী! বার্ডেন যেন। বিয়ে দিয়ে যেন বিড়াল পার করে সবাই বেঁচে যাবে। স্বামী সেক্স নেবে আর তার বাড়ির আনপেড সার্ভেন্ট হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে! তুই ভাব, এটা কোনও জীবন? এক্সপেক্টেশন না থাকাটা ভাল কথা নয় কিন্তু,” একটানা কথা বলে বিন্নিদি হাঁপাচ্ছিল।

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

বিন্নিদি আবার বলেছিল, “এই এক্সপেক্টেশন না থাকার মধ্যেকার অপমান, অবহেলা, কষ্টটা বুঝিস? ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে থাকার কষ্টটা বুঝিস? সারা জীবন কি আমরা এমন কিছু না-হয়েই থাকব? যে যাই বলুক, এম এ পাশ করার পরে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। আমি চাকরি করব। স্কুলের চাকরি।”

বিন্নিদি নিজের কথা বলেছে, ঠিক আছে। ওটা ওর মত হতেই পারে। কিন্তু আমার ইনসিগনিফিকেন্ট হতে কোনও আপত্তি নেই! আমি স্ট্রেস, প্রেশার নিতেই পারি না। কষ্ট হয় মাথার মধ্যে।

কিন্তু এই জন্মে তো আর উপায় নেই। তাই ক্যালকুলাস খুঁটে খুঁটে জীবনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। স্ট্যান্ড না করলেও স্টার পেতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এক বারে না হলেও দু’বারের চেষ্টায় অন্তত চান্স পেতে হবে!

জামাটা গায়ে গলিয়ে চুলটা আঁচড়ালাম। তার পর ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগটা দেখলাম। মাসের শেষ প্রায়। কুড়ি টাকা পড়ে আছে। সেটাই নিয়ে নিলাম। খেলে ফেরার সময় টিউশনিতে যেতে হবে। বিচ্ছুটাকে পড়াতে হবে আজ।

“জুলু বেরচ্ছিস?” মা এসে দাঁড়াল দরজায়। মায়ের মুখটা সামান্য ফুলেছে। দুপুরে ঘুমের ফল। মা আর দুই জেঠিমা সবাই দুপুরে একটু ঘুমোয়। তার পর যে আগে ঘুম থেকে ওঠে, সে চা করে। আমাদের পরিবার এখনও যৌথ জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যে ঠোকাঠুকি হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। ঝগড়ার পরে মিলমিশ হয়ে যায় দ্রুত। সব নিয়ে মোটামুটি শান্তিতেই চলে আমাদের জীবন।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম, “আমি মাঠে যাচ্ছি। পড়িয়ে ফিরব। এখন কিছু করতে পারব না।”

“আঃ, খালি না আর না!” মা সামান্য রেগে গেল, “আরে, চায়ের পাতা ফুরিয়ে গিয়েছে। তুই একটু নারুর দোকানে বলে দে না। ওদের ন্যাড়া বলে ছেলেটা দিয়ে যাবে। সঙ্গে দু’প্যাকেট নানখাটাই দিয়ে যেতে বলিস। এই নে টাকা।”

এই হয়েছে ঝামেলা। বাড়ির যা ফাইফরমায়েশ আমাকেই খাটতে হবে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাটা নিলাম।

মা বলল, “তোর যাওয়ার পথেই তো পড়বে। এমন মুখ করে আছিস কেন? মায়ের কথা শোন, আখেরে ভালই হবে, দেখিস।”

আমি জুতো পায়ে গলিয়ে বেরোতে গেলাম, কিন্তু আবার বাধা! এবার বিন্নিদি। দোতলার সিঁড়ি থেকে উঁকি দিয়ে বলল, “জুলু, আসার সময় আলুকাবলি নিয়ে আসবি? দু’টাকার। আনিস, আমি টাকা দিয়ে দেব। প্লিজ়। ভুলিস না কিন্তু!”

মুদিয়ালি মোড়ে চয়নদা খুব ভাল আলুকাবলি করে। কিন্তু আমার পড়িয়ে ফিরতে তো আটটা হয়ে যাবে। তখন কি চয়নদা থাকবে?

তবে আমি আর এই নিয়ে কথা বাড়ালাম না। ঠিক আছে বলে বেরিয়ে গেলাম।

আমার সাইকেল নেই। হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়। নারুদার দোকানটা আমার যাতায়াতের পথেই পড়ে।

আজ গুন্ডাদা নারুদার দোকানেই বসেছিল। গুন্ডাদাকে ঘিরে

ওরই দলের কিছু ছেলে জটলা করে রয়েছে। ব্যাপারটা কী হল! ওদের ভাবভঙ্গি দেখে ভাল লাগল না আমার।

আমি পাশ কাটিয়ে স্টেশনারি দোকানে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই দোকানে নারুদার ছেলে বান্টি আর হেল্পার হিসেবে ন্যাড়া বসে।

আমি মায়ের কথামতো চা আর নানখাটাই বিস্কিট বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে, টাকাটা হাতে ধরিয়ে দিলাম।

"জুলু, কোথায় যাচ্ছিস?" পাশ থেকে গুন্ডাদা ডাকল আমায়।

আমি দেখলাম গুন্ডাদাকে ঘিরে গোল করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন একটু সরে গিয়ে একটু ফাঁক করে দিয়েছে। গুন্ডাদার মুখ-চোখ লাল। চুলগুলো এলোমেলো। বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম গুন্ডাদার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে গুন্ডাদা?"

গুন্ডাদা নাক টানল। তার পর পকেট থেকে সিগারেট বের করে সময় নিয়ে ধরাল। টান দিয়ে অনেকটা ধোঁয়া টেনে নিল বুকের মধ্যে। কিছুক্ষণ ধরে রেখে ধোঁয়াটা ছেড়ে দিল। সাদা ধোঁয়া এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে গেল আশপাশে। গুন্ডাদা জিভের ডগা থেকে কিছু একটা তুলে আঙুলের টোকায় ফেলে বলল, "একটা বাঞ্চোতের গাঁড় ভেঙে দিয়ে এসেছি। মিঠু ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে প্রায় রোজই হারামজাদাটা পেছন পেছন ঘুরছিল। নানান কথা বলে টিজ় করছিল। কাল দেখি মিঠু কাঁদছে। আজ আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। তপন থিয়েটারের সামনে ধরেছিলাম হারামিটাকে।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

গুন্ডাদা বলল, "সৌর অফিস থেকে এলে এক বার আমাদের বাড়িতে আসতে বলিস তো! মিঠু খুব আপসেট হয়ে আছে!"

পাশ থেকে জগা বলে একটা ছেলে বলল, "গুন্ডাদা, ছেলেটাকে অতটা না মারলেও পারতে। ও কিন্তু বেনে পাড়ার ছেলে। পলিটিকালি কানেক্টেড হতে পারে। আবার কী লাফড়া হবে কে জানে!"

গুন্ডাদা চোয়াল শক্ত করে জগার দিকে তাকাল, "ওই বাঞ্চোতকে যে মেরে ফেলিনি সেটাই ওর বাপের ভাগ্য। মিঠুর সঙ্গে কেউ কিছু করলে তাকে আমি ছাড়ব ভেবেছিস?"

আমার বিরক্ত লাগল। ফালতু এসব গুন্ডামি আমার ভাল লাগে না। জেঠুদের কী যে আক্কেল, এমন বাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাদাভাইয়ের বিয়ে ঠিক করেছে! দাদাভাইয়ের এসব দিকে মন নেই। আজ পর্যন্ত কোনও মেয়ের দিকে তাকায়নি। তাই বলে তোমরা যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে! আশ্চর্য!

আমি বললাম, "আমি আসি গুন্ডাদা। দাদাভাই ফিরলে বলে দেব।"

গুন্ডাদা মাথা নাড়ল। বলল, "কাল আসিস। ক্যারাম খেলব। আজ কিছু ভাল লাগছে না! আচ্ছা জুলু, ওপার কেসটা কী বল তো?"

ওপা! আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার মনের মধ্যেকার এরিয়ালও দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপাকে নিয়ে কেউ কিছু বললে আমার সারা শরীরটাই কান হয়ে ওঠে!

আমি বললাম, "কী কেস?"

গুন্ডাদা উঠে এল এবার। তার পর আমার কাঁধ ধরে ভিড়ের মধ্য থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "দেখ, আমার খুড়তুতো বোন ও। আমারও তো একটা দায়িত্ব থাকে। মেয়েটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে, জানিস! তোরা এক বয়সি। একটু চোখে চোখে রাখিস তো!"

আমি অবাক হলাম। ওপাকে আমি চোখে-চোখে রাখব! ওপাও সায়েন্স নিয়ে পড়ে। কিন্তু আলাদা কোচিংয়ে। ওকে আমি কীভাবে চোখে-চোখে রাখব!

গুন্ডাদা আমায় বলল, "জানিস, ওর ড্রয়ার থেকে সিগারেট পাওয়া গিয়েছে। আর... আর..."

"আর?" আমি চোয়াল শক্ত করলাম।

গুন্ডাদা গলাটা আরও নামিয়ে বলল, "গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে।"

"কী!" আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। বুকের মধ্যে আড়াই হাজার শ্রমিক এক সঙ্গে যেন কোদালের কোপ মারল।

গুন্ডাদা বলল, "জানিস তো কী জিদ্দি মেয়ে! এক বার কয়েক বছর আগে ওকে ওর বন্ধুদের নিয়ে কী সব বলা হয়েছিল। মানে, ওকে ওদের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল কাকু-কাকিমা। তাতে মেয়েটা হাতের শিরা কেটে ফেলেছিল রাগের চোটে। কাকু-কাকিমা ভিতু আর ভাল মানুষ। মেয়েকে হেভি ভয় পায়! তাই কেউ ডাইরেক্টলি কিছু বলে না। আর এই জিনিসগুলো পেয়েছি আমি। কাউকে বলতেও পারছি না। তুই জুলু, একটু দেখিস প্লিজ়। বিশাল চিন্তায় আছি!"

আমি গুন্ডাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লেকের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার মাথা টলমল করছে। গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট! ওপার কাছে! কেন? কার সঙ্গে কী করছে ওপা? আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। সারা শরীরে কেমন যেন ঝিঁঝি ডাকছে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ জমছে। ঝড় হবে কি? কালবৈশাখী! আমি কি মাঠে যাব? পড়াতে যাব? নাকি বাড়ি ফিরে যাব? রাগ হচ্ছে আমার। কান্না পাচ্ছে। বুকের মধ্যে এক জোড়া নেকড়ে যেন ধারালো নখ দিয়ে আমায় ফালা ফালা করছে। হিংসের বিষে আমার সারা শরীর কি সবুজ হয়ে উঠল!

কখন মুদিয়ালি মোড় পার করে লেকের রাস্তায় ঢুকে পড়েছি খেয়াল নেই। আচমকা শুনলাম পেছন থেকে টিংটিং করে বেল বাজছে। আমি রাস্তার এক পাশে সরে গেলাম। কিন্তু বেলটা তাও থামল না। কে রে? আমি বিরক্ত হয়ে ঘুরলাম। দেখলাম বেলা। ওঃ, আবার এই মেয়েটা কেন?

বেলা এসে আমার পাশে দাঁড়াল। মুখে হাসি। বলল, "কী গো, বেল দিচ্ছি, শুনছ না?"

আমি বিরক্তি না লুকিয়ে বললাম, "আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না এখন। কিছু বলবে?"

বেলা কেমন যেন গুটিয়ে গেল এক নিমেষে। বলল, "আসলে ফিজ়িক্সের দুটো অঙ্ক পারছি না। যদি একটু দেখিয়ে দিতে। আমার তো ফিজ়িক্সের স্যার নেই। তাই..."

হ্যাঁ, ইংরেজি আর অঙ্ক ছাড়া বেলা আর কোনও টিউশন পড়ে না। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। এটা বলার জন্য আমায় দাঁড় করিয়ে দিল! কালকেই তো অঙ্ক স্যারের কাছে দেখা হত, তখন বলতে পারত না?

বেলা বড় বড় চোখ মেয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কিন্তু আমি ওর দৃষ্টি পার করে ওর পেছনের রাস্তায় তাকালাম। যেন আমার ফোকাস শিফট করল। দেখলাম ওপা আসছে!

ওপা এখন? এখানে! আমার বুকের মধ্যে আবার নদীর পাড় ভাঙল যেন! ওপার পাশে একটা ছেলে। লম্বা। কান-ঢাকা চুল। ম্যাগি-হাতা জামা। দেখেই মনে হচ্ছে মিঠুন চক্রবর্তীকে নকল করে জামাকাপড় পরে।

ওপা আমায় দেখে হাত তুলে বলল, "জুলু! এই জুলু!"

সাইকেলে বসেই বেলা ঘুরে তাকাল ওপার দিকে। ওপা ছেলেটাকে পেছনে ফেলে হনহন করে এসে দাঁড়াল আমার পাশে। তার পর আচমকা আমার হাত পেঁচিয়ে ধরে বলল, "এই তোকেই তো খুঁজছিলাম আমি। আমায় আজকাল একদম পাত্তা দিস না কেন বল তো! এই বেলা, আমি একটু জুলুকে নিয়ে যাচ্ছি, কেমন!"

বেলা কী বলবে যেন বুঝতে পারল না। আমিও ঘাবড়ে গেলাম। ওপা তো এমন করে না! আমি ওকে পাত্তা দেব না! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা! ও নিজেই তো আমার থেকে কেমন যেন পিছলে পিছলে থাকে! তা হলে এখন এমন করছে কেন?

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। দেখলাম, লম্বা ছেলেটা কেমন যেন ভেবলে গিয়েছে। ওপা আমার হাতটা আরও জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে নিজের শরীর ঘষে বলল, "চল না। কেন দেরি করছিস?" বলে বেলা আর ওই ছেলেটার সামনে থেকে আমায় টেনে নিয়ে লেকের উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল।

আমার শরীর আর সবুজ নেই! এখন কি তবে গোলাপি! জীবনের মধ্যেই কি ম্যাজিক রিয়্যালিজ়ম লুকিয়ে আছে! নাকি আমাদের মনের মধ্যে!

॥ ৪ ॥
বেলা

বুচা আমায় চুমু খেতে চায়! ভেবেই আমার গা-টা কেমন যেন করছে! মনে হচ্ছে সারা গায়ে জোঁক পড়েছে!

কিলবিলে প্রাণী গায়ে পড়লে কেমন লাগে আমি জানি। যদিও কীটপতঙ্গ আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু একমাত্র জোঁক এমন একটা জিনিস, যা দেখলেই আমার শরীরের মধ্যেটা কেমন করে! সেই ছোটবেলায় এই বাড়ির সকলের সঙ্গে সিকিমে ঘুরতে গিয়েছিলাম এক বার। তখন জঙ্গলের মধ্যে বড় গাছ থেকে আমার মাথায় আর গরম জামার মধ্যে জোঁক পড়েছিল!

এই গা ঘিনঘিনে ব্যাপারটা আমি অনুভব করি আলোজেঠুর ঘরে গেলেও। আর আজকে লাগল বুচার কথা শুনে! ও পেটে-পেটে যে এমন কিছু পাকাচ্ছে, সেটা সত্যিই আমি এত দিন বুঝতে পারিনি!

লোডশেডিং তো কলকাতার নিত্যদিনের ঘটনা। স্যারের বাড়িতেও আজ আলো চলে গিয়েছিল। আমরা সবাই স্যারের ছাদের ঘর থেকে ছাদে বেরিয়ে এসেছিলাম। যদিও পড়া হয়ে গিয়েছিল, তাও স্যার সবাইকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন এই বলে যে, উনি দশটা অঙ্কের একটা সেট আমাদের দেবেন। সেটা পরের দিন যেন সবাই সলভ করে আনি।

টিউশনে ছেলেমেয়ে মিলে মোট চোদ্দো জন পড়ি আমরা। স্যারের ছাদে সবাই বসে আড্ডা মারছিল। আমি সবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসা কলকাতাকে দেখছিলাম।

এই সময়টা আমার দারুণ লাগে! আকাশের চূড়াটা কেমন যেন ঘন নীল হয়ে থাকে। আর সেখান থেকে রং পাল্টাতে পাল্টাতে দিগন্তে এসে আকাশটা কেমন আবছা কমলা হয়ে যায়। সূর্য ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটাই যেন প্রিয় মানুষ চলে যাওয়ার মতো। সে চলে যায়, কিন্তু তার ভালবাসার আভা ছড়িয়ে থাকে মনে, আকাশে।

মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় ভালবাসা ছাড়া আর কী-ই বা আছে জীবনে! এমন আকাশ যত বার দেখি, তত বার আমার জুলুর কথা মনে পড়ে! আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যেও অমন একটা সূর্য ডুবে যাওয়ার পরের কমলা আভা ছড়িয়ে পড়ে।

এই তো ওপা আমায় সে দিন বলেছিল, "তুই ফালতু সেন্টিমেন্ট ধরে বসে আছিস। ভালবাসা ইজ় নট ইমপর্ট্যান্ট। এনজয়মেন্ট ইজ় ইমপর্ট্যান্ট।"

"মানে?" আমি খুব অবাক হয়েছিলাম ওপার কথায়।

ওপা বলেছিল, "আমি যার সঙ্গে এনজয় করি, তাকে সময় দিই। যেদিন এনজয়মেন্ট থাকবে না, তাকে ফুটিয়ে দেব!"

"এনজয়মেন্ট? কার সঙ্গে?" আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ওপা হেসে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, "বলব বলব, পরে তোকে একদিন বলব।"

আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল, "জুলু?"

"জুলু!" ওপা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, "ওর দুধের দাঁত পড়েনি, ও কী প্লেজ়ার দেবে?"

আমি আর কিছু বলিনি। কোনও কোনও সময় মানুষের কথা শুনে বুঝে নিতে হয় যে, এর পর কথা বাড়ালে সেটা শক্তি ও সময় ক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু সেই মেয়েই সে দিন বিকেলে রাস্তায় জুলুকে হাত ধরে ওরকম হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল কেন! যদি ওকে পছন্দই না করবে, তা হলে ওকে ওইভাবে নিয়ে যাওয়ার মানে কী!

আমার খুব খারাপ লেগেছিল। এমনিতেই জুলু যে আমায় দেখেও দেখে না, সেই ব্যাপারে একটা কষ্ট তো আছেই! ওই যে ফিজ়িক্সের অঙ্ক দেখিয়ে দিতে বলেছিলাম, সেই ব্যাপারে জুলু কিছু বললই না। সত্যিই আমার ওই অঙ্কগুলো হচ্ছে না। আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হব না। কিন্তু বিএসসি-তে তো ভর্তি হব। সেটার জন্য ভাল রেজ়াল্ট না করলে ভাল কলেজে চান্স পাব না যে!

মা আমায় বলে আলোজেঠুকে বলতে। বলে, "তুই বল না তোর আরও টিউশন লাগবে। ফিজ়িক্স। কেমিস্ট্রি। বায়োলজি। বল না। বললে 'না' করবেন না!"

মা যখন এমনটা বলে, তখন আমার মায়ের ওপর কী যে ঘৃণা হয়, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। সব জেনেও কোন মা এমন করে মেয়েকে ছেড়ে দেয় রাক্ষসের সামনে! নিজের মেয়ে হলে পারত! মা যে অন্ধ হয়ে থাকে, তা কি কেবল সিকিওরিটির জন্য! এখান থেকে বের করে দিলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, সেই জন্য! বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কি সব কিছু মেনে নিতে হয়?

মা আমার দৃষ্টি রেখে বলেছিল, "আহা, উনি তো আর তোর মধ্যে... মানে ইয়ে... সে সব কিছু করেন না। জানিস তো... শুধু মালিশ! এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আমায় অস্বস্তিতে ফেলিস কেন? তুই না করলে আমাদের যে বাড়ি থেকে... মানে বুঝিস তো!"

গা হাত পা টেপায়! আর কিছু করায় না বুঝি! ভাবলে মাঝে মাঝে মনে হয় আলোজেঠুকে আমি খুন করে ফেলি! কিন্তু জানি সেটা সম্ভব নয়। নাকি সাহসী হলেই সম্ভব!

আমি স্যারের ছাদে একা-একা দাঁড়িয়ে এ সবই ভাবছিলাম। তখনই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বুচা।

আমি ভেবেছিলাম ওই তো জুলু— পাপিয়া, শিল্পী, নীলাঞ্জনা আর সুজাতার সঙ্গে গল্প করছে। ও কি এসে দাঁড়াতে পারত না!

বুচা এসে আমার দিকে একটা চিকলেট বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি নিয়েছিলাম। বুচা নিজেও একটা মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলেছিল, "ছোট চুলে তোকে ঘ্যামা লাগছে কিন্তু।"

আমি কিছু না বলে সামান্য হেসেছিলাম। এই প্রথম কেউ চুল কাটা নিয়ে ভুলভাল কিছু বলল না।

বুচা নাক টেনে, হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলগুলো ঠিক করতে করতে আবার বলল, "তার পর? কী মনে হচ্ছে? ইন্ডিয়া ফাইনালে যেতে পারবে?"

"মানে?" আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

"আরে, সামনে বিশ্বকাপ না? জুনের ন'তারিখ থেকে! প্রথম দু'বার তো যা-তা ভাবে হেরেছিল। এবার? ফাইনালে উঠবে?"

ক্রিকেট দেখি আমি। ভালই লাগে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ক্রিকেট নিয়ে সব খবর রাখব। আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "জানি না।"

"কী জানিস না?"

আমি আরও বিরক্ত হয়েছিলাম। দেখছিলাম নীলাঞ্জনা জুলুর মাথায় হাত দিয়ে কী একটা কুটো সরিয়ে দেওয়ার নাম করে গালটাও আলতো করে টিপে দিল!

বুচা আমার কাছে এসে গলা নামিয়ে বলেছিল, "একটা কথা বলব? একটা বাজি ধরবি?"

"কিসের বাজি?" আমি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলাম।

"ইন্ডিয়া কি ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারবে?" বুচা গলাটা আরও নামিয়েছিল।

আমি মাথা নেড়েছিলাম, "এটা তো বাচ্চাও জানে। পারবে না।"

বুচা বলেছিল, "আর যদি পারে?"

"পারলে পারবে!" আমি পাত্তা দিইনি।

বুচা বলেছিল, "যদি পারে তা হলে আমি তোকে চুমু খাব। রাজি?"

আমি আমার বিপজ্জনক সাইকেলটা থামালাম এবার। স্যারের বাড়ি থেকে এই রামবচনদাদুর দোকানে আসার পথটায় আমার খালি বুচার শেষ কথাটাই মাথায় ঘুরছিল। ছেলেটা এমনটা বলল কেন? আমায় চুমু খেতে চাইল কেন? ও তো কোনও দিন এমন বলে না। কথাটা বলে বুচা আর আমার দিকে তাকায়নি। সরে গিয়েছিল। আমার তখন থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছিল। ওই ব্যাচে কেউ খুব একটা আমার সঙ্গে কথা বলে না। না ছেলেরা, না মেয়েরা। সবাই কেমন যেন এড়িয়ে চলে আমায়। আমিও সবাইকে তুমি তুমি করে বলি। কেবল বুচাই আছে

যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বচ্ছন্দ আর তুই-তোকারির। সেখানে কিনা ছেলেটো এসব বলে দিল! কেউই কি স্বাভাবিক কিছু রাখতে দেবে না!

রামবচনদাদু বসেছিল নিজের নিচু চৌকিটায়। লোকটা ভাঙ্গারওয়ালা। লেক মার্কেটের পেছনে ওর এই দোকানটা অনেক পুরনো। কোথা থেকে যে এমন সব পুরনো আর ভাঙাচোরা জিনিস নিয়ে আসে লোকটা কে জানে!

ইউপি-র লোক রামবচনদাদু। কলকাতায় আছে প্রায় চল্লিশ বছর। দু'ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এক মেয়ে ছিল। সে মারা গিয়েছে। কেন কে জানে, আমায় খুবই ভালবাসে রামবচনদাদু। আমিও লোকটার জন্য টুকটাক খাবার তৈরি করে নিয়ে যাই। আমাদের বাড়িতে যেহেতু রান্নাবান্নার সবটাই আমার মায়ের হাতে, তাই ওখানে আমার একটা স্বাধীনতা আছে। কিছু রান্না করলে কেউ কিছু বলে না।

আর লুনাদিদি আসার পর থেকে তো এই ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। আমি এক দিন লুনাদিদিকে মোগলাই পরোটা করে খাইয়েছিলাম। সেটার পরে লুনাদিদি প্রায়ই আমায় এটা-ওটা করতে বলে। এই ক'দিনে লুনাদিদির সঙ্গে আমার একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। যদিও সম্পর্কের ডায়নামিক্সে সেটা প্রভু-ভৃত্য টাইপ, কিন্তু তাও লুনাদিদি অন্তত আমায় মানুষ বলে গণ্য করে।

রামবচনদাদু আমায় দেখে হাসল। বলল, "কী রে এতদিন পরে এলি! দেখে নে কী কী লাগবে। আয় ভেতরে।"

স্যারের বাড়ি থেকে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে এসে আমার জল তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। আমি দোকানের কোণে বসানো একটা কুঁজো থেকে পাশে রাখা কলাই করা গ্লাসে জল গড়িয়ে খেলাম। তার পর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে ব্যাগের ভেতর থেকে একটা পাতলা টিফিন বক্স বের করে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "চিঁড়ে-বাদাম ভেজেছি তোমার জন্য। খাও!"

রামবচনদাদু খেতে ভালবাসে খুব। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার পর টিফিন বাক্সটা খুলে, ভেতরে রাখা স্টিলের চামচ দিয়ে খেতে শুরু করল।

আমার ভাল লাগল দেখে। এই রামবচনদাদু, বৃন্দাবনদা, মুসাফিরদা, মনোহরদা এরা আমার কে হয়? কেউ নয়। তবু এরা আমায় কত আপন করে রাখে! নিজের মতো করে কথা বলে। ভালবাসে। সাহস জোগায়। জীবনে এই সাহস জোগানোটা খুব দরকার। এই পৃথিবীতে সবাই তো সবার মন ভাঙতে, আর মনোবল নষ্ট করে দিতেই যেন বসে থাকে। সেখানে দু'-একটা মানুষ যদি সাহস দেয়, তা হলে তাদের মতো বন্ধু আর কেউ হয়!

আমি এবার ডাঁই করে রাখা ভাঙা আর পুরনো জিনিসের মধ্যে মন দিলাম।

ছোটবেলায় আমার কোনও খেলনা ছিল না। পাড়ার কেউ দয়াপরবশ হয়ে এটা-ওটা ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে যেত। সেগুলোই আমি যত্ন করে সারিয়ে তুলতাম। নানান রকম জিনিস জুড়ে সেগুলোকে নানান আকার দিয়ে ঝুলনের মতো করে সাজাতাম।

এই বাড়িতে আসার পর যেহেতু মাকে আর আমাকে একটা বড় ঘর দেওয়া হয়েছে, সেই ঘরের এক পাশেই আমি কিছুটা জায়গা নিয়ে নানান জিনিস তৈরি করি। ঝুলনের মতো শহর, এয়ারপোর্ট, গ্রাম ইত্যাদি তৈরি করে সাজিয়ে রাখি। একে যে ডায়োরামা বলে সেটা যদিও জেনেছি বেশ কিছু পরে, কিন্তু এই কাজটা করতে আমার এত ভাল লাগে যে, কী বলব! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতেই কেটে যায় আমার।

লুনাদিদি তো এসব দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। আমায় বলেছে, বিদেশে থাকলে এই সব করে নাকি আমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারতাম! আমাদের দেশে এমন হওয়া মুশকিল। লোকজনের টাকা কই! সেই দৃষ্টিভঙ্গি কই!

ঘণ্টা দেড়েক ধরে আমি বেশ কিছু ভাঙা গাড়ি, পুরনো প্লাস্টিকের সৈনিক, কিছু সলিড প্লাস্টিকের পশুর মডেল জোগাড় করলাম। আমি যে শহরটা বানাচ্ছি, তাতে একটা সেনা ছাউনি আর চিড়িয়াখানা বানাব।

সব ক'টা জিনিস নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রামবচনদাদু হাসল আমায় দেখে। জিজ্ঞেস করল, "এ সব তো ঠিক আছে, কিন্তু পড়াশোনা করছিস তো ঠিক করে? ওটা ছাড়া আর সব কিন্তু বেকার জানবি।"

আমি মাথা নাড়লাম। আমি কি আর জানি না, ওটা ছাড়া আর সব কিছু বেকার!

আমি খালি টিফিন-বাক্সটা ব্যাগে ভরে নিলাম। তার পর জিনিসগুলো প্লাস্টিকের মধ্যে ভরে, সেটাও ব্যাগে ঢোকালাম। এ সবের জন্য রামবচনদাদু আমার কাছ থেকে কোনওরকম টাকাপয়সা নেয় না।

আমি "আসছি গো। আবার কয়েকদিন পর আসব," বলে দোকান থেকে বেরোলাম।

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। আমি রাস্তায় নেমে সাইকেলের দিকে এগোলাম। এই সর্দার শঙ্কর রোড থেকে আমাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। রাস্তাটায় হলুদ টিমটিমে আলো জ্বলে আছে কয়েকটা। কালো হলুদ ট্যাক্সি পার্ক করা আছে পাশে। একটা পুরনো বাড়ির বারান্দায় বসে আরও পুরনো একটা লোক খকখক করে কেশে চলেছে! কোথাও গান বাজছে রেডিয়োতে। আর ধোঁয়া উড়ছে। ইস্ত্রিওলার ছোট্ট উনুন থেকে পাতলা চুনজল রঙের ধোঁয়া, পোড়ামাটির গন্ধ ছড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে রাসবিহারী মোড়ের দিকে। আর ধোঁয়ার সেই গতিপথ ধরেই আমি দেখলাম ওদের। মানে লুনাদিদি আর সৌরদাকে।

সৌরদা ক'দিন হল এসে লুনাদিদিকে পড়িয়ে যাচ্ছে। আলোজেঠুই ঠিক করে দিয়েছে। কিন্তু ওরা দু'জনে এখানে কী করছে? এমন আধো আবছায়া রাস্তায়!

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ওরা কি একটু বেশি কাছে-কাছে হাঁটছে! নাকি আমারই চোখের ভুল! মানে এই তো ক'টা দিন দু'জন দু'জনকে চিনেছে। তা হলে!

আমি তাকিয়েই রইলাম। ওরা আমায় দেখেনি। ওই সামনের মোড় থেকে ওরা বাঁ দিকে বাঁক নেবে বলে ঘুরল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, বাঁক ঘোরার ঠিক মুখে লুনাদিদি হাতের আঙুলগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরল সৌরদার হাতের আঙুলগুলো। দেখলাম, সৌরদাও আলতো করে টেনে লুনাদিদিকে নিজের আরও কাছে নিয়ে নিল।

ওরা বাঁক নিয়ে নিয়েছে। সামনের নির্জন রাস্তা এখন শূন্য। কিন্তু আমার কেমন যেন লাগল! মনে হল, এই সময় ঝড় উঠে কড়কড় করে একটা বাজ পড়লে খুব ড্রামাটিক হত না কি!

কিন্তু জীবন তো মনমোহন দেশাইয়ের ছবি নয়! জীবন হল দীর্ঘ, নির্জন আর সাপের দেহের মতো শীতল এক নভেল!

মে মাসের শেষ সপ্তাহে দাঁড়িয়েও আমার কেমন যেন হঠাৎ শীত শীত করে উঠল! মনে হল এক অদ্ভুত ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতায়। জীবনে।

।।সৌরর ডায়েরি থেকে।।
।।খ।।

...আর তুমি যে আমার দিকে ওরকম ভাবে তাকাবে, তুমিও যে আমায় ভালবাসবে, তা কি আমি ভেবেছিলাম কোনও দিন? তোমার হাতের আঙুল যখন আমার আঙুলে জড়িয়ে যায়, আমি নিশ্চিত, তখন পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও কোনও না-কোনও মৃতপ্রায় মানুষ বেঁচে ওঠে ঠিক! কোথাও না-কোথাও সিংহের মুখ থেকে জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয় হরিণ শাবক! আমি নিশ্চিত, তখন দূর মেরুদেশে নিজের প্রিয়তমাকে দেবে বলে জেন্টু পেঙ্গুইন খুঁজে পায় তার চিরকাঙ্ক্ষিত নিটোল পাথর! তুমি কে? কোথা থেকে এলে আমার এই মরুভূমিতে? আমি কি এবার বেদুইন থেকে গৃহী হয়ে উঠব? তোমার চোখের নীল নদী কি গড়ে তুলবে আমার নতুন সভ্যতা...

॥ ৫ ॥
জুলু

ওপা বলেছিল, "আরে, মালটা এত গায়ে পড়ছে যে কী বলব!

আমার গানের ক্লাসে নতুন ভর্তি হয়েছে! পুরো চুয়িংগাম। চটিতে লাগলে উঠতেই চায় না। তাই তোর হেল্প নিলাম। ওকে বোঝানো দরকার ছিল যে, ওর কোনও চান্স নেই! তাই তোকে ইউজ় করতে হল।"

'ইউজ় করতে হল' কথাটা মনে পড়তেই কেমন যেন লাগল। মানে সে দিনের পর থেকে এই কথাটা যত বার মনে পড়ছে তত বারই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। মন খারাপ করছে! ওপার কাছে আমি শুধুমাত্র একটা টুল! সে দিন ছেলেটার থেকে সরে, আমায় নিয়ে গিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ওপর লাল স্কুল বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় এই কথাগুলো খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিল ওপা।

আমি দেখেছি মানুষকে কঠিন কথা বলে যতটা না আঘাত করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি আহত করা যায় তাকে পাত্তা না দিয়ে। ওই যে কথাটা সে দিন ওপা বলেছিল, তার মধ্যে এমন একটা হেলাতুচ্ছ ভাব ছিল, এমন একটা 'তুই কেউ নোস' ভাব ছিল যে, আমায় তা নুইয়ে দিয়েছে একদম!

সেপ্টেম্বর মাসে প্রি-টেস্ট আছে। কোথায় তা ভেবে সারাক্ষণ পড়াশোনা করব না মন খারাপ করে চেত্তা খেয়ে পড়ে আছি। আমি কি ওপার জন্য অবসেসড? নিজের ওপরেই আমার বিরক্ত লাগল। কিন্তু জীবনে এক-একটা সময় আসে, যখন আমাদের মন নিজের কথাই শোনে না!

এর মধ্যে একটাই ভাল খবর যে, ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট শুরু হয়ে গিয়েছে আর ইন্ডিয়া তার প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চৌত্রিশ রানে হারিয়ে দিয়েছে। এমন অভাবনীয় কাণ্ড যে ঘটতে পারে, সেটা আমি ভাবতেই পারিনি!

ক্রিকেট খুব ভাল লাগে আমার। কিন্তু তাও মন খুলে যে আনন্দ করব, সেটাই পারছি না। কারণ, সেই ওপার কথা। কথা বলার সময় ওর মুখের অভিব্যক্তি। কথার টোন। সবটাই আমাকে যেন ছয় মেরে মাঠের বাইরে, খেলার বাইরে ফেলে দিয়েছে! বুকের মধ্যেকার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল যে একটা কথাতেই এমন জনহীন প্রান্তর হয়ে যেতে পারে, সেটা ভাবতেই পারিনি!

আজ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের বসার ঘরে পাড়ার বয়স্ক লোকজনরা এসেছে। কেন এসেছে কে জানে! বাবা, দুই জেঠু আর দাদাভাই কথা বলছে ওদের সঙ্গে।

আমার ভাল লাগছে না ঘরে থাকতে। বুচার একটা ঠেক আছে লেকের কাছে দুধের ডিপোর পাশে। ভাবছি সেখানে যাব। এই মন নিয়ে ঘরে বসে থাকলে পড়াশোনা হবে না।

আমি উঠে হাফ প্যান্টের ওপর একটা পাজামা পরে নিলাম। গায়ে চাপালাম একটা হাফ পাঞ্জাবি। এই রাত আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে মা খ্যাচখ্যাচ করবে, তাই একটা খাতাও নিলাম। জিজ্ঞেস করলে বলব, বুচাকে নোটস দিতে যাচ্ছি।

আমার ঘরটা ছোট। একটা সিঙ্গল বেডেড চৌকি, ছোট পড়ার টেব্‌ল আর স্টিলের সস্তা আলমারি আছে মাত্র। দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। আমি টেব্‌ল থেকে চিরুনিটা তুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালাম।

তার পর ড্রয়ার খুলে দশ টাকা নিলাম। মাইনে পেয়েছি সদ্য। এখন হাতে টাকা আছে। কিন্তু অল্প করেই যে খরচ করতে হয়, এটা আমি জানি।

"কী রে কোথায় বেরোচ্ছিস?" দরজা থেকে দাদাভাইয়ের গলা পেলাম।

ঘুরে দেখলাম দাদাভাই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

দাদাভাইকে মিথ্যে বলি না আমি। বললাম, "ভাল লাগছে না রে! একটু তাই হেঁটে আসছি।"

"গুন্ডার ওদিকে যাবি না। আজ থেকে ওই নারুদার ঠেকের পাশে ক্যারামও খেলবি না," দাদাভাইয়ের গলায় বিরক্তি।

আমি অবাক হলাম। দাদাভাই কখনও তো এমন করে কথা বলে না। কী হল হঠাৎ!

দাদাভাই আমার মুখের ভাবটা বুঝল। ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বসল চৌকিতে। বলল, "দেখ, আমি মাধ্যমিকে আর এইচএস-এ স্ট্যান্ড করে যে নিজের কী বাঁশ নিয়েছি ভাবতে পারবি না! পড়াশোনা আমার মাথায় সহজে ঢোকে। দুঃস্থ বাচ্চাদের পড়াই। গান গাইতে পারি। ছবি আঁকতে পারি। ভাল চাকরি পেয়েছি। কিন্তু তার মানে কি আমি ভগবান? না সাধু! সবাই আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে, এমন সব জিনিস এক্সপেক্ট করে যে, আমি যেন নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করব! এত এক্সপেক্টেশন কেন আমার কাছ থেকে? এই পাড়া থেকে লোকজন এসেছিল, সামনে কী এক ফাংশন আছে, সেখানে নাকি আমাকে সংবর্ধনা দেবে! কেন? কী করেছি আমি? বাবা-কাকারা শুনে খুশি। আমি কত করে 'না' বললাম কেউ শুনলই না! আমি নাকি এগজ়াম্পল! লোকে আমাকে দেখে নাকি উদ্বুদ্ধ হবে! আরে, আমি হতে চাই না এগজ়াম্পল! সেই ছোট থেকে সবাই এত প্রেশারে রাখে সারাক্ষণ! ফালতু সব!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। দাদাভাই আজ খুব খেপে আছে। এমনটা দেখিনি আগে। আসলে শুধু আজ নয়, ক'দিন ধরেই দেখছি দাদাভাই যেন ঠিক আগের দাদাভাই নয়! সারাক্ষণ কেমন একটা অস্থিরতা, খিটখিটে ভাব। কী হয়েছে ওর!

দাদাভাই বলল, "আই অ্যাম টায়ার্ড অফ বিয়িং পারফেক্ট! আচ্ছা জুলু তুই বল, আমি বলেছিলাম কোনও দিন যে, মিঠুকে বিয়ে করব? আমি বলেছিলাম যে, ওকে আমার পছন্দ! গুন্ডা একটা ফালতু মাল। এক কাঁড়ি টাকা আছে শুধু। এসে বাড়ির লোকেদের বলল বিয়ের কথা, তারাও লোভে পড়ে বা ভয়ে রাজি হয়ে গেল! কেন? কেন আমায় মিঠুকে বিয়ে করতে হবে? ক'দিন আগে মিঠুর নাকি মন খারাপ ছিল। তোকে নাকি গুন্ডা বলেছিল আমায় বলতে। তুই ভুলে গিয়েছিলিস বলতে! যেতেই পারিস। মিঠু কে যে, তার কথা মনে রাখতে হবে! তার মন খারাপ হলে আমায় তার কাছে গিয়ে তাকে বাবা-বাছা করে আদর করে মন ভাল করতে হবে? আমি পারব না। আমি ভগবান নই। আমার মধ্যে অনেক কিছু খারাপ আছে। 'তুই ভাল ছেলে' বলে আর কত দিন লোকে আমায় ব্ল্যাকমেল করে নিজের স্বার্থমতো কাজ করিয়ে নেবে?"

আমি এবার দাদাভাইয়ের পাশে গিয়ে বসলাম। আজ দাদাভাই খুব রেগে আছে। অস্থির হয়ে আছে। কী হল হঠাৎ? আমার নিজের মন খারাপটা কেমন যেন পুরনো কাগজের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে।

"কী হয়েছে রে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দাদাভাই চোয়াল শক্ত করে বলল, "আমি... মানে... শোন জুলু, আমার আজ গুন্ডার সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে। তুই একদম ওর ওখানে ক্যারাম খেলতে যাবি না। আমি তোকে ক্যারাম বোর্ড কিনে দেব। ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনালে উঠলে বাড়ির জন্য টিভিও কিনব আমি। আর তোর জন্য ক্যারাম বোর্ড। তুই মোট কথা ওই দিকে যাবি না।"

দাদাভাই আর কিছু না বলে উঠে গেল। বুঝলাম, গুন্ডাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে এমনটা বলছে দাদাভাই। না হলে আমার দাদাভাই এমন মানুষ নয় যে, কোনও অন্যায় করবে। আমি জানি, মিঠুদি দাদাভাইকে খুব ভালবাসে। প্রায় রোজই কিছু না-কিছু রান্না করে ওদের বাড়ির কাজের ছেলে নিতাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। মিঠুদির রান্নার হাত দারুণ! তা ছাড়া দাদাভাই ওই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে ওপার কাছে আমি যাব কী করে!

আমার মাথা আরও ঘেঁটে গেল যেন!

আমি ঘরের বাইরে এসে একটা ঝোলানো ছাতা তুলে নিলাম। এটা ফোল্ডিং ছাতা। ছোটকাকা গত মাসে নেপালে গিয়েছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে। কালো বাঁকানো হাতলের মাঝে রুপোলি রঙের ছোট্ট চৌকো একটা বোতাম আছে। সেটা টিপলে ছাতাটা আপনা থেকে খুলে যায়! এ ছাড়াও নেপাল থেকে ছোটকাকা খুব হালকা সাদার ওপর নানান ছিটছিট রঙের হাওয়াই চটি নিয়ে এসেছে সকলের জন্য।

আমি আমার চটিটা পায়ে গলিয়ে দরজার দিকে গেলাম। আর তখনই মা ডাকল পেছন থেকে, "জুলু, তুই বেরোচ্ছিস?"

আমি পেছনে ফিরে মাথা নাড়লাম।

মা দেখলাম আপত্তি করল না। বরং এগিয়ে এসে আমার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, "নারুর দোকান থেকে একটা পাঁপড়ের বড়

প্যাকেট নিয়ে আসিস তো। আজ খিচুরি করছি। রাতে ভেজে দেব।”

নারুদার দোকান আমার যাতায়াতের পথেই পরে। কিনে নেব। কিন্তু সেখানে যদি গুন্ডাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে?

আমি ছাতা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

ছিপছিপে বৃষ্টিতে ভাঙাচোরা রাস্তার ছোট ছোট গর্তে জল জমে রয়েছে। হলদেটে দুর্বল আলোয় কলকাতার এই অংশটা কেমন যেন রংচটা, ম্রিয়মান। আশপাশের বাড়িঘরগুলোর মধ্যেও যেন এই মন খারাপের ছায়া রয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেমন অনুভব করি, আমাদের আশপাশের পৃথিবীটাও বোধহয় সেরকম হয়ে যায় ক্রমশ।

ভাবলাম, পাঁপড় কিনে আমি আর বুচার কাছে যাব না। এমনি খানিকটা এলোমেলো ঘুরব পাড়ার রাস্তায়, তার পর বাড়ি ফিরে যাব। আসলে কারও সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আর। ভাল লাগছে না কিছু।

একটা সামান্য মেয়ে, একটা সামান্য কথা কীভাবে বলেছে, সেই জন্য আমার মনটাই কেমন যেন তুবড়ে গিয়েছে! আমি বুঝতে পারছি যে, এমন করলে পড়াশোনায় ক্ষতি হবে। কিন্তু বুঝেও কিছু করতে পারছি না। আমাদের জীবনটা যেন কীরকম! ঠিক ভুল সব জানা থাকলেও সেইমতো কাজ করতে পারি না।

নারুদার দোকানের পাশে আজ প্লাস্টিক টাঙিয়ে ক্যারাম খেলা চলছে। ভাগ্য ভাল যে, গুন্ডাদা নেই! দাদাভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। কে জানে কোথায় গিয়েছে! আমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল। আবার কী না কী বলবে! বেকার ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। নিজের মন খারাপ নিয়েই আমি পারছি না, সেখানে আবার অন্যের ঝঞ্ঝাট কে নেবে!

একটা বড় পাঁপড়ের প্যাকেট দু'টাকা চার আনা। বাকি টাকা ফেরত নিয়ে আমি আবার রাস্তায় নামলাম।

যারা ক্যারাম খেলছিল, তাদের মধ্যে মাধব নামে গুন্ডাদার একটা চেলা আমায় বলল, “কী রে জুলু, একটা গেম খেলে যা। ক'দিন আসছিসই না তো!”

আমি ওকে কাটাতে বললাম, “সামনে পরীক্ষা মাধবদা। পরে আসব।”

“অ!” মাধব আর পাত্তা না দিয়ে খেলায় মন দিল।

আমি এগোলাম আর-একটু। সামনেই মাইতিদার রোলের দোকান। এটা নতুন খুলেছে। ভালই বানায়। এগ রোল আড়াই টাকা নেয়। আমার খিদে পায়নি। কিন্তু মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি রোলের দোকানে দাঁড়ালাম। এক-একটা দিন হয় না, যেদিন কিছুতেই মন ঠিক হয় না। আজ সেরকমই একটা দিন। যেদিন ওপা আমায় ওই কথাটা বলেছিল, সে দিন যতটা না খারাপ লেগেছিল, তার পর থেকে এক-একটা দিন যত এগিয়েছে, আমার খারাপ লাগাটাও ক্রমে ক্রমে গভীর হয়েছে।

এটা আমার একটা সমস্যা। কিছু একটা মনে লেগে গেলে সেখান থেকে বেরোতেই পারি না।

আমি একটা এগ রোলের অর্ডার দিয়ে ছাতাটা বন্ধ করে পাশে বন্ধ একটা দোকানের শেডের নীচে দাঁড়ালাম। মাইতিদাকে কষিয়ে লঙ্কা আর চিলি সস দিতে বলেছি। ঝাল খেয়ে ভেতরটা পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার।

“জুলু, তুই এখানে!”

আমি দেখলাম ছাতা মাথায় আমার দিকে এগিয়ে আসছে মিঠুদি!

এই সেরেছে! এখন এই সন্ধে প্রায় সাড়ে আটটার সময় মিঠুদি এখানে!

“তুমি?” আমি অবাক হলাম।

মিঠুদি আমার সামনে এসে শেডের নীচে ঢুকে ছাতা বন্ধ করল। বলল, “এখানে কী করছিস?”

“রোল খাব। তুমি খাবে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল মিঠুদি। না। দেখলাম, মিঠুদিকে কেমন যেন

উস্কোখুস্কো লাগছে। দাদাভাইয়ের জন্য কি?

মিঠুদি বলল, "জানিস, আজ সৌরর সঙ্গে দাদার খুব ঝগড়া হয়েছে! তার পর দাদা বাড়িতে গিয়ে আমায় খুব বকেছে। বলছে, সৌরর সঙ্গে আমি কী করেছি যে, সৌর আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

মিঠুদির গলাটা কেমন ভাঙাচোরা, জল-জমা রাস্তার মতো হয়ে গেল। বর্ষা শুধু একভাবেই আসে না।

মিঠুদি বলল, "কী হয়েছে রে জুলু? সৌর আজকাল এমন করছে কেন? ও কী চায়? আজকাল আসে না। কথা বলে না। সে দিন দেখা করতে গেলাম, এমন ভাব করল যেন আমি কেউ নই। আমি কী করেছি রে?"

"জানি না তো মিঠুদি," আমি আর কী বলব বুঝতে পারলাম না।

মিঠুদি টালুমালু চোখে তাকাল আমার দিকে। বলল, "আমি কী করব বুঝতে পারছি না। কাকিমার সঙ্গে কথা বলব?"

দাদাভাইয়ের মায়ের কথা বলছে মিঠুদি। কিন্তু আমি জানি তাতে লাভ হবে না।

বললাম, "দ্যাখো, মানুষের মন তো। দাদাভাই হয়তো কোনও সমস্যায় আছে। কিছু বলেছে তোমায়?"

মিঠুদির গলাটা আরও ভাঙল। কান্না স্পষ্ট হল গলায়। বলল, "বললে তো বুঝতাম তাও। ও আমায় ইগনোর করছে, এড়িয়ে যাচ্ছে। এটা যে সবচেয়ে খারাপ। আচ্ছা জুলু, ও কি সরে যাচ্ছে রে? সরে যেতে চায়? আগে তো এরকম ছিল না। ওকে ভালবাসি, এটাই কি আমার দোষ? ভালবাসি বলে এমন করে কষ্ট দেবে?"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আর আচমকা বৃষ্টিটা বাড়ল। পিচের রাস্তার ওপর চটরপটর শব্দ তুলে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে লাগল।

মিঠুদি বলল, "কী রে, বল!"

আমি তাকালাম মিঠুদির দিকে। মনে হল বলি, "তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করো।"

কিন্তু বললাম না। দেখলাম মাইতিদা রোলে লঙ্কা দিচ্ছে। ছিস্‌স্ শব্দ হচ্ছে তাওয়ায়।

গলা তুলে বললাম, "মাইতিদা আরও লঙ্কা দাও। আরও লঙ্কা! সব জ্বালিয়ে দাও ঝাল দিয়ে।"

মিঠুদি তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আর মনে হল ওটা মিঠুদি নয়, ওটা সেই বিকেলবেলায় লাল স্কুল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমি!

॥ ৬ ॥

বেলা

লেক মার্কেটের উল্টো দিকে বেশ কয়েকটা গলি আছে। এই গলির মধ্যেকার বাড়িগুলো বেশ পুরনো। আমার এই দিকে আসতে ভাল লাগে খুব। পুরনো কলকাতার একটা টুকরো এখনও কী ভাবে যেন রয়ে গিয়েছে এখানে। এখানেই একটা দোকান আছে ড্রাই ক্লিনার্সের। সেখানে আলোজেঠুর জামাকাপড় কাচতে দেওয়া হয়। এই সব কাজ বাড়ির অন্য লোকজন করে, কিন্তু আজ তাদের কেউ ফাঁকা নেই। এদিকে আলোজেঠুর নাকি ড্রাই ক্লিন করতে দেওয়া একটা কোট আজই খুব দরকার। মা তাই আমাকে বলেছে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ে আসতে।

আলোজেঠুর জন্য কিছু করতেই বিরক্ত লাগে আমার। কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে, উপায় নেই। এই বাড়িতে থাকতে হলে এমনটা না করে আমার কোনও উপায় নেই!

আজ পড়া ছিল আমার। সেসব সেরে আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গিয়েছিলাম।

এখানকার ফুটপাথে সার সার সব দোকান। নানান রকম হজমি, লজেন্সের বিশাল সম্ভার বলা যায়! গত দু'দিন আগে লুনাদিদিকে এই দোকানগুলোর কথা বলেছিলাম।

আর আজ পড়তে আসার আগে লুনাদিদি আমাকে দশ টাকা দিয়েছে, যাতে ওই দোকান থেকে নানারকম লজেন্স কিনে আনি। আমার এ ভাবে হাত পেতে টাকা নিতে খুব খারাপ লাগে। লুনাদিদিকে আমিই যখন ওই সবের কথা বলেছিলাম, তখন আমারই তো সে সব কিনে লুনাদিদিকে খাওয়ানোর কথা। সেখানে লুনাদিদি টাকা দিচ্ছে!

আলোজেঠু লুনাদিদিকে খুব ভালবাসে। বাড়ির মধ্যে যে-লোকটা রাক্ষসের মতো ঘুরে বেড়ায়! সবাইকে দাবড়ে, ধমকে পায়ের তলায় রাখে, সে একমাত্র লুনাদিদিকে দেখলে কেমন যেন নরম হয়ে যায়!

আমি আলোজেঠুকে বলতে শুনেছি, "লুনা, কেউ তোকে যদি কিছু বলে বা করে আমায় বলবি। আমি দেখব কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে! তুই আমার মেয়ে জানবি। আমি তোর মামা হলেও তোকে আমি মেয়ে হিসেবেই দেখি।"

আলোজেঠু এমন সরল ভাবে নিজের মনের কথা বলার মানুষ নয়। কিন্তু একমাত্র লুনাদিদিকেই এইভাবে কথা বলে।

লুনাদিদির বয়স চব্বিশ। এই বয়সে বাচ্চাসহ এরকম ভাবে একা থাকাটা খুব যে সহজ কাজ, তা নয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন খুব নিষ্ঠুর। এরকম একটা মেয়ের জীবন এমন হল কেন! কিন্তু তার পরেই মনে হয়, লুনাদিদি কি এখনও আদৌ সিঙ্গল!

মায়ের কাছে আমি শুনেছি যে, লুনাদিদির নাকি বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আলোজেঠুর এক বন্ধু থাকে জার্মানিতে। তার ভাইয়ের সঙ্গে নাকি লুনাদিদির বিয়ে হবে। সেই ভদ্রলোক লুনাদিদির সম্বন্ধে সব জানে। লুনাদিদির ছবি দেখে নাকি তার মাথা ঘুরে গিয়েছে! তাই সে বিয়ে করতে চায়।

লোকটার বয়স একটু বেশি। পঁয়তাল্লিশ মতো। কিন্তু তাতে আলোজেঠুর আপত্তি নেই। আসলে মা বলছিল যে, লোকটা নাকি আলোজেঠুর ব্যবসাতেও ইনভেস্ট করতে চায়। আলোজেঠু বিহারে একটা জায়গা নিয়েছে ফ্যাক্টরি খুলবে বলে। সেখানে লোকটাকে পার্টনার করা হবে।

আমার এ সব টাকাপয়সার কচকচি ভাল লাগে না একটুও। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে মা রেডিয়োর খবরের মতো পুটুরপুটুর করেই যায়। চুপ করতে বললেও শোনে না। তাই আজকাল আমি আর কিছু বলি না। এই বয়সেই একটা জিনিস আমি বুঝে গিয়েছি যে, মানুষ নিজের যা মর্জি হয় সেটাই করে, অন্যের কথা সে একদম শোনে না।

আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের পাশের দোকানগুলো থেকে স্পঞ্জ লজেন্স, পিপারমিন্ট, আর জ ব্রেকার কিনেছি। সঙ্গে জোকারের প্যাকেটওলা লজেন্সও কিনেছি দুটো। হজমি আজ ভাল ছিল না, তাই কিনিনি। মোট আট টাকা লেগেছে। দু'টাকা লুনাদিদি ফেরত পাবে!

লুনাদিদি সারা বাড়িতে আমার সঙ্গেই যা কথা বলে। কাকা বা কাকিমাদের সঙ্গে সে ভাবে কথা বলে না। নিজের বাচ্চাটাকেও খুব যে নিজের কাছে নেয় তাও নয়। সে সারাক্ষণই প্রায় আমার মায়ের কাছে থাকে। আজকাল দেখছি মা-ও বাচ্চাটাকে অন্য কাউকে দিতে চায় না। এমনকি, গত দু'দিন তো নিজের কাছে নিয়েই শুচ্ছে। এতে লুনাদিদির কিন্তু কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। মা হয়ে এমন ছাড়া-ছাড়া ভাব কেন কে জানে!

লুনাদিদির ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। সপ্তাহে দু'দিন করে সৌরদার আসার কথা ছিল লুনাদিদিকে সায়েন্সের নানান সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য। কিন্তু আমি এখন দেখছি সৌরদা পাঁচ দিন করে আসছে। কয়েক দিন আগে আমি ওদের হাতে হাত ধরে ঘুরতে দেখেছি লেক মার্কেটের পিছনের রাস্তায়! আমার সত্যি বলছি, ভয় লাগছে। সৌরদার সঙ্গে কি লুনাদিদি কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে! কিন্তু সৌরদার তো বিয়ে ঠিক বলেই শুনেছি। ওপার কাজ্জিন দিদির সঙ্গেই তো হওয়ার কথা! তা হলে এখানে আবার লুনাদিদি এসে ঢুকল কেন!

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার কি ব্যাপারটা জুলুকে বলা উচিত। ওকে বললে কি ও নিজের বাড়ির লোকেদের জানাবে? আলোজেঠু, গুন্ডা মস্তান এরা তো ভাল লোক নয়! কী থেকে যে কী হবে কে জানে!

আমার সাইকেলটার অবস্থা খুব খারাপ। বারবার চেন পড়ে যাচ্ছে। কাঁহাতক নেমে নেমে চেন তোলা যায়! তাও ভাল যে, আমি পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে ফিরি। তা হলেও কয়েকবার তো বড় রাস্তা

পার হতেই হয়। বড় রাস্তায় বাস বা গাড়ির সামনে চেন পড়ে গেলে খুব বাজে অবস্থা হবে।

ড্রাই ক্লিনার্সের দোকানটা একদম ফাঁকা। এক জন বয়স্ক ভদ্রমহিলা বসে রয়েছে। তার পাশে একটা রেডিয়ো বাজছে নিচু স্বরে। কী একটা গান হচ্ছে। কান্নার মতো লাগছে স্বরটা।

আমি সাইকেলটা এক পাশে রেখে দোকানের মধ্যে ঢুকলাম। ব্যাগ থেকে স্লিপটা বের করে সামনে বাড়িয়ে দিলাম।

মহিলাটি রেডিয়ো বন্ধ করে স্লিপটা নিয়ে দেখল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "যখন জিনিসপত্র কাচতে দাও, তখন দ্যাখো না পকেটে কিছু রয়ে গিয়েছে কি না! ফাউন্টেন পেনে লেখা চিঠি। রং উঠে কোটে লেগে গেলে তো আমাদের বদনাম হয়ে যেত!"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। এ সব তো আমি করি না। হরিকাকা নামে ওই কুমিরটা করে। যেমন মালিক তেমন তার পিশাচ শাগরেদ! সে-ই নিশ্চয়ই কোটটা পাঠানোর আগে ঠিকমতো পকেট চেক করে দেয়নি।

মহিলাটি একটা মুখ ছেঁড়া খাম আমায় দিল। দামি মোটা কাগজের খাম। ওপরে বিদেশের ডাকটিকিট আটকানো। নীল কালি দিয়ে পেঁচিয়ে লেখা আলোজেঠুর নাম। সেন্ডার্স নেম-টাও লেখা আছে। চিত্তপ্রিয় ঘোষ। আমি নামটা পড়েই চিনতে পারলাম। আরে, এর সঙ্গেই তো লুনাদিদির বিয়ের কথা হচ্ছে! আমি চিঠিটাকে পিঠের ব্যাগে ভরে রাখলাম। খুব কৌতূহল হচ্ছে কী লেখা আছে জানতে। কিন্তু অন্যের চিঠি কি পড়া উচিত!

আমি কোটটা ডেলিভারি নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিলাম। ভদ্রমহিলা আবার বসে পড়ে রেডিয়ো চালু করে দিল। সেই কান্নার মতো মৃদু স্বর ছড়িয়ে পড়ল দোকানে।

বৃন্দাবনদা আজ আমায় দেখে বলল, "কী রে পাগলি এসেছিস? এই দেখ, তোর জন্য এই ম্যাগাজ়িনটা সরিয়ে রেখেছি। সেকেন্ড হ্যান্ড। দাম আট টাকা। কিনবি?"

আমি তাকালাম বৃন্দাবনদার দিকে। বললাম, "আমার কাছে টাকা নেই বৃন্দাবনদা!"

"আরে, আমি এমনি বললাম!" বৃন্দাবনদা হেসে ম্যাগাজ়িনটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এ সব ম্যাগাজ়িন বিক্রি হয় না। পড়ে পড়ে পোকায় কাটে। যার থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ম্যাগাজ়িন নিই, সে গছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে ব্যাটাও কাউকে দিতে পারছিল না। তুই নিয়ে যা।"

আমি ম্যাগাজ়িনটা দেখলাম। পুরনো বটে। পাতার কোনাগুলো ডগ'স ইয়ার হয়ে আছে। কিন্তু এটা যে পতঙ্গদের ওপর নয়! এটা তো এমনি প্রাণীদের ওপর।

আমি বললাম, "এটা তো ইনসেক্টদের ওপর নয় বৃন্দাবনদা!"

"আরে, আছে আছে। বিট্‌লদের ওপর একটা আর্টিকল আছে। তবে আমি এটা তোকে দিলাম অন্য কারণে। হানি ব্যাজারের ওপর দারুণ একটা পিস আছে। পড়িস।"

আমি জানি বৃন্দাবনদা খুব বই পড়ে। এই কারণে মানুষটাকে আমার এত ভাল লাগে। সদাহাস্যময় একটা লোক। বই পড়ে, গান শোনে। সুন্দর বেহালা বাজায়! কিন্তু এই বইয়ের চৌকির ওপরে এমন করে বসে থাকে যেন কিছুই জানে না, পারে না!

আমি বললাম, "স্পেশ্যাল কী এই প্রাণীটার?"

"সাহস, সাহস!" বৃন্দাবনদা বলল, "এমন সাহসী প্রাণী বোধহয় আর নেই। নিজের চেয়ে বড় বড় প্রাণীদের আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। সিংহ, কুমির কাউকে পরোয়া করে না। ভয়ে পালিয়ে যায় না। রুখে দাঁড়ায়। আক্রমণ করে। পড়িস, ভাল লাগবে।"

আমি পাতা উলটে আর্টিকালটা খুললাম। কালো লোমে ঢাকা প্রাণী। পিঠের দিকটা ধূসর লোমে ভরা। এর এত সাহস!

বৃন্দাবনদা বলল, "সাহসটাই আসল, জানিস তো? ওর চেয়ে বন্ধু আর কেউ নেই! সেই স্কুল-জীবনে আমাদের একজন স্যর ছিলেন। নিজে টুকটাক কবিতা লিখতেন। একটা লেখা এখনও মনে আছে।"

সবাই যখন বিরুদ্ধতা বলে
শানায় ছুরি বন্ধু হওয়ার ছলে
মিষ্টি কথার বিষ বুঝে আজ ভাবো
দাঁড়িয়ে ওঠার লড়াই কোথায় পাব?
কোথায় যাব জীবন ছুঁয়ে দিতে?
মনের মধ্যে অজানা সঙ্গীতে
ফুটছে লাভা, ভাঙছে হিমবাহ...
অসময়ের সঙ্গী শুধু সাহস!

"বুঝলি পাগলি, এটা মনে রাখবি, অসময়ের সঙ্গী শুধু সাহস!"

আমি অবাক হলাম, এটা আমায় হঠাৎ বলল কেন বৃন্দাবনদা!

কিন্তু আমি আর কথা বাড়ালাম না। বইটাকে ব্যাগে গুছিয়ে রাখলাম। তার পর ঠোঙা থেকে দুটো স্পঞ্জ লজেন্স বের করে বৃন্দাবনদার হাতে দিলাম। আমি জানি লুনাদিদি এসবের হিসেব নেবে না।

বৃন্দাবনদা হাসল। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আয় মা। সাহস রাখিস।"

আমার অবাক লাগল আবার। লোকটা আজকে এমন কথা বলছে কেন?

মনোহরদা গেটে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়িতে যে ছেলেটা দুধ দেয়, তার সঙ্গে কথা বলছিল। ছেলেটা কাছেই থাকে। সন্ধেবেলা কখনও-কখনও আসে মনোহরদার সঙ্গে কথা বলতে। দেশোয়ালি ভাই।

মনোহরদা আমায় দেখে হাসল। বলল, "লিট্টি বানিয়েছি। রেখেছি তোর জন্য কয়েকটা। নিয়ে যাস।"

আমি মাথা নাড়লাম। লোকটা আমায় নানান কিছু বানিয়ে খাওয়ায়। বলে, আমায় দেখলে নাকি ওর নিজের বোনের কথা মনে পড়ে! মানুষের মনে কার জন্য যে কী ফিলিং জমা হয় কে জানে!

আমি সাইকেলটা বাগানের এক কোণে কাঠালচাঁপা গাছের নীচে স্ট্যান্ড করিয়ে রাখলাম। তার পর ব্যাগটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।

মা বসার ঘরে ছিল। বাচ্চাটাকে হাতে করে ধরে দোল খাইয়ে খাইয়ে খেলছিল। আমি কোটটা বের করে সোফায় রাখলাম। কিছু বললাম না। তার পর ফেরত আসা টাকাটাও কোটের ওপরে রাখলাম।

মা "বুধি বুধি" করে ডাকল। এই ছেলেটা ফাইফরমায়েশ খাটে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। আমার কাজ আছে লুনাদিদির ঘরে।

বাড়িটা আজ বেশ ফাঁকা। কাকুরা তো এখনও অফিস থেকে আসেনি। কাকিমারাও সব কোথায় যেন গিয়েছে। ওদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। জুলুও এসেছে টুবলুকে পড়াতে।

আমি সোজা ওপরে উঠে গেলাম। বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ির এই দিকের বড় দুটো ঘর লুনাদিদির। দেখলাম, ঘরের বাইরে পর্দা ফেলা। দরজাটা ভেজানো রয়েছে। কিন্তু বাইরে কোনও জুতো নেই। সৌরদা এলে এখানে সৌরদার জুতো থাকে। মানে সৌরদা কি এসে চলে গিয়েছে না আসেইনি এখনও!

আমি বাইরে থেকে গলা তুলে ডাকলাম, "লুনাদিদি, আসব?"

"আয়," লুনাদিদি ছোট্ট করে বলল।

আমি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। লুনাদিদি বসে রয়েছে টেবিলে। সামনে খোলা বই। পড়ছে।

আমি ভাবলাম, কলেজে ভর্তি হবে বলে এমন পড়াশোনায় মন, নাকি অন্য কারণে? দেখলাম, পাশে রাখা চেয়ারটার ওপরের লেসের ঢাকনাটা এখনও টানটান হয়ে আছে। সৌরদা তা হলে এখনও আসেনি মনে হয়।

আমি ব্যাগ থেকে লজেন্সের প্যাকেটটা বের করে সামনের টেবিলে রাখলাম। পাশে দুটো এক টাকাও রাখলাম। এশিয়াডের মনোগ্রাম করা কয়েন। গতবার দিল্লি এশিয়ান গেমস উপলক্ষে বেরিয়েছিল।

লুনাদিদি এবার মুখ তুলে তাকাল। আমায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবি?"

আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলাম। তার পর ব্যাগ থেকে সেই খাম-ছেঁড়া চিঠিটা বের করে লজেন্সের ঠোঙার পাশে রাখলাম। বললাম,

“ইয়ে এটা... মানে, জানি না তোমায় দেখানো ঠিক হচ্ছে কি না! কিন্তু তোমার সেই... মানে চিত্তপ্রিয় ঘোষের চিঠি। আলোজেঠুকে লেখা। কী আছে জানি না। কিন্তু ভাবলাম তোমায় দিই... পেলাম তো... তাই...”

লুনাদিদি চট করে ঘুরে বসে খামটা ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে। তার পর খামের মধ্য থেকে চিঠির কাগজটা বের করে দ্রুত পড়তে লাগল। আমি উলটো দিক থেকে দেখে বুঝলাম পাকা, প্যাঁচানো হাতে ইংরেজিতে লেখা চিঠি।

চিঠিটা শেষ করে লুনাদিদির মুখটা আচমকা লাল হয়ে উঠল। মনে হল যে, রক্ত চুঁইয়ে পরবে চোখ, নাক, কান দিয়ে! সর্বনাশ! আমার ভয় লাগল। ভুল করলাম নাকি!

লুনাদিদি চিঠিটা খামে ঢুকিয়ে নিজের বইয়ের ভেতরে রাখল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, “এটার কথা কাউকে বলবি না। বুঝেছিস?”

আমি মাথা নাড়লাম।

“যা এবার,” লুনাদিদি ইশারা করল।

আমি আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। তার পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। দেখলাম, নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে লুনাদিদির মাস্টার, সৌরসেন রায়!

॥ সৌরর ডায়েরি থেকে ॥

॥ গ ॥

...অনেক হয়েছে গুড বয়! আর সময়। ওরা কিছু করার আগে আমাকেই কিছু করতে হবে। আমি কিছুতেই তোমাকে হারাতে পারব না! আমার জীবন তুমি ছাড়া অর্থহীন! প্রেম সময়ের মাপে গভীরতা পায় না, অনুভবের মাপে পায়! তুমি দ্বিধা করছ কেন? তুমি কি জানো না আমি তোমায় কতটা...

॥ ৭ ॥

জুলু

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজে। কখন মাকে ডাকবে কে জানে! প্রায় এক ঘণ্টা হল এখানে বসে আছি। দেখলাম, মা রিসেপশনে রাখা একটা ম্যাগাজ়িন নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। বাংলা সিনেমার পত্রিকা। সামনের পাতায় সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় আর দীপঙ্কর দে-র ছবি দেওয়া। বাংলা সিনেমার প্রতি মায়ের খুব আগ্রহ। সুযোগ পেলেই জেঠিমাদের সঙ্গে সিনেমায় যায়। টিকিট আমাকেই কেটে আনতে হয় যদিও।

রিসেপশনটা ছোট। হলুদ রং করা কাঠের প্যানেল দিয়ে ঘেরা। প্যানেলের ওপরে ঘষা কাচ লাগানো। সামনেই অল্পবয়সি একটা মেয়ে বসে আছে। রিসেপশনিস্ট। মেয়েটা এমন করে লিপস্টিক লাগিয়েছে যে, দাঁতে লেগে গিয়েছে কিছুটা। আমার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছে।

আমার কিছু সমস্যা আছে। মানে, খুব ছুটকো-ছাটকা, কিন্তু আছে। এই যেমন কেউ যদি হাত-পায়ের যত্ন না নেয়, আমার বাজে লাগে। আমি দেখেছি, লোকে মুখ খুব রংচঙে করে, পাউডার মাখে, কিন্তু হাত-পায়ের যত্ন সেভাবে নেয় না। নেলপলিশ অর্ধেক উঠে থাকে। বচ্চন-কাটিং চুলের ভাঁজে থাকে খুশকি! পায়ে ময়লা জমে থাকে নখের কোণে। গলার কাছে দাগের মতো হয়ে যায় অপরিচ্ছন্নতা থেকে। মানে, ওপর ওপর নিজেকে সাজিয়ে রাখলেও, একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, মানুষটি একটুও পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর করে না। আমাদের দেশে সবাই হেলথ নিয়ে মাথা খারাপ করে, কিন্তু হাইজিন নিয়ে অধিকাংশেরই নজর নেই!

রিসেপশনের মেয়েটির পায়ের গোড়ালিটা ফেটে তাতে ময়লা জমে আছে। জুতোটাও নোংরা। হাতের নেলপলিশ কেমন যেন রংচটা পুরনো টেবিলের মতো! টেনে বাঁধা চুলের ওপরে আবছা ভাবে খুশকি ভেসে আছে! বাজে লাগছে আমার!

“আবার নাক কোঁচকাচ্ছিস?” বুচা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল। বুচাও আমার সঙ্গে এসেছে।

নিজের অজান্তেই কি নাক কুঁচকে যাচ্ছে আমার! আমি মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বুচার দিকে তাকালাম। হাসলাম সামান্য।

বুচা চাপা গলায় বলল, “তুই বাইরের লাইটিং দেখেই মরলি। আসল মানুষ এ সবের অনেক ভেতরে, মনের মধ্যে থাকে! নো ওয়ান্ডার, তোর ওপালিনাকে ভাল লাগে!”

“চুপ,” আমি বুচার পায়ে চিমটি কাটলাম, “মা শুনতে পাবে!”

“ধুর! পাবে না,” বুচা হাসল, “কাকিমা পুরো সিনেমায় ঢুকে পড়েছে। তুই ভাবিস না।”

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। সত্যি, গভীরভাবে বইয়ের মধ্যে রয়েছে। পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে কে জানে!

আসলে দু’দিন আগে দোতলা থেকে চায়ের কাপ নিয়ে নামতে গিয়ে মায়ের পা স্লিপ করে গিয়েছিল। হাত থেকে দুটো চায়ের কাপ পড়ে ভেঙে গেলেও মায়ের সেভাবে বড় কিছু হয়নি। কেবল ডান পা-টা মচকে গিয়েছিল।

রাতে ঘটনাটা ঘটেছিল বলে ডাক্তার দেখানো যায়নি। পাশের বাড়ি থেকে বরফ নিয়ে এসে কাজ চালানো হয়েছিল।

গতকাল ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তিনি বলেছেন এক্স-রে করাতে। যদিও ভাঙেনি বলেই মনে করছেন ডাক্তার। তাও শিওর হয়ে নিতে চাইছেন আর কী।

মায়ের পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে। ফোলা আছে। তবে মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু তাও এক্স-রে করানোটা জরুরি। মা যদিও এক্স-রে করাতে চায়নি। আমি দেখেছি, আমার মা-জেঠিমারা, নিজেদের শরীরে কিছু হলে সেটা নিয়ে গুরুত্ব দেয় না। কেন কে জানে নিজেরা নিজেদের প্রায়োরিটি লিস্টের একদম নীচের দিকে রাখে।

বাবা-ই আমাকে বলেছে মাকে নিয়ে এখানে আসতে। তার পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাবারও এখানে আসার কথা! আমি জানি যতই আমি আর আমার বন্ধু থাকি না কেন, বাবা না আসা অবধি মা ঠিক ভরসা পাবে না।

রিসেপশনে আরও একজন বসে রয়েছে। তার এক্স-রে হওয়ার পরে মায়ের হবে। বাবা যে কখন আসবে! আমি রিসেপশনের দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকালাম। পাঁচটা চল্লিশ।

বুচা আচমকা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “তোর কী মনে হয়, ইন্ডিয়া এবার কিছু করতে পারবে?”

ও যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের কথা বলছে, সেটা বুঝতে পারলাম। বললাম, “দেখ, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তো আমরা প্রথম ম্যাচে হারালাম। জিম্বাবোয়েকে সেকেন্ড ম্যাচেও। কিন্তু সামনে এখনও কঠিন সব ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া আছে, আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে। জানি না কী হবে।”

বুচা নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, “শালা, বড্ড বেশি খেলে ফেলেছি। ফাইনালটা না বলে আর-একটু সোজা কিছু বলতে পারতাম!”

আমি অবাক হলাম, কী বলছে কী ছেলেটা! হাত দিয়ে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলাম, “কী বলছিস? মাথাটা গিয়েছে একেবারে?”

বুচা হাসল। বলল, “ও কিছু না। যাক গে। সৌরদা কেমন আছে রে?”

“এই আছে,” আমি পাশ কাটাতে চাইলাম। কারণ, আমি দাদাভাইকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না।

আমি জানি সামনে একটা ঝামেলা লাগার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সে দিন শেষ সন্ধেয় মিঠুদিকে দেখে আমার মোটেও ভাল লাগেনি। যখন কোনও মানুষকে তার ভালবাসার মানুষ পাত্তা দেয় না, তার থেকে ক্রমশ সরে যায়, তখন সেই মানুষটির যেমন হারিয়ে যাওয়ার মতো, এলোমেলো হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, তেমনই হয়েছে মিঠুদির। আমার ওপার জন্য যে-কষ্ট, সেটা তো একতরফা। কিন্তু মিঠুদিরটা তো আর সেরকম নয়। রীতিমতো বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর আচমকা দাদাভাই এখন কেমন যেন পাল্টি খাচ্ছে! মিঠুদির সে দিনের ওই কাঁপা গলা, ছলছলে চোখ দেখে ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। তাই বাড়ি ফিরে এসে রাতে দাদাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি।

“কী রে এখনও তোদের হয়নি?” বাবার গলা পেলাম আমি।

দেশপ্রিয় পার্কের রাস্তার পাশেই এই ক্লিনিকটা। অনেকটা সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। মায়ের যে কী কষ্ট হয়েছে এতটা খাড়াই সিঁড়ি ভাঙতে! একদিকে আমি আর অন্যদিকে বুচা মাকে ধরেছিলাম। এক্স-রে ক্লিনিক কেউ এমন পাহাড়ের মাথায় করে? কত রকম শারীরিক অসুস্থতা আর সমস্যা নিয়ে লোকজন আসে। তারা এই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠবে কী করে? কারও কি কোনও সেন্স নেই?

বাবা এসে মায়ের পাশে বসল। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এসে গিয়েছি। তোর অন্য কোনও কাজ থাকলে তুই যা!"

আমি অবাক হলাম, "মাকে নিয়ে একা নামতে পারবে এই হিমালয় থেকে?"

ইচ্ছে করেই কথাটা জোরে বললাম। দেখলাম, রিসেপশন থেকে মেয়েটা ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে।

বাবা বলল, "ও তোর মা ধরে নেবে সিড়ির একটা দিক। আমি হাত ধরে থাকব। তুই যা।"

মা-ও দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তার পর বাবাকে বলল, "ফেরার পথে দেশপ্রিয় পার্কের কোণে ওই ঘুগনিটা খাওয়াবে?"

বাবা অবাক হল সামান্য। বলল, "এই পা নিয়ে ঘুগনি খাবে?"

মা বিরক্ত হল, "পা দিয়ে আমি ঘুগনি খাব নাকি?"

আমি বুঝলাম স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মতো করে একটু থাকতে চাইছে। স্বাভাবিক। আমাদের বাড়িটা বাজারের মতো। কারও কোনও প্রাইভেসি নেই! সবাই সবার ঘরে ঢুকে পড়ে। স্বামী-স্ত্রীরা কেউই জোড়ায় জোড়ায় সেভাবে কোথাও যায় না। সেখানে আজ মা-বাবা একটু সুযোগ পেয়েছে।

আমি উঠে পড়লাম। বুচাও উঠল আমায় দেখে।

বাবা পকেট থেকে কুড়ি টাকার লালচে-কমলা নোটটা বের করে দিল আমায়। বলল, "এটা রাখ।"

আমি আর বারণ করলাম না।

রাস্তায় বেশি ভিড় নেই। আকাশে মেঘ করে আছে। পথের অবস্থা দেখে বুঝলাম, একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছে।

বুচা বলল, "খাওয়া। কাকু টাকা দিলেন।"

আমি বিরক্ত হলাম, "আমার বাবা আমায় টাকা দিয়েছে। তোকে খাওয়াব কেন?"

"তুই এত স্বার্থপর!" বুচা ভুরু কোঁচকাল। বলল, "আরে, শিঙাড়া খাওয়া। কোনও দামি খাবার খাওয়াতে বলিনি। দুটো শিঙাড়া আর জিলিপি। চল না। প্লিজ়!"

বুচার এই জিনিসটা ভাল। এমন করে বলে যে, 'না' করা যায় না। আমি এমনিই খাওয়াতাম। আসলে ওর পিছনে লাগছিলাম একটু।

লেক মার্কেটের পাশের গলিতে পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডার আছে। ভাল শিঙাড়া করে। বেশ অনেকটা করে বাদাম দেয়! বুচাকে নিয়ে আমি ওই দিকে হাঁটতে লাগলাম।

বুচা হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে বলল, "খেয়েই আমি কাটব। বাড়িতে কাজ আছে। এমনিতে চোদ্দো গুষ্টি থাকে, কিন্তু সব দায়িত্ব যেন আমার!"

আমি সামান্য চমকে উঠলাম। সে দিন দাদাভাইও এমন কথাই বলছিল না?

আমি দাদাভাইকে মিঠুদির ব্যাপারটা খুলে বলেছিলাম।

দাদাভাই সবটা শুনে বিরক্ত হয়েছিল যেন। বলেছিল, "তোকে এসব বলেছে? কেন? আশ্চর্য! আর জুলু, তুই বড় হয়েছিস বলেই তোকে বলছি, আমি কি চেয়েছিলাম মিঠুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে? চাইনি। গুন্ডা এসে বাবা-কাকাদের কী সব ভুজুং-ভাজুং দিয়ে গিয়েছে! তারাও বিয়ে-ফিয়ে হাবিজাবিতে রাজি হয়ে বসে আছে! লাইফটা আমার আর আমার নিজের কোনও মতামত থাকবে না?"

আমি বলেছিলাম, "কিন্তু তুই তো রাজি হয়েছিলিস দাদাভাই!"

"একদম না। 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলিনি। আর সবাই মৌনতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নিয়েছিল! কেন রাজি হব আমি? আমার কী এমন বয়স যে, এখনই বিয়ে করতে হবে? আমার যাকে ভাল লাগবে তাকে বিয়ে করব। কেউ আমার লাইফের টার্ম ডিক্টেট করবে, সেটা মানব না। আমার কাছে কোনটা ইমপর্ট্যান্ট সেটা আমি জানি," দাদাভাই কঠিন গলায় বলেছিল।

আমি বলেছিলাম, "তুই এমন করছিস কেন? কী হয়েছে দাদাভাই?"

দাদাভাইকে আমি রাগ করে, বিরক্ত হয়ে কথা বলতে দেখেনি কোনও দিন।

দাদাভাই বলেছিল, "কী হবে? আমি আর গুড বয় হয়ে থাকতে পারছি না। ব্যস! একটা ব্যাপার কাউকে বলিনি, কিন্তু তোকে বলছি। আমি বম্বেতে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। সেটা মনে হয় হয়ে যাবে। ফার্স্ট সেখানে যাব। তার পর সেখান থেকে গালফ! মিডল ইস্ট এখন বুমিং। অনেক টাকা দিচ্ছে। আমি চলে যাব।"

আমি কী বলব বুঝতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, "গুন্ডাদা কিন্তু মিঠুদিকে খুব ভালবাসে। বোনের কষ্ট দেখে..."

"ছাড় তো!" দাদাভাই মাথা নেড়েছিল, "অমন গুন্ডা বদমাশ আমি অনেক দেখেছি!"

পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে বেলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লেক মার্কেটের লাল বাড়িটার পাশের এই রাস্তাটায় সারাক্ষণ দারুণ হাওয়া বয়। দেখলাম, বেলা ওর ঝরঝরে সাইকেলটা নিয়ে পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে কিছু কিনছে।

বেলাকে দেখেই বুচা এগিয়ে গেল। বলল, "কী রে তুই! কী কিনছিস?"

বেলা মুখ ফিরিয়ে দেখল আমাদের। তার পর বলল, "শিঙাড়া।"

"তুই খাবি?" বুচা হাসল।

বেলা বলল, "না। লুনাদিদি। কেন?"

বুচা আর কী বলবে যেন খুঁজে না পেয়ে বলল, "ইন্ডিয়া কিন্তু দুটো ম্যাচ জিতেছে।"

বেলা খুব একটা পাত্তা দিল না। বরং আচমকা সাইকেলটা বুচার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা ধরে দাঁড়া তো। আমার জুলুর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"জুলুর সঙ্গে!" বুচা কেমন যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতির মতো মুখ করে তাকাল বেলার দিকে।

আমি অবাক হলাম। বুচার কী হয়েছে! এমন করছে কেন?

বেলা এগিয়ে এল আমার দিকে। তার পর বলল, "আমার দুটো কথা ছিল।"

আমার সঙ্গে আবার কী কথা! মেয়েটা সে দিনও কী সব ফিজ়িক্স না কিসের অঙ্ক করে দেওয়ার কথা বলছিল না! ঠিকমতো শোনার আগেই তো ওপা চলে এসেছিল!

বেলা বলল, "আমাকে দুটো ফিজ়িক্সের অঙ্ক দেখিয়ে দেবে? আর চারটে কেমিস্ট্রিরও। দেবে?"

কেউ এইভাবে বললে তাকে না করা যায়! আমি বললাম, "আমি পারলে দেব। অসুবিধে নেই!"

বেলা মাথা নাড়ল। হাসলও একটু। দেখলাম, শ্যামলা মেয়েটাকে হাসলে বেশ দেখায় তো!

বেলা এবার পেছন ফিরে বুচাকে দেখল এক বার। তার পর যেন এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে। খুব গোপন কিছু বলছে এই ভাবে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কী?" আমি অবাক হলাম।

বেলা একই রকম নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "সৌরদার সব কিছু কি ঠিকঠাক আছে? মানে সৌরদা আর মিঠুদির মধ্যে আর কী।"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আর ঠিক তখনই দেখলাম, বুচা দোকানদারের কাছ থেকে শিঙাড়ার প্যাকেটটা নিতে গিয়ে সাইকেলটা ফেলে দিল মাটিতে। ঝকাং করে শব্দ হল একটা। আর মাটিতে পড়ে গিয়ে সাইকেলটার প্যাডেল, চেন, হাতল খুলে ছিটকে পড়ল চারিদিকে!

"আরে কী করলি!" চিৎকার করে উঠে সব ভুলে বেলা দৌড়ে গেল।

ওর দৌড়ে যাওয়ার মধ্যে যে অসহায়তাটা ছিল, সেটা যেন এই মেঘ করে আসা সন্ধের শহরে ভেসে বেড়াতে লাগল, পতঙ্গের মতো!

আমি বুঝলাম এই সাইকেলটা আমাদের কাছে ঝরঝরে হলেও বেলার কাছে অমূল্য!

দাদাভাইয়ের কাছেও কি তা হলে অন্য কিছু মূল্যবান হয়েছে এখন!

হলে, কী সেটা? নাকি প্রশ্নটা হবে, সে কে?

॥ ৮ ॥

বেলা

সাইকেলটাকে রং করা হয়েছে। নীল রং। সঙ্গে পেছনের মাড-গার্ডে একটা রিফ্লেক্টর লাগানো হয়েছে। রাতে পেছন থেকে কেউ আলো ফেললে চকচক করবে রিফ্লেক্টরটা। সাইকেলটা হাতে নিয়ে ভাল লাগল আমার। চার দিন ছিল না জিনিসটা, তাতেই কেমন যেন খালি খালি লাগছিল। আজ ফিরে পেয়ে আনন্দ হল।

আমি বুচার দিকে তাকালাম। বললাম, "থ্যাঙ্কস।"

বুচা সামান্য লজ্জা পেল। বলল, "আরে, আমিই খারাপ করে দিয়েছিলাম, তাই এটা ঠিক করার দায়িত্বও আমার।"

বুচার কী হয়েছে আজকাল! সারাক্ষণ এমন লজ্জা লজ্জা আর বুজে আসা গলা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে কেন?

আমি বললাম, "তোর কী হয়েছে বল তো? এমন লজ্জাবতী লতা হয়ে থাকিস কেন রে?"

বুচা হাসল। কিছু বলল না। টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের নীচ দিয়ে ভবানী সিনেমার দিকে একটু গেলেই এই সাইকেল সারাইয়ের দোকান। বুচার কেমন যেন পাড়াতুতো দাদা হয় এই ননীদা।

সে দিন সাইকেলটা ভেঙে গিয়েছিল পদ্ম মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে।

ননীদার কাছে সাইকেলটা সে দিন বুচাই নিয়ে গিয়েছিল। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ ফেটে জল আসছিল। কেন আমি জুলুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওরকম করে সাইকেলটা অন্যের হাতে দিয়ে গেলাম! আমার জিনিস, আমাকেই তো যত্ন করতে হবে। বুচার কী যায় আসে আমার সাইকেল ঠিক থাকল না ভুল থাকল তাতে!

আমার নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছিল। জুলু স্পষ্ট আমায় এড়িয়ে যায়! তাও আমার শিক্ষা নেই। সেই গাল বাড়িয়ে চড় খেতে ছুটে ছুটে যাই। ওকে দেখলেই আমার কেন এমন সব কিছু গুলিয়ে যায়! কেন মনে হয় সব ওলটপালট হয়ে গেল! মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও কোনও মানুষের সামনে আমরা যেন নিরুপায় লোহা মাত্র! আর তারা তীব্র এক চুম্বক! মনে হয় আমাদের শরীর, মন, সত্তার সব কিছুই যেন তাদের প্রতি আলোর গতিবেগে ছুটে যাচ্ছে!

কেন? কেন? কেন আমি সামান্য এক লোহায় পরিণত হই জুলুর সামনে! ও তো স্পষ্টই ওপাকে পছন্দ করে! ও তো ওপার সামনে লোহা! আমি একটা জিনিস বুঝেছি। দু'জনের মধ্যে যে কম ভালবাসে বা একদম ভালবাসে না, সে-ই আসলে সম্পর্কটাকে নিয়ন্ত্রণ করে!

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, জুলু যেন নীলকর সাহেবদের মতো নিষ্ঠুর! সব বুঝেও যেন কিছুই বুঝতে চায় না। সারাক্ষণ কষ্ট দেয় আমায়। অবজ্ঞা করে মেরে ফেলার মতো কষ্ট! তার মধ্যে সাইকেলটারও ওই দশা হল! আমার হাত পা ছুড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কে এটা ঠিক করার টাকা দেবে আমায়! মায়ের হাতে যে-ক'টা টাকা দেওয়া হয়, তাতে আমার পড়াশোনাটাই কোনও মতে চলে। আমার জামাকাপড় কাকিমারা কিনে দেয়। বাকি যে কিছু খরচ হতে পারে, সেটা যেন কারও নজরেই আসে না। আমি জানি আলোজেঠুকে বললেই আলোজেঠু টাকা দেবে। কিন্তু ওই জানোয়ারটাকে আমার কিছু বলতেই ইচ্ছে করে না। লোকটা নিজে থেকে কিছু দিলেও আমি নিই না। নিতে ঘেন্না লাগে।

লোকটা বোঝে। একদিন তো আমার মুখটা ধরে কাছে নিয়ে এসে বলেছিল, "আমি কিছু দিলে নিস না কেন? আমারটা ভাল লাগে না?"

কথার মধ্যেকার নোংরা ইঙ্গিতটা আমি না বোঝার ভান করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তার পর বাথরুমে গিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধোওয়ার সময় মনে হয়েছিল, একদিন এই লোকটাকে আমি ঠিক খুন করে ফেলব!

ননীদা আমার সাইকেলটা শুধু সারিয়ে দেয়নি, রংও করে দিয়েছে। বুচা বলেছে সব খরচ ওর। এটা শুনে খুব লজ্জা লেগেছিল আমার। কিন্তু সাইকেলের সব কাজ হয়ে গিয়েছে। বুচাও জোরাজুরি করছে। আমার কাছে টাকাও নেই। আমি যে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমার আসলে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

বুচা বলল, "নীল রংটা তোর ভাল লেগেছে তো! আসলে মেয়ে হলেই লাল বা গোলাপি এ সব রং করায়। আমার কিন্তু নীলটাই ভাল লাগে।"

আমি বললাম, "আমি টাকাটা তোকে দিয়ে দেব, দেখিস। একটু টাইম দিস।"

"টাকাটা দিয়ে দিবি?" বুচা অবাক হয়ে আমার সাইকেলটা ধরে দাঁড় করাল। লেকে ঢোকার রাস্তার মুখে এখন গাড়ি কম। ও বলল, "এটা বলতে পারলি?"

"হ্যাঁ, দেব না? তুই আমার সাইকেল সারানোর জন্য টাকা দিবি কেন?" আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম।

বুচা এমন করে আমার দিকে তাকাল যেন এর চেয়ে অবাক করা কথা ও আর শোনেনি কোনও দিন! বুচা বলল, "আমি দেব না তো কে দেবে? আমি তোকে ভালবাসি যখন তখন আমিই তো দেব!"

"কী!" আমি হাঁ হয়ে গেলাম। কী বলল ছেলেটা? ভালবাসে?

বুচা নিজেও কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছে। নিমেষে লাল হয়ে গিয়েছে ওর মুখ। বলল, "আরে, মানে ইয়ে বন্ধুর মতো, বন্ধুর মতো! সরি, স্লিপ অব টাং হয়ে গিয়েছে। প্লিজ়, কিছু মাইন্ড করিস না।"

আমি বললাম, "বন্ধুর কাছ থেকে এসব কিছু নেওয়া যায় না। আমি ঠিক ফেরত দিয়ে দেব দেখিস।"

বুচা কথা ঘোরাতে বলল, "তোকে একটা কথা বলার ছিল।"

আবার কথা! আমি চোয়াল শক্ত করে তাকালাম ওর দিকে।

বুচা হাসল জোর করে। আগের কথাটার রেশ এখনও ওর কাটেনি। তাও বলল, "তুই যে কী সব সাজাস না, ওই ঝুলন টাইপের..."

"ডায়োরামা," আমি বললাম।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা। আমার এক দাদু আছেন পাড়ার। জাপানদাদু। দীর্ঘদিন জার্মানিতে ছিলেন। উনিও এই সব পছন্দ করেন। আমি ওঁকে তোর কথা বলেছিলাম। তুই ওঁর সঙ্গে দেখা করবি? ওঁর বিদেশে খুব যোগাযোগ। সেখানে ইন্ডিয়ান প্রেক্ষাপটে ডায়োরামার নাকি খুব চাহিদা। মানে, গোটা ইউরোপ আর আমেরিকাতে। এটা এখানে কেউ ভাবে না। কিন্তু উনি এই নিয়ে বিজ়নেস করতে চান। তুই কি ইন্টারেস্টেড?"

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। বুচা বলে কী! ডায়োরামা নিয়ে ব্যবসা! আর আমি তাতে কী করব?

বুচা বলল, "উনি মেটিরিয়াল দেবেন। তুই ডিজ়াইন করবি। সেই সঙ্গে বানাবি। ভাল টাকা আছে রে।"

"জাপানদাদু মানে? এটা কেমন নাম?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"আরে, মানে আবার কী! নাম ইজ় নাম। জাপান ডাকনাম। দাদুরা ছ'ভাই। কারও নাম ভুটান, কেউ নেপাল, কেউ কঙ্গো, কেউ আবার জার্মানি। বড়জনের নাম রাশিয়া!" বুচা গম্ভীর ভাবে বলল।

আমি সরু চোখে তাকালাম ওর দিকে। এই ছেলেটা কোনটা যে সত্যি বলে আর কোনটা মিথ্যে, বোঝা মুশকিল! এমন নাম কেউ দেয় নাকি?

"আর, তুই নাম নিয়ে পড়লি কেন? জাপানদাদুর কাছে যাবি কি না বল। আমি তা হলে নিয়ে যাব। কথা অন্তত বল। ইচ্ছে হলে জাপানদাদুকে নিয়ে তোদের বাড়িতে গিয়ে তোর ঘরে যে ঝু... মানে ডায়নামো না কী সাজিয়েছিস সেটা দেখাস। আমি সিরিয়াসলি বলছি কিন্তু," বুচা ওর গোলগোল চোখগুলো কুঁচকে ছোট করে যতটা পারল সিরিয়াস দেখানোর চেষ্টা করল।

আমি আর দাঁড়ালাম না। পাগলের সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট করা। আমি সাইকেলে উঠে বললাম, "পরে ভেবে দেখছি।"

বুচা বলল, "ভেবে দেখিস কিন্তু। নতুন ধরনের কাজ। তোর নিজের ইনকাম হবে। ভালই হবে, বলে দিলাম।"

আমি সাইকেলে প্যাডেল করে বললাম, "সাইকেলের টাকাটা তোকে ফেরত দিয়ে দেব। এলাম।"

লেকের রাস্তাটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। ডান দিকে লেক।

সবুজ নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে কিছু রেলিং। বড় বড় গাছ রাস্তার ওপর ঝুঁকে এসে রাস্তায় ছায়া দিচ্ছে।

জুন মাস হলেও দু'দিন বৃষ্টি নেই। বরং একটা প্যাচপেচে গরম লাগছে। বিকেল শেষ হয়ে আসছে এখন। রাস্তায় আলো আছে যদিও। শাঁ শাঁ করে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

এই রাস্তাটার এক দিকে যেমন লেক, অন্য দিকে তেমনই সুন্দর বাগান বা উঠোনওলা বড় বড় বাড়ি। দক্ষিণের অভিজাত পাড়া এটা। আলোজেঠুর বাড়িটাও এমনই। বড় আর অভিজাত। কিন্তু তলায় তলায় নরকের মতো অন্ধকার!

মনোহরদা বসে বসে গান শুনছে আজকেও। কালো চামড়ায় মোড়ানো ছোট্ট ট্রানজিস্টার। একটা এরিয়াল সোজা হয়ে আকাশের দিকে তাক করে রয়েছে। তাতে সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত চলছে। মাঝে মাঝেই মনোহরদা এমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে। আমার মজা লাগে খুব। বেশির ভাগ শব্দের মানে কিন্তু মনোহরদা বুঝতে পারে না। তাও শোনে। বলে, ভাল লাগে সুরগুলো!

আমি শুনলাম আজ বাজছে— "রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?/তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে॥"

মনোহরদা চোখ বন্ধ করে বসে মাথা নাড়াচ্ছে। মনোহরদাকে দেখে ভাল লাগল আমার। বিকেলের শেষ হয়ে আসা আলোর মধ্যে একটা লোক বসে গানের সঙ্গে মাথা নাড়াচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে কোনও অশান্তি, চিন্তা, ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট বলে কিছু নেই!

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সাইকেলের শব্দ পেয়ে মনোহরদা চোখ খুলল, "ও তুই এসে গিয়েছিস!" তার পরেই আমার সাইকেলটা দেখে বলল, "আরে, নতুন সাইকেল! ও না না, রং করিয়েছিস! বহোত আচ্ছা!"

আমি বললাম, "সে দিন লিট্টিটা হেভি হয়েছিল। দারুণ খেতে লেগেছে! আমি কাল লঙ্কার পরোটা বানাব, তুমি খাবে? আচার দিয়ে। খেলে সেইমতো বানাব!"

মনোহরদা হাসল। বলল, "এমন করিস না। তোর মা-বা-বিবিজিরা জানলে বকবে। আমার তো তোদের বাড়িতে খাবার কথা নয়। আউট হাউজে থাকি, নিজেই রান্না করি। তুই ঝামেলা করিস না।"

আমি বললাম, "তুমি খাবে কি না বলো।"

মনোহরদা বলল, "দুটো।"

আমি সাইকেলটা নিয়ে বাগানের মধ্যেকার বাঁধানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। এদিকে মিটার ঘর আছে। তার পাশে কাঠালচাঁপা গাছের নীচে আমি সাইকেল রাখি।

আজ স্যারের টিউশনের পরেই বুচার সঙ্গে গিয়েছিলাম সাইকেল আনতে। সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে কাপড়ের সাইড ব্যাগটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম।

আর বাড়িতে ঢুকেই কেমন যেন লাগল আমার। দেখলাম, নীচের বড় ঘরে কাকিমারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা-ও ছোট্ট বাচ্চাটাকে কোলে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। বাড়ির কাজের লোকজন পেছনের ঘর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। সবার মুখ থমথমে আর উদ্বিগ্ন!

আমি থমকে গেলাম। ওপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, দোতলার সিঁড়ির ওপরে হরিকাকা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কী ব্যাপার! কী হয়েছে! আমি মায়ের দিকে এগোলাম, "কী হয়েছে?"

মা চাপা গলায় বলল, "ভাল মানুষের বেশ ধরে সিঁধেল চোর ঢুকেছিল ঘরে। হরিকাকা ধরেছে আজ। আলোদাদার কাছে নিয়ে গিয়েছে!"

আমি অবাক হলাম। মা কি গুপ্ত সংস্থায় জয়েন করেছে! এ সব সাংকেতিক ভাষায় কী বলছে?

ছোট কাকিমার বয়স অল্প। মুখের আগল কম। আমায় হাত ধরে টেনে নিয়ে বলল, "আরে, ওরা কিস করছিল ঘরে বসে। হরিকাকা ধরে ফেলেছে!"

ওরা মানে! ও আচ্ছা। আমার বুঝতে এক সেকেন্ড দেরি হল। আর তখনই ওপর থেকে গলা পেলাম। শুনলাম, দোতলার বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সৌরদা বলছে, "যা করেছি দায়িত্ব নিয়ে করেছি। আমাদের জীবন। আমরা বুঝব। আপনাদের নাক গলাতে হবে না।"

"শাট আপ! আর কোনও দিন এ বাড়িতে আসবে না। আমার দিদির মেয়ে ও। একটা ট্র্যাজেডি হয়েছে ওর সঙ্গে। তাই বলে তুমি সেটার সুবিধে নেবে?" আলোজেঠুও এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির সামনে।

সৌরদা ওপর থেকে নীচে দাঁড়ানো আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা সবাই জেনে রাখুন। আমি লুনাকে ভালবাসি। আমি ওকেই বিয়ে করব। ওর মেয়ে আমার মেয়ে। কেউ বাধা দিয়ে দেখাক।"

"বেরোও তুমি। বেরোও এখান থেকে," আলোজেঠু এসে আচমকা ধাক্কা মারল সৌরদাকে। সৌরদাও রিফ্লেক্সে আলোজেঠুকে প্রতিহত করতে গিয়ে ধাক্কা দিল। আর সেটা এমন আচমকা হল যে, আলোজেঠু পড়ে গেল মাটিতে।

হরিকাকা সঙ্গে সঙ্গে "শুয়োরের বাচ্চা" বলে ধরতে গেল সৌরদাকে। সৌরদা নিজেকে বাঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তার পর চিৎকার করে বলল, "লুনা, আমি আবার আসব," তার পর প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

লুনাদিদি কোথায়? নিজের ঘরে কি? আমি দেখলাম বাড়ির সবাই এবার দৌড়ে যাচ্ছে আলোজেঠুর দিকে। আমি গেলাম না। চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল সৌরদা ঠেলা মেরে জানোয়ারটাকে এক তলায় ফেলে দিল না কেন! কেন মেরে ফেলল না!

আচমকা আমি আমার মধ্যে কেমন যেন একটা পশুকে জেগে উঠতে দেখলাম। হাত-পা কেমন যেন করে উঠল আমার। মনে হল যাই হয়ে যাক আমি আলোজেঠুকে মেরেই দেব একদিন! কিন্তু পরমুহূর্তেই অবাক লাগল। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে দেখলাম। ছোট করে কাটা চুল, চুড়িদার পরে দাঁড়িয়ে থাকা আমিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চিনতে পারলাম না যেন।

॥ সৌরর ডায়েরি থেকে ॥

॥ ঘ ॥

...তোমার শ্বাসের গন্ধ লেগে আছে আমার সারা গায়ে। তোমার ঠোঁটের ওপরের ওই তিল, চিবুকের ওই ভাঁজ, তোমার চুলের মধ্যে ডুবে যাওয়া সূর্যের আলো, তোমার আঙুল আর নিঁখুত ভাবে কাটা নখ, আর আমার পিঠে সেই নখের আঁচড় আমায় উন্মাদ করে দেয়! তোমায় কবে আমি পাব নিজের করে? যে যাই বলুক, যতই বাধা দিক, এমন আর-একটা বর্ষাকাল আসবে, যেদিন আমি আর তুমি নির্জন কোনও বারান্দায় এক সঙ্গে দেখব এই আঝোর ধারাপাত। আমি পৃথিবীর আর কোনও কিছুকে তোয়াক্কা করি না। আমাকে আর কেউ তোমার কাছে যাওয়া থেকে আটকাতে পারবে না, দেখো।...

॥ ৯ ॥

জুলু

হাওড়া স্টেশনটা যেন বিশাল এক দৈত্যের পেট। সেখানে হাজার হাজার মানুষকে দৈত্যটা যেন গিলে নিয়েছে! আমি চারিদিকটা ভাল করে দেখলাম।

পর পর প্ল্যাটফর্মে মেরুন রঙের ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনের ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই জেঠু। বাবা আর ছোটকা ট্রেনের মধ্যে উঠে হোল্ডঅল, বেতের ঝুড়ি ব্যাগ, সুটকেস সব গোছাচ্ছে। ব্যাপারটা হল, বাবারা চার ভাই, তিন বৌ আর বিন্নিদি মিলে কয়েকদিনের জন্য পুরী যাচ্ছে।

বর্ষা যেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে, সেখানে এই সময়ে কেউ পুরী যায়! তার ওপর মায়ের পায়ে চোট! যদিও মা এখন ভাল আছে।

কিছু ভাঙেনি। তাও স্ট্রেন করলে ব্যথা বাড়তেও পারে। এই সব বলেছিলাম আমি। কিন্তু কেউ আমার কথায় পাত্তা দেয়নি। বড় জেঠিমার নাকি পুরীতে পুজো দেওয়ার মানত আছে। দাদাভাইয়ের চাকরি হলে পুজো দেবে বলে রেখেছিল। এর পরে গেলে রথের ভিড় হয়ে যাবে।

আমাকেও মা যেতে বলেছিল, কিন্তু সামনেই আমার প্রি টেস্ট। তাই যেতে পারিনি। দাদাভাইও যায়নি। নতুন চাকরি, তাই ছুটি যে পাবে না সেটাই স্বাভাবিক।

আমি আর বুচা স্টেশনে এসেছি সকলকে ছাড়তে। আট জন লোকের প্রায় কুড়িটা লাগেজ হয়েছে। জেঠিমারা মুড়ি, বাতাসা, চ্যবনপ্রাশ, মগ, হট ওয়টার ব্যাগ, রুটি বেলার বেলুন-চাকি সহ আরও কীসব যে নিয়েছে, তা আর পুরো দেখে উঠতে পারিনি।

বাবা প্ল্যাটফর্মে নেমে এল এবার। তার পর বলল, "পড়াশোনাটা করবি কিন্তু। আমরা নেই বলে টো টো করে ঘুরবি না!"

বুচা পাশ থেকে বলল, "ঠিক বলেছ কাকু। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। স্যররাও তো বলেন সেই কথা। আমিও বারণ করি। সারাক্ষণ ঘোরা আর মোহনবাগান!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তোর মতো ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার হব নাকি? মেলা বকিস না!"

বাবা হেসে আমার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, "একদম ঝগড়া নয়। বাড়ি যাওয়ার সময় কিছু খেয়ে নিস দু'জনে।"

বুচা বলল, "ওকে বলে দিন তো, যেন আমায় খাওয়ায়! কিপটে হয়ে গেছে হেভি!"

এবার জানলার পাশে মা এসে বসল। বলল, "জুলু, একদম রাত জাগবি না। আমরা নেই, সেই সুযোগে মদ-সিগারেট খাবি না কিন্তু। আর আমি মালতীদিকে বলে দিয়ে এসেছি। যা খেতে ইচ্ছে করবে বলবি, বানিয়ে দেবে, বুঝেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম, "মা, যাচ্ছ তো পাঁচ দিনের জন্য! এত চিন্তা করছ কেন?"

"এই মাত্র পাঁচদিন?" বুচা আমায় পাশ থেকে খোঁচা দিল।

"হ্যাঁ কেন?" আমি বিরক্ত হলাম।

বুচা ট্রেনের মধ্যে আর প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে থাকা মালপত্র দেখিয়ে চোখ গোলগোল করে বলল, "আমি ভাবলাম মাস দুয়েকের জন্য যাচ্ছে বোধহয়!"

মা বিরক্ত হয়ে বুচাকে বলল, "তুই চুপ কর! ডেঁপো কোথাকার। এত লোকজনের একটু লাগেজ হবে না? নিজেরা রান্না করে খাব। পিঁড়ি ছাড়া বসে আনাজ কোটা যায়?"

"পিঁড়ি!" বুচা আঁতকে উঠে আমার দিকে তাকাল, "তোমরা পিঁড়িও নিয়েছ?"

"ঠাকুরের ছবি আর ধূপদানিও," মা যোগ করল।

বুচা মাথা নাড়ল নিজের মনে। বলল, "তোমাদের লেগ ডাস্ট দিয়ো। গোটা বাড়িটাকেই প্যাক করে নিয়ে যেতে পারতে!"

মা হেসে বলল, "তুই বিয়ের পর বৌকে বলিস ও ভাবে যেতে!"

"বিয়ে? আমি?" বুচা দরজায় দাঁড়ানো বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকুকে দেখে শখ মিটে গিয়েছে আমার!"

"তবে রে বাঁদর ছেলে!" মা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বুচার কানটা মুলে দিল।

বুচা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলি, এই হচ্ছে বাঙাল বাড়ির মেয়ে! কেমন মন-খোলা!"

মা চোখ পাকিয়ে বলল, "আমি বর্ধমানের মেয়ে! বাঙাল হতে যাব কোন দুঃখে?"

"এগজ্যাক্টলি," বুচা মাথা নাড়ল, "এটাই বলছিলাম, বাঙাল বাড়ির মেয়ে হলে চট করে পরের বাড়ির ছেলের কান মুলতই না!"

মা চোখ বড় করে রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। তার পর বলল, "দাঁড়া, তোর জন্য পুরীর লাঠি নিয়ে আসব। তোর মাকে দেব!"

"খাজা এনো তার চেয়ে। আর বাঘের চামড়ার জুতো!" বুচা সিরিয়াস মুখ করে বলল।

আমি বললাম, "হরিণের চামড়ার রে ইডিয়ট! বাঘের চামড়ার জুতো! কী বুদ্ধি!"

"সরি সরি," বুচা মাথা নাড়ল, "খাদ্য খাদক গুলিয়ে গিয়েছে!"

আচমকা দূর থেকে হুইস্‌ল শুনলাম। ট্রেনটা একটু নড়ে উঠল যেন। বাবা ট্রেনে উঠল। তার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা ফিরে যা। সাবধানে যাবি। বাড়িতে উল্টোপাল্টা কিছু করবি না কিন্তু।"

আমি আর বুচা একটু সরে দাঁড়ালাম। মা-জেঠিমারা হাত নাড়ল জানলা দিয়ে।

বিন্নিদি বলল, "তোর জন্য ঝিনুক আনব অনেক!"

আমি হাত নেড়ে হাসলাম। বৃদ্ধ দাঁড়াশ সাপের মতো ট্রেনটা আস্তে আস্তে চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে।

বুচা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাঃ, ভুল হয়ে গেল!"

"কী ভুল হল আবার!" আমি অবাক হলাম।

"একটা কটকি শাড়ি আনতে বলব ভাবলাম। ভুলে গেলাম!" বুচা নিজের মনে মাথা নাড়ল।

"কটকি শাড়ি? কার জন্য? কাকিমার জন্য?" আমি অবাক হলাম।

"না না," বুচা সামান্য লজ্জা পেল, "আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্য।"

"তোর কে?" আমি হাঁ হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

"গার্ল ফ্রেন্ড!" বুচা আরও লজ্জা পেল যেন।

"আমায় বলিসনি তো!" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

বুচা বলল, "এখনও ঠিক ফাইনাল হয়নি। তবে..." বুচা নাক টানল, "যাক গে। চল এবার যাই। স্ট্যান্ড থেকে মিনি ধরে নেব। আজ বাড়িতে টিভি আসবে। এতক্ষণে এসেও গিয়েছে বোধহয়। চল চল।"

সত্যি চারিদিকে এখন টেলিভিশন কেনার ধুম পড়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়িতেও গত পরশু টিভি এসেছে। দাদাভাই কিনেছে। বাড়ির বড়রা ছদ্ম-রাগ দেখালেও, মনে মনে তারা যে এক্সাইটেড, বেশ বুঝতে পারছি।

আমাদের টিভিটা বেশ বড়। কাঠের একটা আয়তাকার বাক্স যেন। পেছনে প্লাইউডের কভার। তাতে স্লট কাটা। তার মধ্য দিয়ে আলো-জ্বলা ডায়োড দেখা যায়। টিভির সামনে কাঠের শাটার আছে। তাতে চাবিও দেওয়া যায়। টিভির স্ক্রিনের ডান দিকে একটা প্যানেল। তাতে নানান নব। সে সব দিয়ে টিভিকে অন করা যায়, সেট করা হয়। ছবি কাঁপলে বা লাফালে ঠিক করা হয়।

আমাদের ছাদের ওপর একটা তিন কাঠির অ্যান্টেনা বসানো হয়েছে। সেখান থেকে একটা তার এসে টিভিতে যুক্ত হয়েছে! বাড়িতে টিভি আসা মানে একটা বিরাট ব্যাপার! ওয়ার্ল্ড কাপ দেখা যাবে এবার। ইন্ডিয়া আচমকা এমন খেলছে যে, চার টিমের গ্রুপ থেকে সেমি ফাইনালে চলে যেতেও পারে। সেরকম হলে নিজের চোখে টিভিতে খেলা দেখা একটা বড় ব্যাপার হবে!

আমরা দু'জনে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। তার পর একটু হেঁটে মিনিবাস স্ট্যান্ডের দিকে গেলাম। সার দিয়ে মেরুন-হলুদ মিনি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি মুদিয়ালি নামব আর বুচা চারু মার্কেট-এ নামবে। সেই মতো একটা বাসে উঠলাম।

বুচা আমার পাশে বসে বলল, "আমাদের নেলকো টিভি আসছে। তোদের তো সোনোডাইন, তাই না?"

আমি বললাম, "তোর গার্লফ্রেন্ড! এটা নতুন খবর! মেয়েটা কে?"

বুচা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "নেমে আমার টাইম থাকবে না। আমায় দশ টাকা দিবি আমি রোল খেয়ে নেব।"

"ইল্লি! দশ টাকা দেব! কেন দেব?" আমি ভুরু কোঁচকালাম।

"আরে, কাকু আমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন তো! পঁচিশ চাওয়া উচিত ছিল আমার। দশ বললাম তোর ভাগ্য!" বুচা খলবল করে বলল।

"কথা এড়িয়ে যাচ্ছিস," আমি দশ টাকা বের করে ওকে দিয়ে বললাম, "মেয়েটা কে?"

“আরে, সব ফাইনাল হবে, তার পর জানবি। আগে বলে কেস খাই আর কী!” বুচা মাথা নাড়াল, “আমাদের বাবা-মা’রা সব কেমন, না? নিজেরা উত্তম সুচিত্রা, অপর্ণা সৌমিত্র, রাজেশ খন্না শর্মিলা ঠাকুর করে হেদিয়ে মরে আর এদিকে আমাদের কাউকে পছন্দ হলেই মার মার করে ওঠে! ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সব!”

আমি কিছু বললাম না। বুচার গার্ল ফ্রেন্ড! এদিকে সেটা যে কে, আমায় বলছে না! আমি তো ওকে বলেছি যে, ওপাকে আমার ভাল লাগে। ও কি আমায় বিশ্বাস করে না! আমার অপমান হল। তার সঙ্গে ওপার কথা মনে পড়ায় কষ্টও লাগল খুব। মেয়েটাকে এত ভালবাসি, কিন্তু মেয়েটা একেবারে পাত্তা দেয় না আমায়। কেমন যেন উড়ে বেড়ায়। আমি যে একটা মানুষ সেটা ভাবেই না!

আমি কিছু না বলে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলাম।

বুচা কী ভাবল কে জানে। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “আসলে মেয়েটাকে এক বার বলেছিলাম। কিন্তু কেমন যেন ফোঁস করে উঠল! ফাইনাল করতে পারলে তোকেই ফার্স্ট বলব আমি।”

বাকি পথটা আর সেরকম কথা বললাম না আমরা। একটু পরে বুচা আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ভবানীপুর আসতে আসতে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। দেখলাম, লোকজন গাছের নীচে, দোকানের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার রাস্তায় কেউ যেন ঘষা কাচের আয়না পেতে দিয়েছে!

এখন মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে চারিদিকে। তাই নানা জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি লেগেই আছে। ভাবলে অবাক লাগে কত দিন আগে এই কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু আজও ট্রেন চলল না!

রাসবিহারী মোড় পার করে আর-একটু এসে মুদিয়ালি স্টপে বাসটা থামল। আমি বুচাকে জাগিয়ে দিয়ে নেমে গেলাম। বুচা নামার আগে আমার হাত ধরে বলল, “তোকেই সবার আগে বলব। প্রমিস!”

মুদিয়ালি থেকে সাহানগর অব্দি রাস্তাটা খুব যে কাছে, তা নয়। তার পর আবার ছিপছিপে বৃষ্টি পড়ছে। অন্য সময় হলে আমি সহজেই হেঁটে চলে যাই। কিন্তু যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে হেঁটে বাড়ি অবধি যেতে গেলে ভিজে যাব একেবারে!

আমি রাস্তাটা পার করে মুদিয়ালি মোড়ে যে বড় রাজবাড়িটা আছে, তার পাশ থেকে রিকশা ধরলাম একটা। রিকশায় বসে একটু এগোতেই দেখলাম বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল। পিচের রাস্তায় চটর-পটর শব্দ তুলে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে রিকশা এগোচ্ছে। বাজ পড়ছে এবার। আকাশ ফাটিয়ে আলোর ঝলকানি গাছের ডালপালার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। রিকশাচালক ভিজে গিয়েছে একদম!

আমি তুমুল শব্দের মধ্যে গলা তুলে বললাম, “আপনি কি একটু দাঁড় করিয়ে দেবেন? ভিজে গেলেন তো!”

লোকটি পেছনে না তাকিয়ে গলা তুলে বলল, “না না, ঠিক আছি ভাই। ভিজে তো গেছিই! অসুবিধে নেই!”

আমাদের বাড়ির সামনে একটা মন্দির আছে। তার সামনে টিনের একটা ছাউনি দেওয়া। আমি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে এক লাফে ছাউনির নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এবার আর অসুবিধে নেই। বাড়ির সানশেডের ছায়ায় ছায়ায় আমি না ভিজেই চলে যেতে পারব।

দাদাভাই কি এসে গিয়েছে? মালতীদি কাছেই থাকে। রাত দশটায় এসে খাবার গরম করে দিয়ে যাবে। আমার আর দাদার কাছে একটা করে চাবি আছে। ফলে বাড়িতে ঢুকতে কোনও অসুবিধে নেই!

বাড়ির দরজা খুলে আমি ঘরে ঢুকলাম। আর তখনই প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ল একটা। আমি ঘাবড়ে গেলাম। দরজা বন্ধ করে সিঁড়ির গোড়ায় জুতো খুলে রাখলাম। তার পর দোতলায় উঠলাম।

আমার ঘরটার একটা ঘর পরে দাদাভাইয়ের ঘর। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখা যায় দরজাটা। দেখলাম, আলো জ্বলছে ঘরে আর দরজাটা অর্ধেক ভেজানো। ভাবলাম, দাদাভাই বলে এক বার ডাকি। কিন্তু তার পরেই বৃষ্টির শব্দের মাঝে কার যেন একটা অস্পষ্ট গলার স্বর শুনলাম। কে এসেছে! আমার কেমন যেন খচ করে উঠল মনটা। মিঠুদি কি? কেউ নেই দেখে দাদাভাইয়ের কাছে এসেছে! মিটমাট হয়ে গিয়েছে দু’জনের? বেলা সে দিন যেন কী একটা বলতে গিয়েছিল! কিন্তু বেলা তো পাগলি! কী বোঝে, কী বলে তার ঠিক আছে?

মিঠুদি এসেছে কি? আমি পা টিপে টিপে দাদার ঘরের দিকে গেলাম। তার পর অর্ধেক ভেজানো দরজা দিয়ে তাকালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠে আমায় যেন ছত্রাখান করে ফাটিয়ে ফেলল দৃশ্যটা!

আমি দেখলাম ওপা দাদাভাইকে জড়িয়ে ধরে আছে। দাদাভাই বেশ বিব্রত, কিন্তু তাও ছাড়ছে না ওপাকে। আর ওপা বলছে, “আমি আদর করলে অসুবিধে কী তোমার? প্রেম করতে বলছি না তো। শুধু আদর করো। প্লিজ়। দ্যাখো, আমার কী অবস্থা... আমি পিলস-এ আছি... প্রবলেম হবে না। সৌরদা, প্লিজ় আজকেও এক বার...”

দাদাভাই বলছে, “এমন করিস না ওপা। আমি নিজেকে আটকাতে পারব না এর পর। আমিও মানুষ তো! প্লিজ় ওপা। আগে যা হয়েছে, হয়েছে। আর না। তা ছাড়া তোর দিদির সঙ্গে আমার... আর তোকে জুলু...”

“ফাক জুলু,” ওপা ছিটকে উঠে হাত দিয়ে দাদাভাইয়ের ঠোঁট বন্ধ করে দিল। তার পর বলল, “আজ আমার চাই-ই চাই। নো ম্যাটার হোয়াট। কেউ না জানলেই তো হল। প্লিজ় সৌরদা... প্লিজ় সৌর... আজ আমি তোমায়...”

ওপা কথা শেষ না করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। আর আমি ছিটকে সরে এলাম দরজা থেকে। চিরচির করে কি চেন খোলার শব্দ পেলাম? আমার সারা শরীর কাঁপছে। মাথার মধ্যে সব ফাঁকা। গা গোলাচ্ছে। ভোঁ শব্দে একটা ভিমরুল যেন বারবার আমার বুকের মধ্যে হুল ফুটিয়ে চলেছে! এটা কী দেখলাম আমি! ওরা কী করছে? কবে থেকে এমন?

টলতে টলতে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আবার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি পড়ছে? আমি কি ভিজে যাচ্ছি? আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! সারা পৃথিবীর সমস্ত আলো দুলছে! দাদাভাই এটা করতে পারল? নিজেকে আটকাতে পারল না? আমার সঙ্গে দাদাভাই এমন করল?

পেটের মধ্যে আচমকা পাক দিল একটা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মাটিতে। বমি করে দিলাম সব। তার পর রাস্তাতেই শুয়ে পড়লাম। মাথায় আর কিছু নেই! সব আবছা এখন। আলপিনের মতো বৃষ্টি ফুটছে গায়ে। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল আমার। আর ঠিক তখনই কে যেন এল আমার পাশে। কে যেন ধরল আমায়! আমি চোখ খুললাম কি? অবিশ্রান্ত জল ঝরে পড়ছে! আলো দুলছে! কে ধরল আমায়? আমি চিনতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম আজকের পর থেকে এই জীবনে আর আমি কাউকে কোনও দিন চিনতে পারব না।

॥ ১০ ॥

বেলা

আর পারছি না। আমি আর সত্যিই পারছি না। আমার নিজের মা যদি থাকত, তা হলে কি দিনের পর দিন আমাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হত? এই অত্যাচার মেনে এখানে পড়ে থাকতে হত? মাসিকে আমি মা বলি বটে, কিন্তু সত্যিকারের মা আর মিথ্যেকারের মায়ের মধ্যেকার পার্থক্য যেন আমি রোজ বুঝতে পারি।

বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিলাম আমি। জানোয়ারটা আজকেও ডেকেছিল আমায়। ঘরের দরজা বন্ধ করে বলেছিল, “আজ ভাল ভাবে করে দিস তো!”

আমি জানি এই বাড়ির অনেকেই জানে এই বন্ধ দরজার এ-পারে কী হয়, কিন্তু কারও কিছু বলার সাহস নেই! দরজার বাইরে গোটা সময়টা যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে হরিকাকা!

আলোজেঠু ক্ষমতাবান মানুষ। আর ক্ষমতাবান মানুষের সামনে

অধিকাংশ লোক কুকুরের মতো লেজ নাড়ে। পায়ে পড়ে যায়। এখানেও তাই।

আমি শুনেছি লোকে বলে, "দেবতার মতো মানুষ আলোকপ্রসাদবাবু। দেখেছ, বিয়ে পর্যন্ত করেনি!"

আমাদের এখানে বিয়ে না করাটা যে কিসের কৃতিত্ব বুঝি না। কাউকে ভগবান বানাতে হলেই এটা বলা হয় যে, সে বিয়ে করেনি! বিয়ে করাটা যেন খুব খারাপ! যেন অন্যায়! বিয়ের সঙ্গে যৌনতা জড়িত বলেই কি এমন একটা মনোভাব লোকজনের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছে? মানুষজন যে কী পরিমাণ হিপোক্রিট, সেটা যত বড় হচ্ছি তত যেন স্পষ্ট হচ্ছে আমার কাছে।

আমি মুখেচোখে জল দিয়ে আয়নার দিকে তাকালাম। মা চুলটা এত ছোট করে কেটে দিয়েছিল যে, প্রায় এক মাস হয়ে গেলেও সেভাবে বড় হয়নি। আজ আলোজেঠু আমার চুলগুলো মুঠো করে ধরার চেষ্টা করতে করতে হিসহিসে গলায় বলছিল, "কেন কেটেছিস চুল? কেন? আমি তোর মাকে বলে দেব আর যেন এমন না করে... আর যেন..." কথা শেষ না করে উত্তেজনায় কেঁপে উঠে অস্ফুটে চিৎকার করে উঠেছিল জানোয়ারটা!

আমি বেসিনের পাশে রাখা তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছলাম। তার পর আয়নার পাশে রাখা শেলফটা খুলে সেখান থেকে একটা ক্রিম নিয়ে মাখলাম হাতে। দেখলাম নতুন টোপাজ ব্লেড রাখা আছে। মনে হল এই যে নরকের মতো জীবনে আছি, সেটা কি শেষ করে দেব? হাতের শিরা কেটে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! কিন্তু এটা ভাবতেই মনের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল ভয়ে। একটা নোংরা লোক নোংরামো করছে, তার জন্য আমি নিজে মরব কেন? মনে হল, এমন পাতলা ব্লেড দিয়ে কি কারও গলা কাটা যায়? বা কাটা যায় পুরুষাঙ্গ?

রান্নাঘরে আমার অবাধ গতি। সেখানে নানান মাপের ছুরি আছে। সেই ছুরি দিয়ে অনায়াসে কেটে ফেলা যায় লোকটার সব কিছু। আমার শ্বাস দ্রুত হল ক্রমশ! চোয়াল শক্ত করে চোখ বন্ধ করলাম আমি। যেন দেখলাম তলপেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে আলোজেঠুর। গলার পাশ দিয়ে ফিনিকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত! আর ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আমি সেই দৃশ্য দেখছি!

"বেলা, এই বেলা," ঠকঠক করে দরজায় ধাক্কার সঙ্গে মায়ের গলা শুনলাম।

আমার যেন হুঁশ ফিরল। আমি চোখ খুলে আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে!

আমি সময় নিলাম একটু। তার পর বললাম, "কী হল?"

মা বলল, "বেরিয়ে আয়! কী করছিস এতক্ষণ ধরে?"

আমি দরজা খুলে বেরোলাম। দেখলাম, মা উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি দু'হাত দিয়ে মুখটা মুছে বললাম, "আমি নিজেকে মারব না, কিন্তু এক দিন ওই জানোয়ারটাকে আমি ঠিক মেরে দেব!"

মায়ের চোখে জল চলে এল আচমকা। আমার হাত ধরে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বলল, "আমি জানি আমি খারাপ। তুই ভাবিস যে, নিজের মা হলে সে এমন হতেই দিত না। কিন্তু আমি কী করব বুঝি না রে বেলা! তোর বাবা মারা যাওয়ার পরে আলোদাদা না থাকতে দিলে কোথায় যেতাম! এখনও তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাব? রাতে ঘুমোতে পারি না। চিন্তায় শরীর অস্থির করে। বুঝি, খুব অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু কী করে এর থেকে বেরোব বুঝি না! কীট-পতঙ্গের মতো জীবন আমাদের। কোনও গুরুত্বই নেই! আমি তো সেভাবে পড়াশোনা জানি না যে, কাজকর্ম করব! বেলা, তুই চাকরি করে এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবি?"

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা কি সত্যি বলছে নাকি আমায় স্তোক দেওয়ার জন্য অভিনয় করছে? আজকাল আসলে কাউকেই আর আমার বিশ্বাস হয় না।

কীট-পতঙ্গদের গুরুত্ব নেই? ভুল, সম্পূর্ণ ভুল! গোটা পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই কীট-পতঙ্গরা। মনে পড়ে গেল সেই কথাগুলো— 'Though apparently aimless, all their movements and actions are most deliberate and purposeful and they never give up.'

মা জানে না যে, আমিও ছাড়ব না! আজ না হয় কাল, না হয় সামনের মাসে, বা পরের বছর বা দশ বছর পরে, অথবা তিরিশ বছর পরে হলেও এর শোধ আমি তুলবই। আই ওন্ট গিভ আপ আইদার!

আমি মাকে বললাম, "বাদ দাও। আমি একটু লুনাদিদির কাছে যাব। বাজারে যেতে হবে তো, তাই জিজ্ঞেস করে নিই কিছু আনতে হবে কি না! তুমিও বলো কিছু আনতে হবে?"

মা কী বলবে বুঝতে না পেরে একটা ফর্দ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মাথা নামিয়ে চলে গেল।

আমি ঘরে গেলাম। আমার ঘরের একটা দিকে একটা নিচু ছোট টেবিলের ওপরে আমার ডায়োরামাটা রাখা আছে। পাশেই জানলা। জানলা দিয়ে কোণের দিকে বড় গেটটা দেখা যাচ্ছে। আমি দেখলাম, গেটের পাশে মনোহরদার সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছপালার জন্য লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কথাও শোনা যাচ্ছে না এত দূর থেকে। কে লোকটা? আমার কৌতূহল হল। আমি জানলার আরও কোণে সরে গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম। লোকটার লাল জামাটা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পরনে একটা বাদামি প্যান্ট। পায়ে কেডস।

লোকটা এবার ঘুরল। তার পর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। গাছের ডালপালা থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমি মুখটা দেখতে পেলাম। আরে, এ যে সেই গুন্ডা লোকটা! গুন্ডাদা বলে সবাই। আজও এসেছে! এই তো গত পরশু এসেছিল! আবার আজকেও এল!

আগে তো এত ঘনঘন আসত না! তা হলে এখন কেন? আমি জানি আলোজেঠু রাজনীতিতে যুক্ত। গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের সময় খুব সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করেছে। তখনও গুন্ডাদা আসত প্রায়ই। তার পর অনেকদিন হয়ে গেল আসেনি। আবার কয়েকদিন হল যাতায়াত বেড়েছে। কেন কে জানে!

আমি জানলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ডায়োরামাটা দেখলাম। একটা শহর বানিয়েছি। তার শেষে একটা নদী আর জঙ্গল। জাপানদাদু এসে দেখে গিয়েছে পুরো জিনিসটা। খুব পছন্দ হয়েছে। তবে কয়েকটা সাজেশনও দিয়ে গিয়েছে। প্রতিটা বাড়িঘরের মেটিরিয়াল যেন আলাদা আলাদা হয় সেটা বলেছে। শহরে কেমন পাখি থাকতে পারে, সেটা বলেছে। বলেছে, শহরের সব রাস্তা যেন একই রকম পিচের না বানাই! নানান রকমের টেক্সচার যেন দিই!

জাপানদাদু লোকটা খুবই ভাল। এই নিয়ে ব্যবসাও করতে চায়। আমাকে বলেছে ওয়ার্কিং পার্টনার করে নেবে। ছোট ছোট মডেল বানাতে হবে আমায়। সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে আটশো অবধি দেবেন। মেটিরিয়াল জাপানদাদুই সাপ্লাই করবে।

আমি জানি, পড়াশোনা আছে আমার, কিন্তু টাকা খুবই দরকার। সে দিন লেক মার্কেটের একটা দোকানে লাল রঙের একটা গেঞ্জি দেখেছি। সেটা দেখেই এত বার জুলুর কথা মনে হয়েছে যে, কী বলব! আমি দামও জিজ্ঞেস করেছি। আটষট্টি টাকা। জাপানদাদু প্রথম পেমেন্টটা দিলে জুলুর জন্য ওই গেঞ্জিটা কিনব!

জাপানদাদু কথা সেরে বলেছিল, "জুলাই মাস থেকে আমি তা হলে কাজ ধরি? তুমি টাইমলি দিতে পারবে তো?"

আমি মাথা নেড়েছিলাম। বলেছিলাম, "পরীক্ষার সময়গুলো একটু দেরি হবে, না হলে ঠিক দিয়ে দেব।"

"গুড," হেসেছিল জাপানদাদু। বলেছিল, "আমি একটা চুক্তিপত্র করে নেব। তা, তোমার ভাল নামটাই কি বেলা?"

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "আমার নাম রোশান্দ্রা চট্টোপাধ্যায়।"

"কী!" জাপানদাদু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, "মানে? কী অদ্ভুত নাম!"

আমি বলার আগেই পাশ থেকে বুচা বলেছিল, "মানে শাইনিং লাইট!"

"বাওয়া!" জাপানদাদু ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "ওর নাম আর

মানে জেনে বসে আছিস তুই! ভালই তো কেস খেয়েছিস!"

বুচা মাথা নামিয়ে হেঁ হেঁ করেছিল একটু। আমি পাত্তা দিইনি। কাজ পাব, টাকা পাব এটাই আসল। আমার চোখের সামনে শুধু লাল গেঞ্জিটা ঘুরছিল।

আমি আর অপেক্ষা না-করে লুনাদিদির ঘরের দিকে গেলাম। সে দিনের ঝামেলার পর থেকে লুনাদিদি একদম চুপ করে গিয়েছে। কারও সঙ্গে প্রায় কথাই বলছে না। যা বলছে শুধু আমার সঙ্গেই। আসলে আচমকা লুনাদিদির সঙ্গে সৌরদার সম্পর্কটা যে এভাবে সবার সামনে এসে যাবে, সেটা কেউ ভাবতে পারেনি।

আমার মনে হল, জুলু কি জানে ওর দাদা এ সব করছে? বা করেছে? ক'দিন জুলু পড়তে আসছে না। বুচাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলতে পারেনি। বলেছে, জুলু নাকি বাড়িতেও যেতে বারণ করেছে ওকে। জুলুর বাড়ির লোকজন পুরী গিয়েছিল। ফিরে আসার পরে বুচা একদিন গিয়েছিল, তখনই দেখেছে জুলু কেমন ঝিমিয়ে গিয়েছে। মুখ শুকনো। চোখের তলায় কালি। কী হয়েছে সেটা জুলু বলেনি। তবে বুচা আমায় বলেছে ওর ধারণা, ওপা নিশ্চয়ই জুলুকে কিছু একটা বলেছে!

ওপা! ওঃ, মেয়েটার নাম শুনলেই মনে হয় কেউ আমার শিরায় রক্তের জায়গায় পেট্রোল ভরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!

আমার ইচ্ছে আছে আজ লেক মার্কেট থেকে এক বার সাহানগরে যাব জুলুদের বাড়িতে। অনেক আগে এক বার গিয়েছিলাম। আজও যাব। এক বার চলে গেলে তো আর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে না! ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।

লুনাদিদির ঘরের পর্দা সরিয়ে আমি ঢুকলাম। লুনাদিদি দরজার দিকে পেছন করে টেবিলে মাথা রেখে বসেছিল। আমার আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল।

আরে, এ কী! লুনাদিদির চোখে জল! নাকের মাথা লাল! নীল চোখ দুটোয় সারা পৃথিবীর মেঘ এসে জমেছে যেন! আমি এগিয়ে গেলাম লুনাদিদির কাছে। লুনাদিদি যেন এমন কেউ আসার অপেক্ষাই করছিল। "কী হয়েছে?" বলে আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লুনাদিদি আচমকা আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বুক আর কোমরের কাছে মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

"আরে, কী হল? লুনাদিদি ও লুনাদিদি? কী হয়েছে বলো। এমন করে কাঁদছ কেন?"

লুনাদিদি সময় নিল আর-একটু। তার পর মুখ তুলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করল। বলল, "আমায় একটা হেল্প করবি বেলা? প্লিজ়, করবি?"

আমি হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসলাম। বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো না! এমন কাঁদছ কেন?"

"আলোমামা সামনে জুলাই এন্ডেই আমার বিয়ে দিয়ে দেবে বলছে। বলছে আর ওয়েট করবে না। কিন্তু ওই লোকটাকে আমি মরে গেলেও বিয়ে করব না। আমায় সৌর বলেছিল ওর সঙ্গে চলে যেতে। বম্বে চলে যাবে ও। আমিও যাব। কিন্তু সেটা যে ওকে বলব, তাই সুযোগ পাচ্ছি না। দেখছিস তো, আমায় বাড়ি থেকেই বেরোতে দিচ্ছে না! আমি কি পুতুল নাকি, যে যা বলবে তাই করতে হবে? আলোমামা নিজের বিজ়নেস দেখছে! কিন্তু আমি কিছুতেই এই বিয়েটা করব না।"

"সে কোরো না। কিন্তু আমায় কী করতে হবে বলো," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লুনাদিদি টেবিলের পাশের ড্রয়ারটা টেনে তার মধ্য থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে বলল, "এটা সৌরকে দিয়ে আসবি? ওদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে। আজকেই। পারবি?"

আমি খামটা নিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম।

লুনাদিদি বলল, "তুই এখনই যা। আমি জানি আজ সৌর অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে। ইন্ডিয়া ইংল্যান্ডের সেমি ফাইনাল ম্যাচ আছে না ওয়ার্ল্ড কাপের! তুই এখনই যা প্লিজ়!"

লুনাদির ডেসপারেশান আমি বুঝতে পারলাম। তার সঙ্গে ভালও লাগল যে, আমি যেটা চাইছিলাম সেটাই হল। জুলুকে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব, ভগবান একটা কারণ তৈরি করে, সেটার সুযোগ করে দিল আমায়! মনের মধ্যে যে-অন্ধকারটা আলোজেঠু ভরে দিয়েছিল, জুলুর কথা মনে আসতেই সেটা কেটে গেল। বুঝলাম, আমরা যাদের ভালবাসি, তারাই আসলে আমাদের জীবনের রোদ্দুর!

আমি সিঁড়ি দিয়ে ঝড়ের বেগে নেমে এলাম। তার পর ঘরে গিয়ে বাজারের ব্যাগটা নিলাম। ফেরার পথে মায়ের দেওয়া ফর্দ মিলিয়ে মাল নিয়ে আসব লেক মার্কেট থেকে। টেবিলের ওপর থেকে সাইকেলের চাবিটা তুলে আবার দৌড় লাগালাম নীচে।

আমাকে ঝড়ের বেগে মেন গেট দিয়ে বেরোতে দেখে মনোহরদা বলল, "আস্তে যা! এভাবে গেলে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে!"

জুলুদের বাড়িটা আমার মনে আছে স্পষ্ট। তাই ওই পাড়ায় পৌঁছতে অসুবিধে হল না। আমার ভাগ্য আজ খুবই ভাল। কারণ, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে হল না। বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা দোকানের বেঞ্চে বসে রয়েছে জুলু। পাশে একটা ক্যারাম বোর্ড পাতা। কয়েকটা ছেলে খেলছে।

আমি সামনে গিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করালাম।

আমায় দেখে মরার মতো চোখ তুলে তাকাল জুলু। এ কী চেহারা হয়েছে ওর! এমন চোখের তলায় কালি! মুখ শুকনো, উস্কোখুস্কো চুল! জামার বোতাম খোলা! দেখেই আমার এত কষ্ট হল! ইচ্ছে হলে চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দিই। মুখটা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিই। ইচ্ছে হল সব ভুলে জুলুকে জড়িয়ে নিজের মধ্যে লুকিয়ে নিই!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সৌরদা আছে বাড়িতে?"

"কে!" জুলু যেন ঘুম থেকে উঠল!

"সৌরদা বাড়িতে আছে? লুনাদিদি একটা চিঠি দিয়েছে," আমি বললাম। ইচ্ছে হল গড়গড় করে সবটা বলে দিই।

জুলু কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম থেকে জাগল, "লুনাদি চিঠি দিয়েছে! কেন?"

আমি হাসলাম। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। বললাম, "তুমি জানো না? দু'জনের মধ্যে..." বলে ঠোঁট কামড়ে তাকালাম ওর দিকে।

"কী!" জুলু দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "ঠিক আছে, দাও চিঠিটা। আমি দিয়ে দেব। দাদাভাই এখনও আসেনি।"

"তুমি দিয়ে দেবে তো?" আমি জামার ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে জিজ্ঞেস করলাম।

জুলু আমার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল চিঠিটা। তার পর বলল, "তুমি যাও, আমি ঠিক দিয়ে দেব। বাই!"

জুলু আমায় আর কিছু বলতে না দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল!

ওর "বাই" বলার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যে, আমার মনের মধ্যের রোদ্দুরটা দপ করে নিভে গেল! আমি আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম, মেঘ করে আসছে কলকাতার ওপর।

আমার মনে হল, কলকাতারও কি এমন কোনও জুলু আছে যে, তাকে একটুও পাত্তা দেয় না!

॥ সৌরর ডায়েরি থেকে ॥

॥ ৬ ॥

...এবার বন্দর ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আমার জীবনে কলকাতা পর্বের এখানেই শেষ! আমার এই জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই! আমি জানি, কেউ আমাকে বুঝবে না। জানি, খারাপ লোকেরা আমাকে বাধা দেবে। কিন্তু পালে যার হাওয়া লেগেছে, তাকে আটকায় সাধ্য কার! আমি এই শহরের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সব পঙ্কিলতা পেছনে ফেলে তোমার সঙ্গে নতুন শহরে যেতে চাই। নতুন জীবনে যেতে চাই। যা অন্যায় আমি করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার অন্যায় কি কোনও রকমে ভাই জেনে গিয়েছে? ওর এমন কষ্ট কেন? কিসের? না, আর এসব ভাবব না। আমি শুধু তোমার কথা ভাবতে চাই। তুমি

আমার আলো! তোমার কাছেই আমার জাহাজের মুক্তি লেখা রয়েছে। দেখা হবে প্রিয়তমা...

৷৷ ১১ ৷৷

জুলু

যাকে তুমি সবচেয়ে ভালবাস, তার প্রতি যখন ঘৃণা আসে সেটাও কি সবচেয়ে বেশি হয়েই আসে? তার কাছে ঠকে গেলে কি নিজেকে বোকা মনে হয়? মনে হয়, আমার বেঁচে থাকার অর্থ শেষ হয়ে গেল? আর? আর কী মনে হয়? মনে হয় তাকে সরিয়ে দেব আমার সামনে থেকে? রাগে, ঘৃণায় কি শরীরের প্রতিটা লোমকূপ থেকে অ্যাসিডের বাষ্প বেরোয়? মাথার ব্রহ্মতালু ভেদ করে ফেটে বেরোয় লাভা? মনে হয় একে চরম শাস্তি দিতে হবে?

আমি নিজের দিকে তাকালাম। লাল চোখ। চোখের তলায় কালি। মাথার চুল এলোমেলো। নিজেকে আমার কেমন যেন বিসর্জনে যাওয়া অসুরের মতো মনে হল! আমার হাত কাঁপছে। পায়ে যেন জোর নেই! মনে হচ্ছে বুকের মধ্য থেকে হৃৎপিন্ডটা বোমার মতো ফেটে ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে! খিদে নেই আমার। ঘুম নেই। নেই অতীত বা ভবিষ্যৎ! কেবল একটা সুড়ঙ্গের ভেতরে কালো থকথকে আঠালো নোংরার মধ্য দিয়ে যেন হেঁটে যাওয়া এক সরীসৃপ আমি! বুকের মধ্যে গরল ভরা একটা বাটি আছে কেবল। এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম আমি। আর আবার সামনে ঝলসে উঠল সেই ঘর। অর্ধেক ভেজানো দরজা। চিরচির শব্দ! খাটের পায়ার মচমচ। শিৎকার। মোচনের আশ্লেষ! এসব কি আমি দেখেছি? নাকি সবটাই কল্পনা? কতক্ষণ আমি ছিলাম ওখানে? আমার সত্যি-মিথ্যে সব গুলিয়ে গিয়েছে! দাদাভাই! দাদাভাই এমন করল? বলল তো ভালবাসে না ওপাকে, তার পরেও এমন ভাবে ওর সঙ্গে সেক্স করল! শরীর? শুধু শরীর! শরীর কি কেবল এক সর্বগ্রাসী পুরুষাঙ্গ?

আর, তার পর জানলাম লুনাদির সঙ্গে প্রেম! মানে ছেলেটা কী? মানুষ? সবাই যাকে ভগবান বানিয়ে রেখেছে, সে আসলে এক রাক্ষস? আসলে নরকের কীট!

আমার চোখে জল এসেছে আবার! আমি হাতের তালুতে মুখ ঢেকে আবার ভেঙে পড়লাম মেঝেতে! কেন কাঁদছি আমি? ওপাকে অমন অবস্থায় অন্যের সঙ্গে দেখে, নাকি নিজের দাদাভাইকে আমার পিঠে ছুরি মারতে দেখে? এটা কি ভালবাসা হারানোর কান্না, নাকি বিশ্বাস হারানোর রক্তক্ষরণ!

ঠকঠক করে দরজায় শব্দ হল এবার! কে এল! আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, বিছানার ওপর রাখা বালিশে ঢাকা দেওয়ার তোয়ালে আছে। আমি সেটা টেনে নিয়ে ভাল করে চোখ মুছলাম।

দরজায় শব্দ হল আবার। সঙ্গে বিন্নিদির গলা, "জুলু? এখন এই সময়ে দরজা বন্ধ করে কী করছিস? দরজা খোল। আজ ফাইনাল না? টিভিটা গোলমাল করছে। নির্ঘাত পাখিতে অ্যান্টেনার তার ঠুকরে খুলে দিয়েছে। দেখ এক বার। দাদাভাই তো আসেনি এখনও। কী রে? কী বলছি?"

আমি নিজেকে যতটা সম্ভব ঠিক করে দরজা খুলে বাইরে এলাম!

বিন্নিদি আমার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল, "কী হয়েছে তোর! এমন মুখচোখ কেন? কী হয়েছে জুলু?"

আমি মাথা নাড়লাম, "কিছু না রে। আমি যাচ্ছি ছাদে। ঠিক করে দিচ্ছি।"

আমি ঘরে ঢুকে যন্ত্র নিতে গেলাম, কিন্তু বিন্নিদি আমায় যেতে দিল না। হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? পুরী থেকে আসা ইস্তক দেখছি কেমন ভূতে পাওয়ার মতো হয়ে আছিস! নেশা-টেশা করছিস নাকি?"

"না রে, কিছু না। সামনে এইচএস না? স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে! তাই মাঝে মাঝে..." আমি হাসার চেষ্টা করলাম।

বিন্নিদি সরু চোখে তাকাল আমার দিকে। বলল, "ঢপ যে মারছিস বুঝতেই পারছি। কী কেস রে? প্রেমে-ফেমে দাগা খেয়েছিস? আমায় বল না!"

আমার গলার কাছে আবার খাবার আটকে যাওয়ার মতো লাগল। কষ্ট হচ্ছে আমার। এসব কথা থেকে যত দূরে যেতে চাইছি, তত এসব কথা যেন তাড়া করছে আমায়।

আমি চোয়াল শক্ত করে প্রাণপণে নিজেকে সামলালাম। বললাম, "কী সব যে বলিস! সামনে পরীক্ষা আর এসব করব! মানুষের কি মন খারাপ করতে নেই? মন খারাপ করলেই প্রেম? ওরকম ভুলভাল মানুষ আমি নই! সর, ছাদে যাই। খেলা শুরু হয়ে যাবে।"

বিন্নিদি আর কিছু না বলে সরে দাঁড়াল। আমি আমার ঘরে ঢুকে স্ক্রু-ড্রাইভার আর ছুরি নিলাম একটা। তার পর আর অপেক্ষা না করে ছাদে উঠে গেলাম।

ছাদের এক পাশে অ্যান্টেনাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুপুরের রোদে চকচক করছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম অ্যান্টেনার যেখানে তারের জয়েন্ট আছে, সেখান থেকে খুলে গিয়েছে। এখানে দোয়েল আসে একটা। ছোট্ট, সাদা-কালো পাখি! খুব অস্থির! ব্যাটা অ্যান্টেনায় বসে এর আগেও দু'বার ঠুকরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে!

ছাদের এক কোণে একটা ভাঙা চেয়ার রাখা আছে। আমি সেটা টেনে নিয়ে উঠলাম। তার পর অ্যান্টেনার দিকে মন দিলাম।

কাজটা সারতে মিনিট দশেক সময় লাগল আমার। চেয়ারটা আবার কোণে রেখে দিয়ে আমি নেমে এলাম নীচে।

বিন্নিদি আমায় দেখেই টিভিটা চালাল। ওই চিত্রবিচিত্র স্থির ছবি দেখাচ্ছে। সঙ্গে কু শব্দ। ঠিক আছে। একটু পরেই খেলা শুরু হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার মন নেই এসবে!

আজ শনিবার। আমাদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। তাই ছুটি। সকালে বুচা এসেছিল। আমি বিরক্তই হয়েছিলাম। ওকে তো আগেই বলেছিলাম যে, এখন যেন না আসে আমাদের বাড়ি। আমি কারও সঙ্গে গল্প করার মুডে নেই!

বুচা আজ খুব উত্তেজিত ছিল। কেমন উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা লোডশেডিং জামা পরে এসেছিল। জামার রংটা ওপর থেকে নীচে নামতে নামতে ফেড হয়ে গেছে। দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায় আমার।

আমি বলেছিলাম, "কী চাই? এসেছিস কেন?"

"ওরে বাবা, পুরো ফর্টি নাইন হয়ে আছিস যে!" বুচা চোখ গোলগোল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার পর বলেছিল, "আজ আমার হেভি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ফাইনাল! জিতলেই ক্লেম করব!"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। কী সব বলছে! ক্লেম করবে মানে? কী ক্লেম করবে! আর সে সব জেনে আমারই-বা কী হবে!

বুচা আমার রিঅ্যাকশন না দেখেই বলেছিল, "যদি আজ জিততে পারি, তবে দেখবি কী হয়! বাই দ্য ওয়ে, মিঠুদির কী হয়েছে রে?"

মিঠুদি! আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম।

বুচা বলল, "আরে, আসার পথে দেখলাম হাসপাতালে নিয়ে গেল। কী কেস! তুই জানিস কিছু?"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। মিঠুদির আবার কী হল!

বুচা বলেছিল, "যাক গে, আমি যাই। তুই আসবি আমাদের বাড়িতে খেলা দেখতে? এক সঙ্গে দেখা যেত!"

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "তুই যা, আমার কিছু ভাল লাগছে না। প্লিজ়।"

বুচা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, তার পর যাওয়ার আগে বলেছিল, "আবার হিমালয়ে-টিমালয়ে চলে যাস না যেন! যা চেহারা আর মুখের ছিরি করেছিস! সামলে নিলে বলিস কী হয়েছে! তোরা ঘটিরা এত চাপা কেন বল তো?"

আমি কথা না বাড়িয়ে ঘরে চলে এসেছিলাম। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছিল না। তার সঙ্গে মিঠুদির আবার কী হল! আমার মনে পড়েছিল সেই বৃষ্টির সন্ধেটার কথা। আমি বাড়ির বাইরে এসে, পড়ে গিয়েছিলাম রাস্তায়। তখন কে তুলে ধরেছিল আমায়! গুন্ডাদা!
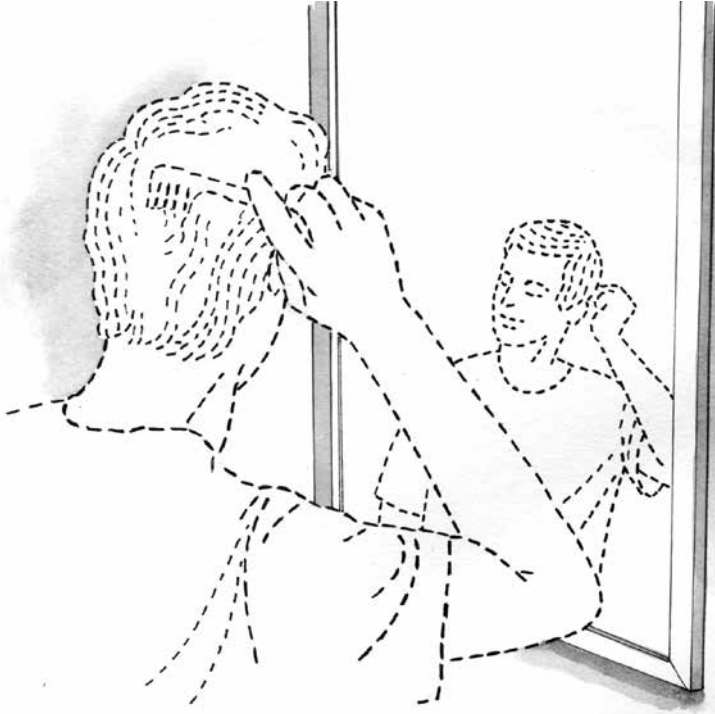
গুন্ডাদা আমায় নিয়ে নারুদার দোকানে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল কী হয়েছে? আমি এমন করছি কেন? কিন্তু সে দিন আমি কোনও কিছু বলার অবস্থাতেই ছিলাম না। সারা পৃথিবী দুলছিল আমার। যা দেখেছিলাম, তাতে যেন আমার চোখে কেউ লোহার গরম শলাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। গুন্ডাদার কোনও কথা আমার কানে ঢুকছিল না। আরও কয়েকজন আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

তবু তার মধ্যেও আমার মনে হচ্ছিল গুন্ডাদাকে যদি আমি সবটা বলে দিই, তা হলে ভয়ঙ্কর কিছু হবে। তাই আমার মনের মধ্যেকার আর-একটা মন যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমায় ধরে রেখেছিল।

কতক্ষণ ওখানে বসেছিলাম মনে নেই, তার পর দেখেছিলাম দাদাভাই এল! কে ডেকে এনেছিল দাদাভাইকে? আর দাদাভাই কি একা ছিল! আমার মাথা কাজ করছিল না। দাদাভাই আর গুন্ডাদা আমায় ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। আমি যাওয়ার পথে হাঁ করে দাদাভাইকে দেখছিলাম! এই আমার ব্যাটম্যান! মুখোশের আড়ালে এ কি সত্যি ব্যাটমান, নাকি নরক থেকে উঠে আসা কোনও রাক্ষস! আমরা কোন গোথামে থাকি? এই গোথামে কি ব্যাটম্যানই আসল খারাপ লোক?

সে দিন গুন্ডাদাকে কিছু বলিনি আমি। কিন্তু পরে আর চুপ করে থাকিনি। যেদিন নারুর দোকানের সামনে আমার সঙ্গে বেলার দেখা হয়েছিল, সে দিন বেলা আমায় দাদাভাইয়ের নাম করে চিঠি দিয়েছিল একটা। আর তার সঙ্গে এমন একটা কথা বলেছিল যে, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল আমার! লুনাদিকেও ফাঁসিয়েছে রাক্ষসটা? একজনকে বলছে বিয়ে করবে। তার বোনের সঙ্গে শুচ্ছে। আবার অন্য একটা দুঃখী মেয়ের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে! এমন করে কেউ পার পেয়ে যাবে? বার বার করেও পার পেয়ে যাবে! এটা হতে দেব আমি? কেন দেব? অন্যায় যে সয় সেও কি সমান দোষী নয়?

বেলা চলে যাওয়ার পরে আমি নারুদার কাছে গিয়ে কেটলির ভাপে খামের মুখটা খুলেছিলাম। কী লিখেছে দেখি!

দ্রুত পড়েছিলাম চিঠিটা। লুনাদি এসব কী লিখেছে? দাদাভাইয়ের সঙ্গে বম্বে চলে যাবে কাউকে কিছু না বলে! দাদাভাই-ই নাকি এমন কথা বলেছে ওকে! এসব কী হচ্ছে! দাদাভাই কী করছে! আমার মনে হচ্ছে সারা পৃথিবীটা দু'হাতের মধ্যে নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিই। মনে হচ্ছিল আর নয়, এবার একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। আমি তাই অপেক্ষা না করে গুন্ডাদার কাছে গিয়েছিলাম। জানতাম, শ্মশানের কাছের পার্টি অফিসে এই সময় গুন্ডাদা থাকে।

কিন্তু গুন্ডাদা ছিল না। পার্টি অফিসের একটা ছেলে বলেছিল, আলোজেঠুর বাড়িতে গিয়েছে গুন্ডাদা। বলেছিল, ইচ্ছে করলে আমি অপেক্ষা করতে পারি। গুন্ডাদা চলে আসবে।

গুন্ডাদা এসেছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। বিকেলের আলোয় গুন্ডাদাকে কেমন যেন এলোমেলো লাগছিল সে দিন। মনে হচ্ছিল কিছু নিয়ে খুব অস্থির হয়ে আছে। আমাকে নিয়ে শ্মশানের গেটের উল্টোদিকের একটা চায়ের দোকানে বসেছিল। আমি দেখছিলাম শ্মশানের মধ্য থেকে কালো ধোঁয়া হেলে যাওয়া মিনারের মতো আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আমায় গুন্ডাদা বলেছিল, "মিঠুটা আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে! সৌরটা যে কী করছে! জানতাম দু'জনের মধ্যে ভাব-ভালবাসা আছে। তাই আমি সেভাবে ঢুকিনি ওদের মধ্যে। একদিন শুধু সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল সৌরর সঙ্গে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাকে পুরো ঢুকতেই হবে। জল মাথার ওপর উঠে গিয়েছে। যাক গে, তুই কিছু বলবি?"

আমি কোনও কথা না বলে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। গুন্ডাদা অবাক মুখ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার পর চিঠিটা নিয়েছিল।

ধোঁয়ার মিনার লম্বা হচ্ছিল ক্রমশ। বিকেলের আলো পড়ে আসছিল চেতলার দিকে। টালিগঞ্জ রোডে ভিড় বাড়ছিল একটু একটু করে। ম্যাটাডোরে করে মৃতদেহ আসছিল একের পর এক। আর চিঠিটা পড়ে মাথা নামিয়ে বসেছিল গুন্ডাদা।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে চিঠিটা নিয়ে নিয়েছিলাম গুন্ডাদার হাত থেকে। গুন্ডাদার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে তার পর শুধু বলেছিল, "এটা আমি জানি।"

জানে? কীভাবে? তবে আমি সে সব জিজ্ঞেস করিনি। শুধু আমি বলেছিলাম, "এর কি কোনও বিহিত হবে না?"

গুন্ডাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "চিঠিটা মুখ বন্ধ করে সৌরকে দিয়ে দিবি।"

আমি চোয়াল শক্ত করে বলেছিলাম, "তুমি কিছু করবে না?"

গুন্ডাদা বলেছিল, "বাড়ি যা জুলু। বড়দের ব্যাপারে পড়িস না।"

টিভির লিঙ্ক চলে গিয়েছে! কোনও মানে হয়! আসল সময়েই এমনটা

হল! অগত্যা আমরা রেডিয়ো চালিয়ে দিয়েছি। কমেন্ট্রি শুনছি।

শুনলাম, মদনলালের বলটা অফ স্টাম্প ঘেঁষে এল আর ভিভ রিচার্ডস বলটা শর্ট দেখে পুল করার লোভ সামলাতে পারল না। আড়াআড়ি চালাল ব্যাটটা। কিন্তু বলটা সামান্য মিস টাইম হল আর বেলুনের মতো আকাশে উঠে গেল মিড উইকেটের দিকে। কপিলদেব বল লক্ষ করে দৌড় দিল এবার। আর গোটা ভারতবর্ষ কপিলদেবের সঙ্গে দৌড়ল!

আমি দেখলাম বাবা, দুই জেঠু আর দাদাভাই উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে। ওই বলটা নীচে নামছে এবার। কপিল হাত তুলে বলের নীচে পৌঁছে গিয়েছে। রেডিয়োতে চিৎকার করছে কমেন্টটর। বাবাও চিৎকার করছে। কপিল বলটা লুফে নিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল এবার! আর চিৎকার বাড়ল আরও! পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে! কমেন্টেটর বলছে, দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়েছে। আমার বাবা বাচ্চা ছেলের মতো বড় জেঠুকে জড়িয়ে ধরে নাচছে! বিন্নিদি লাফাচ্ছে। মা-জেঠিমারাও খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব বলে যাচ্ছে! আর আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আমার এই মনের অবস্থায় কি খুশি হওয়া উচিত? কী করা উচিত আসলে? আমি মাথা নিচু করে নিলাম। আর ঠিক তখনই আমাদের বাড়ির কলিংবেলটা বেজে উঠল।

এখন আবার কে? মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে গেল। তার পরই দরজা থেকে বলল, "সৌর, গুন্ডা এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে।"

"এখন!" দাদাভাই বিরক্ত হল, "আসার সময় পায় না!" বলল, কিন্তু গেলও। কী মনে হওয়াতে আমিও পেছনে পেছনে গেলাম।

মা আমাদের রেখে ঘরে ফিরে গেল।

গুন্ডাদা বলল, "খুব দরকার, বাইরে আয়!"

"এখন? খেলা ছেড়ে?" দাদাভাই বিরক্তিটা লুকোল না।

গুন্ডাদা বলল, "লুনাকে নিয়ে জরুরি কথা আছে। এদিকে মিঠু হাসপাতালে ভর্তি। চল, আমার সঙ্গে। নাকি এখানেই..."

"ল-লুনা!" দাদাভাই চকিতে আমার দিকে তাকাল। তার পর পায়ে চটিটা গলিয়ে বলল, "চুপ কর গুন্ডা। বাইরে চল," বলে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল বাইরে।

গুন্ডাদা আমার দিকে তাকাল। তার পর ঠান্ডা গলায় বলল, "দরজা বন্ধ করে দে। ওর ফিরতে দেরি হবে।"

ফিরতে কত দেরি হবে? দেখলাম, টিভির লিঙ্ক চলে এল একটু পরেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ উইকেটটা পড়ল প্রায় রাত বারোটার কাছাকাছি। আমরা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ভারত প্রুডেনশিয়াল কাপ মানে বিশ্বকাপ জিতেছে! সারা পাড়ায় বাজি ফাটতে আরম্ভ করল। রাস্তায় লোকজন বেরিয়ে চিৎকার শুরু করল। ভারতের পতাকা নিয়ে গান শুরু করল কিছু মানুষ। কিন্তু এ সব থেকে দূরে আমাদের বাড়িতে উদ্বেগ বাড়তে লাগল। দাদাভাই এখনও ফিরল না কেন?

কপিলদেব হাতে বিশ্বকাপ তুলল। আজ সবাই হাসিখুশি। আনন্দে পাগল। শুধু আমাদের বাড়ির লোকজন কী করবে যেন বুঝতে পারছে না।

বাবা জেঠুরা এবার বাইরে বেরোল। বড় জেঠিমা মুখ লাল করে বসে রইল। গোটা বাড়ি থমথমে হয়ে আছে। টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে ভারতের বিশ্বকাপ জেতার মতো একটা ঘটনার জন্য চারিদিকের এই আনন্দের মধ্যেও আমাদের বাড়িটা যেন দেশের বাইরের একটা দ্বীপ!

জেঠুরা ফিরল রাত আড়াইটে নাগাদ। পরিচিত কারও বাড়িতে দাদাভাই নেই। গুন্ডাদাও নাকি নেই। কোথায় ওরা?

রাত আরও বাড়তে লাগল। জেঠিমা কাঁদছে। বিন্নিদিও কাঁদছে। আমার চোখে জল নেই। শুধু কেমন যেন জ্বালা করছে। রাস্তায় লোকজনের আনন্দ-উল্লাস কমে আসতে লাগল এবার। আমাদের পাড়া এবার ক্রমে ক্রমে ডুবে যেতে লাগল নিস্তব্ধতায়। বিন্নিদি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল কখন। কিন্তু আমরা, বাকিরা সবাই জেগে বসে রইলাম। কী হল দাদাভাইয়ের? কোথায় গেল ও? কখন ফিরবে?

আমাদের বাড়িটা অথৈ সাগর জলের মধ্যে ছোট্ট, ভঙ্গুর নৌকার মতো ভেসে রইল যেন। মনে হল চারিদিকে ঘন মেঘ। ধ্রুবতারা দেখা যাচ্ছে না!

তার পর এক সময় ভোর হল!

॥ মুসাফির, আবার ॥

লেকের রাস্তার পাশে কারা যেন ইট বিছিয়ে বিশাল বড় করে লিখে রেখেছে 'ক-পি-ল-দে-ব'। বাঁশ পুঁতে কারা যেন টাঙিয়ে দিয়েছে জাতীয় পতাকা। আজ রোদের রংটা বড্ড ভাল। আকাশ কী নীল! কৃষ্ণচূড়া গাছে ঝেঁপে এসেছে ফুল। বকুলে পথ সাদা। ছোট্ট রঙিন কাগজের মতো প্রজাপতি উড়ছে জংলা গাছের ফুল ঘিরে। দেখেই মন ভাল হয়ে যায়। প্রজাপতিরা ফুলের উঁচু-নিচু ভাগ করে না। আমরাও কি এমন হতে পারি না!

মুসাফির আবার হাঁটা শুরু করল। এত সমারোহ চারিদিকে যে, মুসাফিরের চোখে জল চলে আসছে আনন্দে! জীবন যে কত সুন্দর, তা আমরা দেখি না কেন?

লেকের মধ্যে মর্নিং ওয়াকাররা এসে জমছে এবার। আমাদের দেশ বিশ্বকাপ জিতেছে। এই জয় সবার মধ্যেই আনন্দ জাগিয়ে তুলেছে। সবার হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সেটা। আজ সবাই প্রজাপতি!

মুসাফির হাঁটতে লাগল। সকালবেলায় না হাঁটলে হয় না। লেকের হাওয়ায় শরীর আর মনের সব গ্লানি কেটে যায়। রোজ নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করে ওর।

লেকের এই দিকটা বিশেষ কেউ আসে না। একটু জঙ্গল মতো হয়ে আছে। বড় ঝোপ আর কচুপাতা ছড়িয়ে রয়েছে। তার পাশেই আবার একটা গন্ধরাজ গাছও রয়েছে। গাছটায় যে কী সুন্দর সাদা ফুল হয়! মুসাফির রোজ গাছটার কাছে যায়। না, ফুল তোলে না। মাটিতে পড়ে গেলে শুধু তুলে নেয়। মনে হয় গাছ ওর জন্য রেখে দিয়েছে!

আজও এগোল মুসাফির। এই আনন্দের দিনে আজও কি ওর জন্য ফুল রাখবে গাছ? কিন্তু ও কী? ওটা কে?

মুসাফির অবাক হল। এক জোড়া চটি পরা পা জঙ্গলের মধ্য থেকে একটু বেরিয়ে আছে। ভাল করে না দেখলে বোঝাও যাবে না। এখানে কে আবার শুয়ে আছে এইভাবে?

মুসাফির দ্রুত এগোল। কারও বিপদ হল না তো! সামনের ঝোপটা সরিয়ে মুসাফির উঁকি দিল। দেখল একটা ছেলে পড়ে আছে। আধখোলা চোখ। গলার কাছটা কাটা। তাতে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। সকালের হাওয়ায় ছেলেটার চুল উড়ছে!

মুসাফির থমকে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল! এ কী! এই ছেলেটাকে তো ও চেনে! এ যে ওদের ব্যাটম্যান!

দ্বিতীয় পর্ব

উনচল্লিশ বছর পর, ২০২২

॥ ১ ॥

বেলা

বাড়ির কাছেই লেক প্লেসে এই ঘরটা নিয়েছি আমি। আগে পার্ক সার্কাসের কাছে ছিল আমার স্টুডিয়ো। কিন্তু গত চার মাস হল এটা পেয়েছি। এক কামরার বড় একটা ঘর। পাশে লাগোয়া আর-একটা ছোট ঘর। সঙ্গে বাথরুম। যে-পাঁচটা মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে দু'জন এখানেই থেকে যায় রাতে।

ডায়োরামার কাজ এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে আমার। জাপানদাদু মারা যাওয়ার আগে গোটা কাজটাই আমাকে দিয়ে যায়। আমাদের দেশের মধ্যে মুম্বই আর বেঙ্গালুরু থেকে মূলত অর্ডার আসে। আর বাকি সব অর্ডার আসে বিদেশ থেকে।

বিদেশে আমার এজেন্ট আছে একজন। টম ক্যাশ। ও-ই প্রধানত

কাজ ধরে দেয়। আমাকেও টুকটাক যেতে হয়। সামনের মাসেই তো যেতে হবে। টম নাকি হলিউডের কিছু স্টুডিয়োর সঙ্গে কথা বলেছে। আমাদের কাজের স্যাম্পেল দেখিয়েছে। যদিও বেশির ভাগ সিনেমার কাজে সিজিআই ব্যবহার করা হয়, তাও এখনও অনেক স্টুডিয়ো আছে, যারা ডায়োরামা ব্যবহার করে শুটের জন্য। আমাদের দেশ থেকে কাজ করিয়ে নিয়ে গেলে ওদের খরচ অনেক কম পড়বে। কিন্তু কাজের কোয়ালিটি ভাল হওয়া চাই। দেখি, যদি কাজ পাওয়া যায়!

সামনে মিনু নামে মেয়েটা একটা ছোট শহরের ডায়োরামা বানাচ্ছে। উনিশশো বিরাশি সালের মুম্বই। মানে, তখনকার 'বম্বে' আর কী! সাউথের একটা ছবির জন্য লাগবে। ওরা যেমন চায়, তার ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই ভাবেই তৈরি করা হচ্ছে। ওদের লোকজন আসবে পরের সপ্তাহে, তার আগে কাজটা শেষ করতে হবে।

আজকাল আমার শরীর মাঝে মাঝে আর দেয় না। আগে যতটা দৌড়তে পারতাম, এখন আর ততটা পারি না। শরীর যেন চলে না। জীবনে টাকাপয়সা করেছি। তার দিকে আর মোহ নেই। জীবনে অনেক কিছুই পাল্টে গিয়েছে এখন! সেই যে পোকামাকড় নিয়ে আগ্রহ ছিল, সেটাই আর সেভাবে মনে আসে না। বয়স কি সব কেড়ে নেয়! নির্মোহ ও অনাগ্রহী করে তোলে! সবার ক্ষেত্রে হয়তো নয়! হয়তো আমার মতো গুটিকয়েকের ক্ষেত্রে।

মাঝে মাঝে ভাবি, সব বন্ধ করে দিলেই তো হয়! কিন্তু তার পর মনে হয় এই মেয়েগুলোর কী হবে? আমার তো আর সন্তান নেই, এরাই তো আমার মেয়ের মতো। আর, যদি সামনে কাজ বাড়ে, তা হলে আরও মেয়ে নিতে হবে! হ্যাঁ, মেয়েদের ছাড়া আমি পুরুষ কর্মী নিই না। আমার কোম্পানি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দ্বারা চালিত।

আমি উঠলাম। বিকেল পাঁচটা বাজে। এবার বাড়ি যাব। লেক মার্কেটের পেছনে পরাশর রোডে আমার ফ্ল্যাট। নাম দিয়েছি 'মৌচাক'। ওখানে আমার সঙ্গে ফুটি বলে একটা মেয়ে থাকে। বাড়ির সব কিছু ওই দেখাশোনা করে। এ ছাড়াও ঠিকে কাজের জন্য একটি মেয়েও আসে।

ফুটি মেয়েটা ভাল। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তার পর বর ওকে ছেড়ে চলে যায়। আর ফেরত আসেনি। আমি ওকে রেখেছি আমার কাছে। খুব চৌকস মেয়ে। সব পারে। এই যে আমি অফিসে আসি, ওই তো গাড়ি চালিয়ে দিয়ে যায় আমাকে। আবার পাঁচটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়।

আমি বলি, "এইটুকু পথ, আমি ঠিক হেঁটে চলে যাব। একটু হাঁটাহাটিও তো দরকার।"

ফুটি পাত্তা দেয় না আমায়। কড়া গলায় বলে, "হাঁটুর অবস্থা কি ভাল তোমার? বাইরে থেকে নিজেকে ধরে রেখেছ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি তোমার ক্ষয় হয়নি? ফিগার ভাল রাখলেই সব হয় নাকি? তা ছাড়া সকালে তো হেঁটে আলোদাদুর বাড়িতে যাও। সেখানে কি আমি না করি? একদম আমার মুখে মুখে তর্ক করবে না বলে দিলাম। যা বলছি চুপচাপ শুনবে।"

ফুটি আমার হয়ে কাজ করে, না আমি ওর হয়ে কাজ করি, কে জানে! তবে ভালবাসাটা বুঝি। মানুষ জীবনে যা কম পায়, তার গুরুত্ব সে বোঝে।

আলোজেঠুর বয়স এখন প্রায় নব্বই। নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আমি রোজ সকালে যাই দেখা করতে। মা মারা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, যেন আমি রোজ খবর নিই!

যে লোকটা আমার সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছে তার খবর নিতে কেমন লাগে আমার? রাগ হয় না? কষ্ট হয় না? হয় তো, খুব হয়। তাই তো এটাই দেখতে যাই যে, জানোয়ারটা কেমন কষ্ট পাচ্ছে! জানি খারাপ, কিন্তু তাও লোকটা যে পচে-গলে যাচ্ছে সেটা দেখে কেমন যেন তৃপ্তি হয় আমার।

সেই আশির দশকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোকটা এখন যেন ভূতের মতো হয়ে গিয়েছে। বাড়ির চার তলার চিলেকোঠার দুটো ঘরের একটায় পড়ে আছে। কেউ সেভাবে খেয়াল করে না। তিন তলায় তার বিশাল রাজ্যপাট এখন অন্যদের দখলে।

বছরখানেক আগে লোকটা চার তলার ছাদ থেকে লাফ মেরে সুইসাইড করতে গিয়েছিল। নীচে রাখা খড়ের গাদার ওপর পড়েছিল! তাই খুব আঘাত পেলেও মরেনি! ছ্যাঙাপোড়া হয়ে বেঁচে আছে। তবে আমি জানি যে, বাড়ির লোকজন চায় লোকটা মরে যাক। কারণ, কেউ এই লোকটাকে সহ্য করতে পারে না। আলোজেঠু যে ভয়ঙ্কর দুর্মুখ! সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সে সব কেন সহ্য করবে লোকে? এখন ওই বাড়িতে আলোজেঠুর ভাগনে আর নাতিদের রাজত্ব। তারা চায় বুড়ো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরুক। আমি নিজে শুনেছি টুবলুকে বলতে, "বুড়ো লাফিয়ে খড়ের আঁটির ওপরেই পড়ল! মাটিতে পড়তে পারল না! মরলে বাঁচতাম!"

টুবলু একজন বড় পুলিশ অফিসার! সে যখন এমন বলছে, মানে বোঝাই যায় লোকটা কী হারে সবাইকে জ্বালাচ্ছে!

আলোজেঠু এখন সারা দিন বসে থাকে চুপ করে। সকালে ফিজিওথেরাপি করাতে আসে। সেটার পরে সারা দিন একা। তার মাঝে বাড়ির কাউকে দেখলেই যা নয় তাই বলে গালাগালি করে। জিনিসপত্র ছুড়ে মারে। কেন যে সবার ওপর এত রাগ কে জানে!

আমি সকালে গিয়ে প্রথমে ওই বাড়ির সবার সঙ্গে একটু সময় কাটাই। তার পর বুড়োর ঘরে যাই!

লোকটার কাছে গেলেই আমার সারা শরীরের রক্ত রাগে, কষ্টে নীল হয়ে যায়! সেই সব সময়ের কথা মনে পড়ে যায় আমার। তার পর যখন দেখি, বড় জানলা দিয়ে আসা রোদের মধ্যে বসে রয়েছে লোকটা— মুখটা সামান্য বাঁকা, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, তখন বুঝি লোকটার মধ্যে আর কিছু নেই!

আমি কাছে যাই। পাশে বসি চুপ করি। শুনি, আলোজেঠু বিড়বিড় করছে। বলছে, "সব শুয়োরের বাচ্চা। সব হারামি। সব ক'টাকে লাথি মেরে বের করে দেব!"

আমি শুনি আর হাসি। ভাবি, সময় কী করে দেয় মানুষকে! না, তাই বলে কিন্তু দয়া হয় না আমার! বরং এক জান্তব আনন্দ হয়! মনে হয় বলি, 'কী করতে আমার সঙ্গে মনে নেই!' বলি না। শুধু তাকিয়ে হাসি।

আলোজেঠু আমার সেই হাসির মানে বোঝে। আমার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকায়। খসখসে নীচু গলায় বলে, "মর মাগি, মরতে পারিস না?"

আমার হাসি বেড়ে যায়! আমি আলোজেঠুকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসি। সারা ঘরে ঘুরি। মাঝে মাঝে রোদটা আড়াল করে দাঁড়াই।

রাগে আলোজেঠুর ফর্সা মুখ লাল হয়ে ওঠে। থরথর করে কাঁপে। মুখ থেকে সরু লালার সুতো পেন্ডুলামের মতো ঝোলে। আর লোকটা একই রকম খসখসে গলায় বলে, "সরে যা। সামনে থেকে সরে যা! সরে যা মাগি! মর, মরে যা তুই!"

আমি আরও উত্তেজিত করার জন্য শাড়ির আঁচলটা নামাই। সামনে ঝুঁকে পড়ি! তার পর হেসে তাকাই আলোজেঠুর দিকে।

বুড়োর মুখ দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ে। ঝুঁকে বসে। লালার সুতো আরও নীচে নেমে আসে। দোলে। বুড়ো অশক্ত হাত তুলে বলে, "বেশ্যা, একটা বেশ্যা তুই। রাক্ষসী... তুই রাক্ষসী! মর, মর!"

আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই। শাড়ি ঠিক করি। ছোট করে কাটা চুলে হাত বোলাই। তার পর ঝুঁকে পড়ে বলি, "কেন আর ধরব না তোমারটা?"

বুড়ো এক স্তূপ বাতিল কাপড়ের মতো ঝুপ করে হেলান দিয়ে বসে চেয়ারে।

আমি বলি, "বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। আরও যন্ত্রণা পেতে হবে!"

"দিদি, আমার কাজটা একটু দেখে দেবেন?" মিনুর কথায় আমার সংবিৎ ফিরল।

আমি তাকালাম। সামনে যে ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, তার ওপরে বিছিয়ে রাখা বেস বোর্ডের ওপর কাজটা করা হয়েছে। আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, দুটো বিজ্ঞাপনের বোর্ড ঠিকমতো করা হয়নি। একটা হেলথ ড্রিংক আর-একটা লাইটের কোম্পানির নামের বানান ভুল লেখা আছে। বিজ্ঞাপন বোর্ডের মাপ ওয়ান ইজ় টু ফরটি এইট স্কেলে বানানো

হয়েছে। বানানের একটু এদিক-ওদিক হলেই ধরা পড়ে যাবে।

এই ডায়োরামা জিনিসগুলো তৈরি করা সহজ নয়। নানান সময়ের গাড়ি-বাড়ি-শহর গ্রামের ডায়োরামার জন্য সেই সময়ের রং জোগাড় করতে হয়। সেই সময়ের মেটিরিয়াল জোগাড় করতে হয়। না হলে অথেন্টিক ফিলিংস আসে না। তার পর সেই মতো 'এজিং' করাতে হয়। মানে, যাতে বোঝা যায় যে, জিনিসটা পুরনো। এই কাজে শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞান এসে যোগ হয়। যারা এগুলো করায়, তারা যেমন অনেক টাকা দেয়, তেমন খুঁটিয়ে কাজও বুঝে নেয়।

আমি উঠে গিয়ে মিনুকে দেখিয়ে দিলাম ভুলগুলো। তার পর বললাম, "ওরা তো ছবি দিয়ে গিয়েছে। সেগুলো মিলিয়ে দেখ ভাল করে। আমি কাল সকালে অফিস এসে বাকিটা দেখে নেব। বুঝলি?"

মিনু মাথা নাড়ল।

আমার আলাদা চেম্বার নেই। এই ঘরেই সবার সঙ্গে বসি। আমার মনে হয়, তাতে সকলের কাজের ওপর নজর রাখতে সুবিধে হয়।

আমি টেবিল থেকে ব্যাগটা নিলাম। তার পর মোবাইল ফোনটা তুলে দেখলাম। নানান রকম মেসেজ এসেছে। আসুক। এসব ভাল লাগে না আমার।

"আসছি," বলে আমি অফিসের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

শীতকাল এখন। বিকেল পাঁচটায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তবে কলকাতার রাস্তায় এখন অনেক আলো। লেক প্লেসের চারিদিকেও আলোর বন্যা। কাছেই লেক। সেই দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ডিসেম্বরের এই সময়ে অনেক গাছেরই পাতা ঝরে যায়। এখানেও রাস্তার পাশে বেশ কিছু পাতা পড়ে রয়েছে। এখন রাস্তায় ঝাঁট পড়ে। ফলে পাতা বা ময়লা বেশিক্ষণ থাকে না।

ফুটি গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। লেক প্লেসের রাস্তার পাশেই ভগবানের চায়ের স্টল। সেখান থেকেই ফুটি এসে রোজ চা খায়। ভগবান সেই এপিক বইয়ের দোকানের মালিক বৃন্দাবনদার ভাগনে। এপিক বইয়ের দোকানটা অনেকদিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনদাও মারা গিয়েছে বহু দিন আগে।

মাঝে মাঝে ভাবি, সব লোকজন কেমন যেন মিলিয়ে গেল হাওয়ায়! এই সেই দক্ষিণ কলকাতা। এই সেই রাস্তা। এই লেক। বাড়িঘর। সবই রইল, তবু মানুষজন যেন কী করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এক এক করে! এই জীবনের দিকে তাকালে মনে হয় সবই এক, কিন্তু তাও কিছুই যেন এক নয়! যেন ঘড়ির সেই ঘণ্টার কাঁটার মতো। ছোট্ট সময়ের গণ্ডিতে তার সরণ বোঝা যায় না! কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মাপে কাঁটা তার অবস্থান আমূল বদলে ফেলে। সত্যি, জীবন এক আশ্চর্য গোলোকধাঁধা! এক অপরিমেয় রহস্য!

আমি গাড়ির পেছনের সিটে ব্যাগপত্র রেখে সামনের সিটে বসলাম। ফুটি গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আমি বললাম, "মুসাফিরদার দোকানে চল। যে-ইউনিফর্মগুলো তৈরি করতে দিয়েছিলাম, বলেছে হয়ে গিয়েছে। নিয়ে নিই।"

ফুটি বলল, "বেকার বেকার টাকার শ্রাদ্ধ করো। কী দরকার তোমার অফিসের মেয়েদের ইউনিফর্ম দেওয়ার? ক'টা তো মোটে মেয়ে!"

আমি হাসলাম, "বাইরের লোকে আসে ইনস্পেকশনে। কাজের ডিসিপ্লিন, আমার কোম্পানির ডিসিপ্লিন আছে, সেটা প্রোজেক্ট করা প্রয়োজন। তুই বকবক না করে চল তো।"

আশপাশের অনেক পুরনো বাড়িঘর ভেঙে নতুন নতুন সব ফ্ল্যাট উঠেছে। তার মধ্যেও লেক টেম্পল রোডের মুসাফিরদার দোকানটা আশ্চর্য ভাবে টিকে আছে! আর এই মধ্য সত্তরেও মুসাফিরদা কাজ করে চলেছে।

আজও দেখলাম, চোখে চশমা পরে মাথা নিচু করে মুসাফিরদা বোতামঘর সেলাই করছে।

আমি আর নামলাম না গাড়ি থেকে। ফুটি গিয়ে ইউনিফর্মগুলো নিয়ে এল। মুসাফিরদা আমাকে দেখে হাসল শুধু। তার পর ফুটির হাতে চারটে লজেন্স ধরিয়ে দিল।

ফুটি হাসল। বলল, "এবার তুমি রিটায়ার করো লজেন্সবুড়ো। অনেক কাজ করেছ।"

"কাজেই আমার মুক্তি রে পাগলি!" মুসাফিরদা নরম গলায় বলল।

"চোখ দুটো যাবে তোমার," ফুটি আবার বলল, "সারাক্ষণ খুটে খুটে সেলাই করে যাচ্ছে, হুঃ! একটা কথাও কেউ শোনে না আমার।"

ফুটি মেয়েটা খুব ভাল। সবার জন্য ওর চিন্তা। মুখে ফটফট করে, কিন্তু মনটা সোনার মতো। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার নিজের যদি এমন একটা মেয়ে থাকত!

বিয়ে হয়েছিল আমার। কিন্তু বরটা ছ'মাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট! বিয়ে ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই আমি একা হয়ে গিয়েছিলাম। তার পর আর বিয়ে করিনি। কাউকেই যে আর ইচ্ছে হয়নি বিয়ে করার!

সেই স্কুল লাইফে বুচা, ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পরে বলেছিল, "তোকে যেটা বলেছিলাম সেটা এখন খাব না। যে দিন তুই আমায় নিজের চেয়ে ভালবাসবি, সে দিন খাব।"

বুচাও আর বেঁচে নেই। কলেজে পড়ার সময়ই ও মারা যায়! এটাও অ্যাক্সিডেন্ট। আমার কাছে যে-ই আসতে চায়, সেই কি এ ভাবে অপঘাতে মরে? আলোজেঠু যে আমায় রাক্ষসী বলে, আমি কি সত্যি তাই?

লেকের দিক থেকে শিরশিরে হাওয়া দিল আচমকা আর আমার চোখটা জ্বালা করে উঠল হঠাৎ। চোখের কোণে জলও কি জমল একটু! শ্বাস ভারী হয়ে এল। আমার কষ্ট হল খুব। কিন্তু কার জন্য হল? যার জন্য হল, সে কি আজও আমায় দেখতে পায় না?

ফুটি আমার দিকে তাকাল। তার পর বলল, "জানলার কাচটা তুলে দাও। না হলে আবার ঠান্ডা লাগবে। আর চোখে জল কেন? তুমি কি বড় হবে না বেলামণি?"

আমি রুমাল দিয়ে জলটা মুছলাম। হাসলাম একটু। বললাম, "আর পাকামো করতে হবে না।"

ফুটিও হাসল। বলল, "চলো, তোমার মন ভাল করে দিই। তোমার প্রিয় ওষুধের দোকানে যাই। চলো।"

"আবার পাকামো?" আমি হাসলাম।

ফুটি কিছু না বলে গাড়ি চালাল। কাছেই কবীর রোডের পুরনো বাড়ির নীচে ছোট্ট এই ওষুধের দোকানটা। এখান থেকেই আমি আমার ওষুধ কিনি। কিন্তু শুধু ওষুধই কি কিনি?

দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে ফুটি বলল, "যাও কিনে আনো।"

আমি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বললাম, "তুই যা না! ও তো জানে কী ওষুধ নিই!"

"ইস," ফুটি মুখ বাঁকাল, "তার পর মনে মনে গালি দাও আমায়! তোমার জিনিস তুমি আনো। আমি কেন যাব?"

আমি হাসলাম। তার পর গাড়ি থেকে নেমে টাকার ব্যাগটা নিয়ে দোকানের দিকে গেলাম। বুকের মধ্যে আমার কেমন যেন চাপ চাপ লাগল। শ্বাস ঘন হয়ে এল। এই শীতেও কপালে ঘাম জমল একটু। মনে হল শরীরের মধ্যে হাজার হরিণ দৌড়ে যাচ্ছে কুয়াশার জঙ্গলে! কেন আমার হচ্ছে এমন? কেন এখনও এমন হয়?

আমি ছোট্ট দোকানটায় ঢুকলাম। কোনও খরিদ্দার নেই। কাউন্টারের ও পারে একজন বসে রয়েছে। তার মাথা নিচু। বই পড়ছে। আমি পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম কাউন্টারের কাছে।

মানুষটা হাতের বইটা রাখল এবার। তার পর ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সেই বাদামি চোখ। কপালের ওপর এসে পড়া চুলে রুপোলি ক্রেয়ন। কাঁচাপাকা গোঁফ। বুকের কাছে জামার বোতাম খোলা।

আমার মনে হল কে যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা দু'হাত দিয়ে ধরে পিষে দিচ্ছে! এখনও এমন কিশোরী কেন আমি?

আমি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। দেখলাম, ছোট্ট টুল থেকে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসছে জুলু।

॥ ২ ॥

জুলু

পন্টিং বলে আমি নাকি প্লাটিপাস! আমার মতো একাকী মানুষ নাকি

আর কেউ নেই কলকাতায়! ওর কথা শুনে আমার মজা লাগে খুব। এই সাহানগরের বাড়িটার নীচের তলায় আমি একা থাকি এখন। দোতলায় থাকে বিন্নিদি আর ওর ছেলে শৌর্য ও ছেলের বৌ রিয়া। পন্টিং ওদের ছেলে। আট বছর বয়স পন্টিংয়ের। কিন্তু এই বয়সেই বইয়ের পোকা একদম। এখনকার দিনে এমন খুব একটা দেখা যায় না। ছেলেটা কার্টুন দেখে না। মোবাইল নেয় না। সারাক্ষণ বই হাতে ঘোরে!

বিন্নিদি মাঝে মাঝে বলে, "এমন আশ্চর্য ছেলে কোথাও দেখেছিস জুলু? এই বয়সের ছেলে কী সব পড়ে সারাক্ষণ! এটা কোনও মেন্টাল প্রবলেম নয়তো?"

আমার হাসি পায়। বিন্নিদি এখনও একই রয়ে গিয়েছে। বলে এটা নাকি মেন্টাল প্রবলেম! আমার তো পন্টিংকেই একমাত্র সুস্থ বলে মনে হয় আশপাশের সবার চেয়ে। আমি তো দেখি চারিদিকে আজকাল সবাই সারাক্ষণ মোবাইল ফোনের মধ্যেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকে! পাশাপাশি বন্ধুরা বসে থাকে আড্ডায়, কিন্তু গল্প না করে সবাই যে যার মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। পাশের মানুষের চেয়ে দূরের মানুষের প্রতি তাদের যত আগ্রহ। কে কী বলল না বলল তাতেই তাদের বেশি মনোযোগ, গুরুত্ব! সেখানে পন্টিং সারাক্ষণ বই নিয়ে ঘোরে।

আজ সকালেও তো পন্টিং এসে বসেছিল আমার কাছে। আমি দোকানে যাব বলে তাড়াতাড়ি পাউরুটি সেঁকছিলাম। গতকাল রাতের একটু ঘুঘনি ছিল সেটা গরম করে পাউরুটি আর শশা খেয়ে নেব ভেবেছিলাম। আমি একা মানুষ। আমার ঝামেলা নেই। কাজের এক জন দিদি আসে সকালে। বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছে দেয়! বাকি কাজ মানে রান্না, জামাকাপড় ধোয়া আমি নিজেই করে নিই।

তেমনই টোস্টারে পাউরুটি দিয়ে সেঁকছিলাম। তখনই পন্টিং এসেছিল। হাতে একটা রঙিন বই। আমিই কিনে দিয়েছিলাম গত মাসে। সেটা নিয়ে এসে বসেছিল আমার পাশে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুই পাউরুটি খাবি?"

পন্টিং বলেছিল, "নাঃ, আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি খাও!" তার পর বলেছিল, "জানো দাদা, একটা কথা ভাবছি!"

"কী ভাবছিস?" তাকিয়েছিলাম আমি।

পন্টিং বলেছিল, "তুমি না একটা প্লাটিপাস!"

"আমি? প্লাটিপাস!" আমি হেসে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

পন্টিং বইটা রেখে ভাল করে ঘুরে বসেছিল। তার পর বলেছিল, "কাল রাতে মা বলছিল বাবাকে যে, ছোটমামাকে বিয়ে করতে বলো না! আরও বয়স বাড়লে কে দেখবে ওকে? তখন বাবা বলল, ছোটমামা বিয়ে করবে না। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে কেউ বিয়ে করে? তখন মা আবার বলল, কেন বিয়ে করার সময় হয় নাকি? এখন তো কত মানুষ করছে! আর কত দিন একা থাকবে? বাবা হেসে মাকে বলল, ছোটমামা লোনলি টাইপ। বলে লাভ নেই।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম পন্টিংয়ের দিকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুই না-ঘুমিয়ে মটকা মেরে শুয়ে এসব কথা শুনছিলিস?"

পন্টিং মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে বলেছিল, "আমি এমন করি তো! তা, তুমি লোনলি শুনেই মনে হল যে, তুমি প্লাটিপাস! ওরাও খুব লোনলি জানো তো? আর খুব লাজুক। সবার থেকে দূরে একা একা থাকে।"

"বাপ রে, তুই এত জানিস?" আমি হেসেছিলাম।

পন্টিং গম্ভীরভাবে বলেছিল, "তুমিও জানবে। পড়ো, ঠিক জানতে পারবে।"

"কই রে ছেলেটা?" আমাদের কথার মাঝে বিন্নিদি চলে এসেছিল। তার পর পন্টিংকে দেখে বলেছিল, "তুই এখানে? আর মা তোকে খুঁজছে! স্কুল যাবি না? চল, রেডি হয়ে নিবি!"

আমিও বলেছিলাম, "যা, রেডি হয়ে নে। আমিও খেয়ে বেরোব!"

পন্টিং আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আরে, স্কুলে কিছু পড়ায় না। আমি ক্লাস ফোরের অঙ্ক পারি, কিন্তু আমায় এখনও ক্লাস থ্রি-র অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে রাখে! ভাল লাগে, বলো! আমি ক্লোরোফিল নিয়ে জিজ্ঞেস করি, আমায় বলে এসব পরে পড়বে। আমি এদিকে ফোটোসিন্থেসিস শিখে গিয়েছি। স্কুলে গিয়ে কী হবে দাদা, আমি যে নিজেই ওর চেয়ে বেশি পড়ে ফেলেছি!"

আমি বললাম, "শোন, তাও স্কুলে যেতে হয়। ওটা ডিসিপ্লিন। ওতে সোশ্যাল স্কিল বাড়ে। আর পড়াশোনাও শেখা যায়!"

পন্টিং বলেছিল, "সোশ্যাল স্কিল বাড়িয়ে কী হবে? বড় বড় সায়েন্টিস্ট, পোয়েটস, রাইটার্স, পেন্টার্সরা ম্যাক্সিমাম সবাই সেল্ফ-টট আর তাদের সোশ্যাল স্কিল কিচ্ছু নেই! সে দিন পড়লাম একজন বলছিল, সোশ্যাল স্কিলস আর ফর পেটি, অ্যাভারেজ অ্যান্ড অপরচুনিস্ট পিপল! আমি কি ওরকম হব?"

এই ছেলেটা এই বয়সে কী সব পড়ছে! আমি হাঁ হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। বিন্নিদিও অবাক হয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

আমায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেছিল, "কী সব বলছে রে! আমি এত দিন ছাত্র পড়িয়েছি, এমন কাউকে কোনও দিন দেখিনি! ওর মাথাটা কিন্তু সাংঘাতিক! একদম যেন ছোটবেলার দাদাভাই, না রে!"

দাদাভাই, তুই কি অনন্ত নক্ষত্রের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিস এখন! শোকহীন, তাপহীন, দীর্ঘ এক নিস্পৃহতার মধ্যে কি ভেসে আছিস তুই? সেখান থেকে কি এই কলকাতা শহরটাকে দেখা যায়? দেখা যায় সাহানগর নামের এই রংচটা মধ্যবিত্ত পাড়াটাকে? তার এই বিস্কুট রঙের বাড়িটাকে? দাদাভাই, তুই কি দেখতে পাস আমায়? আজ, এই এত বছর পরেও তুই কি ক্ষমা করতে পেরেছিস আমাকে! ভুলতে পেরেছিস যে, আমিই তোর মৃত্যুর জন্য দায়ী! তোর শোক সামলাতে না-পারা জেঠিমার সুইসাইডের জন্য দায়ী! জেঠুর হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী! তুই কি জেনেছিস রবিনই ব্যাটম্যানকে শেষমেশ এগিয়ে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে!

আমি আজও চোখ বন্ধ করলে সেই ছাব্বিশে জুনের সকালটা দেখতে পাই যেন! না, পুরোটা নয়, কেমন যেন স্ন্যাপশটের মতো, আলাদা আলাদা করে দেখি কিছু দৃশ্য! মুসাফিরদা। পুলিশের কালো গাড়ি। দাদাভাইয়ের চাদর ঢাকা দেহ। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বড় জেঠিমা। পাড়ার মোড়ে ভিড়। আর... আর আমাদের বাড়ির সেই অ্যান্টেনার ওপর এসে বসে থাকা একাকী একটা দোয়েল।

আমার মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হয় খুব। মনে হয় মাথাটা বোমার মতো ফেটে পড়বে চারিদিকে। আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এক অনন্ত বিষাদ-কুয়াশায় আমি ডুবে থাকি সারাক্ষণ। আমার সে ভাবে আর পড়াশোনাও হয়নি। পাস কোর্সে বিএসসি পাশ করে আমার দৌড় থেমে গিয়েছিল। বাবা-মা আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে এক এক করে চলে গিয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। বাবার টাকায় ছোট্ট একটা ওষুধের দোকান দিয়েছি আমি। কেন দিয়েছি? বেঁচে থাকব বলে। বেঁচে থাকার এত লোভ আমার! দাদাভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমি নিজে বেঁচে থাকতে চাই। নিজেকে কেন মেরে ফেললাম না আমি? এত ভয় আমার? নাকি বেঁচে থাকার লোভ? কোথায় গেল সেই ওপালিনা! সেই মিঠুদি! কোথায় সেই শ্বেয়েতলানা! সবাই ভুলে গিয়েছে দাদাভাইকে! দু'-এক বছর পরে শ্বেয়েতলানা, বিদেশে থাকে এমন একটা মাঝবয়সি লোককে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল! গুন্ডাদার জেল হয়ে যাওয়ার পরে মিঠুদিরাও চলে গিয়েছিল পাড়া ছেড়ে! এখন কোথায় থাকে কে জানে! আর ওপালিনা? শুনেছি ওপালিনা এখন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এ থাকে।

গুন্ডাদা দাদাকে মেরেছিল? কেন মেরেছিল? সেই কথা গুন্ডাদা কিছুতেই বলেনি। শুধু বলেছিল, পাপের শাস্তি পেয়েছে সৌর। ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালের দিন গুন্ডাদা দাদাভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা কেটে ফেলে দিয়েছিল লেকের কোণে একটা ঝোপে। তার পর গুন্ডাদা পালিয়ে গিয়েছিল বর্ধমানে। সেখানকার একটা গ্রাম থেকে পুলিশ গুন্ডাদাকে ধরে নিয়ে আসে। বিচারে যাবজ্জীবন সাজাও হয়। কিন্তু তার পর আর জানি না কী হয়েছে ওর। আসলে আমাদের বাড়িটাই এমন তছনছ হয়ে গেল যে, কার আর খবর রাখব!

দুই জেঠু, জেঠিমা, বাবা, মা, ছোটকাকা সবাই একে একে চলে গিয়েছে! ভাগ্যিস বিন্নিদিরা এসে দোতলায় থাকতে শুরু করল, না হলে তো আমি একাই যখের মতো পড়ে থাকতাম এখানে!

এখন রাতে, আয়নার দিকে তাকালে নিজেকে কেমন যেন প্রেতের মতো লাগে আমার। মনে হয় মৃত এক অ্যালবাট্রস গলায় ঝুলিয়ে সেই পুরনো নাবিকের মতো জেগে আছি এক শ্মশানে! যেন এই নরক থেকে আমার উদ্ধার নেই। মুক্তি নেই। সারাক্ষণ আমার চামড়ায় তলায় যেন অজস্র পিন ফোটে! খালি মনে হয় কী করে এই জ্বালা থেকে আমি মুক্তি পাব! কেন আমি গুন্ডাদাকে ও সব বলতে গিয়েছিলাম! আমি কি জানতাম না গুন্ডাদা কেমন মানুষ? জানতাম না গুন্ডাদা আসলে একটা খুনি? নিজের দাদার হত্যাকারী কি আসলে আমি নই? এ কথা কাকে বলব আমি? কে আছে আমার? কেউ নেই। এই পৃথিবীতে প্রেতের কেউ থাকে না। দাদাভাইয়ের মৃত্যুর পর আমি নিজেই শাস্তি দিয়েছি নিজেকে। নিজেই বেঁচে থাকা থেকে সরে এসেছি চিরদিনের মতো।

প্লাটিপাস, আমি প্লাটিপাস! হাসি পেল আমার। সাইকেলটা নারুদার দোকানের পাশে দাঁড় করিয়ে একটা চিঁড়ের প্যাকেট কিনলাম। দুপুরের টিফিন আমার। কবীর রোডের কাছেই একটা মিষ্টির দোকান আছে। সেখান থেকে দই কিনে নিই একটু। তার পর চিঁড়ে দই দিয়েই খাওয়া সেরে নিই।

মাঝে মাঝে ফুটি আসে। বাড়িতে যা রান্না হয় সেটা দিয়ে যায়! আমি বারণ করি। শোনে না। জোর করে। খুব মুখরা মেয়ে। আমি পেরে উঠি না ওর সঙ্গে। তাই নিয়ে নিই যা দেয়।

জিজ্ঞেস করি, “তুই এ সব আনিস কেন?”

ফুটি বলে, “বেলামণিকে জিজ্ঞেস করো। সে-ই পাঠাতে বলে।”

আমি অবাক হই। সেই পুরনো দিনের মধ্যে মুসাফিরদা আর বেলা, এই দু’জন পরিচিতই আছে এখনও। কিন্তু তাই বলে বেলা এ সব মাঝে মাঝে পাঠায় কেন?

আমি জিজ্ঞেস করি, “ওই-বা পাঠায় কেন!”

ফুটি আমার দিকে বড় বড় চোখ তুলে তাকায়। তার পর মুখ বেঁকিয়ে বলে, “কারণ, বেলামণি একটা পাগলি আর তুমি একটা অন্ধ!”

বেলা যে পাগলি টাইপ ছিল, সেটা তো আমি জানি। কিন্তু আমি অন্ধ। কেন? মনে আছে বুচার খুব পছন্দ ছিল বেলাকে। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা হয়নি! বুচাও মারা গিয়েছিল সেই কলেজ-জীবনেই! মাঝে মাঝে ভাবি, আমার জীবনে এত মৃত্যু কেন! চারিদিকে সবাই মারা গেল কী করে! আর মারা গেল যদি, তা হলে আমিই-বা বেঁচে রইলাম কেন!

নারুদার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। রোজ দোকানে আসে না। ওর ছেলে আর নাতিরাই চালায় দোকান। তাও দোকানটা আজও নারুদার নামেই চলে।

নারুদার ছেলে বান্টি আমায় বলল, “জুলু, তোকে এক বয়স্ক মহিলা খুঁজতে এসেছিল। তুই কোথায় জানতে চাইছিল। মানে, তোদের বাড়িটা চেনে, কিন্তু সেখানে নাকি যাবে না। তোর অফিস কোথায় জানতে চাইল। আমি বললাম তোর দোকানের কথা! ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। বুঝলি?”

আমায় আবার কে খুঁজছে? কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। তার পর ভাবলাম যার দরকার সে আসবে। আমি ফালতু ভেবে কী করব!

আমি পাশে তাকালাম। এই সকালেই ক্যারামের বোর্ড পড়ে গিয়েছে। খেলা হচ্ছে। পাশে একটা নীল প্লাস্টিকের চেয়ার! আমি চমকে উঠলাম, মনে হল সেখানে যেন গুন্ডাদা বসে রয়েছে!

না, গুন্ডাদা বসে নেই! জানি। তাও ব্যাঙ্কোর ভূত দেখি নাকি আমি? আচ্ছা, গুন্ডাদা কি এখনও বেঁচে আছে, নাকি সে-ও মারা গিয়েছে! মারা না গেলে মাঝে মাঝে গুন্ডাদার ভূতকে কেন দেখি আমি?

সাইকেল চেপে দোকানে যেতে বেশি সময় লাগে না। কবীর রোডের পাড়াটা বেশ নির্জন। সম্ভ্রান্ত পাড়া আসলে। তার মধ্যে আমার দোকান যে বিশাল চলে তা নয়। তবে খারাপও চলে না। আমার নিজের হয়ে গিয়েও বেশ কিছু টাকা বাড়তি হয়। একটা অরফ্যানেজ আছে হরিদেবপুরে। সেখানে সামান্য কিছু দিই প্রতি মাসে।

আসলে ওষুধের দোকানের পাশাপাশি আমি রক্ত, মল-মূত্র পরীক্ষার নমুনাও সংগ্রহ করি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রেশার মেপে দিই। ইনজেকশন দিয়ে দিই। ফিজিওথেরাপির কাজও করি টুকটাক। কারও কারও জন্য তো এই কাজগুলো প্রায় নিয়মিত করতে হয়। সেই যে আলোজেঠু! তার বাড়িতেও তো রোজ আমায় সকাল সাড়ে ছ’টায় যেতে হয়। মাঝে মাঝে ইনজেকশন দিতে হয় আর পায়ে রোজ মালিশ করে দিতে হয়! লোকটা বছরখানেক আগে সুইসাইড করতে গিয়েছিল, তার পর থেকে খুবই অসুস্থ থাকে। আর বয়সটাও তো কম হয়নি! সারা দিন এ সব নানা কাজ করেই কেটে যায় আমার! তাও নিজেকে যতই ব্যস্ত রাখি না কেন, এত বছর পরেও দাদাভাইয়ের মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি। সেই শেষবারের মতো দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়াটা ভুলতে পারি না। একটা মেয়ের জন্য আমি এমন করেছিলাম! যৌন ঈর্ষা আমাকে রাক্ষস বানিয়ে দিয়েছিল!

দোকানের সামনে সাইকেল থেকে নামলাম। দেখলাম, বাচ্চা মেয়েটা আজও বসে আছে দোকানের ছায়ায়। রোজই বসে থাকে। আমি জানি ও সকালের রাস্তায় রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বেড়ায়। কেউ টাকা দিলে নেয়, না দিলেও চায় না। ভারী মায়াভরা মুখ মেয়েটার। শ্যামলা গায়ের রং। চাপা নাক। বড় বড় পাতার আড়ালে ছলছলে চোখ। নাম বুড়ি।

আমি বললাম, “খেয়েছিস?”

বুড়ি মাথা নাড়ল। বলল, “জল।”

আমি বললাম, “ওই সামনে বোসদার দোকানে চলে যা। মাখন-টোস্ট, ডিম আর দুধ খেয়ে নে। আমি বলে রেখেছি, তুই তো জানিস।”

বোসদার দোকান এখানে বেশ নামকরা। খুব ভিড় হয়। আমায় ভাল মতো চেনে।

“তুমি রোজ খাওয়াবে কেন?” বুড়ি জিজ্ঞেস করল, “আমার লজ্জা লাগে।”

“তুই না খেলে যে আমার মন খারাপ লাগে। কোনটা বেশি ইমপর্ট্যান্ট? লজ্জা না মন খারাপ?”

বুড়ি ঢোক গিলে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, “যা, খেয়ে নে। বাবার জন্য কিছু নিয়ে যেতে চাইলে নিয়ে যাস!”

বুড়ি বলল, “আমি যে তোমার জন্য কিছু করতে পারি না!”

আমি হাসলাম, “করবি তো। আমি যখন আরও বুড়ো হয়ে যাব, আমার দেখাশোনা করবি। কী রে, করবি না?”

বুড়ি হাসল। ভারী সুন্দর হাসি! শীতের সকালের রোদ্দুরের মতো!

আমি বললাম, “যা, খেয়ে নে!”

বুড়ি বোসদার দোকানের দিকে দৌড়ে গেল। আমিও এ বার দোকান খুললাম।

দোকান পরিষ্কার করে ওষুধের খাতাটা টেনে নিলাম আমি। বারোটা নাগাদ সাপ্লায়ারদের লোকজন আসবে। ওদের বলে দিতে হবে, কোন কোন ওষুধ ক’টা করে দিতে হবে।

দোকানের সামনে শব্দ করে গাড়ি থামল একটা। না, এটা বেলার গাড়ি নয়। ওই গাড়ির শব্দ আমি চিনি। আমি মুখ তুলে তাকালাম। গাড়িটা বেশ বড়। কালো কাচে ঢাকা। আমার দোকানের সামনে দাঁড়াল কেন?

গাড়ি থেকে একজন বৃদ্ধা নামলেন। সামান্য মোটা। সাদা হয়ে যাওয়া চুল। চেহারায় সম্ভ্রান্ত ছাপ। চোখে সানগ্লাস!

আমি খাতাটা সরিয়ে রাখলাম। দেখি, কী ওষুধ নিতে এসেছেন!

ভদ্রমহিলা দোকানে এসে ঢুকলেন। সারা দোকানে হাল্কা, কিন্তু ভারী সুন্দর এক গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বলুন ম্যাডাম।”

ভদ্রমহিলা চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে তাকালেন আমার দিকে। তার পর সময় নিয়ে বললেন, “সে কী রে জুলু, আমায় কবে থেকে তুই ম্যাডাম বলিস!”

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কে ইনি! চিনতে পারছি না তো! আমায় চেনেন?

উনি হাসলেন। বললেন, “তোর বয়স বাড়লেও বেশ চেনা যায়! কিন্তু আমায় আর চেনা যায় না, না রে?”

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমি, মিঠু!"

"মিঠুদি!" আমার গলা কেঁপে গেল সামান্য। আমি কী বলব বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মিঠুদি বলল, "তোকে একটা কথা বলতে এলাম জুলু। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর এই অঞ্চলে এলাম আমি। পাড়ার নারুদার দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তোকে কোথায় পাওয়া যাবে। আমার ফ্লাইট আছে বিকেলে। একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম। আজ যাওয়ার আগে ভাবলাম তোকে একটা কথা বলে যাই।"

"আমায়! কী কথা?"

মিঠুদি বলল, "জানিস জুলু, কথাটা তোকে জানানোর ছিল। কিন্তু কলকাতায় তো আসা হয় না। তাই জানাতে পারিনি। এবার ভাবলাম জানিয়ে যাই। কবে না কবে ফট করে মারা যাব! তার আগে জানাতে হবে তোকে। কারণ, সৌর তোকেই তো সবচেয়ে ভালবাসত!"

শেষের কথাটা ছুরির মতো এসে বিঁধে গেল আমার শরীরে! আমার পা দুটো কেমন যেন দুর্বল লাগল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে টুলে বসে পড়লাম।

মিঠুদি বলল, "আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাই ছোট করে বলছি। আমার দাদা, মানে গুন্ডাদা কিন্তু সৌরকে মারেনি। ওকে পুলিশ ধরেছে। ও খুনের দায় মাথায় নিয়েছে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আমার কাছে যায়। সেখানেই ছিল। কয়েক মাস আগে মারা যাওয়ার সময় আমায় বলে গিয়েছিল যে, ও খুনটা করেনি। দায়টা নিয়েছিল একটা কারণে। তোর জন্য এই দেখ, একটা চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছে।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, মিঠুদির হাতে একটা খাম!

মিঠুদি বলল, "আমি গুন্ডাদার সঙ্গে কথা বলতাম না। আমাকে সৌর না-ই ভালবাসতে পারে। তাই বলে ওকে মেরে দিতে হবে? সেই কারণে আমি গুন্ডাদার থেকে সরে গিয়েছিলাম পুরো। সেটা দাদা নিতে পারেনি। তাই কাউকে বলবে না পণ করেও আমাকে বলে গিয়েছিল শেষমেশ। বলে গিয়েছিল ও খুনটা করেনি।"

আমার মাথা ঘুরছে। শীতের মধ্যেও ঘাম হচ্ছে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে! গুন্ডাদা খুন করেনি? মানে, আমি যা বলেছি তার ফলে দাদাভাই মারা যায়নি? মানে সারা জীবন আমি তাহলে কিসের মধ্যে বাঁচলাম! আমার চোখের দৃষ্টি কি ঝাপসা হয়ে আসছে! আমি কি কাঁদছি!

মিঠুদি এগিয়ে এসে কাউন্টারের ও-পার থেকে আলতো করে ধরল আমার হাত। তার পর নরম গলায় বলল, "কাঁদিস না। সত্যি বলছি গুন্ডাদা খুনটা করেনি। সৌরকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পর ও লেকের কাছ থেকে চলে এসেছিল। সেখানে অন্য কয়েকজন সৌরকে ধরে। আর..." মিঠুদি চুপ করে গেল।

"কে মেরেছে দাদাভাইকে?" আমি বুজে আসা গলায় কোনও মতে জিজ্ঞেস করলাম।

মিঠুদি সময় নিল সামান্য, তার পর বলল, "জানতে চাস সত্যি? চিঠিতে লেখা আছে।"

আমি বললাম, "তুমি আমায় বলো, প্লিজ়। চিঠি পরে দেখব। আগে নামটা বলো!"

মিঠুদি দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। তার পর ধীরে ধীরে বলল নামটা।

॥ ৩ ॥
বেলা

রামবচনদাদু একশো বছর বয়সে মারা গেল। একশো! ভাবলেই কেমন যেন লাগছে আমার! জীবনে প্রথম কোনও মানুষকে দেখলাম, যার বয়স একশো! আমার বাড়ির কাছেই রামবচনদাদুর ভাঙ্গারের দোকান। দোকানের পেছনেই ছোট একটা ঘরে নাতির সঙ্গে থাকত মানুষটা। একদম থুড়থুড়ে হয়ে গিয়েছিল। শীতের যেটুকু রোদ কলকাতার ফুটপাথ পায়, তার মধ্যে সোয়েটার আর মাফলারের পুঁটুলি হয়ে বসে থাকত। শেষের দিকে চোখে দেখতে পেত না। আমি গেলে হাত বাড়িয়ে আমার মুখটা ধরত। ফোকলা মুখে হাসত। বলত, "কী নিবি নিয়ে যা!"

এই সব মানুষ আমার সাধারণ ধুলোকণার মতো জীবনে আশীর্বাদের মতো! আমার মা-বাবা ছোট থেকেই নেই। মাসিকেই মা বলে ডেকেছি। কিন্তু সেখানেও নানান খামতি ছিল। যে বাড়িতে বড় হয়েছি, ঝি-চাকরের মাঝেই বড় হয়েছি। সেখানে, মুসাফিরদা, বৃন্দাবনদা, রামবচনদাদু, মনোহরদারা ছিল আমার সত্যিকারের আপনার লোক।

খবর পেয়ে আমি এসেছি রামবচনদাদুর বাড়ির সামনে। ফুটপাথের ওপরে যেখানে রোদে বসে থাকত দাদু সেখানেই একটা খাটে শুইয়ে রাখা হয়েছে মানুষটাকে। ছোট্ট হয়ে গিয়েছে একদম। গায়ে সোয়েটার আর চাদর দেওয়া। নাকে তুলো, চোখে তুলসী পাতা। শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে! একশো বছর বাঁচা খুব সহজ কাজ নয়। আমার এই পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের জীবনেই কতবার মনে হয়েছে, পারছি না আর! মনে হয়েছে মরে গেলে ভাল হয়। কত লোকে অবাঞ্ছিত ভাবে অপমান করেছে, সুযোগ নিয়েছে। মন ভেঙে দিয়েছে। সেখানে একশো বছর! একটা শতাব্দী!

ফুটিকে বলেছিলাম ফুল-মালা কিনে আনতে। লেক মার্কেটে ফুলের অনেক দোকান আছে। সেখান থেকেই ফুটি কিনে এনেছে। একটা মালা, আর একটা রিদ।

আমি বললাম, "দিয়ে দে মালাটা।"

ফুটি বলল, "সব গলাকাটা দাম চাইছে, জানো! একটা মালা নাকি দুশো টাকা! টাকা গাছে ফলে তো! পাড়ো আর খরচ করো!"

ওঃ! মেয়েটা কিছু মুখরা হয়েছে বটে! আমি কড়া চোখে তাকালাম ওর দিকে। ফুটি বুঝল। হাসল সামান্য। আমায় ম্যানেজ করার চেষ্টা আর কী!

দেখলাম, মুসাফিরদাও এসেছে। শান্ত মুখে তাকিয়ে আছে। আমি পায়ে পায়ে মুসাফিরদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মুসাফিরদা বলল, "সকালে লেক থেকে ফেরার সময় ব্রিজবাসীদের থেকে দুধ নিয়ে আমি রামুকাকার সঙ্গে কথা বলে যেতাম। একা হয়ে গিয়েছিলেন তো। খুব খুশি হতেন। যা ঠান্ডা পড়েছে, তাতে সুস্থ মানুষই ঠিক থাকছে না তো এমন বৃদ্ধ মানুষ!"

"ঠিকই তো। এবার বেশ ঠান্ডা পড়েছে!" আমি বললাম।

মুসাফিরদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাও কলকাতার এই শীতকালের সকালগুলোর একটা নিজস্ব মজা আছে! আমার তো বেশ সুন্দর লাগে! এমন একটা সকালে উনি মারা গেলেন! জানি, এমন দিনে হয়তো এসব বলা ঠিক নয়, তবু রোজ সকালে বেরোই তো হাঁটতে। ভাল লাগে বুঝলি! তাই বললাম।"

কথাটা ঠিক। এবার কলকাতায় ঠান্ডা পড়েছে খুব। তবু তার মধ্যেও এর একটা আলাদা মজা আছে। সকালে চারিদিকে কেমন যেন ঘোলাটে একটা আস্তরণ পড়ে থাকে। পরাশর রোডে যে লম্বা অশোক গাছগুলো আছে, তার মাথায় মাথায় কুয়াশা এসে থেমে থাকে। আলস্য ছেড়ে রোদ উঠতে দেরি করে বেশ। পুরনো বাড়ির কার্নিসে বসে থাকে জবুথবু পায়রা। আপাদমস্তক শীত-পোশাকে মুড়ে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দেয় কাগজওয়ালা। পুরোহিতরা এত সকালেই স্নান সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুজোর কাজে। ঠিকে ঝি-রা ট্রেন থেকে নেমে চলে আসে বাড়িতে বাড়িতে। কাছেই লেক মার্কেটের বড় সবজি আর মাছের বাজার। লোকজন ক্রমে বাড়তে থাকে সেখানে। যে ভাবে ফুল ফোটে, সেভাবেই একটা দিন ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।

"আমি একটু আসছি," মুসাফিরদা সামনে রামবচনদাদুর নাতির দিকে এগিয়ে গেল।

"ও তুইও আছিস! তাই আজ সকালে আসিসনি বাড়িতে!" পেছন থেকে মনোহরদার গলা পেলাম।

আমি ঘুরে তাকালাম। মনোহরদাও এসেছে। রামবচনদাদুকে চিনত মনোহরদা।

মনোহরদার বয়স হয়ে গিয়েছে। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা।

মাথায় পাকা চুল। রোগা হয়ে গিয়েছে অনেক। দেখেই বোঝা যায় যে, শরীরে সেই আগের জোর নেই। তবু ওই বাড়িতে রয়ে গিয়েছে এখনও!

আমি হাসলাম।

মনোহরদা বলল, "আরে, অনেক আগেই খবর পেয়েছি। আমি চলেই আসতাম। কিন্তু বাড়িতে সকাল সকাল এমন ঝামেলা হল যে, বলার নয়! তাই দেরি হয়ে গেল।"

"ঝামেলা!" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আলোজেঠু নিশ্চয়ই কিছু করেছে। লোকটা তো সারাক্ষণ ঝামেলা পাকানোর তালে আছে! আমি বুঝি না এই সব মানুষকে! এত বয়স হল এদের, কিন্তু এখনও গুরুত্ব পাওয়ার লোভ, ঝামেলা করে মনোযোগ নেওয়ার চেষ্টা কমল না একটুও। বয়স হলে নাকি জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলো থেকে মানুষের মন আলগা হয়ে যায়! কিন্তু কই, আমার আশপাশে তো এ সব দেখি না কিছু। সেখানে তো লোভী, স্বার্থপর সব মানুষের মিছিল!

মনোহরদা বলল, "আরে, আজ আলোসাহেব খুব চিৎকার করেছে। রাগারাগি করেছে। এমনকি, জুতো ছুড়ে মেরেছে টুবলুর বৌকে। সারা বাড়িতে সবাইকে তটস্থ করে রেখেছে লোকটা! এই বয়সে কেউ এমন করে! হাই প্রেশারের মানুষ! কিছু যদি হয়ে যায়! সবাই বলছিল লোকটা সেই যে সুইসাইডের চেষ্টা করেছিল সেটা সফল হলেই নাকি ভাল হত!"

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব আর!

মনোহরদা বলল, "আজ সকালে জুলুও আসেনি। সেটাও একটা রাগের কারণ। এই বয়সে কেউ যে এমন অসভ্য কথা নিজের ভাগনে-বৌকে বলতে পারে আমি ভাবতে পারি না! টুবলু পুলিশের বড় অফিসার। বুড়োকে কিছু বলতেও পারে না। আজ শেষমেশ রাগে এক ধাক্কা মেরেছিল! কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! বাইরের লোকে তো আর বোঝে না। ভাবে বয়স্ক লোকজন নিরীহ হয়। আমি দেখেছি জানিস, ফ্যামিলিতে ম্যাক্সিমাম গোলমাল বয়স্ক মানুষরাই করে। সব ব্যাপারে তাদের মত দেওয়া চাই আর বাড়াবাড়ি করা চাই। গোটা বাড়িতে খুব থমথমে পরিবেশ! তাই আসতে দেরি হয়ে গেল আমার!"

আমি চুপ করে রইলাম। মনোহরদা খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। আসলে আজ ওই বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আমার হাঁটুর ব্যথাটা একটু বেড়েছে। তার ওপর এমন ঠান্ডা পড়েছে যে, সকালে লেপ ছেড়ে উঠতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যা শুনলাম তাতে কাল এক বার যেতে হবে আমাকে। ওদের বাড়ির এখনকার জেনারেশনের ছেলেমেয়েগুলো খুবই ভাল। আমি তো ছোট থেকে দেখেছি ওদের। আমার সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক। আলোজেঠু যা করেছে, তাতে আমার গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসা দরকার।

মনোহরদা বলল, "খারাপ কথা বলছি একটা। কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি কী সেটাই বোঝে না। সারাক্ষণ তারা অশান্তি আর ঝগড়া করতে পারলেই বেঁচে যায়! তার সঙ্গে নোংরামি তো আছেই। নিজের পজ়িশনের সুযোগ নিয়ে নোংরামো করে। জানি না কেন এমন হয়, কিন্তু থাকে কেউ কেউ এমন। এই লোকগুলোর কি বেঁচে থাকার খুব দরকার আছে?"

আমি তাকালাম মনোহরদার দিকে।

মনোহরদা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর বলল, "আমি তোর ব্যাপারটাও জানি।"

কী! আমার ব্যাপার! কে বলল মনোহরদাকে!

মনোহরদা আমার মাথায় আলতো করে হাত দিল। বলল, "অনেক কষ্ট পেয়েছিস। আমি জানি রে মা।"

বিহ্বল ভাবটা কাটাতে আমার সময় লাগল! কে বলেছে মনোহরদাকে? কত দিন হল জানে মনোহরদা?

আমি তাকিয়ে রইলাম মানুষটার দিকে। চোখে জল এল আচমকা! কিন্তু কিছু বলার আগেই রামবচনদাদুর নাতি রমেশ এসে দাঁড়াল সামনে। ওদের নিজের লোকজন এর মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে বেশ।

রমেশ বলল, "দিদি, আমরা তা হলে এগোই! দাহ কাজ সারতে হবে তো!"

আমি মাথা নাড়লাম। দেখলাম, ইতিমধ্যে খাটের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে চার জন সেই খাটটাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। চাপা গুঞ্জনে শবযাত্রার ধ্বনি দিচ্ছে। ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশান খুব কিছু দূরে নয়। ওরা হেঁটেই যাবে।

শবযাত্রার দিকে তাকিয়ে আমি হাত জড়ো করে নমস্কার করলাম। রামবচনদাদু চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো! আচমকা আমার চোখটা জ্বালা করে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে দু'-এক ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল।

মুসাফিরদা তাকাল আমার দিকে। তার পর এগিয়ে এসে আলতো করে আমার মাথায় হাত রেখে বলল, "কাঁদ। এটাই স্বাভাবিক!"

হ্যাঁ ঠিক। এটাই স্বাভাবিক। কেউ যখন চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যায়, তার জন্য কি চোখে একটুও জল আসবে না! আমরা জানি জীবনে বিচ্ছেদটাই একমাত্র সত্য। তাও, সত্য হলেই কি তাকে নিস্পৃহ ভাবে মেনে নিতে হবে? আমরা যে ছেড়ে যাওয়া মানুষটিকে ভালবাসতাম। তার চলে যাওয়ার পরে আমাদের জীবনের একটা অংশ যে ফাঁকা হয়ে গেল, সেটা কি জানাব না! জানাব তো! এই চোখের জলে, শব্দহীনভাবে সেটাই তো জানালাম!

গুটিকয় মানুষের মিছিলটা শবদেহ নিয়ে ওই চলে গেল সামনের রাস্তার বাঁক ঘুরে। আমি পেছন ফিরে ভাঙ্গারের দোকানটাকে দেখলাম। দোকানটা বন্ধ। তার পাশে কাঠের নড়বড়ে চেয়ারটা শূন্য! আর কোনও দিন সেই মানুষটা এখানে বসবে না! আমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসার একটা মানুষ কমে গেল পৃথিবী থেকে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। অফিস আছে। বাড়ি গিয়ে স্নান পুজো সেরে বেরোতে হবে। আমি মুসাফিরদা আর মনোহরদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।

রাস্তাটা এখানে সামান্য বাঁক নিয়েছে। আর ওই বাঁকের মুখেই আমি মেয়েটাকে দেখলাম। প্রায়ই দেখি এই অঞ্চলে। বাচ্চা মেয়ে। ফ্রকের ওপর গায়ে একটা ময়লা সোয়েটার। চটর-পটর বাজিয়ে গান করে। আমি জানি, ও সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মুখে ফুটপাথে থাকে। ওর বাবা অন্ধ। মা-ও সেভাবে কিছু করে না! মেয়েটার নাম বুড়ি! খুব মিষ্টি গলা!

আমি শুনলাম, বুড়ি হাতের চটর-পটর বাজিয়ে গাইছে, "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা হাহা হা। / আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা হাহা হা।"

কোথায় এমন গান শিখেছে মেয়েটা! কী আছে ওর গানের সুরে! আচমকা আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ঘূর্ণি তৈরি হল! মনে হল এক গাছ টগর ফুল যেন ঝরে পড়ল শূন্য উঠোনে! আমার চোখ আবার জ্বালা করে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, বুড়ি নিজের মনে গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে সকালের নির্জন রাস্তা দিয়ে।

ফুটি আলতো করে হাতটা ধরল আমার। বলল, "চোখটা মোছো বেলামণি। চলো এবার।"

আমার ফ্ল্যাটটা বেশ ছিমছাম। এমনিতেই এই রাস্তাটা নির্জন। তার ওপর ফ্ল্যাটের মেন গেট দিয়ে ঢুকলে সবটা আরও কেমন যেন নির্জন লাগে।

ফ্ল্যাটের নীচে কেয়ারটেকার ছেলেটা বসে রয়েছে। ছেলেটার নাম তাপস। মোটাসোটা মানুষ। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগে রয়েছে। আমায় দেখে তাপস উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, "কিছু বলবে?"

"দিদি, নীচের গেস্ট রুমে একজন এসে বসে আছে। আপনার নাকি পরিচিত। আসলে আপনি নেই, তাই ওপরে যেতে দিইনি আর কী!" তাপসের কথায় একটা বাঙাল টান।

আমি একটু অবাক হলাম। সকাল ন'টা বাজে। এখন কে এল আবার! আমার কাছে তো সেভাবে কেউ আসে না। আমার কেউ নেই-ই যে আসবে!

ফুটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কথা বলে এসো। আমি ওপরে যাই। রান্না চাপাই গিয়ে!"

আমি বললাম, "আমি জাস্ট দুটো টোস্ট আর সুপ খাব। আর কিছু করিস না আমার জন্য।"

"ঠিক আছে। তুমি কথা সেরে এসো," ফুটি আর না দাঁড়িয়ে লিফটে
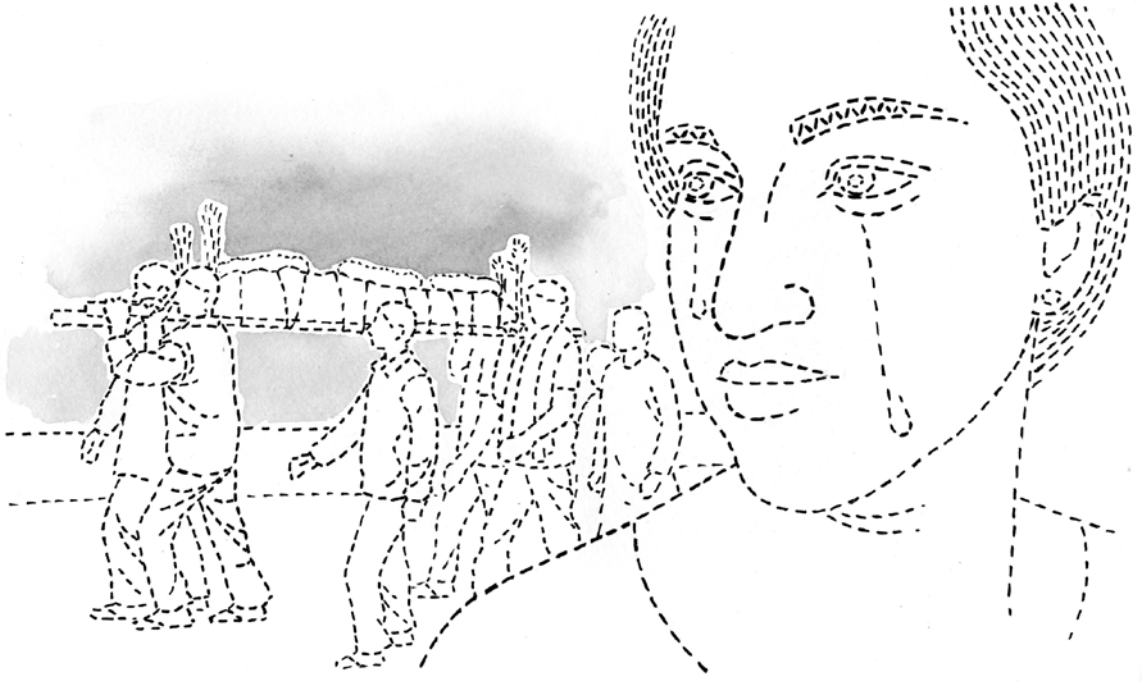
করে উঠে গেল ওপরে। আমি এগোলাম গেস্ট রুমের দিকে।

গেস্ট রুমটা আসলে একটা বড় ঘর। এখানে ফ্ল্যাটের লোকজনদের টুকটাক অনুষ্ঠান হয়। অন্য সময় কেউ এলে এখানে বসেই অনেকে কথা সেরে নেয়।

আমি কাচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। এক জন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। ঘাড় অবধি কাটা চুল। তাতে কেমন যেন লাল রং করা। দেখে, বয়স আমার মতোই মনে হল। আমাকে দেখেই উনি উঠে এলেন। আর কাছে আসতেই আমি চমকে উঠলাম! আরে এ কে! সেই আলতো টোল পরা থুতনি! ভুরুতে তিল! বাদামি চোখ! এ যে ওপালিনা! ওপা! এত বছর পর! ঠিক কত বছর পর?

ওপা আমার অবাক মুখ দেখে হাসল। না, সেই ঝলমলে আলো করে দেওয়া হাসি নয়। এ হাসি ম্লান। ক্লান্ত। কী হয়েছে ওপার? এত দিন পরে হঠাৎ আমার কাছে এল কেন?

ওপা এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তার পর বলল, "চিনতে পেরেছিস তা হলে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

ওপা আমার দিকে তাকাল ভাল করে। বলল, "সেই যে চুল ছোট করে কাটলি, তার পর আর বড়ই হতে দিলি না! আমার মনে আছে। তোকে এখন কী ভাল দেখতে লাগছে রে বেলা! নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস। সফল হয়েছিস দেখেই বোঝা যায়।"

আমার যে খুব ভাল লাগল, তা কিন্তু নয়। বরং ভেতরে ভেতরে বেশ একটু বিরক্তই হলাম আমি। এই মেয়েটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না। জুলুকে এই মেয়েটাই আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখত বলে আমার বিশ্বাস! হ্যাঁ, এত বছর হয়ে গেলেও আমার জুলুর প্রতি টান একটুও কমেনি। এমনি এমনি কি আমি ওর দোকানে ওষুধ কিনতে যাই? এমনি এমনি কি রোজগারের প্রথম টাকায় কেনা সেই লাল গেঞ্জিটা আমি আজও রেখে দিয়েছি যত্ন করে!

ওপাকে দেখে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার সব কথাই যেন হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল। সেই লুনাদিদি! সৌরদার খুন! গুন্ডাদার জেল! সব, সব মনে পড়ে গেল!

গুন্ডাদার সেই ব্যাপারটার পরে মিঠুদি আর ওপারা ওই পাড়া ছেড়ে শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল! আমি ভেবেছিলাম যাক আপদ গেল!

কিন্তু সৌরদার মৃত্যুর পরে জুলুটা কেমন যেন পালটে গিয়েছে। যেন আচমকা ওর জীবন থেমে গিয়েছে। যেন কোনও বিষয়েই ওর আর কোনও ইচ্ছে বা আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। সেই থেকে আজ অবধি জুলু একই রকম আছে। অসাড়, অনাগ্রহী আর হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষ। বা ঠিক মানুষও নয়, মানুষের ছায়া মাত্র!

"তুই?" আমি গলার বিরক্তিটা লুকোলাম না!

ওপা সময় নিল। তার পর বলল, "কেমন আছিস?"

"এই চলছে," আমি কাঠ কাঠ ভাবে জবাব দিলাম। বললাম, "তোর কী দরকার যদি বলিস!"

ওপা ঠোঁট চাটল এক বার। ভাবল একটু। বুঝলাম, ও নিজেকে প্রস্তুত করছে। তার পর বলল, "আমরা এদিকে এসেছিলাম। মিঠুদিও এসেছিল। একটা নেমন্তন্ন ছিল। গতকাল মিঠুদি চলে গিয়েছে। আজ আমি যাব। বিকেলে। তার আগে একটা কথা তোকে বলে যেতে চাই। মিঠুদি আমায় বলেছে। জুলুকেও বলেছে। আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে তুইও কোথাও যুক্ত ছিলিস বেলা। তাই তোকেও আমি ব্যাপারটা জানাতে চাই।"

আমি রাগের গলায় বললাম, "আমি শুনে কী করব? আমি কে?"

"তোর আমার ওপর রাগ আছে আমি জানি। আর সেটাই স্বাভাবিক! আমি জানতাম তুই জুলুকে ভালবাসিস। কিন্তু সেই বয়সের উন্মাদনায় আমার মনে হত আমিই রানি! আমার জন্যই সবাইকে পাগল হতে হবে। তাই জুলুকে ভাল না বাসলেও ওকেও অদৃশ্যভাবে টেনে রাখতাম আমি। তবে আমার সত্যিকারের ভাল লাগত অন্য এক জনকে!"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "দাঁড়া দাঁড়া। আমায় এই সব বলছিস কেন? আমি জেনে কী করব?"

ওপা বলল, "আমি এবার কলকাতায় নেমন্তন্নে এসে মিঠুদির কাছ থেকে কিছু কথা জেনেছি। জানিস, আমি আর কোনও দিন কলকাতায় আসব না। আর কোনও দিন তোর সঙ্গে দেখাও হবে না আমার। তাই আমি চাই তোকে সবটা জানিয়ে যেতে। কেন চাই জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় সৌরদার মৃত্যুর পিছনে আমারও ভূমিকা আছে! তা ছাড়া মনে হয় জুলুর এমন একটা জীবনের পিছনেও আমার অন্যায় ভূমিকা আছে!"

"কী সব বলছিস তুই!" আমি অবাক হলাম।

ওপা বলল, “আমার যে সৌরদাকে ভাল লাগত! আমি কী করব! আমাদের ভাললাগাগুলোকে কি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি? পারলে কি পৃথিবীতে এত অশান্তি হত?”

আমি কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওপা আমার হাত দুটো ধরল। তার পর বলল, “তাই তোকে বলতে চাই। জানিস বেলা, গুন্ডাদা সৌরদাকে মারেনি!”

“কী!” আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওপার দিকে, “তা হলে কে মেরেছিল?”

ওপা বলল, “সেটা বলতেই এসেছি তোর কাছে। তবে তার আগে একটা কথা বল আমায়!”

“কী কথা?” আমি তাকালাম ওপার দিকে।

ওপা বলল, “জীবনের কি সবটাই শেষ হয়ে গিয়েছে বেলা? হয়তো তোদের এখন বিকেলবেলার রোদ। তাও সেই রোদেও কি তুই জুলুর পাশে গিয়ে বসতে পারিস না?”

॥ ৪ ॥

জুলু

আমার এ গল্প আজ শেষ হয়ে যাবে। আজকের পর আমার সাধারণ জীবন আর সাধারণ থাকবে না। আজকের পরে আমি একজন অপরাধী, একজন ক্রিমিনাল হয়ে বাকি জীবনটা কাটাব। কারণ, আজ আমার হাতে খুন হবে আলোকপ্রসাদ উপাধ্যায়, মানে আলোজেঠু।

‘সল্ট ওয়াটার’ বলে একটা কবিতা পড়েছিলাম।

‘I quieted my life
Until the only thing I could hear
Was the sound that blood makes in your body
When you’re still enough and listen
And the tapping of rain on the windowsill
And the simmer of sage leaves as they coil
The familiar clicking of a keyboard
And the steeliness of a frigid afternoon
Each of these an encryption
Reminding me what matters
Telling me where to go.’

সে দিন মিঠুদি নামটা বলে চলে যাওয়ার পর, আমি চিঠিটাও পড়েছিলাম। সেই গুন্ডাদার চিঠি! আর তাতে স্পষ্ট করে লেখা ছিল আলোজেঠুর নাম! আর বলা ছিল শুধু আলোজেঠু নয়, ওর খাস লোক হরিকাকাও জানত ব্যাপারটা! গুন্ডাদা লিখেছিল, ওর আগের নানান খুনজখমের অপকীর্তি ফাঁস করে দেবে আর ওর বাড়ির লোকদের ক্ষতি করে দেবে, এই ভয় দেখিয়ে গুন্ডাদাকে খুনের দায়টা নিতে বাধ্য করেছিল আলোজেঠু! ক্ষমতাবান মানুষ আলোজেঠু। কী করত গুন্ডাদা!

এটা জানার পর থেকেই আমার জীবন যেন আরও নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আমিও যেন আমার শরীরের মধ্যেকার রক্ত তৈরি হওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমার আশপাশের সব কিছুই যেন বলছে, আমায় কোথায় যেতে হবে। কী করতে হবে। সারাটা জীবন আমি নিজেকে দোষ দিয়ে এসেছি। সারাটা জীবন আমি আর কিছু করতে চাইনি। কিছু হতে চাইনি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমি চাই এই লোকটাকে মেরে দিতে! আজ এই কুয়াশা-ঘেরা সকালে আমি আলোজেঠুকে শেষ করে দিতে চাই।

আমি আলোজেঠুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সকালে আজ রক্ত নিতে হবে বুড়োর। তার পর ফিজিওথেরাপিও আছে। সারা বাড়িতে এই সময় সবাই নীচে থাকে। বুড়ো ওপরে থাকে একা। এটাই আমার সুযোগ!

না, আমার সেই গায়ের জোর নেই, আমার সেই ক্রূরতা নেই যে, লোকটাকে আমি গলা টিপে বা বুকে ছুরি মেরে শেষ করে দেব! তার চেয়ে অন্য পদ্ধতি নেব। আজ আমি সঙ্গে করে প্রচুর ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে নিয়ে এসেছি।

আমি জানি, আলোজেঠু ফিজিওথেরাপির মিনিট পনেরো পরে একটা গোটা বোতল জল খায়। আমি শুধু এই গুঁড়োগুলো সেই জলে মিশিয়ে দেব। ব্যস। তার পর ওষুধ তার কাজ করবে।

এই ঘরে এখন কেউ নেই। আমি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা কৌটো বের করলাম। কাল দোকান থেকে একশোটার মতো ওষুধ নিয়ে এসে বাড়িতে গুঁড়ো করেছি। তার পর এই ছোট কৌটোটায় ভরে রেখেছি।

লোকটার পায়ে যখন মাসাজ করি, লোকটা তখন আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। ভেবেছিলাম, সেই সুযোগে আমি জলের বোতলে ওষুধটা মিশিয়ে দেব। কিন্তু আজ দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। এসে দেখছি লোকটা বাথরুমে গিয়েছে!

জলের বোতলে গুঁড়ো মিশিয়ে আমি ঝাঁকাতে লাগলাম। সাদা গুঁড়ো জলে মিশে যেতে যেতে জলটাকে সামান্য ঘোলাটে করে দিচ্ছে!

আমার মাথা ঘুরছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে লক্ষ হাতি দাপাচ্ছে যেন! একটা মানুষকে আমি মেরে ফেলছি! একটা অসহায়, বৃদ্ধ মানুষকে আমি এই ভাবে শেষ করে দিচ্ছি!

বোতলটা তুলে দেখলাম। জলটা সামান্য ঘোলাটে। কিন্তু বুড়ো ওই দুর্বল দৃষ্টিতে বুঝতে পারবে না। আজ আমি দাদাভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব! দাদাভাইয়ের সঙ্গে আমি যে অন্যায়টা হয়েছিল তার একটা পাল্টা অন্তত আমি দিয়ে যাব। এই জীবনে যে আমার কিছু নেই! কেউ নেই! আমি বাঁচলে বা মরলে কার কী! পুলিশ যদি আমায় ধরতে পারে, আমি স্বীকার করে নেব। না পারলে এই এভাবেই ধুলোবালির মতো বেঁচে থাকব! কিন্তু এই জানোয়ারটাকে তো অন্তত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারব।

আমি গতকাল হরিকাকার কাছেও গিয়েছিলাম। হরিকাকা, যে আগে আলোজেঠুর কাছে কাজ করত, এখন গাঁজা পার্কে, নিজের নাতিদের সঙ্গে থাকে। পক্ষাঘাতে একদিক অসাড়! মনোহরদা ফোনে জানিয়েছিল আমায়।

হরিকাকার শরীর ভেঙে গিয়েছে একদম। কথাও বলে খুব কষ্ট করে! ছোট্ট একটা ঘরে নড়বড়ে চৌকিতে শুয়ে ছিল মানুষটা। দেখেই বুঝতে পারছিলাম আর্থিক বা শারীরিক অবস্থা ভাল নয়!

আমায় দেখে তো প্রথমে চিনতে পারেনি হরিকাকা। তার পর অনেক কষ্টে চিনতে পেরেছিল যখন, বলেছিলাম আমি সৌরদার ভাই।

সৌর! নামটা শুনেই হরিকাকা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকিয়েছিল।

আমি কাছে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “আমি জানলাম, আমার দাদাভাইকে নাকি আলোজেঠুই লোক লাগিয়ে... সত্যি?”

হরিকাকা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার পর কাঁপা স্বরে বলেছিল, “এত দিন পরে... এ সব আবার!”

“আপনি বলুন। এটা সত্যি?” আমি হরিকাকার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট বের করেছিলাম।

হরিকাকা টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেটেছিল। তার পর আমায় বলেছিল, “কী বলি বাবা! থানা পুলিশ... এই শরীরে... আমি...”

আমি আরও কয়েকটা নোট বের করে বলেছিলাম, “দশ হাজার আছে। কেউ কিছু জানবে না। আপনি শুধু হ্যাঁ বা না বলুন। আপনাকে কেউ কিছু করবে না। কথা দিচ্ছি। বলুন!”

অশক্ত কিন্তু লোভী হাতে টাকাগুলোকে মুঠো করে ধরেছিল হরিকাকা। তার পর আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বলেছিল, “আমি একদম শেষমেশ জেনেছিলাম। আর জানলেও আমার কিছু করার ছিল না। তাই... আলোসাহেব মানুষ নন রাক্ষস! অনেকের সঙ্গেই অনেক খারাপ কাজ করেছেন। ভগবান আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, ওঁকেও দেবেন!”

ভগবান কাউকে শাস্তি দেন না। ভগবান শাস্তি দিলে এই পৃথিবীতে এত অরজাকতা, এমন মাৎস্যন্যায় চলত না। তাই যা করতে হবে, জানি আমাদেরই করতে হবে। আমাদের আর কেউ নেই, আমরা ছাড়া।

কাল রাতে আমি আমাদের চিলেকোঠার ঘরে উঠেছিলাম। দাদাভাইয়ের পুরনো জিনিসপত্র আমি ফেলতে দিইনি কাউকে। সেই সবই ঘেঁটে দেখতে গিয়েছিলাম। পন্টিংও ছিল আমার সঙ্গে। আমি দেখেছি,

বাচ্চাদের খুব আগ্রহ থাকে পুরনো ট্রাঙ্কপত্তরের ব্যাপারে! ওরা কী ভাবে যে এমন জায়গা থেকে কোনও গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে?

রংচটা কমলা একটা ট্রাঙ্কের মধ্য থেকে বেরিয়েছিল গুপ্তধন। দাদাভাইয়ের নানান টুকিটাকি জিনিস। দাদাভাই চলে যাওয়ার পর জেঠু-জেঠিমার যখন পাগল পাগল অবস্থা, আমার বাবা এই সব জিনিস এক জায়গায় করে এই ট্রাঙ্কে পুরে সবার নজরের আড়ালে সরিয়ে দিয়েছিল।

গতকাল সেই অতীতটুকু খুলে বসেছিলাম আমি। কেন বসেছিলাম? জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি যা করতে যাচ্ছি, তার পর হয়তো আমার আর এই বাড়িতে আর ফিরে আসা হবে না। তাই শেষবারের মতো ব্যাটম্যানের কাছে একটু বসে যাক রবিন।

ট্রাঙ্কের মধ্য থেকে কাঠের ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, বাব্‌লগামের জমানো র‍্যাপার, মৌরি লজেন্সের জোকার-খাপের বাক্স, পুরনো থিন অ্যারারুট বিস্কিটের মতো দশ পয়সা, গানের ক্যাসেট, জং-ধরা জ্যামিতি বক্স-সহ আরও কত কী যে বেরোল!

পন্টিং অবাক হয়ে সব কিছু ধরে ঘেঁটে দেখছিল। আমায় বলেছিল, “এগুলো কার গো? আমি এগুলো নেব?”

আমি হেসেছিলাম ওর দিকে তাকিয়ে। তার পর বলেছিলাম, “এটা তোর এক দাদুর! সে আর নেই। সে রেখে গিয়েছে এইগুলো।”

“কার জন্য রেখে গিয়েছে? আমার জন্য?” পন্টিং তাকিয়েছিল আমার দিকে।

আমি হেসে বলেছিলাম, “হ্যাঁ ঠিক। তোর জন্য!”

পন্টিং আবার জিজ্ঞেস করেছিল, “তুমি এ সব নিয়ে বসলে কেন?”

“এই, ইচ্ছে হল!” আমি হেসেছিলাম।

“আমি পড়েছি লোনলি মানুষ নাকি খেয়ালি হয়! আর তুমি তো হবেই! তুমি যে প্লাটিপাস!” পন্টিং বোদ্ধাদের মতো মাথা নাড়িয়েছিল।

আমি ওর মাথার চুলটা ঘেঁটে দিয়ে বলেছিলাম, “প্লাটিপাস শুধু লোনলি অ্যানিম্যালই নয়, ওর বিষও আছে। জানিস তো?”

পন্টিং কী বুঝেছিল কে জানে! ও সদ্য পাওয়া সব কিছু একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিয়ে নেমে গিয়েছিল নীচে।

আমি ট্রাঙ্কটা বন্ধ করার আগে আর-এক বার একটা পুরনো ট্র্যাকস্যুট তুলে নিয়েছিলাম। দাদাভাই ভাল ক্রিকেট খেলত। ইউনিভার্সিটির ট্র্যাকস্যুট এটা। বুকে লোগো লাগানো। আর ট্র্যাকস্যুটটা ওঠাতেই তার তলায় দেখেছিলাম একটা ডায়েরি।

দাদাভাই ডায়েরি লিখত! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এটা তো জানতাম না! আমি দ্রুত ডায়েরিটা খুলেছিলাম। দেখেছিলাম, পাতার পর পাতা নয়, মাঝে মাঝে কয়েক লাইন করে লেখা। আমার কৌতূহল হয়েছিল খুব। আমি ডায়েরিটা নিয়ে, ট্রাঙ্ক বন্ধ করে জায়গায় রেখে, নীচে নেমে এসেছিলাম!

তার পর রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে মলিন, নীল চামড়ায় বাঁধানো ডায়েরিটা খুলে বসেছিলাম!

সামনে শব্দ হল এবার। আলোজেঠু হাতে লাঠি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। লোকটার মুখটা গম্ভীর। ভুরু কোঁচকানো। আর দেখলাম আলোজেঠুর পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বেলা!

বেলা এখানে আসে আমি জানি। কিন্তু কখন এসেছে?

আমি দেখলাম, বেলা আমায় দেখে আর ঘরে ঢুকল না। পাশের ঘরে একটা টুল টেনে বসে রইল।

আলোজেঠু এসে বসল চেয়ারে। বলল, “আগে মাসাজ কর, তার পর রক্ত নিবি। আর রিপোর্ট যেন আজকেই দেয়। না হলে তোকে একটা টাকাও দেব না! বুঝেছিস?”

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। এক বার তাকালাম বোতলটার দিকে। সামান্য ঘোলাটে জল। বিষ! আমি চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকালাম। দেখলাম, বেলা ওই ঘর থেকে আমাকেই দেখছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র ও সরিয়ে নিল চোখ!

আমার সামনে এই বড় চেয়ারে আলোজেঠু হেলান দিয়ে আছে! লোকটা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। কেন বাঁচল লোকটা? এই লোকটাকেই আমি এত দিন ধরে সুস্থ করার চেষ্টা করেছি! এই লোকটা গুন্ডাদাকে দিয়ে ডাকিয়ে এনেছিল দাদাভাইকে। বলেছিল, বিশ্বকাপ ফাইনাল হচ্ছে, রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে। সেই সুযোগে লেকের পাশে নিয়ে এসে জাস্ট বোঝাবে, যাতে শ্বোয়েতেলানাকে ছেড়ে দেয়। তার পর গুন্ডাদা চলে গেলে, ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে দাদাভাইকে টেনে লেকের মধ্যে, ঝোপের পাশে নিয়ে গিয়ে...

আমার হাত কাঁপছে রাগে! মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছে! শুনতে পাচ্ছি, আমি আমার রক্তের স্রোতের মধ্যে জেগে ওঠা আদিম মানুষের প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের শব্দ শুনতে পাচ্ছি! বুঝতে পারছি, সঙ্কুচিত, নুয়ে পড়া, একাকী আমির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে অন্য এক আমি! এই আমিটা বুঝতে পারছে, আজ তাকে কী করতে হবে। আমি চোয়াল শক্ত করে আলোজেঠুর পায়ে হাত দিলাম।

আজ লেকের জলের ওপর একটা কুয়াশা এসে থমকে আছে। জলের মাঝে যে দ্বীপের মতো ভূমিখণ্ড রয়েছে, তার গাছপালার ওপরটা কেমন যেন মেঘ লেগে আবছা। আমি লেকের পারের ফাঁকা বেঞ্চে বসে আছি। আমার কাজ শেষ! আমি কাজ সেরে চলে এসেছি প্রায় এক ঘণ্টা হল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই জল খেয়েছে আলোজেঠু! এর মধ্যে কি শেষও হয়ে গিয়েছে রাক্ষসটা? ডিসেম্বরের এমন একটা শান্ত শীতের সকালেই কি শেষ হল একটা খুনি? নাকি জন্ম নিল আর-একজন! আমি যা করলাম, ঠিক করলাম কি? আমার কী করা উচিত? নিজেকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত?

আমাকে সে দিন মিঠুদি বলেছিল, “জাস্ট তোকে জানিয়ে গেলাম। তুই কিন্তু একদম এটা নিয়ে ঝামেলা করবি না। বুঝেছিস জুলু?”

“জুলুরা যোদ্ধা হয় মিঠুদি!” আমি শান্ত গলায় বলেছিলাম, “এই জীবনে আমি কোনও দিন নামের মর্যাদা রাখতে পারিনি। এবার চেষ্টা করব!”

আমি জানি আমি কেউ নই। আমার এই হত্যার মাধ্যমে কোনও দেশের, কোনও জাতির, কোনও মানুষের কোনও উন্নতি সাধন হবে না। তাও একটা জীবনে আমিও কি কোনও অন্যায়ের প্রতিকার করব না? যে অপরাধবোধ নিয়ে সারাটা জীবন কাটল, সেটার স্খালন করব না?

ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে সামনের জল থেকে। কুয়াশা কাটছে একটু একটু করে। ওই দূরের বড় বড় শিরীষ গাছের মাথায় কমলা আভা লাগছে এখন। নতুন একটা দিন জাগছে! হঠাৎ টুঁই-টুঁই করে সাইরেনের শব্দ এল বড় রাস্তার দিকে থেকে।

আচ্ছা, ওটা কি পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যাচ্ছে? একটা দুটো তিনটে? ক'টা গাড়ি এল? আর অ্যাম্বুলেন্স! সেটার সাইরেনও শুনলাম যেন! তা হলে কি এবার ধরে নিয়ে যাবে আমায়? নাকি আমি নিজেই যাব? আমি এক বার মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। আলোজেঠুদের বাড়িটা তো লেকের গেটের ঠিক উল্টো দিকেই। ভাবলাম, তা হলে কি আমার কাজ শেষ হল? তা হলে কি সত্যিই রাক্ষসের পতন হল অবশেষে!

আমি মাথা ঘুরিয়ে আশপাশে পড়ে থাকা কংক্রিটের মধ্যে বহু বহু বছর আগে লিখে রাখা একটা শব্দ খুঁজলাম। না নেই। সবই তো পাল্টে গিয়েছে! এটাও যে পাল্টাবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাও মনের মধ্যে লিখে রাখা সেই ‘প্রমিস’ শব্দ মনে পড়ল আমার!

আমি কাঁধের ব্যাগ থেকে দাদাভাইয়ের ডায়েরিটা বের করলাম।

একটা জীবন কেটে যায় মানুষকে বুঝতে! একটা জীবন কেটে যায় সমস্ত ভুলগুলোকে শুধরে নিতে!

আমি ডায়েরিটা নিয়ে বসে রইলাম একা। সামনে কুয়াশা কাটছে আরও। রোদের কমলা আভা বাড়ছে। আর, আমার পেছনে? পেছনে কি পায়ের শব্দ? শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ কি এগিয়ে আসছে? কেউ আসুক আর না-আসুক, আজ আর কিছু এসে-যায় না আমার। আর পেছনের দিকে তাকানোর মানেও নেই কোনও। আমি শান্ত হয়ে গাছের বাড়ানো ডালপালার মধ্য দিয়ে নেমে আসা রোদের ওড়নার তলায় বসে রইলাম। একা।

॥ ৫ ॥
বেলা

পুলিশের চারটে গাড়ি আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। বড় গেটের বাইরে উৎসুক জনতার ভিড়! মনোহরদা গেটে কড়া পাহারায় বসে আছে। প্রেসও নাকি আসবে! স্বাভাবিক! টুবলু একজন বড় পুলিশ অফিসার, তার বাড়িতে এমন কাণ্ড হলে প্রেস আসবে না!

আমি ব্যাগটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। ঘরের সবাই গম্ভীর! কিন্তু তার মধ্যেও কি ওদের চোখেমুখে একটা স্বস্তির ভাব আছে? নাকি সবটাই আমার কল্পনা?

টুবলু দু'জন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। আমায় দেখে বলল, "তুমি বেরোচ্ছ বেলাদি?"

"হ্যাঁ রে? কেন আমায় থাকতে হবে? তদন্ত-টদন্ত হবে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম!

টুবলু মাথা নাড়ল, "না না, এর আগেও তো চেষ্টা করেছিল! রুটিন কিছু হবে। নাথিং সিরিয়াস! ক্রনিক ডিপ্রেশনের রোগী! হিস্ট্রিও আছে এমন করার। প্লাস মনোহরদা তো দেখেছে! আমায় বলল, ছাদ থেকে ঝাঁপ দিতে দেখেছে। বাবু বলে ও নাকি চেঁচিয়েওছিল!"

আমি থমকালাম একটু! বড় করে শ্বাস নিলাম। তার পর বললাম, "সত্যি কী যে হল! আমি ওপরেই অন্য ঘরে ছিলাম, হঠাৎ শুনি চিৎকার! জুলু তো এসেছিল সকালে। মাসাজ করল। ব্লাড নিল। ওকেও তো খ্যাঁচাচ্ছিল! তার পর হঠাৎ কী এমন হল!"

"দ্যাখো বেলাদি, এ সব ভেবে আর কী করবে! জানি, তুমি ছোট থেকে দেখছ লোকটাকে, তাই মায়া আছে তোমার। কিন্তু একদিন না একদিন সবাইকেই যেতে হয়! ওকেও হল। বয়স তো কম হয়নি! তুমি কষ্ট পেয়ো না," টুবলু আমার দিকে আর তাকাল না। আবার পুলিশদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

আমি বাড়ির বাকিদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, চাপা গলায় কথা বলছে সবাই। দু'-চারজনের মুখে সামান্য হাসিরও আভাস! বুঝলাম, একটা লোক যে চলে গিয়েছে, তাতে কারও দুঃখ, কষ্ট কিছু নেই।

আমি কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে বড় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনে ছড়ানো বাগান। তার পাশ দিয়ে বাঁধানো পথ ধনুকের মতো বেঁকে বড় গেটের দিকে গিয়েছে।

এই বাড়িতে, এ পথে এক দিন কত সময় কেটেছে আমার! ওই তো বাড়ির বাইরে মিটার বক্স। কাঠালচাঁপা গাছ। ওখানেই আমি আমার সেই 'বিপজ্জনক সাইকেল'-টা রাখতাম! এই বাঁধানো পথে সন্ধেবেলা আলো জ্বালিয়ে টুবলু আর অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। ওই সেই ছাদ, যেখানে শীতের দুপুরে বসে চালতার আচার খেতাম। ওই দোতলার বারান্দা, যেখান থেকে দেখতাম জুলু এক মনে টুবলুকে পড়িয়ে যাচ্ছে! আমাদের বাড়ি তো আর শুধু ইট কাঠ সিমেন্টের বস্তুখণ্ড নয়! আমাদের বাড়ি আসলে স্মৃতি-ঘর।

আমি গেটের কাছে দাঁড়ালাম আবার। মনোহরদা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে রইলাম। মনোহরদা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আলতো করে হাত দিল আমার মাথায়। তার পর বলল, "নিশ্চিন্তে যা। কোনও সমস্যা হবে না। আর মাঝে মাঝে একটু আসিস!"

আমার চোখে জল এল আচমকা। আমি বললাম, "আমার ফ্ল্যাট তো চেনো তুমি। তুমি আসো না কেন! আমার কে আছে বলো মনোহরদা? আমার তো কেউ নেই!"

"আছে রে আছে," মনোহরদা হাসল, "সেই বৃন্দাবন, মুসাফির, আমি, ফুটি, তোর অফিসের মেয়েরা, তারা কি নেই! আর? আর কেউ নেই বেলা?"

"কে আছে আর!" আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

মনোহরদা বলল, "যাকে তুই নিজের ভাবিস, সেও কি তোর নয়? সব পাওয়া কি আর একরকম হয়? মনে মনে পাওয়ার কি কোনও দাম নেই!"

আমি মাথা নামালাম। তার পর বললাম, "আমি কি পাপ..."

"চুপ! কিচ্ছু না! যা হওয়ার স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে। আমি যা দেখার দেখেছি! যা বলার পুলিশকে বলেওছি! জানিস বেলা, আমি যখন তোর কষ্টের কথা শুনেছিলাম, আমার যে কী খারাপ লেগেছিল! মনে হত এই আলোসাহেবকে মেরে ফেলি! সেটা আমি পারিনি। বৃন্দাবনকে বলেছিলাম একদিন আর সহ্য করতে না পেরে! বৃন্দাবন আমায় বলত, বেলা খুব সাহসী মেয়ে, ও এই সব অন্ধকার কাটিয়ে উঠবে ঠিক। বৃন্দাবন বলত, আমাদের অসময়ের সঙ্গী কেবল আমাদের সাহস! তুই সব সাহস দিয়ে অন্ধকার কাটিয়ে আলোর দিকে গিয়েছিস। তুই নিজেই আলো হয়ে উঠেছিস। এই আলো হয়ে ওঠাটাই তো জীবনে আসল রে! তুই শান্ত মনে বাড়ি যা। জানবি সব ঠিক থাকবে।"

গেটের বাইরে কৌতূহলী লোকের ভিড় ঠেলে আমি বেরোলাম। কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠছে। বড় গাছের মাথায় মাথায় আলোর রুমাল। লেকের দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে একটা। শান্ত, সুন্দর একটা দিন!

আমি ফুটপাথ বদলে লেকের দিকে গেলাম। এখন রোদে হাঁটতে ইচ্ছে করছে আমার।

লেকে ঢোকার বড় গেটটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সকালের লেক প্রায় ফাঁকা। সামান্য কয়েকজন মর্নিংওয়াকার অলসভাবে হাঁটছে। লেকের গেটে বসে থাকা সিকিওরিটির ছেলেটা কারও সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছে। দূরে দ্বীপের মতো জায়গাটায় যে গাছগুলো আছে, তার ওপর সার সার বক বসে রয়েছে। আমার কী যে ইচ্ছে হল এক বার ভেতরে যাওয়ার! জীবনের একটা বড় সময় এই লেকের সামনের বাড়িতেই থাকতাম আমি। কিন্তু তাও সে ভাবে এই লেকে যাওয়া হয়নি আমার। ইচ্ছেই করেনি! শুধু সৌরদাকে যেদিন গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেল, সে দিন গিয়েছিলাম! তার পর এতগুলো বছর পরে আজ আবার যাওয়ার ইচ্ছে হল।

লেকের গেট পেরিয়ে ঢুকলাম। আলো আর-একটু বেড়েছে। শীতের ঝাপটায় বেশ কিছু শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে মাটিতে। আর তখনই দেখলাম ওকে! জুলুকে! এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল। গলায় মাফলার। জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। এখানে কী করছে ও! আর কতক্ষণই-বা বসে রয়েছে!

আমি শুকনো পাতার ওপর দিয়ে এগোলাম ওর দিকে। বড় একটা সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে জুলু।

আমিও গিয়ে পাশে বসলাম ওর। জুলু আবার আমার দিকে তাকাল! আমিও তাকালাম। জুলুর চোখের দৃষ্টি শান্ত। কিন্তু জামাকাপড় এখনও সকালের মতোই অবিন্যস্ত। সেই স্কুল-জীবনের জুলু যেন সৌরদার মৃত্যুর সঙ্গেই হারিয়ে গিয়েছে! তার পরের জুলু কেমন যেন একাকী, ম্রিয়মাণ, বেভুলে এই শহরে চলে আসা এক মানুষ!

জুলু এবার হাসল। ক্লান্ত হাসি। তার পর জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ কি আসছে? নাকি আমি নিজেই যাব?"

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কোনও কথা বললাম না।

জুলু এবার ঘুরে বসল, "দাদার সঙ্গে যা করেছে আলোজেঠু, তার পর আর ওর বেঁচে থাকার অধিকার নেই! আমি জানি, এভাবে হিংসের কথা বলা কোনও সভ্য মানুষের কাজ নয়! কিন্তু মানুষ কবে আর সভ্য হয়েছে? আর, জীবনের সব ন্যায় তো আর নিয়ম মেনে হয় না! ওরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে, না? আমি পুলিশের হুটার শুনলাম! অ্যাম্বুলেন্সও তো এসেছে! তুমি কি এটাই বলতে এসেছ?"

আমি এবার হাসলাম সামান্য। তার পর আমার কাঁধের বড় ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে সামনে রাখলাম ওর।

জুলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জলের বোতলটার দিকে। ভরা বোতল। জলটা সামান্য ঘোলাটে!

ও অবাক আর উত্তেজিত গলায় বলল, "এটা? তা হলে... মানে ওদিকে পুলিশ... আলো..."

আমি জলের বোতলটা খুলে পাশের ঘাসের ওপর বোতলটা সম্পূর্ণ খালি করে দিলাম। তার পর বোতলের মুখ আটকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম।

বললাম, “আমি দেখেছিলাম তুমি এটাতে ওষুধ মেশাচ্ছ। তোমার তো কোনও দিকেই খেয়াল থাকে না! তুমি চলে আসার পরে, আলোজেঠুর ঘর থেকে তাই বোতলটা সরিয়ে নিয়েছিলাম। আমি জানি কী হয়েছিল সৌরদার সঙ্গে। কে করেছিল তাও জানি। আমার কাছে ওপালিনা এসেছিল গতকাল। ও বলেছে আমায়! এ-ও বলেছে যে, মিঠুদি গিয়েছিল তোমার কাছে।”

জুলু কী বলবে যেন বুঝতে না পেরে মাথা নামিয়ে বসে রইল।

আমি বললাম, “এ সব নিয়ে আর ভেবো না।”

জুলু এবার মাথা তুলল। তার পর বিহ্বল গলায় বলল, “তা হলে পুলিশ!”

আমি বললাম, “আসবে না? মারা গিয়েছে তো আলোজেঠু। চারতলার ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছে!”

“অ্যাঁ! সে কী!” জুলু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, “কী ভাবে? ছাদে গেল কী করে?”

“কেন? লাঠি হাতে মাঝে মাঝে তো যেত রোদ পোহাতে!”

“কিন্তু,” জুলু অস্থির হল, “সেখান থেকে পড়ল কী করে?”

আমি থমকালাম একটু। আমার মনে পড়ে গেল মনোহরদার মুখটা। নীচ থেকে অবাক হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকাটা। তার পর মনে পড়ে গেল বাড়ি থেকে বেরনোর সময়কার সেই আশ্বাসবাণী। আমি চোখ বন্ধ করলাম। বুকের মধ্যে বড় অস্থিরতা হল হঠাৎ! তাও প্রাণপণে নিজেকে সামলালাম। আমার মধ্যে জেগে ওঠা সেই রাক্ষসীকে সামলালাম! বললাম, “আগেও সুইসাইডের চেষ্টা করেছিল। আবার হয়তো করেছে!”

“হয়তো মানে?” জুলু এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি বললাম, “তুমি অত জেনে কী করবে? শুধু জানো, যে লোকটাকে তুমি মারতে চেয়েছ, সে এমনিই মরে গিয়েছে! তোমার এক সময়ের ছাত্র টুবলু নিজে ব্যাপারটা দেখছে। সিম্পল সুইসাইড। লোকটা গিয়েছে, সবাই খুশি এখন।”

জুলু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, “না, এটা ঠিক নয়। কারও মৃত্যু কখনও খুশির হতে পারে না!”

আমি তাকালাম ওর দিকে। বাদামি চোখ। ঢেউ খেলানো কাঁচাপাকা চুল। সেই জুলু! কোনও দিন এভাবে আমার কাছে বসেনি! কিন্তু আজ বসেছে। বসে আছে। আরও কি বসে থাকবে? কে জানে! জীবন এক অনিশ্চিত রূপকথা। এক অদ্ভুত সময়-ঝিনুক! কেউ জানে না সেই ঝিনুকের মধ্য থেকে কী বেরোবে? আমাদের হাতে শুধু এই মুহূর্তটুকু আছে। আমাদের হাতে শুধু আমরা নিজেরা আছি।

এক বিরাট আলোর পাখির মতো সূর্য তার কমলা ডানা মেলছে এ বার। পালকের মতো আলোর খণ্ড গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে আমাদের গায়ে, মাথায়। ওই দূরের গাছের ডালে বসে থাকা বকের দল উড়ল এবার। নতুন জীবনের দিকে কি? হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা, কিন্তু বড্ড ভাল!

আমি দেখলাম, জুলু মাথা নিচু করে বসে আছে। গালে কাঁটা দেওয়ার মতো ফুটে উঠেছে ত্বক! ঠান্ডা হাওয়ায় কি? আমি পাশে সরে গিয়ে ওর মুখটা ঘোরালাম আমার দিকে। জুলু তাকাল। চোখ সামান্য ভিজে। এ কোন দৃষ্টি! এমন চোখে তো আমি জুলুকে কোনও দিন তাকাতে দেখিনি! আমার আজ খুব সাহস বেড়েছে! সূর্য তার সমস্ত সাহস যেন আমার মধ্যে ভরে দিয়েছে! মনে পড়ছে বৃন্দাবনদার সেই কথা— অসময়ের সঙ্গী শুধু সাহস!

আমি জুলুর মুখটা ধরে হাত দিয়ে ওর এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিলাম এবার। তার পর বুকের কাছে জামার খোলা বোতামটা বন্ধ করে দিলাম। মাফলারটাও জড়িয়ে দিলাম গলায়।

জুলু হাত বাড়াল এ বার। দেখলাম, ওর হাতে একটা ডায়েরি। আমি নিলাম।

জুলু কিছু না-বলে তাকিয়ে রইল। আমিও তাকিয়ে রইলাম। আর কলকাতার রাস্তায় গাড়ি বাড়ল। শব্দ বাড়ল। লেকের গেটের কাছ থেকে ভেসে এল গান। হাওয়ার ঝিরি উঠল গাছে। জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ল নরম তুষারের মতো। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে স্পষ্ট হয়ে উঠল সব।

আর আমাদের জীবন এবার শুরু হল।

॥ সৌরর ডায়েরি থেকে ॥

॥ চ ॥

...আমি জানি, সবাই ভুল বুঝবে আমায়! জানি, সবাই খারাপ বলবে। কিন্তু আমি সেসব নিয়ে ভাবি না। কারণ, আমি জানি পৃথিবীতে সবাই আমায় ভুল বুঝলেও, জুলু আমায় ভুল বুঝবে না কোনও দিন! কেউ যদি আমার সঙ্গে খারাপ কিছু করে, ও ঠিক তার প্রতিবাদ করবে। আমি জানি আর কেউ না-হলেও জুলু আমার হয়ে থাকবে আজীবন।

॥ মুসাফির, শেষটুকু ॥

লেকের বড় মাঠটায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, ওই দূরে বসে থাকা বেলা আর জুলুর দিকে তাকিয়ে রইল মুসাফির। আজ ভাগ্যিস মর্নিংওয়াকে বেরোতে দেরি হয়েছিল! না হলে কি দেখতে পেত ওদের, এইভাবে! মুসাফির দেখল ওরা দু'জনে হাতে হাত ধরে বসে রয়েছে জলের পাশে। ওদের বিকেলবেলার জীবনে আজ এসে পড়ছে সকালবেলার আলো!

মুসাফির জানে, এ মুহূর্ত বড় ব্যক্তিগত। বড় দুর্লভ। এমন মুহূর্তে ওদের নিজেদের মতো থাকতে দেওয়াই ভাল!

মুসাফির ধীর পায়ে লেক থেকে বেরিয়ে এল। সেই ছোট্ট বুড়ি, আজও গান গাইছে বসে। একটা ময়লা সোয়েটার পরে, হাতে চটর-পটর বাজিয়ে গাইছে, “ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্ রে চেয়ে আমার বুকে—/ ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে॥ / আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে / তাই হেরি তায় সকলখানে॥”

মুসাফির দাঁড়াল ওর সামনে। হাসল। তার পর পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সামনের বাটিতে রাখল। বুড়ি গাইতে গাইতেই হাসল। বাজনা থামিয়ে হাত বাড়াল এ বার। মুসাফির পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে বুড়ির হাতে দিল। আর বুড়ির হাসি লেবু-রঙা রোদ্দুর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ভাঙাচোরা একাকী শহরটায় মাথায়। যেন বলল, তুমি একা নও, আমরা আছি তোমার পাশে।

মুসাফির দাঁড়াল না আর। দোকান খোলার সময় হয়েছে। অনেক কাজ পড়ে আছে। অনেক বোতামঘর তৈরি এখনও বাকি। বড় রাস্তা পেরিয়ে আলোছায়ার মধ্যে হাঁটতে লাগল মুসাফির!

শীতের মাঝেও এক অন্য উষ্ণতা বাড়তে লাগল কলকাতায়!

(বিপজ্জনক সাইকেল, ঝরে পড়া টগরফুল আর মুসাফিরদা ছাড়া এই গল্পের আর সব কিছুই কি বানানো?)

শিল্পী: কুনাল বর্মণ
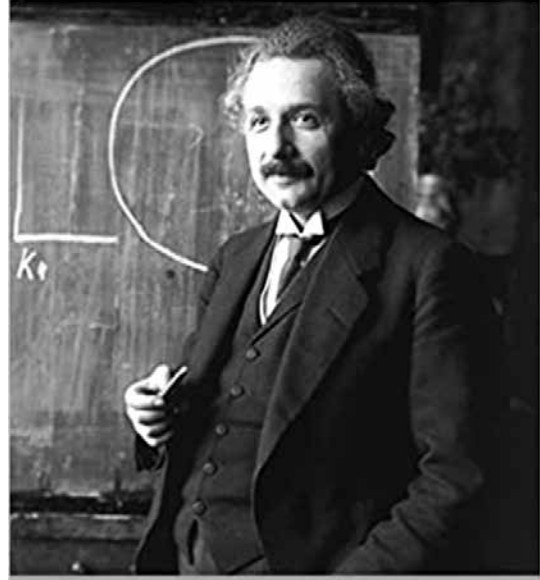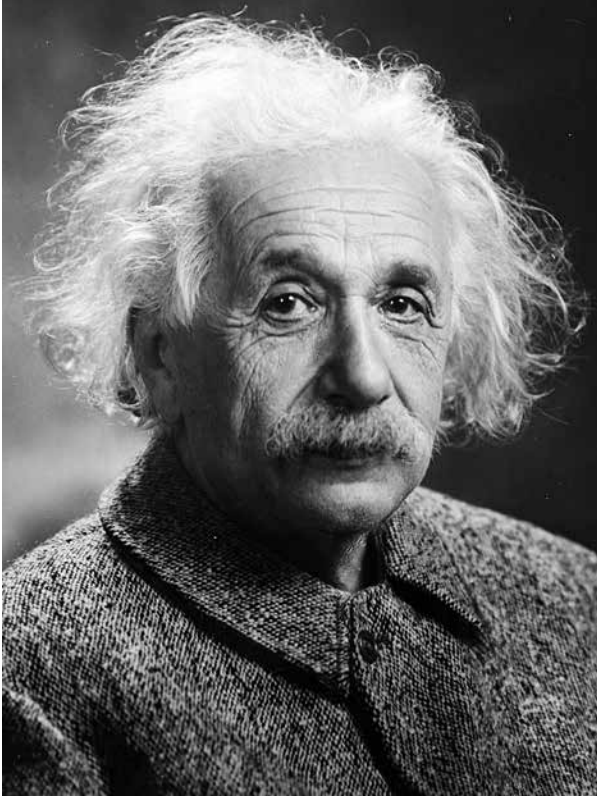
অ্যালবার্ট আইস্টাইন ও রিলেটিভিটি বিষয়ে তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ

বোঝা এবং না বোঝার উপত্যকা

পথিক গুহ

‘সিনক্রোনিসিটি’ বলে একটা কথা চালু আছে। ইংরেজিতে ‘সিনক্রোনাস’ শব্দের মানে হল, সমকালে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা। এক ধরনের সমাপতন। মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর কাছে সিনক্রোনিসিটি মানে অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ। যার ব্যাখ্যা মেলে না বুদ্ধিতে। হয়ে যায়— কেন, কী করে, সে সব কেউ জানে না।

হাতের কাছে উদাহরণ, পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। ১৯৮৮ সালের প্রকাশিত ‘আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম: ফ্রম দ্য বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোল্‌স’ বইয়ের সূত্রে যিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। ২০১৮ সালে প্রয়াণের আগে পর্যন্ত যিনি জীবিত বিজ্ঞানীকুলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ ছিলেন। গালিলেও গালিলেই, আইজ়্যাক নিউটন এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সুযোগ্য উত্তরসূরিও বলা হত তাঁকে।

হকিংয়ের পরিচিতি এবং গ্ল্যামার আরও বেড়েছিল বিশেষ কারণে। তিনি ছিলেন এ এল এস (অ্যামিওট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস) ব্যাধির শিকার। ওই রোগে হাত-পা অসাড় হয়ে যায়। তাঁর ২৫ বছর বয়সে ধরা পড়েছিল ওই রোগ। আর দু’-তিন বছরের বেশি বাঁচার কথা ছিল না তাঁর। তার পরও ৫০ বছর বেঁচে থাকা বিরল ব্যতিক্রম। কথা বলতেন পারতেন না। অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়েছিল স্বরনালী। কথা ‘বলতেন’ কম্পিউটারের সাহায্যে। কম্পিউটার যেন এক অভিধান। একটা একটা করে শব্দ নির্বাচন, সেগুলো পাশাপাশি বসিয়ে পুরো বাক্য তৈরি। তার পর যন্ত্রে উচ্চারণ। এই ভাবে ‘কথা বলা’। হাত-পা অবশ, ফলে চলচ্ছক্তিহীন। প্রায় মৃতবৎ দশা। নার্সরা খাইয়ে দিত, জামাকাপড় পরিয়ে দিত। দেহে একমাত্র সচল অঙ্গ বলতে মস্তিষ্ক। যা গণনা করে চলেছিল ফিজ়িক্সের জটিল অঙ্ক। এক দিকে মৃতবৎ দেহ, অন্য দিকে ব্রহ্মাণ্ডচিন্তা— এই বৈপরীত্য হকিংয়ের গ্ল্যামার

বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ।

কবে গ্ল্যামারাস হলেন হকিং? নিঃসন্দেহে ১৯৮৮ সালে। যখন তাঁর বই 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' প্রকাশিত হয়। একটা বই লিখেই এত খ্যাতি সচরাচর দেখা যায় না। বইটা কেমন? 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-কে বলা হয় 'দ্য মোস্ট আনরেড বুক'। মানে, বইটা লোকে কিনেছে, পড়েনি। যে বই কোটি কোটি কপি বিক্রি হয়, ক্রেতাসংখ্যা যার 'বাইবেল'-এর পরেই, তা কেন হবে 'দ্য মোস্ট আনরেড বুক'? উত্তর হল, বইটা কঠিন। হকিং-এর চেষ্টা সত্ত্বেও কঠিন। যে বইয়ের সাহায্যকারী ভলিউম হিসেবে প্রকাশিত হয় 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম: আ রিডার'স কম্প্যানিয়ন' অথবা 'আ ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম', সে বই পাঠকের কঠিন লাগবেই। মানুষ কিনেছেন 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম', কিনে পড়তে গিয়ে আর বেশি দূর এগোতে পারেননি। আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন। অন্যদের দেখাতে, যে তিনি স্টিফেন হকিং-এর লেখা বই পড়েন!

ইংরেজিতে একটা কথা আছে— 'ফেমাস ফর বিয়িং ফেমাস'। বিখ্যাত হওয়ার জন্যই বিখ্যাত। কথাটা হকিং-এর ক্ষেত্রেও খাটে। যখনই 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' লিখে তাঁর নাম হয়ে গেল, সকলে কিনলেন তাঁর বইখানি। ব্যাপারটা চমৎকার বুঝিয়েছেন মাইকেল হোয়াইট এবং জন গ্রিফিন, তাঁদের বই, 'স্টিফেন হকিং: আ লাইফ ইন সায়েন্স'-এ। রুশ বিজ্ঞানী আন্দ্রেই দিমিত্রিয়েভিচ লিন্দ যাচ্ছেন মস্কো থেকে নিউ ইয়র্ক। তিনি বিমানে দেখলেন, পাশের সিটে বসে এক ভদ্রলোক 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' পড়ছেন। মনে রাখতে হবে, লিন্দ কিন্তু এমন এক জন বিজ্ঞানী, যাঁর গবেষণা হকিং আলোচনা করেছেন তাঁর বইয়ে। সেই বই সহযাত্রীকে পড়তে দেখে লিন্দ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'পড়েছেন বইটা?'

'হুঁ,' তাঁর উত্তর, 'আপনি পড়েননি?'

সহযাত্রী লিন্দকে চিনতে পারেননি। তাঁর প্রশ্নের জবাবে লিন্দ বললেন, 'পড়তে শুরু করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত পারিনি। কঠিন লেগেছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীর মন্তব্য, 'কই! দেখান তো আপনি, কোথায় আপনার কঠিন মনে হয়েছিল!'

বুঝুন অবস্থা! সাধারণ পাঠক বুঝিয়ে দেবেন বিজ্ঞানী লিন্দকে। হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!

ব্রহ্মাণ্ড-রহস্যের প্রবক্তা স্টিফেন হকিং

একেই বলে 'ইলিউশন অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং'। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় দুটো বই। একই বিষয়ে। দুটো বইয়ের শিরোনাম একই। 'ফার্মা'স লাস্ট থিয়োরেম'। দু'টি বইয়ের বিষয় কী?

সে কথা জানতে হলে, ফরাসি সিভিল সার্ভেন্ট পিয়ের দ্য ফার্মার কথা বলতে হয়। পেশায় সরকারি চাকুরে, নেশায় গণিতজ্ঞ। রাত জেগে গণিত নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসতেন। এক দিন রাত্তিরে পড়ছিলেন গ্রিক গণিতজ্ঞ দিওফান্তাস-এর লেখা 'আরিথমাতিকা' বইটি। হঠাৎ চোখ আটকে গেল এক জায়গায়। দিওফান্তাস ওখানে আলোচনা করেছিলেন আর-এক গ্রিক গণিতজ্ঞ পিথাগোরাসের ত্রয়ী সংখ্যা নিয়ে। যেখানে প্রথম দু'টি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি তৃতীয় সংখ্যার বর্গ। যেমন—

$৩^২+৪^২=৯+১৬=২৫=৫^২$

$৬^২+৮^২=৩৬+৬৪=১০০=১০^২$

$৫^২+১২^২=২৫+১৪৪=১৬৯=১৩^২$

$১০^২+২৪^২=১০০+৫৭৬=৬৭৬=২৬^২$

৩-৪-৫, ৬-৮-১০, ৫-১২-১৩ কিংবা ১৩-২৪-২৬ ত্রয়ী সংখ্যা। এ রকম ত্রয়ী সংখ্যার শেষ নেই। অগুন্তি পাওয়া যাবে। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের যে রাতে ফার্মা পড়ছিলেন 'আরিথমাতিকা' বইয়ের ওই অংশটা, তখনই ওঁর মাথায় আসে একটা প্রশ্ন। বর্গের বেলায় (সংখ্যার ঘাত যখন ২) ও রকম অগুন্তি সংখ্যা পাওয়া গেলেও, ঘাত ৩, ৪, ৫... হলে আর ও রকম ত্রয়ী সংখ্যা পাওয়া যাবে না কেন?

ঘাত ২-এর চেয়ে বড় হলে ও রকম ত্রয়ী সংখ্যা যে আর পাওয়া যাবে না, তা ফার্মা একটু চেষ্টা করেই বুঝতে পারলেন। প্রশ্ন হল, কেন? যা চাই, তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা, কেন ঘাত ২-এর বেশি হলে একটাও ত্রয়ী সংখ্যা মিলবে না। 'আরিথমাতিকা' বইয়ের যে পৃষ্ঠাটি ফার্মা পড়ছিলেন, তার মার্জিনে তিনি লিখলেন, 'একটি চমৎকার প্রমাণ আমার হাতে আছে, কিন্তু এই মার্জিনে জায়গা নেই বলে এখানে লিখতে পারলাম না।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল গণিতের এক ধাঁধা। গণিতে ধাঁধার অভাব নেই। ফার্মা নিজেও অনেকগুলি ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। কালে কালে ও সব ধাঁধার সমাধান মেলে। বাকি থাকে ত্রয়ী-সংখ্যা সংক্রান্ত ওই ধাঁধা। ফার্মার শেষ অমীমাংসিত ধাঁধা। নাম হয়ে যায়, 'ফার্মা'স লাস্ট থিয়োরেম'। ৩৫৮ বছর কেটে যায় ওই ধাঁধার সমাধানে। ১৯৯৫ সালে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ অ্যান্ড্রু ওয়াইল্‌স সমাধান করেন ওই ধাঁধা। যে ধাঁধা কিনা একটা ক্লাস সেভেনের ছেলেও বুঝতে পারে, তা সমাধানে ৩৫৮ বছর!

হ্যাঁ, গণিতের নতুন নতুন শাখা খুলে যায় ওই ধাঁধার সমাধানে। ওয়াইল্‌স কেমব্রিজে এক সেমিনারে তিন দিনে তিনটি লেকচার দিয়ে ওই ধাঁধা সমাধান করেন। পরে সেই সমাধান গণিতের জার্নালে ছাপা হয় শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে। এমনই দুরূহ সেই সমাধান।

সমাধানের পর যে দুটো বই ছাপা হয়, তার একটির লেখক সাইমন সিং। ৩৬৮ পৃষ্ঠার বই। অনেকটা ব্যাখ্যা করে লেখা বই। আর-একটি বইয়ের লেখক আমির ডান একজেল। মোটে ১৬০ পৃষ্ঠার বই। তায় আবার প্রায় পকেটবুক সাইজ়ের। অত কম পরিসরে গণিতের ৩৫৮ বছরের গবেষণা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবু একজেল চেষ্টা করেন পাঠকদের একটা আইডিয়া দিতে। তাঁর এই চেষ্টার প্রশংসা করে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকা। লেখা হয়, 'দ্য অথর হ্যাজ় বিন সাকসেসফুল ইন ক্রিয়েটিং ইন দ্য মাইন্ড অব রিডার্স অ্যান ইলিউশন অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং'। চমৎকার শব্দচয়ন। অ্যান ইলিউশন অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। পুরোপুরি বোঝা নয়, বোঝার একটা বিভ্রম মাত্র। একজেল জানতেন, ৩৫৮ বছর ধরে গণিতজ্ঞরা যে ভাবে ফার্মা'স লাস্ট থিয়োরেম সল্‌ভ করার চেষ্টা চালিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করতে চাইলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন না। একজেল নিজেও কি তা বুঝবেন? মনে হয় না। না বোঝারই কথা। সুতরাং, কী কর্তব্য? জনপ্রিয় বিজ্ঞান যাঁরা লেখেন, এটা তাঁদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। দুরূহ বিষয় এমন করে লিখতে হবে, যাতে পাঠকের মনে হয়, তিনিও ব্যাপারটা বুঝেছেন। আসলে তিনি পুরোটা বোঝেননি, কিন্তু তাঁর মনে হবে, তিনি সবটা বুঝে গেছেন। এই বিভ্রম তৈরি করাটাই জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখকের কাজ। একজেল সেটা ভাল ভাবে করেছেন। 'নিউ ইয়র্কার'

পত্রিকা সেই কথাই বলেছিল।

আমি নিজে সেটা টের পেয়েছিলাম ২০০১ সালে। ওই বছর ৫ থেকে ১০ জানুয়ারি 'স্ট্রিংস-২০০১' কনফারেন্স হয়েছিল ভারতের মুম্বই শহরে। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ। সেই উপলক্ষে জন শোয়ার্জ, এডওয়ার্ড উইটেন-এর মতো স্ট্রিং থিয়োরি (যে গবেষণায় ধরা হয় পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান কোনও কণা নয়, সুতোর মতো একটা কিছু) বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা মুম্বইয়ে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন হকিং। আমি বুঝতে চেয়েছিলাম 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইয়ে ওঁর বলা ইম্যাজিনারি টাইম বা কাল্পনিক সময়ের ধারণাটা। 'স্ট্রিংস-২০০১' কনফারেন্সের অন্যতম সংগঠক, টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক অতীশ দাভোলকর (পরে যিনি ইটালির ত্রিয়েস্ত শহরে আবদুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিক্যাল ফিজ়িক্স-এর ডিরেক্টর হন) আমাকে ইম্যাজিনারি টাইম বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ওঁর কাছে যাওয়ায় উনি বললেন, "নাহ্! পারলাম না ইম্যাজিনারি টাইম সহজ করে বোঝাতে।"

কাজেই সাধারণ এক বিমানযাত্রী বিজ্ঞানী আন্দ্রেই লিন্দকে 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বুঝিয়ে দেবেন— এটা অসম্ভব। সেই সহযাত্রীর মনে হয়েছিল, তিনি বইটা পড়ে বুঝে ফেলেছেন। আসলে তিনি এক বিভ্রমের মধ্যে ছিলেন। ইলিউশন অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

আগেই বলেছি, স্টিফেন হকিং 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' লেখার সুবাদে বিখ্যাত হন। এত বিখ্যাত যে, টোকিয়ো শহরের রাজপথেও তাঁকে দেখতে ভিড় জমে যায়। আমেরিকার প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ়-এর অধ্যাপক ফ্রিম্যান জন ডাইসন ওই শহরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছিলেন হকিং-এর জনপ্রিয়তা। কেন এই জনপ্রিয়তা? কারণ, হকিং তাঁর এই বইয়ের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা দার্শনিক প্রশ্ন। ঈশ্বর। ঈশ্বরচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরস্পরবিরোধী বলে ধরা হয়। অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য সে কথা মানেন না। যাই হোক, মনে পড়ছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত মন্তব্য। তিনি দেখতে চান, ঈশ্বর চাইলেই পারতেন কি না ব্রহ্মাণ্ডকে অন্য ভাবে গড়তে। মানে ব্রহ্মাণ্ড কি বিজ্ঞানের নিয়মের দাস, নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার?

যে বই কিনেছেন বহু জন, কিন্তু পড়েছেন খুব কম

ঈশ্বর বনাম বিজ্ঞান বিষয়ে যে আগে বই লেখা হয়নি, এমন নয়। ১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানী পল চার্লস উইলিয়াম ডেভিস লিখেছিলেন, 'গড অ্যান্ড দ্য নিউ ফিজ়িক্স'। পদার্থবিদ্যার নতুন পর্যবেক্ষণ এবং ঈশ্বরচিন্তা মিশিয়ে। 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-এ হকিং-এর নাস্তিকতা বেরিয়ে এল। তিনি প্রশ্ন তুললেন, "সৃষ্টিকর্তার তা হলে দরকার আছে কি?"

হ্যাঁ, শুধু দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপনের জন্যই 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' হকিং-কে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিল না। এক জন মানুষের কৃতিত্বও কিছু কম নয় এ ক্ষেত্রে। তিনি পিটার গাজার্ডি। ব্যান্টাম বুক্স-এর এডিটর। এইখানেই সিনক্রোনিসিটির ভূমিকা।

এক দিন, নিউ ইয়র্ক শহরে ব্যান্টাম বুক্স-এর অফিস থেকে গাজার্ডি দুপুরে বেরোলেন লাঞ্চ সারতে। লাঞ্চ সেরে অফিসে ফেরার পথে তিনি কিনলেন 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স সানডে ম্যাগাজ়িন' পত্রিকা। তাতে ছাপা হয়েছে একটি প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুটি কৌতূহলোদ্দীপক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন প্রফেসর, যিনি চলতে-ফিরতে পারেন না, তিনি একটা বই লিখেছেন ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে। বইটি ছাপাবে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। এর আগে ওই প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরিয়েছে ওঁর আর একখানি বই। 'দ্য লার্জস্কেল স্ট্রাকচার অব দি ইউনিভার্স'। গাজার্ডির বুঝতে অসুবিধে হল না আগামী বইটির মার্কেট। যে বিজ্ঞানী নিজে চলতে-ফিরতে পারেন না, তিনি লিখছেন মহাবিশ্ব নিয়ে বই!

পরদিন মর্নিং ফ্লাইটে গাজার্ডি নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনে। সেখান থেকে কেমব্রিজ। প্রফেসর হকিং-এর সঙ্গে দেখা। তাঁকে প্রস্তাব। ব্যান্টাম বুক্স তাঁর আগামী বইটি ছাপতে চায়। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস আগাম হিসেবে কত দিতে চায় তাঁকে? মোটে কুড়ি হাজার পাউন্ড! ব্যান্টাম বুক্স দেবে আড়াই লক্ষ ডলার। লোভনীয় প্রস্তাব। হকিং রাজি। অবশ্য রাজি হওয়ার পিছনে অন্য কারণও ছিল। হকিং-এর অনেক দিনের সাধ তাঁর লেখা বই শোভা পাক এয়ারপোর্ট বুক স্টোরে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস যে সব বই ছাপে, সেগুলো মূলত গবেষণাতেই লাগে। সেই কারণে এয়ারপোর্ট বুক স্টোরে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ব্যান্টাম বুক্স থেকে প্রকাশিত অনেক বই এয়ারপোর্ট বুক স্টোরে সাজিয়ে রাখা হয়। মানে, ব্যান্টাম বুক্স এমন বই ছাপে, যেগুলো এয়ারপোর্টে বিক্রি হয়। এর পাশাপাশি থাকে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। যার উপর বইয়ের বিক্রি অনেকটা নির্ভর করে। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস বইয়ের মার্কেটিং করে না। গবেষকরা নিজেদের প্রয়োজনে বই কেনেন। সব দিক ভেবে হকিং রাজি হলেন ব্যান্টাম বুক্স-এর প্রস্তাবে।

একে বলে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বুক লঞ্চ পার্টি হল নিউ ইয়র্ক হারবারে। জাহাজ ভাড়া করে। ইংল্যান্ডে বুক লঞ্চ পার্টি হল রয়্যাল সোসাইটির ভোজসভায়। আটলান্টিকের দুই পারে বইয়ের খবর বেরোল পরদিনের কাগজে। 'টাইম' ম্যাগাজ়িনে খবর। লিখলেন 'ডিসকভার' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক লিও জ্যারফ। বিষয়, হকিং মানুষটি শারীরিক অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে কী ভাবে দুরূহ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'নিউজ়উইক' ম্যাগাজ়িনে কভার স্টোরি। 'মাস্টার অব দ্য ইউনিভার্স'। প্রচ্ছদে হকিং-এর ছবি। পিছনে রাতের আকাশ। এ সব কি সম্ভব হতে পারে ব্যান্টাম বুক্স বই না ছাপলে? গাজার্ডি সে দিন লাঞ্চ করতে না বেরোলে? বেরিয়ে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্স সানডে ম্যাগাজ়িন' না কিনলে? ওই পত্রিকা হকিং-সংক্রান্ত খবর না ছাপলে? সিনক্রোনিসিটির ভূমিকা তা হলে খাটো করার মতো নয় মোটেই।

গাজার্ডি 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' ছাপার কনট্র্যাক্ট হাতে পেতেই হকিং-কে অনেক পরামর্শ দেন। যে সব পরামর্শ এয়ারপোর্টের বুক স্টোরে বই বিক্রির উপযোগী। এয়ারপোর্ট বুক স্টোরে থরে থরে সাজানো থাকে মূলত গোয়েন্দা-কাহিনি। হ্যারল্ড রবিন্স, জেম্স হেডলি চেজ়-এর মতো থ্রিলার-লেখকদের বই। গোয়েন্দা-কাহিনি তরতর করে
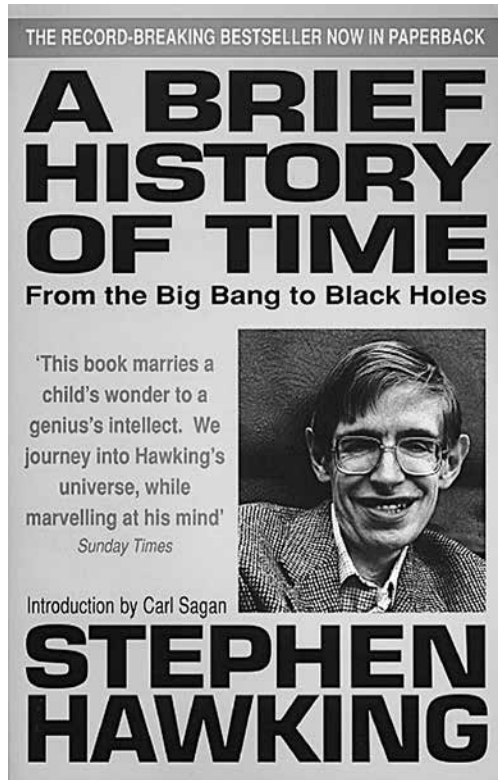
এগোয়। পড়ে ফেলতে একটুও কষ্ট হয় না। বিজ্ঞানের বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। বিজ্ঞানের বই যাঁদের পড়ার অভ্যেস নেই, তাঁরা পড়বেন না। তাঁদের পড়ানোর জন্য গাজার্ডি বারবার পাণ্ডুলিপি বদলাতে বললেন। গাজার্ডি আর-একটা পরামর্শ হকিং-কে দিলেন। তা হল, প্রতিটি ফর্মুলা বইয়ের বিক্রি কমিয়ে দেয়। একটা বাড়তি ফর্মুলা মানেই বইয়ের বিক্রি অর্ধেক। হকিং গাজার্ডির এই পরামর্শ মেনে নেন। তবে তিনি 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' থেকে যে-ফর্মুলাটি একেবারেই বাদ দিতে পারেন না, সেটি হল $E=mc^2$, আইনস্টাইন আবিষ্কৃত সেই ফর্মুলা, যা বলে দেয় পদার্থ এবং শক্তি, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

পদার্থ যেন জমাটবাঁধা শক্তি। এক রত্তি পদার্থ মানে বিশাল পরিমাণ শক্তি বা এনার্জি। ওই ফর্মুলায় E হল এনার্জি, আর m হল মাস বা পদার্থের ভর। যেহেতু ওই ফর্মুলায় c^2 ঢুকে আছে (c হল শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ, যা সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার, তার আবার বর্গ), সেহেতু কিছুটা পদার্থ মানে বিশাল পরিমাণ শক্তি। এই $E=mc^2$ বিজ্ঞানে সবচেয়ে পরিচিত ফর্মুলা। আইনস্টাইন-আবিষ্কৃত ওই ফর্মুলাকে হকিং তাঁর বই থেকে বাইরে রাখতে পারেননি। রাখলে, তাঁর বইয়ের বিক্রি দ্বিগুণ হত কি না, তা বলা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানে সবচেয়ে পরিচিত ফর্মুলা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করায় হয়তো তাঁর বইয়ের গ্ল্যামার বেড়েছে। বিক্রি না কমে, হয়তো বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের বসন্তে মে মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ আমেরিকায় প্রথম বার গিয়ে আইনস্টাইন যে লেকচারগুলো দেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে, সেগুলোর কথাই মনে পড়ছে। পরের বছর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ওই বইগুলোর অনেকটা বই আকারে প্রকাশিত হয়। 'দ্য মিনিং অব রিলেটিভিটি'। এ বার শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে বইটির। সে প্রসঙ্গে কিছু কথা।

পপুলার সায়েন্স সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল আইনস্টাইনের? তিনি বলতেন, কোনও দুরূহ বিষয় নিজে বোঝা মানে কী? যখন বিজ্ঞানী সে জিনিসটা একটা রাস্তার লোককে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। সেই মানুষটিই আবার বলেছেন, বিজ্ঞানকে যতটা দরকার, ততটাই সোজা করে বলতে হবে, তার চেয়ে বেশি নয়। তাতে জল মিশে যেতে পারে। মানে, জলবৎ তরলং করতে গিয়ে কোনও বিষয়ে অহেতুক অন্য বিষয়ে পরিবর্তিত করা অপছন্দ ছিল আইনস্টাইনের।

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে চারটে বক্তৃতা দেন তিনি। যে বক্তৃতাগুলো একত্রিত করে 'দ্য মিনিং অব রিলেটিভিটি' বই প্রকাশ, তা যথেষ্ট খটোমটো। ওই বইয়ের পাতায় পাতায় ফর্মুলা, গণিতের চিহ্ন ঠাসা। শ্রোতাদের কথা ভেবে আইনস্টাইন ওই বক্তৃতাগুলো দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি মে মাসের ৯ ও ১০ তারিখে আরও দুটো বক্তৃতা দেন, যে বক্তৃতাগুলোকে বলা হয়েছিল পপুলার লেকচার। এই বক্তৃতা দুটোয় শ্রোতার আসরে শুধু বিজ্ঞানীরাই ছিলেন না। ছিলেন প্রিন্সটন শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আর তাঁদের স্ত্রীরা। বক্তৃতা দুটোর শীর্ষনাম ছিল, 'রিলেটিভিটি তত্ত্বের নিয়মাবলি (গাণিতিক চিহ্ন ছাড়া)'। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল স্পেশ্যাল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা জেনারেল থিয়োরি বিষয়ে। বিশেষ করে, জেনারেল রিলেটিভিটির যে সব পরীক্ষা বাকি আছে।

আমেরিকা ভ্রমণকালে শুধু প্রিন্সটনেই বক্তৃতা দেননি আইনস্টাইন। দিয়েছিলেন অন্যান্য জায়গাতেও। তার আগে ওঁর প্রথম আমেরিকা ভ্রমণের প্রসঙ্গে আসা যাক। আইনস্টাইন কিন্তু বিখ্যাত হন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি আবিষ্কার করে নয়, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল রিলেটিভিটি আবিষ্কারকালেও নয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে তারিখে ছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। সূর্যের পূর্ণগ্রাসে দিনের বেলা নেমে আসে রাতের অন্ধকার। আকাশে তারা দেখা যায়। তারা দেখা মানে তারার আলো দেখা। তারার আলো সূর্যের পাশ ঘেঁষে পৃথিবীতে আসার সময় কতখানি বাঁকবে (এমনিতে আলো সব সময় সরলরেখায় চলে), তা বলা হয়েছিল জেনারেল রিলেটিভিটিতে। ওই দিন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কালে দেখা গেল, ঠিক ওই পরিমাণ বাঁকছে। চার দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' কাগজ হেডিং

পিয়ের দা ফার্মা, যিনি গণিতের বিখ্যাত ধাঁধা তৈরি করেছিলেন

করল 'লাইট্‌স অল অ্যাসকিউ ইন দ্য হেভেন্‌স/ মেন অব সায়েন্স মোর অর লেস অ্যাগগ ওভার রেজ়াল্টস অব ইকলিপ্স অবজ়ারভেশন্‌স/ আইনস্টাইন থিয়োরি ট্রায়াম্ফস/ স্টারস নট হোয়্যার দে সিম্‌ড অর হোয়্যার ক্যালকুলেটেড টু বি, বাট নোবডি নিড ওরি/ আ বুক ফর টুয়েল্‌ভ ওয়াইজ় মেন/ নো মোর ইন অল দ্য ওয়ার্ল্ড কুড কমপ্রিহেন্ড ইট, সেড আইনস্টাইন হোয়েন হিজ় ডেয়ারিং পাবলিশার্স অ্যাকসেপ্টেড ইট'। এ রকম হেডলাইনের পর কি কারও বিখ্যাত হতে সময় লাগে?

হ্যাঁ, বিখ্যাত হওয়ার পর আইনস্টাইনকে আটলান্টিকের ও পারে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল রিলেটিভিটি কী, তা বুঝিয়ে বলার জন্য। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অঙ্কের অধ্যাপক লুথার আইসেনহার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জন হিবেন-এর পক্ষ থেকে জানতে চান, কোনও একটা সময়ে আইনস্টাইন প্রিন্সটনে আসতে পারবেন কি না বক্তৃতা দিতে। আইনস্টাইন সরাসরি চিঠি লিখলেন হিবেন-কে। জানালেন, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি বক্তৃতা দিতে যেতে পারবেন প্রিন্সটনে, তবে তাঁকে বক্তৃতা-বাবদ ফি দিতে হবে ১৫ হাজার ডলার। অঙ্কটা তখনকার হিসেবেও বেশিই। হিবেন তাঁকে জানালেন, অত ডলার তাঁরা দিতে পারবেন না। ব্যাপারটা আর এগোল না।

এর মধ্যে ঘটল একটা ঘটনা। জেরুজ়ালেম শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় (পরে যার নাম হয়েছে হিব্রু ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদিদের তরফে অর্থসংগ্রহে আমেরিকা ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হল। ইহুদিদের দলে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল আইনস্টাইনকে। এখন, তাঁর তরফে এই অনুরোধ এড়ানো কঠিন। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা প্রকট। আইনস্টাইন ছিলেন, যাকে বলে, লোনার। একা একা চলতে ভালবাসতেন। জীবনে কোনও পিএইচ ডি ছাত্র নেননি। সেই মানুষটি গভীর সহানুভূতিশীল ছিলেন ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি। নিজেই বলতেন,

আমি যদি কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে থাকি, তা হল ইহুদি সম্প্রদায়। আসলে অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন আইনস্টাইনের চিরকালীন স্বভাব। ওঁর মনে হত, বিশ্ব জুড়ে ইহুদিরা অত্যাচারিত, তাই তিনি নিজে ইহুদি হিসেবে বরাবর সেই দলে। জেরুজ়ালেম শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহে আমেরিকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ এলে আইনস্টাইন সাদরে তা গ্রহণ করলেন। এমনকি, বাতিল করলেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে ধনকুবের আর্নেস্ট সলভে আয়োজিত কনফারেন্স। (১৯১১ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন পরবর্তী কালে সলভে কনফারেন্স নামে প্রসিদ্ধি পায়।) সলভে কনফারেন্সে ফিজ়িক্সের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা হত। আর তখন একের পর এক নতুন আবিষ্কারে পদার্থবিদদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। পরমাণুর ভিতরে আবিষ্কার হচ্ছে এক অন্য জগৎ। সে আবিষ্কারগুলোর নাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এহেন সময়ে সলভে কনফারেন্সের ডাক উপেক্ষা করা মানে পদার্থবিদের সমূহ ক্ষতি। তবুও আইনস্টাইন ইহুদি সংগঠনের তরফে আমেরিকা ভ্রমণের আহ্বান অগ্রাহ্য করলেন না, ইহুদি স্বার্থ তাঁর কাছে এতই বড়। আইস্টাইনের এই সিদ্ধান্তে চটে গেলেন তাঁর বন্ধু ফ্রিৎস হেবার, যিনি ইহুদি পরিবারে জন্মেও পরে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। চটে গিয়ে হেবার এমন কথাও আইনস্টাইনকে বললেন যে, ইহুদি স্বার্থরক্ষায় ওঁর এমন পদক্ষেপ জার্মানিতে বসবাসকারী ইহুদিদের আরও বেশি ঘৃণার পাত্র করে তুলবে খ্রিস্টানদের চোখে। উল্টে আইনস্টাইন চিঠি লিখলেন তাঁর এক ডাচ বন্ধু হেনড্রিক আনটুন লরেঞ্জকে— 'জেরুজ়ালেম শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এই অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ আমার ভাল লেগেছে। আমার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। এক জন ইহুদি হিসেবে আমি মনে করি, এটা সফল হওয়ার জন্য আমার যত দূর সম্ভব চেষ্টা করা উচিত।'

যাই হোক, হিবেন-কে আবার চিঠি লিখলেন আইনস্টাইন: 'জেরুজ়ালেম শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে আমি বাধ্য হচ্ছি মার্চের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা ভ্রমণে। ওই সময় প্রিন্সটনে কয়েকটা বক্তৃতা দিতে পারি। অবশ্য যদি আপনি সে রকম ইচ্ছা করেন।... প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ছাড়াও ইয়েল, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস থেকে আমাকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে আমার সময় কম বলে এবং আপনাদের তরফে প্রথমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে শুধু আপনাদের ওখানেই আমি বক্তৃতা দিতে চাই।'

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জন হিবেন

হিবেন-কে আইনস্টাইন ওই চিঠি লিখলেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি। আইনস্টাইন বক্তৃতার সাম্মানিক কমাতে রাজি হয়েছিলেন কি না, তা জানি না। তবে তাঁর চিঠি পেয়ে হিবেন এ বার রাজি হলেন বক্তৃতার জন্য। আইনস্টাইন ইহুদি দলের সঙ্গে আমেরিকা পৌঁছলেন ১ এপ্রিল। ওঁদের ও দেশে থাকার কথা দেড় মাস। উপকূলবর্তী শহরে ইহুদিদের নিজেদের একটা দেশ এবং হিব্রু ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবেন আইনস্টাইন, আর অর্থসাহায্য সংগ্রহ করবেন। পরদিন 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ বেরোল রিপোর্ট। লেখা হল, জাহাজঘাটায় হাজার হাজার মানুষ চার ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন আইনস্টাইনকে আমেরিকায় স্বাগত জানাতে। ইহুদিদের দলনেতা কাইম ওয়াইজ়মান, যিনি পরে ইজ়রায়েল রাষ্ট্র গঠিত হলে তার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন, রিপোর্টারদের বললেন, "হিব্রু ইউনিভার্সিটির স্বার্থে আইনস্টাইন আমাদের সঙ্গে আসায় আমরা সম্মানিত বোধ করছি। আমরা অনেক দিন ধরে ভেবেছি, জেরুজ়ালেম শহরে একটা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে এক জন হিব্রু বিদ্যার্থী নিজেকে পরিপূর্ণ বিকশিত করার সুযোগ পাবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করতে পারবে।' আইনস্টাইন বললেন, 'জেরুজ়ালেম শহরে হিব্রু ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মতো এত আনন্দ আমি আর কিছুতে পাই না।"

আইনস্টাইনের ইচ্ছে আমেরিকা ভ্রমণের পুরো সময়টা অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতে। ওয়াইজ়মান ওঁকে বোঝালেন, কিছু আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে রিলেটিভিটি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে। তাতে ওঁদের অর্থ সংগ্রহের কাজটা এগোবে। প্রস্তাব মনে ধরল আইনস্টাইনের। ১৫ এপ্রিল প্রথম বক্তৃতা দিলেন তিনি। নিউ ইয়র্ক শহরে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। তিন দিন পর দিলেন এক বক্তৃতামালা। চারটে লেকচার। সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কে দ্য স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি, দ্য ডেভলপমেন্ট অব দ্য স্পেশাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি, দ্য জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশন এবং দ্য ইথার অ্যান্ড রেডিয়েশন।

আইনস্টাইন এর পর এসে পৌঁছলেন শিকাগো শহরে। সেখানকার ফ্রান্সিস পারকার স্কুলে বক্তৃতা দিলেন তিনি। আইনস্টাইন আশা করেছিলেন, ওই শহরে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা হবে— এক জন রবার্ট অ্যান্ড্রুজ় মিলিকান এবং অন্য জন আলবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন। মিলিকান ইলেকট্রন কণার চার্জ আবিষ্কার করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। আর মাইকেলসন কল্পিত ইথারের অনস্তিত্ব ১৮৮৭ সালে পরীক্ষায় প্রমাণ করে বিখ্যাত হন। মাইকেলসন তখন বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের দেখা হল না। কিন্তু মিলিকান তখন দেশেই ছিলেন এবং আইনস্টাইনের বক্তৃতা শুনতেও এসেছিলেন। তিনি তখনও ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক)-এর প্রেসিডেন্ট হননি। আর ইথারের অনস্তিত্ব? সে সম্পর্কে পরে আসছি।

এর পর প্রিন্সটন। ৯ থেকে ১৩ মে— এই পাঁচ দিন লেকচার। প্রথম দিন ৯ মে, ১৯২১। সোমবার। বক্তৃতার আগে এক অনুষ্ঠানে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির তরফে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হল আইনস্টাইনকে। হিবেন বললেন, "আপনার লেখায় আপনি সাহসী চিন্তা করে অনুমান করেছেন এক সীমিত অথচ উন্মুক্ত বিশ্বের সম্ভাবনা। বিশ্ব সীমিত না সীমাহীন, তা আমি জানি না। তবে নিশ্চয়ই একটা জগৎ আছে, যে জগতের কোনও সীমানা নেই। সে জগৎ ভাবনার। আর অবশ্যই সে জগতের অংশীদার আপনি।" আইনস্টাইনকে ডক্টরেট দিয়ে ইউনিভার্সিটির ডিন অ্যান্ড্রু ওয়েস্ট বললেন, "আপনি জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, আইজ়্যাক নিউটন, গালিলিও গালিলেই এবং পিথাগোরাসের সার্থক উত্তরসূরি। আপনি আমাদের যুগের অগ্রগণ্য তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী। ... জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি আপনার খ্যাতির মূলে। ওই তত্ত্ব স্পেস আর টাইম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা... আলো এবং মহাকর্ষ সম্পর্কে নতুন ধারণা... জাড্য এবং মহাকর্ষ এই দুই রহস্যকে একাকার করে দিয়েছে।"

ওয়েস্ট তাঁর ভাষণ শেষ করলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানিতে আইনস্টাইনের সাহসী ভূমিকার উল্লেখ করে— "আপনাকে কুর্নিশ জানাই আপনি যে ভাবে বিপদ উপেক্ষা করেও জার্মানির বেলজিয়াম আক্রমণ করা মেনে নেননি।" এই মন্তব্য নিশ্চয়ই 'টু দ্য সিভিলাইজ়ড ওয়ার্ল্ড' বা ম্যানিফেস্টো অব দ্য নাইন্টিথ্রি সম্পর্কে। ওই

ইস্তাহারে (যার শিরোনাম ছিল 'টু দ্য সিভিলাইজ়ড ওয়ার্ল্ড') জার্মানির ৯৩ জন বুদ্ধিজীবী (অধ্যাপক, বিজ্ঞানী প্রমুখ) জানান, তাঁরা জার্মানির সেনাবাহিনীর পক্ষে। সেনারা যে কলা এবং সংস্কৃতির নিদর্শন ধ্বংস করছে, তা তাঁরা মানেন না। বরং বিশ্বাস করেন, আগ্রাসন না থাকলে জার্মান শিল্প-সংস্কৃতি মুছে যেত। আইনস্টাইন ওই ইস্তাহারের প্রতিবাদ করেন। তাতে স্বাক্ষর করেন না। চিকিৎসাবিজ্ঞানী জর্জ নিকোলাই এবং আইনস্টাইন পাল্টা ইস্তাহার প্রকাশ করেন। 'ম্যানিফেস্টো টু দ্য ইউরোপিয়ান্স'। ওতে নিন্দা করা হয় ম্যানিফেস্টো অব দ্য নাইন্টিথ্রি-তে প্রকাশিত উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের। যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমর্থন করে। আইনস্টাইন এবং নিকোলাই হলেন প্যাসিফিস্ট, অর্থাৎ শান্তিকামী। তাঁরা যুদ্ধ সমর্থন করেন না। সমর্থন করেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সে কারণে নিন্দা এবং সমালোচনা সহ্য করেও উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ করেন আইনস্টাইন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যখন আইনস্টাইন আমেরিকা পৌঁছলেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি টাটকা। তাই ওয়েস্ট ও কথা বলেছিলেন।

স্থানীয় সংবাদপত্রে আইনস্টাইনের আমেরিকা আগমন এমন ভাবে কভার করা হল, যেন তিনি এক জন ভিভিআইপি। প্রিন্সটনের অদূরে নিউ ইয়র্ক শহর। ওখান থেকে প্রকাশিত প্রতিটি খবরের কাগজ রিপোর্ট করল তাঁর প্রতিটি কথা। যেমন, বিজ্ঞান গবেষণা আমেরিকায় এগিয়ে চলেছে, অথচ ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্থিতাবস্থা এসেছে। যেমন, সব থিয়োরির মতো রিলেটিভিটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রমাণাভাবে। কেমন প্রমাণ? আইনস্টাইন তুললেন গ্র্যাভিটেশনাল রেডশিফ্ট-এর প্রসঙ্গ। তিনি যে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন, তা অনুযায়ী, প্রচণ্ড গ্র্যাভিটির মধ্যে পড়লে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। মানে, তা লাল আলোর কাছে চলে যায়। একে বলে গ্র্যাভিটেশনাল রেডশিফ্ট। আইনস্টাইন রিপোর্টারদের বললেন, গ্র্যাভিটেশনাল রেডশিফ্ট যদি না দেখা যায়, তা হলেই জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি বাতিল হয়ে যাবে। সূর্যের গ্র্যাভিটি প্রচণ্ড। সূর্যের আলোর মধ্যে সব রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি না বাড়ে, তা হলে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ব্যস! রিপোর্টাররা লিখে দিলেন, আইনস্টাইন বলছেন, তাঁর থিয়োরি বাতিলযোগ্য!

ইজ়রায়েলের প্রেসিডেন্ট কাইম ওয়াইজ়মান

কিন্তু, ওই পর্যন্তই। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আইনস্টাইনের বক্তৃতার বিন্দুবিসর্গও সাংবাদিকরা বুঝতে পারলেন না। কারণ, তা যথেষ্ট জটিল। বক্তৃতার আগে ৬০০ আমন্ত্রণপত্র ছাপা হয়েছিল। সে সব বিতরণও করা হয়েছিল। অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন ৩০০ বিজ্ঞানী। কিন্তু বক্তৃতার দিন যত এগোল, শ্রোতার সংখ্যা ততই কমে গেল। কমবেই, কারণ বক্তব্য জটিল যে! বক্তৃতার দ্বিতীয় দিনেই শ্রোতার সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। হকিংকে দেওয়া গাজার্ডির পরামর্শ মনে পড়ছে? তৃতীয় দিনে হলঘরের বদলে আইনস্টাইন বক্তৃতা দিলেন ছোট্ট একটা ক্লাসরুমে। তাতেও থেমে থাকল না ব্যাপারটা। দু'-তিন জন করে বিজ্ঞানী কমতে থাকল শ্রোতার সংখ্যা থেকে। এতই জটিল সে বক্তৃতা!

এমন পরিস্থিতিতে পড়ে, রিপোর্টাররা যা করার তাই করলেন। কোনও বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী বুঝেছেন আইনস্টাইনের বক্তৃতার, তার পর তাঁর কথা শুনে লেখা। যেমন, 'দ্য নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' কাগজে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হল ১২ মে তারিখে, তা এ রকম : ওই কাগজের রিপোর্টার ধরেছিলেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গণিতের অধ্যাপক এল পি আইসেনহার্ট-কে। ওঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আইনস্টাইনের তথ্য ঠিক, না বাগাড়ম্বর। তিনি যা বলেন, তা হল : আইনস্টাইনের তত্ত্বের মধ্যে কিছু আছে কি না, সে প্রশ্ন অনেক বার তোলা হয়েছে। যত নতুন নতুন পরীক্ষার ফল জানা যাবে, তত নতুন নতুন ভাবে বাস্তবে ব্যাখ্যা করা হবে তত্ত্ব। তবে বাস্তব জগতের তত্ত্ব হিসেবে ফিজ়িক্স আর জ্যামিতির সম্পর্ক হয়তো স্থায়ী প্রভাব ফেলবে।

রিলেটিভিটি আদ্যন্ত বিজ্ঞানের তত্ত্ব। এর সঙ্গে মরালিটি বা নীতিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ এ তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক ভুল ধারণা চালু হয়ে যায়। এভরিথিং ইজ় রিলেটিভ— এই যেন রিলেটিভিটির নির্যাস। ফলে, কোনও কিছুই শ্রেয় বা ভাল নয়, তুলনা বা বিচার করলে সব কিছুই মেনে নেওয়া যায়— এ রকম একটা ধারণা রিলেটিভিটি সম্পর্কে চালু হয়ে যায়। সেটা ঠিক নয়। 'দ্য নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' কাগজের রিপোর্টার এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক ই জি স্পলডিং-এর কাছে। ১৩ মে তাঁর মন্তব্য প্রকাশিত হল ওই দৈনিকে। তিনি বললেন, 'আইনস্টাইনের তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই নীতিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বের সমস্যার সঙ্গে, দর্শনশাস্ত্রের সমস্যাগুলির সঙ্গে। এই নতুন তত্ত্ব কোনও ভাবে মরালিটির সঙ্গে যুক্ত নয়। মানুষ কতটা ভাল, এ প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটিভিটির কোনও সম্পর্ক নেই।'

লেকচার দিতে আইনস্টাইন যে দিন প্রিন্সটন গিয়ে পৌঁছলেন, সে দিনই তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর সঙ্গে এক মউ স্বাক্ষর করলেন। লেকচার বই হিসেবে বেরোবে এবং ইউনিভার্সিটি প্রেস তা ছাপবে। বই প্রকাশের ছ'মাসের মাথায় প্রেস আইনস্টাইনকে ১৫ শতাংশ বই বিক্রির রয়্যালটি দেবে। আর আইনস্টাইন ছ'কপি বই বিনে পয়সায় পাবেন। পাঁচ বছর পরে যদি প্রেসের বিচারে বই বিক্রি লাভজনক না হয়, তা হলে এই চুক্তি বাতিল হবে। প্রেসের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রেসের ম্যানেজার পল টমিলসন। ছেপে বেরনোর পর কখনও সে বইয়ের আকর্ষণ কমেনি। হোক না জটিল, তবু যাঁরা গণিত দিয়ে রিলেটিভিটি বুঝতে চান, তাঁদের কাছেও বইয়ের আকর্ষণ চিরকালই তুঙ্গে। আজও ওই বই মুদ্রিত হয়ে চলেছে।

লেকচার দিতে আইনস্টাইন যখন প্রিন্সটনে, তখনই খবর পেলেন ক্লিভল্যান্ড শহরে কেস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ডেটন ক্ল্যারেন্স মিলার, মাউন্ট উইলসনের মানমন্দিরে পরীক্ষা করে কল্পিত ইথারের চলন শনাক্ত করতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইথার এক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, বিশ্বের পরিব্যাপ্ত ইথার মাধ্যম। পৃথিবীও সাঁতার কেটে চলেছে ইথারের মধ্যে। ইথারের যে অস্তিত্বই নেই, সেটা রিলেটিভিটি তত্ত্বের মূলে। ইথারের অনস্তিত্ব ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন এবং এডওয়ার্ড উইলিয়ামস মোরলে। এখন আইনস্টাইন ওঁদের পরীক্ষার ফলাফল জেনে রিলেটিভিটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন কি না, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। আইনস্টাইন নিজেও এ ব্যাপারে নানা কথা বলেছেন। যাই হোক, ইথার এত বড় ধারণা যে, বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরে বারবার পরীক্ষা করেন। বারবারই পরীক্ষায় ইথারের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষায় প্রমাণ করেন মিলার। আইনস্টাইন মিলারের পরীক্ষার ফলাফলের খবর পেয়ে বিখ্যাত মন্তব্যটি করেন, যা তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। 'রাফিনির্য়েট ইসট ডার হ্যেরগট, আবের বোশাফট ইসট এর নিখট।' মন্তব্যটি এত বিখ্যাত যে, তা খোদাই করা আছে প্রিন্সটনের গণিত বিভাগের কমনরুম ফাইন হলে। ওই জার্মান বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ, 'শাটল ইজ় দ্য লর্ড,
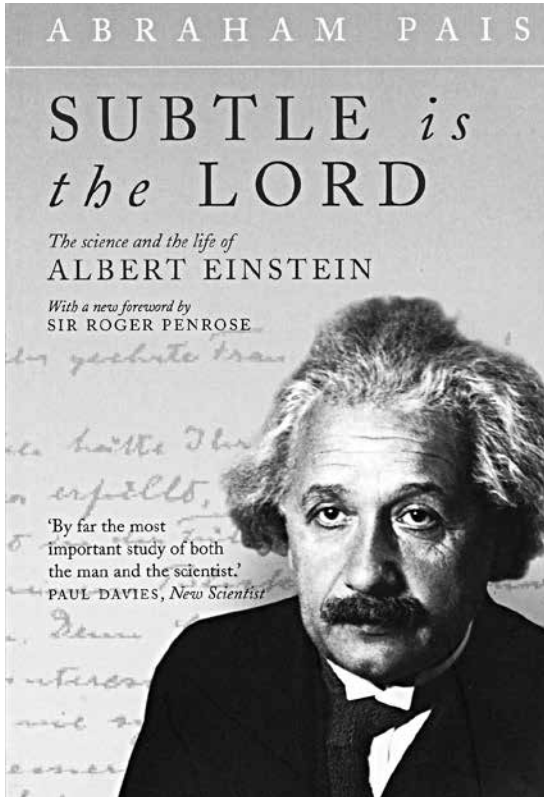
আব্রাহাম পায়াসের লেখা আইনস্টাইন-জীবনী

বাট ম্যালিশাস হি ইজ় নট।' প্রায়ই ওই জার্মান বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ এমনও হয়ে থাকে, 'গড ইজ় ক্লেভার, বাট নট ডিজ়অনেস্ট'। ওই অনুবাদ ঠিক নয়। প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি, যেখানে জীবনের শেষ তিন দশক কাটিয়েছিলেন আইনস্টাইন, সেখানে ওঁর সহকর্মী ছিলেন বিজ্ঞানী আব্রাহাম পায়াস। সেই পায়াস যে জীবনী লিখেছিলেন আইনস্টাইনের, তার শিরোনাম দিয়েছিলেন, 'শাটল ইজ় দ্য লর্ড... : দ্য সায়েন্স অ্যান্ড লাইফ অব আলবার্ট আইনস্টাইন'। বলা হয় বিজ্ঞানীরা খুশি হবেন ওই বই পড়ে। কারণ, ওই জীবনীতে যথাযথ বিজ্ঞানটা আছে। রিলেটিভিটির আগের বিজ্ঞান, পরের বিজ্ঞান, সবটা।

প্রিন্সটন ভ্রমণের পর আরও দু'সপ্তাহ আমেরিকায় কাটিয়ে আইনস্টাইন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হলেন। নামলেন ম্যানচেস্টারে। লন্ডনে, অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিলেন। গেলেন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে, সেখানে মালা দিলেন আইজ়্যাক নিউটনের সমাধিতে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বার্লিনে ফিরে এলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে তিনি প্রিন্সটন বক্তৃতামালা থেকে যে বই হবে, তার পাণ্ডুলিপিতে মন দিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে টমিলসন চিঠি লিখলেন আইনস্টাইনকে। লেকচার শেষ হওয়ার এক মাসের মাথায় প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর হাতে বইয়ের পাণ্ডুলিপি পৌঁছনোর কথা ছিল, তার কী হল? আইনস্টাইন কী উত্তর দেবেন? তিনি ছ'সপ্তাহের জন্য লেকচার ট্যুরে গেলেন ইটালি, সুইটজ়ারল্যান্ড এবং হল্যান্ড। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অন্য লেখায়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে শিশুদের কষ্ট বা বিজ্ঞান গবেষণা আটকে পড়ার ব্যাপারে।

পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে তিনি মন দিলেন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে। এর মধ্যে আইনস্টাইন যোগাযোগ করলেন জার্মান (ফ্রিডরিখ ভিউয়েগ অ্যান্ড সন), ইংরেজি (নিথুয়েন), ফরাসি (গথিয়ে-ভিলারস) ভাষার প্রকাশকের সঙ্গে। তাঁদের বলে রাখলেন, ওই সব ভাষায় বই বেরোবে আমেরিকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস বই ছাপানোর পরে। বইয়ের জার্মান এডিশনের প্রুফ সংশোধন করে দিলেন ইলসে রোসেনথাল। আইনস্টাইনের দ্বিতীয় স্ত্রী এলসা রোসেনথাল-এর মেয়ে। মূল জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভার আইনস্টাইন দিলেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ফিজ়িক্সের অধ্যাপক এডুইন প্লিম্পটন অ্যাডাম্স-কে। তিনিই আইনস্টাইনের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া বক্তৃতা জার্মান থেকে ইংরেজিতে তরজমা করে যাচ্ছিলেন। অ্যাডাম্স আইনস্টাইনকে চিঠিতে লিখলেন, বইটা যথেষ্ট জটিল হয়ে গেছে। দু'-একটা বিষয় ব্যাখ্যা করে পরিশিষ্ট জুড়তে পারলে ভাল হয়। অ্যাডাম্স পরিশিষ্ট লিখে দিতে রাজি। এখন আইনস্টাইন পরিশিষ্টে রাজি কি না, তা তিনি জানেন না। আইনস্টাইন পত্রপাঠ উত্তর দিলেন। তিনি পরিশিষ্টে রাজি। ১২ জানুয়ারি, ১৯২৩। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আমেরিকার বাজারে ছেপে বেরোল বই। 'দ্য মিনিং অব রিলেটিভিটি'। পরের বছর ১২ জানুয়ারি বেরোলেও কপিরাইটের জায়গায় লেখা থাকল ১৯২২। মানে ও বই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, এই ভাবে ধরা হয়। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস বইয়ের দাম রাখল দু'ডলার।

বইয়ের প্রথম জার্মান সংস্করণে নতুন ভূমিকা (যা ইংরেজি সংস্করণে নেই) লেখেন আইনস্টাইন। ওই ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'আমি ১৯২১ সালের মে মাসে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে যে লেকচারগুলো দিয়েছিলাম, তাতে রিলেটিভিটি তত্ত্বের প্রধান ধারণা এবং গণিত প্রকাশ করেছিলাম। সেগুলো এখানে বিশদে জানালাম। এখানে আমি কম প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো বাদ রাখার চেষ্টা করেছি। তবে মূল আইডিয়াগুলো এমন ভাবে পেশ করেছি, যাতে যাঁরা উচ্চতর গণিত জানেন, কিন্তু নতুন করে শিখতে চান না, তাঁদের কাছে একটা ভূমিকা হিসেবে দাঁড়ায়। এটা কোনও ভাবেই সমগ্র তত্ত্ব নয়। আমি এখানে ক্যালকুলাসের গূঢ় এবং কৌতূহলোদ্দীপক ধারণাগুলোর কথা বলিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বের মূল ধারণাগুলি স্পষ্ট করা।' ইংরেজি সংস্করণ? আইনস্টাইনের জীবদ্দশাতেই প্রত্যেক সংস্করণে নতুন কিছু যোগ করেন তিনি। আসলে তখন জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি নতুন কনসেপ্ট। সে সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। সে সব মতের উত্তর দিতে হয় আইনস্টাইনকে। তাই প্রত্যেক সংস্করণে নতুন নতুন সংযোজন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শুরুতে আইনস্টাইনকে জানানো হয় যে, তিনি আগের বছরের জন্য ফিজ়িক্সে নোবেল প্রাইজ় পাচ্ছেন। ওঁকে নোবেল প্রাইজ় দেওয়া হচ্ছে ওঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি-র জন্য নয়, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত ওঁর ফোটোইলেকট্রিক এফেক্টের (আলোর ধাক্কায় ধাতুর পাত থেকে কণা বেরোনো) জন্য। আসলে, তখনও জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি এক বিতর্কিত কনসেপ্ট।

হ্যাঁ, 'দ্য মিনিং অব রিলেটিভিটি' একটা খটোমটো বই। অন্তত যাঁরা গণিত জানেন না, তাঁদের পক্ষে। পাতায় পাতায় ফর্মুলা, তবু এখনও বই বিক্রি হচ্ছে। সমানে এডিশনের পর এডিশন হচ্ছে। দেখেশুনে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর রজার পেনরোজ়-এর কথা মনে পড়ছে। হকিং যখন 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' লেখেন, তখন গাজার্ডি ওঁকে পরামর্শ দেন যে, একটা ফর্মুলা মানে বইয়ের বিক্রি অর্ধেক। আর মানুষের তৈরি কম্পিউটার যে কোনও দিন বুদ্ধিমান হতে পারবে না— এ বিষয়ে পেনরোজ় একটি বই লেখেন। 'দ্য এমপেরর'স নিউ মাইন্ড: কনসার্নিং কম্পিউটর, মাইন্ডস অ্যান্ড দ্য লজ় অব ফিজ়িক্স'। 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' প্রকাশের পরের বছরই, অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে। 'দ্য এমপেরর'স নিউ মাইন্ড'-এর পাতায় পাতায় ফর্মুলা। তা সত্ত্বেও বইটি বিক্রি হয় খুব। কেমন বিক্রি? পাবলিশারের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন স্যর রজার, যদি রয়্যালটি থেকে কিছু পাউন্ড প্রাপ্য হয় তাঁর। পাবলিশারের তরফে জানানো হয়, তাঁর যে অর্থ প্রাপ্য, তা দিয়ে একটা গাড়ি কিনতে পারবেন তিনি!

আসলে ফর্মুলা থাকলেই যে বই আদৌ বিক্রি হবে না, তেমন নয়। এক এক ধরনের বইয়ের বাজার এক এক রকম। বাজার ধরার নিশ্চিত ফর্মুলা বোধহয় আজও অধরাই!

অপাপবিদ্ধা

তিলোত্তমা মজুমদার

নরম চোখে দেখছে নীলপর্ণা। সামনে নিশ্চল শায়িত বুবকা। তার স্বামী। এই সে দিনও সে নিজে গাড়ি চালিয়ে পর্ণাকে আপিসে পৌঁছে দিয়েছে। এখনও বিশ্বাস হয় না বুবকা বুঝছে না কিছুই, শুনতেও পাচ্ছে কি না জানে না পর্ণা। কারণ, বুবকার মুখ অসাড়। সে কথা বলতে পারছে না। এমনকি, নয়নতারা অবধি স্থির। পায়ের দিক সামান্য নাড়াতে পারছে। কিন্তু হাত অচল। অসুখটাই এমন। প্রথমে ঘাড়, কাঁধ, হাত, মুখ, পিঠ আক্রমণ করে। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে দ্রুত নীচের দিকে নামে। অদ্ভুত অসুখ। হঠাৎ এক দিন অফিসে কাজ করতে করতে অচেতন হল। এক সময় জেগে উঠল, কিন্তু আর কথা বলতে পারল না। মুখ বেঁকে ঙ হয়ে গেছে। টিকোলো নাকটা মনে হচ্ছে চূড়া ভেঙে যাওয়া পাহাড়। ঝকঝকে সুন্দর মানুষটা যেন ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া গ্রাম। নীলপর্ণা সেই গ্রামের এমন এক অক্ষত বৃক্ষ, যার শোক করার উপায় নেই। তাকে ছায়া দিতে হবে। দিতে হবে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও টিকে থাকতে পারার আশ্বাস। তাই সে নিজেই আঁকড়ে ধরেছে নিজের শক্ত শাখা। প্রথম দিকে, তখনও হাত অসাড় হয়নি, বড় হাসপাতালের নামী ডাক্তার দেখে বললেন, “বেলস পলসি। ভয়ের কিছু নেই। উদ্বেগ, মানসিক যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা কিছু আছে?”

নিরুদ্বিগ্ন মানুষ কি পাওয়া সম্ভব এখন? যত

গুরুদায়িত্বের কাজ, তত মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম। কিন্তু সবাই ধরে নিচ্ছে, বুবকার সঙ্গে নীলপর্ণার সম্পর্ক এর জন্য দায়ী। বাইরে থেকে দেখে যতই সুখী মনে হোক, ভিতরে নিশ্চয়ই অশান্তি আছে। এখনও একটা বাচ্চা হল না। নাকি নেবে না? আজকাল মেয়েরা চাকরি নিয়ে মেতে থাকতেই পছন্দ করে। আত্মীয়-পরিজন বুবকার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল, নীলপর্ণার প্রতি বিরক্তি ও সন্দেহ। ডাক্তারেরও ধারণা হল, পারিবারিক অশান্তির প্রভাব অস্বীকার করছে নীলপর্ণা। কে কী ভাবল পরোয়া করবে না স্থির করলেও ভিতরে ক্ষোভ নিঃশব্দে গুমরোয়।

চিকিৎসা সত্ত্বেও কয়েক দিনের মধ্যে অসাড়তা ও যন্ত্রণা বেড়ে উঠল অনেকখানি। অসহ্য সেই দৃশ্য। হাত নাড়াতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চাইছে যন্ত্রণায়। দৃষ্টি এত কাতর, নীলপর্ণার মনে হয়েছিল, বুবকা বলতে চায়, এই যন্ত্রণার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কী হল ওর? দিশাহারা, বিনিদ্র নীলপর্ণা দ্বিতীয় পরামর্শের জন্য আরও এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হল। ভারত জোড়া খ্যাতি তাঁর। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। তিনি বুবকাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, "বেলস পলসি নয়। এটা অন্য রোগ। অনেকেই একে ক্যান্সার বলে ভুল করে। আজ পর্যন্ত মাত্র তিন জনের এই রোগ দেখেছি। দু'জন দশ বছরের যমজ ভাই, আর এক জন ওঁর মতো। ছোটবেলাতেই এই রোগ হওয়ার কথা। কিংবা ষাটের পরে। জিন মিউটেশন যে কখন কী করে বসে, বলা মুশকিল।"

"ও ভাল হয়ে যাবে তো?"

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে ছিলেন। নিরুত্তাপ বললেন, "ওষুধগুলো খাইয়ে যান। বয়স খুব বেশি নয়, আশা করছি সুস্থ হয়ে যাবেন। মানে, ওই যে বললাম, অসুখটা এই মধ্য তিরিশে হয় না সাধারণত। ভাল হতে হয়তো বেশ কিছুটা সময় নেবেন। ধৈর্য ধরতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ওটা বাড়লে সমস্যাও বাড়বে।"

আরও নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন তিনি নীলপর্ণাকে। রোগী যে ঘরে থাকবে, সেখানে গান বাজানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুমধুর বাজনা বা সুরেলা কণ্ঠে ধ্রুপদী সঙ্গীত খুব মৃদু শব্দে বাজবে দিনে অন্তত চার ঘণ্টা। সেই শব্দতরঙ্গের অভিঘাত বুবকার মস্তিষ্ক ও স্নায়ু উজ্জীবিত করবে।

"তা হলে ও শুনতে পাচ্ছে?" পর্ণা জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার বললেন, "ধরে নিতে হবে উনি দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন।"

কুড়ি দিন প্রায় সাততারা হোটেলের মতো এক বেসরকারি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা হল বুবকার। যত দূর বুঝেছে সে, বুবকার শরীরে পেশি ও অস্থি সংযোগকারী কোষকলা ও কন্ডরা কঠিন হাড়ের মণ্ড হয়ে যাচ্ছে। দ্রুতবিস্তারী অস্থিভবন। আন্তর্জালে খোঁজ করে সে দেখেছে, এই রোগের নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, সেরে উঠবে বুবকা। বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দিন নীলপর্ণা অসহায়ের মতো প্রশ্ন করেছিল, "এফ ও পি, মানে ওই মাঞ্চমেয়ের রোগীকে ফিজ়িওথেরাপি করালে হয় না?"

"হয়তো হয়। কিন্তু সব কিছুর একটা সময় লাগে। দয়া করে নেট ঘেঁটে ডাক্তারকে ডাক্তারি শেখাবেন না। ওটাও একটা অসুখ। জানেন তো? সাইবারকন্ড্রিয়া। হাইপোকন্ড্রিয়াও বলা যায়। ওতে শুধু টেনশন বাড়ে।"

"না না। আমি আপনাকে শেখাতে যাচ্ছি না। ক্ষমা করবেন ডক্টর।"

"দেখুন, ওঁর পায়ের দিক ভাল আছে কিছুটা। যখন ব্যায়াম করানোর প্রয়োজন হবে, আমি বলব। ওঁর অসুখটা এমন, এতটুকু ভুল হলে সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়ে যাবে।"

নীলপর্ণা নমস্কার করে বেরিয়ে এসেছিল। দশ দিন হল হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে বুবকা। সে কি বুঝতে পারছে, সে নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে?

এই দশ দিন রাতের আয়া রাখেনি নীলপর্ণা। নিজেই করেছে যা করার। দশ দিনে তিন বার দিনের আয়া পাল্টাতে হয়েছে। নির্মেদ, পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি, চৌত্রিশ বছরের বুবকার শুশ্রূষা সহজ নয়। রান্না ও সংসার ধরে রাখে যে গীতামাসি, তার বয়স তিন কুড়ি দুই। কোনও স্বাস্থ্যবান যুবকের সেবা-শুশ্রূষা করবে কী করে? খুব তাড়াতাড়ি ভাল এক জনকে পাওয়া দরকার। নীলপর্ণাকে এ বারে কাজে যোগ দিতে হবে। ছুটি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সে বুবকার মাথায় হাত রাখল। ফিসফিস করে বলল, "সোনা, সেরে ওঠো। প্লিজ়।"

দরজা-ঘণ্টি বাজল। গীতামাসি এসে বলল, "যার আসার কথা ছিল, এসেছে। বসতে বললাম, তা বলে, 'না থাক।' বাইরেই দাঁড়ে আছে। কেমন যেন!"

"আমি আসছি। ওকে এক বার ইউরিনাল ধরে দিয়ে যাই।"

"যেমন তোমার কপাল। এই কি তোমার কাজ? হুঁহ!" মুখখানা গোমড়া করে চলে গেল গীতামাসি। আজ সকাল থেকে কোনও আয়া নেই। নীলপর্ণার সযত্ন পরিশ্রম দেখে দুঃখ হয়েছে তার। কত লেখাপড়া জানা মেয়ে, কত বড় চাকরি করে, সে কি আয়ার কাজ পারে? কিন্তু করছে দ্যাখো, যেন কতকালের অভিজ্ঞতা। স্বামীকে যেন চোখে হারায় মেয়েটা। গীতামাসি দরজার কাছে গিয়ে চশমা ঠিকঠাক করে বলল, "আসতেছে। ভিতরপানে আসো তো ভালমানুষের মেইয়ে। তুমি বাইরে দাঁইড়ে থাকলে তো দরজা বন্ন করতে পারবনি।"

কাগজের তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে নীলপর্ণা এল। দু'জনেই দেখল পরস্পরকে। কর্মদাত্রী ও কর্মপ্রার্থিনী। বেশ লম্বাচওড়া মেয়েটি। এমনই চেয়েছিল নীলপর্ণা। ভাল স্বাস্থ্য, সৎ, সেবাশুশ্রূষা জানে, ওষুধের নাম পড়তে পারবে। নির্ভরযোগ্য। "আমরা নির্ভরযোগ্য লোকই দিই ম্যাডাম। আসলে সবাই সব জায়গায় মানিয়ে নিতে পারে না," আয়া সেন্টারের মেয়েটি বলেছিল।

"ভেতরে আসুন," নীলপর্ণা বলল। মেয়েটি সসঙ্কোচে বলল, "অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছি দিদি। পা অপরিষ্কার।"

"বেশ তো। ওয়াশরুমে গিয়ে পা-হাত ধুয়ে আসুন," নীলপর্ণা সরে দাঁড়াল।

মেয়েটি ভিতরে এসে এ-দিক ও-দিক দেখল। গীতামাসি তাকে বাইরের লোকের ওয়াশরুম দেখিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিল। কত জন এল গেল, কেউ কি টেকে? মানুষজন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। খাটবে না। আরে, ভগমান গতর দিয়েছে কিসের জন্য রে বাপু? যত আলসেকুটি। সে প্রার্থনা করতে লাগল, যাতে এই নবাগতা স্থায়ী হয়ে ওঠে।

নীলপর্ণা সোফায় বসল। মেয়েটি নিজেই টেনে নিল বেতের মোড়া। নীরবে ব্যাগ খুলে আধার কার্ডের জ়েরক্স, আয়া সেন্টারের পরিচয়পত্র ও থানা থেকে সই করিয়ে আনা শংসাপত্র নিচু কফি-টেবিলে রাখল।

"নাম কী আপনার?" নীলপর্ণা জিজ্ঞেস করল।

"প্রতিমা। প্রতিমা হালদার," বলল সে।

"সেন্টার থেকে বলেছে, কী ধরনের কাজের লোক চেয়েছি?"

"হ্যাঁ। বিছানায় শয্যাশায়ী রোগীর দেখাশোনা করতে হবে।"

"আমার স্বামী। ওর নাম বুবকা। দেখাশোনা বলতে একেবারে ছোট শিশুর মতো টেক কেয়ার করতে হবে। নাওয়ানো, খাওয়ানো, ওষুধ দেওয়া, বেডপ্যান দিয়ে সে সব পরিষ্কার করা, সব। পারবেন?"

"কী অসুখ? প্যারালিসিস?"

"না, এটা অন্য রকম। এই অসুখের নাম স্টোনম্যান সিনড্রোম।"

"কী? কী বললেন? স্টোনম্যান সিনড্রোম? কিছুই পারেন না?"

"না। কথা বলতে, ইশারা করতে, কিছু বোঝাতে, কিছুই পারে না।"

"সেন্টার বলল আপনি বারো ঘণ্টা চাইছেন। ক'টা থেকে ক'টা?"

"সকাল আটটার মধ্যে আসতেই হবে। আমি সাড়ে আটটায় বেরোব আপনি এলে। সন্ধ্যায় আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ফিরে আসব। আমি এলে আপনার ছুটি।"

"কত দেবেন?"

"আটশো পার ডে। যেমন কথা হয়েছে সেন্টারের সঙ্গে।"

"আরও দুশো করে বাড়িয়ে দিন। ওটা সেন্টারকে বলবেন না।"

"সে কী করে হয়? সে তো অন্যায়,

তাই না? ওরা আপনার-আমার উভয়েরই উপকার করছে।”

“আপনি তো ওদের ঠকাচ্ছেন না। হয়তো আমি ঠকাচ্ছি। আপনার বিবেকে লাগার কিছু নেই। পাপ হলে আমার হবে। ওরা টোয়েন্টি পারসেন্ট কেটে নেবে। তার পর প্রথম মাসের পেমেন্ট থেকে পাঁচ হাজার ওদের দিতে হবে। পুজোয় কোনও বাড়তি টাকা দেয় না। আমাকেও তো সংসার চালাতে হয় দিদি। ঠিক আছে। কিছু দিন আমার কাজ দেখে, তার পর না হয় দেবেন। আপনি তো আমাকে টিপস দিতেই পারেন। তাতে সেন্টারের কিছু বলার থাকে না। দেখুন, পুলিশের কাগজ দিয়েছি। আপনি হাজার টাকা ফেলে রাখলেও আমি চুরি করব না। অভাবের সংসার। কষ্ট করে চালাই। এই কাজগুলো পার্মানেন্ট কিছুও তো নয়। কী করব, বলুন?”

নীলপর্ণা ভাবল খানিক। বাড়তি ছ’হাজার টাকা যাবে। তবে এই মেয়েটি টিকে গেলে, সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। ভাল করে দেখল সে প্রতিমা হালদারকে। শ্যামলা, মোটের ওপর স্বাস্থ্য ভাল। টানটান ভাব। ছোটর ওপর ভাসা ভাসা দু’টি চোখ। তেল দেওয়া চুল উলটো করে কপাল থেকে টেনে খোঁপা করা। কপালে সিঁদুর। হাতে শাঁখা-পলা। হাতের নখ কাটা ও পরিষ্কার। বাঁধনি নকশা সুতির ছাপা শাড়ি পরেছে। মেয়েটির বক্তব্য স্পষ্ট। নীলপর্ণার তাকে খারাপও লাগল না, ভালও লাগল না। অপরিচিত এক জনের দায়িত্বে তার প্রিয়তম মানুষটিকে রেখে যেতে হবে। অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে সে জিজ্ঞেস করল, “কাল থেকে আসতে পারবেন? এলে ভাল হয়। আমি তা হলে কাজে যোগ দিতে পারি।”

“হ্যাঁ, পারব। আমি কি ওঁকে এক বার দেখতে পারি? ওষুধপত্র বুঝে নিতাম। অফিস বেরোবেন, কাল আপনার তাড়া থাকবে।”

“আসুন,” নীলপর্ণা প্রতিমা হালদারকে নিজের শোওয়ার ঘরে নিয়ে আসার আগে গীতামাসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, প্রতিমা দুপুরে এ বাড়ির খাবার খাবে কি না। প্রতিমা শান্তভাবে বলল, “যদি খাই, আপনি কি আমার পেমেন্ট থেকে খাবারের দাম কেটে নেবেন?”

“না।”

“খাব তা হলে।”

নীলপর্ণা বুবকার কাছে এসে তার হাত ধরে বলল, “শোনো, তুমি তো জানো, কাল থেকে বেরোতে হবে আমায়। ইনি প্রতিমা। তোমার দেখাশোনা করবেন।”

প্রতিমা বলল, “উনি শুনতে পান?”

“জানি না। আমি মনে করি পায়। তাতে আমার কাজের সুবিধে হয়। আসুন, আপনাকে সব বুঝিয়ে দিই। দু’বেলা ইনসুলিন দিতে হয়। দুপুরে আর রাতে খাওয়ার আগে। দুপুরেরটা আমি যাওয়ার আগে দিয়ে যাব।”

“আমি পারি। ইনসুলিন দিয়েছি আগে অনেক পেশেন্টকে। স্যালাইন দেওয়া, পাল্টানো, চ্যানেলে ওষুধ দেওয়া, ইঞ্জেকশন সব পারি। উনি কী ভাবে খান? চিবোতে পারেন?”

“না। তবে তরল খাবার অল্প অল্প করে মুখে দিলে গিলে ফেলতে পারে। অনেকটা সময় লাগে খেতে। ধৈর্য ধরতে হবে। ওষুধ দেবেন গুঁড়ো করে, জলে গুলে।”

“রাইলস টিউব দেননি ডাক্তার?”

“হাসপাতালে ছিল। ডাক্তার বললেন, অল্প যেটুকু অংশ স্বাভাবিক কাজ করছে, সেগুলো নিষ্ক্রিয় না করাই ভাল। যেমন, পা নাড়তে পারে। আপনি মাঝে মাঝেই পা ভাঁজ করে দেবেন, যাতে ও নিজে থেকে খুলে সোজা করে।”

“ঠিক।”

প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে নীলপর্ণা বলল, “দেখুন, রক্তচাপ মাপা ও ইনজেকশনের জন্য এক জন আসেন। তাঁকেই বলে দেব দিনের ইনসুলিন দিয়ে যাবেন। বাকি আপনার দায়িত্বে ওকে ফেলে যাব। প্রতি ঘণ্টায় আমাকে ফোন করে জানাবেন। ফোনের টাকা আমি দিয়ে দেব।”

“ফেলে যাবেন কেন? ওঁকে আমার দায়িত্বে রেখে যাবেন।”

॥ ২ ॥

একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আটটায় আসে প্রতিমা। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রোগীর পাশ ছেড়ে সে নড়ে না। এ ঘরের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে। “বিছানায় শয্যাশায়ী রোগীর সব কিছু পরিষ্কার রাখতে হয়,” সে বলে। এখন সে নীলপর্ণার ভরসা নিখুঁতভাবে অর্জন করছে ক্রমশ। বুবকার এত যত্ন, এমন প্রাণঢালা সেবা পর্ণা নিজেও করতে পারত কি না, সেই বিষয়ে অকপট সন্দেহ প্রকাশ করেছে সে প্রতিমার কাছে। প্রতিমা সবিনয়ে বলে, “রোগীর সেবা করাই তো আমার কাজ দিদি। এ কাজ তো আপনার নয়। আপনি করেন, সেই অনেক।”

ইনজেকশন দিতে আসে যে লোকটি, প্রায়ই তার সময়ের হেরফের হয়ে যায়। ইনসুলিন প্রয়োগের সময় মাপা। এর ওপর রোগীর খাওয়া ও ভোজন পরবর্তী ওষুধগুলি নির্ভরশীল। সব দেখেশুনে, পরখ করে, পর্ণা অবশেষে প্রতিমার ইনসুলিন প্রয়োগের দক্ষতা বিশ্বাস করেছে। অতএব সে এখন ইনসুলিন দিতে পারে। দক্ষতার সঙ্গে খাইয়ে দেয় বুবকাকে। প্রতি ঘণ্টায় বুবকার শায়িত দেহটি এ-পাশ ও-পাশ করে দেয় সে, যাতে শয্যাক্ষত হয়ে না যায়। সে এক যুবতী নারী, অপরিচিত যুবকের শরীরের সর্বাত্মক যত্ন নিতে তার দ্বিধা সঙ্কোচ নেই। “ষোলো বছর বয়স থেকে কাজ করছি। কত রকম রোগীর সেবা করলাম। আমার হাতে রোগী সেরে ওঠে দিদি। একটা নার্সিং হোমে ছিলাম দশ বছর,” সে শান্তভাবে বলে। তার অন্যান্য কথার মধ্যে ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি প্রায় নেই, ওই ‘বিছানায় শয্যাশায়ী’ ছাড়া। নীলপর্ণা এক দিন শুধরে দিল। সেই এক দিন সামান্য হেসেছিল মেয়েটি। এমন শান্ত বিষাদ যার, তাকে নিজের জীবনের বিষয়ে কোনও অভিযোগ করতে শোনেনি পর্ণা।

গীতামাসি, প্রতিমার কাজ দেখে তুষ্ট। বলল, “আমার যদি বয়সটা কম হত, গতরে বল পেতাম, বুবকাদাদার যত্ন করতাম সেই রকম করে। একটুও খাই-খাই নেই। নিজের থালা তো মাজেই, বুবকাদাদার থালা-বাসন মাজে, সিঙ্কে অন্য বাসন থাকলেও মেজে রাখে। সে দিন মোচা ছাড়াচ্ছি, বলে, আমাকে দাও মাসি, আমি তো বসেই আছি, বেছে দিই। এমন মেয়ে লাখে একটা। কিন্তু কপাল একেবারে ঘষা, বুঝলে। স্বামীর রোজগার নেই। শুধু অসুখ আর অসুখ। মেয়ে এগারো ক্লাসে পড়ে।”

ভোর ছ’টায় এসে নীলপর্ণাকে চা দেয় গীতামাসি। নিজেও নেয় এক কাপ। যাবতীয় গল্প করে। নিজের বাড়ির কথা, এ বাড়ির নানা প্রসঙ্গ। সে বাজার করে আনে। জামাকাপড় ধোলাইযন্ত্রে কেচে ইস্ত্রি করে রাখে। বাড়ি ধোয়ামোছা করে। তার সঙ্গে কথা বলার বহু বিষয় জমা থাকে। এখন যোগ হয়েছে প্রতিমা প্রসঙ্গ। গীতামাসি বলে, সে শোনে মাত্র। প্রতিমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তার আগ্রহ নেই। তবে মেয়েটি ভাল, মেনে নিয়েছে নীলপর্ণা। ডাক্তারের চিকিৎসায় আর প্রতিমার যত্নে চোখের মণি একটু একটু নড়ে উঠছে বুবকার। ডাক্তার বললেন, ভাল লক্ষণ।

ইদানীং রবিবার করে উৎসাহী আত্মীয়রা বুবকাকে দেখতে আসে। হয়তো বছর দু’-তিন যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, ফোনে কথা হয়েছে কদাচিৎ, তারাও সাগ্রহে আসছে। কত রকম মাসিপিসি, কত ভাইবোন কাকা পিসে বন্ধু। আহা রে, এই অল্প বয়সে এ কী হল? স্টোনম্যান রোগ? এ সব আবার কী গো? কোনও দিন শুনিনি তো। তাই বলো। কোটিতে একটা হয়। কতরকম যে রোগ পৃথিবীতে। স্টোনম্যান রোগ। কী থেকে হয় গো? আগে কিচ্ছু টের পাওনি? নিশ্চয় ওর অসুবিধে ছিল। তুমি বুঝতে পারোনি। হট করে একটা জলজ্যান্ত ছেলে পাথর হয়ে যাবে? স্টোনম্যান বলে একটা খুনি ছিল না? কেউ ধরতে পারেনি লোকটাকে। এই অ্যাত্ত বড় পাথর দিয়ে ফুটপাথে লোক মারত। একেবারে মাথা থেঁতলে মারত। বুবকার কি মারধোরের প্রবণতা ছিল?

কেউ না-কেউ আন্তর্জাল খুলে অনুসন্ধান করে। এই তোমাদের ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড দাও তো। এই তো! পেয়েছি! ফাইব্রোডিস্প্লাজিয়া অসসিফিকান্স প্রগ্রেসিভা। মাঞ্চমেয়ের ডিজ়িজ়। জিনবাহিত রোগ। আরে, এখানে তো বলছে এর চিকিৎসাই হয় না। বুবকা আর খুঁজে খুঁজে রোগ পেল না?

এই রকম রোগী বাড়িতে ফেলে রাখা কি ঠিক? কলকাতায় কি আজকাল ভাল চিকিৎসা হয় নাকি? কেউ কিচ্ছু জানে না। ওকে চেন্নাই নিয়ে যাও। না না। চেন্নাই কেন? ওই যে জায়গাটা, কী বলে, আরে বলো না, খ্রিস্টানদের টাকায় চলে যে! ওঃ, বেলোর? বেলোর না, বেলোর না। ভেলোর। ওখানে সব রকম রোগ সেরে যায়।

আরে ধুর, ভেলোর আগে ভাল ছিল। এখন সবচেয়ে ভাল হায়দরাবাদ আর বেঙ্গালুরু। দারুণ সব হাসপাতাল। বুবকাকে কিন্তু নিমহান্সেও নিয়ে যাওয়া যায়। আরও ভাল হয় সিঙ্গাপুর গেলে। মেডিক্লেম আছে? অফিস থেকে খরচ দেবে?

গীতামাসি অতিথিদের চা-জলখাবার দেয়। প্রতিমা সাহায্য করে। তোমার লোকগুলো খুব ভাল পেয়েছ। মন্তব্য আসে ফিসফিসিয়ে। কত করে নেয়? রোজ এক হাজার? কতক্ষণ থাকে? এত? মাসে চল্লিশ হাজার তো কাজের লোকের পেছনেই চলে যায়। দু'জনেই খায়? ওরা তো খায়-ও রাক্ষসের মতো। আলাদা চাল কেনো? বুবকাকে অফিস থেকে মাস গেলে মাইনে দেবে?

প্রশ্ন। মন্তব্য। উপদেশ। কৌতূহল। অর্থহীন প্রসঙ্গ। চলতে থাকে, চলতেই থাকে। সপ্তাহে একটিমাত্র ছুটির দিন, লৌকিকতায় চলে যায়। গীতামাসি গজগজ করে, "সব এসে বসে গাবজাবে। কাজের লোকের পেছনে চল্লিশ হাজার। তাতে তোমাদের কী? কেউ কি চাইতে যাচ্ছে? তুমি কি খরচা দেবে যে অত খোঁজ নিচ্ছ? এদের বাড়িতে আমার তিরিশ বচ্ছর। বুবকাদাদা আমার বুকে বড় হয়েছে। কত দেখলাম! কত হচ্ছে!"

প্রতিমা শান্ত ভাবে বলল, "প্রথম প্রথম আসে সবাই।"

এক মাস হলে দু'দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হল বুবকাকে। নানা রকম পরীক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার দিন বুবকাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার জন্য আত্মীয়দের কাউকে পাওয়া গেল না। এক বন্ধু আসবে বলেছিল। যানজটে আটকে গেল। গীতামাসির দুই রিকশাচালক ছেলে সাহায্য করে গেল। প্রতিমা সারাক্ষণ নীলপর্ণার সঙ্গে সঙ্গে থাকল। নীলপর্ণার মনে হল, সে এই মেয়েটিকে ভরসা করছে। ভরসা আদায় করতে পেরেছে এ। নিজের কথা একেবারে বলে না। কোনও বাড়তি কৌতূহল দেখায় না, শান্তভাবে কর্তব্য করে যায়। বুবকাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার দিন সে বলল, "রোগটা কম হয় ঠিক কথা। কিন্তু আমার চেনা এক জনেরও হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় বিছানায় পড়ে আছে। কত দাম সব ওষুধের, কেনার সামর্থ্য নেই।"

নীলপর্ণা বলল, "সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারো।"

"নিয়েছিল। ওখানেও সব ওষুধ দিতে পারে না। কিনতে হয়। একমাস বেড়ে রেখেছিল। ওষুধ কোম্পানির লোকদের থেকে বলে-কয়ে ডাক্তারবাবু অনেক ওষুধ দিয়েছেন। এ ভাবে আর কত দিন চালানো সম্ভব? ভেলোরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে অনেকে। কিন্তু সে তো অনেক হ্যাপা। বাড়ির লোককে ঘর ভাড়া করে থাকতে হবে। এমন অসুখ, কত দিনে সারবে কেউ বলতে পারে? ঘরের পুরুষমানুষ যদি অসুখে পড়ে, সব দায়িত্ব বৌয়ের ঘাড়ে এসে পড়ে। আমাদের মতো ঘরে জমানো টাকা কিছু থাকে না। মেডিক্লেম করার ক্ষমতাও নেই।"

"আপনার নিজের কারও হয়েছে এই অসুখ?"

"না না। চেনা এক জনের।"

"কোন হাসপাতালে নিয়েছিল?"

"নিয়েছিল কোথায় যেন! ঠিক জানি না।"

"সরকারি স্বাস্থ্যবিমার কার্ড নেই তাদের?"

"আছে তো। সেই কার্ডে নাকি এই রোগের চিকিৎসা হবে না। ক্যান্সারের হয় না যেমন।"

॥ ৩ ॥

গীতামাসি ক'দিন জ্বরে পড়েছে। কাজে আসতে পারেনি। নীলপর্ণা সকালে নিজে চা করে নিয়েছিল। স্নান করে বেরনোর আগে কর্নফ্লেক্স, কলা আর দুধ খেতে বসেছে। প্রতিমা এল। "ওঃ, আজ মাসি আসেনি?" বলল সে।

"না। জ্বর। খুব হচ্ছে চার দিকে। শুনুন, আপনি তো বুবকার খাবার করতে পারেন, কোথায় কী আছে দেখে নিয়ে বানিয়ে নেবেন। আর নিজের জন্য যা হোক কিছু রান্না করবেন।"

"দিদি, মাসি আসবে না, আমাকে এক বার ফোন করে বলবেন তো। আরও আগে চলে আসতাম আমি। আপনি নিশ্চিন্তে যান, আমি আপনার রাতের খাবার করে রাখব। দু'মাস হল দিদি। কোথায় কী আছে আমি জানি। যে ক'দিন মাসি আসবে না, আমি চলে আসব সকাল সকাল।"

"অসুবিধে হবে না তো?"

"না না। অসুবিধে কিসের?"

"দিদি, আপনি কি ওষুধ কিনে নিয়ে আসবেন? আর তিন দিনের আছে। কী দাম সব ওষুধের! একটা ক্যাপসুল, বারোশো টাকা। একটা আঠারোশো টাকা। ইনজেকশনের ওষুধ এক-একটা পঁচিশ হাজার, সাত হাজার, দশ হাজার করে। এগুলো সব আপনি কোম্পানি থেকে পাবেন? জানতে চাইলাম বলে কিছু মনে করবেন না দিদি। আপনি খুব বড় চাকরি করেন, বুঝতে পারি, কিন্তু খরচটা যে ভীষণ!"

"এ ধরনের কৌতূহল আমি পছন্দ করি না প্রতিমা। অসুখ হলে চিকিৎসা করতে হবে। তবে উন্নতি হচ্ছে দেখতে পেলে ভাল লাগে। সামান্য চোখের পাতা পড়ে আজকাল। তার বেশি কিছু তো এগোচ্ছে না। ভাবছি চেন্নাই নিয়ে যাব কি না। আর হ্যাঁ, কোম্পানি আমাদের মেডিক্যাল বেনিফিট দেয়। তার কিছু কাটছাঁট করে। অনেক নিয়ম আছে। আপনার জানা কিছু জরুরি নয়। ঠিক আছে? আমি বাড়ি ফেরার আগে ওষুধ নিয়ে আসব। দেখুন, ফাইলে প্রেসক্রিপশনের কপি আছে, এনে দিন আমাকে।"

"রাগ করলেন দিদি? আর এরকম করব না। কম ঘাটের জল তো খেলাম না দিদি, আপনি এত ভাল, আপনার জন্য কষ্ট হয়। দেখবেন, উনি ভাল হয়ে যাবেন। ডাক্তার তো বললেন, অল্প অল্প করে সেরে উঠবেন। কত বড় ডাক্তার। কত বিলিতি ডিগ্রি।"

"হ্যাঁ। উনি খুব বড় ডাক্তার। আপনার সেই পরিচিত কার কথা বলছিলেন, একই অসুখ, সে কেমন আছে?"

"খোঁজ নেওয়া হয়নি দিদি।"

নীলপর্ণা বেরিয়ে গেল। প্রতিমা সারা দিন একা। সে ধীরেসুস্থে রান্না করল। বুবকার শুশ্রূষা করল। জলে বা দুধে গুলে একটু একটু করে খাওয়াতে হয় ওষুধ। সে জল দিল অতি যত্নে, শুধু জল। সময় মতো দুধে প্রোটিন গুলে খাইয়ে দিল, ক্যাপসুলের ভিতরের গুঁড়ো একটি কাগজে মুড়ে ব্যাগে ঢোকাল, বাইরের খোল ফেলে দিল ময়লার ঝুড়িতে। স্টেরয়েড ওষুধগুলি সে কাঁচি দিয়ে কেটে আধাআধি করল। সে জানে, হঠাৎ এই ওষুধ বন্ধ করে দিলে বিপত্তি হতে পারে। আরও কিছু ওষুধ, যেগুলি খুব দামি নয়, সে নিয়ম মেনে খাওয়াল বুবকাকে। অবশেষে বুবকার নিদানপত্রের মূল কাগজ নিয়ে বেরোল ওষুধ কিনতে। এই কাগজ ছাড়া দোকান ওষুধ দেয় না। অন্য দিন গীতামাসি থাকে বলে বাইরে যেতে পারে না। আজ সুযোগ মিলেছে। যেগুলি কেনার সামর্থ্য আছে তার, নেবে। চিকিৎসা হল ঠাকুরের পায়ে ফুল-মিষ্টি দেওয়ার মতো। সামান্য হলেও নিজেকে খরচা করতে হয়, নইলে ফল দেয় না। তার যদি ক্ষমতা থাকত, সে সবটাই কিনত।

একবারে অনেক ক'টা ওষুধ কিনে ফিরে এল সে। বুবকার মূত্র পরিষ্কার করল। এ রোগীর যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে এখনও সামান্য সময়ের জন্য কঠিন ও বৃহৎ। দু'-চার বার টোকা দিলে সে মূত্রত্যাগ করে। মলত্যজনের প্রয়োজনে দুই পা বারংবার নাড়াতে থাকে। প্রতিমা তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিল। দেরাজ থেকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও ভায়াল নিল। সে ইনজেকশন জানে, কিন্তু নীলপর্ণা এ ব্যাপারে তাকে এখনও ভরসা করেনি। ইনসুলিন দেওয়া আর ইনজেকশন এক নয়। সব ইনজেকশন একই রকমভাবে প্রযুক্ত হয়, তাও নয়। কঠিন রোগের ইনজেকশন প্রয়োগও নিশ্চয়ই কঠিন। প্রতিমা মনোযোগ দিয়ে কাজটি পর্যবেক্ষণ করে।

রোজ দু'বেলা যে ইঞ্জেকশন দেয়, রক্তচাপ মাপে, প্রয়োজনে রক্ত ও মলমূত্র পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়, দৈনিক তিনশো করে নেয়। প্রতিমা কাজটা করে দিলে মোটেও আলাদা টাকা নিত না। ন'হাজার টাকা বেঁচে যেত। যাকগে। এরা ন'হাজার নিয়ে ভাবে

না। এই রোগীকে দিতে পারে না বলে তার ইনজেকশন দিতে পারার ক্ষমতা ব্যর্থ হয় না। সে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে, সেই ঘন সাদাটে তরল একটি খালি শিশিতে ঢেলে দিল। অর্ধেকের বেশি। সিরিঞ্জে জল ভরে ভায়াল পূর্ণ করে দিল।

গীতামাসি থাকে বলে রোজ এই কাজ করতে অনেক ঝুঁকি নিয়ে শৌচাগারে যেতে হয়। আজ সে বুবকার সামনেই সব সেরে ফেলল। হঠাৎ চমকে উঠল সে। অস্থিরভাবে পা নাড়াচ্ছে বুবকা। কী হয়েছে? কী হয়েছে? এরকম করছেন কেন? জল খাবেন? পটি করবেন? কিছু না। কিচ্ছু না। অসাড় কী করে সাড়া দেয়?

॥ ৪ ॥

ছ'মাসে খানিকটা সেরে উঠবে, বলেছিলেন ডাক্তার। কত বড় ডাক্তার। কিন্তু ভাল হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। বুবকার সহকর্মী দু'জন এসেছিল। ডাক্তারের কত প্রশংসা করল। তিনি অসাধ্যসাধন করেন। তা হলে বুবকা কেন ভাল হয়ে যাচ্ছে না?

আত্মীয়বন্ধুদের আগমন হ্রাস পেয়েছে। তারা ফোন করে নানা কথা বলে, এই সব রোগ আর ক্যান্সারে কোনও তফাত নেই। আয়ুর্বেদিক করো। হোমিওপ্যাথি কেন করানো হচ্ছে না, সমান্তরাল চিকিৎসা হিসেবে? কেরলে নিয়ে গেলে ওখানে ভেষজ চিকিৎসার মহা মহা হাসপাতাল। খরচ অতি সামান্য। উপদেশ, মতদান, বুবকার ঠিক কী অবস্থা জানার পর অল্প বয়সে কে কে অচল অনড় অথর্ব হয়ে পড়ে আছে, তার দীর্ঘ তালিকা শুনে শুনে যখন নীলপর্ণা ক্লান্ত, তখন পাদটীকার মতো স্বজনেরা যোগ করে, আয়াটিকে কিন্তু খুব ভাল পেয়েছ। কপাল করে এমন সেবিকা পাওয়া যায়।

একলা রাতে আজকাল নীলপর্ণার হঠাৎ কান্না পেয়ে যায়। ও কি আর ভাল হবে না? ঘাড়ে, পিঠে ব্যথা বলত, শিরদাঁড়া, কোমর, হাতের কব্জি, কাঁধ। তারা দু'জনেই ভেবেছিল দীর্ঘ সময় কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকার ফল। ব্যথা নিবারক ওষুধ খেয়েছে, ভালও হয়ে গেছে। এক দিন বলছিল, ছোটবেলায় সে খুব একটা খেলতে পারেনি। পা ফেলে ছুটলে পায়ের তলায় খুব যন্ত্রণা হত। থুপ করে বসে পড়ত বলে বন্ধুরা ডাকত থুপকা। সেই সমস্তই কি এই রোগের ইশারা ছিল? কেন বুবকার বাবা-মা গুরুত্ব দেননি?

সে বুবকার কাছে বসে বলল, "তোমাকে চেন্নাই নিয়ে যাব। এখানে তুমি সেরে উঠছ না কেন?"

বুবকার পা দু'টি দুর্বল ভাবে নড়ে উঠল মাত্র।

"তুমি এ ভাবে পা টানছ কেন? জোর পাচ্ছ না? নীচের দিকটাও কি খারাপ হল?"

বুবকার চোখ উপচে জল পড়ছে। এ কি সুস্থতার লক্ষণ, না অসুস্থতার? নীলপর্ণা চোখের জল মুছিয়ে চুমু খেল।

ভোরের দিকে নিথর অনড় বুবকা একা একা মারা গেল।

আত্মীয়বন্ধুরা আসতে দেরি করেনি। হাসপাতালে যাওয়ার লোক না জুটলেও শ্মশানবন্ধুর অভাব হয় না কখনও।

সবাই দেখছে, বুবকার পাশে চুপ করে বসে আছে নীলপর্ণা। কী শক্ত মেয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। গীতামাসি রান্নাঘরের কোণে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে। আর ওই আয়াকে দ্যাখো। কী যেন নাম? সবিতা? না না। অণিমা। না গো। অণিমাও নয়। প্রতিমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিমা। ওই তো সব করত বুবকার। সত্যিকারের সেবা ও-ই করেছে। একেবারে পায়ে পড়ে কাঁদছে। দাদাকে রাখতে পারলাম না, হায় গো, এত করলাম, রাখতে পারলাম না। ও দিদি, ও দিদি, ও দিদি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার হাতে কেউ কোনও দিন মরেনি। আমি কী পাপ করলাম! কী পাপ করলাম!

এর সঙ্গে আবার পাপ-পুণ্যের কী সম্পর্ক? আরে, শোকে-দুঃখে মানুষ কী না বলে। আয়ার আবার অত শোক কখনও দেখিনি বাবা! হবে না? কত টাকা পাচ্ছিল। সেটা হাতছাড়া হয়ে গেল না? যাই বলো, সেবা ওই মেয়েটিই করেছে। আহা, মায়া তো পড়ে!

মায়া, মায়া, মায়াই তো সব। কাল প্রতিমার ঘরের মানুষ উঠে বসেছে। ডাক্তার সত্যি অসাধ্যসাধন করতে পারেন। কত বড় ডাক্তার! কত বিলিতি ডিগ্রি! প্রতিমা নিজের লোকটার জন্য যা করতে পারে, করেছে। সে কি পাপ? নিজের প্রাণের মানুষটাকে বাঁচানো কেন পাপ হবে? ভগবান না চাইলে এই বাড়িতেই সে এসে পড়বে কেন? প্রতিমা কাঁদতে লাগল। কাঁদতেই লাগল। দুঃখে না আনন্দে সে নিজেও জানে না। কারণ, বুবকা এত তাড়াতাড়ি মরে যাক, সে কখনও চায়নি। কিন্তু তিনিই মারেন, তিনিই রাখেন। প্রতিমা কে? সে তো নিমিত্ত মাত্র।

শিল্পী: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

সব সময় নিজেই ফোন ধরতেন সত্যজিৎ রায়

তিনি আর আমি

দেবাশিস ভট্টাচার্য

এবার তাঁর শতবর্ষ পূর্তির বছর। ২০২১ সালে একশোয় পা দিয়েছিলেন তিনি। সেই থেকে বছরভর তাঁকে নিয়ে, তাঁর বহুমুখী কাজ নিয়ে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ২০২২ জুড়েই চলছে তাঁর শতবর্ষের সাড়ম্বর উদ্‌যাপন। এই বছর আনন্দবাজার পত্রিকাও শতবর্ষে পৌঁছল। চার দশক আগে সাংবাদিক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। দীর্ঘ সময় ধরে কর্মসূত্রে অনেক স্মরণীয়, বরণীয়, কৃতী মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার, কথা বলার, এমনকি পরিচিত হওয়ারও সুযোগ হয়েছে। সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল এক নাম।

আনন্দবাজারের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাই শতবর্ষীয় সত্যজিৎকে নিয়ে কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করছে। হয়তো অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ভরসা এটাই যে, তাঁর তুল্য ব্যক্তির বিষয়ে কোনও কিছুই ফেলনা নয়।

জানিয়ে রাখা জরুরি, সত্যজিৎ রায়ের অযুত প্রতিভার মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করার ধৃষ্টতা এবং যোগ্যতা কোনওটিই আমার নেই। যেটুকু জানি, তার চেয়ে না-জানা অনেক গুণ বেশি। যেটুকু বুঝি বলে ভাবি, সেখানেও না-বোঝার অংশই হয়তো ষোলো আনা।

তবু বলব, তাঁকে ‘জেনে’ উঠতে না পারলেও নিজের মতো করে ছুঁয়ে থাকার বাসনা লালন করেছি। যেখানে তাঁর ও আমার মাঝখানে আর কেউ নেই। কোনও বাধা নেই ভুবনে। সেই প্রশ্রয়েই কিছু কথা বলা। আসলে কিছু সঞ্চিত মুহূর্তকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা।

বিশ্ব যখন মানিক-হারা হল, আমার সাংবাদিকতার বয়স তখন বারো বছর। কাজের সুবাদে অভিজ্ঞতার ভান্ডার তত দিনে কিছুটা ভরে উঠেছে। চেনা-পরিচিতির বৃত্ত বাড়তে শুরু করেছে স্বাভাবিক নিয়মে। ওই সময়কালের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের কাছাকাছি যাওয়ারও সুযোগ ঘটেছিল কয়েক বার। তার প্রতিটিই স্মৃতির অ্যালবামে ধরে

রাখা এক-একটি সম্পদ।

প্রথম বার মিনিটখানেক কথা হয়েছিল টেলিফোনে। তাতে প্রাপ্তি ছিল জলদগম্ভীর কণ্ঠের বকুনি এবং দ্রুত ফোনটি নামিয়ে রাখা। মনে আছে, পরবর্তী কালে খবর সংগ্রহের কাজে প্রথম যে দিন জ্যোতি বসুর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম, সে দিন তিনিও প্রচণ্ড রেগে 'গেট আউট, গেট আউট' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস, প্রথম দিনেই সরাসরি সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হইনি!

আনন্দবাজার পত্রিকায় রিপোর্টারের চাকরিতে তখন সবেমাত্র যোগ দিয়েছি। শিক্ষানবীশ সাংবাদিক। ঠিক দু'সপ্তাহ কেটেছে। এমন সময় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার নির্দেশ পেলাম। উপলক্ষ, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

১৯৮০-র ১৬ ফেব্রুয়ারি সেই গ্রহণের সময় ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গুজবে সে এক থরহরি কাণ্ড। ভরদুপুরের কলকাতা শহর জনমানবহীন। সব পাড়া দুয়ার এঁটে টিভি-তে 'পথের পাঁচালী' দেখছে। হয়তো 'শেষ বারের' মতো!

রিপোর্টার-ফোটোগ্রাফাররা শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ-দিক ও-দিক। কারণ, পৃথিবী ধ্বংস হলেও পরদিন সকালের কাগজে খবরটা তো চাই! যাই হোক, পৃথিবীটা সে যাত্রা টিকে গেল। বিকেলে গ্রহণ-মুক্তির পরে অন্যরাও বিলক্ষণ বুঝলেন, বেঁচেবর্তে আছি!

আমার হাতে বিশিষ্টদের নামের একটি তালিকা ধরিয়ে চিফ রিপোর্টার বলেছিলেন, ওঁদের সকলকে ফোন করে গ্রহণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। সেই তালিকার প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। দ্বিতীয় নাম সত্যজিৎ রায়। তাঁর কাছে সেদিন জিজ্ঞাস্য ছিল দু'টি। এক, গ্রহণ দেখা। দুই, আতঙ্কের দুপুরে টিভি-তে 'পথের পাঁচালী' দেখানো।

করে ফেললাম ফোন। আগে তো কখনও এমন অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি যে সব সময় নিজেই ফোন ধরেন, সেটাও জেনেছিলাম তার পরে। তাই নিঃসঙ্কোচ, দ্বিধাহীন আমি ও-পারের ভারী গলার কাছে জানতে চাইলাম, সত্যজিৎবাবু আছেন? জবাব এল, "আমি কথা বলছি। কে? কী ব্যাপার?"

কাগজের পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বলে গ্রহণের প্রসঙ্গ পাড়তেই এবার কড়া বকুনি: "কী ভেবেছেন বলুন তো আপনারা? কিসের প্রতিক্রিয়া? একটা বৈজ্ঞানিক সত্যকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর কী আছে? এ সব নাটক আমি পছন্দ করি না। কাজের সময় এ ভাবে বিরক্ত করবেন না।" তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখা পর্যন্ত আর একটিও কথা বলার সুযোগ সেদিন আমার হয়নি। অন্য প্রশ্ন করা তো দূরস্থান। তবে তাঁর ওই বক্তব্য লেখা হয়েছিল।

এই ঘটনার পরেও অবশ্য কখনও কোনও প্রয়োজনে তাঁর মতামত জানতে আরও ফোন করেছি। দু'-একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে জবাব দিয়েছেন। কিন্তু বছরখানেক পরে যা ঘটল, আমার কাছে তার রেশ আজও ফুরোয়নি। শুধু তা-ই নয়, সেদিন তাঁর কাছে কিছুটা প্রশ্রয়ও পেয়েছিলাম, যা ভুলব না।

যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৮১ সাল। আনন্দবাজারে চাকরি তখন পাকা হয়ে গিয়েছে। সুযোগ এল সরাসরি তাঁর কাছে যাওয়ার। এ বারের বিষয়, নতুন ধারার চলচ্চিত্র।

অপর্ণা সেনের পরিচালনায় প্রথম ছবি '৩৬, চৌরঙ্গি লেন' নিয়ে সেই সময় চার পাশে খুব আলোচনা। নতুন ধারার ছবি সম্পর্কে আমাকে একটি নিউজ়-ফিচার লিখতে বলা হয়েছিল। যেখানে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক সিনেমার বাইরে বাংলায় প্যারালাল সিনেমার অগ্রগতি, বিপণন-সম্ভাবনা, সাফল্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকবে।

চিফ রিপোর্টার বলে দিয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফোনে নয়। তাঁর কাছে সময় চেয়ে নিয়ে, বাড়ি গিয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে হবে। লেখাটির মূল ভিত্তি হবে সেটিই।

যেতে হবে, এটা জানতে পেরে আনন্দ তো হলই, আবার ভয়ও কম হল না। আনন্দ সহজবোধ্য। কিন্তু ভয়ের কারণ, যে বিষয় নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হতে হবে, আমি তাতে যথেষ্ট আনাড়ি। কী বলতে কী বলব! হয়তো উনি বিরক্ত হবেন, রেগে যাবেন সময় নষ্ট করেছি বলে। কথাই বলবেন না।

কী জানি কী হবে! তবে নান্য পন্থা। অতএব বুক ঠুকে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন এবং এক দিন পরেই সকালে বাড়িতে সময় দিলেন সত্যজিৎ রায়।

আমার বেগতিক অবস্থা বুঝে এ বার এগিয়ে এলেন এক অগ্রজ সহকর্মী। সত্যজিৎ-মৃণাল সেন প্রমুখ অনেকের সঙ্গেই তাঁর ভাল যোগাযোগ ছিল। তাঁদের বাড়িতে উনি যাতায়াতও করতেন। আমাকে 'আশ্বস্ত' করে ওই অগ্রজপ্রতিম বললেন, "চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছিলেন সমান্তরাল সিনেমার বিবর্তন

যথাসময়ে বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই ফ্ল্যাটে বেল বাজাতেই তিনি স্বয়ং এসে দরজা খুললেন। অগ্রজ সহকর্মীর দিকে একটু হাসি। তার পরে আমার চেহারা জরিপ করে বললেন, "তুমি ফোন করেছিলে? এসো।"

বসতে বসতেই কাজের কথা। স্মৃতি খুব ভুল না হলে হাতে একটি কালো পাইপ ধরা ছিল তাঁর। তাতে এক বার টান দিয়ে জানতে চাইলেন, "কী বিষয় যেন বলেছিলে তুমি?" ঘাড় ঈষৎ কাত করে দৃষ্টি সরাসরি আমার উপর।

ঢোক গিলছিলাম কি না, বলতে পারব না। তবে পাশে বসা সহকর্মী-দাদা তার আগেই বলতে শুরু করলেন, "আসলে মানিকদা, আমাদের একটা লেখা তৈরি করতে হবে..."

আমার থেকে চোখ সরিয়ে সত্যজিৎ তখন ওঁর দিকে। বললেন, "তুমি লিখবে, না ও?" দাদা এবার একটু অপ্রস্তুত। সত্যজিৎ বলতে থাকলেন, "লেখা যখন ও লিখবে, তখন বিষয়টি ওর কাছেই শুনি। কী জানতে চায়, কী লিখতে চাইছে বলুক। তুমি এখন এর মধ্যে কথা বোলো না।"

এ বার আমার বলার পালা। তাঁর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে মেনস্ট্রিম সিনেমা, প্যারালাল সিনেমা, নিউ ইন্ডিয়ান সিনেমা-র মতো কয়েকটি কেতাবি শব্দ ছন্নছাড়া ভাবে উচ্চারণ করে হয়তো দু'-একটি দুর্বোধ্য বাক্য সাজানোর চেষ্টা করেছিলাম! যদিও তাতে আর যা-ই হোক, তাঁর সামনে বসে কথা এগোনোর মতো এলেম দেখানোর কোনও অবকাশ ছিল না। ভাবিওনি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যজিৎ রায় আমার সেই দীনতা নিশ্চিত ভাবেই 'ক্ষমা' করেছিলেন! তাই এক অর্বাচীনের অর্থহীন বাক্-বিন্যাস হাত তুলে থামিয়ে তিনি সহৃদয় শিক্ষকের মতো আমার অজ্ঞতা আড়াল করে বললেন, "শোনো, আগে আমি বলি। কী বলছি মন দিয়ে শুনবে।"

সেই বলা কত ক্ষণের ছিল? দু'মিনিট? পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট? না অনন্তকালের? বলতে পারব না। সেখানে সত্যজিৎ এলেন, ঋত্বিক

ঘটক, মৃণাল সেন এলেন। ‘পথের পাঁচালী’ এল। ‘নাগরিক’ এল। এবং আরও কত কী! চল্লিশের দশক থেকে বাংলায় প্যারালাল সিনেমা নিয়ে তাঁদের ভাবনাচিন্তা কী ভাবে এগিয়েছে, সংক্ষেপে শোনালেন সেই সব কথাও।

উপসংহারে বলেছিলেন, দর্শককে তৈরি হওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিতে হয়। এখন যত দিন যাচ্ছে, প্যারালাল সিনেমার দর্শক বাড়ছে। আরও বাড়বে। ছবি তৈরির টাকা পাওয়াও তখন সহজ হবে।

চলে আসার আগে জানতে চেয়েছিলাম, লেখা বেরোলে কি এক বার ফোন করতে পারব? সত্যজিৎ রায় তাতেও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

লেখাটি ছাপা হওয়ার দু’-চার দিন পরে এক সন্ধেয় অফিস থেকে ফোন করলাম তাঁকে। পরিচয় দিতেই বললেন, “পড়েছি। যেটুকু বুঝেছ, লিখেছ। যেটা বোঝোনি, লেখোনি! এটাই।” ফোন ছাড়ার পরে হতভম্ব আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারলাম না, আসলে কী বললেন তিনি। লেখা পাশ করল, না ডাহা ফেল!

তাঁর কাছে, তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ আর কখনও আমার হয়নি। তবে মাঝে মাঝে কোনও প্রয়োজনে বক্তব্য জানতে যখন তাঁকে ফোন করে নাম বলতাম, তখন মনে হত, আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজের সুবাদে অনেক বার ফোন করায় নামটি তিনি মোটামুটি চিনে নিতে পারছেন। এটুকুই আমার কাছে তখন অনেক!

এ ভাবে চলতে চলতে ১৯৮৮-তে ঘটল আর-এক কাণ্ড। তবে তার আগের একটি দিনের কথা বলি। ১৯৮৭-তে সত্যজিতের হাতে ‘লিজিয়ন অফ অনার’ তুলে দিতে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ এসেছিলেন কলকাতায়। কারণ, চিকিৎসকরা তখন সত্যজিৎকে বিদেশ সফরের অনুমতি দেননি। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরির প্রশস্ত অঙ্গনে। সেখানে দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে ছয়লাপ। নিরাপত্তার ঘোরাটোপ তো ছিলই।

মনে আছে, সম্মান গ্রহণের পরে স্ত্রী বিজয়া রায়কে নিয়ে সত্যজিৎ এসে বসলেন একটি সোফায়। সেখানেই পাশাপাশি বসে জ্যোতি বসু ও তাঁর স্ত্রী কমল বসু। বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ-ই সেদিন আলোকবৃত্তের কেন্দ্রে। তাঁকে ঘিরে সব কিছু। সবাই তাঁর কাছে আসতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। এমনকি, বাইরের সাংবাদিকরাও।

প্রশ্রয় দিয়েছিলেন লেখালিখি সংক্রান্ত মতামত চাইতেও

তারই মধ্যে আমরা কলকাতার গুটিকয়েক সাংবাদিক ওই সোফার পিছন দিক থেকে প্রায় কাঁধের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সত্যজিতের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টায়। তিনি আপত্তি তো করলেনই না, বরং ক্রমাগত ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলে গেলেন আমাদের সঙ্গে। কোনও প্রশ্নে আমাদের কাউকে সে দিন তিনি নিরাশ করেননি। নিজেকে এ ভাবে সহজ করে নিয়েছিলেন বলেই হয়তো এটা ভুলিনি।

১৯৮৮-র ঘটনাটির শুরু একটি শোক-সংবাদ কেন্দ্র করে। জুন মাস। শেষ বিকেলে হঠাৎ খবর এল, রাজ কপূর প্রয়াত। আমারই উপর আরও এক বার ভার পড়ল সত্যজিতের সঙ্গে কথা বলার। ফোন করলাম। বিষয় বললাম। প্রথমেই জানতে চাইলেন, “বয়স কত বলল?” তার পরে সংক্ষেপে নিজের বক্তব্যটুকু জানিয়ে দিলেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হল না। কারণ, একটু পরেই সংবাদ সংস্থা জানাল, রাজ কপূরের মৃত্যু-সংবাদটি ‘ঠিক’ নয়। অতএব সংবাদের পরিভাষায় যাকে বলে খবর ‘কিল’ করা, সেটাই করে রাজ কপূরের অন্তিম সংবাদের ‘মৃত্যু’ ঘটানো হল।

তবে সত্যজিৎকেও তো সেটা জানাতে হবে। কারণ, রাজ কপূরের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রথম তাঁকে জানিয়েছি আমরা। সেটি যে ঠিক নয়, তিনি অন্য সূত্রে জানলে তা সঙ্গত হবে না। কিন্তু আমি তখনই আরও একবার তাঁকে ফোন করতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। এগিয়ে এলেন অগ্রজ সাংবাদিক সুদেব রায়চৌধুরী। তাঁকেও সত্যজিৎ ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন।

এ সব ব্যাপারে সুদেবদা-র একটি অননুকরণীয় ভঙ্গি ছিল। যেন কিছুই হয়নি, এমন চালে ফোন করে তিনি বললেন, “মানিকদা, প্রণাম নেবেন। সুদেব বলছি। একটা মুশকিল হয়ে গেছে।”

বুঝতে পারছিলাম, ফোনের ও পারের মানুষটি নিশ্চিত ভাবেই জানতে চাইছেন, ‘মুশকিল’টা কী! কারণ, সুদেবদার পরবর্তী বক্তব্য ছিল, “মুশকিল মানে, রাজ কপুর মারা যাননি। ভুল খবরের ভিত্তিতে দেবাশিস আপনাকে ফোন করেছিল।”

সত্যজিতের জবাব এল, “এতে মুশকিলটা কোথায় হল! মারা যাননি। এ তো ভাল খবর। লেট’স উইশ হিম লং লাইফ।”

তবে ‘মুশকিল’ পিছু ছাড়ল না। সেটা সত্যিই হল। সত্যজিৎ ফোন ছেড়েছেন কি ছাড়েননি, ফের সংবাদ সংস্থার সংশোধনী এল— রাজ কপূরের প্রয়াণের খবরটি ঠিক। যাকে বলে, কনফার্মড। এ বার কী হবে? হিসেবমতো তা হলে এ বার আমার ফোন করার পালা। সুদেবদা বললেন, “করে ফেলো। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলবে, এটা তো আমাদের হাতে নেই। যেমন খবর এসেছে, তেমন বলতে হয়েছে। উনি সব বুঝবেন।”

অগত্যা ফোন করলাম। ধরেই বললেন, “আবার কী হল?” শুনলেন বটে। কিন্তু এ বার স্পষ্টতই বিরক্ত তিনি। অবশ্য প্রকাশের ভাষাটি তীক্ষ্ণ হলেও তাতে ছিল এক অদ্ভুত কৌতুক। বলেছিলেন, “কী ব্যাপার বলো তো! তুমি বললে মারা গেছেন। সুদেব বলল মারা যাননি। এখন আবার তুমি বলছ মারা গেছেন। বেটার, ইউ ফার্স্ট ডিসাইড মারা গেছেন, না মারা যাননি। তবে যদি মারা না গিয়ে থাকেন, তা হলে আমার আগের বলা কথাগুলো যেন আবার ছেপে দিয়ো না!”

সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণের সময়টিও ছিল শেষ বিকেল। ১৯৯২-এর ২৩ এপ্রিল। অসুস্থ হয়ে বেলভিউ নার্সিং হোমে ছিলেন বেশ কিছু দিন। সেখানেই জীবনাবসান।

তখন মোবাইল ফোনের যুগ নয়। সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি চ্যানেল-দের ব্রেকিং নিউজ় কিছুই ছিল না। তবে ওই নার্সিং হোমে আমার নিজস্ব একটি ‘সূত্র’ ছিল। সরকারি ভাবে প্রচারের খানিক আগে তাই দুঃসংবাদটি পেয়ে গিয়েছিলাম।

আনন্দবাজারের প্রধান সম্পাদক তখন অভীক সরকার। সে দিন তিনি ছিলেন দিল্লিতে। দিল্লি অফিসে ফোন করে তাঁকে খবরটি দিলাম। তিনি জানালেন, তখনই প্লেন ধরে রাতে সোজা অফিসে আসবেন। প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশও মিলল। সেইমতো আমাদের কাজ শুরু হল।

একটু প্রসঙ্গচ্যুতি, তবু বলি। প্রধান সম্পাদক পৌঁছনোর আগে গতানুগতিক ছকে যে পাতাটি তৈরি হয়েছিল, তিনি এসে প্রথমেই সেটি বাতিল করে দিলেন। জমা পড়া সব ছবি দেখলেন এবং শায়িত দেহের একটি ছবি বেছে নিয়ে পুরো পাতা জুড়ে উপরে প্যানেলের মতো সেটি

বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল রাজ কপূরের প্রয়াণ-পরবর্তী বক্তব্য জানতে গিয়ে

ব্যবহার করলেন। তার নীচে বসানো হল শিরোনাম— 'সত্যজিৎ রায় চলে গেলেন'।

ওই রাতেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অভীকবাবু গিয়েছিলেন বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছিলাম। নিশ্চল দেহের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলাম আমিও।

পরদিন বিকেলে মরদেহ নিয়ে নন্দন থেকে শোকমিছিল পৌঁছল কেওড়াতলায়। শেষযাত্রা থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত পুরোটাই খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। যার সমাপ্তি ছিল পীড়াদায়ক।

রিপোর্টার হয়ে বহু বিশিষ্ট জনের অন্তিম যাত্রার সাক্ষী থাকতে হয়েছে। অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক রকম। বড় রাজনৈতিক নেতাদের কথা আলাদা। তাঁদের জন্য একটি সংগঠিত ব্যবস্থা তৈরিই থাকে। তার বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্টদের বেলায় সেই ধাঁচ হয়তো কিছুটা আলাদা। কিন্তু তাতে পরিবেশের মর্যাদা কোথাও এক তিলও ক্ষুণ্ণ হয় না। শুধু সত্যজিতের অন্ত্যেষ্টিপর্ব আমাদের লজ্জার ইতিহাস।

চাকরির একেবারে গোড়ায় উত্তমকুমারের শেষযাত্রা দেখেছি। আবেগ কতটা তীব্র ও উত্তাল আকার নিতে পারে, সামনে থেকে তা দেখা অবশ্যই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সুচিত্রা সেনের বেলাতেও শ্মশানে প্রচুর ভিড় দেখেছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনও শোকমিছিল হয়নি বলেই হয়তো তার আকার ও উন্মাদনার মাত্রা দুই-ই ছিল তুলনায় নিয়ন্ত্রিত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সকলের শেষ যাত্রায় অজস্র মানুষ শামিল হয়েছেন। কোথাও কোনওরকম বিশৃঙ্খলা হতে দেখিনি।

ব্যতিক্রম সত্যজিতের শেষকৃত্য। সে দিনের সন্ধেটা ছিল বঙ্গ-সংস্কৃতির পক্ষে, বলা ভাল সমাজের পক্ষে, এক চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়। চোখের সামনে তা ঘটতে দেখা আরও মর্মান্তিক। কিছু ঘটে যাওয়ার পরে হাজার যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু আজ এত বছর পেরিয়ে এসেও এ কথা মানতেই হবে, কোথাও একটা বড় ফাঁক বা গলদ অবশ্যই ছিল। নইলে ওই পরিবেশে এমন ঘটনা ঘটতে পারত না। আর তার দায়ও মূলত পুলিশ-প্রশাসনের। গান-স্যালুটে যা ঢাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

দাহকার্য তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বিশিষ্টরা প্রায় সকলেই তখনও সেখানে। আর বাইরেও প্রচুর লোক। কেওড়াতলা সেই সময় এখনকার মতো সুবিন্যস্ত ছিল না। একটি ছাউনির নীচে বেঞ্চে পরপর বসে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, অসীম দাশগুপ্ত, অনিল বিশ্বাসরা। সেখানেই তাঁদের পাশে বসার জায়গা পেয়েছিলাম।

টুকটাক কথাবার্তা চলছিল। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে কদর্য গালাগালি করতে করতে এক যুবক সেখানে ঢুকে পড়ল। ওই পরিবেশে তার উপস্থিতি ও মুখের ভাষা শুনে সবাই হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নেতা-মন্ত্রীরাও যেন কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। উদ্ধত যুবকটি তত ক্ষণে ছাউনির এক দিক থেকে বেঞ্চগুলি টপকাতে টপকাতে অন্য দিকে ছুটছে।

নিমেষে কয়েক জন পুলিশ তাড়া করে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আটকাল। জোর করে জাপটে ধরে নিয়ে গেল বাইরের চত্বরে। তখনও কিন্তু তার অশ্রাব্য বুলিবর্ষণ চলছে। এ বার বেধড়ক প্রহার। শ্মশানের বড় গেট দিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান এল। মারতে মারতে ওই যুবককে সেখানে তোলার সময় তার মুখে উচ্চারিত হল বহু বিতর্কিত সেই আর্তনাদ— "সাহা-দা দেখুন, ওরা আমায় মারছে।"

ঘটনাচক্রে বীরেন সাহা তখন কলকাতার নগরপাল।

ভ্যান বেরিয়ে গেল। আর বাইরে থেকে শ্মশান চত্বরে উড়ে আসতে লাগল থান ইট, সোডার বোতল। আমরা সবাই মাথা বাঁচাতে মরিয়া। বাইরের রাস্তায় বোমাও ফাটছে। আলোগুলি ভেঙে দেওয়ায় চার দিক অন্ধকার।

ভিতরে চুল্লির আগুনে তখন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের শরীর। একটু আগেই যাঁকে সরকারি মর্যাদায় গান স্যালুট দিয়ে বিদায় জানানো হয়েছে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিস্থলে চলছে এই 'ভৈরব জাগরণ'!

সে দিন শ্মশানে যা ঘটে, তার শিকড় কত দূর বিস্তৃত ছিল ক্রমশ সে সব সামনে আসে। কেওড়াতলার তৎকালীন দুই মস্তান স্বপন ও শ্রীধর খবরের কাগজের শিরোনামে চলে আসে। তাদের রাজনৈতিক সংস্রব ও পুলিশের উঁচুতলার সঙ্গে যোগাযোগের বিবিধ তথ্য বেরিয়ে পড়ে। সে সব অনেকেরই মনে থাকবে। সেই আলোচনার পরিসর আলাদা। তবে সত্যজিতের বিদায়-পথ ক্লেদাক্ত করে তোলার ওই দায় সমাজ কি এড়াতে পারে? তাঁকে নিয়ে উদ্‌যাপনের এই আবহে সেই 'প্রায়শ্চিত্ত'টুকু করাও আজ আমাদের কর্তব্য।

উপন্যাস

অমৃত সন্ধানে

বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ ঝড় ওঠে, হঠাৎ বন্যা আসে, হঠাৎ করে ভূমিকম্প হয়। আরও কত যে 'হঠাৎ' আছে! থাকাই স্বাভাবিক। 'হঠাৎ' যে বেঁচে থাকার অঙ্গ। হঠাৎ কেউ অনাথ হয়, হঠাৎ দেশছাড়া। হঠাৎ কর্মহীন, হঠাৎ প্রেমে পড়া। তা হলে 'হঠাৎ'কে এত গুরুত্ব কেন?

এই শতাব্দীতে সব 'হঠাৎ' এর সেরা 'হঠাৎ' বোধহয় কোভিড ১৯ বা করোনাভাইরাসের আক্রমণ। চিনে উৎপত্তি হলেও অল্প দিনেই ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। আমেরিকা, ইটালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, বাদ রইল না কোনও দেশ-মহাদেশ। ভাইরাসটি সামান্য নয়, মৃত্যুদূত যেন। ফুসফুস ঝাঁঝরা করে কেড়ে নেয় প্রাণ। মানুষের দেহকে আশ্রয় করে বংশবিস্তার করে, তাই মানুষই বনে গেল মানুষের শত্রু। বিচ্ছিন্নতাই একমাত্র সমাধান। বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দিতে শুরু হল বিশ্বজোড়া লকডাউন। লকডাউন হল ভারতেও। একেবারে আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারত।

এই উপন্যাসের শুরু কলকাতায়, করোনার প্রথম ঢেউয়ের শেষভাগে। সরকার-মানুষ সকলেই নিশ্চিত করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ঠিক এই সময়ে একটি পরিবারের উপর আছড়ে পড়ল উথালপাথাল ঝড়, যেন করোনাকালীন 'আমপান', ঘর-বাড়ি উড়িয়ে নিঃস্ব মানুষকে করে দিল আরও নিঃস্ব। ঝড়ের আগমন একটি টেলিফোনে। নাড়িয়ে দিল এক আপাতসুস্থ গার্হস্থ্য ভিত।

॥ ২ ॥

সাজতে ভালবাসে প্রকৃতি। শুভ্র তুষারশৃঙ্গ, ধূসর টিলা, শুষ্ক মরুভূমি, বহমান স্রোত, নানা রঙের গাছগাছালি, ফুল, নীল আকাশের ক্যানভাস জ্যান্ত ছবি যেন। তবুও কিছু মানুষের ইচ্ছে হয় একটু-আধটু বদল ঘটাতে। বোঝে না, প্রকৃতি বেখেয়ালি নয়। অহেতুক প্রশ্রয় দেয় না সজ্জাকে।

প্রকৃতির সাজ বদলের ইচ্ছেটা তমালের মাঝেমধ্যেই হয়। নীল আকাশের গায়ে যদি দেওয়া যেত গোলাপি আলপনা অথবা একই নদীতে থাকত যদি রামধনু রং? সূর্যের রং ভোর-গোধূলিতে লাল আর অন্য সময় হলুদ, এটাই বা হবে কেন? বেশির ভাগ গাছের পাতা সবুজ হওয়ার সত্যিই প্রয়োজন আছে? সালোক সংশ্লেষের বিকল্প কি কিছুই নেই? আর এই যে মেটে আর লাল রঙের মাটি, এর বাইরেও তো ভাবা যায়। নানা রঙের আবিরের মতো নানা রঙের মাটি কি খুবই কঠিন? কঠিন এবং বাস্তবসম্মত যে নয়, বিলক্ষণ বোঝে তমাল। তবুও বাঁধ দিতে পারে না ভাবনায়। ছোটবেলা থেকেই যে লাগামছাড়া ভাবনায় অভ্যস্ত। অভ্যেস করিয়েছে বাবা, যাদব কর্মকার।

টিকরবেতা, বীরভূমের প্রান্তিক গ্রাম। অজয় নদীর ধারে। লাগোয়া গ্রামগুলো কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি, বিল্বমঙ্গল বা বেলুড়িয়া, ভরাঙ্গী, জনুবাজার, রঘুনাথপুর, মন্দিরা। টিকরবেতা ব্যতিক্রমী। কারণ দুটো। এক, টিকর অর্থাৎ উঁচু অবস্থানের জন্য অজয়ের বন্যার প্রভাব তেমন পড়ে না। দুই, অন্যান্য গ্রাম কৃষিকাজে ব্যস্ত থাকলেও টিকরবেতায় সারাদিনই ঠুকঠাক শব্দ। তৈরি হচ্ছে পিতল-কাঁসার বাসন। কৃষিকাজ

একেবারে ত্যাজ্য না করলেও টিকরবেতার আকর্ষণ বাসন শিল্পে। অথচ সামান্য পুব দিকেই ভিন্ন পরিবেশ। ঠুকঠাক শব্দের বদলে বাউল-কীর্তন। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের জন্মস্থান হিসেবে গণ্য কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রাম জয়দেব নামেই পরিচিত। স্থানমাহাত্ম্যে রয়েছে কাঙাল ক্ষ্যাপা, কোটরেবাবা, হালাকাঁপা, মনোহর ক্ষ্যাপার মতো নানা সাধকের আশ্রম। সাধক সমাধিপ্রাপ্ত হলেও ভক্ত সমাগমে গমগম করে আশ্রমগুলো। উৎসবের রূপ নেয় পৌষ সংক্রান্তির জয়দেব মেলায়।

কর্মকার পরিবারের সদস্য হয়েও বাবার মন যায়নি বাসন শিল্পে। বরং সারাদিন ডুবে থাকত নানা বইয়ে। বাধা দেয়নি দাদু। হয়তো চেয়েছিল পরিবারের কেউ এক জন অন্য রকম হোক। পড়াশোনায় বরাবরই ভাল, তাই গ্রামীণ স্কুলে চাকরি পেতে অসুবিধে হয়নি। তমাল অবশ্য বাবাকে হেডমাস্টার দেখতেই অভ্যস্ত। নিজেও ছিল ওই স্কুলেরই ছাত্র। তবে কোনও দিনই ‘হেডমাস্টারের ছেলে’র বাড়তি সুবিধে পায়নি। পেতে দেয়নি বাবা। মেধা, সততা, নিষ্ঠার জন্য সম্মান ছিল সর্বত্র।

স্কুলের বাইরে বাবা যেন বন্ধু। বছর সাতেকেই তমালের জানা হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী শুধুই সাদা-কালো নয়। ভাল-মন্দ মেশানো। চেনা হয়ে গিয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল। চিনেছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক বা সিরিয়স। তার পর একে-একে কালপুরুষ, চিত্রা, স্বাতী, রোহিণী, অরুন্ধতী, শ্রবণা আরও কত। স্কুল থেকে ফেরার পথে কখনও অজয়বাঁধে, কখনও মন্দিরে-মন্দিরে। চিন্তামণি বা মনসা মন্দির, বাণেশ্বর বা শিব মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির। ঘুরতে-ঘুরতে কত কথা, কত ইতিহাস। অজয়ের বাঁধ ঘেঁষে কুশেশ্বর শিবমন্দিরে রয়েছে ভুবনেশ্বরী যন্ত্র। সেখানে বসেই নাকি কবি জয়দেব লিখেছিলেন ‘গীতগোবিন্দম্’ যা সম্পূর্ণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। বিখ্যাত রাধাবিনোদ মন্দিরও নাকি জয়দেবের জন্মভিটের উপরে তৈরি। তৈরি করেছিলেন বর্ধমানের রানি নৈরাণীদেবী। বাঁধপথেই কদম্বখণ্ডি ঘাট, যেখানে শুধুমাত্র অসুস্থ জয়দেবের গঙ্গাস্নান ইচ্ছাপূরণের জন্যেই মা-গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিলেন। বাবা জানাতে ভুলত না ওগুলো মিথ, প্রামাণ্য কোনও নথি নেই। যেমন অনেকেই বলেন জয়দেব বাংলার নন, ওড়িশার। মাঝে মাঝে ‘গীতগোবিন্দম্’ উদ্ধৃত করত বাবা। ভাল গাইতও। গাইত আশ্রম অনুষ্ঠানে, মেলায়। জয়দেব মেলার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত তমাল। বুঝত বাবা। নিয়ে যেত গানের আসরে, মেলায়। জিলিপি, কেঠোগজা, লবঙ্গলতিকা থেকে নাগরদোলা, কোনও কিছুতেই আপত্তি করত না। নিজের মুক্তচিন্তা চারিয়ে দিতে চাইত ছেলের ভিতরে।

মেঘলা আকাশ থেকে চোখ সরালেও মন থেকে মেঘ সরাতে পারল না তমাল। বাবার মুখটা এখনও চোখে ভাসে, কানে বাজে কথা। বাবা যেন কাঁটার মতো বিঁধে আছে বুকে। সেই মুক্তচিন্তা, মুক্তপ্রাণ মানুষটা হারিয়ে গেল এক সময়ে। যেন দৈব দুর্বিপাক। তমাল বুঝেছিল হারিয়ে যাবে, তবুও সাধ্য ছিল না রোখার। কতই বা বয়স তখন, দশ বা বারো। বোন মীনাক্ষী বা মিনু সবে দুই। রোখা যায়?

আজ প্রাসঙ্গিক ভাবেই বাবা দখল করে নিয়েছে পুরো মনচিত্র। যে চিত্র ছিল স্পষ্ট, আজ যেন স্পষ্টতর। যে কথা ছিল মর্মরধ্বনি, আজ বেদন-বাজনা যেন। দেখতে বা শুনতে যে চায়নি এমনটা নয়, আর্ত ভাবেই চেয়েছিল। সেই চাতক-চাওয়াই বয়ে নিয়ে এল এক টেলিফোন।

“মিনু নাকি?”

“হ্যাঁ ছোটকাকা, তোমরা সবাই ভাল আছ তো?”

“আছি আপাতত। তোর মাকে একটু দে তো।”

“মা তো বাড়িতে নেই ছোটকাকা।”

“ও হ্যাঁ... না থাকারই তো কথা। মেয়ের বিয়েতে কি আর দম ফেলার ফুরসত থাকে? তবে এই সময়ে বেশি লোক নেমন্তন্ন করিস না যেন,” সতর্ক করলেন মাধব কর্মকার। করোনার প্রকোপ কমলেও বেশি লোকের জমায়েত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখনও টিকরবেতাতেই থাকেন। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ বাসন-ব্যবসা ছেড়ে দিলেও, নিজে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। মেজদা সুদেব মারা যাওয়ার পরে বসতভিটে বিক্রি করে কলকাতায় ছেলের কাছে যেতেও মন চায়নি।

“না না ছোটকাকা, বেশি লোককে বলা হবে না। শুধু দুই বাড়ির ঘনিষ্ঠ কয়েক জন,” আশ্বস্ত করল মীনাক্ষী। অনুজের সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক। ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে। তাই বৈশাখেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্চ শেষেই শুরু হল লকডাউন। চলল প্রায় আড়াই মাস। এবার ধীরে ধীরে সব কিছুটা স্বাভাবিক হচ্ছে। সরকারি অতিথি নিয়ন্ত্রণের নিয়ম মেনে বিয়ে হতে আর বাধা নেই।

“শোন, যে কথাটা বলতে ফোন করলাম,” প্রসঙ্গে আসতে চাইছেন মাধব।

“কী কথা?”

“গত মাসে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর গিয়েছিলাম...”

“এই করোনার মধ্যে!”

“এখন তো প্রকোপ অনেকটাই কম, তার উপর ছেলে গাড়ি নিয়ে এল কলকাতা থেকে। তাই গেলাম আর কী...” মাধবের সাফাই। দীর্ঘ লকডাউনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাই সম্মতি দিয়েছিলেন ছেলে, গিন্নির জোরাজুরিতে।

“ভাল ঘুরলে?”

“সে ঘুরলাম, কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, সেখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।”

“অদ্ভুত ঘটনা?”

“তুই তো জানিস তোর কাকিমার জ্যোতিষে খুব বিশ্বাস। ওখানে গিয়ে শুনল এক সাধুবাবা মাসখানেক ধরে আস্তানা গেড়েছেন। শুনেই তোর কাকিমা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সাধু মানেই যেন ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ভুল বলতে পারবে। পাঁচ বছর হয়ে গেল নাতির মুখ দেখতে পাচ্ছে না। আমি প্রথমটায় উৎসাহ দেখাইনি। পরে ভাবলাম বড়দার বিষয়ে কিছু যদি জানা যায় তা হলে... তুই তো জানিস না, দাদা আমাকে কতটা ভালবাসত,” মাধব আবেগপ্রবণ।

“জানতে পারলে?” চমকে উঠল মীনাক্ষী।

“সেটা বলব বলেই তো ফোন করেছি। ছোট্ট একটা গুহায় ধুনি জ্বালিয়ে সাধুবাবা একা বসে। তোর কাকিমা গিয়েই হড়হড় করে সমস্যার কথা বলতে লাগল। সাধুবাবা একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে শুনছেন। আমি সাধুবাবাকে দেখছি। বুঝতে চেষ্টা করছি ভণ্ড কি না। তোর কাকিমার কথা শেষ হলে সাধুবাবা জানালেন, তিনি হাত বা কপাল পড়ায় বিশ্বাসী নন। শুধু তোর কাকিমার মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করতে পারেন। ততক্ষণে আমার মাথার মধ্যে টের পেয়েছি বিদ্যুৎ ঝিলিক। সাধুবাবার মধ্যে যেন বড়দার আদল...” উত্তেজনা মাধবের গলায়।

“বাবা!” শরীর শিরশিরিয়ে উঠল মীনাক্ষীর।

“হ্যাঁ রে... তোর বাবার মতোই। তবে প্রথমেই ধাক্কা খেলাম। সাধুবাবা তোর কাকিমাকে হিন্দিতে উত্তর দিলেন। এক বিন্দুও বাংলা টান নেই। দমে না গিয়ে আমি নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। সাধুবাবাও উত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু মেলাতে কিছুতেই পারি না। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিলাম। ফিরে এসে তোর কাকিমাকে বলতেই হেসে উড়িয়ে দিল। জোর দিয়ে বলল, বড়দাকে চিনতে ওর ভুল হতেই পারে না। তা ছাড়া একই আদলের একাধিক মানুষ কি থাকে না? অগত্যা মেনেই নিলাম,” হতাশা যেন মাধবের গলায়।

“এতদিন বাদে কথাটা বললে?”

“ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে পারিস। কিন্তু আজ হঠাৎ পুরনো একটা বই খুঁজে পেলাম যেটায় বড়দার হাতের লেখা। আমাকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।”

“কেন তোমার ওই সাধুকে বাবা বলে মনে হয়েছিল?” উৎসুক মীনাক্ষী।

“সেটা ঠিক বলতে পারব না রে। তবে একটা মানুষকে দীর্ঘ দিন দেখলে, তার সম্বন্ধে অবচেতনে একটা ধারণা বোধহয় তৈরি

হয়েই যায়।”
“সাধু ওখানে কত দিন থাকবে জিজ্ঞেস করেছিলে?”
“না রে... সেটা করা হয়নি।”
“সন্দেহ যখন হয়েছিল তখন আর এক বার যেতে পারতে ওই সাধুর কাছে।”
“সময় হয়নি। তা ছাড়া সাধুবাবা যে দাদাই, সে রকম কোনও জোরালো প্রমাণও তো পাইনি। তবে জানিস, সন্দেহের আরও একটা কারণ ছিল।”
“কী?”
“বড়দার নাকের ডান দিকে একটা আঁচিল ছিল। ঠিক সেই রকম ওই সাধুবাবারও ছিল।”
চুপ করে গেল মীনাক্ষী। মাথার মধ্যে হাজার প্রশ্ন অথচ বলতে গেলেই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন সম্ভাবনা যে কল্পনাতীত!
কল্পনাতীত তমালের কাছেও। বোনের মুখে সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসেছিল। প্রথমেই মনে হল, বাবা বেঁচে আছে! দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরে অনেক কিছুই সম্ভব। পরক্ষণেই মনে হল, বেঁচে থাকলেও বাবার মতো মুক্তমনা মানুষ কি ঈশ্বর আঁকড়ে বাঁচতে চাইবে? যতটুকু বুঝেছে, যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে দেখেনি কখনও। খটকা শুধু তিন জায়গায়। ছোটকাকার সন্দেহ, নাকের পাশে আঁচিল আর ভবিষ্যদ্বাণী করতে না চাওয়া। কিন্তু ছোটকাকা ভুল করতে পারে আর নাকের পাশে আঁচিলও বড় কোনও প্রমাণ নয়। সাধু-সন্তদের ভবিষ্যদ্বাণী করতে না চাওয়াটা একটু অস্বাভাবিক হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। অনেক ভেবে তমাল সিদ্ধান্তে এল, বাবা কিছুতেই সাধু হতে পারে না। সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও দিল বোনকে। চুপ করে শুনল মীনাক্ষী, তার পর কোনও কথা না বলে উঠে গেল। তখনও জানা নেই, কী প্রবল ঝড় আছড়ে পড়বে পরিবারে।

॥ ৩ ॥

শূন্যতা প্রকৃতির আদি রূপ হলেও, নানা রূপে প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় পূর্ণতার লক্ষ্যে। শূন্যতা বোঝাতে ছবির বদলে যেমন না-ছবির ফাঁকা জায়গা, তেমনই না-শূন্যতা যেন সংসার। ভরা সংসার। প্রকৃতি সন্তান হওয়ায় মানুষও এমনটাই চায়। না-শূন্যতার জন্য আঁকে নতুন ছবি।
কেউ অকালে মারা গেলে অথবা নিরুদ্দেশ হলে শোকের ছায়া নামে পরিবারে। হঠাৎ করেই অসহায়, দিশাহীন। প্রকৃতির নিয়মে সেই শোকেরও এক্সপায়ারি থাকে। এক মাস, দু’মাস, ছ’মাস বা বছরে সরে যায় শোকছায়া। চরৈবেতি মন্ত্রে জন্মদীক্ষিত মানুষ খুঁজে নেয় বেঁচে থাকার বিকল্প পথ।
ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছেন তপতী। মানুষ হয়েছেন মামার বাড়ি, শিবপুরে। বর্ধমান জেলায়। জেলা বর্ধমান হলেও টিকরবেতার উল্টো পারে নবগ্রাম বা কৃষ্ণপুরের পাশেই। বীরভূম, বর্ধমানের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে অজয় নদী। জয়দেব থেকে মাটির অস্থায়ী ব্রিজের উপর দিয়ে অনায়াস যাতায়াত। শুধু বর্ষাকালে জলের তোড়ে ব্রিজ ভাঙে, চলে নৌকো। ও পারে পৌঁছলেই কৃষ্ণপুর, শিবপুর, মলানদিঘি, গোপালপুর, মুচিপাড়া হয়ে সোজা দুর্গাপুর। পৌঁছলেই রুজিরুটির অবাধ দুনিয়া।
অবস্থা তেমন ভাল ছিল না তপতীর মামার। সামান্য জমিতে ধান, তরকারি। বেচতে যেতেন জয়দেবের শনি-মঙ্গল হাটে। অমায়িক ব্যবহারের জন্যই বোধহয় বন্ধুত্ব হল যাদবের বাবার সঙ্গে। সখ্য গড়াল সম্পর্কে। সেই প্রথম সুখের মুখ দেখলেন তপতী। সঙ্গে গর্ব। টিকরবেতা তো বটেই, আশপাশের গ্রামগুলোও সম্মান দেয় যাদবকে। তার উপর বাড়ির বড় বৌ। অল্প দিনেই হাতে এল সংসারের কর্তৃত্ব। এল প্রথম সন্তান। ছেলে হওয়ায় গুরুত্ব আরও বাড়ল। কানায়-কানায় পূর্ণ জীবন।
পূর্ণতাও বোধহয় অস্বস্তি প্রকৃতির। না হলে যাদবের মতো মানুষের গায়ে কালির ছিটে লাগে! প্রথমে শুধু তপতী নয়, কেউই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পুলিশ এসে বাড়ি থেকে যখন স্কুল ফান্ডের টাকা উদ্ধার করল, তখন চুরির অভিযোগ না মেনে উপায় রইল না। সন্দেহ গাঢ় হল যাদবের নির্লিপ্ততায়। যেন মেনে নিয়েছে অপরাধ। হাজতবাস না হলেও চাকরি গেল। বছরখানেক উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন। কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন না, কেউ এগিয়েও এলেন না। গ্রাম-পরিবার সকালের কাছেই ত্যাজ্য হয়ে গেল এক সময়ের প্রিয় মানুষটা। তপতীও হয়তো বিশ্বাস করেছিলেন চুরির অপবাদ। আস্তে-আস্তে কখন যেন সরে এলেন। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে থাকলে দাঁড়াতেন প্রিয় ছেলের পাশে। কিন্তু ঘটনার বছর দুই আগে দু’জনেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিলেন। মায়া কাটালেন যাদবও। এক দিন ভোর রাতে ঘর ছাড়লেন। ছেলে তখন বছর বারো, মেয়ে সবে দুই।
কাঁদলেন তপতী, আফসোসও করলেন, তার পর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ালেন। বাপের বদলে ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব যে নিতে হবে। রান্নাঘর সামলে হাত লাগালেন শ্বশুরবাড়ির ব্যবসায়। এক দিকে হেঁশেল সামলানো, অন্য দিকে বাসন বানানো। চাপ না থাকলেও ছিল আত্মমর্যাদা। তাই শ্বশুরবাড়ির আপত্তি সত্ত্বেও বেছে নিয়েছিলেন কর্মকারজীবন। বঞ্চিত করেনি শ্বশুরবাড়ি। ছোট দেওর মাধবের তখন বয়স কম, ব্যবসার খুঁটিনাটি বুঝতেন মেজ দেওর সুদেব। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে কাজ শেখালেন, বোঝালেন ব্যবসা। প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে দিলেন অংশীদারি, শ্রমের মূল্য। সেই মূল্যই গড়ে তুলল ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ। ছেলে নামী সংবাদপত্রের সাংবাদিক, মেয়ে বড় কোম্পানিতে কম্পিউটর ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেমেয়ের চাকরির সুবাদেই টিকরবেতা ছেড়ে ঠাঁই হয়েছে কলকাতায়। বেশ কয়েক বছর ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন ছেলের নিজস্ব ফ্ল্যাটে।
আত্মত্যাগের গরিমায় দিন কাটছিল বেশ। অতীত গর্ব-স্মৃতি ফিকে হতে-হতে নিঃশেষ। জায়গা নিয়েছে তীব্র ঘৃণা। চোরের বৌ মানা যায়! তার উপর যে চোর সমস্ত দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে পালিয়ে যায়! যদি স্কুলের বিরুদ্ধে লড়াই করত অথবা খুঁজে নিত অন্য চাকরি বা পেশা, তাও না হয় মানা যেত। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার মানে তো কৃতকর্মকেই সমর্থন করা। অতীত ধুয়ে-মুছে তাই নতুন করে জীবন সাজিয়েছেন তপতী। সেই হারিয়ে যাওয়া গর্ব-সুখের জীবন। ভাবতেও পারেননি ফসিল মানুষ আচমকা জ্যান্ত হতে পারে।

“এত বড় সিদ্ধান্তটা তুই আমাকে না জানিয়েই নিয়ে নিলি?”
“সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়স কি আমার হয়নি?”
“বয়স হলেই সব সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া যায় না। পরিবারের অন্য মানুষগুলোর কথাও ভাবতে হয়।”
“ভেবেছি তো। ভেবেই তো সিদ্ধান্তটা নিয়েছি।”
“তোর বাবা এখনও তোর পরিবার? যাকে ভাল করে চোখেই দেখলি না, সে আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল! আমার কোনও দামই নেই?” বেসামাল তপতী ভেঙে পড়েন কান্নায়।
“তোমার ঋণ কোনও দিনই শোধ হওয়ার নয় মা। তুমি তো শুধু জন্ম দাওনি, একা হাতে পালনও করেছ। আমি, দাদা আজ যা কিছু, সে তোমারই জন্য। কর্তব্য পালন তো তোমার কাছেই শিখেছি,” মীনাক্ষীর আবেগহীন স্বীকারোক্তি।
“একে কর্তব্য পালন বলে? যে মানুষটা তিন তিনটে মানুষকে অসহায় করে চলে গেল, তার প্রতি কিসের কর্তব্য?” নিজেকে খানিক সামলে তপতীর যুক্তি। এই পরিস্থিতি একেবারেই অকল্পনীয়।
“সেটাই তো আমার প্রশ্ন মা। একজন সৎ মানুষ হঠাৎ কেন অসৎ হয়ে গেল?” মনের প্রশ্ন প্রথম ব্যক্ত করল মীনাক্ষী। দাদার কাছে বাবা সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছে, খারাপ মানুষ মনে হয়নি কখনওই। বরং আফসোস হয়েছে, কেন নিয়তি বঞ্চিত করল পিতৃসান্নিধ্য?
“চুরি না করলে কি প্রতিবাদ করত না? এমনি-এমনি চুপ করে মেনে নিত? মুখোশ পরা একটা মানুষের সঙ্গে অতগুলো বছর কাটিয়েছি ভাবতেই ঘেন্না হয়...” তপতী মুখ বিকৃত করেন।
“মুখ আর মুখোশের ফারাকটাই তো বুঝতে চাইছি।”
“এত বছর পরে? তাও এই করোনার সময়ে? এই সময়ে কেউ

বাইরে যায়?”

“অনেকেই যাচ্ছে। ছোটকাকারাই তো ঘুরে এল।”

“আমি বলছি, তুই ওই পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে কিছুতেই যাবি না। কোনও প্রয়োজন নেই সত্যি মিথ্যে যাচাই করার,” সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন তপতী।

“শুধু সত্যি মিথ্যের বিচার নয় মা, আমার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।”

ভুরু কুঁচকে গেল তপতীর।

“ওই সাধু যদি সত্যিই বাবা হয়, তা হলে বিয়েতে অন্য কেউ কেন আমার সম্প্রদান করবে? সেই অধিকার তো বাবার,” দ্বিধাহীন মীনাক্ষী।

“এক জন চোর করবে তোর সম্প্রদান!”

“চোর কি চোর নয়, সেটা জিজ্ঞেস করেছিলে? নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে চেষ্টা করেছিলে খুঁজে বার করার? এখন আমি যখন জানতে বুঝতে চাইছি, তখনও বাধা দিচ্ছ? লাভ নেই মা। সূত্র যখন পেয়েছি তখন একটা চেষ্টা আমাকে করতেই হবে,” মীনাক্ষীও স্পষ্ট করল নিজের সিদ্ধান্ত।

“চিনবি কী করে? তোর দাদার যাও বা কিছু স্মৃতি আছে, তোর তো কিছুই নেই,” তপতীর শেষ অস্ত্র।

“দাদাকে নিয়েই তো যাব।”

“ছোটবেলার স্মৃতি দিয়ে তোর দাদা চিনে ফেলবে? তাও ছাব্বিশ বছর বাদে? পারলে তোর ছোটকাকাই পারত,” জোর গলায় বলেন তপতী। পেয়েছেন সবল যুক্তি।

“দেখার চোখ সকলের সমান হয় না মা। অনুভূতিও আলাদা হয়। দেখাই যাক না।”

তর্কে জড়ায়নি তমাল। উত্তপ্ত পরিবেশ করতে চায়নি আরও উত্তপ্ত। কোনও একটা পক্ষ নিতেই হত। কার পক্ষ নিত? দু’জনেই দু’জনের মতো করে ঠিক। তমাল নিজের অবস্থান ব্যক্ত করলে এক পক্ষ নির্ঘাৎ ভেঙে পড়ত, বিশেষ করে মা। যে অর্জিত আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে জীবন কাটিয়েছে, নিমেষে সেই আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ হত। শুভ সময় আসন্ন প্রায়। নিজেকে নির্লিপ্ত রাখল তমাল।

বাবাকে দেখার ইচ্ছে অস্বীকার করলে নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়। কিছু বছর হলেও তো কাছ থেকে দেখেছিল মানুষটাকে। জেনেছিল কত অজানা। তবে ওই ঘটনার পরে বাবা কথা বলা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিল। বাঁধের উপর বা অশ্বত্থ গাছের নীচে যখন চুপ করে বসে থাকত, তখন তমালকে সামনে পেলে হাত ধরে থাকত অনেক ক্ষণ। এক সময় কী করে যেন তমাল বুঝে গেল, বাবার ওই হাত ধরা ছেড়ে দেওয়ার জন্যই। কেউ না টের পেলেও বাবা যে দিন বাড়ি ছাড়ে, তমাল যেন আগেই টের পেয়েছিল। সারারাত ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল বিছানায়। ভোর রাতে বাবা যখন বেরিয়ে গেল, তখন পিছু নিল। ধরেও ফেলল বাঁধের কাছে।

“আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?”

তমালের দিকে তাকিয়েছিল বাবা। কী করুণ সেই দৃষ্টি! চাপা স্বরে বলেছিল, “ছেড়ে যাচ্ছি কি না জানি না... তবে যাচ্ছি।”

“আর কোনও দিন আসবে না?”

উত্তর দেয়নি বাবা। হাত বুলিয়েছিল তমালের মাথায়। যেন আশীর্বাদ। তার পর আচমকাই হাঁটা দিয়েছিল।

পিছু ডাকেনি তমাল। চেষ্টা করেনি ফেরানোর। এখনও বিশ্বাস করে, ভুল সিদ্ধান্ত বাবা কখনওই নিতে পারে না। তা ছাড়া ওই ঘটনার পরে মুক্ত মনের মানুষটা যেন হয়ে গিয়েছিল বদ্ধ খাঁচার পাখি। উড়ানে বাধা দিতে মন চায়নি তমালের। বোন ছাড়া কেউ জানে না শেষ সাক্ষাৎকার।

॥ ৪ ॥

প্রেম অতি পবিত্র। তবে অপার্থিব জগতেই মানায় ভাল। পার্থিব জগতে নিখাদ প্রেম যেন বেমানান। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও ভাবে নিঃস্বার্থতাকে অতিক্রম করে ক্ষুদ্র অথবা অতিক্ষুদ্র স্বার্থ জড়িয়েই পড়ে। শ্রেষ্ঠ জীবকে সহজে দেবতার আসনে অভিষিক্ত করতে যেন কুণ্ঠা বোধ করে নিয়তি।

অপেক্ষা বোঝে না অনুজ। জানে না ব্যর্থতা। কলকাতার সচ্ছল পরিবারের সদস্য, নামী স্কুলের ফার্স্ট বয়, এক চান্সে জয়েন্ট, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ থেকে চাকরি। মসৃণ কেরিয়ারের মতো প্রেমও অনায়াস। বাড়ানো হাত ধরতে হয়েছিল শুধু। ভেবেচিন্তেই ধরেছিল।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলেও চেহারায় সেই ছাপ নেই মীনাক্ষীর। বরং বেশির ভাগ শহুরে মেয়েদের তুলনায় বেশি সপ্রতিভ। বাংলা মিডিয়ামের ছাপ নেই ইংরেজি বলাতেও। দক্ষিণ কলকাতার একই পাড়ার বাসিন্দা হওয়ায় পরিচয় হয়েই গেল। দু’জনেরই পছন্দ হল দু’জনকে। বড় ফারাক একটাই। অনুজরা এলাকার বর্ধিষ্ণু পরিবার আর মীনাক্ষীরা ভাড়াটে। নিজের স্মার্টনেসের সঙ্গে মানানসই হলেও ফারাক অগ্রাহ্য করতে পারেনি অনুজ। বাধা দিয়েছিল আভিজাত্যের অহঙ্কার। কিন্তু দেখা হতে-হতে, কথা হতে-হতে সেই অহঙ্কার ক্রমশ ফিকে হতে লাগল। নিশ্চিহ্ন হল সে দিন, যে দিন সরাসরি প্রশ্ন করল মীনাক্ষী। দু’জনেই দু’জনকে বুঝতে পারছে অথচ বলতে পারছে না, বড়ই অসহনীয়। অধৈর্য অনুজ তাই দিয়েছিল অকপট উত্তর। বোকা-বোকা আধুনিকাদের চেয়ে শ্যামলা, স্মার্ট মীনাক্ষী ঢের এগিয়ে। কথা বলা আনন্দের, সঙ্গে চলা গর্বের।

“হাউ কুড ইউ মেক সাচ এ ফুলিশ ডিসিশন?”

“ফুলিশ!”

“ফুলিশ নয়? চোখে দেখলেও যে লোকটাকে তোমার মনে নেই, সেই লোকটার জন্য এতখানি ডেসপারেট হচ্ছ?” অনুজ উত্তেজিত। চেনা মীনাক্ষী যেন হঠাৎই অচেনা।

“লোকটা নয় অনুজ, মানুষটা। মানুষটা আমার বাবা,” কেটে-কেটে মীনাক্ষী বলে।

“বাবা! যে বাবা মিনিমাম রেসপন্সিবিলিটিটুকুও নিল না, সে কেমন বাবা? আমার মনে হয় না এই বাবা ডাক উনি ডিজ়ার্ভ করেন,” উত্তেজনার পারদ চড়ছে অনুজের।

“ডিজ়ার্ভ করে কি করে না, সেটা জানার জন্য আই শুড নো হিম ফার্স্ট। প্লিজ় অনুজ, এ ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ো না,” ধীর লয়ে বলে মীনাক্ষী।

“আচ্ছা ধরো, পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে গিয়ে শুনলে লোকটা, আই মিন মানুষটা ওখানে নেই, তা হলে কী করবে?” হঠাৎ করেই যেন উবে গিয়েছে অনুজের উত্তেজনা।

“ফিরে আসব। অ্যান্ড লাইফ উইল গো অন অ্যাজ় ইট ইজ় নাও।”

“কিন্তু যদি শোনো তিনি অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন?”

“তা হলে সেখানে যাব।”

“সেখানে গিয়েও যদি শোনো অন্য জায়গায় গিয়েছেন?”

“সেখানেও যাব।”

“আর আমাদের বিয়েটা? তোমার এই হুইমজ়িক্যাল ডিসিশনের জন্য দ্য ম্যারেজ উইল গেট ডিলেড অ্যান্ড ডিলেড অ্যান্ড ডিলেড?” আবার হঠাৎ গলা চড়ল অনুজের।

চুপ করে গেল মীনাক্ষী। বুঝতে পারেনি অনুজ পাকা উকিলের মতো বিষয়টা এই দিকে নিয়ে আসবে। খানিক চুপ থেকে বলল, “তোমার যদি মনে হয় আমি ভুল, তা হলে বিয়েটা নাও করতে পারো।”

“এত দিন পরে, এত সহজে বলতে পারলে কথাটা? ডোন্ট ইউ ফিল ফর মি?” আবেগে ঘা দিতে চাইল অনুজ।

“দু’ তরফে ফিলিংস না থাকলে বিয়ে...”

“শুধুমাত্র সম্প্রদানের জন্য এত বড় ডিসিশনটা নিচ্ছ?”

“ভুল বুঝছ অনুজ। আই অলসো ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্রুথ।”

ঝড় দেখছে তমাল। শুনছে মা, বোন দু’পক্ষের যুক্তি। তবুও কোনও পক্ষ নিতে পারেনি এখনও। যদিও জানে এক সময়ে

নিতে হবেই। এগিয়ে আসছে বিয়ের দিন। নিমন্ত্রণ, কেনাকাটা শুরু হয়েও থমকে গিয়েছে। বড়ই কঠিন এই সময়, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিদ্ধান্ত।

মায়ের যুক্তি পুরোটাই বাস্তব। সত্যিই যদি সেই সাধু বাবা হয় আর ফিরেও আসে, তা হলেও তো পরিস্থিতির কোনও হেরফের হবে না। বরং আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে জেরবার হতে হবে। বিশেষ করে পাড়ায় হতে হবে নানা অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রায় সবাই জানে বাবা মারা গিয়েছে। প্রমাণ মায়ের সাদা সিঁথি, শাখা-পলাহীন হাত, হাল্কা রঙিন শাড়ি। আচমকা বাবার উপস্থিতি হবে চরম অস্বস্তিদায়ক। শুধু তো পাড়ার লোক নয়, অস্বস্তিদায়ক হবে পরিবারেও। যে মানুষটাকে ছাড়া ছাব্বিশটা বছর বাঁচতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে একটা পরিবার, আচমকা সেই মানুষটাকে কী করে মেনে নেবে? মানুষটারও কি মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না? অসুবিধে যে হবে, ভালই বোঝে তমাল। এত বছর পরে একটা মানুষের আচমকা আগমন যে কী পরিমাণ অস্বস্তি সৃষ্টি করবে আন্দাজও করতে পারে। তবুও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।

বোনের সিদ্ধান্তে যুক্তি থাকলেও আবেগটাই বেশি। কিন্তু সেটা না থাকলে কি ভাল হত? হয়তো। আবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে বসে যেত বিয়ের পিঁড়িতে। বোনের বিয়ে হলে নিজেও বিয়ে করতে পারত, গড়ে উঠত সুখী সংসার। না, প্রেমে অঙ্গীকারবদ্ধ নয় তমাল। তা হলে কি বোনের কাছে বাবার কথা বলে ভুল করল? তা-ই বা বলে কী করে? এক জন মানুষ তার শিকড়কে জানবে না, বুঝবে না? বিশেষ করে বাবার মতো অমন এক জন জ্ঞানী মানুষকে? দোষ যদিও বা থাকে, শুধুমাত্র একটা দোষেই কি স্খলন হয় সমস্ত গুণ? দ্বিধাগ্রস্ত তমাল।

নিজে কী চায়? নিজেকে প্রশ্ন করল তমাল। উত্তর উঠে এল সহজেই। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা না থাকলে ফোনের খবর শুনেই দৌড় লাগাত। সত্যিই যদি সেই সাধু বাবা হত, তা হলে অপলকে দেখত মানুষটাকে। কত অজানা যে জানা বাকি এখনও। হয়তো অসম্ভব, তবুও ছেলের সান্নিধ্যে, উষ্ণ পরশে বাবা যদি ঘরে ফিরতে চাইত? প্রশ্নটা নিজের কাছেই বড্ড কঠিন লাগল তমালের। তবে অন্য ভাবনাও এল। বাবাকে দেখে মা যে দুর্বল হত না কে বলতে পারে? বাবাও হয়তো আঁকড়ে ধরতে চাইত ছিন্ন শিকড়। আর দশটা পরিবারের মতো এই পরিবারটাও পেত পূর্ণতা!

দশ বছরের সাংবাদিক জীবন তমালের। প্রথম দিন থেকেই পালন করছে নিরপেক্ষতার ধর্ম। আজ বুঝছে, সেই ধর্ম পেশায় প্রযোজ্য হলেও পারিবারিক জীবনে নয়। সেখানে পক্ষ নিতেই হয়। বড় কঠিন এই সময়, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিদ্ধান্ত।

॥ ৫ ॥

মস্তিষ্কের সঙ্গে মৌচাকের একটা মিল বোধহয় আছে। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন শয়ে-শয়ে মৌমাছি উড়ান দেয়, তেমনই মস্তিষ্কেও কোনও বিষয়ে টোকা লাগলে বেরিয়ে আসে স্মৃতিঝাঁক। মৌমাছিদের মতোই বেলাগাম। কখনও মন প্রশান্ত, কখনও রক্তাক্ত হৃদয়। মিথ্যে হয়ে যায়, 'স্মৃতি সতত সুখের'।

"পিঁপড়েরা কী করে বৃষ্টির খবর পায়?"

"যেমন করে তুমি পাও আমার মনের খবর।"

"সে তো তোমাকে দেখে বুঝতে পারি।"

"পিঁপড়েরাও প্রকৃতি দেখে বুঝতে পারে।"

"ধ্যাত! পিঁপড়েদের অত বুদ্ধি আছে নাকি? তা ছাড়া ওইটুকু চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখা যায়?" তমালের সরল জিজ্ঞাসা।

"চোখ না থাকলেও পৃথিবী দেখা যায়। অন্ধ মানুষ কী করে চলাফেরা করে ভেবে দেখো," ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহ যাদব। স্কুল থেকে ফেরার সময়ই যেন এই সব বিচিত্র প্রশ্ন মনে জাগে ছেলের।

"সে তো চলাফেরা করতে করতে একটা আন্দাজ হয়ে যায়। মানুষও সাহায্য করে," তমালের যুক্তি।

"আন্দাজ হয় অনুভবে। চোখে দেখার চেয়ে অনুভবের শক্তি যে অনেক বেশি। আর অনুভব প্রখর হয় প্রকৃতির কাছাকাছি থাকলে। ঠিক যেমন তুমি আমার কাছাকাছি থেকে অনুভব করো আমাকে," হেসে বললেন যাদব। ছেলের মুক্তভাবনায় আনন্দ পান।

"আমরাও তো প্রকৃতির মধ্যেই থাকি, কাছাকাছি," বুঝতে চাইছে তমাল।

"প্রকৃতির মধ্যে থাকলেও, কাছাকাছি আর থাকি কোথায়? বয়স্ক মানুষদের আমরা বাড়িতে ঠাঁই দিলেও কতটা কথা বলি তাঁদের সঙ্গে, কতটা থাকি কাছাকাছি? নিজেদের বুদ্ধি, কর্মের উপর প্রবল আস্থা আমাদের। এতটাই যে, নিজেদের ঈশ্বর ভাবতেও দ্বিধা করি না। অবলীলায় ধ্বংস করতে পারি প্রকৃতি," একদমে বলে গেলেন যাদব। মানুষের নির্মমতা অসহ্য।

বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল তমাল। ঠিক যুক্তি মাথায় এল না।

"প্রকৃতিকে পরিবার ভাবতে হবে। ভাবতে হবে স্বজন। থাকতে হবে পরিবারের এক জন হয়ে। সেটা আমরা যদি না বুঝি, মাস্টারমশাইয়ের মতো প্রকৃতিই এক দিন বুঝিয়ে দেবে। হ্যাঁ, চরম শাস্তি দিয়েই বোঝাবে," ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে যাদব।

"তুমি বোঝো?" তমালের আগ্রহ। বাবার চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে কথাগুলো শুধু বলছে না, বিশ্বাসও করে।

"বুঝতে চেষ্টা করি। পুরোপুরি বুঝে ফেললে কি আর সংসার-বন্ধনে মন টিকত?" হেসে বললেন যাদব।

"চলে যেতে আমাদের ছেড়ে?"

"কত দূর এলাম?"

"প্রায় হাফ রাস্তা..."

গাড়ি ছুটেছে দুরন্ত গতিতে। জানালার বাইরে প্রকৃতি স্মৃতির মতোই সরে সরে যাচ্ছে। করোনা-পরিস্থিতিতে ট্রেনে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়নি তমাল। কিছু স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়া সব ট্রেনই বাতিল। গাড়িতে খরচ বেশি হলেও বোনের বিয়ের আগে কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলে না। দূরত্বও খুব বেশি নয়। কলকাতা থেকে তিনশো কিলোমিটার মতো। এইটুকু সাধ্যের মধ্যে।

পক্ষ নিতেই হল শেষ পর্যন্ত। বর্তমানের চেয়ে অতীতের পাল্লাই হল ভারী। বিস্তর মান-অভিমানের বাধা পেরিয়ে গুরুত্ব পেল বোনের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছে কি নিজেরও নয়? সন্দেহ নেই কোনও। তবুও প্রকাশ করেনি। করলে খড়কুটোও হারাত মা।

"তা হলে আমার কোনও দামই রইল না, বল?"

"এমন কথা বলছ কেন?"

"বুঝেও অবুঝের ভান করিস না, আরও অসম্মানিত লাগে। এত কষ্ট করে তোদের বড় করলাম, কোনও দামই দিলি না..." তপতীর দীর্ঘশ্বাস।

"তোমার কষ্ট, ত্যাগের দাম হয় না মা। একটা কথা জেনো, বটগাছ বড় হলে মাটির দিকেই ঝুরি নামায়। ফিরতে চায় সেই মাটিতেই যেখান থেকে তার জন্ম। মানুষও তাই মা, ফিরতে চায় শিকড়ের কাছে। মিনুর যে ইচ্ছেটা হয়েছে সেটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক," তমালের প্রলেপের চেষ্টা।

"আর তোর?"

"আমার তো সব কিছুই তোমাকে ঘিরে মা। বাবা ফিরে এল কি এল না, মিনুকে সম্প্রদান করল কি করল না, তাতে তো পরিস্থিতির কোনও হেরফের হবে না। ভাঙা কাচের মতো সংসারও আর জোড়া লাগবে না," যতটা সম্ভব গুছিয়ে, আবেগ মিশিয়ে বলতে চেষ্টা করল তমাল। সত্যি অভ্যেসে মিথ্যে উচ্চারণ বড়ই কঠিন।

"তবুও যাচ্ছিস?"

"উপায় নেই মা। মিনু এই বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ওর শেষ ইচ্ছে পূরণ করা আমাদের কর্তব্য," আপ্রাণ চেষ্টা করছে তমাল।

“একটা কথা বলব, রাখবি?”

“কেন রাখব না? বলো...”

“মানুষটার সঙ্গে যদি সত্যিই দেখা হয় আর আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করে, তা হলে একটা কথা বলতে পারবি?”

“কী?”

“বলিস...আমি মরে গিয়েছি...”

“দাদা, পাহাড়!”

দূরে অনেক দূরে সবুজ পাহাড় দেখল তমাল। ড্রাইভারের কাছে জানল, বাংলার সীমানা পেরিয়েছে অনেক ক্ষণ। ওড়িশার বালাসোর শহরও পেরিয়ে এসেছে। শুরু হয়েছে নীলগিরি অঞ্চল। পঞ্চলিঙ্গেশ্বর দূর নয় বেশি।

“আমার সিদ্ধান্তটা তোর পছন্দ হয়নি, না দাদা?”

“পছন্দ না হলে আসতাম?”

“তা হলে তোর চোখের কোণদুটো চিকচিক করছে কেন?” মীনাক্ষীর চোখ এড়ায়নি তমালের নিঃশব্দ কান্না।

“ধুর... হাওয়ায় ধুলোবালি ঢুকছে... বেশি মাথা ঘামাস না তো, বরং যে কারণে এসেছিস সেই বিষয়টা নিয়ে ভাব,” তমালের ম্যানেজ করার চেষ্টা। মায়ের কথাগুলো কানে বাজছে। এখনও কত অভিমান!

“তাই তো করছি দাদা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এখানেই যেন বাবার দেখা পাই...” আবেগে গলা বুজে এল মীনাক্ষীর। এমন দিনও জীবনে আসতে পারে, ভাবতেই পারেনি।

“বাবা কী বলত জানিস?”

“কী?”

“মাটি-কাঠ-পাথরের মূর্তির কাছে নয়, নিজেকে সমর্পণ করো প্রকৃতির কাছে। দু’হাত বাড়িয়ে বলো, আমি জানি না, আমাকে জানাও,” বাবার মতো করেই উচ্চারণ করার চেষ্টা করল তমাল। বুঝল, যার কথা তার মুখেই মানায় ভাল।

“ভগবানে বিশ্বাস করত না বাবা?” দ্বিধায় মীনাক্ষী।

“অবশ্যই করত। তবে আমরা ভগবান বলতে যেমনটা বুঝি, তেমনটা নয়। বলত, তাঁর সৃষ্টির মাঝেই তিনি বিরাজমান। দেখা সম্ভব নয়, তাই তাঁকে অনুভব করো তাঁর সৃষ্টির মধ্যে,” বাবার মতো না হলেও কথাগুলো আউড়ে যেন বাবার সান্নিধ্য অনুভব করল তমাল। এই জন্যই তো বোনের কাছে করত বাবার গল্প। সেই গল্পের রেশ যে এত দূর গড়াবে, ভাবতেও পারেনি।

“আর কী বলত?” মীনাক্ষী আপ্লুত।

“প্রকৃতির চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক আর কেউ নেই। পূর্ণ সমর্পণ করলে সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হবে। সৃষ্টি প্রতিপালনই যে তাঁর ধর্ম।”

চোখ বন্ধ করল মীনাক্ষী। আকাশ, মাটি, পাহাড়, জঙ্গলের কাছে জানাল আর্তি, ‘দেখা যেন পাই...’

॥ ৬ ॥

খোঁজ কখন যেন নেশায় রূপান্তরিত হয়। খুঁজতে-খুঁজতে এক সময়ে অজান্তেই উদ্দেশ্য হারিয়ে প্রাধান্য পেয়ে যায় শুধুই খোঁজ। ‘কী খুঁজছি’, ‘কেন খুঁজছি’র যুক্তি হারিয়ে যেন নিজেকেই খুঁজে বেড়ানো দেশ-দেশান্তরে। এই ভাবেই কি এক সময়ে মানুষ মিশে যায় প্রকৃতির সঙ্গে! বিস্মৃত হয় পরিবার, পরিজন!

নীলগিরি অঞ্চল সমতল, পাহাড় মেশানো। চাষের জমির পরেই পাহাড়ের শুরু। পাহাড়গুলো কোথাও রুক্ষ পাথুরে, কোথাও ঘন সবুজ। বিভিন্ন সংস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা আসে পাহাড়ে ওঠার প্রশিক্ষণে। আশপাশে বেশ কিছু আদিবাসী গ্রাম। একটি পাহাড়ের উপরে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির।

অন্য পাহাড়গুলোকে ডাইনে-বাঁয়ে রেখে সাদা কংক্রিটের রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে মন্দিরের উদ্দেশে। পাহাড়ের নীচে বিশাল পার্কিং লট। তীর্থস্থানের সঙ্গে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর টুরিস্ট স্পটও। নভেম্বর থেকে মার্চ পাহাড়, জঙ্গল, দিঘি, ফলস আকর্ষণ করে টুরিস্টদের। সরকারি ‘পান্থনিবাস’ ছাড়া হোটেল অবশ্য গুটিকয়েক। বেশির ভাগই সকালে এসে বিকেলে ফিরে যায়। আছে বেশ কিছু দোকানও। পাওয়া যায় পুজোর সামগ্রী, খেলনা, গ্রামীণ হস্তশিল্প। শিবলিঙ্গ দর্শনের আগে-পরে কেনাকাটা করে মানুষ। মন্দিরে যাওয়ার জন্য আছে সিঁড়ি। আছে ইতিহাস।

অনেকের বিশ্বাস, বনবাসকালে সীতা গড়ে তোলেন এই পঞ্চলিঙ্গ। আবার অনেকের বিশ্বাস, প্রবল পরাক্রমী এবং শিবভক্ত অসুর বাণাসুরের প্রতিষ্ঠা করা এই পঞ্চলিঙ্গ। তবে কীর্তি যারই হোক, পঞ্চলিঙ্গ আবিষ্কার করেন মর্ধারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হরিচন্দন। রাজা নাকি লিঙ্গগুলি আবিষ্কারের জন্যই এখানে এসেছিলেন।

ছোট্ট জায়গা, সাধুবাবার হদিস পেতে দেরি হল না। তবে সাধুবাবা এখন এখানে নেই। সপ্তাহখানেক আগেই ডেরা ছেড়েছেন। দোকানি বা হোটেলওয়ালারা কেউই বলতে পারল না তিনি কোথায় গিয়েছেন। হঠাৎ যেমন এসেছিলেন, তেমন হঠাৎই চলে গিয়েছেন।

তমাল তেমন হতাশ না হলেও ভেঙে পড়ল মীনাক্ষী। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। তমাল মেলায়-মেলায় সাধুসঙ্গের অভ্যেসে জানে, বেশি দিন এক জায়গায় থাকেন না সাধুরা। পরিব্রাজন সেরে ফিরে যান নিজস্ব আশ্রমে। কিন্তু কোথায় সেই আশ্রম?

“জানার কি আর কোনও উপায়ই নেই?”

“উপায় বলতে তো স্থানীয় মানুষজন। তারা তো কিছুই জানে না দেখছি।”

“আমরা কি সব মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি?” মীনাক্ষী মরিয়া।

“তা বলিনি... তবে বেশির ভাগের সঙ্গেই তো বললাম,” নিজের উত্তরে তেমন জোর পেল না তমাল।

“দাদা, মানুষ সাধারণ হোক বা সাধু, একটা জিনিস কিন্তু তাঁর লাগবেই। সেটা হল খাবার। সেই খাবারের জন্য হয় তাঁকে ভিক্ষা করতে হবে অথবা কোনও পয়সাওয়ালা ভক্তকে এগিয়ে আসতে হবে। তেমন কাউকে কিন্তু খুঁজিনি আমরা। আলগা প্রশ্ন করেছি মাত্র,” মীনাক্ষীর জোরালো যুক্তি।

বোনের তারিফ না করে পারল না তমাল। এতটা গভীরে সত্যিই ভাবেনি। অথচ সাংবাদিক হিসেবে ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করতে তো আসেনি এখানে। মনে যে প্রবল দ্বন্দ্ব। এক দিকে বাবাকে দেখার ইচ্ছে, অন্য দিকে মায়ের আকুলতা। কোনও ভাবেই যেন বিয়ে না বিঘ্নিত হয়। মাঝদরিয়ায় উথালপাথাল ঢেউয়ে মাথা কাজ করে মাঝির?

“বলেছিস ঠিক, তবে আমার মনে হয় আজকের দিনটা এখানে থেকে যাই। বেলাও পড়ে আসছে, রাতে ড্রাইভ করাটাও উচিত হবে না। আজ বরং মন্দিরটা ঘুরি, কাল সকাল থেকে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করব,” পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইল তমাল। যেন ঢেউয়ের মুখে নৌকা সোজা রাখার চেষ্টা।

“মাটি-কাঠ-পাথরের মূর্তির কাছে নয়, সমর্পণ করো প্রকৃতির কাছে— বাবার এই কথাগুলো তো তুই-ই আমাকে বলেছিস দাদা। মানুষও যে প্রকৃতিরই অঙ্গ, সেও বলেছিস। মানুষ ছেড়ে আমি পাথরকে আঁকড়াতে পারব না রে...” গলা বুজে এল মীনাক্ষীর।

অবাক হয়ে গেল তমাল। বাবার মুখে যে কথা শুনে সে সম্মোহিত হয়েছিল, বোন পরের মুখে তা শুনেই এতটা আত্মস্থ করে ফেলেছে!

পাকা রাস্তা ছেড়ে আশপাশের গ্রামে ঘুরতে শুরু করল তমাল, মীনাক্ষী। সবই আদিবাসী গ্রাম। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দাওয়ায় রাখা বাসনগুলোও ঝকঝকে। প্রকৃতিশিক্ষায় অভ্যস্ত মানুষকে আলাদা করে নিতে হয় না হাইজিন পাঠ।

সাধুবাবা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না আদিবাসীরা। বৈদিক দেবতার বদলে নিজস্ব লৌকিক দেবতায় বিশ্বাস ওদের। আছে নিজস্ব

পুরোহিত, গুনিন, ওঝা। তাই সাধুবাবা সম্বন্ধে আগ্রহীও নয়। তবে আশার বাণী শোনাতে না পারলেও আতিথেয়তায় ত্রুটি রাখল না। ঠান্ডা জল আর গুড় খাওয়াল তমাল-মীনাক্ষীকে।

সন্ধান পাওয়া গেল এক পথচলতি মানুষের কাছে। একটু দূরের গ্রামে থাকে। কাজ করে মুদির দোকানে। দোকানটা মন্দির থেকে একটু দূরে হওয়ায় নজরে পড়েনি। দোকান মালিকই সাধুবাবার দেখাশোনা করত। নিতাই পাণ্ডা, বয়স বছর পঞ্চান্ন। সাধুবাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জোড়হাত কপালে ঠেকাল।

"আমি ভগবান দেখিনি, সাধুবাবাই আমার কাছে ভগবান। দু'-দণ্ড ওঁর কাছে বসলেই মন শান্ত হয়ে যেত। সে যে কী অনুভূতি বোঝাতে পারব না... তা ছাড়া উনি আমার বিরাট উপকারও করেছিলেন," আবেগে ছলছল নিতাই। বাংলা, ওড়িশা পাশাপাশি হওয়ায় প্রায় সকলেই বাংলা বলতে, বুঝতে পারে।

"কী উপকার?"

"সেই দিনই সাধুবাবা প্রথম এসেছেন। যাচ্ছিলেন মন্দিরের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল পাহাড়ের খানিক উপরে একটা বাচ্চা ছেলেকে। দৌড়ে গেলেন। বাচ্চাটাকে আটকাতে না পারলেও পড়ার মুহূর্তে পৌঁছতে পেরেছিলেন পাহাড়ের নীচে। বাচ্চাটা পড়ল সোজা সাধুবাবার কোলে। সেই প্রথম দেখলাম সাধুবাবাকে। বাচ্চাটা আমার একমাত্র নাতি। তার পর থেকে যত দিন সাধুবাবা ছিলেন তত দিন আমিই সেবা করেছি," কৃতজ্ঞতার রেশ নিতাইয়ের চোখমুখে।

"সাধুবাবা কোথায় গিয়েছেন জানেন?" তমাল প্রসঙ্গে এল।

"না, যাওয়ার সময় তো উনি বলে যাননি। শুধু আমার সেবায় খুশি হয়েছিলেন বলেই হয়তো একটা হদিস দিয়ে গিয়েছেন," নিতাই যেন গর্বিত।

"হদিস?" মীনাক্ষী উদ্‌গ্রীব।

"হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন যেখানেই থাকুন না কেন কুম্ভমেলায় শিবরাত্রির স্নান করতে যাবেনই।"

"কুম্ভমেলা! হরিদ্বারে? এই বছর হবে?" হদিস পেয়েও তমাল বিভ্রান্ত। করোনার জেরে এই বছরের কুম্ভমেলা নিয়ে বিস্তর টানাপড়েন চলছে উত্তরাখণ্ডে। সাধুসন্তরা বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভের পুণ্যলাভ ছাড়তে নারাজ হলেও সরকার দ্বিধাগ্রস্ত।

"তা তো জানি না। তবে উনি যাবেন বলেছেন। আমিও যাব। যদি আবার দেখা পাই তাঁর।"

"ঠিকানা দিয়ে গিয়েছেন উনি? মেলা যদি হয়, তা হলে কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড়ে খুঁজে পাবেন কী করে?" বাস্তব ব্যক্ত করল তমাল। আশ্রমের নাম জানাটা জরুরি।

"জানি না, তবে চেষ্টা করব। আমি তো বুঝতে পারিনি উনি হঠাৎ চলে যাবেন। তা হলে নিশ্চয়ই ঠিকানা চেয়ে নিতাম। আপনাদেরও উপকার হত," নিতাইয়ের আফসোস।

"আচ্ছা নিতাইবাবু, আপনার কি মনে হয়েছে সাধুবাবা বাঙালি?" নিরাশার মধ্যে আশার আলো খুঁজছে মীনাক্ষী।

"না। বরং ইউপির বলেই মনে হয়েছে। শুদ্ধ হিন্দি বলতেন," অনেকটাই নিঃসন্দেহ নিতাই।

"সাধুবাবার কোনও ছবি আছে আপনার কাছে?" দমে না গিয়ে প্রশ্ন করল মীনাক্ষী।

"ছবি তোলার কথা তো মনে হয়নি কখনও।"

"সাধুবাবার নামটা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন?" অন্তত একটা সূত্র পেতে চাইছে তমাল।

"ভগবানের নাম জিজ্ঞেস করা যায়? মহারাজ বলেই ডাকতাম," আবার জাড়হাত কপালে ঠেকাল নিতাই।

"শিবরাত্রি কবে?"

মীনাক্ষীর প্রশ্ন শুনে তমাল অবাক চোখে বোনের দিকে তাকায়।

"শিব দর্শন করেই যাই।"

"এখন!"

"অসুবিধে কী?"

"বেলা শেষ হয়ে আসছে। উপরে উঠে দর্শন করে নামতে-নামতে অন্ধকার হয়ে যাবে। তা ছাড়া ফিরতেও তো হবে," মীনাক্ষীর উটকো বায়না আটকাতে চাইল তমাল।

"এত কাছে এসে দেখা না করলে মহাদেব রেগে যেতে পারে," হঠাৎ করেই খিলখিলে মীনাক্ষী। "তা ছাড়া তুই তো বলেছিলি, আজ ফিরবি না।"

"সে বলেছিলাম, কিন্তু কাজ যখন হয়ে গিয়েছে তখন..."

"চল না দাদা..."

লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে মীনাক্ষী। তমালের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না বোনের মানসিকতা। বাবার দেখা না পেলেও একটা অতি ক্ষীণ সূত্র অন্তত পেয়েছে। পজ়িটিভ মানুষদের এই এক গুণ, বিন্দুতে সিন্ধু দেখে। সহজে হতাশ হয় না, আঁধারের কাছেও করে আলোর খোঁজ।

'শিবরাত্রি কবে?' মীনাক্ষীর ওই প্রশ্নই বলে দিয়েছে কুম্ভমেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত ও নিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছে না ওই ভিড়ের মধ্যে অচেনা কাউকে খুঁজে বার করা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও। মেলা ঘোরার অভিজ্ঞতায় তমালের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কতটা কঠিন এই খোঁজ।

সমস্যা আরও আছে। এখন ডিসেম্বর। শিবরাত্রি মার্চ মাসের এগারো তারিখ। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে মার্চ মাসের তেরো তারিখ। অর্থাৎ হরিদ্বার যেতে হলে বিয়ে পিছোতেই হবে। পিছোতে হবে এক মাস। কারণ ফাল্গুন মাসের ওইটাই বিয়ের শেষ তারিখ আর তার পরেই পড়ে যাচ্ছে চৈত্র মাস। বারো তারিখ প্লেনে ফিরলে তেরো তারিখ বিয়ে হতেই পারে। কিন্তু মীনাক্ষীর যা মানসিকতা, অত সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়ার কথা মনে হতেই মায়ের মুখটা মনে পড়ল তমালের। কিছুতেই মেনে নেবে না। তার উপর এই করোনা-পরিস্থিতিতে হরিদ্বার যাওয়া নিয়েও প্রবল আপত্তি তুলবে। অনুজও যে বিষয়টা কী ভাবে নেবে বুঝতে পারল না তমাল। শুধু বুঝল, ঝড় এবার সাইক্লোনের আকার নিতে চলেছে।

জীবন যে হঠাৎ এতটা দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠবে, ভাবতেই পারেনি তমাল। অথচ তলিয়ে ভাবলে দ্বন্দ্বের কোনও প্রশ্নই নেই। মীনাক্ষীর মতো সে নিজেও তো চায় বাবাকে খুঁজে বার করতে। শুধু একটা ফারাক আছে। সফল হোক বা বিফল, টাকা-পরিশ্রম-সময়ের বিনিময়ে তমাল মিটিয়ে দিতে পারবে খোঁজের মূল্য। ক্ষতি একমাত্র মীনাক্ষীর। অনুজ যদি অপেক্ষা করতে রাজি না হয়, তা হলে ভেঙে যাবে একটা সুন্দর সম্পর্ক। স্বপ্নও কি ভেঙে যাবে না? নতুন স্বপ্ন দেখাই যায়, কিন্তু এই অনিশ্চিত খোঁজের জন্য তা হবে চরম হঠকারিতা। তবুও তমাল সে ভাবে বাধা দিতে পারছে কই? বরং মীনাক্ষীর আকাঙ্ক্ষাকে শিখণ্ডী করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছে। এতখানি স্বার্থপর হতে পারে কোনও দাদা? তমাল সিদ্ধান্ত নিল, যেমন করে হোক মীনাক্ষীকে হরিদ্বার যাওয়া থেকে বিরত করবে। কিছুতেই নিশ্চিতকে তুলে দেবে না অনিশ্চিতের হাতে।

শ্লথ পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল তমাল। যেন জীবনপথ।

এত কঠিন? জানা ছিল না তো!

॥ ৭ ॥

"পৃথিবী অঙ্কময়। নিখুঁত অঙ্কে ঘুরে চলেছে মহাকালের চাকা। একটুও এ দিক-ও দিক হবে না। অঙ্ক যেন ঈশ্বরের ভাষা। কণামাত্র পড়তে পারলেও জীবন সার্থক, না হলে যন্ত্রের মতো ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে মরা। কোথায় নেই অঙ্ক? সায়েন্স, কমার্সে আছে বোঝা গেলেও আর্টসও যে অঙ্কভিত্তিক, বোঝে ক'জন? ইতিহাস-ভূগোলে আবার অঙ্ক কিসের? কোথায় অঙ্ক সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-চিত্রকলায়? আছে। প্রথমে

মানতে হবে তার পর করতে হবে খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতেই এক সময় আবিষ্কৃত হবে ফর্মুলা। বিশ্বাস হবে, ঈশ্বর কথা বলেন অঙ্কের ভাষায়।”

ছেলের পিঠে হাত রেখে আকাশের দিকে চেয়ে বলে চলেছেন যাদব। যেন গল্প বলছেন। শুনছে তমাল। বুঝছে আবার বুঝছেও না, তবু থামাচ্ছে না বাবাকে। গল্পের টানে মন্ত্রমুগ্ধ। কঠিন বিষয়কেও কী সহজ করে বলতে পারে বাবা! ঘোর লেগে যায়। ঘোর লাগা এমন জীবনই পছন্দ তমালের। বিষয় বৈচিত্রে স্কুলের পড়াশোনাও অনেকটা হয়ে যায়। পড়াশোনাকে মনে হয় না পরিশ্রম। বাড়তি লাভ স্কুলের বন্ধুদের মাঝে ‘কত জানি’র আত্মপ্রচার। আফসোস শুধু একটাই, স্কুলে বাবা যেন চিনতেই পারে না। চিনতে পারে শুধু স্কুল থেকে ফেরার সময় আর রবিবার বা ছুটির দিনে।

রবিবার বা ছুটির দিনে বাপ-বেটায় বেরিয়ে পড়ে দুপুরের খাওয়া সেরে। বেশির ভাগ দিনই যায় ও পারের গড়জঙ্গলে। লাল মাটির রাস্তা ধরে ইছাই ঘোষের দেউল, শ্যামারূপা মন্দিরে। সেখানে ইতিহাস যেন রূপকথা।

ইছাই ঘোষ ছিলেন ঢেঁকুরগড়ের রাজা। পাল রাজত্বের শেষভাগে, চূড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতিতে তিনি ত্রিষট্টিগড়ের রাজা কর্ণসেনকে পরাজিত করেন। গড়জঙ্গলের অন্য নাম তাই ঢেঁকুরগড়। অনেকে বলেন, ইছাই ঘোষই দেবী ভগবতীর দেউলটি তৈরি করেন। কারও মতে, প্রায় ন’শো বছর আগে ইছাই ঘোষের উত্তরসূরিরা মন্দিরটি নির্মাণ করেন। আবার পঞ্চাশ ফুট উঁচু গম্বুজটি এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। এখন মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ বসানো আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী, কর্ণসেনের ছেলে লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাজিত করে হত্যা করেন।

গড়জঙ্গলের গভীরে শ্যামারূপা মন্দির। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে এখানেই নাকি কবি জয়দেবের সাক্ষাৎ। জয়দেব প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন। শ্যামারূপা আদতে দেবী চণ্ডী। নরবলিও হত। এক সময়ে আপত্তি করেন জয়দেব। পূজারি কাপালিককে দেখিয়ে দেন মায়ের শ্যাম রূপ। সেই থেকেই শ্যামারূপা।

গড়জঙ্গল থেকে ফিরে, শেষ বিকেলে মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রমের সামনের বটতলায় কাটে কিছু ক্ষণ। কত কথা, কত অজানাকে জানা। মাঝেমধ্যে কোনও বাউল এসে বসে, শোনায় গান। গল্প-গানে সন্ধ্যা নামে।

“ছেলের সঙ্গে কী এত গপ্‌পো হচ্ছে মাস্টার?”

“তেমন কিছু না। বিশ্ব সংসারের কতটুকুই বা জানি...”

“এই তোমার এক দোষ মাস্টার। সব কথাতেই প্যাঁচ। তোমার মতো পণ্ডিত যে দশ গাঁ ঘুরলেও পাওয়া যাবে না এ কথা সবাই জানে” যাদবের বিনয়ে বিরক্ত বন্ধু সাধন দাস।

“দুনিয়াটা দশ গাঁ নিয়ে নয় সাধন,” স্মিত হেসে বলেন যাদব।

“বাদ দাও তোমার তত্ত্বকথা, একটা কাজের কথা শোনো। তোমার ছেলেটার গলা ভারী সুন্দর। ওকে আমার কাছে পাঠাও, তার পর দ্যাখো কেমন কীর্তনীয়া তৈরি করি,” বিরক্তি ভুলে সাধন গদগদ। ছেলেটাকে তৈরি করতে পারলে দলের সুনাম, রোজগার দুই-ই বাড়বে।

“কীর্তনীয়া! কেন?” আচমকা প্রস্তাবে যাদব অবাক।

“ক্ষতিটা কী শুনি? পয়সা রোজগারের সঙ্গে পুণ্যিও হবে। মনে রেখো, কলিযুগে একমাত্র হরিনামেই মুক্তি,” সাধন বলেন হাসিমুখে।

“আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...”

“মানে? কলিযুগে নামেই মুক্তি, এ কথা তুমি মানো না?”

“তাই বলেছি? হঠাৎ গুরুদেবের কথা মনে পড়ল...”

“তুমি আবার কোন গুরু ধরলে হে?”

“রবীন্দ্রনাথ।”

“বলতেই পারতে ছেলেকে আমার দলে দেবে না। সবেতেই প্যাঁচমারা কথা তোমার,” মুখবিকৃতি করে হাঁটা লাগান সাধন।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল তমাল। বাবা যে আচমকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে টেনে আনবে, ভাবতেই পারেনি। পড়ার বইয়ের বাইরেও কত গল্প, কবিতা পড়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। বাবার মুখেও শুনেছে কত কথা। সাধনকাকার রাগে মজা পেয়ে ‘বীরপুরুষ’ কবিতার মতো ‘হারে রেরে রেরে’ করে তেড়ে গেল। তবে একটু গিয়েই থমকে গেল। মনে পড়ল সাধনকাকা নিম্বার্ক আশ্রমের ঘনিষ্ঠ। জয়দেবের সবচেয়ে বড় আশ্রম। এক সময় মেলা, শনি-মঙ্গলের হাট ওরাই বসাত। এখনও ওদের পিতলের রথেই পালন হয় রথযাত্রা। সাধনকাকার জন্যই উঠতে পারে রথের উপর। রেগে গেলে যদি আর উঠতে না দেয়? মনকে বাগে এনে পিছন ফিরল তমাল। বাবা তখন গান ধরেছে, ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...’ আকাশের দিকে তাকাল তমাল। অনুভব করতে চাইল লালরঙা বল।

সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তমালের। ভেঙে গেল ঘুম। ভাঙল গানের রেশ নিয়ে। অনেক দিন পরে মনে পড়ল গ্রামের কথা। করোনার কারণে এই বছর জয়দেব মেলা না হওয়ায় হবে না যাওয়া। মা-বোন প্রতি বছর না গেলেও নিজে নিয়ম করে মেলার সময় যায়। দেখা হয় টিকরবেতার সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে। আত্মীয়রা বেশির ভাগই ওখানে আর থাকে না। তমালের মতোই মেলার সময় আসে। টিকরবেতাও আর আগের মতো নেই। থেমে গিয়েছে ঠুকঠাক। প্রায় কেউই আসেনি পিতল-কাঁসার পৈতৃক পেশায়। বদলে গিয়েছে জয়দেবও। আশ্রম-সংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে জমির দাম। এক সময়ের ভরা অজয় আজ শুকনো প্রায়। সেই চরেও আশ্রম। হোটেল গড়ে না উঠলেও তৈরি হয়েছে রিসর্ট। কলকাতার বাবু-বিবিদের উইকএন্ড টুর স্পট। বাইরে থেকে কুঁড়ে মনে হলেও ভিতর হোটেল-সমান। গ্রামীণ হাটও আর আগের মতো নেই। হয়েছে পাকা ছাউনি। নেই নিম্বার্ক আশ্রমের পিতলের রথও। বদলে ছোট লোহার রথ। বাস রুট বেড়েছে, বেড়েছে মোবাইল, বাইকের ব্যবহার। অপেক্ষা শুধু অজয়ের উপরে ব্রিজের। ভোল বদলে যাবে এলাকার।

বদলেছে জয়দেব মেলাও। বাউলের মেলা আজ কীর্তনীয়াদের দখলে। বিরাট আলো ঝলমলে আখড়ায় কীর্তনের আসর। রাধাবিনোদ মন্দির চত্বরের বদলে দোকানপাট বেশির ভাগই অজয় চরে। সেখানেও বড়-বড় আখড়া। যে মেলা হ্যাজাক, লণ্ঠনের আলোয় শুরু হয়েছিল অক্ষয় বটতলায়, সেই মেলাই এখন মাইক-বক্সে গমগমে, ঝমঝমে। গরুর গাড়ির বদলে পার্কিং লটে হাজার-হাজার গাড়ি-বাইক। মেলার রেশ গড়িয়েছে ও পারেও। আখড়া না থাকলেও থাকে পার্কিং লট, দোকানপাট।

অনেক দিন পরে গ্রামের কথা মনে পড়লেও, বাবার কথা মনে পড়ে রোজই। এই পর্যন্ত একটা দিনও পার করেনি বাবাকে স্মরণ না করে। তবে ছোটকাকার ফোনের পরে সারাক্ষণই মনজুড়ে বাবা। মীনাক্ষীরও নিশ্চয়ই তাই। তবুও তমাল দশ-বারো বছর পেয়েছে পিতৃসান্নিধ্য, মীনাক্ষীর তো মনেই নেই। তমালের মুখে শুনেই অনুভব করেছে পিতৃটান। ভাল লাগে তমালের, গর্বও হয়। এক জন মানুষকে কতটা অনুভব করলে পরে অন্যের আকর্ষণের বিষয় করা যায়! তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পিতৃতর্পণই হবে চরম অমঙ্গলদায়ক।

প্রায় ভোর রাতে ফিরেছে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর থেকে। ড্রাইভারের অসুবিধের জন্য ইচ্ছে থাকলেও থাকা যায়নি। সারা রাস্তা মীনাক্ষী শুনিয়েছে হরিদ্বারের পরিকল্পনা। ইন্টানেটে দেখেছে করোনার জন্য সরাসরি হরিদ্বার যাওয়ার ট্রেন আপাতত নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লির ট্রেন আছে, তাই দিল্লি হয়েই হরিদ্বার যাবে। হোটেলের অ্যাভেলিবিলিটিও দেখে নিয়েছে। কী ভাবে খুঁজবে সেই প্ল্যানও করে ফেলেছে। অদ্ভুত বিষয়, বিয়ের ডেট এবং অনুজ প্রসঙ্গ এক বারও তোলেনি। যেন বিয়ে ঠিকই হয়নি! তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত, দাদা সঙ্গে যাবেই। বোনের উৎসাহের মাঝে তমাল জানাতে পারেনি নিজস্ব সিদ্ধান্ত। চায়নি মাঝরাস্তায় মনকষাকষিও। তবে জানিয়েছে, করোনা উপেক্ষা করে বাবা যদি হরিদ্বারে যায়ও, তা হলেও কতটা কঠিন তাঁকে খুঁজে বার করা। দমানো যায়নি মীনাক্ষীকে। শেষ চেষ্টা করবেই।

বাড়ি ফিরেই ঘুম। বোনের পরিকল্পনা গোপন করে মাকে শুধু জানিয়েছে, খোঁজ মেলেনি বাবার। নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়েছে। রাগ, অভিমান ঝেড়ে ফেলে আবার হাল ধরতে উদ্যোগী হয়েছে। মীনাক্ষী যে ঘুম থেকে ওঠেনি, গলা না পেয়ে আন্দাজ করল তমাল। আন্দাজ ঠিক হলে, মা এখনও জানে না হরিদ্বার পরিকল্পনা। বিষয়টা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তুফান তোলার আগেই সাইক্লোনকে নিষ্ক্রিয় করা জরুরি। সাইক্লোন নিষ্ক্রিয় করতে পারে একমাত্র নিজস্ব সিদ্ধান্ত। মনে-মনে প্রস্তুতি নিল তমাল।

॥ ৮ ॥

সোজা পথে চলতে-চলতে মোড় পড়বেই। মোড়েই মুশকিল। কোন পথ যে পৌঁছে দেবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে, তা অজানা। আন্দাজে নির্ভর করতেই হয়। ঠিক নির্বাচনেও নিস্তার নেই। আবার পড়বে মোড়। এ বারে ওতরানো গেলেও, পরের মোড়ে? সব নির্বাচনই যদি ঠিক হয়, তা হলে গন্তব্যে পৌঁছনো নিশ্চিত। কিন্তু কোনও এক মোড়ে ভুল হলে? সেই মোড়ে ফিরে এসে নতুন রাস্তা আন্দাজ করা ছাড়া উপায় নেই। এমনও হতে পারে এক মোড়ের সব রাস্তাই ভুল, ফিরতে হবে আগের মোড়ে। এই ভাবে যদি পেরিয়ে যাওয়া মোড়ের পর মোড়ের কাছে ফিরতে হয়, জীবন হয়ে ওঠে গোলকধাঁধা।

"আপনি কী চাইছেন?"

"বিয়েটা হোক।"

"সেটা কিন্তু আমার বা আপনার হাতে নেই।"

"জানি, তাই তো..."

"আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু আপনার বোন যদি রাজি না হয়, তা হলে আমি কী করতে পারি বলুন?" কেটে-কেটে অনুজ বলল।

"একটু অপেক্ষা করতে পারো না?" তমালের কাতর আর্তি।

"কেন করব? কেন প্রশ্রয় দেব ওর এই আচরণকে? বিয়ের আগে যদি এই হয়, তা হলে বিয়ের পরে কী হবে ভেবে দেখেছেন? মানুষ ফ্যামিলি গড়ার জন্য বিয়ে করে, ডিভোর্সের জন্য নয়," ক্ষোভ গোপন করে না অনুজ। গোপন করে লাভও নেই আর। সময় এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

"তোমার দিকটা আমি ভালই বুঝতে পারছি। কোনও দিক দিয়েই তুমি ভুল নও। তবুও..."

"তবুও চাইছেন বিয়েটা হোক! শুধু শুধু দু'জন মানুষ জেনেবুঝে অশান্তির জালে জড়িয়ে পড়ুক। কেমন দাদা আপনি?" সরাসরি আঙুল তুলতে দ্বিধা করল না অনুজ।

"দায়িত্ববান যে নই সে তো বুঝতেই পারছ..."

"ইউ আর নট ওনলি ইরেসপনসিবল, হাইলি ইমোশনাল অলসো। কিন্তু জীবনটা তো এ রকম নয়," অনুজের মুখে ব্যঙ্গ হাসি।

"প্র্যাকটিক্যালি যদি চিন্তা করো অনুজ, তা হলে এই রকম সিচুয়েশনে আগে কখনও পড়েছ? আন্দাজ করতে পারি পড়োনি। পড়লে এই সম্পর্কটা সাত বছর টিকত না। সাতটা বছর নিশ্চয়ই একতরফা ভাবে টেকেনি?" অনুজ-বাণেই অনুজকে ঘায়েল করতে চাইল তমাল।

"মোর দ্যান ওয়ান উইক মিনু আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখে না। আমার অপরাধ কী, না মায়ের অসুস্থতার জন্য আমি চেয়েছিলাম বিয়েটা ঠিক সময়েই হোক। আপনিই বলুন তো দাদা, ভুল চেয়েছিলাম? আনসার্টেনটির পিছনে ছুটে নিজের ফিউচার নষ্ট করা কি উচিত?" অভিমান অনুজের গলায়।

"একেবারেই উচিত নয়। তুমি বিশ্বাস করো, আমার দিক থেকে সমস্ত চেষ্টাই আমি করেছি যাতে বিয়েটা ঠিক সময়েই হয়। কিন্তু..."

"কী চেষ্টা করেছেন?"

স্থির চোখে অনুজের দিকে তাকিয়ে থাকে তমাল। সে চেষ্টা করেছে তার মতো করে। কথা বলেছে মায়ের সঙ্গে।

"আমি একাই হরিদ্বার যাব।"

"পাগল হয়েছিস! তুই গেলে বিয়েটা হবে কী করে?"

"তুমি যে বলো, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই। সেটা কি ভুল?"

"বিবেচনাবোধও কি ঈশ্বরের দান নয়?"

"অস্বীকার করছি না। আমি গেলে বিয়েতে কোনও অসুবিধে হবে না। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব," তমালের আশ্বাস।

"তবুও, বাড়ির বড় ছেলে বোনের বিয়েতে থাকবে না, এ হয় নাকি?" মানতে পারছেন না তপতী।

"এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই মা। মিনুকে কিছুতেই বাগে আনা যাবে না। সবই তো বললাম তোমায়। আমি যাই, গিয়ে দেখি সেই সাধু সত্যিই বাবা কি না, এর মধ্যে বিয়েটাও হয়ে যাবে," তমাল সিদ্ধান্ত জানায়।

"হবে না।"

চমকে উঠল তমাল, তপতী। কখন যে ঘুম ভেঙে মীনাক্ষী উঠে এসেছে টেরই পায়নি।

"কেন?" মা, ছেলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

"তোমরা আমার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাচ্ছ। মানুষটা সত্যিই যদি আমার বাবা হয়, তা হলে আমি চাই তিনিই আমাকে সম্প্রদান করুন," দৃঢ় গলায় জানাল মীনাক্ষী।

"বাবা থাকতে কি অন্য কেউ সম্প্রদান করে না? তোর ছোটকাকা সম্প্রদান করলে অসুবিধে কী?" তপতীর ঝাঁঝালো প্রশ্ন।

"অসুবিধের কথা তো বলিনি, বলেছি আমার ইচ্ছের কথা। আমার বিয়েতে আমার কি কোনও ইচ্ছে থাকতে পারে না?" নাছোড় মীনাক্ষী।

"অবশ্যই পারে। কিন্তু বিষয়টা একটু প্র্যাকটিক্যালি ভাব মিনু। তুই হরিদ্বার গেলে বিয়েটা পিছোতেই হবে। কী কারণ দেখাব ও বাড়ির লোককে?" বাস্তব ব্যক্ত করল তমাল।

"কারণ তোদের কিছুই দেখাতে হবে না। আমিই জানিয়ে দেব।"

"যাদের নেমন্তন্ন করা হয়ে গিয়েছে তাদের কী বলব? বলব যে, মেয়ে বাপকে খুঁজতে গিয়েছে তাই বিয়েটা এখন হচ্ছে না?" তপতীর গলায় ব্যঙ্গ।

"হারানো মানুষকে ফিরে পাওয়ার আশায় তারা তো মনে হয় খুশিই হবে।"

"ছাই হবে। একটা কথা জেনে রাখ, ওই চোরের মুখদর্শনও আর কেউ করতে চায় না," ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল তপতীর।

"কেউ না চাক, আমি চাই। চোরের মেয়েরও তো বিয়ে হয় মা। চোরই সম্প্রদান করে। ভেবে নাও না, এটাও কোনও এক চোরের মেয়ের বিয়ে," ম্লান হেসে বলে মীনাক্ষী।

"আমার কথা শোন মিনু, বিশ্বাস কর আমাকে। ওই সাধু যদি সতিাই আমাদের বাবা হয়, তা হলে যেমন করে পারি আমি তোর কাছে হাজির করব," তমালের শেষ অস্ত্র।

"তুই কনফিডেন্ট যে, নিয়ে আসতে পারবি?"

"পারব রে... পারব।"

"না, পারবি না। আমি জানি বাবাকে তুই ভালবাসিস, শ্রদ্ধা করিস। আমার চেয়ে বেশিই করিস। তবুও তুই পারবি না," মীনাক্ষী শান্ত, ধীর।

"কেন?" আকুল প্রশ্ন তমালের।

"বাড়ির বড় ছেলে তুই। অনেক দায়িত্ব তোর উপরে। ব্যালান্স, কম্প্রোমাইজ় যে তোকে করতেই হবে দাদা।"

"তুই বলতে চাস, বাবাকে চিনেও আমি ফিরিয়ে আনব না?"

"হতেও পারে। তা ছাড়া ফিরতে চাইলে তো ফেরাবি। একটা কথা শোন, আমার চেয়ে তুই অনেক সফ্ট হার্টেড। আমার যে ডেসপারেশন আছে সেটা তোর নেই। তাই আমাকে যেতেই হবে। তুই সঙ্গে গেলেও যাব, না গেলেও যাব," নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে দ্বিধা করল না মীনাক্ষী।

"আমাকে ছাড়া চিনবি কী করে?"

"ছোটবেলা থেকে যে শুনে এলাম, রক্ত চেনে রক্তকে।"

সবটা শুনে অনুজের বক্তব্য, "অ্যাবসার্ড..."
"হয়তো তাই।"
"হয়তো মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন? যে মানুষটাকে মিনুর মনেই নেই, সে চিনে ফেলবে শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে, ব্লাড রিলেটস?" বিস্ময়, বিরক্তি অনুজের মুখে।
"জানি না অনুজ, এই ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকুই বা বুঝি?"
"একটা সত্যি কথা বলবেন দাদা?"
"বলব।"
"আপনিও কি ফিরে পেতে চান আপনার বাবাকে?"
"চাই।"
"কেন?"
"বাবা আমাকে প্রকৃতি দেখতে শিখিয়েছিল অনুজ। শুধু দেখতে নয়, অনুভব করতেও কিছুটা শিখিয়েছিল। শিক্ষা যে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি..." গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে এল তমালের।
"ডু ইউ রিয়্যালি লাভ ইয়োর ফাদার?" অনুজের দ্বিধান্বিত প্রশ্ন।
"টু বি অনেস্ট, মোর দ্যান মাইসেল্ফ..." চোখের জল বাগ মানেনি, তবুও কোনও রকমে বলল তমাল।
"দাদা, আমি জানি না এই সিচুয়েশনে কী বলা বা করা উচিত। বাট আই ক্যান গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। আই উইল ওয়েট..."
"আর একটা কথা দিতে পারো?"
সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে ছিল অনুজ।

॥ ৯ ॥

টিকে থাকার সংগ্রাম সব প্রাণীর মতো মানুষও করে। কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে মানুষের আছে অদম্য কৌতূহল। এই কৌতূহলই অন্যতম কারণ, যা মানুষকে অন্য প্রাণীদের থেকে উন্নত করেছে। তবে কৌতূহলের বিষয়বস্তু আগেও যা ছিল, এখনও তাই। ভাল থাকার অদম্য চেষ্টা। পুরোটাই পার্থিব। অপার্থিব বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? তবুও কিছু মানুষ চিরকালই হেঁটেছে উল্টোমুখে। সরাসরি উন্নতিতে যোগদান না করলেও দেখাতে পেরেছে দিশা, দিতে পেরেছে শান্তি সন্ধান।

"পাখিরা কি শুধু খাবারের খোঁজেই ওড়ে?"
"প্রকৃতি দেখতেও ওড়ে।"
"ওরা বুঝতে পারে প্রকৃতিকে?"
"আমাদের মতো না পারলেও, পারে।"
"কেমন করে?"
"অনুভব করতে পারে বাতাস। বুঝতে পারে মাটি। মাটি থেকে গাছ হয়, সেই গাছে বাসা বাঁধতে হয়, ডিম পাড়তে হয়, বাচ্চা পালন করতে হয়," মৃদু হেসে বললেন যাদব। ছেলের কৌতূহলে বিরক্ত হন না। ভাল লাগে, এই বয়সে ক'জন ভাবে এমন করে?
"কী করে বোঝে?"
"সে রহস্য বোঝার ক্ষমতা কি মানুষের আছে? আমিও ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, সৃষ্টি মুহূর্তে প্রকৃতি জীবকে দীক্ষিত করে টিকে থাকা আর বংশ বিস্তারের মন্ত্রে। তাই অতি হিংস্র প্রাণীও যত্নে সন্তান পালন করে। শুধু শ্রেষ্ঠ জীব মানুষেরই আছে সর্বাধিক মস্তিষ্ক ব্যবহারের ক্ষমতা। তবে সকলের সুতোই বাঁধা কারিগরের কাছে," ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে যাদবের ব্যাখ্যা।
"তোমার কারিগর মানে তো ভগবান। ভগবানের কাছে আমরা সবাই পুতুল!" কথাগুলো একেবারেই অচেনা লাগল তমালের।
"তুমি যে ভগবানের কথা বলতে চাইছ সেই ভগবানকে আমি ঠিক বুঝি না। তবে আমরা যে তাঁর খেলার পুতুল সে কথা অনেকটাই উপলব্ধি করতে পারি," স্থির দৃষ্টিতে বলেন যাদব।
"মানুষের নিজের কোনও ক্ষমতাই নেই?" বাবার কথা যেন দুর্বোধ্য তমালের কাছে।
"সেনাবাহিনীতে কী হয় জানো? সেখানে সবাই সেনাপতির আদেশ পালন করে। নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা সেনাদের দেওয়া হয় না। দিলে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। মহাজগতেও বিষয়টা একই রকম। বিশৃঙ্খলা এড়াতে সবার সুতোই কারিগরের হাতে," উদাস দৃষ্টি, মোলায়েম স্বরে বলেন যাদব।
চিন্তায় পড়ে গেল তমাল। বাবার কথা ফেলতেও পারছে না, গিলতেও অসুবিধে। বাঁধের উপর দৌড়য়, নদীর চরে খেলা করে, রাধাবিনোদকে প্রণাম জানায়, সে কি নিজের ইচ্ছেয় নয়? বেশ খানিক ক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে যা করছি কিছুই কি নিজের ইচ্ছেয় নয়?"
"একটা কথা ভেবে দ্যাখো, ওই ইচ্ছেগুলো হচ্ছে কেন? ভাবলে দেখবে, প্রত্যেকটা ইচ্ছেরই একটা সময় এবং উদ্দেশ্য আছে। যখন-তখন মনে যে কোনও ইচ্ছে জাগে না। আরও তলিয়ে যদি ভাবো তা হলে বুঝবে, তোমার ইচ্ছেপূরণ বা পূরণের চেষ্টা কোনও না কোনও ভাবে মানুষের উপকার অথবা অপকার করছে। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি। আমার তো মনে হয়, আমরা যে যার নির্দিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি মাত্র। বাড়তি কিছু করতে গেলেই গন্ডগোল," স্মিত হাসি যাদবের ঠোঁটে।
"অপকার! তার মানে তো মানুষের ক্ষতি?" বিভ্রান্ত তমাল।
"প্রকৃতিতে শুধু ভাল মানুষই থাকবে? মন্দ মানুষেরও যে সমান অধিকার," যাদবের মুখে স্মিত হাসি।
"মন্দ মানুষের সৃষ্টি হল কেন?" বিভ্রান্তি বেড়ে গেল তমালের। শুধু ভাল মানুষই কি কাম্য নয়?
"লয় হবে না যে। লয় না হলে নতুন সৃষ্টিও হবে না। লয়ের জন্য মানুষও যে কারিগরের অন্যতম হাতিয়ার," কঠিন কথা সহজ করে বোঝাতে চাইছেন যাদব।
"সৃষ্টির সময়ে মানুষ হব না পাখি, পছন্দ করা যায়?"
সশব্দ হেসে উঠলেন যাদব। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোনটা পছন্দ করবে তুমি?"
"পাখি..."

উড়ে চলেছে পাখির ঝাঁক। যেন গন্তব্যহীন উড়ে চলা। ওদের দেখেই তমালের মনে পড়েছে বাবার কথা। বাবা বলেছিল, গন্তব্যহীন যাত্রা হয় না। সকলেই এগিয়ে চলেছে নিজস্ব নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওরাও কি উড়ে চলেছে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়?
যাত্রা অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে অনুজ। সত্যিই যে কথা রেখে সঙ্গী হবে ভাবতে পারেনি তমাল। অনুজ-সঙ্গ নিশ্চিন্ত করেছে মাকে। মেয়ের উদ্ভট বায়নায় বিয়েটা অন্তত ভেস্তে যাবে না। তমাল আন্দাজ করতে পারে, অনুজকে পাশে পেয়ে বোনও খুশি হয়েছে। কে আর ভাঙতে চায় ভালবাসার সাতমহলা? যাত্রার সুবিধে করেছে ভারতীয় রেলও। একেবারে শেষ মুহূর্তে চালু করেছে হাওড়া থেকে কুম্ভ-স্পেশ্যাল। মকর সংক্রান্তি অর্থাৎ চোদ্দই জানুয়ারি যে মেলা শুরু হয়, সেই মেলা কোভিডের কারণে এই বছর শুরু হচ্ছে পয়লা এপ্রিলে। চলবে আঠাশে এপ্রিল পর্যন্ত। শিবরাত্রির স্নান ঘোষিত মেলার আগেই। তা হলে কি সাধু আসবেন?
সংশয় আরও ছিল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে কোভিড টেস্ট করিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ ছিল না, মেলার আগে না মেলার জন্য নির্ধারিত সময়ে। ঝুঁকি নেয়নি তমাল। তিন জনেরই টেস্ট করিয়েছে। সেই নিয়েও বিস্তর সমস্যা। টেস্টের ভ্যালিডিটি বাহাত্তর ঘণ্টার, তাই দিনের দিন রিপোর্ট আবশ্যিক। অনেক জায়গা ঘুরে এক বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ন'শো পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে করিয়েছে আরটি-পিসিআর টেস্ট। পজ়িটিভ জীবন কাঙ্ক্ষিত হলেও, টেস্টের ক্ষেত্রে নেগেটিভই কাম্য।
বিপত্তি কি আরও ছিল না? ট্রেন-যাত্রায় আপত্তি জানিয়েছিল অনুজ। যেহেতু প্লেন যাত্রায় অভ্যস্ত, তাই কম সময়ে দেহরাদূন পৌঁছতে

চেয়েছিল। সেখান থেকে ভাড়াগাড়িতে হরিদ্বার ঘণ্টা দুয়েক। আপত্তি জানিয়েছিল তমাল। অনুজ প্লেন ভাড়া দেবে জেনেও জানিয়েছিল। প্লেন যাত্রার তেমন অভ্যেস নেই এবং অন্যের টাকায় সুযোগ নিতেও মন সায় দেয়নি। তা ছাড়া প্লেনে বদ্ধ জায়গায় হাওয়া চলাচলের উপায় নেই। অল্প ক্ষণ হলেও বসতে হবে গায়ে-গায়ে। সেই কারণে ক্ষমতায় কুলোলেও ট্রেনে এসি কামরা বুক করেনি। একেবারে নন-এসি থ্রি-টিয়ারের সাইড লোয়ার। ঘেঁষাঘেঁষি নেই, হাওয়াও পর্যাপ্ত। তবে মীনাক্ষী সমর্থন না করলে সহজ হত না সিদ্ধান্ত।

"আপনার মাস্ক নেই?"

"ব্যাগের ভিতরে..."

"এই নিন পরুন," মাস্ক বাড়িয়ে দিল তমাল। সঙ্গে প্রচুর সার্জিক্যাল মাস্ক আর হ্যান্ড স্যানিটাইজ়ার নিয়ে এসেছে। রাস্তাঘাটে নিজেকে বাঁচিয়ে চললেও ট্রেনে অসম্ভব। একটু সচেতন হতে মানুষের যে কী সমস্যা বোধগম্য হয় না। আশপাশে বেশির ভাগই মাস্কহীন। অথচ ট্রেনে ওঠবার সময়ে প্রায় সকলের মুখেই মাস্ক ছিল। অতীতচারণের বেখেয়ালে পরিস্থিতি বদল টের পায়নি। সবাইকে সরাসরি বলা না গেলেও উল্টো দিকের বয়স্ক মানুষটিকে বলতেই হল। সাদা কাপড়, গলায় কণ্ঠি, বোঝাই যাচ্ছে বৈষ্ণব গুরু। শিষ্যদল নিয়ে হয়তো চলেছেন কুম্ভে। বেনারসও হতে পারে। স্পেশ্যাল ট্রেন যাবে মোগলসরাই হয়ে। সদ্য নামকরণ হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন।

"কী দরকার, দূরেই তো আছি," একটু হেসে বললেন বাবাজি।

"আপনার দরকার না থাকলেও আমার আছে। পরে ফেলুন," ইচ্ছে করে গলা চড়ালো তমাল। কাজও হল। আশপাশের দু'চারজনও পরে ফেলল মাস্ক। ইচ্ছে করেই সিট নামায়নি তমাল। পা ছড়ানোর আয়েশের চেয়ে জীবন বাঁচানো জরুরি।

মাস্ক পরে বোধহয় বিষণ্ণবোধ করলেন বাবাজি। করুণমুখে চেয়ে রইলেন জানালার বাইরে। শিষ্যদলের বেশির ভাগের সিট পড়েছে কামরার অপরপ্রান্তে। এক সময়ে সেখান থেকে এক শিষ্য খাবার নিয়ে এল। তমালের দিকে তাকালেন বাবাজি। বুঝতে পেরে সম্মতি জানাল তমাল। মাস্ক খুলে খেতে বসলেন তিনি। বছর সত্তরেও থালায় ভাল পরিমাণ ইডলি, ডাল, তরকারি, মিষ্টি। খাওয়া সেরে আবার মাস্ক পরে তমালকে বললেন, "আপনি প্রসাদ নেবেন না?"

"একটু পরে নেব। আরও দু'জন আছে সঙ্গে," হেসে বলল তমাল। মেলায় বৈষ্ণব-সঙ্গ অভিজ্ঞতায় 'প্রসাদ' বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ইষ্টদেবকে নিবেদন করে খাওয়া। অনেকে সেবাও বলে।

"বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?"

"ওই আর কী... হরিদ্বার।"

"বুঝেছি, শিবরাত্রির স্নান করতে যাওয়া হচ্ছে," মৃদু হাসি বাবাজির মুখে।

"ঠিক স্নান নয়। খুঁজতে যাচ্ছি...," বয়স্ক মানুষটিকে অসত্য বলতে বাঁধল যেন তমালের।

"খুঁজে চলাই তো কাজ আমাদের..."

চুপ করে গেল তমাল। সকলেই চলেছে অমৃত সন্ধানে। নিজেও যা খোঁজ করছে, তাও কি অমৃত নয়?

চায়ের নেশা তমালের। বাড়ি থেকে ফ্লাস্কে চা বানিয়ে এনেছে। যত ক্ষণ ট্রেনের বিস্বাদ চা এড়ানো যায়। করোনার সময়ে বাইরে কিছু খেতেও অনিচ্ছুক, তাই দুপুরের খাবারও খেয়ে বেরিয়েছে। পথের পুরো খাবার নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। ট্রেন ছেড়েছে দুপুর একটায়। এখন বাজে দুটো। বাড়ির খাবার অনেক ক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছে।

"আপনি তো ও দিকে বেশ জমিয়ে ফেলেছেন দাদা? কী বলছে গুরুদেব? শিষ্য করতে চাইছে নাকি?" অনুজের কৌতূহল।

হাসিখুশি অনুজকে দেখে ভাল লাগল তমালের। মীনাক্ষীকে সত্যিই ভালবাসে সন্দেহ নেই। এখন ভালয়-ভালয় বিয়েটা হলেই নিশ্চিন্তি। অনুজের প্রশ্নে বলল, "না, সে রকম কোনও প্রস্তাব এখনও দেয়নি। তবে মানুষটা ভাল।"

"এদের একদম বিশ্বাস করবেন না দাদা। মোস্ট অফ দেম আর ফ্রড," চাপা স্বরে অনুজ।

"কারও সম্বন্ধে না জেনে কমেন্ট করা কিন্তু অপরাধ..."

আচমকা নারীকণ্ঠে তমাল, অনুজ দু'জনেই চমকে উঠল। প্রতিবাদ করেছেন উল্টো দিকের গেরুয়া শাড়ি পরিহিতা এক মাঝবয়সি মহিলা।

"আপনি আমাকেও অপমান করেছেন। আমি জুনা আখড়ার উদাসীন," অনুজের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন মহিলা। অনুজ হতভম্ব।

"সাসপেন্সে উদাসীন থাকা কিন্তু বেশ কঠিন," হাল ধরতেই হল তমালকে।

"মানে?"

"আপনার মোবাইলে সানডে সাসপেন্স বাজছে। আপনি সাসপেন্স খুব ভালবাসেন, না?" ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলল তমাল। মহিলার বেশভূষার সঙ্গে আচরণের অমিলে চরিত্র বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিছু মানুষ কোনও কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। ভোগবাদ শেষ করে আসে আধ্যাত্মবাদে। সেখানেও 'কী পেলাম' ছেড়ে খুঁজে বেড়ায় 'কী পেলাম না'। সর্বক্ষণ সন্দেহ, অসন্তোষ, ক্ষোভ।

"আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন..." মহিলার ফরসা মুখ লাল।

"দাদা ধর," স্যান্ডউইচ-মিষ্টি এগিয়ে দিয়েছে মীনাক্ষী। অনুজের সঙ্গে নিজেও নিয়েছে।

"সরি। আমরা খেয়ে নিই, তার পর চা খেতে-খেতে কথা বলব আপনার সঙ্গে," মহিলার উদ্দেশে বলল তমাল।

"কোনও প্রয়োজন নেই," তীব্র দ্বেষ মহিলার চোখে।

অনুজ, মীনাক্ষীর ইশারায় থেমে গেল তমাল।

খেতে-খেতে উল্টো দিকে চোখ বোলাল তমাল। ছ'জনের মধ্যে দু'জন মাঝবয়সি লোক। মহিলার সঙ্গে ফিসফিস করছে দেখে বোঝাই যায় একই দলের। দু'জন বয়স্ক স্বামী-স্ত্রী বাবাজির ভক্ত, সেটা বাবাজির সঙ্গে আন্তরিকতায় আগেই স্পষ্ট। একটি সিটে ঝোলা ব্যাগ রাখা। অস্পষ্ট পড়া যাচ্ছে কোনও এক মঠের নাম। আন্দাজ করা যায়, রাতে বাবাজির কোনও শিষ্যের আশ্রয় হবে সেটি। পাশের কুপে নিজে এবং বাবাজি। উল্টো দিকে ছ'জনই মাঝবয়সি পুরুষ, চলেছে হরিদ্বার। ট্রেন ছাড়ার সময়ে কুম্ভে কোভিড প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা শুরু করলেও কখন যে রাজনীতিতে ঢুকে পড়ল নিজেরাই জানে না। সেই আলোচনা এখন তর্কে গড়িয়েছে। কামরার বেশির ভাগের গন্তব্যই বোধহয় হরিদ্বার।

মাত্র কুড়ি মিনিট লেট। একে-একে পার হয়ে এসেছে মধুপুর, যশিডি, মোকামা, পটনা। কোভিড পরিস্থিতিতে লোকাল ট্রেন বন্ধ। চলছে শুধু দূরপাল্লার কিছু স্পেশ্যাল ট্রেন। লাইন ফাঁকা পেয়ে ছুটছে দুরন্ত গতিতে। ট্রেন গতিতে চললে মানুষের বোধহয় দিল খুশ হয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমোতে চায়। ছোটবেলার অভ্যেস যেন কাটে না বড়বেলায়ও। কামরার সবাই ঘুমে। মীনাক্ষী, অনুজ বেশ কিছু ক্ষণ গল্প করলেও এড়াতে পারেনি দুলুনির মোহ। বাবাজিও সাইড আপারে উঠে গিয়েছেন। সন্ধেবেলায় গল্প করেছেন বেশ কিছু ক্ষণ। নাম বনমালী দাস, বাড়ি নবদ্বীপ। হরিদ্বার হয়ে যাবেন বৃন্দাবন। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নবদ্বীপের আশ্রমে যাওয়ার। কথা দিয়েছে তমাল। ভালই লাগে সাধুসঙ্গ, অধ্যাত্মকথা। এখনও জেগে বসে রয়েছে দূর থেকে এক বার কাশীর ঘাটগুলো দেখবার জন্য। বাবার মুখে কত গল্প শুনেছে! ট্রেন বেনারস পৌঁছবে রাত দুটোয়।

"মহাত্মা কে উপর পানি ছিড়কতে হো? দেখকে তো পড়ালিখা লগতা হ্যায়..."

টয়লেট থেকে বেরিয়ে বাইরের বেসিনে হাত ধুচ্ছিল তমাল। কথা

কানে যেতেই হাসি পেয়ে গেল। সত্যিই কুম্ভ-স্পেশ্যাল। ট্রেনে মহাত্মার ছড়াছড়ি! তাকিয়ে দেখল মেঝেয় বসে কমবয়সি দু’জন সাধু। হাত ধুতে গিয়ে জলের ছিটে লাগায় তাদেরই কেউ একজন বিরক্তি প্রকাশ করেছে।

“দুঃখিত, দেখতে পাইনি।”

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি দু’জনের।

“বাঙালি তো? কী নাম? বাড়ি কোথায়?” মজা করার লোভ সামলাতে পারল না তমাল। সাংবাদিক চোখে ধরা পড়ে অনেক অ-দেখা।

“কী করে ধরলেন?” হেসে প্রশ্ন এক জনের।

“টিকিটও নেই নিশ্চয়ই?”

“আপনি পুলিশ নয়তো?” এক জনই কথা বলছে।

“না, আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার।”

“রিপোর্টার তো পুলিশের বাবা! পুলিশ আসে কেউটে বেরোনোর পরে। কেঁচো খোঁড়ে তো রিপোর্টাররাই। সত্যি বলছি স্যর, আমাদের সঙ্গে কিচ্ছু নেই...”

হো-হো শব্দে হেসে ফেলল তমাল। ঘুমন্ত যাত্রীদের কথা ভেবে থেমেও গেল। হাসি গিলে বলল, “ভয় পেয়ো না, আমি কোনও রিপোর্টিংয়ের কাজে যাচ্ছি না। তোমরা উঠলে কোথা থেকে? সারাদিন তো দেখিনি।”

“দেখবেন কী করে, এই কামরায় তো বেনারস থেকে উঠলাম। সেই আসানসোল থেকে সারা রাস্তা টিটির গুঁতো খাচ্ছি।”

“বাড়ি কোথায়?”

“স্যর, আমার নাম রতন আর ও পঞ্চা। দু’জনের বাড়িই বাঁকুড়ার বড়জোড়ায়।”

“যাবে কোথায়?”

“হরিদ্বার।”

“শিবরাত্রির স্নান করার জন্য এত গুঁতোগুঁতি?” হাসল তমাল।

“স্যর, আপনি লোক ভাল বলেই মনে হচ্ছে। যদি একটু উপকার করেন তা হলে...”

“টাকা লাগবে?”

“না স্যর, আপনি শুধু আপনার পরিচয় দিয়ে টিটিকে বলবেন, আমাদের যেন একটু দয়া করে...” রতনের আর্তি।

“আমি তো তোমাদের চিনিই না।”

“আপনি লোক ভাল, তাই কিছু গোপন করব না আপনার কাছে। পনেরো বছর বয়সে দু’জনে ঘর ছেড়েছিলাম এক সাধুর পাল্লায় পড়ে। ঠেকনা নিয়েছিলাম তারাপীঠে তারই কুঁড়েয়। ভেবেছিলাম, তারা মায়ের সাধনা করে বামাক্ষ্যাপা না হতে পারি, সত্যিকারের সাধু তো হতে পারব। কিছু দিন পরেই ভুল ভাঙল। বুঝলাম, একার ক্ষমতায় কুলোয় না বলে সেই সাধু আমাদের পাকড়াও করেছে তামাক বেচার জন্য। তখন আর ফেরার উপায় নেই। কোন মুখে বাড়ি ফিরব? বয়সও হয়ে গিয়েছে বাইশ-তেইশ। বুঝে গিয়েছি ব্যবসার আঁটঘাঁট। এক দিন সুযোগ বুঝে পালালাম। তার পর নিজেরাই ব্যবসা শুরু করলাম,” ফিসফিসিয়ে বলল রতন।

তমালের বুঝতে অসুবিধে হল না গাঁজার অন্য নাম, বলল, “বুঝলাম, তা হরিদ্বার কী উদ্দেশ্যে?” আন্দাজ পরখ করতে চাইল ও।

“তামাকের বিক্রি তো মেলা-মোচ্ছবেই বেশি হয় স্যর। আর সাধুদের কাছেই লোকে তামাক খোঁজে। তাই পোশাকটা আর ছাড়িনি। কিন্তু আড়াই মাস লকডাউন, তার উপর সব মেলা-মোচ্ছব বন্ধ। পেট চালাব কী করে? তাই কুম্ভমেলা হবে শুনে অত দূর যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম।”

“কতটা আছে তোমাদের সঙ্গে?” মুচকি হেসে তমাল প্রশ্ন করে। এরা যে মহাত্মারও উপরে!

“শ-প্যাকেট মতো আছে। অনেক কষ্টে ধারধোর করে জোগাড় করেছি স্যর। একটু দেখবেন এই গরিবদের...”

পরিমাণ শুনে আঁতকে উঠল তমাল। পরক্ষণেই বিষাদ ছাইল মনে। করোনা কারণে কত মানুষ হয়েছে কর্মহীন, কত জন করেছে আত্মহত্যা। গুলিয়ে গেল নীতিবোধ। কিছু না বলেই ফিরে এল নিজের সিটে। এ কী দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়ল! আজ রাতে টিটিই যদি নাও আসে, কাল সকালে ট্রেন লখনউ পৌঁছলে নিশ্চয়ই আসবে। নিজে আগ বাড়িয়ে টিটিইকে কিছু না বললেও ওরা বলবেই। ওদের স্বার্থেই বলবে। মালসমেত ধরা পড়লে সামলাবে কী করে? কী করে চাপা দেবে জ্ঞাত অপরাধ?

॥ ১০ ॥

মানুষের শিল্পকর্ম নিখুঁত কাম্য হলেও নিখুঁত মানুষ বড়ই বেমানান। ‘দোষে-গুণে’র ছকে পড়ে না। খাটে না কোনও থিয়োরি। সমাজমাঝে বিচিত্র জীব যেন। মানুষ হবে একটু সৎ একটু অসৎ, একটু উদার একটু স্বার্থপর, একটু হিসেবি একটু বেহিসেবি, একটু ভিতু একটু সাহসী, একটু স্নেহশীল একটু নিষ্ঠুর। ‘একটু’র সংমিশ্রণের তারতম্যেই নির্ধারিত হয় ভালমানুষ-মন্দমানুষ। ‘একটু’র অনুপস্থিতি আর ‘পুরো’র পুরোপুরি উপস্থিতি হলেই সমস্যা। ‘পুরো’ মন্দ হলে অসুবিধে তেমন নেই। যত ক্ষণ না নিজের গায়ে আঁচ পড়ছে, অনর্গল চলতে পারে কুৎসা-কেলেঙ্কারির গালগল্প। বাড়তি সময় সদ্ব্যবহারের সঙ্গে মেলে আত্মসুখ। কিন্তু ‘পুরো’ ভাল হলে? মাথা নত করতেই হয়, ভুগতে হয় হীনম্মন্যতায়। বাধ্য হয়ে সহ্য করলেও মন মানে না কিছুতেই। শুধু মানুষ নয়, জন্তু-জানোয়ারদেরও না-পসন্দ দলছুট। সুবিধে একটাই, ‘পুরো’ ভাল মানুষ প্রকৃতিতে বিরলের মধ্যে বিরলতম।

কেন যে এক জন বিরলের মধ্যে বিরলতম মানুষের সঙ্গে বিয়ে হল, দিশা পায় না তপতী। প্রথম দিকে ভালই লাগত। দশ গ্রামের মানুষ যখন শ্রদ্ধা-সম্মান করত, গর্বই হত। মহিলা মহলেও জুটত বাড়তি খাতির। এক সময় গা-সওয়া হয়ে গেল। শুরু হল নতুন সমস্যা। এক জন মানুষ যদি সব কিছুই ঠিক মতো করে, তা হলে কথা চলে কী করে? আটপৌরে মানুষের বেশির ভাগ কথাই যে অন্যের ভুল নিয়ে। বাজার আনতে ভুল হয় না, ছেলেকে পড়তে বসাতে ভুল হয় না, উপরি চা চায় না, কুটুম্বিতায় খামতি নেই, সংসারের খুঁটিনাটির প্রতিও সর্বদা সজাগ। তার উপর পাণ্ডিত্য। এমন দায়িত্বশীল, পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই নেই। প্রশ্ন নেই মান-অভিমানেরও। থাকলে হত কিছু কথা, অভিমান ভাঙানোর ছলে আদর-সোহাগ। আদর-সোহাগ যে করত না তা নয়। তবে যেন নিক্তিমাপা। ভুল করলে ক্ষমা চাওয়ারও উপায় নেই। কথা খরচের আগেই ক্ষমাদৃষ্টি। সহ্য হয় অতিমানব?

খুঁত বেরোল চুরির ঘটনায়। আকস্মিক নিজেকে অচেনা লাগল তপতীর। থানা-পুলিশ, অপমান-অপবাদের ভয় তো তেমন হল না! মন যেন পুলকিত! সে কি অসাধারণকে সাধারণে এনে ফেলার পুলক? বড়ই অদ্ভুত যেন এই মানসিকতা। বুঝতে দিল না কাউকে। নিজেকে আড়াল করতে নির্বাক হয়ে গেল। ভাবতে লাগল পরিবার, গ্রামের লোকেরও কি একই মনোভাব? কেউ তো প্রতিবাদ করল না? বলল না যে, একজন সৎ মানুষ আচমকা অসৎ হয়ে যেতে পারে না! নিজের সঙ্গে গ্রামের মানুষও যেন ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস। মানুষটা অতিমানব নয় তা হলে!

অচেনাকে চেনা লাগল বেশ কিছু দিন পরে। পরিবারিক ব্যবসায় যুক্ত হয়ে তপতী বুঝল, নিজেও সামান্য নয়। বরং এতগুলো বছর চাপা পড়েছিল অতিমানবিক ছায়ায়। চরিত্র সংস্কার সম্ভব না হলেও কর্মদক্ষতা আয়ত্ত করা সম্ভব। সেই গুণেই আদায় করে নিল সকলের সম্মান। ছেলেমেয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনেও রইল না অবহেলা। দশ গ্রাম লোকের মুখে মুখে ফেরে, কী লড়াকু মেয়েমানুষ! তপতী বুঝতেই পারেনি, স্বামীর সঙ্গে মানুষটা ছিল যেন প্রতিদ্বন্দ্বীও।

আজ নিয়তি আবার নিয়ে এসেছে প্রতিযোগিতার ময়দানে। লোকটা যদি সত্যিই নিজের স্বামী হয়, তা হলে কী করে করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা? এতগুলো বছর লড়াই করতে-করতে আজ যে বড়ই ক্লান্ত। স্বপ্ন দেখছে মেয়ের পরে ছেলের বিয়ে দিয়ে আরামের জীবনের।

মন শক্ত করল তপতী। লোকটা যদি ফিরেও আসে, কিছুতেই টিকতে দেবে না বাড়িতে। নিষ্ঠুর-নৃশংস হবে, তবুও হারাবে না নিজস্ব পৃথিবী। পৃথিবী মানে তো সংসারই বুঝে এল আজীবন।

"তোমার কী মনে হয়?"

"সে কথা তো শুনেছ..."

"আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ?"

"পারছি, কিন্তু ভাবতে পারছি না আমার কথা শুনে তোমার ছেলেমেয়ে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেবে," মাধবের অনুশোচনা। দাদার চেয়ে বছর দশেকের ছোট এবং তপতীর প্রায় সমবয়সি।

"একটা সত্যি কথা বলবে?" টেলিফোনে তপতীর আর্ত জিজ্ঞাসা।

"কেন বলব না?"

"তোমার দাদা ফিরে এলে তুমি খুশি হবে?"

থমকে গেলেন মাধব। বৌদিকে বুঝতে পেরেই থমকে গেলেন। বলতে পারলেন না, দাদা ফিরে এলে খুশিই হবেন। শুধুমাত্র একটা ঘটনা কি মুছে দিতে পারে এত দিনের স্মৃতি? বিচ্ছিন্ন ওই ঘটনা ছাড়া আর তো কোনও দিন কারও আঙুল ওঠেনি দাদার দিকে? আর অপরাধও সে ভাবে প্রমাণ হল কোথায়? দাদা প্রতিবাদ না করায় হয়ে গেল একতরফা সিদ্ধান্ত। নিজেও তো সে দিন প্রতিবাদ করেনি। কেন? তা হলে কি মেনে নিয়েছিলেন, দাদা চুরি করলেও করতে পারে? যদি করেও থাকে, তা হলেও তো জানত চাননি কারণ। নিমেষে মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল এত দিনের যাপন। আজ মাধবের অবাক লাগে নিজেরই আচরণে। তবুও নিজেকে সংযত রেখে বলেন,

"আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি বৌদি..."

"উত্তরটা কিন্তু দিলে না।"

"উত্তর যে কঠিন বৌদি। দাদা আর সহধর্মিণীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তর ফারাক। রক্তের সম্পর্ক নয় বাদই দিলাম, তবুও দাদা মানে তো আমার কাছে শুধুমাত্র কাছের জন নয়। অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা ভালবাসার। তা ছাড়া দাদা ফিরে এলে আমার সংসারারিক পরিস্থিতির কোনও হেরফেরও হবে না। ফিরে পাব অতীত, হয়তো ভালবাসাও। কিন্তু তুমি? যে মানুষটাকে ছাড়া এতগুলো বছর কাটালে, এত লড়াই করলে, সে-ই তোমার পক্ষে যে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে একটা অভ্যেস। অনভ্যাসকে অভ্যাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কতটা কঠিন, সেটা এই বয়সে বুঝতে অসুবিধে হয় না," অকপট না হয়ে উপায় রইল না মাধবের।

"তবুও খুশি হবে, তাই তো?" ম্লান হেসে বলেন তপতী।

"আজীবন পৈতৃক ব্যবসা সামলে এলাম, তাই ব্যবসা আমার রক্তে। লেনদেনের হিসেবটা ভালই বুঝি। এখন তুমি বলো, কী চাইছ আমার কাছে?" আবেগ ঝেড়ে প্রসঙ্গে আসতে চাইলেন মাধব।

"মানুষটা যদি ফিরে আসে, তা হলে অস্বীকার করতে হবে ওকে," তপতীও সরাসরি বলেন।

আবার থমকান মাধব। মনে পড়ল অজয়ের বন্যা। বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছিল জয়দেবে। নিজের জীবন বিপন্ন করে দাদা বাঁচিয়েছিল অনেক

জনকে। জল নেমে গেলে হাতে হাত লাগিয়ে গড়ে দিয়েছিল ভাঙা ঘর। গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, "সত্যিই যদি সেই সাধু দাদা হয়, তা হলে তো নিজের বাড়িতে তার হক আছে। তোমার যদি অসুবিধে না থাকে, তা হলে আমাদের উঠোনেই ঘর করে দেব দাদাকে। মেজদা বেঁচে থাকলে এমনটাই হয়তো চাইত। দাদাও খুশি হবে নিজের জায়গায় ফিরতে পেরে।"

"তবুও অস্বীকার করতে পারবে না। আমার কথাটা ভেবে দেখেছ? তুমি যদি ওকে আশ্রয় দাও তা হলে সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে ও আমার ছেলেমেয়েদের বাবা। ওরা আর ছাড়তে চাইবে ওকে? বিচ্ছেদ যেমন ভালবাসা বাড়ায় তেমনই ঘৃণারও উদ্রেক করে, বোঝো সে কথা?" গলা ভিজে আসছে তপতীর। সমব্যথী পাওয়া দুষ্কর।

"এখনই অত ভেবো না বৌদি। দ্যাখো না কী হয়..." মাধবের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা।

"একটা কথা জেনে রেখো, ওই মানুষটা যদি সত্যিই ফিরে আসে, আমি কিন্তু আত্মহত্যা করব। অতীত নিয়ে কিছুতেই আমি চলতে পারব না..." আবেগ সামলাতে পারলেন না তপতী।

থেমে গেলেন মাধব। যেন পাথর চাপা দিলেন হারানো মানুষকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছেয়।

আমি এমন মানুষ পেলাম না রে, যে আমায় ব্যথা দিল না,
নয়ন জলে বুক ভাসালাম, কেউ মুছে দিল না।

টিকরবেতায় রোজ এক জন বাউল আসত মাধুকরী করতে। রোজ গাইত একই গান। আজ সেই গানকেই যেন জীবনসার বলে মনে হল তপতীর। বেশ বুঝতে পারছে সকলেই মনে-মনে ক্ষমা করে দিয়েছে লোকটাকে। কারণ বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না। কেউই তো বঞ্চিত হয়নি, হারিয়েছে মাত্র। বঞ্চনার শিকার একমাত্র তপতী। স্বামী-সুখ, সংসার-সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে লড়াই করতে হয়েছে অর্ধেক জীবন। সেই লড়াইয়ে আত্মসুখ থাকলে, অপূর্ণতাও আছে। মানুষ তারিফ যেমন করে, করুণা করতেও ছাড়ে না। বিজয়ী পুরুষের স্বীকৃতি খাদহীন হলেও নারীর নয়। স্বীকৃতির সঙ্গে মিশে থাকে সহানুভূতি, সন্দেহের খাদ। যোগ্য মর্যাদা কখনওই মেলে না। নারী যেন পুরুষের ছত্রছায়াতেই মানানসই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তপতী। নিজের ছেলেমেয়েই যখন বুঝল না, তখন আর পরকে দোষ দিয়ে লাভ কী? ছেলে বাবাকে কিছুটা পেয়েছে তাই প্রভাবিত হওয়া আশ্চর্যের নয়। কিন্তু মেয়ের তো বাবাকে মনেই নেই। শুধুমাত্র দাদার মুখে শুনে বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল? সেও এতটা যে, নিজের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতেও পিছপা নয়? নিজেকে হেরো মনে হল তপতীর। লোকটা যেন আড়াল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েই যাচ্ছে। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান তপতী। মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন সম্মুখ সমরের। এইবার সুবিধে একটাই। লড়াই হবে সমানে-সমানে। অতিমানবের সঙ্গে নয়।

॥ ১১ ॥

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়— খেলায় মগ্ন যেন কারিগর। বিরামহীন, ক্লান্তিহীন খেলা। গড়ে ভাঙা, ভেঙে গড়ার খেলা। খেলা যুগ যুগান্তরের। কিছুতেই যেন পছন্দ হয় না নিজস্ব কীর্তি। গড়ার পরে নিরিক্ষণ করতে-করতে ফাঁক-ফোঁকর অনুভব করলেই ধ্বংস। কীর্তি-মায়া নেই, তাই দ্বিধাহীন নতুন গড়া। প্রতিবারই কীর্তি উন্নত থেকে উন্নতর হলেও, মন ভরে না কারিগরের।

কারিগর চলেন নিজের মর্জিতে। সময় জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম। ধ্বংসেরও যেন লগ্ন আছে। তাই বোধহয় পূর্ণ কুম্ভের সময়ই অতিমারির আগমন। যে সময়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষ কুম্ভস্নানে সমবেত হবে, ঠিক সেই সময়টাই যেন সঠিক লয়-লগ্ন। কিছু অপছন্দের গাছে বাজ ফেলে যেমন মৃত্যুবরণে বাধ্য করেন, শুষ্ক করেন অপছন্দের নদী, তেমনই কিছু ভুলভ্রান্তি নজরে পড়ায় কি ধ্বংস করতে চাইছেন শ্রেষ্ঠ জীবকে? সেই কারণেই কি পূর্ণ কুম্ভ, যা হয় বারো বছর অন্তর, এগিয়ে এল এক বছর?

মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাশি থেকে নির্বাচিত কিছু নক্ষত্রকে বারো ভাগে ভাগ করা হয়। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বৃহস্পতি গ্রহ যখন কুম্ভরাশিতে অবস্থান করে এবং সূর্য বা রবি মেষরাশিতে, তখনই গঙ্গা তীরে অনুষ্ঠিত হয় হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ। আগামী বছর অর্থাৎ দ্বাদশ বছরে বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করলেও রবি মেষরাশিতে অবস্থান না করায় হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ এগিয়ে এসেছে এক বছর। বিরল না হলেও এমন ঘটনা একশো ছেষট্টি বছরের মধ্যে তৃতীয় বার, তাও তিরাশি বছরের ব্যবধানে।

হরিদ্বার ছাড়াও বারো বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় আরও তিন জায়গায়। বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং রবি-চন্দ্র মকররাশিতে অবস্থান করলে মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে প্রয়াগ কুম্ভ। বৃহস্পতির সঙ্গে রবি-চন্দ্র কর্কটরাশিতে অবস্থান করলে ভাদ্র-কার্তিক মাসে গোদাবরী তীরে নাসিক-ত্র্যম্বকেশ্বর কুম্ভ। বৃহস্পতির সঙ্গে রবি-চন্দ্র তুলারাশিতে অবস্থান করলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিপ্রা নদী তীরে উজ্জয়িনী কুম্ভ। বারোটি পূর্ণকুম্ভের পরে অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ বছর পরে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হয় মহাকুম্ভ। অর্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয় ছ'বছর অন্তর শুধুমাত্র প্রয়াগ এবং হরিদ্বারে।

কারিগরের আজব খেলা ভাবতে-ভাবতে ট্রেন কখন যে হরিদ্বারে কাছাকাছি এসে গিয়েছে খেয়ালই নেই তমালের। ঘোর কাটল মীনাক্ষী-অনুজের তাড়ায়। বিদায় নেওয়ার দায় একমাত্র বাবাজির কাছে। জোড়হাতে নমস্কার জানাল। বাবাজিও হেসে প্রতি নমস্কার জানালেন। গেরুয়াধারিণীকে বিদায় জানানোর প্রশ্ন নেই। সারা রাস্তাই মুখ ঘুরিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সঙ্গীদের সঙ্গে। সকালে টিটিই না আসায় ঝামেলায় পড়তে হয়নি তমালকে। হরিদ্বারের আগের স্টেশন লস্কর জংশনে নেমে গিয়েছে রতন-পঞ্চা। বাসে গন্তব্যে পৌঁছবে। গাঁজা নিয়ে হরিদ্বারে নামলে ঝামেলায় পড়তে পারে। করোনার জন্য থাকতে পারে কড়া চেকিং।

আশঙ্কা অমূলক নয়। স্টেশন আধা সামরিক বাহিনীতে ছয়লাপ। ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং আচমকা অন্তর্ঘাত মোকাবিলার জন্য। কোভিড টেস্ট সার্টিফিকেট কেউ দেখতে চাইল না। দেখা মিলল না টিকিট পরীক্ষকেরও। কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা স্টেশনে ঢোকা-বেরোনোর একটি করে গেট। গেট পেরিয়ে রাস্তায় এল তমালরা। রিকশা-অটো-টোটো-গাড়ি-বাইক-মানুষের গিজগিজে ভিড়। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং, মাস্ক যেন অলীক!

বুকিং করেছিল এক নামী আশ্রমে। দেরি হয়ে যাওয়ায় মেলেনি আলাদা ঘরের সুবিধে। ডরমিটরিতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেই কাটবে, রাতটুকু ডরমিটরিতে ঘুমোতে কী আর অসুবিধে? হোটেলগুলোকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অনলাইন পেমেন্ট পেয়েও যদি বাড়তি লোভে শেষ মুহূর্তে বুকিং ক্যানসেল করে? লক্ষ মানুষের ভিড়ে স্থান অকুলান হবে সহজেই অনুমেয়। সে দিক থেকে নামী আশ্রম নিরাপদ। সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে বিপদে ফেলবে না। কিন্তু আশ্রমের অফিসে সইসাবুদ সেরে ডরমিটরিতে পৌঁছে চক্ষু চড়কগাছ!

"এখানে থাকা ইমপসিবল।"

"আমি ভাবতে পারিনি যে..."

"এখন তো দেখতে পাচ্ছেন। উই হ্যাভ টু ডু সামথিং..."

দেখতে পাচ্ছে তমাল। বড় হল ঘরে বিছানার সার। এক ইঞ্চিও ফাঁক নেই। আশঙ্কা যে ছিল না, তা নয়। কলকাতার আশ্রমে প্রশ্ন করায় উত্তর মিলেছিল, ভরসা রাখুন। ভরসা রেখেছিল, শোয়ার জায়গা হবে ছ'ফুটের দূরত্ব মেনেই। আশ্রমে ঢুকেই সন্দেহ একটু হয়েছিল। হ্যান্ড-স্যানিটাইজ়ারের ব্যবস্থা নেই, মহারাজ-সন্ন্যাসীরদের মুখেও নেই মাস্ক। তবুও ভরসা রেখেছিল। এখন ভরসা পরিণত হয়েছে আতঙ্কে। হয়তো রাত পোহালেই করোনা। গুরুত্ব দিতেই হল অনুজের আপত্তি।

"দাদা, কী করবি এখন?" উভয়সঙ্কটে মীনাক্ষী। দাদা জায়গা ঠিক করেছে এবং সেটা যে ভুল, প্রমাণও হয়ে গিয়েছে। অনুজ প্রিয়জন

হলে, দাদাও কাছের মানুষ।

“শোন, তোরা এখানে থাক। আমি বেরিয়ে দেখি কোনও হোটেল পাই কি না,” শান্ত গলায় বলল তমাল। উদ্বেগ দেখালে আরও উত্তেজিত হবে অনুজ। যদিও জানা নেই হোটেল পাবে কি না।

“আমরা এখনই বেরিয়ে যাব না কেন?” অধৈর্য অনুজ।

“একটু ধৈর্য রাখো অনুজ। তিন জন এই ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় ঘুরলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। তা ছাড়া এখনই এসে এখনই বেরিয়ে যাওয়াটাও খারাপ দেখায়। তুমি এদের বোঝাতে পারবে না ভুলটা। তা ছাড়া মিনুকে একা রেখে যাওয়াটাও ঠিক নয়। তাই বিষয়টা আমাকেই হ্যান্ডেল করতে দাও,” তমালের প্রস্তাব।

“বাট উই শুড প্রোটেস্ট...”

“লাভ হবে না। সকলে ওদের ফেভারেই কথা বলবে। আর এই মুহূর্তে প্রোটেস্টের চেয়ে সিকিউরিটি ইজ় দ্য প্রায়োরিটি।”

“হ্যাঁ দাদা, তুই যা, ভাল একটা হোটেল খুঁজে আয়।”

আশ্রমটা হর কি পৌড়ির উল্টো দিকে। হর কি পৌড়ি হরিদ্বার গঙ্গাপাড়ের প্রধান ঘাটশ্রেণি এবং অবশ্য দ্রষ্টব্য। সন্ধ্যারতি বারাণসী সমতুল্য না হলেও সমগোত্রীয়। খোঁজখবর নিয়ে তমাল বুঝল বেশির ভাগ হোটেলই হর কি পৌড়ির রাস্তায়। উল্টো দিকে বা বাইপাসের ধারে হোটেল থাকলেও বেশ দূরে-দূরে। অন্য সময় হলে হর কি পৌড়ির কাছাকাছি হোটেলেই সুবিধে হত। কিন্তু করোনায় পরিস্থিতি ভিন্ন। যত ভিড় তত বিপদ। বিশেষ করে রাস্তায় বেশির ভাগ মানুষের মুখেই মাস্ক নেই। তবুও হর কি পৌড়ির দিকেই এগোতে লাগল তমাল। দ্রুত হোটেলের ব্যবস্থা করা জরুরি।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাড়ছে সন্ধ্যারতি দেখার ঢল। কোতোয়ালি বা থানার পর থেকে যানবাহনও বন্ধ তাই। হর কি পৌড়ির দিকে যত এগোয় ততই বাড়ে ভিড়। হোটেলে-হোটেলে ঘুরছে তমাল। যা ভেবেছিল তা নয়। অন্য বার বুকিং ফুল হয়ে গেলেও, এ বার করোনার কারণে অর্ধেকও ভরেনি। শিবরাত্রির স্নান দু’দিন পরে, তাই ভাড়া না কমিয়ে আশায় হোটেলওয়ালারা। শিবরাত্রি, প্রথম শাহী স্নান।

শাহী অর্থাৎ রাজকীয় স্নান। হরিদ্বার কুম্ভে শাহী স্নান চারটি। শিবরাত্রিতে, সোমবতী অমাবস্যায়, মেষ সংক্রান্তি বা বৈশাখীতে এবং চৈত্র পূর্ণিমায়। এ ছাড়াও আছে কিছু বিশেষ স্নান। মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা, বসন্ত পঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা, চৈত্র অমাবস্যা। সাধুসন্তদের সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ মানুষ গঙ্গায় স্নান করে পুণ্যলাভের আশায়। পুরাণে কথিত, কার্তিকে সহস্রবার, মাঘে শতবার গঙ্গাস্নানে এবং বৈশাখে কোটি নর্মদাস্নানে যে ফললাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত বাজপেয় যজ্ঞে যে ফললাভ হয়, লক্ষ পৃথিবী প্রদক্ষিণে যে ফললাভ হয়, এক বার কুম্ভস্নানেই সেই ফল পাওয়া যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পছন্দমতো হোটেল পেল তমাল। স্টেশনের উল্টো দিকে বাস স্ট্যান্ডের কাছে। বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে হওয়ায় ভিড়ের সমস্যা নেই বললেই চলে। দুটো ঘরের একটায় থাকবে মীনাক্ষী অন্যটায় অনুজের সঙ্গে নিজে। হোটেল পরিচ্ছন্ন হলেও ঘরদুটো ভাল করে স্যানিটাইজ় করতে হবে।

রাস্তায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলেছে সাধুর দল। খুঁটিয়ে দেখছে তমাল। ভাবছে ওই সাধু যদি সত্যিই বাবা হয়, তা হলে চিনবে কী করে? মীনাক্ষীকে বহু বার বোঝালেও বোঝেনি। তমাল চিনতে পারবেই, বিশ্বাসে অটল। ছাব্বিশ বছর পরে চেহারা কি আগের মতো থাকে? তার উপর জটা-দাড়ি থাকলে তো আরও মুশকিল। কথা না বললে চেনার উপায় নেই। কিন্তু সব সাধুর সঙ্গে তো কথা বলা সম্ভব নয়। চেহারার একটা আন্দাজ তাই পেতেই হবে। নাকের ডান দিকের আঁচিল কিছুটা সহায়ক হলেও, ওই জায়গায় আঁচিল অনেকেরই থাকে। বাড়িতে যদি বাবার একটা ছবিও থাকত, তা হলে জটা-দাড়ি এঁকে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা যেত। সে ব্যবস্থা রাখেনি মা। বাবার কোনও ছবিই নেই। মনেই ছবি আঁকবার চেষ্টা করল তমাল। এক বার যদি আন্দাজ করতে পারে তা হলে এমন প্রশ্ন করবে যে, এক সেকেন্ড হলেও কেঁপে উঠবে মানুষটা। ওই ‘এক সেকেন্ড’এর জন্য টিকরবেতায় ফিরে গেল তমাল। হাতড়াতে লাগল প্রশ্নবাণ।

॥ ১২ ॥

প্রতীক সহজবোধ্য নয়। গভীর প্রজ্ঞা প্রয়োজন হয় প্রতীক বুঝতে। অনেকটা মহাভারতের ব্যাসকূট বোঝার মতো। তাই প্রয়োজন পড়ে কাহিনির। কাহিনির মর্মার্থ উপলব্ধির সাফল্যেও প্রতীকের সার্থকতা। সরাসরি প্রতীক অনুধাবন করতে পারলে নতুন ভাবে অনুভব করা যায় প্রকৃতিকে। প্রকৃতিও যে এক অর্থে পূর্ণকুম্ভ।

দুর্বাসা মুনির অভিশাপে শক্তিক্ষয় করে স্বর্গ হারালেন দেবতারা। দখল নিল অসুরদল। পুনরুদ্ধার প্রশ্নে বিষ্ণু উপদেশ দিলেন সমুদ্র মন্থনের। মন্থনে উঠবে অমৃত যা শক্তিবৃদ্ধি করবে দেবতাদের, দেবে অমরত্ব। আবার দখলে আসবে স্বর্গ। তবে দেবতাদের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় মন্থন। অসুরদের সাহায্যে চাইতেই তারা দাবি করল অমৃতভাগ। রাজি হতেই হল দেবতাদের। মন্দার পর্বতকে তুলে আনলেন গরুড়, বিষ্ণু কূর্ম অবতার হয়ে সমুদ্রগর্ভে ধারণ করলেন মন্দারকে। বাসুকি নাগ করলেন বেষ্টন। দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের তত্ত্বাবধানে বাসুকি নাগের দু’প্রান্ত ধরে শুরু হল মন্থন। এক সময় দেববৈদ্য ধন্বন্তরি উঠে এলেন অমৃতকলস নিয়ে। সাধের ধন দেওয়া সম্ভব অসুরদের? কোনও ফারাক থাকবে না যে দেবতা-দানবে! কলস নিয়ে পালালেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। ধাওয়া করল অসুররাও। বারো দিন পরে সফল হলেন জয়ন্ত। বারো দিন একটানা দৌড় সম্ভব হয়নি। চার জায়গায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কলস, পড়েছিল দু’চার ফোঁটা। হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী। দেবতাদের বারো দিন, মানুষের বারো বছর। সেই হিসেবে বারো বছর অন্তর ওই চার জায়গায় হয় কুম্ভ স্নান।

মহাবিশ্বের প্রতীকও যেন কুম্ভ। কলসের খোলা মুখ বিষ্ণুর প্রতীক। গলার অংশ রুদ্রের প্রতীক। কলসের ভিত্তি ব্রহ্মার প্রতীক। কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীগণ। মহাসাগর, চার বেদও অধিষ্ঠিত অভ্যন্তরে। পৃথিবীও যেন কুম্ভ। মানুষও কি কুম্ভের প্রতীক নয়?

মনের প্রশ্ন মনে নিয়ে হর কি পৌড়িতে ঘুরছে তমাল। ঘুরছে ব্রহ্মকুণ্ডে। সেই ব্রহ্মকুণ্ড, যেখানে অমৃতের ফোঁটা পড়েছিল বলে কথিত। সাধু দেখলেই সজাগ করছে মীনাক্ষী-অনুজ। যদিও সাধু বিশেষ নেই। ভরসন্ধ্যায় পুণ্যার্থীর চেয়ে ভ্রমণার্থীই বেশি। ব্রহ্মকুণ্ডকে সুইমিং পুল হিসেবে ব্যবহার করতে ব্যস্ত। টুকরো গঙ্গা হয়ে গিয়েছে যেন অ্যামিউজ়মেন্ট পার্ক। কৃত্রিম উপায়ে বাড়ানো হয়েছে জলের স্রোত। সেই স্রোতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। গভীরতা বেশি নয় বলে দাপিয়ে আনন্দ। পূর্বদিকে বিড়লা ক্লক টাওয়ার, পশ্চিমে গঙ্গামাতা আর নানা মন্দির। ওই মন্দিরগুলোতেই হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টার বিখ্যাত গঙ্গারতি।

গঙ্গারতি শেষ হয়েছে সবে। ফিরতি মানুষের ঢল দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে দর্শনার্থীর সংখ্যা। হোটেলে ঢুকে আর অপেক্ষা করতে চায়নি মীনাক্ষী। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চেয়েছিল হর কি পৌড়িতে। আরতির সময়েই হয়তো সাধুরা একত্রিত হতে পারে। তবুও ভিড় ঠেলে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। মিলল না সাধুদের দেখা। খোঁজখবর নিয়ে তমাল জানল, সন্ধ্যায় সাধুরা এখানে আসে না, আরতি করে নিজেদের আখড়ায়।

মানুষজন এলোমলো ঘুরছে হর কি পৌড়িতে। মাস্কের বালাই নেই। যদিও এক নামী কোম্পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজ়ারের ব্যবস্থা রেখেছে। বোতামে চাপ দিলেই বেরোবে হাতশুদ্ধি। কাজে লাগাচ্ছে না প্রায় কেউই। শুধু বাচ্চারা বারবার বোতাম টিপছে, যেন নতুন খেলনা। উপার্জনের আশায় আরতি-অগ্নি নিয়ে ঘুরছে পূজারির দল। মানুষ মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রদীপ ভাসাচ্ছে গঙ্গায়। চুম্বকের সাহায্যে কিছু বাচ্চা ছেলে খুঁজছে খুচরো পয়সা। সার দেওয়া খাবারের হোটেল। করোনাকাল বলেই হয়তো ভিড় তেমন নেই। মীনাক্ষী খুঁজে চলেছে

সাধুর দল। খোঁজ নিয়ে জানল, ও পারে অর্থাৎ পূর্ব দিকে বসেছে কিছু সাধু। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল গন্তব্য।

গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য গঙ্গার উপরে রয়েছে একাধিক ব্রিজ। ও পারে পৌঁছে এক নতুন দৃশ্যের সম্মুখীন হল তমালরা। শিবরাত্রি উপলক্ষে হাজার-হাজার মানুষ এসেছে গঙ্গাজল নিতে। জল নিয়ে যাবে কোথায়? জানা গেল, পায়ে হেঁটে কেউ যাবে হৃষীকেশের নীলকণ্ঠ মন্দিরে, কেউ নিজস্ব পছন্দের অন্য মন্দিরে। দেবাদিদেবের মাথায় ঢালবে পুণ্য কুম্ভের জল। তবে বাঙালিদের চেয়ে ওদের কায়দা আলাদা। বাঙালিরা ঘট, ঘড়া ভর্তি করে তারকেশ্বর যায়। ওদের ঘটের বদলে প্লাস্টিকের ছোট জার। বাঁকের দু'দিকে বেতের চুবড়ি, চুবড়ির মধ্যে জলের জার। বাঙালিদের বাঁকের তুলনায় অনেকটাই হালকা। বাঁকের সাজও অদ্ভুত। যে যেমন খুশি সাজাচ্ছে। রঙিন কাপড় থেকে বাচ্চাদের খেলনা, বাদ নেই কিছুই।

অন্য বার এই পারে আখড়া হলেও এই বার কোভিডের কারণে এখনও হয়নি। কিছু সাধু নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তুলছে ছাউনি। আলো-আঁধারিতে ভাল করে দেখা মুশকিল, তবুও তমাল জরিপ করতে লাগল সাধুদের। কাউকেই বাবার মতো লাগল না। সন্ধ্যারতি হচ্ছে বিরাট বটগাছের নীচে এক সমাধি স্থানে। সেখানেই পঞ্চমুখী মহাকালেশ্বর মন্দির। সঞ্চালক মহন্ত দিব্য ধুনা গিরিজি মহারাজ। খাটো শরীর, ভুঁড়িতে বাবার সঙ্গে কোনও তুলনাই করতে পারল না তমাল। খুঁজতে খুঁজতেই কানে এল মাইকের ঘোষণা, "হরিয়ানা সীতাপুর সে আয়ি হ্যায় জানকীদেবী। আপ যাহা ভি হো তুরন্ত মেলা অফিস মে আ যাইয়ে..."

"দাদা চল..."

মীনাক্ষীর পরিকল্পনায় অবাক হয়ে গেল তমাল। এত মরিয়া চেষ্টাও করতে পারে মানুষ! পরিকল্পনায় কাজ হবে কি হবে না অজানা, কিন্তু আপাতত বাধা দেওয়ার প্রশ্ন নেই। মেলা অফিসে নিয়ে এসেছে মীনাক্ষী। গঙ্গারতি দেখতে এসে প্রবল ভিড়ে অনেকেই হয়েছে দলছুট। নাম ঠিকানা লিখে দিলে মেলা কমিটি সাহায্য করার চেষ্টা করছে ঘোষণার মাধ্যমে। নাম, ঠিকানা লিখতে চাইল না মীনাক্ষী। যুক্তি দিল তাদের বাবা হিন্দি বোঝে না, তাই নিজেই বলবে। প্রথমে আপত্তি জানালেও এক সময়ে রাজি হল কর্মকর্তারা। মাইক হাতে শুরু করল মীনাক্ষী— ''বীরভূম টিকরবেতা গ্রামের যাদব কর্মকার, তোমার মেয়ে মীনাক্ষী আর ছেলে তমাল মেলা অফিসে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো বাবা... খুব তাড়াতাড়ি।''

কর্মকর্তাদের তাড়া উপেক্ষা করে তিন বার ঘোষণা করল মীনাক্ষী। বোনের দিকে অপলকে চেয়ে রইল তমাল। কী আকুল আর্তি! চোখ চিকচিক করে উঠল।

"হবে এই ভাবে?"

"দেখি না চেষ্টা করে।"

"আই থিঙ্ক ইটস এ গুড ট্রাই দাদা। অ্যানাউন্সমেন্টটা গোটা মেলায় ছড়িয়ে গিয়েছে," অনুজ উত্তেজিত।

"তা ঠিক। তবে বাবা যদি সত্যিই এসে থাকে আর শুনতেও পায়, তা হলে কী রিঅ্যাকশন হবে বুঝতে পারছি না," তমাল সংশয় প্রকাশ করে।

"তার মানে তুই বলছিস অ্যানাউন্সমেন্টটা শুনে বাবা ইমোশনাল হবে না আর মেলা অফিসেও আসবে না?" তমালের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিলেও ভরসা হারাতে চাইছে না মীনাক্ষী।

"ইমোশন উপেক্ষা করে যে মানুষ ঘর ছাড়ে, ছাব্বিশ বছর পরে সে কতটা ইমোশনাল হবে ঠিক বুঝতে পারছি না," আন্দাজ করতে পারলেও বোনকে পুরোপুরি নিরাশ করতে চাইল না তমাল।

"লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট দাদা," হবু বৌয়ের উপস্থিত বুদ্ধিতে আপ্লুত অনুজ।

"শিবরাত্রি কিন্তু দু'-দিন পরে,'' স্মরণ করিয়ে দিল তমাল।

"দু'-এক দিন আগেও তো আসতে পারে। রোজ এক বার করে অ্যানাউন্সমেন্ট করব। ব্লাইন্ড খেলা ছাড়া আমাদের তো আর কোনও উপায় নেই," প্রত্যয়ী মীনাক্ষী।

"রোজ ঘোষণা করতে দেবে?"

"ওটা তুই আমার উপরে ছেড়ে দে।"

মেলা অফিসের বাইরে অপেক্ষা করতে-করতে এক অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করল তমালরা। বছর দশেকের একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছে দু'জন পুলিশ। কর্মকর্তারা মেয়েটির গ্রাম এবং মায়ের নাম ঘোষণা করলেও মেয়েটি সমানে বলে চলেছে, 'ও নেহি আয়েগি'। পুলিশ এবং কর্মকর্তাদের জেরায় জানা গেল, মেয়েটির নাম আরতি। বাবা কয়েক বছর আগে মারা যাওয়ার পরে মা কিছু দিন একা সংসার চালাবার চেষ্টা করেও পেরে ওঠেনি। বাধ্য হয়েই সাড়া দিয়েছে এক বৃদ্ধ, বিপত্নীকের ডাকে। সে মাকে বিয়ে করলেও, মেয়েকে নেবে না। তাই ইচ্ছে করেই মা গঙ্গারতির পরে মেয়ের হাত ছেড়ে ভিড়ে মিশে গিয়েছে। এত ক্ষণে হয়তো বাসেও উঠে পড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে দু' জন পুলিশ মেয়েটিকে নিয়ে দৌড়ল বাস স্ট্যান্ডের দিকে। কিছু ক্ষণ বাদে ফিরেও এল। মেয়েটি কাঁদছে না। যেন জানেই ভবিতব্য।

আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মীনাক্ষী। মেয়েটির দায়িত্ব নিতে চায়। প্রবল আপত্তি জানাল পুলিশ এবং কর্মকর্তারা। আপাতত মেয়েটিকে থানায় পাঠানো হবে, তার পর হোমে। দায়িত্ব নিতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। তবুও মীনাক্ষী নাছোড়। হস্তক্ষেপ করতেই হল তমালকে। রোজ কত শত মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, পাচার হয়ে যাচ্ছে, ক'জনের দায়িত্ব নেবে মীনাক্ষী? তা ছাড়া এসেছে অন্য উদ্দেশ্যে। অতি আবেগে সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া মোটেই কাম্য নয়। অনুজও বোঝাল। অবশেষে নিরস্ত হল মীনাক্ষী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তমাল। মেলা বড়ই বিচিত্র। কেউ আসে খুঁজতে, কেউ হারাতে।

॥ ১৩ ॥

চরৈবেতি জীবনে একবগ্গা এগিয়ে চলাই মোক্ষ। 'এগোতে হবে', 'পৌঁছতে হবে', তাড়িয়ে নিয়ে চলে সর্বক্ষণ। অর্থই লক্ষ্য। ঘোড়ার মতো চোখে ঠুলি পরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা। ডিগ্রি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, মোটা মাইনের চাকরি প্রত্যাশায়। অথচ বেশির ভাগেরই জানা নেই মোটা মাইনের সদ্ব্যবহার। উদ্যোগপতি বা কোনও গঠনমূলক কাজে নয়, ভোগের উদ্দেশ্যে অর্থ কুক্ষিগত করাই একমাত্র লক্ষ্য। কতিপয় মানুষই শুধু ভাবে, 'কেন এলাম?'

"উত্তর খুঁজছ?"

"পেয়ে গিয়েছি মনে হয়।"

"পেয়ে গিয়েছ! তা হলে বলো, কেন এলে?"

"চোর সাজতে।"

অজয় বাঁধের উপর গাছের ডাল দিয়ে সাইকেলের টায়ার ঘোরাচ্ছিল তমাল। হঠাৎ নজরে পড়ল কুশেশ্বর শিবমন্দিরের চাতালে বাবা উদাস মুখে বসে। কাছে যেতেই হাত দুটো ধরল। ধরেই রইল। কিছু একটা বলতে হয় তাই প্রশ্ন করেছিল। উত্তর যে এমন হবে কল্পনাও করেনি।

"তুমি আমাদের উপর খুব রাগ করেছ, না বাবা?"

"আমাদের মানে?"

"বাড়ির লোক, গ্রামের লোক..."

"না রে... কারও উপরেই রাগ নেই আমার।"

"তা হলে ওই কথা বললে কেন?"

"বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না যে। আর ভেবে দেখলে, কথাটা তো মিথ্যে নয়।"

"মিথ্যেই তো। তোমাকে দেখে আমার খুব অবাক লাগে।"

"কেন রে?"

"কোনও অন্যায় তো তুমি সহ্য করো না। তা হলে প্রতিবাদ করলে না কেন?"

“গাছের গায়ে কুড়ুল মারলে গাছ কি প্রতিবাদ করে?”

গঙ্গাপাড়ে বসে রয়েছেন জটাধারী এক সাধু। দীর্ঘ শরীর, উদাস দৃষ্টি। যেন তাঁর কথোপকথন চলছে মা গঙ্গার সঙ্গে। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে একদৃষ্টে চেয়ে তমাল। মীনাক্ষী-অনুজ পশ্চিম পারে। মীনাক্ষীর বিশ্বাস, বিকেলে না হোক সকালে ব্রহ্মকুণ্ডেই আনাগোনা বেশি হবে সাধুদের। তেমন কাউকে মনে হলেই ফোন করবে তমালকে। তমাল আগ্রহী পূর্ব পারে। যতটুকু জেনেছে, বড় আখড়ায় ডেরা বাঁধতে কড়ি দরকার। যাদের সে ক্ষমতা নেই বা টাকার বিনিময়ে কিনতে চায় না প্রচার, তারাই ডেরা বাঁধে পূর্বপারে। বাবা যে সেই রকমই এক মানুষ।

বাবার সঙ্গে মিল না থাকলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল আর এক স্থবির সাধু। মনে পড়ল, ‘গাছের গায়ে কুড়ুল মারলে গাছ কি প্রতিবাদ করে?’ গাছের মতোই যেন বসে রয়েছেন সাধু। সজ্ঞান, সচেতন, আত্মমগ্ন। তমাল আজও বুঝে পায় না কেন সে দিন নিজেকে গাছের সঙ্গে তুলনা করেছিল বাবা? কেন হঠাৎ করে হয়ে গিয়েছিল সর্বংসহা?

হর কি পৌড়ির উল্টো পারের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বারচারেক হেঁটে ফেলল তমাল। পেরিয়ে গেল অনেক ঘাট। গণেশ ঘাট থেকে অলকানন্দা ঘাট। ঘাটের সিঁড়ির পরেই পথচারীদের জন্য রয়েছে প্রশস্ত রাস্তা। রয়েছে বসার বেঞ্চ। রাস্তার শেষে জমি বেশ খানিকটা উঁচু। সেখানে চলছে সাধুদের ছাউনি গড়ার কাজ। কেউ প্লাস্টিক টাঙাতে ব্যস্ত, কেউ মাটি লেপে জমি সমান করতে, কেউ ধুনোর জায়গা প্রস্তুতিতে। কেউ করছে অলস গল্পগাছা, কেউ দিচ্ছে গাঁজায় টান। গাঁজা বিক্রি বা সেবন অপরাধ হলেও সাধুদের অবাধ ছাড়। তাই জুটে যায় কিছু গঞ্জিকাপ্রেমী। এক জায়গায় চোখে পড়ল ট্রেনের সহযাত্রীদের, যাদের তর্ক কোভিড প্রোটোকল থেকে রাজনীতিতে গড়িয়েছিল। আপাতত সব প্রোটোকল, নীতি ভুলে হাসি মুখে দিচ্ছে গাঁজায় টান। ট্রেনে কথা না বললেও এখন নেশার ঝোঁকেই বোধহয় সকলে হইহই করে ডাকল তমালকে। সৌজন্যের খাতিরে যেতেই হল।

তমাল গাঁজা খায় না জেনে হতাশ হল সকলেই। উৎসাহিত করতে এক জন জানাল, গাঁজা গাছই নাকি একমাত্র গাছ যা মর্ত্য থেকে স্বর্গে পৌঁছেছিল। দেবাদিদেবের তখন ঘোর অ-সুখ। মন ভাল করতে মর্ত্য থেকে আমদানি হল গাঁজা। তৃপ্ত হলেন দেবাদিদেব। গাঁজা গাছ স্থায়িত্ব পেল স্বর্গে।

ছিলিমে টান দিয়ে এক সাধু শোনালেন আরও গাঁজা মাহাত্ম্য। গাঁজা ভক্তিমার্গে পৌঁছনোর অন্যতম উপায়ও। আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছতে গেলে আগে সামাজিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। বিচ্ছিন্নতার সহায়ক গাঁজা। তাই আদর করে সাধুরা ছিলিম বা কল্কেকে বলে ‘বাঁশি’। যে কাঠের তক্তায় গাঁজা কাটা হয়, নাম তার ‘প্রেমতক্তি’। কাটারির নাম ‘রতনকাটারি’। কল্কেতে পা ঠেকে গেলে প্রণাম তো করতেই হবে, সেবনের আগেও ঠেকাতে হবে মাথায়। ছিলিম ঘুরবে অ্যান্টিক্লকওয়াইজ়। টানের পরে দিতে হবে জয়ধ্বনি, ‘ব্যোম ভোলে...’ অথবা ‘জয় শিবশঙ্কর...’

উৎসাহিত হবার কোনও লক্ষণই দেখাল না তমাল। বরং সাত-সকালে গাঁজার গন্ধে মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। ছাড়তে নারাজ সাধু। বাধ্য হয়ে কুড়ি টাকা প্রণামী দিল। উৎসাহিত হয়ে সাধু জানালেন, গাঁজা গাছেরও স্ত্রী-পুরুষ আছে এবং দুই গাছেই ফুল ফোটে। কিন্তু স্ত্রী গাছ থেকেই পাওয়া যায় গাঁজা, ভাং, সিদ্ধি, চরস, হাসিস। প্রকৃতির দান গ্রহণে দোষ কোথায়?

এক রকম জোর করেই উঠে পড়ল তমাল। ঘাটগুলোতেও আর ঘুরতে ইচ্ছে করল না। জল নেওয়ার ভিড় আজ আরও বেড়েছে। অনেকেই এসেছে সপরিবার। যত্ন করে সাজাচ্ছে বাঁক। সাজ ছেলেমানুষি হলেও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতেই হয়। তা ছাড়া সাধুদের কেউ বাবার চেহারার ধারেকাছেও নেই। ভাল করে নজর করার প্রবৃত্তিও হচ্ছে না। এতটা সস্তা হয়ে যাবে বাবা? তা হলে কি বড় কোনও আখড়ায় উঠল?

ভাবতে ভাবতেই মীনাক্ষীর ফোন, “দাদা, কনখল যেতে হবে।”
“কেন?”
“ওখানে আখড়া হয়েছে। অনেক আশ্রমও আছে।”

কনখল, ইতিহাস, মিথ যেন চলে হাত ধরে। এখানেই নাকি হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ। হরিদ্বার থেকে প্রাচীনতার গন্ধ প্রায় বিলুপ্ত হলেও, কনখল এখনও ধরে রেখেছে অনেকটাই। হরিদ্বারের কাছে অথচ কোলাহল মুক্ত। প্রচুর আশ্রম থাকায় গম্ভীর পরিবেশ। কুলকুল করে বয়ে চলেছে গঙ্গা। তীর্থমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে বসে ভীষ্মকে বলেছিলেন, যেখানেই অবগাহন করা হোক না কেন গঙ্গা সর্বত্রই কুরুক্ষেত্র তুল্য। কিন্তু কনখলে গঙ্গা বিশেষ তীর্থ আর প্রয়াগে অতি মহাতীর্থ।

কনখল পৌঁছতে বিস্তর হ্যাপা পোহাতে হল। শাহী স্নানের আগে অনেক আখড়া জুলুস বা শোভাযাত্রা নিয়ে পরিক্রমায় বেরোয়। আজ মহানির্বাণী পঞ্চায়েতি আখড়ার জুলুস। শুরু হবে শীতলা মাতা মন্দির থেকে। তাই রাস্তায় ব্যারিকেড, যান চলাচল বন্ধ। অটোচালকের পটুতায় গলি তস্য গলি ঘুরে দক্ষ মন্দিরের সামনে পৌঁছনো গেল। সেই দক্ষ মন্দির, যেখানে হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ।

দক্ষ মন্দির দ্রষ্টব্যস্থান হলেও তমালরা গেল না সেখানে। পা বাড়াল একটু এগিয়ে শীতলা মন্দিরের দিকে। উল্টো দিকেই আনন্দময়ী মায়ের বিশাল আশ্রম। তবুও শোভাযাত্রায় সাধু সমাগমের আশায় গেল শীতলা মন্দিরে। এখনও শুরু হয়নি শোভাযাত্রা। ইতিউতি ঘুরছে ব্যান্ডপার্টির দল। কেউ দিচ্ছে রিহার্সাল। এসেছে একাধিক ঘোড়া আর সিংহাসন বসানো ঘোড়ার গাড়ি। একটা হাতিরও দেখা পাওয়া গেল। লেজ নাড়তে-নাড়তে পাতা চিবোচ্ছে। সেই বোধহয় লিড করবে। সাধুদের শোভাযাত্রায় হাতি-ঘোড়ার কী প্রয়োজন বোধগম্য হল না তমালের। আড়ম্বরহীন জীবনই তো তারা বেছে নিয়েছে। প্রশ্ন জাগল, আগেই যদি এই আয়োজন হয়, তা হলে শাহী স্নানের দিন না জানি কী হবে?

এক চায়ের দোকানির কাছে তমালরা জানল, অন্য বার কনখলে যা ভিড় হয় এ বার সে তুলনায় কিছুই হয়নি। স্থায়ী আশ্রমগুলোতে স্থান অকুলান তো হয়ই, অগুন্তি অস্থায়ী আশ্রমেও ভরে যায়। বসে দোকানপাট, হোটেল, ভজন-ভক্তিগীতির আসর। প্রতিদিন আসে লক্ষ মানুষ। হরিদ্বারে গিজগিজে দোকান, হোটেলের ভিড়ে ব্যবসার সুযোগ নেই। ব্যবসায়ীরা আসে তাই কনখলে। এ বার তারাও আসেনি। অথচ এই হরিদ্বার-কনখলে এক সময় আসত কাবুল, তুর্কি, আরব, পারস্য থেকে ব্যবসায়ীর দল। বিক্রি করত হাতি, ভল্লুক, হরিণ, বাঁদরের সঙ্গে হরেক পসরা। পারস্যের হায়না, বিড়াল, পাখি ছিল আকর্ষক। চলত রমরমা ব্যবসা। বহু দিন তারা নেই। যারা আসত তারাও নেই এ বার। করোনার কারণে কনখল তাই শুনশান। না হলে বাইপাস থেকেই হেঁটে আসতে হত।

শীতলা মন্দিরে আসবার সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল, তা বোঝা গেল সাধুদের মেলা দেখে। বেশির ভাগই নাগা সন্ন্যাসী এবং উলঙ্গ। অল্প কয়েক জনের পরনেই ছোট্ট সাদা ল্যাঙোট। সকলেই খোশমেজাজে। হাসি-মশকরা করতে-করতে দিচ্ছে গাঁজায় টান। তারই মাঝে গঙ্গায় গা ডোবানোর পরে মেখে নিচ্ছে ভস্ম বা বিভূতি। তমাল অবাক হয়ে দেখল, সেই বিভূতি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় প্যাকেটে। খোঁজ নিয়ে জানল, আগে ছাইয়ের সঙ্গে গোবর-বেলপাতা-কলা-দুধ মিশিয়ে ভস্ম তৈরি করত নাগারা। এখন রেডিমেড। বিভূতি, গাঁজা, চায়ের জোগানদার কখনও আখড়া কর্তৃপক্ষ, কখনও কোনও ভক্ত। শীতলা মন্দির ঘাটকে যেন সাধুদের মেকআপ রুম বলে মনে হল তমালের। শোভাযাত্রার আগে নিচ্ছে প্রস্তুতি। অন্য সাধুরা উপস্থিত থাকলেও, নাগাদের কাছে সকলেই ম্লান। দর্শক থেকে টিভি চ্যানেল, সকলের কেন্দ্রবিন্দুতে নাগারা। বছর দশেকের একটি ছেলে, যে মন্দিরে পুণ্যার্থী এলেই বাজাচ্ছে ঢোল, সেও কম আকর্ষক নয়। ফাঁকতালে নাগাদের মাঝেও বাজিয়ে যাচ্ছে। মিলছে দশ-বিশ। বাবা যে মেকআপ করা

সন্ন্যাসী হতে পারে, বিশ্বাস করতে মন চাইল না তমালের। তাই মীনাক্ষী-অনুজ উৎসাহী হলেও তেমন সাড়া দিতে পারল না।

একটি বছর কুড়ির ছেলের দিকে নজর পড়ল তমালের। গঙ্গাপারের নিরালায় বসে পাঠ করছে গঙ্গাস্তোস্ত্র। আশপাশের হট্টগোল যেন স্পর্শই করছে না তাকে। ঘাটে আরও দু'জনকে দেখে অবাক লাগল তমালের। এক জন মাঝবয়সি, অন্য জন বছর বারো। মাঝবয়সির জটা-দাড়ি না থাকলেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ, ছেলেটির পরনে সাদা ল্যাঙোট। কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল তমাল। জানল, তারা বাবা-ছেলে। কুম্ভের তিন মাস সন্ন্যাসযাপন করবে, তার পর ফিরে যাবে সংসারে। তমালের মনে পড়ল, কল্পবাসী সম্প্রদায়ের যে নাম শুনেছে, এরা কি তাই? জিজ্ঞাসা করার আগেই দু'জন উদ্দাম নৃত্য শুরু করল ঢোল বাজিয়ে ছেলেটির সঙ্গে।

দীর্ঘ প্রস্তুতি সাধুদের। ইতিমধ্যে হাজির হয়েছেন এক আকর্ষণীয় সাধু। পরনে সিল্কের লাল আলখাল্লা, গলায় রুদ্রাক্ষ, পায়ে লাল ভেলভেট মোড়া খড়ম। এক শিষ্য মাথার উপরে ধরেছে সুদৃশ্য ছাতা। পিছন শিষ্যদল থাকলেও দু'পাশে সুন্দরী শিষ্যা। আর থাকতে মন চাইল না তমালের। এইখানে বাবাকে খোঁজার যে কোনও মানেই হয় না বুঝিয়ে দিল মীনাক্ষী-অনুজকে।

"এ জন্মের নাম কী?"

"এ জন্ম? জন্ম তো একটাই..."

"সে আপনাদের, আমাদের নয়। সন্ন্যাস নিলে নবজন্ম হয়। আর নাগা সাধু হতে গেলে তো সন্ন্যাস গ্রহণের বারো বছর পরে নিজের পিণ্ডদানও করতে হয়।"

"আমরা তো জানি না..."

"তা হলে খুঁজে পাবেন কী করে? আর খুঁজতে চাইছেনই বা কেন? সন্ন্যাসী যে আর ফেরে না সংসারে," স্মিত হাসি মুখে রেখে বলে চলেছেন বছর চল্লিশের অবিচল মহারাজ। একটা কলেজ মাঠ ভাড়া নিয়ে গড়ে তুলেছেন আখড়া। তবে সন্ন্যাসী নয়, পুণ্যার্থীদের জন্য এবং টাকার বিনিময়ে। পাশের অন্য আখড়াটিও একই উদ্দেশ্যে।

"তা হলে আমরা..." করুণ মুখে বলে মীনাক্ষী।

"যেটুকু আপনারা বললেন তাতে বুঝলাম, আপনারা তাঁকে বাবা ভাবলেও, তিনি কিন্তু কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে নেই। বিশ্ব চরাচরে বিলীন হয়ে গিয়েছেন," অবলীলায় বললেন অবিচল মহারাজ।

"তার মানে যে সাধুদের ওই শীতলা মন্দিরে দেখলাম, সবাই বিশ্ব চরাচরে বিলীন হয়েছেন?" মহারাজের কথা মানতে নারাজ তমাল।

"একটা জটিল কথা সরল করে বলি আপনাদের। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার্স, পিএইচ ডি, আছে তো আপনাদের? সাধুদেরও আছে। সত্যি করে বলুন তো, আমাকে দেখে আপনাদের কী মনে হচ্ছে? হরিদ্বারে এসেছি ব্যবসা করতে, তাই তো? হ্যাঁ, নর্মদা পরিক্রমাও করাই টাকার বিনিময়ে। তবে অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ফারাক একটু আছে। আমি ব্যবসা করি লাভের অংশ মানুষের সেবায় বিনিয়োগ করব বলে। ঈশ্বরলাভ বা পিএইচ ডি যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বুঝে গিয়েছি অনেক আগেই। তাই মানবসেবাকেই বেছে নিয়েছি। সে-ও তো এক রকম ঈশ্বরসেবাই। আর সেবা করতে টাকা যে লাগেই," মহারাজ গম্ভীর।

তমাল, মীনাক্ষী, অনুজ হতবাক। প্রসঙ্গ যেন অপ্রাসঙ্গিক।

"অবাক হলেন? আবার বলি, আপনাদের মুখে শুনে মানুষটাকে যতটা উপলব্ধি করতে পারছি, তিনি আর কোনও জাগতিক সম্পর্কে জড়িয়ে নেই। তাই খোঁজার চেষ্টা বৃথা," আবরণহীন হতে চাইছেন মহারাজ।

"সামনে আমার বিয়ে। বাবা যদি সম্প্রদানটা করত... তা ছাড়া অপমানিত হয়ে ঘর ছেড়েছিল বাবা। সেই সত্যিটাও জানা জরুরি। অপবাদ যদি মিথ্যে হয় তা হলে আমরা কেন বয়ে চলব সেই মিথ্যে অপবাদের বোঝা?" মীনাক্ষীর সবল যুক্তি।

"হ্যাঁ মহারাজ... সেই জন্যই..." সুযোগ বুঝে অনুজের অংশগ্রহণ।

"সম্পর্কই নেই তো সম্প্রদান!" আবার স্মিত হাসি ফিরে এল মহারাজের মুখে। "আর একটা কথা বলি, সত্যিই যদি আপনাদের বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে মান-অপমানের ঊর্ধ্বে তিনি। তাই..."

"খুঁজতে বারণ করছেন?" তমাল ধরে ফেলেছে মহারাজকে।

"সরাসরি বারণ তো করতে পারি না। তবে জানবেন, খাঁচার বাঘ জঙ্গলে গেলে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয় ঠিকই। কিন্তু এক বার মানিয়ে নিতে পারলে সে কখনওই আর খাঁচায় ঢুকতে চাইবে না," হাসি ছেড়ে আবার গম্ভীর মহারাজ।

"আপনার কাছে কি কোনও সাহায্যই পাব না?" মীনাক্ষীর আর্তি।

আর্তিতে বোধহয় মন ভিজল মহারাজের। মোলায়েম গলায় বললেন, "অত দূর থেকে এত আকুলতা নিয়ে ছুটে এসেছেন, আপনাদের নিরাশ করি কী করে? একটা ছবিও যদি থাকত... যাই হোক খোঁজবার চেষ্টা করব কোনও বাঙালি ছাব্বিশ বছর আগে সন্ন্যাস নিয়েছেন কি না।"

ফোন নম্বর দিলেন অবিচল মহারাজ। প্রণাম জানাল তিন জন।

তিন জন হাঁটছে আনমনে। এত দূর থেকেও কানে আসছে শোভাযাত্রার শব্দ। চোখে পড়ছে মা সন্তোষী আশ্রম, শ্রীহরি গিরি নিরঞ্জন আশ্রম, সুরত গিরি বাংলা আশ্রম, স্বামী চেতনানন্দ গিরি আশ্রমের মতো অনেক আশ্রম। ঢোকার বা খোঁজার তাগিদ অনুভব করছে না কেউই। তমাল চোখ বোলাচ্ছে আশপাশের বাড়িগুলোতে। এখনও থাম, খিলান, ঝুলবারান্দা, কারুকাজ দরজা। মীনাক্ষী হাঁটছে শূন্য দৃষ্টিতে। ভুল হল সিদ্ধান্ত? হবে না আকাঙ্ক্ষা পূরণ? উচ্চারণ না করলেও অনুজ নিশ্চিত, বিষয়টা গড়াচ্ছে পাগলামির দিকে।

৷৷ ১৪ ৷৷

সাফল্য ঢেকে দেয় ত্রুটি, দুর্বলতা। জোয়ার জলোচ্ছ্বাসের মতো মন ভিজিয়ে ভুলিয়ে দেয় তিক্ততা, অভিমান। কিন্তু ব্যর্থতা জন্ম দেয় সংশয়, সন্দেহের। যখন বেঁধে-বেঁধে থাকা প্রয়োজন তখনই আছড়ে পড়ে বিতর্ক-বিবাদ, দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপ। অধরা সাফল্য সরতে থাকে দূর থেকে দূরান্তরে।

"আমার মনে হয় এ ভাবে হবে না।"

"কী ভাবে হবে?"

"সেটা আমি কী করে বলব? আমি তো আপনাদের কথায় ভরসা করে এসেছি।"

"এখন কি ভরসা হারিয়ে ফেলেছ?"

"মহারাজ যা বলল, দ্য ট্রুথ মে বি হার্ড, কিন্তু মনে হয় না আমাদের কোনও আশা আছে," হতাশা প্রকাশ করেই ফেলল অনুজ।

"মিনু কী ভাবছিস?"

চুপ করে রইল মীনাক্ষী। মহারাজের আশ্রম থেকে বেরোনোর পরে আর কথা বলেনি। দুপুরের খাওয়াটাও ভাল করে খায়নি।

"দ্যাখো অনুজ, এটা যে ব্লাইন্ড গেম সেটা আমরা সবাই জানি। তা হলে মহারাজের কথায় অত প্রভাবিত হচ্ছ কেন?" বোনের মুখ চেয়ে বলতেই হল তমালকে। অনুজের কথায় অশান্তির আঁচ।

"আপনি ঠিকই বলেছেন দাদা। আমি জানতাম এটা ব্লাইন্ড গেম। কিন্তু জানতাম না, ইটস ইমপসিবল টু উইন," অনুজের দ্বিধাহীন যুক্তি।

"ব্লাইন্ড গেমে কি ইমপসিবিলিটি ইনক্লুডেড নয়?" তর্কে জড়িয়ে পড়ল তমাল।

থমকে গেল অনুজ।

"আমি কেন এসেছি জানো? শুধুমাত্র এক জন মানুষের ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে। এর পরের চাওয়াগুলো তো মিনু তোমার কাছেই চাইবে অনুজ। আমাদের কাছে তো এটাই ওর শেষ চাওয়া," নিজেকে সামলে নিয়েছে তমাল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিজেকে

সামলানো জরুরি।

দাদার দিকে তাকাল মীনাক্ষী। যেন বাবা বলে মনে হল।

অনুজ বলল, "কিন্তু দাদা, আমরা যখন বুঝেই গিয়েছি এটা হওয়ার নয়, তা হলে সময় নষ্ট করছি কেন? আমরা তো অন্য কোথাও যেতে পারি লাইক হৃষীকেশ..."

"কিছুই নষ্ট করার সাধ্য আমাদের নেই অনুজ। সময়ও নয়। আর যদি ওয়েস্ট ধরেও নিই, তা হলেও সেটা কতটা? আরও যদি পঞ্চাশ বছর বাঁচো, তা হলে সেটা আঠারো হাজার দুশো পঞ্চাশ দিন। সেখান থেকে দশটা দিন খরচ করা কি খুবই এক্সপেনসিভ?"

কী বলবে বুঝতে পারল না অনুজ। মীনাক্ষী অপলকে চেয়ে রইল দাদার দিকে। কিংবা হয়তো বাবার দিকে।

"টুর করার সময় তোমরা অনেক পাবে অনুজ। কিন্তু প্লিজ়, এই শেষ চেষ্টাটা মিনুকে করতে দাও। সাকসেস যদি নাও আসে ইউ উইল গেন সামথিং। দ্যাট ইজ় রেসপেক্ট," তর্ক ভুলে তমালের অনুরোধ।

মাথা নিচু করল অনুজ।

পাঁচটার আগেই আজ হাজির হয়েছে বিড়লা ক্লক টাওরারের সামনে। এখান থেকেই ভাল দেখা যাবে সন্ধ্যারতি। মেলা উপলক্ষে নতুন রঙে সেজেছে বিড়লা ক্লক টাওয়ার। গেরুয়া-হলুদ রঙের পোঁচ পড়েছে গুমটি, গঙ্গা পারাপারের ব্রিজগুলোতে। এক এক ব্রিজে এক একরকম আলোকসজ্জা। কিছু সাধু আরতির আগে গঙ্গাপুজো করছে। এখন এক মন্ত্রী পুজো করলেও আবার তো কোনও সাধু হাজির হতে পারে। দেখে যদি আন্দাজ করতে পারে দাদা?

দুপুরে দাদাকে দেখে অবাক হয়েছিল মীনাক্ষী। যেন নতুন করে চেনা। দাদার যে এত আবেগ, আগে তো বোঝেনি! একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। বাবাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলে ছোটকাকা নয়, সম্প্রদান করবে দাদা। দাদার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে বাবাকে। জ্যেষ্ঠতা তো শুধু বয়সে নয়, প্রাজ্ঞতায়ও।

আজ ভিড় বোধহয় গতকালের চেয়েও বেশি। তারই মধ্যে সিকিওরিটি অথবা গঙ্গা রক্ষণাবেক্ষণের কর্মীরা ঘুরে-ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করছে। একশো টাকা দিল মীনাক্ষী, কর্তব্য মনে করল। আরতির আগে সকলকে আহ্বান জানানো হল গঙ্গামাতাকে দূষিত না করার জন্য। হাত উঁচিয়ে সবাই জানাল সমর্থন। তার পরেই শুরু হল আরতি।

'ওঁ জয় গঙ্গে মাতা...' মাইকে গান বেজে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে এক একটা মন্দিরে জ্বলে উঠতে লাগল একশো আট প্রদীপ। বাল্মীকি মন্দির, গঙ্গা মন্দির, মহাদেব মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির। সব মন্দিরের প্রদীপগুলো যখন এক সঙ্গে জ্বলে উঠল, তখন যেন এক স্বর্গীয় পরিবেশ। সামনে বসা পুণ্যার্থীর দল গঙ্গায় ভাসাতে লাগল নিজেদের প্রদীপ। গঙ্গা মা-কে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানানোর আর কীই বা উপায় আছে?

আরতি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মীনাক্ষী লক্ষ্য রাখছে চার পাশেও। বিশেষ করে দাদাকে। এত দিন ভাবত দাদা শুধু সঙ্গ দেওয়ার জন্যই এসেছে। মায়ের প্রতি দুর্বলতায় হয়তো এড়িয়ে যাবে দায়িত্ব। আজ ভুল ভেঙেছে। দাদার মুখের ঝিলিকই বলে দেবে মোক্ষপ্রাপ্তি।

আরতি শেষ হতেই এতক্ষণের সুশৃঙ্খল ভিড় মুহূর্তে এলোমেলো। মানুষের আসতেও যত তাড়া, যেতেও তত। বেড়াতে বা পুণ্যার্জন করতে এসে কিসের এত তাড়া বোঝা দায়। দেরি করল না মীনাক্ষী। অনুজ, তমালকে নিয়ে পৌঁছে গেল মেলা অফিসে। কর্মকর্তাদের কয়েক জন গতকালের। ভ্রু কুঁচকে তাকাল মীনাক্ষীর দিকে, তার পর বাড়িয়ে দিল মাইক। সারা মেলা গমগম করে উঠল— "বীরভূম টিকরবেতো গ্রামের শ্রীযাদব কর্মকার। তোমার মেয়ে মীনাক্ষী আর ছেলে তমাল মেলা অফিসে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো বাবা... গতকাল থেকে পথ চেয়ে রয়েছি তোমার। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো।

এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তমাল। মীনাক্ষী-অনুজকে একটু একা থাকতে দেওয়াই উচিত। আজ ও পারে যাওয়ার উৎসাহবোধ করেনি। এ পারেই ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা ঘাটে। বিষ্ণু ঘাট, রাম ঘাট, কুশাবর্ত ঘাট, গোও ঘাট, নঙ্গ ঘাট। এ পারেও অল্প কিছু সাধু আস্তানা গেড়েছে। কাউকেই মনে ধরল না তমালের। ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে জলের ধারে দাঁড়াল। প্রবল বেগে বয়ে চলেছে গঙ্গা। হঠাৎই চোখে পড়ল ট্রেনের সেই গেরুয়াধারিণীকে। সিঁড়ি ভেঙে জলের দিকে নামছেন। স্নান যা হচ্ছে সবই ব্রহ্মকুণ্ডে। এখানে কেউ তো স্নান করছে না? তা হলে মহিলা জলে নামছেন কেন? হাতে তো প্রদীপও নেই!

ঘাট বরাবর স্টিলের রেলিং। রেলিংয়ে মোটা চেন। অপরপ্রান্তে গোল রিং। সেই রিং ধরে করতে হয় স্নান। না হলে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ব্রহ্মকুণ্ডের গভীরতা কম হওয়ায় সেখানে ইচ্ছেমতো স্নান করা যায়। কিন্তু জল দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে গভীরতা অনেক বেশি। ভাবতে-ভাবতে রেলিংয়ের ও পারে চলে গিয়েছেন মহিলা। হাতে ধরা নেই চেন। এক মুহূর্তও দেরি করল না তমাল। দৌড় লাগাল।

"কী করছেন?"

তমালের ধমকে চমকে উঠলেন মহিলা। ততক্ষণে মহিলার হাত ধরে ফেলেছে তমাল। প্রায় হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তমালের দিকে চেয়ে রইলেন মহিলা। আচমকা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। বিস্মিত, বিহ্বল তমালও যেন স্থবির হয়ে গেল। কী করণীয় বিস্মৃত হল।

সচ্ছল, সুখের সংসার ছিল মৃদুলা রায়ের। স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার, বছর আঠারোর ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফার্স্ট ইয়ার। আর পাঁচ জন বাঙালির মতো বছরে তিন-চার বার দিঘায় যেতেন। সেই বারও গিয়েছিলেন। কল্পনাও করতে পারেননি কী বিপদ অপেক্ষা করছে। স্বামী-ছেলে স্নান করছিল সমুদ্রে। আচমকা বিরাট ঢেউ, চোখের পলকে অদৃশ্য। বুঝতেও পারেননি। ভেবেছিলেন ঢেউ চলে গেলেই ভেসে উঠবে বাবা-ছেলে। উঠল না। আশা-নিরাশায় দুলতে-দুলতে নিজেও এক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। জোর করে টেনে তুলল নুলিয়ারা। যে গিয়েছে তাকে যেতে দেওয়াই সমুদ্রের নিয়ম। নিজেই ফিরিয়ে দেবে এক সময়ে।

ফিরিয়ে দিল। নিথর, নিস্পন্দ দেহ। পাগলপ্রায়, দিশাহীন মৃদুলা। স্বামী-পুত্র ছাড়া আর কেউই তো ভেসে গেল না? তারা তো পড়ল না দেবতার গ্রাসে? উত্তর খুঁজতে দেবতারই শরণাপন্ন হলেন। কী অপরাধে এমন অভিশাপ?

উত্তর মিলল না। এ-আশ্রম সে-আশ্রম, এ-গুরু সে-গুরু, ঘোরাই সার। এক সময় সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাণ বিসর্জনের। বিসর্জন দেবেন জলেই। করবেন চরম ব্যঙ্গ, দ্যাখো, আমাকে গ্রাস করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করছি।

যে কোনও জায়গাতেই ডুবে মরা যেত। কিন্তু দেবতার উপরে প্রতিশোধ নিতে মৃদুলা বেছে নিলেন দেবস্থানের পবিত্র জল। কুম্ভের চেয়ে পবিত্র জল আর কোথায়ই বা আছে? তাই দীর্ঘ এগারো বছর কুম্ভে-কুম্ভে ঘুরছেন। করছেন আত্মহত্যার চেষ্টা। কিন্তু প্রতি বারই বিফল। উড়ে আসে দেবদূত।

"বড়ই অদ্ভুত ভাবনা আপনার।"

"জীবনটাই কিম্ভূত, ভাবনা তো অদ্ভুত হবেই।"

চমকে উঠল তমাল! মনে পড়ল বৈরাগীতলার মেলায় বাউলকথা, গা থাকলেই ঘা হয়। অভিজ্ঞতায় কত কিছুই না অর্জন করে মানুষ! হয়তো বুঝতেও পারে না। মৃদুলাকে থিতু করবার জন্য বটতলায় বসিয়েছে, খাইয়েছে গরম চা।

"এত বার আত্মহত্যার চেষ্টায় বিফল হয়ে কী বুঝলেন আপনি?"

"বুঝলাম ভগবান আমার শত্রু।"

হেসে ফেলল তমাল। হাসি সমীচীন নয় বুঝে বলল, "ঈশ্বর কারও শত্রুও নন, মিত্রও নন।"

"কী করে বলছেন একথা?"

“আমাদের প্রেসিডেন্ট কি আপনার বন্ধু না শত্রু? একশো তিরিশ কোটি মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রাখা সম্ভব?”

“আমার তা মনে হয় না। তিনি নিশ্চিত বিশেষ করে আমার উপর কুপিত। আরও কষ্ট দিতে চান আমায়।”

“যদি মেনেওনি, তা হলে উল্টোটাও কিন্তু হতে পারে।”

“মানে?”

“প্রকৃতির কাজ এখনও শেষ হয়নি, দেওয়ার কিছু বাকি আছে ।”

“আমি আর কী দিতে পারি প্রকৃতিকে? সানডে সাসপেন্স শুনছিলাম বলে আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সত্যিই সন্ন্যাসীর সাসপেন্স থাকতে নেই। যে সমর্পিত, তার আবার কৌতূহল কিসের? কিন্তু বিশ্বাস করুন, সমর্পণ করার ক্ষমতা আমার নেই। সন্ন্যাসীও তাই হতে পারলাম না। উদ্দেশ্য একটাই, মরার আগে পর্যন্ত সময়টা কোনও রকমে পেরিয়ে যাওয়া,” শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন মৃদুলা।

“এখনও কি বুঝতে পারছেন না, আসা যেমন আপনার ইচ্ছায় হয়নি, যাওয়াও হবে না?”

“দেখছি তো তাই। আরও অনেক দগ্ধাতে হবে।”

“আমি হয়তো আপনাকে একটা দিশা দেখাতে পারি।”

“মরা মানুষকে জ্যান্ত করার ক্ষমতা আছে নাকি আপনার?” ম্লান হাসল মৃদুলা।

“সে ক্ষমতা প্রকৃতি আমাদের দেয়নি। তবে আমি আপনাকে কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, যাদের বলা হয় স্পেশ্যাল চাইল্ড। বাচ্চাগুলোর যদি একটুও উন্নতিসাধন করতে পারেন, তা হলে দেখবেন আপনার ভগবানের কাছে উত্তর খোঁজার প্রয়োজন বোধহয় পড়বে না,” প্রস্তাব দেয় তমাল।

“বাচ্চা...” হঠাৎ করেই মৃদুলা আনমনা।

“এক বার তাদের সান্নিধ্য পেয়ে দেখুন, তার পরেই না হয় সিদ্ধান্ত নেবেন।”

“সত্যি বলছ ভাই?”

“আপনাকে মিথ্যে বলার কোনও প্রয়োজন আমার নেই দিদি। এই নিন আমার কার্ড। কলকাতায় ফিরে ফোন করবেন, স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। কিন্তু দয়া করে আর আত্মহত্যার চেষ্টা না। জানবেন, প্রকৃতি এখনও চায় আপনাকে।”

কার্ড নিতে গিয়ে তমালের হাত চেপে ধরলেন মৃদুলা। যেন পেয়েছেন সমুদ্রমাঝে একটুকরো স্থল। শক্ত মাটি উঠে দাঁড়াতে ইন্ধন দিচ্ছে । কানে বাজছে, প্রকৃতি এখনও চায় আপনাকে।

এক জন মানুষের আত্মহত্যার চেষ্টা কোনও বড় ঘটনা নয়। তাকে উদ্ধার করাও কোনও বড় ঘটনা নয়। এই মুহূর্তে বড় ঘটনা হল, আত্মহত্যার চেষ্টা এবং উদ্ধার, জন্ম দিয়েছে এক নতুন ভাবনার। আত্মহত্যার কথা কখন ভাবে মানুষ? মানসিক আঘাতে, অর্থাভাবে, মনোরোগে, ইচ্ছা অপূর্ণ থাকার হতাশায়, কলঙ্ক ভয়ে অথবা কলঙ্কিত হয়ে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তমালের হঠাৎ মনে হল, বাবাও তো আত্মহত্যা করতে পারে? কলঙ্কিত হওয়া যথেষ্টই জোরালো কারণ। যদিও বাবার মতো বলিষ্ঠ মানুষের পক্ষে আত্মহত্যা অস্বাভাবিক, তবুও বলিষ্ঠ মানুষও তো কখনও না কখনও ভেঙেচুরে যায়। তখন কি আত্মহত্যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়ে ওঠে না?

আর ভাবতে পারল না তমাল। ভাবতে চাইলও না। জোরে পা চালাল। মীনাক্ষীরা রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছে হোটেলে। তবুও এক বাঁশিওয়ালার করুণ সুরে ফিরে এল অজানা আশঙ্কা। বাবা যদি সত্যিই আত্মহত্যা করে থাকে, তা হলে যে ব্যর্থ হবে সব আয়োজন। লক্ষ মানুষের ভিড়ে খোঁজাই সার হবে নেই-মানুষকে।

॥ ১৫ ॥

চলতে-চলতে পথ যদি হঠাৎ হয় শেষ? সামনে অগভীর খাদ। সেখানে জন্তু-জানোয়ার, সরীসৃপ। পিছনে ফেরা যেতেই পারে, মিলতে পারে সুগম পথ। কিন্তু এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত হলে ফেরা চলে না। ঝাঁপ দিতেই হয় খাদে। মৃত্যু না হলে জীবন হবে দুর্বিষহ। নানারকম প্রথার মধ্যে কোনও রকমে টিকে থাকা। রাজনীতি, কূটনীতি, ছলনা, প্রতারণার প্রয়োগে টিকে থাকা। থাকতে-থাকতে এক সময় হয়তো সহ্য হয়ে যাবে, জীবন মোড় নেবে অন্য পথে। আবার যদি উদ্দিষ্ট পথের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলেও কি অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে আর পাড়ি দিতে ইচ্ছে করবে? উপায় আরও একটা আছে। পথের শেষপ্রান্তে ঝাঁপ না দিয়ে জীবন বিসর্জন দেওয়া। নতুন করে ফিরে এসে শুরু করা।

হর কি পৌড়ির রাস্তায় দ্রুত হাঁটছেন অবধেশ গিরি মহারাজ। গন্তব্য জুনা আখড়া। ওখানেই উঠেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। বয়স আশির কোঠায়। করোনার ঝুঁকি নিয়েও এসেছেন। ছাড়তে পারেননি দীর্ঘ পুণ্যার্জনের অভ্যেস। কিন্তু এসেই অসুস্থ। জ্বর, সর্দি-কাশি। করোনো না হলেও বয়সের কারণে চিন্তার বিষয়। খবর পেয়েই তাই রওনা দিয়েছেন। সম্পর্ক তো আজকের নয়।

নিজেও এড়াতে পারেননি দীর্ঘ অভ্যেস। নিয়মমাফিক উঠেছেন কনখলের এক ছোট্ট আশ্রমে। তবে উদ্দেশ্য সামান্য ভিন্ন। পুণ্যার্জন নয়, মিলন ইচ্ছাই টেনে আনে কুম্ভমেলায়। সাধু-সন্তদের সঙ্গে আলোচনা, বিতর্ক-বিবাদে বেশ কাটে সময়টা। অর্জনও বাড়ে। দৃষ্টি একমাত্রিক হলে অসম্পূর্ণ রয়ে যায় জীবন। নানাজনের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মেলে বহুমাত্রিক জীবনসন্ধান। মন প্রফুল্ল হয়, জাগে আনন্দ। এই আনন্দ আস্বাদন অসম্ভব আটপৌরে পিঁপড়ে জীবনে।

অভ্যেস এড়াতে না পারলেও সর্বদা সতর্ক অবধেশ মহারাজ। ধর্মের আবরণে সুরক্ষিত ভাবতে নারাজ। সর্বক্ষণ সঙ্গে মাস্ক, স্যানিটাইজ়ার। শিষ্যদেরও আনেননি এইবার। বহুজন নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। নিজের বয়স হয়েছে, লাভ কি গুটিয়ে থেকে? অহেতুক দীর্ঘ জীবন কাম্য নয়।

জুনা আখড়ার কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন। বাইকের হর্ন, অটো-রিকশাওয়ালাদের হাঁকাহাকি, হকারদের ডাকাডাকির মধ্যেও কানে এল— “বীরভূম টিকরবেতা গ্রামের শ্রীযাদব কর্মকার। তোমার মেয়ে মীনাক্ষী আর ছেলে তমাল মেলা অফিসে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো বাবা... গতকাল থেকে পথ চেয়ে রয়েছি তোমার। যত তাড়াতাড়ি পারো এসো।”

অজান্তেই থমকে গেল পা। ‘ভুল শুনছি’র আশ্বাস পেতে চাইলেন। কিন্তু না আবার, পরপর তিন বার। অসহায় বোধ করলেন। কোনও রকমে নিজেকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন আখড়া-অন্দরে।

অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের মূল ফারাক বুদ্ধি, হাসি, স্মৃতিশক্তি, চেতনা। শ্রেষ্ঠ প্রাণির তকমায় ভূষিত হলেও, বিড়ম্বনাও কম নয়। বেদনা যেমন মানুষের বেশি তেমনই চেতনার। অন্তত স্মৃতিশক্তি যদি কম হত, তা হলে হয়তো রেহাই মিলত খানিকটা। স্মৃতি টানে পিছনপানে। মসৃণ রাস্তা হঠাৎ শেষ হয়ে দাঁড় করায় খাদের কিনারে।

স্বামীজির সঙ্গে দেখা করেও আখড়া থেকে বেরোতে পারলেন না অবধেশ মহারাজ। অলীক খাদের ভয়ে পায়ের ওজন যেন কয়েক মণ। আখড়ার নিরালায় বসলেন। মন শক্ত করতে চাইলেন। তবুও মন গেল পিছনপানে, খাদের টানে, টিকরবেতায়।

সেই রাধাবিনোদ মন্দির, সেই কুশেশ্বর মন্দির, সেই জয়দেবের সিদ্ধাসন, সেই কাঙাল ক্ষ্যাপা-কোটরেবাবা-মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রম, সেই মহাশ্মশান, সেই অক্ষয় বটতলা, সেই জয়দেব মেলা, সেই অজয় বাঁধ, সেই টিকরবেতার অবিরাম ঠুকঠাক। মাথার ভিতরেও কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। স্মৃতিমালা জট পাকিয়ে ফিরে আসছে দমকে-দমকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মন-লাগাম হারিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন স্মৃতি-জোয়ারে।

কোনও দিনই বৈষয়িক বিষয়ে মাথা ঘামাননি যাদব। বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন পড়াশোনা আর স্কুলে। ছেলেকে নিয়ে বেশ

খানিকটা আগেই বেরিয়ে পড়তেন। বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে রাধাবিনোদ মন্দিরে। সেখানে প্রণাম সেরে আবার বাঁধের উপর দিয়ে কুশেশ্বর মন্দির হয়ে স্কুলে। পথে দেখা মিলত নানা মানুষজনের। কেউ করত কুশল বিনিময়, কেউ জানাত সমস্যা। মানুষের ভরসা, নির্ভরতাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজস্ব বিবেচনায় বাতলাতেন সমাধান।

স্কুলে পৌঁছেও ভিতরে ঢুকতেন না। ছেলে ঢুকে গেলেও দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রধান ফটকে। ঘণ্টা বেজে গেলেও দাঁড়াতেন বেশ কিছু ক্ষণ। দেরি হলে ছাত্র, শিক্ষক রেয়াত করতেন না কাউকেই। নিজে নিয়মিত ক্লাস না নিলেও ফাইনাল পরীক্ষার আগে সমস্ত ক্লাসেই দু'-চার বার ঢুঁ মারতেন। মূল্যায়ন হয়ে যেত ছাত্র, শিক্ষক দু'জনেরই। ছাত্রের খামতি নজরে পড়লে নিতেন বাড়তি ক্লাস আর শিক্ষকের গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া তিরস্কার। স্কুলের রেজ়াল্টও হত ভাল। জেলার আর দশটা স্কুলের থেকে এগিয়ে থাকত অনেকটাই। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যাদব। অন্যের মূল্যায়নে কোনও খামতি রাখেননি। আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন খামতি পূরণের। শুধু নিজের মূল্যায়নটাই কেউ করল না। এক বারও ভেবে দেখল না, স্কুলের সুনামের নেপথ্যে হেড মাস্টারমশাইয়ের অবদান। উল্টে জুটল চোর তকমা। মানুষকেও আর দোষ দিতে মন চায় না। বিনা স্বার্থে কেউ যে কিছু করতে পারে এমন ভাবনা ভাবতে পারে ক'জন? একজনও কি ছিল না? আফসোস শুধু ওইটুকুই।

আজও সেই ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে। অত নীচেও নামতে পারে মানুষ! সেই মানুষ, যাদের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছেন সর্বদা! সেই মানুষ, যাদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন খাবার! সেই মানুষ, যাদের ভাবতেন অনাত্মীয় হয়েও আত্মীয়! নিজের বিশ্বস্ত জনও কখন যে স্বার্থান্বেষী হয়ে উঠেছে, বুঝতেও পারেননি। লড়াই করতেই পারতেন, জানাতেই পারতেন প্রতিবাদ। প্রবৃত্তি হয়নি। মনোবলও ঠেকেছিল তলানিতে। কৃষ্ণ-সারথি তো সবার ভাগ্যে জোটে না। তাই যাওয়া হয়নি কুরুক্ষেত্র ময়দানে। তীব্র হতাশা, ঘৃণায় ময়দান ছেড়েছিলেন।

ছাড়বার আগে যে কারও কথা ভাবেননি তা নয়। বেশি করে ভেবেছিলেন ছেলেমেয়ের কথা। আপন মানুষ গড়ার কাজই বাকি রয়ে গেল। তবুও সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। ওদের ভালর জন্যই রইলেন। বাপের চোর কলঙ্কের ছিটে ওদের গায়েও লাগবে। ভুগবে হীনম্মন্যতায়, প্রভাব পড়বে মনে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হবে যদি কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তিতে দিশেহারা হয়ে বিশ্বাস করে ফেলে অপবাদ। সেই অসম্মান যে অসহনীয়। তার চেয়ে অনেক ভাল চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়া। শুধু চোখের সামনে থেকে নয়, পৃথিবী থেকেই সরে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যেই দীর্ঘ পথ হেঁটে পৌঁছে গেলেন দুর্গাপুর স্টেশনে। যে ট্রেন আসবে তাতেই উঠে পড়বেন। কোনও নির্জন স্থানে পৌঁছে করবেন উদ্দেশ্য সাধন। তখনও জানা নেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে অন্য পথে। গৃহী জীবন ত্যাগ করে হতে হবে সন্ন্যাসী।

"এখানে একা বসে আছেন মহারাজ?"

"এমনিই..."

"এমনি নয়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে গভীর কিছু চিন্তা করছেন।"

"ভাবছি, এ বার মেলা না হলেই বোধহয় ভাল হত..." দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অবধেশ মহারাজ। নিজস্ব চিন্তার বিষয়টি আড়াল করতে চাইলেন। যদিও জানেন, সন্ন্যাসীর নিজস্ব বলতে কিছুই থাকতে নেই। তবুও নিজেকে একবগ্গা সন্ন্যাসী ভাবতে পারলেন কোথায়?

"এ কথা বলছেন কেন? পূর্ণ কুম্ভ কখনও বাদ যেতে পারে!" অখিল অবাক। জুনা আখড়ার সর্বক্ষণের কর্মী। নানা জায়গা ঘুরে স্থায়ী হয়েছে হরিদ্বার আশ্রমে।

"বাদ গেলেই বা অসুবিধে কী ছিল? জীবনের চেয়ে ধর্ম তো বড় নয়। আস্তে-আস্তে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ছে। তার উপর শিবরাত্রির জল নিতেও আসছে হাজার-হাজার মানুষ। সরকারের তরফে তো সে রকম সচেতনতা দেখছি না। অথচ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রচুর। শেষমেশ মড়ক না লেগে যায়," চিন্তিত অবধেশ মহারাজ।

"অত ভাববেন না মহারাজ। দেখবেন, মহাদেবের কৃপায় কিচ্ছু হবে না। কাল বাদে পরশু শিবরাত্রির স্নান। আপনি যাবেন তো আমাদের সঙ্গে?" অখিলের আন্তরিক জিজ্ঞাসা।

"তা যাব। তবে নিরঞ্জনী আখড়ায়ও একবার যেতে হবে। কথা দিয়েছি ওদের।"

"আপনার মতো জ্ঞানী মানুষকে পেয়ে সবাই ধন্য হতে চায়। কোনও একটা বড় আখড়ার সঙ্গে যদি যুক্ত থাকতেন, তা হলে নিশ্চিত এত দিনে মহামণ্ডলেশ্বর হয়ে যেতেন।"

"রাজা হতে তো আমি কোনও দিন চাইনি অখিল। তোমাদের সকলের ভালবাসা পাই, এই আমার পরম প্রাপ্তি," স্মিত হেসে বলে অবধেশ মহারাজ।

"আপনাকে যে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতেই হয় মহারাজ। যাই হোক, শাহী স্নানে আমাদের কিন্তু নিরাশ করবেন না। আমি যাই, অনেক কাজ বাকি," আবদার জানিয়ে অখিল প্রণাম করে।

"নিশ্চিন্ত থেকো, ঠিক সময়ে আমি হাজির হয়ে যাব।"

ঠিক সময়টাই বাছতে পারছেন না অবধেশ মহারাজ। রাস্তায় এখনও প্রচুর ভিড়। সেই ভিড়ে যে ওরাও নেই কে বলতে পারে? অথচ বেশিক্ষণ আর বসাও চলে না আখড়ায়। মানুষের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকবে, করবে নানা প্রশ্ন। তবুও পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছেন না। কিসের ভয়? শরীর দীর্ঘকায় থাকলেও শীর্ণ হয়েছেন অনেকটাই। তার উপর জটা, দাড়ি-গোঁফ। পাকও ধরেছে। চিনতে পারার কথাই নয়। আর পারলেই বা কী? সম্পর্ক বলে আর কিছু তো অবশিষ্ট নেই। নেই তাই আবেগও। জোর করে তো ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু একটা কথা বুঝতে পারছেন না, এত দিন পরে হঠাৎ খোঁজ পড়ল কেন? তা হলে কি মাধব ব্যক্ত করেছে সন্দেহ? নিজে চিনতে পারলেও মাধব যে পারেনি নিশ্চিত ছিলেন। এখন মনে হচ্ছে মাধবের সন্দেহের সূত্র ধরেই ছেলেমেয়ে গিয়েছিল পঞ্চলিঙ্গেশ্বরে। তার পর খুঁজে বার করেছে নিতাই পাণ্ডাকে। ওর কাছেই পেয়েছে কুম্ভমেলায় শিবরাত্রি স্নানের সংবাদ। আচমকাই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন অবধেশ মহারাজ। যে ভিড় ভয়ের, আশঙ্কার, সেই ভিড়কেই অস্ত্র মনে করলেন। ওই ভিড়ে কিছুতেই সম্ভব নয় চিনতে পারা।

দ্বিধা, জড়তা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অবধেশ মহারাজ। পা বাড়ালেন আখড়ার বাইরে। মনে সংকল্প, অতীত যদি সত্যিই সামনে এসে দাঁড়ায়, দূরে ঠেলতে দ্বিধা করবেন না। যত কঠিনই হতে হোক না কেন, কিছুতেই আর পা রাখবেন না জন্তু-জানোয়ার, সরীসৃপের জঙ্গলে। কিছুতেই ফিরবেন না পিঁপড়েজীবনে।

॥ ১৬ ॥

কর্কট রোগের চেয়েও অনিশ্চয়তা ভোগ যেন বহুগুণ দুর্বিষহ। এক মুহূর্তও তিষ্ঠতে দেয় না। সারাক্ষণ জ্বালাপোড়া। মানসিক শান্তি যেন অলীক। অনিশ্চয়তা মানেই আয়ত্তে নেই নিশ্চয়তা। পরনির্ভরশীলতা অসহ্য ঠেকে। সহ্য করতেই হয়। দাঁতে দাঁত চেপে শুধুই অপেক্ষা, পরিস্থিতি অনুকূল হবে না প্রতিকূল?

সারাদিন ঘর-বার করতে-করতে তপতী ঘেমে-নেয়ে একসা। ভাবতে অবাক লাগে, কয়েক মাস আগেও তো এমনটা ছিল না! দিব্যি নিশ্চিন্তে কাটছিল জীবন। আচমকাই এক ঝোড়ো হাওয়া যেন ঝড় তুলে দিল জীবনে। একার জীবন হলে ঝড় সামলে নিতেন। কিন্তু জীবন যে জড়িয়ে গিয়েছে আরও দুটো জীবনের সঙ্গে। এমন দু'জন, যাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব। নিজের ছেলেমেয়ে যে এই ভাবে বিপক্ষে চলে যাবে, ভাবতেই পারেননি তা।

এখন বুঝতে পারছেন, ভাবা উচিত ছিল। সকলেরই আটপৌরে জীবন পছন্দ হবে এমনটা নাও হতে পারে। সন্তানের আগে তারা তো মানুষ। আর মানুষ বলেই থাকবে নিজস্ব মতামত। তারও আগে পরম্পরা। তবুও নিরপেক্ষ হতে পারলেন না। কী করে হতে পারবেন? মধ্যবিত্ত জীবন, মানসিকতা যে সেই শিক্ষা দেয় না। দেয় সাদা-কালো

অনুভূতি আর নিজস্ব ক্ষমতাটুকু নিয়ে সেরা হওয়ার প্রয়াস। তবুও ভাবতে অবাক লাগে, মধ্যবিত্ত জীবনে অভ্যস্ত হয়েও ছেলেমেয়ে কী করে অতিক্রম করল মধ্যবিত্ত মানসিকতা? এ কি শুধুই পরম্পরা, নাকি নিজস্ব ক্ষমতায় উত্তরণ?

ফোনে মীনাক্ষীর চেষ্টার যে বিররণ শুনেছেন তাতে মনে হচ্ছে, মেয়েটা জিতেও যেতে পারে। ছেলেমেয়ে অথবা জীবনের সঙ্গে যে হার-জিতের খেলায় নামতে হতে পারে, ভাবেননি কখনও। ভাবেননি এক সময় সকলেই হয়ে উঠবে প্রতিদ্বন্দ্বী।

এমনটা না ভাবলেও তো হয়। ছেলেমেয়ের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিলেই তো মিটে যায় সমস্যা। কিন্তু মেটে না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় অভ্যেস, নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। আরও তলিয়ে ভাবেন তপতী। আজ যদি ছেলেকে নিয়ে এই ঘটনা ঘটত, তা হলেও কি এমনটাই ভাবতেন? কখনওই নয়। বরং ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য আকুলি-বিকুলি করত। কিন্তু ছেলে আর স্বামী যে এক নয়। এক জন আত্মজ, অন্য জন আত্মীয়। তা ছাড়া ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুই মানসিক। স্বামীর সঙ্গে যে দেহ-মন জড়িয়ে। যদিও দেহ-সুখের বয়স আর নেই, তবুও তার যদি থাকে? যে মানুষের প্রতি জন্মে গিয়েছে ঘৃণা, তাকে করা যায় দেহদান?

ফিরে যে আসবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। তা হলে এত ভাবছেন কেন? ভাবার কারণ, ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে প্রবল ইচ্ছাশক্তি। ছেলের ইচ্ছাশক্তি অতটা প্রবল হয়তো হবে না। মায়ের প্রতি টান ঘাটতি আনবে। কিন্তু মেয়ে? সে যে একবগ্গা। তার ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজয় ঘটলেও ঘটতে পারে। পরাজয় মানার বয়স আর নেই। নেই মানসিকতাও। তপতী তাই ভাবতে লাগলেন অন্য উপায়। সময় খুবই কম। কাল বাদে পরশু শিবরাত্রি।

"আপনি যখন বলেছেন, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।"

"হ্যাঁ বাবা, একটু দেখো।"

"শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এই রকম প্রয়োজন পড়ল কেন?"

"প্রয়োজন তো পড়বেই বাবা। শিগগিরই মেয়ের বিয়ে। তার পরেই ছেলের বিয়ে। মেয়ে-জামাই বাড়িতে এলে থাকতে দেব কোথায়? ঘর তো মোটে দুটো," বাস্তব আড়াল করে তপতীর প্রয়োজন ব্যাখ্যা।

"মেয়ের বিয়ে! এ তো খুব ভাল খবর মাসিমা। কিন্তু নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে উঠবেন?" খুশি হলেও সমস্যা বোধগম্য হয়নি তপন শিকদারের। যদিও বাড়ি খুঁজে দিতে পারলে মন্দার বাজারে দালালি কিছু জুটবে।

"খামোখা আর একটা ফ্ল্যাট কেনার তো কোনও মানে হয় না। আমি আর ক'দিন বাঁচব বলো? এ ক'টা দিন ভাড়া বাড়িতে দিব্যি কেটে যাবে।"

"সে ঠিক আছে, তবে এখন করোনা বাজারে ফ্ল্যাটের দাম কিন্তু বেশ কম। আমি বলি কী মাসিমা, ছেলেকে বলুন আর একটা ফ্ল্যাট কিনতে। আমি সস্তায় ম্যানেজ করে দেব। বিয়ের পরে ছেলে সেখানে থাকবে আর আপনি যেমন আছে তেমন। মেয়ে-জামাই এলে উঠবে আপনার এখানেই," তপনের প্রস্তাব। ভাড়ার দালালির চেয়ে বিক্রির কমিশন ঢের বেশি। এক বার যদি মহিলাকে ফাঁসানো যায়, ক'মাসের লোকসান অনেকটাই পুষিয়ে যাবে। করোনা এসে ব্যবসাপত্তর একেবারে লাটে তুলে দিয়েছে।

"বলব। তবে আপাতত তুমি একটা ভাড়াবাড়িই দ্যাখো," প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন তপতী। সঞ্চয় যা আছে, বাড়িভাড়া দিয়েও নিজের খরচ চালিয়ে নিতে পারবেন।

"আমি বলছিলাম ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে ভাল হত না? ও যদি নতুন ফ্ল্যাট..." খেলা ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টা তপনের।

"আপাতত যেটা বললাম তুমি সেটাই করো তপন। কাছাকাছির মধ্যে একটা ভাড়াবাড়ি খুঁজে দাও। একটা ঘর হলেই চলবে।"

"ঠিক আছে দেখছি..."

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে অনেকটা হালকা বোধ করলেন তপতী। যদিও জানা নেই ছেলেমেয়ে কী ভাবে নেবে এই সিদ্ধান্ত। তবে পছন্দ যে করবে না আন্দাজ করাই যায়। তীব্র আপত্তিও জানাবে। কিন্তু কোনও বারণই শুনবেন না তপতী, সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন। তবে সিদ্ধান্তের কথা তখনই জানাবেন যদি সাধুকে নিয়ে ওরা ফেরে। কিন্তু ফিরলে বিয়ে এড়াবেন কী ভাবে? আর ভাবতে পারেন না তপতী। নিজেকে ছেড়ে দেন ভবিষ্যতের হাতে। তলিয়ে যান ঘুমে।

"হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিলে?"

"নিলাম..."

"কেন নিলে সেটা তো বলবে? এত দিন পরে..."

"ভাবলাম, ছেলে তো প্রায় বড় হয়ে গেল। একজন সঙ্গী পেলে ওর ভাল লাগবে। তা ছাড়া তুমি মেয়ে চেয়েছিলে। এবার যদি... তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে, নতুন অতিথিকে মানুষ করে সময়ও কাটবে আনন্দে," যাদব যেন অন্যরকম।

"এত কিছুও ভাবো তুমি?" হালকা হাসি তপতীর ঠোঁটের কোণে।

"জানি খোঁটা দিলে। সারাদিন স্কুল আর গ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তোমাকে সময় দিতে পারি না। এটুকু জেনো, সেটা কিন্তু ইচ্ছে করে নয়। পরিস্থিতি বাধ্য করে," সামান্য হলেও নিজস্ব গাম্ভীর্যে ফিরে যান যাদব।

"আমিও কি বাধ্য করছি?" যাদবের গাম্ভীর্যকে গুরুত্ব দিলেন না তপতী।

"সে কথা বলেছি? তুমি তো কখনও আমার কোনও কাজে বাধা দাওনি। হাসি মুখে মেনে নিয়েছ সব। আমার মনে হল তাই বললাম। কেন, তুমি চাও না?" গাম্ভীর্য বজায় রেখে যাদব জানতে চান।

"আমার চাওয়া না-চাওয়ার তোয়াক্কা করো তুমি?" ভ্রু উঁচিয়ে ঠোঁটে হালকা হাসি বজায় রেখে বলেন তপতী।

"দেখে হয়তো মনে হয় করি না, কিন্তু করি অবশ্যই।"

"শুনেও শান্তি..."

"বিশ্বাস করছ না আমাকে?"

"অবিশ্বাস করতে পারি তোমায়? শুধু বলি, তুমি যা চাইছ আমিও তাই চাই। এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দিও না আমায়," মাটির দিকে তাকিয়ে তপতী। হালকা হাসি মিলিয়ে মুখ হয়েছে রাঙা।

"তুমি দেখো আমাদের মেয়েই হবে," তপতীর হাসি এ বার যাদবের মুখেও।

"হলে পুজো দেব রাধাবিনোদ মন্দিরে।"

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন তপতী। এমন স্বপ্ন তো আসেনি বহু দিন! তবে কি মানুষটার কথা বেশি ভাবছেন বলেই এমন স্বপ্ন? খুশি-অখুশি দুই-ই হলেন তপতী। সুখের অতীতই তো জীবনের ধনরত্ন। কিন্তু সেই সুখ ছাপিয়ে যখন থাবা বসায় দুঃখের অতীত, তখন সুখ আর সুখ থাকে না। ঘেন্না জন্মায় নিজের উপরে। মনে হয়, তাসের ঘরকে পোক্ত বাড়ি ভেবেছিলাম!

স্বপ্ন দূরে ঠেলে মন শক্ত করলেন তপতী। কিছুতেই হবেন না দুর্বল।

॥ ১৭ ॥

এনার্জির কোনও সিক্রেট হয় না, যার থাকে তার থাকে। যেন প্রকৃতির অপার করুণা। কতিপয় মানুষই এই গুণের অধিকারী। ক্লান্ত হয় না, হতাশ হয় না, সর্বক্ষণ ফুটছে উৎসাহ উদ্দীপনায়। কোনও কাজেই পিছপা নয়। অসম্ভব শব্দটাই নেই অভিধানে। চরৈবেতি

জীবনের অগ্রগামী পথিক যেন।

মীনাক্ষীর এনার্জি অবাক করে তমালকে। হরিদ্বারে পৌঁছনোর পর থেকেই চলছে অবিরাম ঘোরাঘুরি। সাফল্যের সামান্য আভাসও মেলেনি। তবুও রোজ সকাল ছ'টায় উঠে পড়ে। চায়ের ব্যবস্থা করে ঠেলে তোলে তমাল-অনুজকে। বাধ্য করে ব্রেকফাস্ট সেরে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে। তমাল-অনুজ অসহায়। এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সামনে কোনও যুক্তি চলে না।

মীনাক্ষীর যুক্তিতে আজ আবার কনখল যেতে হবে। স্থায়ী আশ্রমগুলোয় ভাল করে খোঁজ করতে হবে। একবার যেতে হবে অবিচল মহারাজের আখড়ায়ও। যদি কোনও সূত্র পেয়ে থাকেন। তার পর হরিদ্বারের আশ্রমগুলোতেও খোঁজ নিতে হবে। আগামী কাল শিবরাত্রি। আজকের মধ্যে চষে ফেলতে হবে গোটা কনখল, হরিদ্বার।

রাস্তায় বেরিয়ে অবাক হয়ে গেল তমাল। শিবরাত্রি উপলক্ষে গতকাল রাত থেকেই ভিড় বাড়ছিল। আজ যেন পিলপিল করে আসছে মানুষ। বেশিরভাগই কমবয়সি ছেলের দল, এসেছে শিবরাত্রি উপলক্ষে গঙ্গাজল নিতে। মাস্কের বালাই নেই, দূরত্ববিধি দূর অস্ত। কোনও রকমে ভিড় এড়িয়ে কনখলের অটোয় উঠল।

"ভগবান কে সিবা এক সাধু কা অর কোই নেহি হোতা। তো ফায়দা কেয়া হ্যায় খোঁজনে মে?"

আশা, উৎসাহ নিয়ে এ-আশ্রম সে-আশ্রমে সন্ধান করছিল তমালরা। আচমকা মহানির্বাণী আখড়ার এই সাধুর কথা যেন দড়াম করে কেউ মুখের উপর দরজা এঁটে দিল। থমকে গেল তিনজনেই। জানা কথাও চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল পিঠে।

মূল সমস্যা, আশ্রমগুলোয় খোঁজ করতে গেলেই তারা উদ্দেশ্য টের পেয়ে যাচ্ছে। সকলেই সংসার ত্যাগী তাই কেউই চাইছে না সতীর্থকে আবার পাঁকে ঠেলতে। হয়তো চেনে না, তবুও বাড়ির লোক খোঁজ করছে জেনেই নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছে। হতাশ হয়ে তিনজন এল অবিচল মহারাজের আখড়ায়। তিনিও কোনও আশার বাণী শোনাতে পারলেন না। উল্টে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

"তা হলে দাদা..."

"একটা ভুল হয়ে গিয়েছে আমাদের।"

"কী ভুল?"

"আমরা যে বাড়ির লোক সেটা বোঝানো ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল, আমরা শিষ্য। গুরু কোথায় উঠেছেন জানা না থাকায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি," তমালের যুক্তি।

"সে তো গুরুকে ফোন করলেই জানা যায়," পাল্টা যুক্তি দিল মীনাক্ষী।

"ফোন পাল্টালে নম্বর তো নাও থাকতে পারে। সবাই তো আর গুগল ড্রাইভে সেভ করে না," উত্তর যেন সাজানোই ছিল তমালের।

"কিন্তু এখানকার প্রায় সব আশ্রমই যে ঘোরা হয়ে গেল..."

"প্ল্যানটা এখানে আর কাজে লাগবে না। হরিদ্বারের আশ্রমগুলোয় অ্যাপ্লাই করব।"

"বলেছিস ঠিক। তবে আমি..."

"মনের জোর হারাস না মিনু, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখ।"

"আমাদের টিকিট তো ফোরটিন্থ নাইট। আজ টেন্থ, মানে আরও চার দিন সময় আছে। চিয়ার আপ মিনু, উই উইল ডু ইট," বাড়তি উৎসাহ জোগায় অনুজ।

ম্লান হাসল মীনাক্ষী।

"হম হাত পর থুক সকতে হ্যায় লেকিন স্যানিটাইজ়ার নেহি লাগায়েঙ্গে।"

হরিদ্বারের চায়ের দোকানি যেন সপাটে থাপ্পড় কষালো গালে। গত দু'দিন যত দোকানে চা খেয়েছে সকলকেই অনুরোধ করেছে চা বানানোর আগে হাত স্যানিটাইজ় করতে। স্যানিটাইজ়ার নিজেরাই দিয়েছে। অনিচ্ছুক হলেও আপত্তি করেনি কেউই। কিন্তু এই দোকানি যে আচমকা এই রকম উত্তর দেবে অভাবনীয়। হতবাক হয়ে গেল তিন জন। কথা না বাড়িয়ে সরে এল দোকান থেকে।

প্রচণ্ড রাগ হল তমালের। ঠিক করে ফেলল, ফিরে গিয়েই কুম্ভের অসচেতনতা নিয়ে একটা ফিচার লিখবে। স্থানীয় মানুষজনেরই যদি এই আচরণ হয়, তা হলে যারা বাইরে থেকে আসছে তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারে প্রশাসন? সারাক্ষণ মাইকে ভক্তিগীতি বাজছে, সচেতনতার ঘোষণা কোথায়? ঘোষণা শুনলেই যে মানুষ সচেতন হয়ে যেত এমনটা নয়। সরকারের তরফে একটা চেষ্টা অন্তত থাকত। যদিও হোটেল বা রেস্তরাঁয় খেতে গিয়ে একাধিক বার শুনেছে, 'করোনা নাম কি কোই চিজ়ই নেহি হ্যায়'। অর্থাৎ যা দেখতে পাচ্ছি না, তা নেই। তা হলে ঈশ্বরকেও তো দেখতে পাওয়া যায় না। তবুও কেন সকলে বিশ্বাস করে তিনি আছেন? সংস্কারের কারণে? করোনা নতুন, তাই দ্বিধাহীন অস্বীকার? মীনাক্ষীর বদলে এ বার নিজেই হতাশ হয়ে পড়ল তমাল। 'মর্নিং শোজ় দ্য ডে', কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়।

নিরঞ্জনী আখড়া। সুন্দর, ছিমছাম। যত্নের ছাপ সর্বত্র। জানা না থাকলে হোটেলও মনে হতে পারে। ভিতরের ফাঁকা জায়গায় সাধুরা আস্তানা গেড়েছে, রয়েছে প্রবচন শোনার মঞ্চও। তবে নামী সাধু, ভক্তরা যে অন্দরে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রয়েছে এসি প্যাভিলিয়ন। গরমে গুরুদের কষ্ট না ভক্তদের, বোঝা মুশকিল। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, জুনা আখড়ার তুলনায় গুরু-ভক্ত সংখ্যা কম হলেও, এই আখড়ার বেশির ভাগ সাধুই তুলনামূলক ভাবে অধিক শিক্ষিত। লাভ কিছু হল না। মহামণ্ডলেশ্বরের অনুমতি ছাড়া কারও কোনও মন্তব্য বা ইনফরমেশন দেওয়ার অনুমতি নেই। অগত্যা জুনা আখড়া।

জুনা আখড়া অনেকটাই বড়। আরও বড় হচ্ছে। চলছে কনস্ট্রাকশনের কাজ। পয়লা এপ্রিল অফিশিয়াল মেলার টার্গেট ধরেই এগোচ্ছে বোধহয়। নিরঞ্জনী আখড়া তুলনায় ছোট এবং লতাপাতায় মোড়া বলে এসি ঘরের সংখ্যা অতটা বোঝা যায় না। কিন্তু জুনা আখড়া খোলামেলা হওয়ায় চোখে পড়ে অগুনতি এসি ঘর। এসি সর্বত্যাগী সাধু না উচ্চবিত্ত ভক্তদের জন্য, বোধগম্য হল না। বোধগম্য হল না এখানকার ব্যবস্থাপনাও। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে দিশা মিলল না অনেক ঘুরেও। তার উপর আগামী কাল শিবরাত্রির প্রথম শাহী স্নান। সবাই ব্যস্ত প্রস্তুতিতে। হতাশ মনে বিশাল আখড়ায় ঘুরতে লাগল তমালরা। এখানেও ফাঁকা জায়গায় আস্তানা গেড়েছে অনেক সাধু। কাউকেই মনে ধরল না তমালের।

হরিদ্বারের বেশির ভাগ আশ্রমই গঙ্গার ধারে। রাস্তার নাম নিরঞ্জনী আখড়া রোড। দু'ধারে 'বিড়লা হাউস'এর মতো ঝুল-বারান্দাওয়ালা সার দেওয়া হাভেলির সঙ্গে আশ্রমও। যোগেশ্বর আশ্রম, চিন্তামণি আশ্রম, আনন্দ আখড়া, আরও কত। বিভিন্ন আখড়া, আশ্রম ঘুরেও সুরাহা কিছু হল না। মীনাক্ষী-অনুজকে নিয়ে তমাল এল হর কি পৌড়ির উল্টো দিকে। যদি নতুন কোনও সাধু আস্তানা গেড়ে থাকে?

থিকথিকে ভিড়, হাঁটাই দায়। মানুষজন ব্যস্ত হরেক কাপড়, খেলনা দিয়ে বাঁক সাজাতে। কারও মুখেই যে মাস্ক থাকবে না জানাই কথা। নতুন সাধু চোখে পড়লেও মনে ধরল না তমালের। সন্তর্পণে ভিড় এড়িয়ে পৌঁছল হর কি পৌড়িতে। বিষ্ণুঘাট, কুশাবর্তঘাট, রামঘাটে ঘুরল এলোমেলো। কিছু সাধুর দেখা মিললেও নজর কাড়তে পারল না কেউই। বিষ্ণুঘাটে 'দাদা-বৌদি'র বিখ্যাত হোটেল। আসল-নকল তুলনা করে আগেই বার করেছে তমাল। হতাশ, অবসন্ন মনে দুপুরের খাবার খেতে ঢুকল।

সকাল থেকে শেষ দুপুর, পুরোটাই ব্যর্থ। ব্লাইন্ড গেমে সহজ সার্থকতা আশা করেনি কেউই। শুধু আশা করেছিল সামান্য ভাগ্য সহায়তা। সেটুকুও মিলল না। তবুও পুরোপুরি দমে গেল না মীনাক্ষী। আগের দু'দিনের মতো আজও গঙ্গারতির পরে করবে ঘোষণা। খেলা তো এখন অদৃষ্টের হাতে। লাগলে তুক...

॥ ১৮ ॥

“বাবা, বীরভূম টিকরবেতা গ্রামের শ্রীযাদব কর্মকার, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? যদি পেয়ে থাকো, এক্ষুনি মেলা অফিসে এসো। অপরাধ আমরা করেছি। ক্ষমা চাইবার সুযোগটুকু অন্তত দাও। এসো বাবা। আমরা আজ তিন দিন অপেক্ষা করছি তোমার জন্য। এসো বাবা... শুনতে পাচ্ছ?”

শুনতে পেয়েছেন অবধেশ মহারাজ। আজ আর দোলাচল নেই। মন বেঁধে ফেলেছেন। তবে ছেলেমেয়েকে একবার যে দেখতে ইচ্ছে করছে না সে কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। বাস্তব প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেও স্মৃতির চলাচল যে অবাধ। গলা শুনে মেয়েকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন যাদব। বছর আঠাশ হবে বোধহয়। হয়তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মোলায়েম, আকুতিভরা কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে, ভাল মনের মানুষ হয়েছে মেয়েটা। আর ছেলে? ছেলের কথা মনে পড়তেই বেদনায় মন ভরে গেল যাদবের। কত যে মধুর স্মৃতি! নিয়তির ফেরে ত্যাগ করতে হল সব। উপায়ও ছিল না। শত্রু আঘাত করলে সহ্য হয়। কিন্তু বিশ্বস্ত জনের আঘাত যে বড়ই মর্মান্তিক। ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত করে দেয়। পৃথিবী হয়ে ওঠে বিষময়।

ট্রেনে উঠে পড়েন যাদব। কোথায় যাবেন জানেন না। শুধু জানেন, যেতে হবে নির্জন কোনও স্থানে যেখানে মৃত্যুর পরে খোঁজ পাবে না কেউ। ট্রেনে আলাপ হল এক দল তরুণের সঙ্গে। যাচ্ছে উত্তরকাশী, নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিংয়ে কোর্স করতে। আলাপ হলেও বলতে পারেন না সঙ্গে টিকিট নেই। বাড়ি থেকে একটা পয়সা নিয়েও বেরোননি। টিটি এলেও টিকিট চাইল না। তরুণ দলকে নিয়েই ব্যস্ত রইল। হয়তো ওদেরই এক জন ধরে নিল। খাবারও জুটল ওদের ভালবাসায়। যাদব বলে চলেছেন নানা কথা, ওরা গিলছে গোগ্রাসে। কথা শেষ হল না হরিদ্বার এসে গেল। এ বার বাস। তরুণদলই টিকিট কাটল। উত্তরকাশী সম্বন্ধে ধারণা না থাকলেও যাদব শুধু এইটুকু বুঝতে পারেন, পাহাড়ি এলাকায় নির্জনতার অভাব হবে না। হইহই করতে-করতে চলল উত্তরকাশী। মৃত্যু যেন বেদনার না হয়।

গন্তব্যে পৌঁছে বিদায় নিল তরুণদল। এলোমেলো ঘুরতে লাগলেন যাদব। বাস নামিয়েছে বাজার এলাকায়। নির্জনতার জন্য হয় এগোতে নয় পিছোতে হয়। কুলকুল করে বয়ে চলেছে গঙ্গা, গায়ে লাগছে শীতল বাতাস, মনের আনন্দে এগোতে থাকেন যাদব। বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ল। গঙ্গা পারাপারের জন্য রোপওয়ে বা ঝুলা। যাত্রী নিয়ে করছে এ পার-ও পার। উদ্দেশ্য স্থির করে ফেলে যাদব। চার দিক খোলা ঝুলা থেকে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দেবেন। এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কী-ই বা হতে পারে। নজরে পড়লেও মানুষের সাধ্য নেই বাঁচানোর। মুহূর্তে স্রোতের টানে ভেসে যাবেন বহু দূর। নজর করে দেখেন ঝুলায় চড়ার জন্য কোনও পয়সা লাগে না। অসুবিধে একটাই, ঝুলায় চার জনের বসবার ব্যবস্থা। তবে সব সময় যে চার জন হচ্ছে এমন নয়। এক জন হলেও পার করিয়ে দিচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন যাদব।

সুযোগ এল একসময়। চড়ে বসেন ঝুলায়। ঝুলা চলতে শুরু করতেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন যাদব। মাঝামাঝি পৌঁছলেই ঝাঁপ দেবেন। শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে, হাত-পা প্রায় অসাড়, বুকের ভিতরে হৃদ্‌যন্ত্র যেন পিংপং বল। তবুও জোর করে ধরে রাখেন মনোবল। মনকে বোঝান আর একটু, একটু বাদেই অপার শান্তি। কিন্তু প্রায় মাঝামাঝি গিয়ে থেমে গেল ঝুলা। চলতে লাগল পিছনপানে। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! বেশ কিছু ক্ষণ ধরে দেখছেন ঝুলা লোক নিয়ে করছে এ পার-ও পার। তা হলে কি যান্ত্রিক গোলযোগ? এখনই হতে হল? ভাবতে-ভাবতে এ পারে পৌঁছে যান যাদব। ইশারায় নেমে যেতে বলে চালক। হতবাক যাদব নেমে যান। তার পরেই জটা-জূটধারী এক সন্ন্যাসীর মুখোমুখি। যাদবের কপালে অনামিকা ছোঁয়ান সন্ন্যাসী। পৃথিবী যেন দুলে উঠল, চলে যান অদ্ভুত ঘোরে, বিস্মৃত হলেন উদ্দেশ্য।

কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রম পেরিয়ে ঝুলার দিকে গিয়েছিলেন যাদব। চেহারা, প্রশান্ত অভিব্যক্তি, ধীর লয়ে পথচলা আকৃষ্ট করেছিল মহারাজকে। দেখতে দেখতেই সজাগ হয়েছিল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। নিঃশব্দে পিছু নিয়েছিলেন। ঝুলার জন্য যাদবকে অপেক্ষা করতে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া। তবুও উঠতে দেন ঝুলায়। পাওয়াতে চাওয়া মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসার অনুভূতি। বোঝাতে চাওয়া, যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। তাই ঝুলা প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছতেই চালককে ইশারা করা ফিরিয়ে আনার।

দিনতিনেক ঘোরের মধ্যে ছিলেন যাদব। তার পর কখন যেন মিশে যান অন্য আশ্রমিকদের সঙ্গে। ধ্যান, জপ, পূজার্চনায় কাটতে লাগল দিন। আশ্রমিকরা সকলেই হিন্দিভাষী এবং বেশির ভাগই স্থানীয়। মহারাজও গাড়োয়ালের মানুষ। সর্বক্ষণ হিন্দি শুনতে-শুনতে এক সময় নিজেও সড়গড় হয়ে যান। আশ্রমিকরা সকলেই অল্পশিক্ষিত। যাদব নিজগুণে হয়ে ওঠেন মহারাজের প্রিয়পাত্র। মহারাজের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মেলা-মহোৎসবে। পরিচিত হতে থাকেন বিভিন্ন সাধু-সন্তদের সঙ্গে। তবুও দীক্ষা নেননি। বুঝেছিলেন সমাজের বাইরে বেরোলেও, সাধুদেরও আছে নিজস্ব সমাজ বা পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধানের বদলে ‘মহামণ্ডলেশ্বর’ বা ‘পীঠাধীশ্বর’, ট্রেজ়ারারের বদলে ‘কারোবারি’, সিকিওরিটির বদলে ‘কোতোয়াল’। এ ছাড়াও পুজোর জন্য পূজারি, রান্নার জন্য পাচক। ভরা সংসার যেন।

বাঁধা পড়তে মন চায়নি। মহারাজও জোর করেননি। যদিও আশ্রমে তত দিনে যাদবের স্থান হয়ে গিয়েছিল মহারাজের পরেই। এক সময় দীক্ষা নিতে আদেশ করেন মহারাজ। শরীর ভেঙে পড়ছে। আশ্রমের দায়িত্ব যে যাদবকেই নিতে হবে। আদেশ অমান্য করার শক্তি, যুক্তি কোনওটাই ছিল না যাদবের। এই জীবন তো মহারাজেরই দান। আর নতুন জীবন যে শিখিয়েছে বেঁচে থাকার আনন্দ। শুধুমাত্র আয়ুক্ষয়ের জন্য বেঁচে থাকা নয়, প্রকৃতির একজন হয়ে বেঁচে থাকা। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে দীক্ষা নেন। হলেন অবধেশ গিরি মহারাজ।

কিছু দিন পরেই দেহত্যাগ করেন কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজ। আশ্রমকে নিজের মতো করে সাজাতে থাকেন যাদব। শুধু ধ্যান, জপ, পূজার্চনা নয়, করতে হবে মানবসেবাও। সাধুর চেয়ে নিজেকে মাস্টারমশাই হিসেবে দেখতেই পছন্দ করেন। বিভিন্ন মানুষের অনুদানে গড়ে তোলেন অবৈতনিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অধিকার যে সর্বাগ্রে। যাদবের এই প্রচেষ্টা অনুপ্রাণিত করে আরও আশ্রমকে। বাড়ল পরিচিতি। অনেক আশ্রম থেকেই আশ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ডাক পড়তে লাগল। নিরুপায় না হলে যাদব কাউকেই নিরাশ করেন না। ধীরে-ধীরে সাধুমহলে বাড়ল গুরুত্ব, গ্রহণযোগ্যতা। আজ তাই সব আখড়া, আশ্রমে অবধেশ মহারাজের অবারিত দ্বার। সকলেই ধন্য হতে চায় মহারাজের আতিথ্য গ্রহণে। মহামণ্ডলেশ্বর থেকে পীঠাধীশ্বর, কেউই উপেক্ষা করতে পারেন না। তবে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বছরে একটা সময় কোনও তীর্থস্থানে একাকী কাটান অবধেশ মহারাজ। নিজের সঙ্গে চলে আলাপন।

কখন যেন থেমে গিয়েছে মাইকের ঘোষণা। তবুও কানে বাজছে মেয়ের আকুতিভরা কণ্ঠস্বর। সাড়া দেওয়ার উপায় আর নেই। ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন আশ্রম, সাধুসমাজের সঙ্গে। ইচ্ছে থাকলেও বেরিয়ে আসা অসম্ভব। আর বেরোবেনই বা কেন? কিসের টানে ফিরবেন বিষময় সমাজে? সমাজ তো শুধু পরিবার নিয়ে গঠিত নয়, ঘুরছে অজস্র হিংস্র জন্তু-সরীসৃপ। লড়াই করার মানসিকতা আগেও ছিল না, এখন তো নেই-ই।

তবুও হর কি পৌড়ির উল্টোপাড়ে বসে গঙ্গার ছলাৎছল শুনতে-শুনতে কানে ভেসে এল স্কুলের ছেলেদের কলতান। কী সুন্দরই না ছিল সেই জীবন। মানুষ গড়ার আনন্দই যে আলাদা। তবুও কিছু মানুষের জন্যই দীর্ঘস্থায়ী হল না সেই আনন্দ। দিতে হল অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার খেসারত। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেই গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে গেল নিজের বিশ্বস্তজনও। লড়াই করা যায়?

অতীত ঝেড়ে বর্তমানে ফেরেন অবধেশ মহারাজ। যেতে হবে কিন্নর আখড়ায়। আগের দুটো কুম্ভে গেলেও হরিদ্বার পূর্ণ কুম্ভে আখড়া করতে পেরেছেন এই প্রথম। সহায়তা করেছে জুনা আখড়া। বৃহন্নলাদের মানুষ ঘৃণা, কৌতুক, অশ্রদ্ধাই করে থাকে। তালি বাজিয়ে বাচ্চা নাচানো বা ভিক্ষার বাইরে ভাবতেই পারে না। আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ সাংঘাতিক অপরাধ যেন। বিস্মৃত হয়, সকলেই মানুষ, সকলেরই অধিকার আধ্যাত্মিকতায়। মজার বিষয়, যে সমাজ ওদের অচ্ছুত ভাবে, সেই সমাজই ওদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। লাইন পড়ে করুণা ভিক্ষার। অথচ মানুষ যদি ওদের স্বাভাবিক মানুষের মর্যাদা দিত, তা হলে বৃহন্নলাদের আলাদা সমাজ গঠনের প্রয়োজনই পড়ত না। কিন্তু গর্বিত মানুষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে আবার ঘৃণা, কৌতুক, অশ্রদ্ধা করতেও ছাড়বে না। কিছুতেই বুঝবে না, কাউকে না-মানুষ আখ্যা দিতে গিয়ে নিজেরাও হয়ে উঠছে অমানুষ।

দূর থেকে কিন্নর আখড়ার সামনে ভিড় দেখে মানুষের মানসিকতা বুঝতে অসুবিধে হল না অবধেশ মহারাজের। নারী অথচ পুরুষ অথবা পুরুষ হয়েও নারী, ভারী মজার যেন। যেন গ্রহান্তরের জীব। অথবা সাকার্সের আজব প্রাণী। নিজের পরিবারেও কেউ যে এমন জন্মাতে পারে বেখেয়াল। জন্মালে ভাবা যাবে প্রতিপালন অথবা ত্যাগ। জন্মাবে না ধরেই নেয় মানুষ। তাই যত ক্ষণ পারো লোটো মজা। মেলায় প্রায়ই কানে এসেছে কমবয়সি স্থানীয় ছেলেদের রসিকতা, 'লছমি আয়ি হ্যায়...'

আশ্রম প্রধান লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিপাঠীজি বিশেষ অনুরোধ এখানে আসার জন্য। অনুরোধ রয়েছে ভবানীনাথ বাল্মীকিজিরও। অবধেশ মহারাজ এসে যেন আখড়ার সকলকেই জ্ঞান বিতরণ করেন। দ্বিধা করেননি অবধেশ মহারাজ। আজ তাই সময় করে এসেছেন। মানবধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

॥ ১৯ ॥

খেলার শেষ পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এক গোলে পিছিয়ে থেকে জেতা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। মাথা ঠান্ডা রেখে, আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে, স্নায়ুচাপ উপেক্ষা করতে পারলেই হতে পারে সিদ্ধিলাভ। বলা যতটা সহজ, কাজ ততটাই কঠিন। হারের হাতছানিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তবে একটা গোল শোধ করতে পারলেই ঘুরে যায় মোড়। তখন আর হারের হাতছানি নেই। মিলবে এক্সট্রা টাইম, হয়তো টাইব্রেকারের সুযোগ। ওই বাড়তি সময়টুকুর আশাই ফিরিয়ে দেয় হারানো মনোবল। নিশ্চয়ই কিছু একটা করে ফেলা যাবে। নতুন উদ্যমে কখনও হয়েও যায় আরও একটা গোল।

হারের মুখে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী। একমাত্র ভরসা দাদা। আজ শিবরাত্রির স্নানযাত্রায় সাধুদের শোভাযাত্রায় যদি বাবাকে চিনতে পারে, তা হলে কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। ফেরার টিকিট দু'দিন পরে। সফল হোক বা বিফল, এই দু'দিনে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা অন্তত করা যাবে। যদি ফেরাতে নাও পারে, তা হলেও তো মিলবে দেখা। সেও কম কিছু নয়। এত দিন যাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হল, তাকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়াও যে বড় প্রাপ্তি। কিন্তু সেই পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে আজ সফলতা একান্ত কাম্য। প্রয়োজন ভাগ্যের সহায়তাও।

তমাল বুঝতে পারছে নিজের ভূমিকা। সেই মতো ভোরেই বেরিয়ে পড়েছে পরিস্থিতি বুঝতে। বড় রাস্তায় পৌঁছেই বুঝতে পারল পরিস্থিতি অনুকূলে নয়। ভেবেছিল হর কি পৌড়ির এমন জায়গায় দাঁড়াবে যেখান থেকে সাধুদের স্পষ্ট দেখা যাবে। কিন্তু হর কি পৌড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোর কোনও উপায়ই নেই। জায়গায়-জায়গায় ব্যারিকেড। নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক। তাদের কাছেই জানা গেল, আজ হর কি পৌড়ি শুধুই সাধুদের জন্য। সাধারণ মানুষ যেতে পারবে বিকেল পাঁচটার পরে। হতাশ তমাল বুঝতে পারল না কী করণীয়। বুঝতে পারল না হোটেলে ফিরে মীনাক্ষীকে কী বলবে? মেয়েটা যে বড় আশা করে আছে। নিরুপায় তমাল মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোনও উপায় যদি মেলে।

হরিদ্বার কুম্ভে এইবার আখড়ার সংখ্যা তেরো। নিরঞ্জনী আখড়া, জুনা আখড়া, মহানির্বাণী আখড়া, আনন্দ আখড়া, আবাহন আখড়া, অগ্নি আখড়া, অটল আখড়া, পরি আখড়া, কিন্নর আখড়া, নির্মোহী আখড়া, দিগম্বর আখড়া, খালসা আখড়া, নির্মল আখড়া। শিবরাত্রির প্রথম শাহী স্নান করবে জুনা আখড়া। সঙ্গে থাকবে আবাহন আখড়া, অগ্নি আখড়া, কিন্নর আখড়া। তার পর নিরঞ্জনী আখড়া। সঙ্গে থাকবে আনন্দ আখড়া। শেষ স্নান করবে মহানির্বাণী আখড়া। সঙ্গে থাকবে অটল আখড়া। একমাত্র বৈশাখী পূর্ণিমার তৃতীয় শাহী স্নান তেরোটি আখড়াই করে একসঙ্গে।

জুনা, নিরঞ্জনী আর মহানির্বাণী আখড়া সহযোগীদের নিয়ে স্নান করতে যাবে আলাদা পথে। এক পথ থেকে অন্য পথে যাওয়ার উপায় নেই। থাকলেও এক জনের পক্ষে তিন জায়গায় প্রথম থেকে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব। হোটেলে ফিরে মীনাক্ষী-অনুজকে সব জানাল তমাল। থমকে গেলেও দমে গেল না মীনাক্ষী। হতাশ তমালকে দিল দিকনির্দেশ। যেহেতু নিরঞ্জনী আখড়ায় শিক্ষিত সাধুর সংখ্যা বেশি, তাই সেখানে বাবার থাকবার সম্ভাবনাও বেশি। তা ছাড়া শোভাযাত্রাটা যাবে হোটেলের ঠিক পিছনের রাস্তা দিয়ে। তমালের কোনও অসুবিধেই হবে না। আর দুটো শোভাযাত্রায় যে ভাবেই হোক নিজে এবং অনুজ পৌঁছবার চেষ্টা করবে। মোবাইলে তুলে আনবে প্রচুর ছবি। যদি চিনতে পারে তমাল।

নার্ভাস লাগছে তমালের। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে নিরঞ্জনী আখড়ার পতাকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে শোভাযাত্রা। রাস্তা পুলিশে ছয়লাপ। দড়ি দিয়ে করেছে ব্যারিকেড। কোনও ভাবেই যেন বিঘ্ন না ঘটে। দড়ির বাইরেও মানুষের চলাফেরার উপায় নেই। যে যেখানে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সেখানেই। যেন শোভাযাত্রা নয়, আসছে শত্রুপক্ষ। জনতা সাবধান!

নার্ভাসনেসের মধ্যে ভরসা এইটুকুই, বাবা যদি বলে থাকে শিবরাত্রির স্নানে আসবে তা হলে আসবেই। অসুস্থতা বা আচমকা অসুবিধে হলে অন্য কথা। কিন্তু এলেও চিনতে পারবে কি? খুঁজে পাবে ভিড়ের মাঝে? জটা-দাড়ির যে কল্পিত ছবি এঁকেছে তেমনটা তো নাও হতে পারে? বাবার যা চরিত্র, এমনটা ভাবাই যায়। অজান্তেই প্রার্থনা জানিয়ে ফেলল তমাল, এমনটাই যেন হয় মহাদেব।

'হর হর মহাদেব' ধ্বনিত হল দূরে। তমাল বুঝল শুরু হয়েছে শোভাযাত্রা। ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে আসছে কোলাহল। মানুষের মধ্যেও বাড়ছে চাঞ্চল্য। দু'ধারের বাড়ির ছাদ, বারান্দায় গিজগিজে ভিড়। রাস্তার দু'ধারেও ঠাসা মানুষ। তমাল দাঁড়িয়ে একটু উঁচুতে। একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়ির শেষ ধাপে। পরিষ্কার দেখা যাবে এখান থেকে। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষায় তমাল। এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা।

প্রথমেই ছ'টা ঘোড়ায় ছ'জন নাগা সন্ন্যাসী। পিছনে হাজারখানেক নাগা সন্ন্যাসী পায়ে হেঁটে। গায়ে ভস্ম, গলায় মালা, আত্মভোলা ভাব। রোজ-রোজ তো আসে না এমন দিন। কিছু নাগা সন্ন্যাসী উত্তেজিত হয়ে হর হর মহাদেব ধ্বনিতে উদ্বেল করছে বাতাস। অনেকের হাতেই বল্লম, ত্রিশূল, কুঠার, তরোয়াল। এক বৃদ্ধ বামন নাগা সন্ন্যাসী হেঁটে চলেছে কাঁধে বিশাল গদা নিয়ে। দৃপ্ত পদক্ষেপে নেই কষ্ট, ক্লান্তির ছাপ। একদল নাগা সন্ন্যাসীর কাঁধে পালকি, পালকিতে ইষ্টদেব। হঠাৎই থেমে গেল শোভাযাত্রা। এক বয়স্ক নাগা সন্ন্যাসী শুরু করেছে লাঠিখালা। তাকে ঘিরে লাফিয়ে-লাফিয়ে ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে অন্যদের উচ্ছ্বাস, মহাদেব মহাদেব মহাদেব...

ভিড়ের মধ্যেও তমাল সজাগ। যদিও নাগা সন্ন্যাসী হিসেবে কল্পনা করতে পারে না বাবাকে, তবুও চোখ সরায়নি এক মুহূর্ত। জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষের উৎসাহ দেখে তমাল বুঝতে পারল কুম্ভ মাহাত্ম্য। স্নানের পুণ্যার্জন আর সাধু দর্শন। এখানেই
অন্য মেলার সঙ্গে বড় ফারাক। দেশের তাবড় সন্ন্যাসীদের এক সঙ্গে দেখা মেলে কুম্ভেই। চাইলে পাওয়া যায় ছোঁয়া, আশীর্বাদ। দেখতে-দেখতে মনে পড়ল মীনাক্ষী-অনুজের কথাও। কে জানে কতটা কী

করতে পারল?

এক সময় শেষ হল নাগা সন্ন্যাসীদের মিছিল। আসতে লাগলেন সুসজ্জিত ট্রাক্টর-চালিত ভ্যানে পীঠাধীশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর, মহারাজরা। সিংহাসনে বসে প্রশান্ত মুখে হাত নাড়ছেন। ঘনিষ্ঠ বা গুরুত্বপূর্ণ ভক্তরাই ঠাঁই পেয়েছে পায়ের নীচে। বাকিরা পায়ে হেঁটে। সকলেই গেরুয়াধারী। গাড়ি থেকে দেওয়া হচ্ছে প্রসাদ, পুজোর ফুল, এমনকি চকলেটও। ভক্তিভরে নিচ্ছে মানুষ। এক একটা গাড়ির পিছনে কয়েকশো গেরুয়াধারী। কারও হাতে গুরুর ছবি, কারও মুখে হর হর মহাদেব।

আচমকাই হেলিকপ্টার গর্জন। শুরু হল পুষ্পবৃষ্টি। উপরে তাকিয়ে তমাল দেখল তিনটে হেলিকপ্টার সমানে পুষ্পবৃষ্টি করে চলেছে সাধুদের উপর। শোভাযাত্রার এ মাথা থেকে ও মাথা।
কোনও অংশ যেন বাদ না যায়। খানিক বাদেই পিচের রাস্তা হয়ে উঠল ফুল গালিচা।

এ বার মন সংযোগে ব্যাঘাত ঘটল তমালের। মহারাজদের গাড়ির পিছনে ভক্তদলের সঙ্গে জুড়েছে ডিজে-গাড়িও। তারস্বরে বাজছে ভক্তিগীতি। গানের তালে নেচেও উঠছে কিছু গেরুয়াধারীর দল। মাঝেমাঝে অসাবধানবশত চটুল গানও বাজিয়ে ফেলছে ডিজে'রা। তাতেও নাচ। হঠাৎ করেই ঐতিহ্য, মাহাত্ম্য, গাম্ভীর্য ভুলে শোভাযাত্রা যেন হয়ে উঠল দুর্গা বা কালীপুজোর ভাসান। ডিজে কালচার ইদানীং কলকাতাতেও আমদানি হয়েছে। ডিজের চেয়ে যদি দু'পাশে হাজার দু'য়েক ঢাকি সার দিয়ে চলত তা হলে শোভাযাত্রা নিশ্চিত অন্য মাত্রা পেত। আরও একটা বিষয় দৃষ্টিকটু লাগল তমালের। কেউ সাড়া দিক না দিক, মহারাজরা হাত নেড়েই চলেছেন। যেন ভোটপ্রার্থী। কয়েকশো মহারাজের মধ্যে জনাতিনেকই স্থির বসে। বাহ্যিক কোলাহল যেন স্পর্শ করছে না। তাদের খুঁটিয়ে লক্ষ করল তমাল। নাহ, বাবা বলে তো মনে হচ্ছে না।

তমালকে হতাশ করে ঘণ্টাদুয়েকের শোভাযাত্রা শেষ হল। এ বার? মীনাক্ষীকে ফোন করল তমাল। অনেক বাধা পেরিয়ে মীনাক্ষী পৌঁছতে পেরেছে জুনা আখড়ার শোভাযাত্রার রাস্তায়। তবে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। তবুও ছবি তুলছে সাধ্যমতো। অনুজকে ফোন করল তমাল। অনুজ মহানির্বাণী আখড়ার শোভাযাত্রা খুঁজেই পায়নি। তবে অন্য একটা উপায় বার করেছে। নামী-অনামী বিভিন্ন চ্যানেল লাইভ টেলিকাস্ট করছে। মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে সাধুদের ইন্টারভিউও। নিজে দেখবার সঙ্গে চ্যানেলের লিঙ্ক সেভ করে রাখছে। যদি তমাল কিছু উদ্ধার করতে পারে।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। হর কি পৌড়ির দিকে গিয়ে লাভ নেই বুঝে তমাল নিরঞ্জনী আখড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল। নিরঞ্জনী আখড়ার সামনের পুল পেরিয়ে গঙ্গার উল্টো পারে যাবে। সেখান থেকে হর কি পৌড়িতে পৌঁছনোর শেষ চেষ্টা করবে।

ঘাটে-ঘাটে আজ শুধুই নানা রাজ্যের মানুষের স্নানের ভিড়। বাঁকে জল নিয়ে বিদায় নিয়েছে পুণ্যার্থীর দল। অনেকেই হয়তো পৌঁছে গিয়েছে পছন্দের শিবমন্দিরে। ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল তমাল। পৌঁছেও গেল হর কি পৌড়ির ঠিক উল্টো পারে। কিন্তু প্রত্যেকটা ব্রিজই ব্যারিকেড করা। সামনে কড়া পাহারা। কারও সাধ্য নেই ও পারে যাওয়ার। তবুও পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ জানাল তমাল। জানাল উদ্দেশ্যও। কেউ-কেউ সহানুভূতি দেখালেও ও পারে যেতে দিতে অপারগ। চারদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো। ধরা পড়লে দিতে হবে কৈফিয়ত, চাকরিও সঙ্কটে পড়তে পারে।

হতাশ তমাল বসে পড়ল গাছতলায়। অলস দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মানুষের পুণ্যার্জন। সকলেরই প্রাপ্তি হচ্ছে শুধু নিজেরাই পেল না কিছু। বাবাকে খুঁজে পাওয়ার আশা যে আর নেই সে কথা হয়তো বলেই দেওয়া যায়। মা খুশি হবে। শুধু বোনটাই করবে মনখারাপ। বহমান গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তমাল, বোনের ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থ এক অসহায় দাদা।

॥ ২০ ॥

বড়ই মজার খেলা লুকোচুরি। যে খুঁজছে, খুঁজে পাওয়াতেই সাফল্য। যে লুকিয়ে আছে, সাফল্য লুকোনোয়। কিন্তু মানসিকতা যদি হয়, লুকিয়ে আছি অথচ ধরা পড়ার ইচ্ছে প্রবল, তখন? নিদারুণ যন্ত্রণা, অব্যক্ত হাহাকার। একই সঙ্গে ধরা পড়া এবং এড়ানোর দ্বন্দ্বে মন যেন উথালপাথাল।

আনমনে বসে অবধেশ মহারাজ। সন্ধ্যা নেমেছে। কুলকুল করে বয়ে চলেছে পুণ্যতোয়া গঙ্গা। আজ কোথাও যেতে ইচ্ছে করেনি। কারও সঙ্গে কথা বলতেও নয়। একাকী বসেছেন হর কি পৌড়ির পাশে এক আশ্রমের নিজস্ব ঘাটে। কেউ বিরক্ত করবে না এখানে।

সমুদ্র মন্থন, অমৃতবিন্দু পৌরাণিক আখ্যান। সত্যি-মিথ্যে যাচাই অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব সত্য, কুম্ভস্নানে লাভ হয় অপরিমেয় তৃপ্তি। আজও যখন ব্রহ্মকুণ্ডে নামলেন, খুলে ফেললেন জটা, দিলেন একাধিক ডুব, মন হয়ে উঠল প্রফুল্ল। ছোটবেলায় যে প্রফুল্লতা আসে মা-বাবাকে দেখে। শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেন মাতৃক্রোড়ে করছেন খেলা।

নিরঞ্জনী আখড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ভোরেই। মহামণ্ডলেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে, শোভাযাত্রার প্রস্তুতি দেখে ফিরে এসেছিলেন জুনা আখড়ায়। ফিরতেই হত। গুরুর হাত ধরে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত জুনা আখড়ার সঙ্গেই স্নান করছেন। সকলেই চায় অন্তত একবার অবধেশ মহারাজ স্নান করুন তাদের সঙ্গে। প্রথা ভাঙতে নারাজ মহারাজ।

ভাবতে অবাক লাগে, কত শত মহাপুরুষ এসেছেন কুম্ভমেলায়। হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক, সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তাঁদের চরণরেণু। তাঁদের চলার পথের শরিক ভেবেও ধন্য মনে হয়। ধন্য মনে হয় জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের কথা ভেবেও। আখড়ার সূত্রপাত তো তাঁরই হাত ধরে। গর্বিত মনে হয় হিউ এন সাঙ, মার্ক টোয়েন-ও অভিভূত হয়েছিলেন কুম্ভমেলায়, যা আজ পৃথিবীর বৃহত্তম মেলা।

খারাপ লাগাও আছে। সাধনভজন একান্তই নিজস্ব বিষয়। করতে হয় গুপ্ত ভাবে। সেই সাধনভজন আজ অনেকটাই উন্মুক্ত। হয় মিডিয়ার কাছে নয়তো রাজনীতির কাছে। অনেক সাধুর কাছেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে মোবাইল-বাইক-গাড়ি-ল্যাপটপ, টিভি ইন্টারভিউ। যুগ-যুগ ধরে সাধুরা, বিশেষ করে নাগা সম্প্রদায়,
দেশকে দিয়ে এসেছে নিরাপত্তা। সন্ন্যাসীদের সৈনিক হিসেবেও বিবেচিত তারা। ব্রিটিশ আমলে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেনি। আজ তারা অনেকেই যেন চলে গিয়েছে রাষ্ট্রের অধীনে। জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে সহায়তা করছে নেতাদের। কষ্ট হলেও মেনে নিয়েছেন অবধেশ মহারাজ। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে তো আসেননি। সম্ভবও নয়। তাই নিজের আশ্রমকে অটুট রেখে মানব সেবাতেই নিয়োজিত। রাজনীতি প্রবেশ করতে দেননি অন্দরে।
আজ পর্যন্ত দেননি কোনও ইন্টারভিউও।

কখন যে গঙ্গারতি শেষ হয়ে গিয়েছে টেরও পাননি। আরতিধ্বনি যেন মিশে যায় জলের শব্দে। টের পেলেন কর্কশ ঘোষণায়। কেউ হারিয়েছে মা, কেউ বাবা, কেউ আত্মজ, কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ মঙ্গলসূত্র অথবা মূল্যবান বস্তু। অবধেশ মহারাজ অপেক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ঘোষণার... "বাবা, বীরভূম টিকরবেতা গ্রামের শ্রীযাদব কর্মকার... তুমি কি এসেছ? নাকি চলে গিয়েছ? নাকি আসোনি? আমরা যে অনেক আশা নিয়ে এসেছি বাবা। যদি শুনতে পাও
সাড়া দাও। কথা দিচ্ছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব না। শুধু দেখব এক বার..."

উল্টো পারে ভীমগোড়া ব্যারেজ। মূল গঙ্গাকে বাঁধ দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়েছে হর কি পৌড়িতে। কিন্তু অবধেশ মহারাজ ভেবে পেলেন না, চোখে যে প্লাবন এসেছে তাকে বাঁধবেন কোন বাঁধে? মেয়ের আকুতি আজ আরও বেশি। যেন কান্না। হয়তো হতাশা,

ঐকান্তিক চাওয়া থেকেই চোখ ভিজেছে জলে। অবধেশ মহারাজের মনে হল, আর এক বার যেন করছেন কুম্ভস্নান। চোখের জলে।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আনমনেই অবধেশ মহারাজ ফিরে যান টিকরবেতায়। বর্ষাকালে অজয়ের জলেও থাকত এমনই স্রোত। মকর সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে বসত জয়দেব মেলা। হরিদ্বার কুম্ভ মেলাও অন্য বার শুরু হয় মকরস্নানে। দুটো মেলাই বহমান ভক্তি, স্নান, পুণ্যার্জনের ভিত্তিতে। জয়দেব বাউলদের মেলা বলেই বিখ্যাত। কুম্ভ মূলত শিব, বিষ্ণু ভক্তদের। বৈরাগী, বৈষ্ণব, শিখরাও আছে। জয়দেবে যেমন কীর্তন হয়, কুম্ভেও হয় ভজন-কীর্তন। সাধু-সন্তদের প্রবচন কুম্ভে থাকলেও জয়দেবে নেই। জয়দেবের সাধু উপস্থিতিও কুম্ভের তুলনায় নগণ্য। জয়দেব মানেই বাউল আর বাউলগান।

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' কত দিন পরে মনে পড়ল! নিজেও গাইতেন এক সময়ে লালনের এই গান। পছন্দও করতেন বাউল-ফকির তত্ত্ব। মানুষ-মাঝে ঈশ্বর খোঁজ আকৃষ্ট করত। শুধু বিশ্বাস করতেন না পরম আত্মায় বিলীন হতে দেহই একমাত্র পথ। অন্যতম হলেও একমাত্র নয় কখনওই। বিস্তর বিতর্ক হত, উঠে আসত নানা যুক্তি মতবাদ। বিরক্তি, রাগ নয় বরং উপভোগ করত বিতর্ক-বিবাদ। গান, তর্কে বেশ কাটত সময়।

সময় বড় নিষ্ঠুর। মিলন যেমন ঘটায়, বিচ্ছেদেও দ্বিধা করে না। কারণ অবশ্যই আছে, অকারণে ঘোরে না মহাকালের চাকা। তা হলেও প্রশ্ন জাগে, এক জন সাংসারিক মানুষ, এক জন মাস্টারমশাই যে ব্যস্ত ছিল মানুষ গড়ার কাজে, তাকে কী এমন প্রয়োজন পড়ল প্রকৃতির যে ঘরছাড়া করল? থেমে যেত মহাকালের চাকা?

মন্দ তো ছিল না জীবন। অভাব, মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ কিছুই তো ছিল না। পেয়েছিলেন পছন্দমাফিক পেশাও। ক'জন পান? সেই সঙ্গে ছিল আশা। ছেলেকে নিয়ে আশা। নিজে পরিবারের প্রথম উচ্চশিক্ষিত। ছেলের মেধা, অজানাকে জানার কৌতূহল দেখিয়েছিল এক নতুন স্বপ্ন। উন্নততর মানুষ গড়ার স্বপ্ন। আচমকাই এল প্রকৃতিডাক। রসিকতার 'প্রকৃতির ডাক' যেন নির্মম কষাঘাত।

লাভ কী হল? প্রকৃতির লাভ বুঝতে না পারলেও বুঝতে পেরেছেন নিজের লাভ। আচমকাই উন্নততর জীবনলাভ। কিন্তু এই লাভ তো নিজে চাননি, দিতে চেয়েছিলেন পরবর্তী প্রজন্মকে। এক সময় বুঝতে পারেন প্রকৃতির কাছে নাম, সম্পর্কের কোনও মূল্য নেই। সে 'যাদব'ও চেনে না, 'তমাল'ও চেনে না। শুধু বোঝেন কাকে বেশি প্রয়োজন। কয়েদিদের পরিচয় যেমন নামে নয় নম্বরে, তেমনই প্রকৃতির কাছেও হয়তো প্রত্যেকের আছে নির্দিষ্ট নম্বর।

ক্ষতিও কি কিছু হয়েছে? এত দিন বাদে টাকা খরচ করে যারা হরিদ্বারে এসে নিজের বাবাকে খুঁজে বার করতে চায়, তাদের সচ্ছল বলেই ধরে নিতে হয়। শিক্ষিতও। উচ্চারণ, উদ্যম সেই কথাই বলে। নিজে উপস্থিত থাকলে যে জীবন গড়ে দিতে পারতেন, তারা নিজ সিদ্ধান্তে হয়তো গড়ে নিয়েছে সেই উন্নতর জীবনই।

অতীত মনে পড়লেই ব্যথাতুর হয়ে ওঠে অবধেশ মহারাজ। যে অতীত হতে পারত স্বাভাবিক সুন্দর, সেই অতীতই হয়ে উঠল বিষময়। উগরে না দিয়ে বা ভুলে না গিয়ে উপায় নেই। থেমে যাবে পথচলা। থামিয়ে দিতেই তো চেয়েছিলেন। নিয়তি চেনাল নতুন পথ। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যেন অনুভব করা গেল পরমপিতার উপস্থিতি। এমনিতে নজর করে না কিন্তু বেখেয়াল নয়। যেমনটা বেশিরভাগ পিতা হয়ে থাকে। তবে চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা থাকলে বোধহয় মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা উত্তরণ তরান্বিত করে। যেমন অনেকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে বলেন, নবজীবন পেলাম। চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা থাকলে সেই মানুষটার মনে হবে, প্রকৃতির প্রতি কর্তব্য এখনও শেষ হয়নি।

ব্যথাতুর মনে উঠে পড়েন অবধেশ মহারাজ। তবে জানেন, আগামী কাল আবার আসতে হবে। দিনচারেক আর আছে। রোজই আসতে হবে। মনে পড়ল চণ্ডীদাস, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নয়। 'মানুষ' আর আত্মজ'র সূক্ষ্ম ফারাক যে এই জীবনে ঘোচানো যাবে না বুঝে গিয়েছেন।

॥ ২১ ॥

হঠাৎই যেন খেলা ভেঙে বিদায় নিয়েছে মনুষ্যকুল। বিষণ্ণ পৃথিবী একলা বসে। পাহাড়, নদী, গাছগাছালি, পশু-পাখি সবই আছে। আকাশ রঙিন, বাতাসও ছন্দোময়। নিয়মমাফিক সূর্যের আসা-যাওয়া, চাঁদের সঙ্গে মেঘের লুকোচুরি খেলা। শুধু অখণ্ড নীরবতা পৃথিবীর, আকুল অপেক্ষা মানুষের।

সন্ধ্যার হর কি পৌড়ির উল্টো দিকে এসে মনখারাপ হয়ে গেল তমালের। এ যেন বিসর্জনের দিন। এই ক'দিন যে ঘাটগুলো মানুষের কলতানে গমগম করত, আজ একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম। উদাস দৃষ্টিতে বসে আছে আরতির প্রদীপ বিক্রি করা মেয়েটি, খদ্দেরের অপেক্ষায় ক্লান্ত ছেলেটি প্লাস্টিক জারের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুরছে কুকুর, ভবঘুরের দল। দু'দলেরই উদ্দেশ্য এক, খাবার সংগ্রহ। ধুনি জ্বালিয়েছে কিছু আখড়াহীন সাধু। কিছু বসে অন্ধকারে। মাঝেমধ্যে গেঁজেলদের আনাগোনা, সামান্য রোজগার।

ফাঁকা সিমেন্টের বেঞ্চে বসল তমাল। নিজেও কখন যেন শরিক হয়ে গিয়েছে নিঃসঙ্গ ঘাটের। আপন গতিতে বয়ে চলেছে গঙ্গা। কোনও দায় নেই ঘাটের কুশল জিজ্ঞাসার। পৌঁছতে হবে গন্তব্যে, সময় কোথায় অত? তমাল দেখছে চার দিক। আলো ঝলমলে হর কি পৌড়িরও মন জুড়ে যেন মনকেমন।

"খবর কী?"

"কিছু না।"

"কিছু না তো চলে আয়। শুধু শুধু ওখানে বসে আছিস কেন?"

"ট্রেনের টিকিট তো চোদ্দো তারিখের। আজ সবে এগারো," মাকে মনে করিয়ে দিল তমাল।

"ক্যানসেল করে নতুন টিকিট কাটলেই হয়," দমে না গিয়ে তপতী বলে ওঠেন।

"এখন টিকিট পাওয়া অত সোজা নয়।"

"চেষ্টা তো করা যায় নাকি? যদি পাওয়া নাও যায়, তা হলে ঘুরে আয় এ দিক-ও দিক। এক জায়গায় এতগুলো দিন বসে থেকে কী করবি?" প্রথমটায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেও পরে সুর নরম করেন তপতী। বিপদ মনে হয়ে কেটে গিয়েছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেই স্বস্তি।

"দেখি মিনুকে বলে..."

"তা হলেই হয়েছে। তুই বল যে, দেহরাদূন অথবা মুসৌরি যাবি। আর তোদের নয় একটা উদ্দেশ্য আছে, অনুজের তো কিছু নেই। শুধু শুধু বোর হচ্ছে ছেলেটা," মেয়ের উপর যে ভরসা নেই গোপন করেন না তপতী। পরোক্ষে বুঝিয়ে দেন ছেলের গুরুত্ব।

"দেখছি। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?"

"আর শরীর! আমার শরীরের কথা যদি ভাবতিস তা হলে একা রেখে এতগুলো দিন হরিদ্বারে গিয়ে বসে থাকতিস না," হঠাৎ করেই তপতী অভিমানী।

"মা শোনো..."

"এবার হয়তো অন্য কোনও জায়গার খোঁজ পেয়ে সেখানে যাবি। যা, ফিরে এসে দেখবি আমি..."

মায়ের ফোন কেটে দেওয়ার কারণ বুঝতে অসুবিধে হল না তমালের। কান্না চাপল। নিঃসঙ্গতায় কান্নাকেই যেন সঙ্গী মনে হয়। হালকা হয় পাথর-বুক। কে জানে ঘাটগুলোও কাঁদছে কি না।

অনুজের বিষয়ে মা খুব একটা ভুল আন্দাজ করেনি। আজ সারাদিন ধকল গিয়েছে, তার উপরে দুপুরের খাওয়াও ভাল করে হয়নি। ছুটে আসতে হয়েছে অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য। এক সময়ে আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। মেজাজ হারিয়েছিল মীনাক্ষীর উপরে। ওকে শান্ত করতেই মীনাক্ষীকে যেতে হল এলোমেলা ঘুরতে। না হলে

প্ল্যান ছিল হোটেলে ফিরে দু'জনের ফোনে ছবি আর টিভি রিপোর্ট দেখবে তমাল।

মেলা অফিসেও পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে। রোজ-রোজ একই মানুষকে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে দিতে ওরা রাজি নয়। শুধুমাত্র মহিলা বলে মুখের উপর কিছু বলতে পারছে না। ভাগ্যিস ওদের মধ্যে কেউ বাংলা বোঝে না। তা হলে ছাব্বিশ বছর আগে হারানো মানুষের অ্যানাউন্সমেন্ট কিছুতেই করতে দিত না।

"সারাদিন যে নদী, গাছের দিকে তাকিয়ে থাকো, কী দেখো বলো তো?"

"কী দেখি বল তো?"

"আমি কী করে বলব? তুমি দ্যাখো, তুমিই তো বলবে।"

"অজয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমি যেন অজয় হয়ে গিয়েছি। অক্ষয়বটের দিকে চেয়ে মনে হয়, অক্ষয়বট হয়ে গিয়েছি। শ্মশানের দিকে তাকিয়ে মনে হয়..." উদাস দৃষ্টি যাদবের।

"কী সব বলছ! এগুলো মনে হয় তোমার?" তমালের বিস্ময়।

"তোকে মিথ্যে বলেছি কখনও?" ছেলের হাত ধরেন যাদব।

"আগেও তোমার এমন মনে হত?"

"ভাবছিস মাথা খারাপ হয়ে গেল কি না? না রে, এক মনে তাকিয়ে থাকলে দেখবি, তোরও মনে হবে। কখন যেন মিশে গিয়েছিস প্রকৃতিতে," হাসি থেকে কখন যেন উদাসী যাদব।

"আমার খুব ভয় করছে বাবা।"

"কেন রে, ভয় কিসের?"

"কেমন সব কথা যেন বলছ তুমি। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মানুষ কখনও নদী হয় না গাছ?"

"মানুষ যে কী হতে পারে আর পারে না, আমরা কেউই জানি না রে। মানুষের ক্ষমতা অসীম। কতটুকুই বা কাজে লাগাই আমরা?" সস্নেহ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন যাদব।

"কী করে কাজে লাগাতে পারব?"

"শুধু বিশ্বাস করতে হবে, যা দেখছি যা শুনছি তার বাইরেও একটা জগৎ আছে।"

"যদি থাকেও, যেতে পারব সেখানে?"

"সেখানে যাওয়া যায় না রে। উপলব্ধি করতে পারলেই জীবন সার্থক।"

"সেই জীবনে আমি, মা, বোন সবাই থাকব?"

ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন যাদব। আচমকাই জাপটে ধরলেন। তার পর ডুকরে উঠলেন। জীবনে প্রথম বার বাবাকে কাঁদতে দেখল তমাল।

কখন যে চোখ ভিজে গিয়েছে বুঝতে পারেনি তমাল। মুছল না। কে জানে আরও কত জমে আছে জল। ছোটবেলায় বাবা চলে যাওয়ার পরে লুকিয়ে কাঁদত। তার পর মন ভিজলেও চোখ ভেজেনি কখনও। আজ আচমকাই বেসামাল।

পরিস্থিতি তলিয়ে ভাবল তমাল। এবার কী করণীয়? কনখলে খোঁজা শেষ। হরিদ্বারে কিছু খোঁজ এখনও বাকি। যদি না পায়? তা হলে কি হৃষীকেশে যাবে? ওখানেও তো শুনেছে অনেক আশ্রম। ওখান থেকেই হয়তো আজ স্নান করতে এসেছিল বাবা। বেশি দূর তো নয়। আরও কিছু দিন থাকতেও পারে ওখানে।

নিয়তি বোধহয় হাসে সর্বক্ষণ। নিয়ত খেলে আজব খেলা। যার কথা ভেবে তমাল চোখের জল ফেলছে, ঠিক একই সময়ে উল্টো পারে বসে তাঁর চোখেও বাঁধ ভেঙেছে। মা গঙ্গা সাক্ষী।

॥ ২২ ॥

ভোরের যেন নিজস্ব ক্ষমতা আছে। সতেজ, সজীব প্রকৃতি প্রাণিজগতেও ছড়িয়ে দেয় নিজের সতেজতা, সজীবতা। বিগত দিনের ক্লান্তি ফেলে আবার সকলে যেন নতুন উদ্যমে ফিরে পায় নিজেকে। এই ভাবেই চলে আসছে আবহমান চরৈবেতি জীবন।

ভোরের হর কি পৌড়ি একেবারেই অন্য রকম। সন্ধ্যায় উচ্ছল হলেও ভোরে গম্ভীর। মানুষজনের গঙ্গা-ডুব শান্ত, সমাহিত। যেন আকুল আর্তি জানাচ্ছে প্রকৃতিকে। পূজারিরা মন্ত্রপাঠ করাচ্ছে, ভক্তরা ভক্তিভরে দিচ্ছে অঞ্জলি। মন্দিরগুলোতেও শোনা যাচ্ছে মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টাধ্বনি। অস্থি প্রবাহ ঘাটে সার দিয়ে বসে পরামানিকের দল। পুণ্যার্থীরা মাথা কামাচ্ছে। যথাসম্ভব দান করেই পেতে চাইছে প্রতিদান।

ভোরের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়েছে তমাল। বাবা যদি শিবরাত্রির স্নানের জন্য এসে থাকে, তা হলে মনে হয় না এক দিনের জন্য আসবে। তাই যদি হয়, তা হলে যে ক'দিন থাকবে সেই ক'দিনই আশা করা যায় গঙ্গাস্নান করতে আসবে ব্রহ্মকুণ্ডে এবং সেটা ভোরবেলাতেই। কিন্তু অনেক অপেক্ষা করেও ব্রহ্মকুণ্ডে দেখা মিলল না বাবার। দেখা মিলল ট্রেনের সেই বাবাজির।

"আজও স্নানে এসেছেন?"

"আমার কপাল বাবা... গতকাল শরীরটা এমন খারাপ করল যে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলাম না।"

"হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল!", একটু যেন ঘাবড়ে গেল তমাল। এত লোকের মধ্যেও মাস্ক পরেননি বাবাজি। শিষ্যরাও পরেনি। করোনা হতেও পারে। চিন্তিত মুখে বলেই ফেলল, "আজই বা আসতে গেলেন কেন? ডাক্তারের কাছে যেতে পারতেন।"

"ডাক্তারের কাছেই তো এসেছি। গোস্বামী মতে আজই তো শিবরাত্রির ব্রতপালন। তা ছাড়া আজ যে অমাবস্যা," শরীরে কষ্ট থাকলেও বাবাজির মুখে হাসি।

"ভক্তির চেয়ে কি শরীর আগে নয়?"

"শরীর তো ফুরিয়েই এল প্রায়। এখন ভক্তিই আগে মনে হয়।"

"বেশ, আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন," সঙ্গ এড়াতে চাইল তমাল। ভিড়ের অনেকেই হয়তো করোনা-আক্রান্ত। কিন্তু যেহেতু তাদের শরীরের খবর অজানা তাই আতঙ্কিত হয়নি। বাবাজির শরীর খারাপ শুনে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়েছে।

"শাহী স্নানে ফাঁক পড়লেও আজ অমাবস্যার স্নানেও পুণ্য কম হবে না, কী বলো?"

"পুণ্য আপনার মনে বাবাজি। এই গঙ্গাকেই কোথাও আমরা অমৃত ভাবি কোথাও পাঁক।"

"বা বা বেশ বলেছ। পাপ, পুণ্য সবই তো মনে..."

জলের দিকে এগোলেন বাবাজি। তমাল অবাক হয়ে দেখল কুম্ভ মাহাত্ম্য। শাক্ত, শৈব, বৈরাগী, বৈষ্ণব সকলকে এক করে দেয়। ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয় ধনী দরিদ্রেরও। একই জলে সকলে নিজেকে সমর্পণ করে একই ফললাভে। পরোক্ষে কুম্ভস্নান হয়ে ওঠে যেন সাম্যবাদ পাঠ।

সাতটা বাজে প্রায়। ফোন আসেনি মানে মীনাক্ষী ওঠেনি এখনও। ক্লান্ত শরীর, হতাশ মন হয়তো উৎসাহ দেয়নি বিছানা ছাড়তে। মীনাক্ষীর মানসিকতা আন্দাজ করে তমাল একাই বেরিয়ে পড়েছে ভোরে। এক জন মানুষের আন্তরিক চাওয়াকে অপূর্ণ রাখতে মন চায়নি। নিজেও যে অন্তর থেকে চায় একই চাওয়া। তাই যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ।

অনুজের রাগ, বিরক্তির কারণ ধরে ফেলতেও দেরি হয়নি। কথায়-কথায় জানল, পরিমিত হলেও নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যেস আছে অনুজের। তবে মীনাক্ষীর কড়া নির্দেশ, দাদার সামনে খাওয়া চলবে না। একে অলীক খোঁজ, তার উপর নেশার অপ্রাপ্তি, মাথা ঠিক থাকে? তমালের সাংবাদিক মন বলল, হরিদ্বারে মদ অমিল হলেও মেলা উপলক্ষে ব্ল্যাকে নিশ্চয়ই মিলবে। মিললও বাস স্ট্যান্ডের কাছে। অনুজের পছন্দমাফিক একটা বোতল কিনল। তবে অনুজ ভাবতে পারেনি সাংবাদিক হয়েও তমাল মদ খায় না। তীব্র আপত্তি জানাল। কিছুতেই একা খাবে না। হেসে অনুজের পিঠে হাত রাখল তমাল। একই

অভ্যেস যে সকলকেই খুশি করবে এমন তো নাও হতে পারে। অনুজ বরং অতশত না ভেবে নিজের আত্মাকে তুষ্ট করুক। তাতেই সকলতুষ্টি। তবে মীনাক্ষীকে জানালে চলবে না। খেতে হবে মীনাক্ষী শুতে যাওয়ার পরে। হাসির রেখা দেখা দিল অনুজের ঠোঁটে। হঠাৎ করেই যেন বন্ধু হয়ে গেল দু'জনে।

"এত সকালে আপনি?"

"আমারও তো একই প্রশ্ন।"

"আমি এসেছি ওই সাধুবাবার জন্য। কাল থেকে এক বারও উঠতে দেখলাম না। দেখুন কী রকম উদাস ভাবে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন," ভক্তি যেন উপচে পড়ছে মৃদুলার মুখে।

হাঁটতে-হাঁটতে কখন যেন পুল পেরিয়ে উল্টো পারে এসে পড়েছে তমাল। সামনে তাকিয়ে দেখল, মৃদুলা সেই সাধুর দিকে দিক্‌নির্দেশ করেছেন যাকে আগেই নজরে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, গাছের মতো।

"কোনও কথাও বলেন না সাধুবাবা। আশপাশে খবর নিয়ে জানলাম, রাত তিনটে নাগাদ এক বার শুধু ওঠেন," সাধুর মহিমায় উচ্ছ্বসিত মৃদুলা।

"আপনার দেখছি এখনও সাধুদের প্রতি প্রবল কৌতূহল," হেসে বলল তমাল।

"আধ্যাত্মিকতা আমার লাইন নয় বলছেন?"

"গতি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ট্রেন চালকের বিশেষ কোনও ক্ষমতা নেই। যে লাইন পায় সেই লাইনেই গাড়ি ছোটায়। ছুটতে-ছুটতে এক সময়ে পৌঁছেও যায় গন্তব্যে।"

"মানে?"

"মানে, লাইন ধরার চেষ্টা করে লাভ নেই। শুধু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যে লাইন আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা আছে এক সময় ঠিক সেই ট্র্যাকে পড়ে যাবেন। পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে," হাসিমুখে বলে তমাল।

"গতকাল স্নান করেছেন?"

"না।"

"তা হলে কুম্ভে এলেন কেন?"

"আপনাদের দেখতে।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মৃদুলা।

"শুনুন দিদি, আর অজানার পিছনে ছুটবেন না। তার চেয়ে আমি যে লাইন দেখিয়েছি সেই লাইনে চলুন। উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন জীবনের। বুঝবেন, মানুষের উপকার করতে পারলে জীবনপথে খানিক এগিয়ে দিতে পারলে, কী অপার শান্তি মেলে।"

"বুঝেছি ভাই... কলকাতায় ফিরেই ফোন করব তোমাকে।"

চলে যায় মৃদুলা। তমাল বুঝল, মহিলার ফোন না করার সম্ভাবনাই বেশি। ধর্ম-আফিংয়ের নেশা কাটানো কঠিন।

"কী রে, কোথায় তুই?"

"উঠে পড়েছিস? অনুজ উঠেছে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নে, কচুরি-জিলিপি নিয়ে আসছি। খেতে-খেতে তোদের ছবি আর ভিডিয়ো দেখব।"

ফেরার পথ ধরল তমাল।

"বেটা থোড়া রুক জা..."

পিছন ঘুরে তমাল দেখল এক মাঝবয়সি নাগা সন্ন্যাসী ডাকছে। কৌতূহলে ফিরতেই হল।

"মুঝে এক পাওয়ার-ব্যাঙ্ক দিলা দে বেটা," সন্ন্যাসীর আর্জি। তমাল দেখল সন্ন্যাসীর পাশেই এক বিক্রেতা। হাতে হেডফোন থেকে পাওয়ার-ব্যাঙ্ক, মোবাইলের যাবতীয় আনুষঙ্গিক।

"মোবাইল সে আপলোগো কা কেয়া মতলব বাবা?"

"কনট্যাক্ট রাখনা পড়তা হ্যায়।"

"কিঁউ?"

"জরুরত তো ভক্ত-ই পুরা কর সকতে হ্যায় না।"

হেসে উঠে পড়ল তমাল। ত্যাগীরও প্রয়োজন!

পুল পেরিয়ে আবার এ পারে এল তমাল। হর কি পৌড়িতে একাধিক খাবারের দোকান। কতকগুলো বেশ দামি মনে হল। রামঘাটে এল। আগের দিন একটা ভাল মিষ্টির দোকান নজরে পড়েছিল। পাশেই মিলল কচুরি-জিলিপি। দুটোই গরম হওয়ায় সমস্যা নেই। সমস্যা নেই চা নিয়েও। হোটেলের কিচেনে গিয়ে ভাল করে গ্লাস মেজে নিজেই বানিয়ে আনবে মীনাক্ষী। করোনাকালে সতর্ক না থেকে উপায় কী?

হাতে আর মাত্র আড়াই দিন। এই আড়াই দিনেই যা করার করতে হবে। বাবাকে যদি খুঁজে নাও পায় তা হলেও তো সান্ত্বনা থাকবে যে, চেষ্টা করেছিলাম। চেষ্টার বেশি ক্ষমতা তো নেই মানুষের। তমাল সিদ্ধান্ত নিল, নিরঞ্জনী আর জুনা আখড়ায় যে তাঁবুগুলো পড়েছে, সেখানে ভাল করে খুঁজে দেখবে। তখনও তো সব সাধু এসে পৌঁছয়নি। তার পরে দেখবে গঙ্গাপারের উত্তর দিকটা। ও দিকটায় যাওয়াই হয়নি।

হোটেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে তমালের মনে হল, ব্যর্থতা বলে যথার্থই কিছু হয় না। এই যে বাবাকে খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না, সত্যিই কি পাচ্ছে না? এই ক'দিনে বাবাকে যতটা অনুভব করেছে, ছাব্বিশ বছরেও হয়তো করেনি। না থেকেও বাবা যেন জড়িয়ে গিয়েছে আত্মায়। কম পাওয়া হল?

॥ ২৩ ॥

সাধু আর সাধারণের মধ্যে বিস্তর ফারাক। এমনটাই ভাবতে অভ্যস্ত আমজনতা। সহজে ভাবতে পারে না সাধুর বেশেও থাকতে পারে অসাধু অথবা বেশ ছাড়াও মানসিক ভাবে কেউ হতে পারে সাধু। বেশ যেন উত্তরণ-প্রতীক, চরম আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। তাই চট করে বসে পড়ে, চরণ ছুঁয়েই বাড়িয়ে দেয় হাত। আধ্যাত্মিক মানুষই তো হয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। পাশে দাঁড়ানো সাধারণ পোশাকের নিরীহ-নির্লিপ্ত মানুষটিও যে হতে পারে প্রকৃত সাধুর মতোই আলোকপ্রাপ্ত, মাথায়ই আসে না। গুরুত্ব শুধুই জটা, দাড়ি,
ধুনি, আচারের।

নিরঞ্জনী আখড়ার গোটা পঞ্চাশেক তাঁবুই ভরে গিয়েছে। সাধুরা বসে কম্বলে অথবা নিচু সিংহাসনে। অনেকের সামনেই ধুনি। ভক্তরা ব্যস্ত মনোবাঞ্ছা জানাতে। সাধুদের কোনও ব্যস্ততা নেই। তাকিয়ে বা চোখ বুজে শুধুই শুনে যাওয়া। তার পর সমস্যা বুঝে শিকড়, রুদ্রাক্ষ, মঙ্গল প্রতীক ময়ূরের পালকগুচ্ছ বুলিয়ে আশীর্বাদ। বিনিময়ে দক্ষিণা। তমাল লক্ষ করে দেখল, ময়ূরের পালকগুচ্ছ রয়েছে সব সাধুর কাছেই।

এক সাধুকে দেখে মীনাক্ষী ইচ্ছা প্রকাশ করল, বাবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। মধ্য চল্লিশের বিরাট জটা-দাড়ির ভস্মমাখা নাগা সাধুকে ভাল করে জরিপ করল তমাল। চোখ বুজে বসে আছেন। ভাবলেশহীন মুখে কথা নেই। প্রশ্নের উত্তরে শুধু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলছেন। রাজি হল না তমাল। সকলের মনোবলেই চিড় ধরেছে। এখনই শক্ত থাকার সময়। সাধুর নেতিবাচক উত্তর তলানিতে নিয়ে যেতে পারে মনোবল। সাধু যে সত্যিই ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এমনটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

জুনা আখড়াও প্রায় একই রকম। শুধু তাঁবু, সাধু আর ভক্তসংখ্যা অনেক বেশি। বেশির ভাগই নাগা সন্ন্যাসী। সবার সামনেই জ্বলছে ধুনি। কিছু তাঁবুতে সিংহাসন থাকলেও, বেশির ভাগ সাধুই মাটিতে প্লাস্টিক অথবা মাদুরে বসে। হাতে সেই ময়ূরের পালকগুচ্ছ। কারও পাশে বসে বাল নাগা। প্রস্তুতি নিচ্ছে পূর্ণতা প্রাপ্তির। এখানে দেহাতি মানুষের ভিড়ই বেশি। উদ্দেশ্য এক, অজানাকে জানা। মৌনী চোখে পড়ল না কাউকে বরং অনেকেই উচ্চগ্রাম। এক জন বৃদ্ধ নাগা ফাঁকা বসেছিলেন। ইশারায় ডাকলেন মীনাক্ষীকে। তমাল বাধা দেওয়ার আগেই যেন সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল মীনাক্ষী। প্রমাদ
গুনল তমাল। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই। সাধুকে প্রণাম করে

সামনে বসল মীনাক্ষী। ভুলে গিয়েছে কোভিড সাবধানতা। অনুজ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও থামিয়ে দিল তমাল। দেখাই যাক নিয়তির খেলা।

মীনাক্ষী হাত বাড়িয়ে দিলেও দেখলেন না সাধু। চেয়ে রইলেন মীনাক্ষীর মুখের দিকে। বেশ খানিকক্ষণ পরে ভাঙা গলায় উত্তর ভারতীয় হিন্দিতে জানালেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে মীনাক্ষী এসেছে সেটা পূরণ হবে। খড়কুটো পেয়ে মীনাক্ষী জানতে চাইল, বাবা বেঁচে আছে কি না। স্মিত হাসি সাধুর মুখে। মাথা নেড়ে জানালেন, বেঁচে আছে। উৎসাহিত মীনাক্ষী জানতে চাইল, কোথায় পাবে বাবাকে? অঙ্গুলিহেলনে সাধু জানালেন, এখানেই। আপ্লুত মীনাক্ষী আবার সাধুকে প্রণাম করে একশো টাকা দক্ষিণা দিল। পালকগুচ্ছ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন সাধু। হাঁপ ছাড়ল তমাল।

মন প্রফুল্ল হলেই বোধহয় চায়ের প্রয়োজন পড়ে। সেই বায়নাই ধরল মীনাক্ষী। অনুজ সমানে বুঝিয়ে চলেছে কতবড় ভুল মীনাক্ষী করেছে সাধুর সামনে মাটিতে বসে আর ময়ূরপুচ্ছ মাথায় ঠেকিয়ে। তমাল খুঁজছে চায়ের দোকান। সেই দোকানির বিস্ময়কর উক্তির পরে কাউকেই আর ভরসা করতে পারেনি। বানানো চায়ের বদলে খেতে শুরু করেছে মেশিনের চা-কফি। মেশিনওয়ালা চা-কফির দোকান চোখে পড়ল না তমালের। খুঁজতে-খুঁজতে পেরিয়ে গেল হর কি পৌড়ি। খানিক এগোতেই চোখে পড়ল এক চাওয়ালাকে। দেখে যেন ভরসা হল তমালের।

তমালদের পেয়ে দোকানিও বর্তে গেল। জানাল, এ বার কুম্ভে লোকসংখ্যা অনেকটাই কম। শিবরাত্রি উপলক্ষে যাও কিছু ব্যবসা হয়েছিল, আজ সকাল থেকেই খরিদ্দারের আকাল। সানন্দ হাতে স্যানিটাইজ়ার নিল। সাবান দিলেও বোধহয় আপত্তি করত না। চা বানাল খাসা। খেতে-খেতে তমাল জানল, বাইপাস হওয়ার আগে গঙ্গাপাড়ের এই সরু রাস্তা, ভীমগোড়া রোডই ছিল হৃষীকেশ যাওয়ার একমাত্র পথ। তখন অবশ্য এত দোকানপাট ছিল না। তমাল দোকানির সঙ্গে ব্যস্ত রইলেও, অনুজ-মীনাক্ষী ব্যস্ত রইল কোভিড প্রোটোকল বিতর্কে।

চা শেষ করে হস্তক্ষেপ করতেই হল তমালকে। কাজে লাগাল সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী। বাবাকে এখানেই পেতে হলে আগে তো ভাল করে খুঁজতে হবে। সাধু তো বলে দেয়নি কোন জায়গায়, কোন সময়ে খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই প্ল্যানমাফিক যেতে হবে উত্তর দিকে। মন্ত্রের মতো কাজ হল কথায়। দু'জনেই চুপ। এগিয়ে গেল তমাল। হর কি পৌড়িতে নেমে ধরতে হবে উত্তর পথ।

উত্তর পথ ধরতেই পাল্টে গেল পরিবেশ। ডান দিকে গঙ্গা বাঁ দিকে প্রশস্ত জমি। ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন আখড়ার জন্য। কোথাও লাগানো আখড়ার ফ্লেক্স। শিবরাত্রির ভিড় মিটে গিয়েছে এ বার বোধহয় শুরু হবে নির্মাণ। গঙ্গাপাড় ধরল তমালরা।

গঙ্গার ধারে আস্তানা গেড়েছে অনেক আখড়াহীন সাধু। কেউ ছাউনি করেছে, কেউ গাছতলায়। কালো আলখাল্লা পরা এক সাধু গাছে লাগিয়েছে এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি। হয়তো বোঝাতে চায় গুরুত্ব, ক্ষমতা। কথাও বলছে উচ্চ স্বরে, নাটকীয় ভাবে। হাঁ করে গিলছে দেহাতি মানুষজন। তারাও সংসার পেতেছে গাছতলায়। শিবরাত্রির স্নান সেরে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে মন চায়নি বোধহয়। রান্নার গন্ধ, বাচ্চাদের কলতান, সাধুদের প্রবচন আর গাঁজার ধোঁয়ায় মিলেমিশে গিয়েছে গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস।

সামনেই ভীমগোড়া ব্যারেজ। তার সামনে বিশালকায় শিবমূর্তি। সেই দিকেই এগোতে লাগল তমালরা। হাঁটতে-হাঁটতে ভাল করে নজর করছে সাধুদের। কাউকেই মনে ধরছে না তমালের। সকলের মধ্যেই শিক্ষার অভাব এবং রোজগারের ধান্দা প্রকট। বাবা এমনটা হতেই পারে না।

"স্যর...স্যর..."

চেনা গলা পেয়ে পিছন ঘুরল তমাল। এগিয়ে আসছে রতন-পঞ্চা। মীনাক্ষী-অনুজকে শিবমূর্তির দিকে এগোতে বলল তমাল। ওরা যে কী বলতে কী বলবে আন্দাজ করা মুশকিল। সন্দিগ্ধ মনে চলে গেল অনুজ-মীনাক্ষী।

"ঘুরছেন স্যর?"

"হ্যাঁ, এই আর কী..."

"আপনি কবে ফিরবেন স্যর?"

"কেন বলো তো?" রতনের প্রশ্ন ধরতে পারেনি তমাল।

"আপনার সঙ্গে ফিরতাম..."

"ব্যবসা শেষ?"

"তা এক রকম বলতে পারেন। মহাদেব আর আপনার আশীর্বাদে..." বিগলিত রতন। পঞ্চারও গুটকার ছোপ-ধরা দাঁত বিকশিত। মহাদেবের সঙ্গে একসারিতে ফেলে দেওয়ায় তমালেরও হাসি পেয়ে গেল।

"আমার সঙ্গে ফিরতে চাইছ কেন? এখন তো ভাল টাকাই রয়েছে তোমাদের কাছে। টিকিট কাটতে তো কোনও অসুবিধে নেই।"

"সে ঠিক, কিন্তু অত ভাড়া...আপনার ভরসায় যদি..."

ভরসা করতে ইচ্ছে করল তমালেরও। একশো প্যাকেটের মতো গাঁজা বিক্রি করেছে মানে ভালই ঘুরেছে মেলায়। পরিচিত হয়েছে নানা সাধুর সঙ্গে। এক বার চেষ্টা করে দেখলে হয়। গেম তো ব্লাইন্ড, দেখাই যাক না চেষ্টা করে। দু'জনকে একটু ফাঁকায় এনে তমাল বলল, "এখানে কোনও বাঙালি সাধু দেখেছ? বয়স ধরো সত্তর, লম্বা চেহারা, গলার স্বর ভারী, চোখে চশমা, নাকের ডান দিকে আঁচিল।"

"ছবি আছে আপনার কাছে?"

"না ছবি নেই।"

"বাঙালি সাধু তো অনেক আছে, তবে আপনি যেমন বললেন তেমন কাউকে চোখে পড়েনি এখনও। পড়লেই আপনাকে জানাব। আপনি ফিরবেন কবে স্যর?" চিন্তিত মুখে রতন জানতে চায়। খোঁজ দিতে না পারলে চান্স ফসকে না যায়।

"পরশু রাত সাড়ে এগারোটার হাওড়া স্পেশ্যালে। আমার ফোন নম্বরটা নাও, খোঁজ পেলেই ফোন করবে," ফোন নম্বর বলল তমাল। রতন সেভ করল নিজের মোবাইলে।

"খোঁজ যদি না পাই?"

"তা হলেও আমার সঙ্গে যাবে। তবে বিনা টিকিটে নয়। তোমাদের টিকিট আমি কাটব," তমালের আশ্বাস। যদি কাজ দেয়।

"স্যর, আপনি সত্যিই মহাদেব," আচমকা প্রণাম করতে উদ্যত হল পঞ্চা। হেসে পিছিয়ে এল তমাল। দু'জনে পুরো নাম, বয়স জানিয়ে বিদায় নিল। অনুজ-মীনাক্ষী কী ভাবছে কে জানে?

"সাধু দু'জনকে তো সুবিধের মনে হল না।"

"কেন?"

"সাধু কখনও স্যর বলে?"

"ট্রেনে আলাপ। তা ছাড়া বয়স কম..." তমালের সাফাই মীনাক্ষীকে।

"এখন কী করবি?"

"গলিঘুঁজিগুলো ঘুরে দেখি।"

গলিতে গলিতে প্রচুর হোটেল, ধর্মশালা। তমাল উৎসাহ না দেখালেও মীনাক্ষী গেল ধর্মশালাগুলোয়। যেতে হল অনুজকেও। পায়চারি করতে-করতে তমাল দেখল, একটু ফাঁকা জমি পেলেই বাঁধা হচ্ছে ম্যারাপ। বুঝতে পারল মেলা শুরু হলে হরিদ্বারের এক ইঞ্চি জমিও ফাঁকা পড়ে থাকবে না। আজ সকাল থেকেই মাইকের আওয়াজ বদলে গিয়েছে। ভক্তিগীতির বদলে শুধুই কোভিড সতর্কতা। রাস্তায় গাড়ি থেকে স্প্রে করা হচ্ছে হাইপোক্লোরাইট। ঘাটেও এক নামী কোম্পানির হ্যান্ড-স্যানিটাইজ়ার ঘাড়ে নিয়ে মানুষকে বিতরণ করছে কোম্পানির লোগো লাগানো টি-শার্ট পরা ছেলের দল। ঘোষণা, স্প্রে আর ওদের প্রয়োজন ছিল গত চার দিনের ভিড়ে। আন্দাজ করল, প্রথম

শাহী স্নানের সম্প্রচার হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। দেশের ভাবমূর্তি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়নি। তাই হয়তো এই ম্যানেজের চেষ্টা। পরিস্থিতি যা বুঝছে, মেলা শুরু হলে যে বিপুল সংখ্যক সাধু এবং পুণ্যার্থীর সমাগম হবে, নির্বিঘ্নে মেলা শেষ করা যাবে তো?

অসমাপ্ত কুম্ভমেলা আগেও হয়েছে। হরিদ্বারেই কলেরার কারণে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাদের জেরে দুর্ঘটনার সংখ্যাও প্রচুর, প্রায় সব কুম্ভমেলাতেই। পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছে বহু জন। শেষ দুর্ঘটনা অবশ্য বছর পঁয়ত্রিশ আগে। এ বারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেই যেন দেরিতে শুরু করেও নিয়তি নির্দেশে অসমাপ্ত রয়ে যাবে হরিদ্বার কুম্ভমেলা।

খোঁজ পাওয়া গেল না ধর্মশালাগুলোয়। বাকি যে আশ্রমগুলো ছিল সেখানেও নয়। তমালের প্রশ্ন জাগল, বাবা কি আদৌ এসেছে? নাকি এসেছে, ঘোষণা শুনে চলে গিয়েছে অন্তরালে?

॥ ২৪ ॥

দৌড়চ্ছেন অবধেশ মহারাজ। কনখল থেকে হর-কি-পৌড়ি পর্যন্ত হেঁটেই আসেন। আজও এসেছেন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই দৌড়চ্ছেন। পুলিশ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে দৌড়ে গণেশঘাটে পৌঁছতেই কানে এল কাতর আর্তি, "দেখা দেবে না বাবা? আমরা যে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। তোমার কি মনে পড়ে না টিকতবেতার কথা? তমাল, মীনাক্ষীর কথা? তোমাকেই বলছি শ্রীযাদবচন্দ্র কর্মকার। আমি তোমার মেয়ে মীনাক্ষী। সঙ্গে আছে তোমার ছেলে তমালও। সেই তমাল, যাকে তুমি প্রকৃতিশিক্ষা দিয়েছ। শিক্ষা যে এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে বাবা। শুনতে পেলে সাড়া দাও..."

গণেশঘাটেই দাঁড়িয়ে পড়লেন অবধেশ মহারাজ। ভেবেছিলেন আজও বসবেন হর কি পৌড়ির পাশের সেই নির্জন ঘাটে। শুনবেন মেয়ের আবেগভরা কণ্ঠ। সে আর হল কই? অতটা দৌড়, তার উপর এমন আর্তি শোনার পরে আর কি চলার শক্তি থাকে? ঘাটের সিঁড়িতেই বসে পড়লেন। অস্ফুটে বেরিয়ে এল, 'হা ঈশ্বর!'

মন বিধ্বস্ত। তাই আজ আর টিকরবেতার নামে শিহরন জাগল না। বরং উদ্রেক হল ক্ষোভের। টিকরবেতা দিয়েছে যেমন অনেক, কেড়ে নিতেও দ্বিধা করেনি।

"আপনি তা হলে আমার কথা রাখবেন না?"

"রাখার মতো হলে নিশ্চয়ই রাখতাম।"

"অন্যায় কোনও অনুরোধ তো করিনি। আমি স্কুলের সেক্রেটারি। আমার অনুরোধের কোনও দাম নেই? স্কুলের জন্য আমি কম পরিশ্রম করেছি?" বিস্মিত, বিরক্ত মহিম হাজরা।

"আমিও আপনার চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশিই পরিশ্রম করেছি স্কুলের জন্য। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। এখন আপনি যে অনুরোধ করছেন তাতে একজন যোগ্য মানুষ বঞ্চিত হবে। যোগ্য মাস্টারমশাই না পেয়ে ছাত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে," যাদবের যুক্তি।

"শুধু ডিগ্রি দিয়ে কি যোগ্যতা যাচাই হয় মাস্টারমশাই?" ব্যঙ্গের হাসি মহিমের মুখে।

"সেটা আশা করি আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি। দু'টি ছেলের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। আমার নির্বাচিত ছেলেটির সঙ্গে আপনার শালাবাবু কোনও তুলনাতেই আসে না," ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে যাদবের উত্তর।

"তা হলে এটাই আপনার শেষ কথা?"

"অবশ্যই। মনে কোনও সন্দেহ রাখবেন না।"

"বেশ, আমিও দেখব আপনি কী করে মাস্টারি করেন," হুমকিতে না গিয়ে উপায় রইল না মহিমের। স্কুলের সেক্রেটারি হয়েও শালাকে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই! মুখ দেখাবেন কী করে বৌয়ের কাছে?

"মাস্টার আমাকে কেউ বানিয়ে দেয়নি মহিমবাবু। নিজের যোগ্যতায় হয়েছি।"

বহু দিন বাদে অপ্রিয় অতীত মনে পড়ল অবধেশ মহারাজের। আবার প্রায় একই সমস্যায় জড়াতে চলেছেন। বাধ্য হয়েই ফিরে যেতে হবে আগামী কাল। না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

উত্তরকাশী থেকে একটু দূরে হীনা গ্রাম। সেখানেই আশ্রম। আশ্রমের পাশেই অবৈতনিক স্কুল। স্কুলের জমি এখনও কিছুটা ফাঁকা পড়ে। পাশেই এক ব্যবসায়ীর বাড়ি। উত্তরকাশী বাজারে জামা-কাপড়ের দোকান। ইদানীং কোনও ভাবে বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে। পাথরের বাড়ি ভেঙে ইট-সিমেন্টের বড় বাড়ি বানাচ্ছে। ফাঁকা জমিটা কিনতে চাইলেও অবধেশ মহারাজ রাজি হননি। স্কুল আরও বাড়াবার ইচ্ছে। খবর এসেছে, অনুপস্থিতির সুযোগে ব্যবসায়ী ফাঁকা জমির কিছুটায় হাত দিয়েছে। এক্ষুনি থামানো জরুরি।

থামানো কঠিন নয়। পুলিশসুপার যথেষ্টই সম্মান করেন। তা ছাড়া ব্যবসায়ীর পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বেআইনি। শুধু সামনে গিয়ে এক বার দাঁড়ালেই সমস্যার সমাধান হতে অসুবিধে হবে না। তাই আগামী কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। যেতে মন না চাইলেও যেতে হবে। আশ্রমিকদের দায়, গুরুর নির্দেশ উপেক্ষা করা চলে না কিছুতেই। উত্তরকাশী পৌঁছে আশ্রমে যাওয়ার আগেই যেতে হবে থানায়। তার পর পুলিশ নিয়ে আশ্রমে। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অবধেশ মহারাজ। পুলিশি ঝামেলা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না।

"আপনার বাড়ি সার্চ করব।"

"সার্চ! কেন?"

"সেটা সার্চ করলেই জানা যাবে।"

"ওয়ারেন্ট আছে?"

"আইনি ঝামেলায় জড়াতে চাইলে ওয়ারেন্ট আনতেই পারি।"

"সামান্য ব্যাপার মাস্টারমশাই। আমার আর ট্রেজ়ারের বাড়িও সার্চ হয়েছে। সেই যে ডোনেশনের দশ হাজার টাকা আলমারিতে ছিল, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। চাবি তো থাকে আমাদের তিন জনের কাছে। তাই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এই সার্চ। পরে পুলিশ চোর খুঁজে বার করবে," মুখে হাসি রেখে মহিম হাজরা বলেন।

"তা হলে ভিতরে যাওয়া যাক, নাকি?" যাদবের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসারের কড়া প্রশ্ন।

যাদব হতবাক। ছেলেকে নিয়ে স্কুলে বেরোবার আগে যে এই রকম আকস্মিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে কল্পনাতীত। অফিসারের যা মনোভাব, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সেক্রেটারির সমর্থনও স্পষ্ট। নিরুপায় যাদবকে দিতেই হল সার্চের অনুমতি।

ঘর লন্ডভন্ড করে চলল খানাতল্লাশি। পুরো পরিবার চুপ করে দাঁড়িয়ে। তপতীও নির্বাক। তমাল বুঝেই উঠতে পারছে না কী ঘটছে। পুলিশি তাণ্ডবের মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে ছোট্ট মীনাক্ষীর কান্না।

টাকা মিলল শেষমেশ। খাটের তলায়। ছোঁ মেরে পুলিশের হাত থেকে টাকার গোছা নিয়ে নিলেন মহিম। তার পর হাতের চিরকুটের সঙ্গে মেলাতে লাগলেন। খানিক বাদেই চিৎকার করে উঠলেন, "এ তো সেই টাকাই! আমার কাছে নম্বর লেখা ছিল। আপনিও একবার মিলিয়ে দেখুন তো ট্রেজ়ারারবাবু।"

"তা হলে থানায় যাওয়া যাক যাদববাবু," অফিসারের হুকুম।

"না না দারোগাবাবু, টাকা যখন পাওয়া গিয়েছে তখন দয়া করে মাস্টারমশাইকে থানায় নিয়ে যাবেন না," যেন কাতর আর্তি মহিমের।

"টাকা পাওয়া গিয়েছে তো কী হয়েছে? অপরাধ করলে শাস্তি তো পেতেই হবে," রুক্ষ গলায় বলেন অফিসার।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্তি তো পাবেনই। মাস্টারমশাই আজই স্কুল থেকে থেকে রিজ়াইন করবেন। কিন্তু দয়া করে থানায় নিয়ে যাবেন না। এত মান্যিগণ্যি মানুষ," যাদবের কানে ফিসফিস করে বলেন, "কী মাস্টার,

ইস্তফা দেবে নাকি মামলা লড়বে?”

পুরো ঘটনায় যাদব বিভ্রান্ত। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না টাকাটা কী করে ওখানে এল। তবে গোটা ঘটনাই যে মহিম হাজরার সাজানো বুঝতে অসুবিধে হল না। চোখের সামনে ঘটছে কী ভাবে দশচক্রে ভগবান ভূত হয়।

“কী হল যাদববাবু, চলুন?” অফিসারের হুমকি।

“বললাম তো দারোগাবাবু, ইস্তফা দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উনি করবেন। তা হলে আবার থানায় কেন? ঘরের টাকা ঘরে ফিরেছে, এখন চলুন আমরাও ফিরে যাই,” তাড়া দিলেন মহিম। বিদায় নিল সকলে।

যাদব যেন স্থবির। পা গেঁথেছে মাটিতে। পরিবারের সকলেও থমকে গিয়েছে। বিশ্বাস করতে পারছে না দেবতার পদস্খলন। বাবার পাশে এসে দাঁড়াল তমাল। যেন উষ্ণতায় দিতে চাইল সান্ত্বনা। হুঁশ নেই যাদবের। ভেবেই চলেছে, কে রাখল ওখানে টাকা?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে অবধেশ মহারাজ। সময় বেশি নেই। ফিরে যাওয়ার আগে এক বার দেখা করতে হবে কিন্নর আখড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিপাঠীজি’র সঙ্গে। কথা দেওয়া আছে। যেতে হবে জুনা আখড়াতেও। মেলার মধ্যে আর আসা হবে কি না জানা নেই। জানা নেই আর কখনও মেয়ের আবেগভরা কণ্ঠস্বর শোনা হবে কি না। হয়তো জীবনে শেষ বার, তবুও শোনা তো হল! ফিরে যেতে হবে এই প্রাপ্তিটুকু নিয়েই। কম কী?

॥ ২৫ ॥

সবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হার নিশ্চিত জেনেও খেলতে নামে খেলোয়াড়রা। খেলতে-খেলতে অনেক সময়ই ভুলে যায় নিজেদের অক্ষমতা। মেতে ওঠে জেতার নেশায়। ভাগ্যের প্রসন্নতায় হয়তো জিতেও যায় কোনও দিন। কিন্তু ভাগ্যই যেখানে প্রতিপক্ষ, হার সেখানে নিশ্চিত। জাগে হতাশা। ‘একটু হলেই তো...’ ওই ‘একটু’ই হতে দেবেন না ভাগ্যদেবতা। আশার আলো দেখিয়েও চলতে বাধ্য করবেন পূর্বনির্ধারিত পথে।

গতকাল থেকেই কথা কমিয়ে দিয়েছিল মীনাক্ষী। ছবি, ভিডিয়ো কোনও কাজে লাগেনি। সকালে বিভিন্ন আশ্রম, ধর্মশালায় খোঁজাখুঁজি করেছিল, সন্ধ্যায় করেছিল নিয়মমাফিক অ্যানাউন্সমেন্টও। অনেকটাই নির্লিপ্ত। হার জেনেও খেলা চালিয়ে যাওয়া যেন। এখন স্টেশনে বসে একদম নির্বাক। অনুজ সরাসরি বিষয়টার সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়েও মনমরা। অজান্তেই জড়িয়ে পড়েছে খেলায়। তমাল দু’জনকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। কাজ করেনি ভোকাল টনিক।

নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও দেখা নেই হাওড়া স্পেশ্যালের। অখণ্ড নীরবতা বড়ই অস্বস্তিকর। তমাল পায়চারি করছে। স্টেশনও যেন ঝিমিয়ে। সঙ্গত করছে নীরবতায়। ট্রেন এলে নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। হয়তো অনুজ-মীনাক্ষীও বলবে কথা। তমাল তাই প্রতীক্ষায়।

“চলুন স্যর ট্রেন ঢুকে গিয়েছে।”

“ঢুকে গিয়েছে? চলো চলো... এই তোরা ওঠ।”

রতন-পঞ্চা এসেছে সঙ্গে। প্রতিশ্রুতি মতো টিকিট কেটেছে তমাল। ভাগ্যক্রমে মিলেছে রিজ়ার্ভেশনও। তবে দু’কামরা পরে। কামরা আলাদা হওয়ায় খুশিই হয়েছে তমাল। ছেলেদুটো যে কখন কী বিপদ ঘটিয়ে ফেলবে জানা নেই। অবশ্য এখনও পর্যন্ত পারফরম্যান্স ভালই। কুলির প্রয়োজন পড়েনি। না বলতেই স্বেচ্ছাসেবক।

ট্রেনে বসিয়ে বিদায় নিল রতন-পঞ্চা। মীনাক্ষী দু’চার কথা বলেই বিছানা পাতল সাইড লোয়ারে। অনুজও উঠে গেল সাইড আপারে। তমাল আগের মতোই পাশের কুপের সাইড লোয়ারে। মীনাক্ষী-অনুজ ঘুমিয়ে পড়তেই তমাল এসে দাঁড়াল দরজার ধারে। এক সময়ে খুলে দিল দরজা। টাটকা বাতাস এসে ঝাপটা মারল চোখে-মুখে। গ্রহণ করল বুকভরে।

‘হা ঈশ্বর!’

ধান্দায় ঘুরছিল রতন। পঞ্চা গিয়েছে অন্য দিকে। আচমকাই কানে বিশুদ্ধ বাংলা। অন্য সময় হলে গুরুত্ব দিত না। কত বাঙালিই তো ঘুরছে। কিন্তু তমাল দিয়েছে টিকিটের আশ্বাস, তাই মনে রয়েছে খোঁজ। সেই খোঁজেই পিছন ঘুরল। ঘুরতেই নজরে পড়ল এক সাধু। অনেকটাই তমাল যেমন বলেছিল। ভুল হোক বা ঠিক, ফোন করল তমালকে। অন্তত প্রমাণ তো করা যাবে চেষ্টা করছে।

দেরি করেনি তমাল। ফোন পেয়েই প্রায় দৌড় দিল। সাধু ততক্ষণে গণেশঘাট ছেড়ে উঠে পড়েছে। পিছু ছাড়েনি রতন। ফোনে জানাল, সাধু ঢুকেছে জুনা আখড়ায়। জুনা আখড়ায় পৌঁছে রতনকে খুঁজে পেল না তমাল।

“কোথায় তুমি? দেখতে পাচ্ছি না তো?”

“ব্রিজের নীচে আসুন।”

“ব্রিজ! এখানে আবার ব্রিজ কোথায়?”

“আপনি কোথায় আছেন বলুন তো?”

“কেন, জুনা আখড়ার ভিতরে।”

“কোন জুনা আখড়া? থানার উল্টো দিকে?”

“হ্যাঁ, এটাই তো জুনা আখড়া।”

“আরও একটা আছে, টেম্পোরারি। শুনুন, আপনি যেখানে আছেন সেটা জুনা আখড়া চক। ওখান থেকে স্টেশনের দিকে এগোলে পাবেন বাল্মীকি চক। আর এগোবেন না, তা হলে শিবমূর্তি চকে পৌঁছে যাবেন, মানে স্টেশনের সামনে। বাল্মীকি চক থেকে বাঁ দিকে ঘুরে একটু এগোলেই দেখবেন লালাতারা পুল। ওই পুলের নীচেই জুনা আখড়ার টেম্পোরারি আশ্রম। তাড়াতাড়ি আসুন।”

রতনের বর্ণনায় তমাল বিস্মিত। এই ক’দিনে যেন হাতের তালুর মতো চিনে ফেলেছে এলাকা। পেটের তাগিদে কত কী-ই না করতে হয় মানুষকে! বেশ কয়েক বার পুল পেরিয়ে ও পারে গেলেও, আখড়া তো চোখে পড়েনি! রতনের নিখুঁত পথনির্দেশে জুনা আখড়ার অস্থায়ী আশ্রমে পৌঁছে গেল তমাল।

আশ্রমে আরতি চলছে। পুলের নীচে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আশ্রম। দু’ভাগে বিভক্ত। আশ্রমের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে আরও একটা ছোট্ট পুল। তমাল এসেছে আরতির অংশে। একটা তাঁবুর ভিতরে বিভিন্ন মূর্তি। পূজারি আরতি করছে। অনেক সাধু দাঁড়িয়ে আরতি দেখছে, অনেকে নিজস্ব তাঁবুতে ধুনির সামনে বসে। নাগা ছাড়া অন্য সন্ন্যাসীও আছে। আখড়ায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু মোটা গুড়ির উপরে আশ্রম পতাকা। রয়েছে প্রয়াত সন্ন্যাসীদের স্মৃতিস্বরূপ তাঁদের অস্ত্র। রতনকে খুঁজতে-খুঁজতে তমাল দেখতে লাগল সাধুদের। এক সময়ে তাঁবুর মূর্তি ছেড়ে আরতি প্রদীপ নিয়ে পূজারি চলে গেলেন পতাকার নীচে, তার পর একটা বেদির সামনে। তমাল জানল, এ বার জুনা আখড়ার ইষ্টদেব দত্তাত্রেয়’র আরতির পালা। জুনা আখড়ায় যেমন দত্তাত্রেয়, নিরঞ্জনী আখড়ায় কার্তিক, অটল আখড়ায় গণেশ, মহানির্বাণী আখড়ায় কপিলমুনি, নির্মোহী আখড়ায় হনুমান... সব আখড়ারাই রয়েছে নিজস্ব ইষ্টদেব।

আরতি যেন বিভোর করে দিল তমালকে। আরতি শেষে যখন আগুনের আঁচ পোহানোর পালা এল সর্বসাধারণের, তখন হুঁশ ফিরল। ফোন করতে গিয়ে দেখল এগারোটা মিস্‌ড কল রতনের। ঢোল, ঘণ্টা, কাঁসরের শব্দে শুনতেই পায়নি!

“আপনি কোথায় বলুন তো স্যর?”

“এই তো ব্রিজের নীচে। আরতি দেখছিলাম।”

“আপনি কি আরতি দেখতে এসেছেন নাকি সাধু খুঁজতে?”

রতনের কথায় ভাষা জোগালো না তমালের।

“শুনুন, আরতির ওই তাঁবুর পাশ দিয়ে সোজা চলে আসুন। ছোট পুলের তলা পেরোলেই দেখবেন কিন্নর আখড়া। সামনেই দাঁড়িয়ে আছি আমি।”

কিন্নর আখড়ার সামনেই রতন দাঁড়িয়ে। ইশারায় জানাল, সাধু এখানেই আছেন। আখড়ার সামনে জনা পঞ্চাশেকের লাইন। সকলেই লছমিমাতার আশীর্বাদ পেতে উদ্‌গ্রীব। ভিতরে লছমিমাতা এক সাধুর সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। অনেকেই বিরক্ত। তমালের অকারণেই মনে পড়ল, ডাক্তারের চেম্বারে আচমকা মেডিক্যাল রিপ্রজ়েন্টেটিভরা ঢুকে পড়লে পেশেন্টদের বিরক্তি। টিনের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। জটাধারী এক সাধুর সামনে করজোড়ে বসে লছমিমাতা।

অবয়বে মিল খানিকটা আছে। কিন্তু কিন্নর আখড়ায় বাবা! বেরিয়ে যেতে চাইল তমাল। সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আর তো মোটে দেড় দিন। বাধা দিল রতন। বিশুদ্ধ বাংলা যখন বলেছে, হলেও তো হতে পারে। অনিচ্ছায় দাঁড়িয়ে গেল তমাল।

সাধু বেরোলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। বেরিয়েই দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মুখ দেখতে না পেলেও অবয়ব, চলনে আরও অনেকটাই মিল খুঁজে পেল তমাল। এবার শুনতে হবে গলার স্বর, ছুড়তে হবে মোক্ষম প্রশ্নবাণ। প্রয়োজন কোনও নির্জন স্থান। অনুমান ভুল হলে সাধু রেগে যেতে পারেন। অপমানও করতে পারেন ভিড়ের মাঝে। পিছু নিল তমাল। তবে ছেড়ে দিল রতনকে। সামান্য হলেও বিক্রি বাকি। লাভ নেই বেচারার ক্ষতি করে। তা ছাড়া সাধুর মুখোমুখি হতে হবে তো একাই।

সাধু ঢুকলেন থানার সামনের জুনা আখড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। তমাল অপেক্ষায় সিঁড়ির মুখে। মনে আশঙ্কা, বেরোবার আর কোনও পথ নেই তো? মিনিট পনেরোর মধ্যেই নেমে এলেন সাধু। দ্রুত হাঁটতে লাগলেন আবার বাল্মীকি চকের দিকে। আচমকাই ঢুকে পড়লেন বাঁ দিকের গলিতে। তমালও ঢুকল। গলিটা খানিক গিয়েই মিলেছে গঙ্গা পারাপারের ব্রিজে। ব্রিজে উঠলেন সাধু। তমালও উঠল। সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে ব্রিজ তাই নির্জন। মনস্থির করে ফেলল তমাল।

"মহারাজ..."

ঘুরে দাঁড়ালেন অবধেশ মহারাজ।

হালকা আলোয় স্পষ্ট নয় মুখ। স্পষ্ট নয় ঘন গোঁফের আড়ালে আঁচিলও। তবুও মুখে মিল খুঁজে পেল তমাল। ছুড়ল লক্ষ্যভেদের প্রশ্নবাণ, "পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন?"

"জো পুছনা হ্যায় হিন্দি মে পুছিয়ে।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই তমালের। হালকা আলোতেও সাধুর চমক, গলার স্বর, চোখের বিহ্বলতা সব উত্তর দিয়ে দিয়েছে। কঠিন, আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল, "আপনি তো কোনও দিন মিথ্যে বলেননি। তা হলে আজ সাধু হয়ে মিথ্যে বলছেন কেন?"

"আজ ম্যায় জ়রা জলদি মে হুঁ। আপকো জো কুছ পুছনা হ্যায় ফির কিসি দিন পুছিয়ে," নিজেকে সামলে নিয়েছেন যাদব। কিছুতেই ছেলেকে টের পেতে দেওয়া যাবে না মনের উথালপাথাল। চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। বয়স বাড়লেও হারায়নি সারল্যমাখা মুখ। তবুও চলবে না ধরা দেওয়া। পিছন ঘুরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। বাইপাস পেরিয়ে যেতে হবে কনখল। সত্যিই সময় বেশি নেই।

তমালও চলল পিছু-পিছু। বলল, "তাড়া আমাদেরও আছে। কাল বাদে পরশু আমাদেরও ফিরে যেতে হবে। একটু দাঁড়ান... শুনুন আমার কথা।"

দাঁড়ালেন না যাদব। ভাল করেই জানেন, দাঁড়ানো মানেই থেমে যাওয়া। থামিয়ে দেওয়া এত দিনের সাধনা।

পিছু ছাড়ল না তমাল। বুঝতে পারল না, অনেক চেষ্টা করেও কেন 'তুমি' বলতে পারছে না? কেন পারছে না 'বাবা' বলে ডাকতে? দূরত্ব, অদেখা পাল্টে দেয় সম্বোধনও!

॥ ২৬ ॥

"স্যর..."

"তুমি!"

"দেখতে এলাম আপনাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।"

"না না, কোনও অসুবিধে নেই। তুমি শুতে যাও।"

"দরজা খুলে এই হাওয়ার মধ্যে দাঁড়াবেন না স্যর। যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।"

"আজ অনেক দিন পরে বাতাস অনুভব করছি রতন। করতে দাও।"

"স্যর, ওই সাধু কি খারাপ কিছু বলেছে?"

আকাশের দিকে তাকাল তমাল। আজ জ্যোৎস্নারাত নয়। তবে একদিন জ্যোৎস্নারাতেই ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথকে দাহ করে ফিরছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই রকমই ট্রেনে চড়ে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। কবির মনে হল, আমার শমীর জন্য কিছুই তো থেমে নেই। তা হলে প্রকৃতির শরিক হয়ে আমারও তো থেমে যাওয়া চলে না। সৃষ্টি হল অমরগীতি, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন মাঝে'...

কবিকে সযত্নে লালন করেছিল প্রকৃতি। আনন্দ, বেদনা দুই-ই দিয়েছিল উত্তরণের স্বার্থে। হয়তো বুঝতেন কবি। তাই থেমে যাননি, হারিয়ে ফেলেননি নিজেকে। সাধারণ আর অসাধারণের ফারাক থেকেই যাবে চিরকাল। সকলেই হবে না প্রকৃতির আদরের ধন।

ব্রিজ পেরিয়ে ঘাটে নেমেছেন সাধু। হাঁটছেন দ্রুত পায়ে বাইপাসের দিকে। অন্য উপায় না পেয়ে পথ রোধ করল তমাল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন যাদব। পরিষ্কার বাংলায় বললেন,
"কী চাও?"

"একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।"

"কথা মানে তো চোর কি চোর নই, তাই তো? চোর না হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইবে আর চোর হলে থুতু দিতে-দিতে ফিরে যাবে।"

তমাল ভেবেছিল লক্ষ্যভেদের প্রশ্নবাণেই ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু নিজের দিকেও যে প্রশ্নবাণ ধেয়ে আসতে পারে ভাবেনি। সরাসরি কথা জোগাল না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"অত দূর থেকে যখন এসেছ, তখন তোমাকেই প্রথম সত্যিটা বলি। চোর আমি নই। আশা করি বিশ্বাস করবে যে, এখন সত্যি মিথ্যেয় আমার আর কিছু যায় আসে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ, তাতে সফল হলে, এ বার যেতে দাও আমাকে।"

"আমরা সেই জন্য আসিনি।"

"তবে কেন এসেছ?"

কী বলবে বুঝতে পারল না তমাল।

তমালকে বুঝতে অসুবিধে হল না যাদবের। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যে সত্যিকে এত দিন আড়াল করে রেখেছেন, সেই সত্যিই শুনতে চাইছে তমাল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বভরা মনে তাকালেন স্রোতস্বিনী গঙ্গার দিকে। ভেসে গেলেন টিকরবেতায়।

"এটা কিন্তু আপনি ঠিক কাজ করলেন না।"

"সব সময় আমি যে ঠিক কাজই করব, এমন কথা তো আমি কাউকে দিইনি।"

"তা বলে আপনি দাদার চাকরিটা খেয়ে নেবেন?" গলা তুলে প্রশ্ন করেন সুদেব।

"অসুবিধে কী? তোমার দাদা বলে না যে, লয় না হলে সৃষ্টি হয় না। এবার নতুন মাস্টার আসবে, নতুন করে গড়ে তুলবে ছাত্রদের। বলা যায় না, তোমার দাদার চেয়ে আরও ভাল করেই হয়তো স্কুল চালাবে," মহিমের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি।

"এটা অন্যায়, আমি সকলকে জানাব।"

"আমি তোমাকে একটা ঢ্যাঁড়া কিনে দেব। সেইটে পিটিয়ে সারা গ্রামে জানিয়ো। সঙ্গে এটাও জানিও, টাকাটা তুমিই তোমার দাদার ঘরে রেখেছিল," মহিমের সাবলীল প্রস্তাব।

"আমি যদি জানতাম আপনি দাদার চাকরি খেয়ে নেবেন তা হলে ওই জঘন্য কাজ কখনওই করতাম না।"

"করেই যখন ফেলেছ তখন আর আফসোস করে লাভ কী? কথাটা জানাজানি হলে আমি তো নিজেকে সামলে নেব। কিন্তু তুমি? সারা গাঁয়ের লোক তোমার গায়ে থুতু দেবে। বাড়ি থেকে, এমনকি ব্যবসা থেকেও বিতাড়িত হতে পারো। তখন বৌ-ছেলে নিয়ে খাবে কী?"

"আমি আপনার পায়ে পড়ছি মহিমবাবু, দাদার চাকরিটা আপনি ফিরিয়ে দিন।"

"লয় হয়ে গিয়েছে সুদেব, এবার গড়ার পালা। আর কথা বেশি বাড়িয়ো না। কে কখন দেখে ফেলে..."

কেউ না দেখলেও শুনে ফেলল এক জন। আধো-অন্ধকার কুশেশ্বর শিব মন্দিরের এক কোণে শুয়ে সব কথাই কানে গেল যাদবের।

"মেজকাকা!"

"সুদেব আমারই মতো পড়াশোনায় ভাল ছিল। স্বপ্ন দেখত কলকাতায় গিয়ে বড় চাকরি করার। আমি চাইলেও বাবার সম্মতি ছিল না। সকলে বেরিয়ে গেলে পারিবারিক ব্যবসা চলবে কী করে? থামিয়ে দিলেন সুদেবের পড়াশোনা। আঘাত পেয়েছিল সুদেব। তাই মা-বাবা মারা যাওয়ার পরে শোধ তুলল আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করে," একদমে বলে গেলেন যাদব।

"কিন্তু আপনি চলে আসার পরে মেজকাকাই তো মাকে ব্যবসা বুঝতে সাহায্য করেছিল! যত দিন বেঁচে ছিল আগলে রেখেছিল আমাদের। প্রাপ্য দিয়েছিল কড়ায়-গন্ডায়," বিস্মিত তমাল।

"কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে অনেক সময়ই উদারতা আসে অথবা অশুভ কার্যসিদ্ধিতে হয় প্রায়শ্চিত্তের আকাঙ্ক্ষা। তবে আমি অনেক দিনই ক্ষমা করে দিয়েছি ওকে। প্রতিহিংসায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারায়। আজ জানলাম ও নেই। সারা জীবন যে অনুতাপ নিয়ে কাটিয়েছে বুঝতে পারছি। তবে ওর সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। লজ্জায়ও ফেলতে চাইনি ওকে," নির্লিপ্ত অবধেশ মহারাজ।

"ভাইয়ের উপর অভিমান করে সংসার ত্যাগ করলেন?"

"অভিমান এখন না থাকলেও, তখন তো ছিলই। সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, ভালবাসার দাম দিল না কেউ? চেনা মানুষটাকে চোর ভাবতে এতটুকুও দ্বিধা হল না কারও? মনে হল, এ আমি কোথায় আছি, কাদের মধ্যে আছি? তোমাদের কথা যে ভাবিনি তা নয়। তবে ছোটবেলা থেকেই তো শুনে এসেছ, জিভ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনিই। সেই ভরসায় ঘর ছাড়লাম। ভুল করিনি বোধহয়।"

"এক বারও মনে পড়েনি আমাদের কথা? মাথার উপর থেকে বটগাছ সরে গেলে কী হয় ভাবেননি এক বারও? এতটা স্বার্থপর আপনি?"

"আমি স্বার্থপর? এই যে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত-ভূমিকম্প হয়, তখন ভাবো প্রকৃতি স্বার্থপর? ভাবো না। ভাবো, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। নিয়মই বটে। কিন্তু সেই নিয়মকে তরান্বিত করেছ তোমরা। প্রকৃতি ধ্বংস করে নির্মম হতে বাধ্য করছ প্রকৃতিকে। যেমনটা আমাকে করেছিলে।"

রূঢ়ভাষণে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে তমালের। অতিকষ্টে বলল, "আপনাকে ফিরে যেতে বলবার সাহস আমাদের নেই। আমরা আসিওনি সেই জন্য..."

"তবে কেন এসেছ?"

"একবার দেখতে..."

অট্টহাসি হাসলেন যেন যাদব। আচমকা হাসি থামিয়ে বললেন, "শুধু দেখতে ছুটে এলে এত দূর?"

"না মানে..."

"পরিষ্কার করে বলো, কেন এসেছ এত দিন পরে?"

"আগে আপনি বলুন, আমরা যে এসেছি, আপনার জন্যই এসেছি,

ভাল লাগেনি আপনার?”
থমকে গেলেন যাদব। এ এমন এক সত্য যা স্বীকার করা চলে না, আবার চেপে রাখাও কঠিন।
“দেখো, আমার হাতে সময় বেশি নেই। আগামী কাল ভোরেই আমাকে রওনা হতে হবে। তাই আর বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়।”
“তাড়িয়ে দিতে চাইছেন? একটা কথা জানবেন, আপনার এই সন্ন্যাসজীবন যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি আমরা আপনার সন্তান। পরের সত্যির জন্য আগের সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না। বেশি তো কিছু চাইছি না আপনার কাছে। এত কষ্টে আপনার দেখা পেলাম, তাড়িয়ে না দিয়ে দশটা মিনিট কী দেওয়া যায় না? কিছুই বলতে বা শুনতে হবে না আপনাকে। শুধু একটু বসুন পাশে।”
যাদব বুঝতে পারছেন জড়িয়ে যাচ্ছেন জালে। মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু পারছেন কই? স্মৃতিঝাঁক এসে শরীর যেন অবশ করে দিচ্ছে। অনিচ্ছায় দিয়ে ফেলছেন প্রশ্রয়। যন্ত্রের মতো বসে পড়লেন ঘাটের সিঁড়িতে।
নির্জন, আধো-অন্ধকার গঙ্গাতীরে বসে দু'টি মানুষ। নির্বাক, নিশ্চুপ। একে অপরের এত চেনা অথচ লাগছে অচেনা। স্রোতের মতো আসছে কথারা, খুঁজে পাচ্ছে না উৎসমুখ।
“তোমার বোন কী করে?”
“একটা বড় কোম্পানিতে সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।”
“আর তুমি?”
“খবরের কাগজের জার্নালিস্ট।”
“তোমার মা?”
‘বলিস, আমি মরে গিয়েছি...’ বলতে পারল না তমাল। কোনও রকমে বলল, “ভাল আছে।”
উঠে পড়লেন যাদব। তমালের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, “এবার সত্যিই যেতে হবে আমাকে। আশীর্বাদ করি মঙ্গল হোক তোমাদের।”
“দুটো অনুরোধ করব, রাখবেন?”
ভ্রু কুঁচকে তাকালেন যাদব।
“একবার বাবা বলে ডাকতে দেবেন?”
হঠাৎ যেন প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হলেন যাদব। অসাড়, জড়বস্তু।
“বাবা...”
আচমকা জলপ্রপাত যেন। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল প্রস্তরখণ্ড। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক জ্যোতির্ময় অমৃতপুরুষ। স্নেহমাখা চোখ, প্রশান্ত মুখ, দু'হাত প্রসারিত। আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন অমৃত-পুত্রর সঙ্গে।

॥ ২৭ ॥

“এক জন সাধুর খোঁজ পেলাম।”
“কোথায়? কে দিল?”
“ওই যে সে দিন দু'জন কমবয়সি সাধুকে দেখলি না, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল, ওরাই দিল। সাধু নাকি যা বলে সব ফলে যায়। লোকে তাই নাম দিয়েছে সাচ্চিবাবা,” তমাল উৎসাহের সঙ্গে বলে।
“ওই দু'জনকে আমার মোটেও ভাল লাগেনি, তাই ভরসাও হচ্ছে না,” বিরক্তি গোপন করল না মীনাক্ষী।
“এক বার গিয়ে দেখতে তো ক্ষতি নেই। আজ রাত আটটায় সাধু অলকানন্দা ঘাটে যজ্ঞে বসবে।”
“আজ! আজ তো সাড়ে এগারোটায় ট্রেন।”
“অসুবিধে নেই। ঘাটটা বেশি দূরে নয় আর হোটেল থেকে স্টেশন তো কাছেই,” তমাল আমল দিল না মীনাক্ষীর আপত্তি।
“না রে দাদা, আর ভাল্লাগছে না। অনেক তো হল...”
“এত দিন তোর কথামতো চলেছি। আমার একটা কথা অন্তত রাখ...”
“ইয়েস, দাদা ইজ় রাইট। চান্স নেওয়া উচিত। উই মাস্ট মিট সাচ্চিবাবা,” অনুজ উত্তেজিত। পৌঁছতে চায় ক্লাইম্যাক্সে।
“বেশ, তোরা বলছিস যখন...”
“তবে একটা কন্ডিশন আছে।”
ভ্রু কুঁচকে তাকাল মীনাক্ষী।
“শাড়ি পরে যেতে হবে। জিন্স-টিন্স ওই সাধু একদম পছন্দ করেন না,” তমাল জানে মীনাক্ষীর বাসনা। বাবাকে পেলে শাড়ি পরে পুজো দিত মনসা মন্দিরে। অনুজের জন্যও এনেছে পাঞ্জাবি। হর কি পৌড়ির পাশে পাহাড়ের উপর মনসা মন্দিরে হেঁটেও ওঠা যায়, যাওয়া যায় রোপওয়েতেও।
“ইমপসিবল! শাড়ি পরে আমি ট্রেনে যেতে পারব না।”
“হোটেলে ফিরে চেঞ্জ করে নেবে,” অনুজের সহজ সমাধান।
“যাওয়ার সময় অত হ্যাপা পোষায়? প্লিজ় দাদা, ড্রপ দ্য প্ল্যান।”
“ব্লাইন্ড গেমের শেষ তাসটা আমাকে তুলতে দিবি না?” তমালের আবেগঘন প্রত্যাশা।
“প্লিজ় মিনু, উই মাস্ট রেসপেক্ট দাদাজ় চয়েস।”
মাথা নিচু করল মীনাক্ষী।
“তুমিও পাঞ্জাবিটা পরে নিয়ো অনুজ। দু'জনের একটা ছবি তুলে দেব।”

“সাচ্চিবাবা!”
অলকানন্দা ঘাটে পৌঁছে অনুজের বিস্ময়। নিরঞ্জনী আখড়ার ওপারে অলকানন্দা ঘাট। ঘাটের পিছনের উঁচু জায়গায় একটা গাছের নীচে ধুনি জ্বালিয়ে যজ্ঞে মগ্ন এক সাধু। একেবারেই একা। শুধু একটা কুকুর অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। গঙ্গার কুলকুল, সাধুর মন্ত্রোচ্চারণ, আগুন, ধোঁয়া, আধো-অন্ধকার, যেন এক অন্য পৃথিবী। রহস্যাবৃত, মায়াময়।
তিন জনে বসল সাধুর সামনে। ভ্রুক্ষেপ নেই সাধুর। করে চলেছেন উদাত্ত কণ্ঠে শুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ। বেশ কিছু ক্ষণ পরে তাকালেন মীনাক্ষীর দিকে। ইশারা করল তমাল। আগেই বলে দিয়েছে প্রশ্ন করতে হবে হিন্দিতে।
“হামলোগ আপনে বাবাকো মিল পায়েঙ্গে?”
মাথা নাড়লেন সাচ্চিবাবা।
“কিঁউ? ও ইস দুনিয়া মে নেহি হ্যায়?”
আবার মাথা নাড়লেন সাচ্চিবাবা।
আর কী প্রশ্ন হতে পারে ভেবে পেল না মীনাক্ষী।
“বাবা, ইয়ে মেরি বহেন অউর ওহ হামারা হোনেওয়ালা দামাদ। আপ দোনো কো আশীর্বাদ দিজিয়ে বাবা,” মীনাক্ষী থেমে যেতেই হাল ধরল তমাল।
দু'হাত প্রসারিত করলেন সাচ্চিবাবা। ইশারায় মীনাক্ষী-অনুজকে ধরতে বললেন দু'টি হাত। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত ধরল দু'জনে। দু'জনের হাতের উপর নিজের হাত রেখে সাচ্চিবাবা নিয়ে এলেন আগুনের উপর। শুরু করলেন উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ। খানিক বাদে থেমে গেল মন্ত্রোচ্চারণ। দু'জনের হাত ধরে বন্ধ চোখে বিড়বিড় করতে লাগলেন সাচ্চিবাবা। এক সময়ে ছেড়ে দিলেন। তমাল দু'জনকে ইশারা করল প্রণাম করতে। চোখ মেললেন সাচ্চিবাবা। দু'জনের মাথায় হাত রেখে আবার শুরু করলেন বিড়বিড়। আশীর্বাদ শেষ হলে প্রণাম করল তমাল। পেল আশীর্বাদ।

রাত তিনটে পেরিয়ে গিয়েছে। ট্রেন ছুটছে দুরন্ত গতিতে। পেরিয়ে গিয়েছে লক্সর, মোরাদাবাদ স্টেশন। একটাও লোক ওঠেনি। তমাল দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। বুকভরে টানছে বাতাস। বাতাসে বাবার স্পর্শ, গন্ধ।
“আনন্দে আছ তো?”
“তোমাকে ছাড়া আনন্দ...”
“ভুলে গিয়েছ কী শিখিয়েছিলাম?” ভ্রু কুঁচকে যাদবের প্রশ্ন।
মাথা চুলকোয় তমাল।

“মানুষ বা বস্তুর বিনিময়ে নয়, নিজেই নিজেকে আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা রপ্ত করতে হবে।”

“লিখে কিছুটা আনন্দ পাই...”

“খুব ভাল। একটা উপন্যাস লেখো। আনন্দ বৃদ্ধি পাবে,” মৃদু হাসি যাদবের মুখে। আনন্দময় জীবনই তো কাম্য।

“তোমাকে নিয়ে লিখব?” অভাবনীয় ভাবনায় উজ্জীবিত তমাল।

“মন চাইলে লিখতে পারো। তবে জীবনস্মৃতি যেন না হয়।”

বাবার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে কনখলের আশ্রমে। কত কথা, কত স্মৃতি রোমন্থন। আশ্রমে পৌঁছেও ফিরে আসতে মন চাইল না তমালের। আপত্তি করল না বাবাও। ভাবের আদানপ্রদানে কাটল রাত। যেন দুই বন্ধু, মিলেছে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে। ভোর রাতে আবার বেরিয়ে পড়া। সেই ছোটবেলার মতো হাতে হাত ধরে কনখল থেকে হরিদ্বার বাস স্ট্যান্ড নয়, অজয় বাঁধ ধরে হাঁটা যেন। দু'জনেই গাইছে ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে...’ তারাভরা নির্মল আকাশের নীচে যেন এক অলীক পথচলা। বিস্ময়ে তাকিয়ে লুব্ধক, কালপুরুষ, চিত্রা, স্বাতী, রোহিণী, অরুন্ধতী, শ্রবণার সঙ্গে আরও অনেকে।

মাঝে ফোন এসেছিল মীনাক্ষীর। তমাল জানিয়েছিল, ভজনের আসরে বসেছে, শেষ না হলে উঠবে না। বাবা কথা দিয়েছিল, যেমন করেই হোক ফিরে আসবে পরদিন। ইচ্ছে করেই তমাল সময় ঠিক করেছিল রাত আটটায়। ফেরার তাড়ায় মীনাক্ষী যেন কিছু ভাববার সুযোগ না পায়।

বাবার কথায় তমাল বুঝেছিল, কোনও ভাবেই আর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। পদ্ম পাঁকে ফোটে। সেই পদ্মই যখন অর্পিত হয় দেবতার চরণে তখন আর পাঁকে ফেরার উপায় থাকে না। দেবতার সঙ্গেই বিসর্জিত হয় পবিত্র গঙ্গায়। তাই এক বারও অনুরোধ করেনি ফিরে যাওয়ার। বরং শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করেছে সঙ্গ।

“দাদা, ওঠ চা খাবি তো?”

ধড়মড় করে উঠে বসল তমাল। বেলা সাড়ে দশটা প্রায়। ট্রেন থেমেছে সুলতানপুর স্টেশনে। চা খেল তমাল। মীনাক্ষীর মুখ এখনও থমথমে। অনুজ বোধহয় চেষ্টা করেও স্বাভাবিক করতে পারেনি। চা খেয়ে আবার দরজার কাছে গেল তমাল। বাতাসে বাবার স্পর্শ, গন্ধ।

“এখনও দাঁড়িয়ে আছেন স্যর! ঘুমোননি?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি।”

“পরের স্টেশন বেনারস স্যর। সেই যেখানে আপনাকে পেয়েছিলাম,” রতন আপ্লুত।

ম্লান হাসল তমাল।

“আপনার কোনও উপকারে কি আসতে পারলাম স্যর?”

উত্তর দিল না তমাল। হাত রাখল রতনের পিঠে।

“আসানসোলে নেমে যাব। ফোন করব মাঝে মাঝে। বিরক্ত হবেন না তো?

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল তমাল।

বেনারসে ট্রেন থেমেছে। লোক নামলেও ওঠেনি প্রায় কেউ। ট্রেন হাওড়া পৌঁছবে রাত তিনটের পরে। কে আর নামতে চায় অন্ধকার শহরে?

ট্রেন ছাড়তেই উৎসুক হল তমাল। কোথায় দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, হরিশচন্দ্র ঘাট? আসা হয়নি, হয়তো আসবে কোনও দিন।

“দাদা...”

ঘোর কাটল তমালের। সামনে মীনাক্ষী।

“একটা সত্যি কথা বলবি?”

চেয়ে রইল তমাল।

“ওই সাধুই আমাদের বাবা, না?”

উদাস দৃষ্টিতে বোনের মাথায় হাত রাখল তমাল। ডুকরে কেঁদে উঠল মীনাক্ষী। কান্না চাপতে মুখ গুঁজল তমালের বুকে।

বোনের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে ভয় হল তমালের। প্রকৃতির নিয়মেই নারীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর। তবে কি বুঝে ফেলল, বাবা দিয়েছে আশ্রমের ঠিকানা?

ঝমঝম শব্দে রাজঘাট ব্রিজ পেরোচ্ছে ট্রেন। নীচে বহমান গঙ্গা। আকাশ-বাতাস দিচ্ছে ডাক। বুকভরে শ্বাস নিল তমাল। উঠে এল, আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে...

শিল্পী: অসীম হালদার

ফেলে আসা ঘর, উঠোন, গাছ, আশ্রয়

যা হারিয়ে যায়

ঈশানী দত্ত রায়

কী হারাল?

নাকছাবিটি। হলুদ বনে।

না। হলুদ বনে বনে। তা না হলে হারানোই হত না।

শুধু কি নাকছাবি?

না।

তবে?

কত কিছুই যে হারায় গোটা জীবনে। মন, বই, জীবন, সততা, মূল্যবোধ, ছাতা...

ভাবুন, রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচাবে, সেই আশ্রয়টাই আপনি হারিয়ে ফেললেন, ফেলে এলেন গাড়িতে, বাসে। রোদটি লাগল, বৃষ্টির ফোঁটাটি গায়ে পড়ল, মনে হল, এই রে!

সততা, মূল্যবোধের অবশ্য সে বালাই নেই। এক বার হারিয়ে ফেললেন তো গায়ে বিশেষ কুটকুট করবে না এক সময়ে। মুখ অনায়াসে বলবে, পরিস্থিতির চাপে করতে হল। কখনও আবার মুখ বলবেই না। কোনও তরঙ্গই পৌঁছবে না মস্তিষ্কে। কারণ, বোধ তখন একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা করেও তাকে আর পাওয়া যাবে না।

আপনি তখন অনায়াসে বলতে পারবেন, গাড়ির চাকায় কুকুরছানা মারা গেলেও তো দুঃখ হয়, বলতে পারবেন ইঁদুর মরলেও সিবিআই চাইছে।

একটি অ্যাপ ক্যাব সংস্থা তাদের বাৎসরিক হারানোর হিসেব কষে জানিয়েছে, যাত্রীরা কত কিছুই যে হারিয়ে ফেলেন গাড়িতে! মিষ্টি, স্টিকার, জন্মদিনের কেক, আম, আধার কার্ড, কলেজের সার্টিফিকেট, ক্রিকেট ব্যাট ইত্যাদি বেমালুম ভুলে তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। সাধারণত শনিবার ঢিলেঢালা মেজাজে গাড়িতে তাঁরা ফেলে যান জামাকাপড়, সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন, বুধবারে তাঁরা গাড়িতে ফেলে আসেন ল্যাপটপ, রবিবার জলের বোতল হারানোর দিন। সোমবার হারিয়ে যায় হেডফোন। শুক্রবারও হেডফোন হারানোর দিন।

ছোটবেলায় অবশ্য রোজই হারানোর দিন ছিল।

পেনসিল, পেন, চুলের ক্লিপ, জলের বোতল, টিফিন বক্স— সব ছোটবেলাই এগুলো হারায়। স্কুলে, রাস্তায়, কোথায় কে জানে! কে নেয়! নিক গে, তারা পেল, নাকি পেয়ে হারাল! একটা ছোট ক্লাসরুমে হারালই-বা কী করে, খেলতে গিয়ে চুলের ক্লিপ পড়ে গেল হয়তো-বা মারামারি করতে গিয়ে। কিন্তু জলের বোতল, টিফিনের বাক্স? কে জানে। ভুলো মন। ফেলে এসেছে ক্লাসের কোন কোণে, ফেলেও দিতে পারে ইচ্ছে করে। অনেকেই বলে, আমরা যা মনে রাখতে চাই না, তাই ভুলে যাই। এই হারানোর কিছুটাও হয়তো ইচ্ছে করে। যাতে বড়বেলায় মনে পড়ে, ছোটবেলায় এই এই হারিয়ে ফেলেছিলাম। ছোটবেলাটাই হারিয়ে ফেললাম।

হারিয়ে যায় ছোটবেলা। নাকি শুধুই স্মৃতি-বিলাস

বড় হতে গেলে ছোটবেলা হারাতে হয়।

পুরোটা?

হয়তো।

হয়তো পুরোটা নয়।

খেলা-খেলা-খেলা, গরমের ছুটি, গল্প-গল্প-গল্প, সরলতা, ঈষৎ পক্ব হওয়ার দিন, দেদার বন্ধুত্ব, স্কুলে হনুমান ঢুকে পড়লে দৌড়নো, সুজি-বিস্কুট, নারকোল-বিস্কুট, ঘাসে গড়াগড়ি, সোঁদা গন্ধ, কত কিছু হারিয়ে যায়।

বন্ধুরা সবাই হারায় না, কেউ কেউ থাকে। পুরোটাই নিয়ে। আবার অনেকেই থাকে, বন্ধুত্ব থাকে না।

না থাকা কি দোষের?

না, তা কেন, বয়স বাড়লে মনটাও অন্য রকম হয়, তখন সবার মন, চেতনা, ভাল লাগা যে এক সুরে বইবে তা তো নয়, তা এক তালে বাজতে না-ই পারে।

কিন্তু এই বড়বেলা জুড়ে হারাই হারাই ভাব। ডাকনাম, পুরনো মিষ্টি, লজেন্স, পাউডার, সাবানের বিজ্ঞাপন, পুরনো খেলা, সব কিছুর ছবি খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসা, যা আমরা হারিয়েছি।

এমন তো নয় যে, আমাদের সবাই এগুলো হারিয়ে খুব দুঃখে রয়েছি। আধুনিক জীবনের অনেক কিছুই আমরা ভোগ ও উপভোগ করছি, তবু সুখ নেইকো মনে?

নাকি জটিলতা এড়াতে চাই বলে পিছন ফিরে তাকানো, যখন সব কিছু 'সহজ, সরল' ছিল? অন্তত আমাদের তাই মনে হয়। কিন্তু ততটাই কি সরল ছিল আমাদের বাবা-মায়ের জীবন? আমাদের জীবন সরল রাখার জন্য তাঁদের জীবন ততটাই জটিল ছিল। আমাদের 'ছোট্ট গোল রুটি, চলছে গুটি গুটি'র পিছনে তাঁদের প্রতি দিন পয়সা গুনে গুনে সংসার চালানো ছিল। ফুলপ্যান্ট, শাড়ি সেলাই করে পরা ছিল। তবু তাঁরাও কখনও বলে ওঠেন, তোরা কেন তাড়াতাড়ি বড় হলি? ছোট থাকলেই হত।

ছোট ছোট হাতে জড়িয়ে ধরা হারিয়ে গিয়েছে বলে? হবে হয়তো।

আবার অনেকে বড় হয়ে বড়বেলা হারিয়ে ফেলেন, ছোটবেলা থেকে যায়। অ্যালবামে নয়, জীবন জুড়েই। বছর খানেক আগে শহরতলিতে দেখা মিলেছিল এক বৃদ্ধার। তিনি সব ভুলে গিয়েছেন, শুধু মনে রয়েছে স্কুলের নাম। তাঁর মন, স্মৃতি, জীবন জুড়ে শুধু রয়ে গিয়েছে ওই স্কুলের নাম। বাকি সব বিস্মরণ।

আর বাকিরা তো সারা জীবন ধরে অনেক শব্দ হারিয়ে ফেলি, কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী সামাজিক জীবনে। 'বড় আকিঞ্চন তোমার লাগি' রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, সেই আকিঞ্চন শব্দটি কি রয়েছে আমাদের জীবনে, নাকি সেই আকুলতাই নেই আর? মানুষের জন্য, শব্দের জন্য?

হিরাইফ (Hiraeth) একটি ওয়েলশ শব্দ, যা আমাদের না-দেখা বাড়ি, না-দেখা বাসার জন্য আকুতি, যা আমরা কোনও দিন চোখেই দেখিনি, অথচ সেই না-দেখার জন্য আমাদের আকুতি। বাঙাল মাত্রেই জানেন, তাঁদের বংশানুক্রমে ব্যঙ্গ হজম করতে হয়। তা হল, প্রত্যেক উদ্বাস্তুরই নাকি এত জমি, বাগান, পুকুর ছিল যে, সব যোগ করলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোট আয়তনের কয়েক গুণ বেশি হয়। 'দ্যাশে আমাগো এত আসিল' এমন কথা শোনা অবাস্তব নয়, কিন্তু মনে হয়, আমরা যা ফেলে আসি, বা যা ছাড়তে বাধ্য হই, তা কি আমাদের প্রত্যেকের মনেই খুব বড়, খুব বেশি বড়, খুব বেশি ভাল হয়ে থাকে না! ধরা যাক, ছোটবেলায় মামাবাড়ির বাগানটা বিরাট মনে হত, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ, তারও পরে আরও গাছ, বাগান ঘুরে ফুল তোলা একটা অন্য রকম ব্যাপার ছিল, বড় হয়ে দেখলাম, সেই বাগানটা তো তেমন বড় নয়। আর সব ফেলে, প্রাণ হাতে করে যাঁদের চলে আসতে হয়, নিজের বাড়ি ছেড়ে থাকতে হয় দু'ফুট রোদ্দুর নিয়ে কোনও কলোনিতে, তাঁদের পৃথিবীটাই এক লহমায় ছোট আর নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে, ফেলে আসা কুটিরও তো বড়।

জীবনকে তাড়া করে ধ্বংসস্তূপ

বড়। কারণ, তা নিজের বাসা।

বড়। কারণ, তা হারিয়ে গিয়েছে।

বড়। কারণ, তা রয়েছে শুধু স্মৃতিতে। আর স্মৃতির কোনও মাপ নেই, তা নিজের ইচ্ছেমতো ছোট হবে, বড় হবে, মিলিয়ে যাবে, বেঁচে থাকবে।

বড়। কারণ, তা নিত্য উচ্ছিষ্ট আর অপমানের বিরুদ্ধে অক্ষম ঢাল।

বাঙালের ক্লাব আর ট্রফি জেতে না। ক্লাবের একশো বছরে তৈরি ভিডিয়ো দেখতে দেখতে ৮০ বছর কেঁদে ওঠেন, বলেন, ক্লাব তো মাঠে নেই, ক্লাব তো আমাদের মনের মধ্যে।

যা হারিয়ে যায়, তা মনের মধ্যে থাকে। স্মৃতি ইতিহাস তৈরি করে।

হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, সাদা পরিচ্ছন্ন টগরের ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা ফোন করতে করতে কাঁদছেন, এক পুরুষও ফোনে, নাক-চোখ লাল। বাইরের রাস্তা, চত্বর উদাসীন, চঞ্চল, কর্মব্যস্ত, কর্তব্যে নিয়মনিষ্ঠ।

কী হারাল? হারিয়ে গেল চিরকালের মতো?

যার হারাল, সে-ই জানে।

'আগলে বসে রইব কত আর'।

স্কুলে এক বন্ধু গান গাইতে বললেই গাইত, মধুর আমার মায়ের হাসি। ছোটবেলায় সে মাকে হারিয়েছিল। আমরা তখনও যারা মাকে হারাইনি, তারাও কাঁদতাম, হারিয়ে ফেলার ভয়ে, বন্ধুর দুঃখে। তেমন 'বাঁশবাগানের মাথার উপর' গানটিও মনে হয়, বেশ কয়েকটা প্রজন্মের সামগ্রিক হারানোর গান। হারানোর ভয়ের আকুলতার গান। 'শোলোক বলা কাজলাদিদি' জীবনে থাকুন বা না-ই থাকুন, কাউকে হারিয়ে ফেলার, ছোট্ট হৃদয়ের হারানোর অক্ষরমালা।

তারারা সে সব জানে।

জানে সেই মেয়েটি। যার স্বামী অকস্মাৎ এক দিন হারিয়ে যান। প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন, ছেলেরা, ভাই, পাড়ার লোক খুঁজে আনত। এক দিন আর পাওয়া গেল না। একটা গোটা মানুষ হারিয়ে গেল। কোথায় গেল? খোঁজ মেলেনি। তাই অপেক্ষায় রয়েছে। অন্তত ১৫ বছর পার হয়ে গিয়েছে।

জানে সেই মেয়েটি। তিরিশ বছর বয়সে স্বামী মারা যান, অকস্মাৎ, দেশভাগের পরে। বছর কয়েকের মধ্যেই শিশুপুত্র। একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ঈশ্বর ভক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের গান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

রূপা মোদীও জানেন, হারিয়ে যাওয়া কাকে বলে। গুজরাত দাঙ্গার সময়ে গুলবার্গ সোসাইটির বাসিন্দা এই পার্সি পরিবারের ছেলেটি হারিয়ে যায়। আর তাকে পাওয়া যায়নি। হাতে জাতীয় পতাকা, কিশোর পুত্রের সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ফিরে আসে বারবার। তাদের জীবন নিয়ে তৈরি 'পারজানিয়া' ফিল্মের শেষে দেখানো হয় সেই ছবি। যদি কেউ খুঁজে পায়। জাকিয়া জাফরি প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরির স্ত্রী। গোধরার পর সোসাইটিতে ঢুকে এহসানকে কুপিয়ে, পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তিনি ফোন করে প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছিলেন। কোনও সাহায্য পাননি। সেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঙ্গার চক্রান্তের অভিযোগ এনে জাফরি লড়াই চালিয়ে যান এবং পরাজিত হন।

আর সেই মেয়েটি? বেঙ্গালুরু থেকে গুজরাতে চাকরি করতে এসেছিল। সে কোথায় যায়, কী করে, কাকে ফোন করে, সব নজরদারি করা হত 'সাহেবের' নির্দেশে। সেই অডিয়ো ফাঁস হওয়ার পর আচমকাই

স্মৃতি সততই সুখের। খুঁজে ফেরা না-দেখা ঠিকানা

সামনে আসে মেয়েটির বাবার একটি চিঠি, যাতে তিনি দাবি করেন, মেয়ে নতুন শহরে আসার পর তিনিই তাঁর পরিচিত তথা প্রশাসনের সর্বোচ্চ নেতাকে অনুরোধ করেছিলেন মেয়ের উপর নজর রাখতে, যাতে বিপদ না ঘটে। তার পর? মেয়ে, মেয়ের বাবা, পরিবারের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে পারেননি। তাঁরা 'হারিয়ে যান'। জনমানস থেকে।

জাকিয়া, রূপারা কিন্তু এ ভাবে হারিয়ে যেতে দেন না, ভুলে যেতে দেন না। স্মৃতিবিস্মৃত, ইতিহাসবিস্মৃত জাতি তৈরির চেষ্টার সামনে

পাহাড় হয়ে দাঁড়ান। মনে করিয়ে দেন, হারিয়ে যাওয়া মানেই ভুলে যাওয়া নয়। তা 'সামগ্রিক স্মৃতি' হয়ে বেঁচে থাকে এবং প্রত্যাঘাত করে। ইতিহাস তৈরি হয়। দেশভাগ, মরিচঝাঁপি, দণ্ডকারণ্য, শিখবিরোধী দাঙ্গা, গুজরাত দাঙ্গা, কাশ্মীরের হারিয়ে যাওয়া মানুষ—স্মৃতি, ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্মৃতি মৌখিক ইতিহাসের ভিত গড়ে দেয়। দিচ্ছে। এ-ও কি এক রকম রবীন্দ্রনাথেরই কথা নয়? অল্প নিয়ে থাকি বলেই আমার 'যাহা যায়, তাহা যায়।' নাই নাই ভয়, সে শুধু এই ক্ষুদ্র ও দীন আমার। কিন্তু আমি যদি সামগ্রিক হয়ে উঠি, তা হলে বুঝব 'সমস্ত কিছুর মধ্যেই সমস্ত কিছু রহিয়া গিয়াছে'। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে, তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়।'

এই স্মৃতিজাগানিয়া কী ভাবে হতে পারে রাজনৈতিক অস্ত্র, রাষ্ট্রের অস্ত্র, ৯/১১-এর এক বছর পর সংক্ষিপ্ত গবেষণাপত্রে তা লিখেছিল নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। সে বলেছিল, প্রেসিডেন্ট বুশের প্রশাসন বার বার টুইন টাওয়ারে ওই প্লেনের ধাক্কা মারার দৃশ্যই দেখিয়ে যাবে, যাতে এটাই হয়ে ওঠে নতুন স্বাভাবিক জীবন (নিউ নর্মালসি), এটা নিয়েই মানুষ বাঁচবে এবং তাদের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে রেখে যুদ্ধ, অত্যাচারকে স্বাভাবিক বলে তুলে ধরা যাবে। এই স্মৃতির অন্য দিক তুলে ধরেছিলেন এক বাংলাদেশি যুবক। ওই হামলায় তাঁর অফিসে বিশেষ প্রকল্পের জন্য তৈরি দলের ১০ জনের মধ্যে আট জনই মারা যান। সে দিন অফিসে পৌঁছতে দেরি হয়েছিল বলে বেঁচে যান তিনি এবং তাঁর ঊর্ধ্বতন। আগুন জ্বলা টাওয়ার এবং তার ধসে পড়া দেখার সময় মোবাইলে বার বার এসেছিল সহকর্মীদের বার্তা। যখন দেখা হল, ওই দৃশ্যের ধাক্কায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন টলোমলো, প্রেমিকা ছেড়ে গিয়েছেন, কাউন্সেলিং চলছে, অফিসে পৌঁছেও তিনি সামনের কফিশপে বসে থাকতেন, অফিসে ঢুকতেন দ্বিতীয় প্লেনটি ধাক্কার মারার সময় পেরিয়ে। টুইন টাওয়ারে হামলার প্রথম বর্ষপূর্তিতে একটি রেডিয়ো স্টেশনে তাঁর সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা ছিল। সকালেই তিনি জানিয়ে দিলেন, আসতে পারবেন না। কারণ, নিউ জার্সি থেকে ট্রেনে নিউ ইয়র্কে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে এ দিন অন্তত সম্ভব নয়। পর পর প্লেন এসে ধাক্কা মারছে, আর টাওয়ার জ্বলছে, এই দৃশ্য তাঁকে অধিকার করে ফেলেছে সকাল থেকেই।

সমস্ত কিছুর মধ্যেই সমস্ত কিছু রহিয়া গিয়াছে!

যত দিন যোগাযোগ ছিল, তিনি ভয়াবহ স্মৃতি-বন্দি ছিলেন। তার পর আর জানা হয়নি, এই হারানোর ধাক্কা সামলে তিনি কতটা জীবনে ফিরতে পেরেছেন? মৃতদের সঙ্গে বাস করে জীবনে ফিরতে শিখে গিয়েছেন? তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ ওঠে, কিছুটা হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সত্যি। হারানোর কথায় একটা ফিরে পাওয়াও থাকে।

সমুদ্র সব ফিরিয়ে দেয়। হারানো জিনিস, হারানো মানুষ, প্রাণহীন হয়তো-বা।

নতুন মানুষ অনেক কিছু ফিরিয়ে দেয়।

সময় অনেক কিছু ফিরিয়ে দেয়, বলা ভাল সইয়ে দেয়। সময় দেয়। মৃত প্রিয়জনের স্মৃতির সঙ্গে বাস করতে শিখিয়ে দেয়। ছোটবেলায় সব মা-ই কমবেশি বলেন, 'আমি যখন থাকব না, তখনও আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তোমার বুকের ভিতরে।' মৃত প্রিয়জনকে ভিতরে নিয়ে বাস করাও এক সময় অভ্যেস হয়ে যায়। নতুন স্বাভাবিকতা যাকে বলে।

রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হওয়ার গল্পটা আবার অন্য রকম হারানোর। নিজেকে হারিয়ে ফেলা। অন্য 'আমি' বা অন্য 'নিজে' হয়ে ওঠা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্যে এই বাল্মীকি হয়ে ওঠার পর্বের পরতগুলি স্নিগ্ধ। সরস্বতীরূপী বালিকার আগমনের পর থেকে স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে হারাতে থাকে রত্নাকর, ক্রৌঞ্চহত্যা দেখে তাঁর কণ্ঠ উচ্চারণ করে, মা নিষাদ... সরস্বতী তাঁর মনন, হৃদয়, দৃষ্টি অধিকার করে নেন, উন্মোচিত হতে থাকেন অন্য রত্নাকর। কিন্তু সেই কমলাসনা দেবীকে তিনি কোথায় পাবেন? তিনি তো চোখের সামনে নেই। কালী সাধনা ছেড়ে রত্নাকর তখন সরস্বতীর খোঁজে। রূপান্তরের এই পর্বে তাঁর ভয়, অক্ষর, সুর, শব্দ, বোধি পেয়েও হারিয়ে ফেলার আকুলতা— 'কোথা লুকায়িলে, সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার, সবে গেছে চলে ত্যজিয়ে আমারে, তুমিও কি তেয়াগিলে'। আসেন লক্ষ্মী। তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর যখন সরস্বতী আবির্ভূত হন মানসচক্ষে, রত্নাকর গাইছেন, 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি, সব কবিতাময় জগৎ চরাচর, সব শোভাময় নেহারি অন্ধ আঁখি ফুটালে, ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে...'

দেবী আমারি!

এই যে ব্যক্তিগত দেবী, আমার দেবী, প্রত্যেকের নিজস্ব দেবী, তিনি তো আসতেই পারেন সুরে, শব্দে, তুলিতে, উপলব্ধিতে, স্মৃতিতে, ভালবাসায়। তাঁকে পাওয়ার সাধনা একমুখী। গায়ে উইয়ের ঢিপি বা বল্মীক তাঁকে স্পর্শ করে না। বোধিবৃক্ষের তলায় সাধনারতকে মনে পড়ে। সংসার তাঁকে হারিয়েছিল। স্ত্রী, পুত্র তাঁর সঙ্গ স্পর্শ হারিয়েছিলেন। তিনিও স্বেচ্ছায় হারিয়েছিলেন অনেক কিছু। তাঁরই শিষ্য আনন্দকে পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন চণ্ডালিকা।

সবার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার বোধি আত্মত্যাগকে প্রশমন করে নিশ্চয়ই। সেই উপলব্ধি দীনের হয় না।

'গৃহত্যাগী জ্যোৎস্না' প্রলোভন দেখায়।

কৃতজ্ঞতা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবু সয়ীদ আইয়ুব

পুস্তক

জয় গোস্বামী

ক্ষুদ্র এই কবিতাপুস্তক
ক্ষুদ্র এই তারকাগ্রন্থ
ক্ষুদ্র এই নীল সমঝদার
বাহবা! কেয়াবাত!

কত বৃহৎ বহির্শক্রতা
কত বৃহৎ আক্রমণমুখ
উড়িয়ে খেলে সেঞ্চুরি পেলাম
দর্শক উল্লাস

উল্লসিত কবিতাপুস্তক
মহানুভব ভাই মহানুভব
ফিরে যাওয়ার রাস্তা আরও আগে
পিছিয়ে যাও বরং

তোমার হাতে কেমন পতাকা?
কী রং তার কী রং কথা বলছে?
আমিও হাতে নিলাম যে-কাপড়
বর্ণ শুভ্র

তার মানেই শান্তি। যুদ্ধ না।
তার মানেই সন্ধিচুক্তি।
তোমার কাছে আজ অসম্ভব
সীমানা লঙ্ঘন।

সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে শুধু আমার
ক্ষুদ্র এই কবিতাপুস্তক
যে জায়গায় দাঁড়াও সেই দেশে
এ-বই জিতে যায়

জিতে চোদ্দো হাজার বিলিয়ন
আলোবছর দৌড়ে তার প্রান্তে
পৌঁছে গেছে, প্রান্তকে পেরিয়ে
কী আছে? অন্ধকার।

বইয়ের পেটে ব্রহ্মাণ্ড ধরা—
অতি ক্ষুদ্র— তবু তা ফেটে গেল
শক্তি হুহু শক্তি বিকিরণ
মহাজগতে ছোটে

এই তো মহাজগৎপুস্তক
এর ভেতরে লুকিয়ে ব্ল্যাকহোল
যা পায় টেনে ঢোকায় গহ্বরে
কেউ ছাড়া পাবে না

আমিও সব অভিজ্ঞতারাশি
আকর্ষণ করি এ-পুস্তকে
সারা জীবন এখানে বাঁধা আছে
আমার সারা জীবন

ক্ষুদ্র এই জীবনীপুস্তক
হাঁ করেছে জীবনীপুস্তক
ভেতরে ও কে ছটফটায়? কারও
সাধ্য নেই বোঝার

আছে কেবল সে এক স্তম্ভিত!
আছে কেবল মৃৎমূর্তিবৎ
স্তব্ধ হয়ে দেখা কেমনভাবে
আকাশে ওঠে বই

আকাশে থাকে নীল সমঝদার
আকাশব্যাপী নীল সমঝদার
বাহবা তার, তার সে-কেয়াবাত
কলসে ভরে এ-কবিতার শেষে

মাটিতে, বনে, সাগরে ঢেলে দেয়
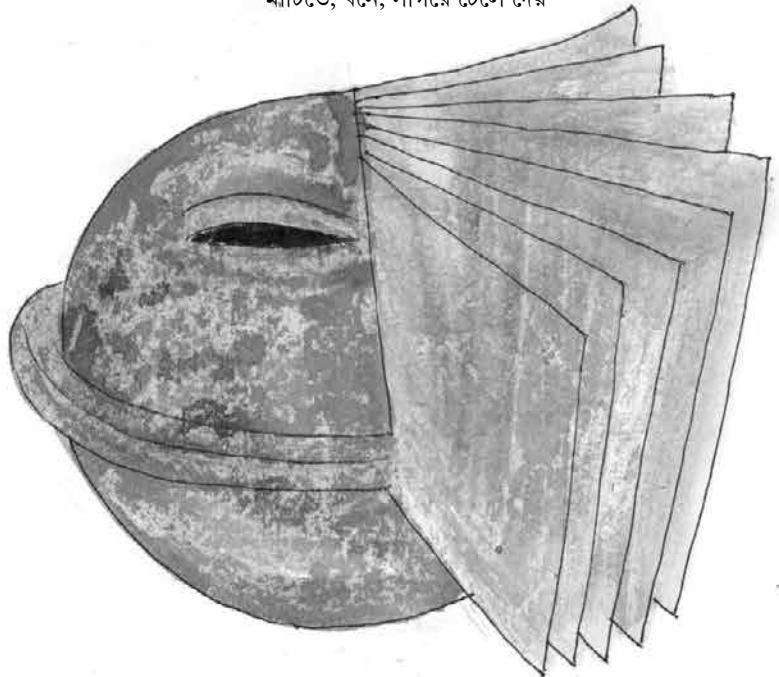
একটি চুম্বন, একটি ডিনামাইট

সুবোধ সরকার

চাই না সুখ, চাই না আমি শান্তি
আমার চাই সর্বনাশ তোমার ভালবাসা।

আশি বছর বাঁচতে আমি আসিনি
বসন্তকে ডাকো
বসন্তকে আমার হাতে চাই।
কেন যে আগে তোমাকে ভালবাসিনি?

সুখ আসলে হিরোশিমার হাসি
শান্তি মানে কচ্ছপের হাই।

এক বাটিতে সুখ তোমার এক বাটিতে অশ্রু
ভালবাসায় আমি স্নেহের দস্যু।

আমার চাই সর্বনাশ
দেরি না করে তোমার চোখে
নামতে থাকে আমার চোখ
সূর্য যদি ওঠে
মরার আগে বাঁচতে চাই
তোমার ভেজা ঠোঁটে।

সুখ আসলে হিরোশিমার হাসি
শান্তি মানে কচ্ছপের হাই।

চাই না সুখ চাই না আমি শান্তি
দেয়ালে পিষে ধরি তোমার মুকুটমণিপুর
একটি চুমু, একটি ডিনামাইট
বাকিটা গুডনাইট।
ফ্লাইওভারে দু'হাত মেলে দাঁড়িয়ে গান গাই
হাতে আমার বসন্তকে চাই।

যে-মানুষটা রাস্তায়

রণজিৎ দাশ

যে-মানুষটা রাস্তায়
আপনমনে গুনগুন গায়
আর মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে নাচের ভঙ্গিতে হাঁটে
ফুটপাথ, খানা-খন্দ, ভিখারি, হকার, ব্যস্ত মানুষের ভিড়
তোয়াক্কা না করে সে নিজের মেজাজে হাঁটে
আর গুনগুন গায়—
যেন চারপাশের বাস্তবতাকে ড্রিবল করে
তার গানে গানে তন্ময় মন
কোনও দূর মরমি গোলের দিকে ধায়!
এমন মানুষ দেখতে পেলেই
আমি তার পিছন পিছন ছুটি—
যদি জীবনের হিংস্র মাঠে
এই মরমি মারাদোনা কোনও অতর্কিত আগ্রাসী ফাউলে
হঠাৎ ধরাশায়ী হয়,
তা হলে আমি যেন তার গানের সুরটা
নিজের বুকে লুফে নিয়ে, তারই মতো গাইতে গাইতে,
সব রক্ষণ ফাঁকি দিয়ে
বহু দূর সন্ধ্যার দিগন্তে
সোনালি গোলের জালে সেই গান জড়িয়ে দিতে পারি।

মানুষ নিজের মুখ দেখতে পায় না

পঙ্কজ সাহা

মানুষ কখনও তার নিজের মুখ দেখতে পায় না,
তার মুখ দেখে অন্য মানুষ।
মানুষ দেখে তার মুখের প্রতিফলিত ছবি,
জলে কিংবা আয়নায়!

জলে মানুষের মুখ হাওয়ায় কেঁপে যায় তিরতির
আয়নার মানুষের মুখ অবিকল স্থির।

কোনও কোনও মানুষ তার প্রতিফলিত মুখচ্ছবিতে
স্থির থাকতে পারে না,
এক অস্থির তরঙ্গ তার মধ্যে খেলা করে,
আলো আর ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়।

সে শব্দের পাশে শব্দ সাজায়,
বাক্যবিন্যাসে দেখতে চায় নিজের মুখ

— জন্ম নেয় কবিতা।

পরস্পর বিপরীত

কৃষ্ণা বসু

অনন্ত অসীম ডাকে 'আয় চলে আয়',
সীমাবদ্ধ ঘরখানি করে 'হায় হায়!'
অনন্ত অসীম ডাকে অন্তিম টানেতে,
সুরখানা ধরে ডাকে গানেতে গানেতে।
কোনটি অধিক সত্য, সীমাবদ্ধ ঘর,
নাকি অসীম বিস্তার ডাকে পরস্পর!
অসীম উদাস করে, দূরে নিতে চায়,
সীমাবদ্ধ ঘরখানি প্রাণ-গান গায়।
চেনা ঘর, প্রিয় ঘর দশ হাতে বাঁধে,
অনন্ত অসীম শুধু দূর থেকে কাঁদে!
জীবনের দুই প্রান্তে দুই সত্য আছে,
মুক্তি ও বন্ধন আছে কাছে কাছে!
জীবনের জলছবি রং দিয়ে ঘেরা
গৃহ টানে, মায়া টানে, তার কাছে ফেরা!
দুই সত্যে চলাচল আশ্চর্য জীবন,
জীবনে বিস্মিত হয় বিবাগি এ মন!
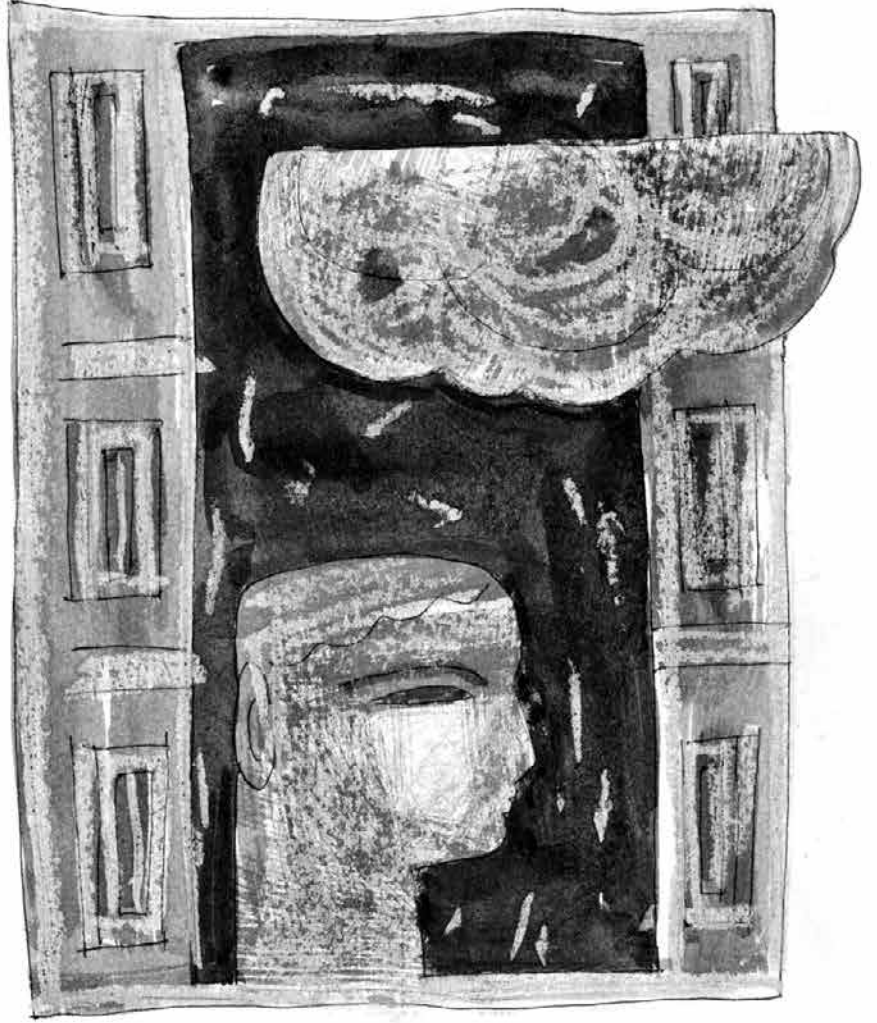
যদি একে ভালবাসা বলো

রূপক চক্রবর্তী

তুমি কি সত্যি কোনও দিন ভেবেছিলে— রাত্রি পার করে
পরদিন ভোরবেলা সেই লোকটাকে নিজের পাশে ঘুমন্ত দেখবে!
না, এ তো স্বপ্ন নয়। হয় সত্যিই সে ঘুমন্ত নয়, আধো তন্দ্রায়।
সেও জানে ঘুমিয়ে আছে, নয়তো রয়েছে... নয়তো রয়েছে...
তোমার গায়ে কিচ্ছুটি নেই। তুমি জেগে উঠেছ আর শরীর খালি।
গলায় চেন আর হাতের কয়েকটা চুড়ি ছাড়া। আজ আর কোনও কাজের
লোক আসবে না। আজ তাদের ছুটি। রোদ এসে পড়েছে জানলা দিয়ে।
রোদ এসে পড়েছে যেখানে সেখানে, যে দুন এক্সপ্রেস বাঁক নিচ্ছে
দেহাতি রোদ্দুরে। ছাদের বাগান, রান্নাঘর, আরও রান্নাঘর, বারান্দায়
বদরিকা, গল্পের বইয়ের ২৪০ নম্বর পাতা... এ সব ছেড়ে পারবে তো?
তুমি উঠতে পারবে তো ভোর ভোর অন্ধকার, অথচ শীত করবে না—
এমন কোনও অচেনা কামরায় উঠতে?

ম্যাসিডোনিয়ার রাজা

রানা সরকার

যুদ্ধকেও সমাদৃত হতে হয়, ন্যায়ের বিপক্ষে মৃত সৈনিকের কফিন অমূলক দীর্ঘ আড়ালে আজ
এই দ্বৈরথ সমরে অনাবাসী বিপন্ন মানুষ ফিরে আসে অনাবৃত দুঃস্থ স্বদেশে—
সেখানে তখন শিশুদের কিন্ডারগার্টেন, আরোগ্য নিকেতনের শূন্যতায় বিরূপ এক অন্ধ সোহাগ...
লৌকিক ভোরবেলায় পাখিদের মুক্ত উড়ান থেমে যায়, ঋতু ফসলের দেশে।

স্বপ্নের লালিত শহর দিকশূন্য সকরুণ নিশ্চুপ এখন
নিষ্প্রাণ বালকের শিয়রে জীবনের মুগ্ধ লুকোচুরি, নীরব বাঙ্কারে জাগে কান্নার জোয়ার,
বাতাসে বারুদের গন্ধ, ধোঁয়ার দূষণ ছড়ায় ঋতুস্নাত ফুলের বাগানে: তর্পণে অবুঝ কথন
রাতের গভীরে জেগে থাকে পদাতিক অশান্ত প্রেমিক, সূর্যোদয়ের পথে দুরন্ত ঘোড়সওয়ার!

একদিন জয়ের পথে তীব্র অভিযান ছিল ম্যাসিডোনিয়ার রাজার,
অমোঘ মৃত্যুর প্রহরে কালের নির্মাতার প্রত্যাবর্তন ছিল, ছিল নিরস্ত্রীকরণের সহবোধ
নগররাজ পুরুর রাজকীয় উচ্চারণে ফিরে এসেছিল রাজ অধিকার, নিজস্ব বৈভব তার;
এখন এক জীবনকথায় রুগ্ন আয়ুষ্কাল ফিরে আসে, ফেরে না মিত্র সহযোগ!

সোনালি গমের দেশে বিলীন হয়েছে শস্যের বাগান, ফিরেছে বসন্তের প্রিয় অনুক্ষণ
স্বদেশে এখানে আজ এগিয়েছে বন্ধ্যা দিনের প্রহর, মধ্যাহ্নের আকাশ দেখায় তপ্ত নবীন,
উল্লসিত ঠোঁট নয়, বিষাদের সুরে কেঁদে ফেরে বিনীত এক শান্ত সমন
দূরালাপে শোকের বিলাপ নেই, ছায়াঘেরা চৌদিক বিস্ময়ে অ-চিন।

চেনা বসন্তের রোদে পুরনো ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে এখানে
সফল পরিযান শেষে সমবেত যোদ্ধামানুষ ছুঁয়ে থাকে জীবনের লুপ্ত উপকূল
পোড়ামাটির দেশ, উতরোল গঞ্জের ছায়ায় জনকোলাহল জেগে ওঠে কাছে
সমূহ জীবনের কথায় মুখোমুখি স্মৃতির মুলুক, অমল আকাশে রামধনু ফুটে আছে বর্ণবহুল।
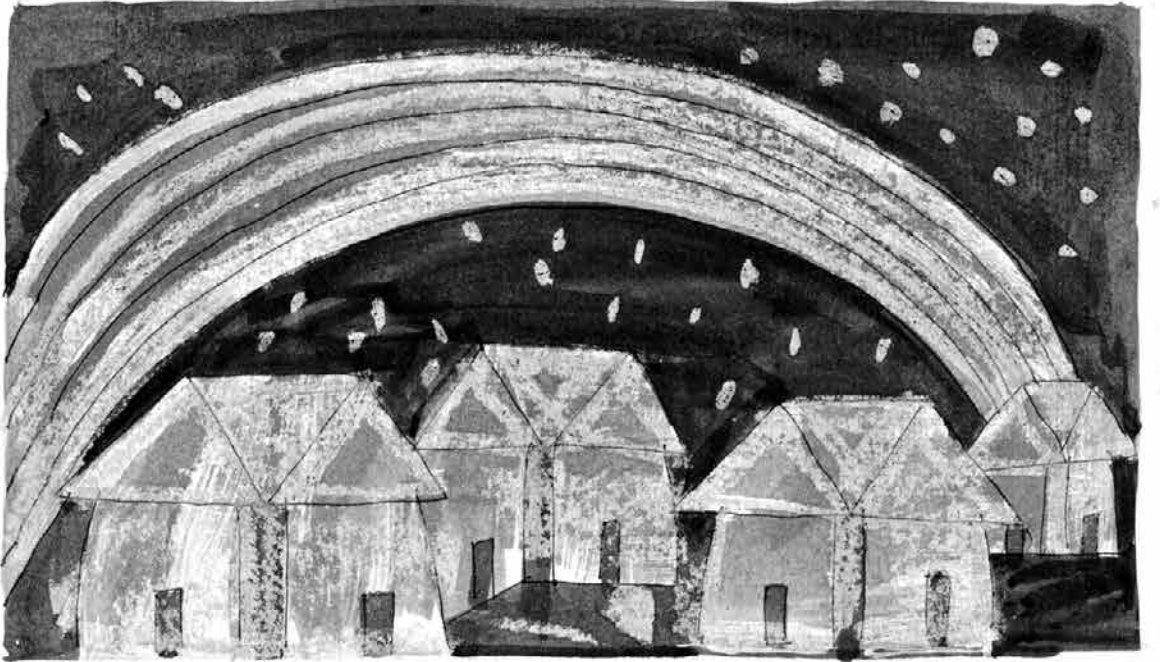
র‍্যাঁবো এসেছিলেন গয়েরকাটায়

বিকাশ সরকার

কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না গয়েরকাটায় এসেছিলেন জঁ আর্তুর র‍্যাঁবো
শ্মশানমন্দিরে বসে তাঁর মনে পড়ছিল ছেড়ে আসা হাবসিরক্ষিতার কথা
তখন চত্বরে বসে গিটার বাজিয়ে সলিল চৌধুরী গাইছিলেন মন্দিরের সাধু
শীত পড়েছিল খুব, ঠান্ডায় ককিয়ে কাঁদছিল আবলুশগাছে সব কানাকুয়াগুলি

তখন র‍্যাঁবোর সঙ্গে ভালেরির সব সমকাম চিরতরে শেষ হয়ে গেছে
তখনও বাম কবজিতে বুলেটের ক্ষত টিপে দিলে বেরিয়ে পড়ছে বদঅশ্রুপুঁজ
আমি তাঁকে নিয়ে গেছি কামিনবস্তিতে শীতের রোদে ভেজা তাজা তাড়ি খেতে
বিকাশঝোরার পাড়ে অন্ধ বাউলের কুটিরে তাঁকে শুনিয়েছি কান্নাভাটিয়ালি

কেউই বিশ্বাস করে না, মিছে ভাবে, কিন্তু দিলু সে ভ্রমণের সাক্ষী আছে
মৃত্যু না হলে সাক্ষী দিত বস্তির লেবারসর্দার, তাঁর খেজুরগাছটিও আর নেই
হারিয়ে গেছে আবলুশ আর কানাকুয়াগুলি, হারিয়ে গিয়েছে সাধুর গিটার
শুধু আজও মাঝে মাঝে চিতা জ্বলে ওঠে, আর মৃদু মৃত একতারা শোনা যায়

নদীর ও-পারে যে আম্বাডিবা গ্রাম, কুয়াশামদির দীর্ঘ সব ফুলকপিখেত
র‍্যাঁবোর খুব মনে পড়েছিল ফেলে আসা তাঁর শার্লেভিলে গ্রাম, অন্ধকার মা
আর তাঁর বোনটি আমারই বোনের মতন চুরি করে পড়ছিল গদ্যের খাতা
আমরা মারুয়ার মিঠে মদ খেয়ে রোমন্থন করেছি সারা রাত মিছে যত স্মৃতি

কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক, এই পথেই চলত মিটার গেজের রেলগাড়ি
আইরিস ফুলে ভরা এক কামরায় চেপে গুয়াহাটি চলে গেছি আমি আর র‍্যাঁবো

বসন্তঘুম

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

কামনাহীন অর্জিত নীরবতা থেকে এখনও প্রতিধ্বনি আসে, যেন
আলুথালু নিশিডাকে বিনিদ্র প্রহরগুলো বসে আছে
অন্তহীন স্মৃতিকে পোড়াবে বলে। তোমাকে সাজাতে গিয়ে
দেখি সে এক জাগ্রত বিরহকাল, কুণ্ঠিত পর্বের প্রাচীন লালন।
তুমি কি দেখেছিলে অবহেলা ঘাম, নির্জনতম শ্রাবণের
পাখির আকাশ। তৃষ্ণার স্বপ্ন মোহে এখনও সে দাবদাহ নীল
কুণ্ডলী পাকানো বসন্তঘুমে বধ্যভূমির একক হৃদয়।
শকটের দূর শব্দে নিঃশর্ত ফিরে পেতে চাই
ব্যাপ্ত জন্মের মায়াময় নির্ভরতা। কোথায় লুকিয়ে আছ, হারিয়ে
গেছে কথা, যাত্রাপথের অপেক্ষা অতীত।
তোমার উত্তরীয় থেকে এখনও ভেসে আসে
সাতাশ বছরের নিঃস্তব্ধতা। হোক সে লুপ্ত জীবন, ঘৃণা
দ্বেষ, দুরন্ত আর্তনাদ পতন বিবেক। এখনও কেঁপে ওঠে ঠোঁট
মোহনচূড়ার রুগ্ন বৃহন্নলা, গরানের সখ্য জলতল।
ফাগুন লাগে বনবীথি জুড়ে, সন্ধের কলসে অবিরল
শঙ্খলাগা ভালবাসা খুলে ফেলে বাসভূমির স্বাদ। পরনারীর মতো
শূন্যের বন্ধনে এ দীপ্ত আকাশ হাঁটু গেড়ে জল চায় প্রিয়জনে
বেজে ওঠে অরণ্য সঙ্গীত দু'হাতের নিবিড় ফসল।
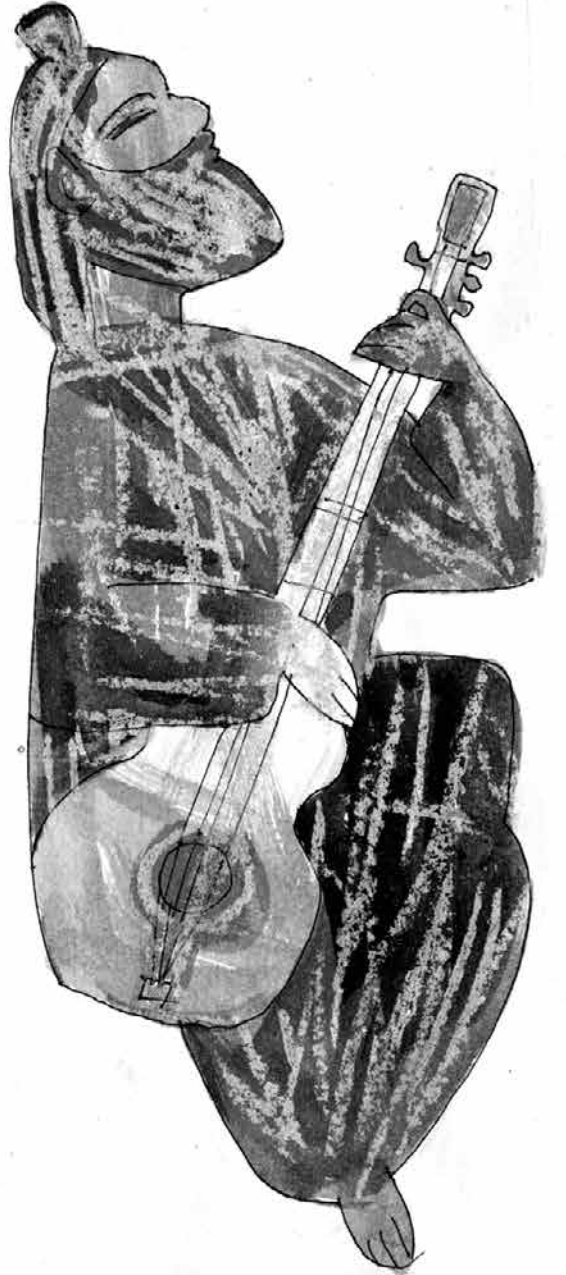
আত্মীয়তা বাঘের মতন

প্রবালকুমার বসু

আমার কোনও আত্মীয় নেই, কিন্তু অনেকের সঙ্গেই রয়েছে জানাশোনা
এদের কেউ কেউ আমার আত্মীয় হতে পারত
কেউ কেউ আত্মীয় বলে দাবিও করে
আমি সব সময়ই এদেরকে বোঝাতে চেয়েছি
জানাশোনা থাকলেই যে আত্মীয় হবে
বা আত্মীয় হলেই যে জানাশোনা থাকবে
এমন কোনও সরলরৈখিক জ্যামিতি মেনে
সম্পর্ক নির্ধারিত হয় না
যেমন কোনও নদী সঙ্গে নিয়ে আসবে জোয়ার
কোনও নদী চলতে চলতে কখন যাবে হারিয়ে
তার যেমন কোনও পাটিগণিত হয় না
তেমন আত্মীয়তারও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বলে কিছু নেই

তবু কেউ কেউ কাউকে কাউকে ভাবে আত্মীয়
আরও কেউ কেউ আরও কাউকে কাউকে ভাবে আত্মীয়ের অধিক
কেউ কেউ ভাবে কারও কারও সঙ্গে রয়েছে জানাশোনা
কারও কারও জানাশোনা থেকে তৈরি হয় আত্মীয়তা
কারও কারও কুকুর বেড়ালের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়
কারও কারও কাঠবিড়ালী বা খরগোশের সঙ্গে
কারও কারও জানাশোনা পাশাপাশি দীর্ঘদিন থেকে যাওয়া
দুটো গ্যালাক্সির মতন
কেউ কারও দিকে একটুও এগিয়ে আসতে পারে না

আমার অনেক জানাশোনা সত্ত্বেও
আত্মীয়ের মতন কাউকে দেখলে সতর্ক হয়ে পড়ি
আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি
আত্মীয়তা বাঘের মতন,
একবার ধরলে না-খেয়ে ছাড়বে না

মেঘ বনাম মৃত্যু

সুমন মহান্তি

এমনও দিন আসে মেঘ ভাসে জানালায়
মন ভাসে কাগজের নৌকা হয়ে
বাতাসে হালকা ধুন, আদুরে নদীর স্রোতে
খুব কাছে আসে বাসন্তী স্বপ্নেরা
দূরে মেঘবাগানে পাতা জুড়ে গুড়ে লেখা
নিজস্ব রূপকথার বৃষ্টিতে ভিজে অজান্তেই গান হয়ে গেলে
আঙুল ছুঁয়ে ফেলে সি-মেজর স্কেল।

এমনও দিন আসে মৃত্যুর টোকা দরজায়
অনন্ত শূন্যের দিকে চলে যায় সমস্ত রাস্তা
অন্ধগলি জুড়ে ঘুমপৃথিবীর ছায়া
মনে পড়ে অমোঘ আয়ুরেখা
শূন্যতা ভাঙতে সিন্থেসাইজ়ারের রিডে সুর ভাঁজতে গিয়ে
ছাইগন্ধ আঙুল বারে বারে করে ভুল।

মেঘ ও মৃত্যুর দড়ি টানাটানি খেলায়
মায়াপথ থেকে ছায়াপথে বার বার
ক্ষয়ের জীবন জিতে যায় বাঁচার উৎসবে...

এ কোন পৃথিবী

সনৎ সেন

অস্ত্র তোমার আধুনিক অত্যাধুনিক পারমাণবিক আরও দানবিক
তোমারই সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপের ইট কাঠ পাথর সিমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে
অট্টহাস্যে হেসে উঠবে তুমি জয়ের উল্লাসে অহমিকায় আত্মম্ভরিতায়
শুনতেই পাবে না সেই সব আর্তনাদ স্বজন হারানোর দীর্ঘশ্বাস বুকের
ভিতর হাহাকার খাঁ খাঁ শূন্যতা রেফিউজি ক্যাম্পে যাওয়ার আগে অত্যন্ত
আপন সেই মানুষটির বিচ্ছেদ বেদনা অসহায়তা নিরস্ত্র লোকটির হৃৎপিণ্ডের
স্পন্দন অন্তরের আর্তি এ সবই তোমার ব্যাভিচার বিকৃত আনন্দের উপকরণ
হাসি আহ্লাদের দুনিয়ায় নামিয়ে আনা আগ্রাসী হুঙ্কার বিধ্বংসী অহঙ্কার
একটি শিশু আজ মাতৃকোলশূন্য পাহাড়প্রমাণ শহরের অবশিষ্টাংশের ভিতর
হামাগুড়ি দিচ্ছে আর এক জন দু'চোখে তার পৃথিবীর ধারা আর থেমে থেমে কান্নায়
কোথায় চলেছে সে আগামী দিনের সন্ধানে আর যে মানুষটা ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে হোঁচট
খেতে খেতে হেঁটে চলেছে অন্য দেশের সীমানার দিকে ন্যুব্জ দেহে ক্ষীণ দৃষ্টিতে অস্পষ্ট
আশায় শীতকুয়াশায় শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে সে-ও পিছনে শুনতে পাচ্ছে যুদ্ধবিমানের শব্দ
সাইরেন তার আরও দ্রুত পা কম্পমান শিথিল মাংসপেশি ত্রস্ত হৃদয়
এ কোন বিশ্ব এ কোন দেশ আর এরা কারা আমাদেরই কেউ আর তুমি
মারাত্মক এই আগুন ধোঁয়ায় মাতোয়ারা হয়ে আরও মারমুখী হয়ে উঠেছ প্রতিদিন
হয়তো জয়ী হবে কিন্তু রাতের আঁধারে বিধ্বস্ত পৃথিবী কেড়ে নেবে তোমার
শখ শৌখিন জীবন সাধের ঘুম নিশুতির ঝিকিমিকি তারা বাঁকা চাঁদের প্রহর
দ্যাখো গণকবরের মাটির তলার আস্তরণ ফুঁড়ে উঠে আসছে হাজার মুখ হাজার হাত
আর এক সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে তারা তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে পৃথিবীর উপান্তে
নির্জনতা চরম একাকিত্বের শেষ সীমানায় দমবন্ধ বিচ্ছিন্ন দুনিয়ার অন্ধ গুহায়।

নিশীথিনী

শঙ্খশুভ্র পাত্র

নামের ইশারা। দিশা ভেসে যায় দিকচক্রবালে।
তোমার হাজিরা দেখি। ইতস্তত। দূর নীপবনে
বেণিহারা অন্ধকার— তোমাকেই খুঁজি মনে-মনে।
আমার সামান্য পুঁজি। রোজগার? চন্দ্র-জটাজালে।

তা তুমি ভেবেছ ঠিক— দিনমানে, এই আমি তারা
আমার সকল যায়— দুই চোখে মেঘ করে আসে।
একটি গানের দিকে অবিরল, শান্ত স্রোতধারা
চুপিচুপি বয়ে চলে। বেঁচে থাকে কবিতার শ্বাসে।

নাম তো অছিলা মাত্র— যেন ওই দূরস্থিত টিলা
ঘুমিয়ে পড়েছে রাগে, অভিমানে— এতটাই মান!
সর্বস্ব উজাড় করে টানি আমি ধনুকের ছিলা
সকলে জানুক প্রেম— সেও এক অবিনাশী গান।

সুর তো বাউল, খ্যাপা। সঙ্গিনীর চুড়ি, রিনিঝিনি
মরমে পশিল, ঢেউ, কোজাগর, পূর্ণ-নিশীথিনী।
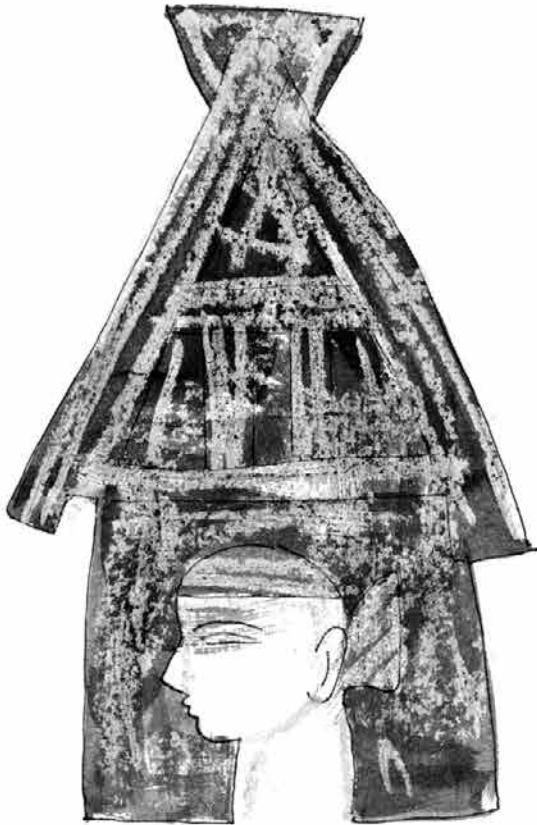
দোঁহা

সেখ রমজান

সময় দুয়ারলগ্ন, লগ্নে পৌর্ণমাসী
হাওরে ভরাট জল ভাসে সদ্যঘ্রাণ
ছিল তো ননীর দেশে আজ গৃহবাসী
সেই গৃহ যেইখানে ধ্বনিমাত্র গান।

ধুমলাগা প্রতিকোশ স্বরবৃত্তে প্রাণ
অহোরাত্র স্বপ্নভ্রম অচেনা রাগিণী
বক্ষে নিলে গলে যায় অতলে উজান
চন্দ্রকলা বর্ধমান অঘোর কিঙ্কিণি।

অতিপ্লাব সসাগরা কে ভাসে কোথায়
স্তরীভূত অন্ধকার আঁধারে অরণি
জ্বলে ওঠে, আধো বুলি ব্রজমোহনায়
অবিরাম জলধারা প্রবালের খনি।

যুগ থেকে যুগান্তর ধূলি ও শিলায়
খোদিত দোঁহার রাস, চিরন্তন লীলা।

মা ও মহাপ্রলয়ের সমাধি যাপন

নাসিম-এ-আলম

গতকাল ছিল শেষ সূর্যাস্তের দিন
মুছে গেছে সাল, মাস, অযুত সময়
প্রস্তর যুগ এসে মিশে গেছে আজকের অমোঘ সময়ে
মাটিহীন পৃথিবীতে কেবল বরফ
গাছের পাতায় মৃত্যু, বরফ আলিঙ্গন।
হয়তো অরণ্য আছে কোথাও
আছে দীপ শিখা নেই, চিরস্থায়ী অন্ধকার চরাচরে।
ক'জন মানুষ প্রলয়ের ঘণ্টা শুনবে বলে বসে আছি।
মা কোথায়, পৃথিবীর সমানবয়সি মা, বহুযুদ্ধ মহামারির সাক্ষী
খরা ও প্লাবনের সাক্ষী, আজ তার
সমাধি জীবন, বরফসমাধি, কয়েক
আলোকবর্ষ পেরিয়ে দেবতারা পাঠিয়েছে অশ্রুহীন কাফন, সমাধি সঙ্গীত,
চলেছি মেরুপ্রদেশের দিকে
ইগলুরা প্রদীপ হাতে অপেক্ষা করছে বহু যুগ।
ইগলুদের বিশপ প্রদীপ জ্বালালেন
সবার কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত। এবার শান্তি।
কোথাও মানুষ নেই, অতএব যুদ্ধ নেই, সাফল্য
ব্যর্থতা নেই, কোলাহল নেই মানুষের।
বিশপ বললেন আজ শেষদিন পৃথিবীর সমানবয়সি মা, এ বার শান্তিতে ঘুমোও।

উপোসি বাংলার কবিতা: একত্রিশ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋণ: রূপসী বাংলার কবি, জীবনানন্দ দাশ

অসীম বিপন্নতা, আত্মমগ্নতা—স্বভাবে যা যা ছিল জটিলদোষ-
সমগ্র-লিখে-গেছি ঝরা পালকজুড়ে; নিযুত অক্ষর শরীরকোষ-
আঁকড়ে-আগলে-ধরে... বন্ধ ট্রাঙ্কের বিষাদে প্রজাপতি ছটফটায়...
সূক্ষ্ম নকশা আর বর্ণসমাহার ধাক্কা-খেয়ে-ফেরে অন্ধতায়
অসংখ্য প্রজাপতি ধারণ-করে-আছে অ-প্রকাশিত আলো-অন্ধকার...
বাকি যা-বলার-ছিল—সে স্বর ভাসিয়েছি, জলের স্তনে মিহি গন্ধ তার...
নিসর্গ পড়ে আজও? বৃক্ষ, বন পড়ে? আকাশ পড়ে নাকি লেখা সেসব...
আমার সৃজন জানে বাংলা নীল রাত—আমার পাঠকেরা একালে শব—

ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর অভয় কর-ছোঁয়া দেননি কক্ষনও কপালে তাই-
সামান্য ক'টা টাকা বড়ই দরকার—বদলে কী-বা দেব? ক'টা লেখাই...
নক্ষত্রের দোষ—শুধুই প্রেম নয়; আমার পথে পথে বাধাস্বরূপ—
হৃদয়ের অন্দরে : ফসলকাটা মাঠ—অঘ্রানের ঝড়—পাতা ঝরুক...
শরীরে-গলিয়ে-নিই গোমেদ-পলা-চুনি... বক্রী গ্রহ, ফলে বকরি আজ—
এসেছি হালাল হতে—পিঠের ছুরিখানা বসাও সোজা বুকে, ভক্কিবাজ!
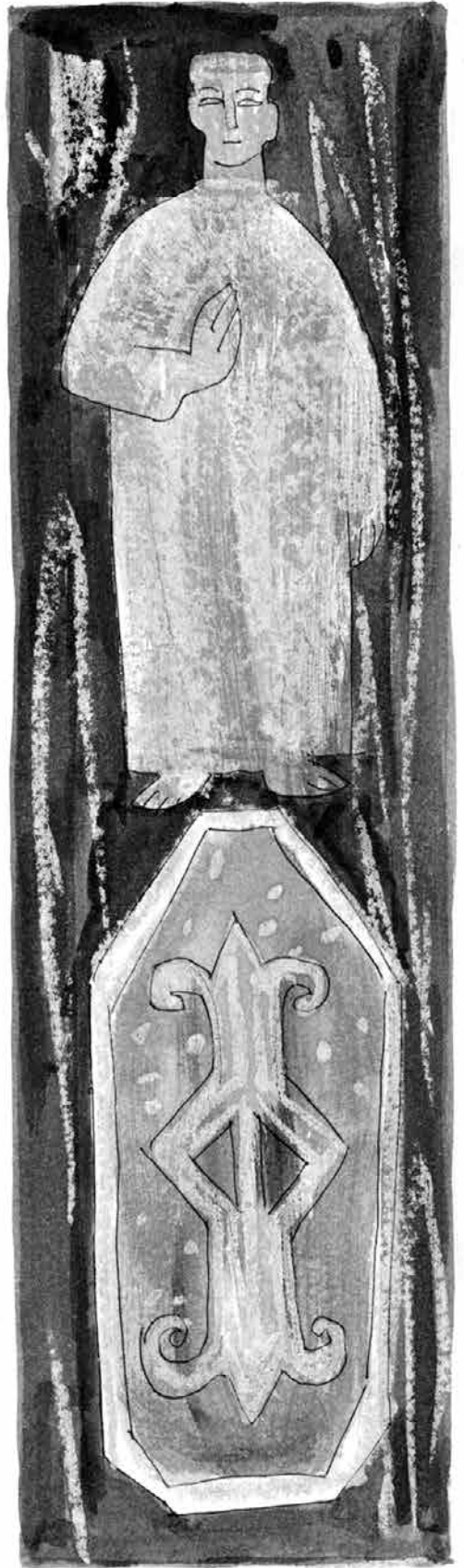
এক যে ছিল রাজা...

সুস্মেলী দত্ত

ইডিয়ট তুই জনগণ হলি কবে
অশ্লীল তোর নগ্নতা পুড়ে খাক
উড়ি উড়ন্ত শখের দোকানদারি
ফুলটুশ মেখে মস্তিরা মৌচাক

উবু ডামাডোলে ফুর্তিরা বামাখ্যাপা
ঝুমশরাবির বিষণ্ণ স্বরভাষে
কে যেন এমন ডানাটা আলতো মেলে
রক্তঋতুতে মাস থেকে বারোমাসে...

ও সব যদিও গতজন্মের কথা
দীর্ঘ দীর্ঘ আকাশ কিন্তু জানে
অনুবাদ আর সম্বোধনের স্মৃতি
নাম লেখালিখি প্রেমের উপাখ্যানে

বোকা বাক্সরা বন্ধ দু'হাত জোড়া
ননসেন্স আমি পায়ে পায়ে গড় করি
হাসতে হাসতে পুকুরপাড়ের ধারে
হেরো ভোলানাথ ন্যাকাবোকা শঙ্করী

প্লেটোনিক থেকে ইষ্টিকুটুম সারা
ভিন মহাদেশে নীলছবি বিকিকিনি
টাক টাক টাক টাকিলায় যাক ভেসে
ধুস পৃথিবীর হিংসুটে কুহকিনী।

সায়াহ্নে

সায়ন্তনী নাগ

অঞ্জলি পেতে রাখি সন্ধে-মেঘের কাছে
দু-ফোঁটা দাক্ষিণ্য-জল ছোঁয় মাটি
কনে দেখা আলো, রুপোলি রেখা, বিষণ্ণতা
এক প্যালেটে মিলেমিশে ছবি বানায়

ইদানীং অস্বচ্ছ আবরণ ঢেকেছে আমার বুকের ছাদ
নিরুপায় স্থবিরতা বাজছে শিরায় শিরায়

তবু এখনই শুনি
নবতিপর প্রতিবেশী বলিরেখা হাতে
জীবনের রেলিং আঁকড়ে গাইছেন
আরো আরো আরো দাও প্রাণ

নার্সিসাস

জয়ন্ত সরকার

প্রতিচ্ছবি, নিছক দ্রষ্টব্য
নও তুমি, ঢেউ নও জলের গভীরের,
অবুঝ আকাশকে নিয়ে তবু পাড়ি দাও, কতটা দূর
জানে না কেউ, দৃষ্টিসীমায় যা ধরা যায় সে আর কতটুকু
ভাবি তোমার কায়ায় পা রাখব এক বার, প্রথমে পায়ের পাতা,
ঈষৎ ছেটাব জল, বেঁকেচুরে নদী হয়ে যাবে তুমি
উড়ে গিয়ে বসবে পাহাড়চূড়ায়
কবেকার জমিয়ে রাখা নুড়িপাথর
গড়িয়ে দেবে বৃষ্টিপাতে, প্রবল ধস নামবে সারা রাত,
মথিত হতে থাকা সমস্ত কথা আর ক্ষোভ
জলতল বেয়ে ছুটে আসবে আমার কাছে
আমি তো সময়কে স্থবির রাখতে চেয়েছিলাম
চুপ মুদ্রায় দেখা স্বপ্নের কত কোলাজ
মৌনতার অক্ষরমালা
যদিও প্রতীক্ষারা জলে আমাকেই খোঁজে
ঢেউয়ের শীর্ষে মুগ্ধতাকে রেখে
পা ফেলব তোমার ওপারে...

হ্যালুসিনেশন

দুলালেন্দু সরকার

হয়তো কোনও একদিন এখানে এসেছিলাম আমি
আজ আবার এসে দাঁড়াই
মহীরুহসম তেঁতুল গাছটির নীচে
তাকে ছুঁয়ে থাকি আর হতবাক আমি
দেখি, ঘাটে নৌকো বেঁধে নতুন বউ নিয়ে
লাজুক মুখে বাড়ি ফিরছে অরবিন্দ কাকা
হেসে বলছে, ‘কবে ফিরলি? আয় বাড়িতে আয়’

শূন্য ঘরে প্রবেশ করি
যত্রতত্র ইঁদুরের মাটি, মাকড়সার জাল
ঠাকুরদার প্রিয় মহাভারতের পাশে উবু হয়ে বসি
মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলছে, ‘একা এলি? বাবা কোথায়?’
দিদিরা পুকুর থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ফিরে আসছে
বাতাসে শিউলিফুলের গন্ধ; ঠাকুর দালানে এসে দেখি
ভাঙা মূর্তিগুলোকে ঘিরে ধরে আছে ধূপ-ধুনোর গন্ধ

শুধু বাবাকে খুঁজে পাই না কোথাও
সেই কবে নদীর তীরে আমাকে বসিয়ে রেখে
খুঁজতে গেছে নতুন ভূখণ্ড

দেউলপাড়ায় সন্ধ্যার লুম্বিনী

স্নেহাশিস পাল

ভাঙা ইজ়েলের মতো বৌদ্ধ মন্দিরের দেওয়ালে টাঙানো— কয়েকটা জাতক-কাহিনি, তেলরঙে আঁকা...
চার কোণে বড়-বড় ফুলদানি দিয়ে ঘেরা বেদি, মাঝে শ্বেতপাথরের সৌম্য বুদ্ধমূর্তি
নীচে মোমবাতি জ্বলে... মনে হয় ব্যক্তিগত শোকের চিতায় ভরে আছে — উপাসনা কক্ষ :
আমাদের মায়ার পৃথিবী...
এই সব খণ্ড-ছবি মাথার ভেতরে পুরে, ফিতে খোলা চটি পরে সপাটে পেরিয়ে যাচ্ছি —
মরা ফুলেদের টব, বাগানবিলাস-ঝোলা জং-ধরা গেট, বৃহৎ ঘণ্টার মতো মন্দিরের চূড়া,
বধির মুখর জনপদ,
কান-কাটা পাগলা ডাচ শিল্পীর হলুদ-ঢালা ছোট সরষেখেত...

সমগ্র দিগন্ত আজ — চন্দ্রহীন, চন্দ্রমুখী আলুখেতে খেলা করা জোনাকিদলের...
কবে কার মরে যাওয়া তারাদের হাতে হাত রেখে
দামোদরের কাঠের সেতু পার হতে-হতে ভাবছি:
দুঃখের মরসুমে—আত্মা কত কিউসেক অশ্রু ছাড়লে মন নিরাপদে বাঁচে?
দূরে — শ্মশানের কাঙাল আগুন ক্ষীণ সুরে মেঠো গান গায়, আরও দূরে — মুণ্ডেশ্বরীর মিলন স্থান,
তারও দূর — হিমালয় থেকে, লাল বদরীপাখি আসে —ওইখানে; প্রত্যেক বছর
কার টানে? কার কাছে?
(আর) মন কত কিউসেক অশ্রু ছাড়লে দু'কূল ছাপিয়ে নদী আত্মহত্যা করে?
ত্রাণের নৌকার মতো মোহ, সর্বদা রক্তের শ্বাসে লোকালয়ে ভাসে...

ক্ষীণজন্মা দুর্বল হেমন্ত; চলে যাচ্ছে — শীতের কবলে...
রিক্ত নিঃস্ব ঠান্ডা হাওয়া এসে বলে — গৃহহীন — আমি —মৃগশিরা নক্ষত্র-জাতক,
পিছনে তাকিয়ে দেখি একা, ঝাপসা চোখে দেখি —
পোড়া বাঙলার এই দেউলপাড়ায়; আস্তে-আস্তে ঢুকে পড়ছে — সন্ধ্যার লুম্বিনী...

ক্ষমা

শ্যামলজিৎ সাহা

মাতঃ ক্ষমা করবেন। এই জাতকের কথা পুনর্বার
মুখে আনবেন না — শেষ প্রহরে আপনার অঙ্গ যখন
সুগন্ধী ঘৃতের সঙ্গে দলা পাকিয়ে উঠেছে, আমি
নির্বাক, নিষ্ঠুর কোনও হত্যাকাণ্ড নিঃশব্দে সমাধা করি:
এই গব্যঘৃতে জীবনের সব দেওয়া নেওয়া, হৃদ্‌-শূন্যতা
আঁধার-দুঃখ, একটি জীবনে দপ করে জ্বলে ওঠা
তার পর ছাই হতে হতে শূন্যে উড়ে যাওয়া।
আপনার শরীরের শেষ রেশ, ছোঁয়াটুকু নিয়ে আমি
শোক বিমোচন করি: আমার হাতের অগ্নি পেতে
এ সন্ধ্যায় যতেক যাতনা তীব্র রোদের মতো ক্রমে
কোনও এক গহ্বরে ঢুকে পড়ে। আমি ভয়ে
চেতনায় লুপ্ত একভাবে ক্রমশ ঘি ঢালতেই থাকি
নীচ থেকে নীচে, শরীরের আরও নীচে।
রোমশের স্তুপ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর দেখি
আপনার উড়ে যাওয়া চুলগুচ্ছ, যেন বরাভয়,
যেন শেষ পতাকায় জাতকের শান্ত হওয়াটুকু।

ভাঙা সাঁকো, নদী আর স্বীকারোক্তি

অভিজিৎ রায়

ভাষা আজ সাঁকো নয়, কিছু চেনা শব্দের প্রাচীর;
দু'দিকে বিস্তীর্ণ বালি, মুঠো ভর্তি অস্থিভস্ম তার।
নিভে যাবে কিছু মেঘ, বরফেরা ছড়াবে আগুন
এ ভাবেই ঘৃণা লেখে প্রেমিকের কথা মুগ্ধতার।

প্রাচীন গুহার মুখে অস্পষ্ট আগ্রহে গুহালিপি
কিছু রেখা দিয়ে আঁকা গুহাচিত্রে রঙিন সন্ত্রাস;
কাহিনির বাঁচা, মরা হৃদয়ের ক্ষতটুকু ছুঁয়ে,
কিছু ছাই বিস্মৃতির খুঁজে খুঁজে বাঁচে ইতিহাস।

সাঁকো আজ ইতিহাস, নদী জল শুকিয়ে অতীত;
নুড়ি পাথরের গায়ে স্পর্শের তুমুল কথকতা;
ভাষা হারানোর দলে মেঘ, নদী, অরণ্যের পথ;
পর্যটক এইখানে এসে খোঁজে ফেলে আসা কথা।

স্বীকারোক্তি লেখা হবে, সাক্ষী দেবে ভাঙা সাঁকো, নদী;
মনের আরামটুকু এ ভাবেই লেখা যেত যদি!
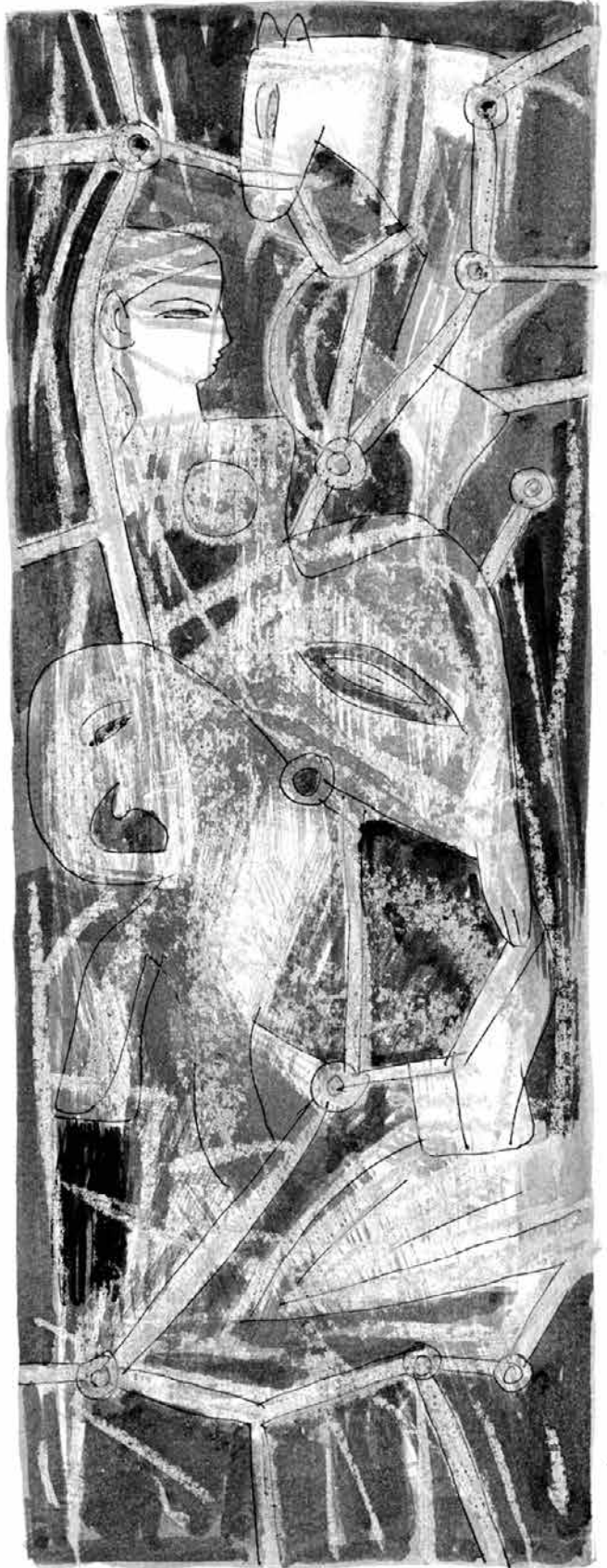
জল-প্রহরিণী

পার্থজিৎ চন্দ

আবার তোমার দিকে ছুটে আসবে
যে মৃত্যু চেয়েছ জলের ভেতর
গামা'র দোতারা, সে পুড়েছে আগুনে
বেজে উঠবে মাঝরাতে। রক্ত-ফোয়ারা
মূঢ় জগন্নাথ; হনন রাত্তির—
নীল জালিকার দেবী, ট্রপিক্যাল
অস্ফুটের গানে নিজেকে সাজাবে।
জিভের ঝিল্লির থেকে রক্ত ঝরবে
গায়ে এসে পড়েছে ভোরের আলো
ঝরে গেছে কবে, আজ উৎসব
জলে যায় সাদা রাজহাঁস, মৃদু
এ জীবন তীব্র শিলোঞ্ছপ্রবণ

তীরে শুধু মোলাস্কার জাদুঘর
তোমাকে হত্যার মায়া দিয়ে গেছে

মৃগশিরা, ছায়াপথ...
বুকফাটা জলকষ্ট
বাজের হলকা মেখে
আলিঙ্গন করো ধীরে
একটি শরীর শুধু
বৃষ্টি ভেজা জাদু-রথ
তোমার আকাশিমুদ্রা
রক্তমাখা পাখিটির
বাসন্তিকা, জীর্ণ পাতা
হসন্তিকা জ্বলে যায়
ভোরের কান্নার মতো
একা মৃত্যু তীরে ধায়

আলো, ঘোর সীমন্তিনী
ভীরু, জল-প্রহরিণী

ইতি যুদ্ধাহত

শ্যামশ্রী রায় কর্মকার

ভাল আছ বন্ধুবরেষু? কী কুশলসংবাদ দেব?
যুদ্ধের খবরাদি গোলাবাড়ি করে গেছে নিদ্রা-প্রাসাদে
ধ্রুবতারার বদলে দিগন্তে দাউদাউ ইউক্রেনের স্কুল
দাম্পত্য আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া পড়শিদের ক্ষতদ্বার
হাহাকার হয়ে উঠেছে জন্মের সামগান ভুলে যেতে যেতে

এ ভাবেই এক দিন পৃথিবী ঘুমোতে ভুলে যাবে
চোখের পল্লব জুড়ে বিকশিত হবে শুধু অনিদ্রাকুসুম
এই সব ভেবে ভেবে নিজেকে গড়িয়ে দিই বিছানার তটে
শ্বদন্ত বিঁধিয়ে দিই নিজের থাবায়

হঠাৎ আজ কী হল জানো! রাত্রি তখন প্রায় শেষ
দক্ষিণের জানলায় বিরলডানার এক পাখি বলে গেল
আমার বাগান জুড়ে গাছে গাছে ফুটে উঠছে রাগ ভৈরবী

তবে কি আবার কেউ
অর্চনা করছেন ডেলফির সুপ্রাচীন মন্দিরে?
রক্তাম্বরা কোনও নবীনা পিথিয়া
পৃথিবীর নাভি স্পর্শ করেছেন এ যুদ্ধের অন্ত জেনে নিতে?
কী এমন হল আজ? আগে তো ফোটেনি এত গান!

বারান্দায় ছুটে এসে দেখি
রাত-সরোদের তারে শান্তির আঙুল রেখে ধ্যানে বসেছেন
আকাশের আমজাদ আলি খান

সন্ধ্যার কুহক

সোহরাব পাশা

আত্মার করুণস্বপ্ন মৃত শহর ঘুরে ঘুরে
বিমর্ষ বিহ্বল

অবিশ্বস্ত আঙুলে—
প্রিয় চোখে মেঘের গুঞ্জন
উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধ্যার কুহক

তীব্র বিষয় বাসনা
পুরনো পাগলা হাওয়া ছিল তার অন্ধপ্রাণে

নোনাজলে কার ছায়া নিচু চোখে কাঁদে
কাটাকুটি-ব্যবচ্ছেদ রক্তমাংসে তার
কে ভাঙছে কবিতার সংসার
বিনয়ী হোক তার আঙুল

আমি তার জন্যে বারান্দায়
দাঁড়িয়ে থাকব
সকাল পড়বে এপিটাফ
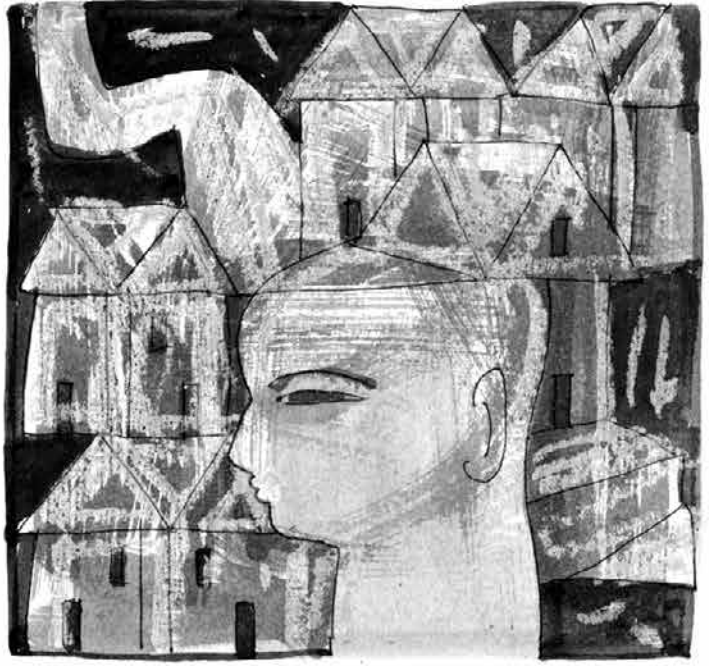
জয়ন্তী ঘাটের কথা

এস মনিরউদ্দিন

অবরুদ্ধ জলের মায়ায় জয়ন্তী ঘাটের সেই
কূলভাঙা ঢেউ আছাড়ি পিছাড়ি মাথা তোলে।
অদূরে কাশের বন নদীর হাতায়
খুঁজে পায় আগমনি গান। নৌকার পাটাতনে
এখনও পায়ের ছাপ রয়ে গেছে কার!
কার আঁচলের টানে অনন্ত দ্রাঘিমা ছুঁয়ে থাকে!

আদুর সকালবেলা অতসী আলোর টানে
ভেসে যায় ওই নদীপাড়; নদীর বাঁকের মুখে
তেঁতুল ছায়ায় বসে আছে উমাপদ।
বইঠা খচিত তার বাহু, শিরাওঠা—
পেশির বাহুল্যে কথাময়; হুঁকোর জ্বলন্ত টিকা
জেগে আছে, দেখ।

চোখের পেছনে যেন অন্য কোনও চোখ,
অন্য কোনও বিদায়ের সুর বেজে যায়।
সেই দিন... এখনও জলের মধ্যে আলোড়ন,
মৃত্যুবাহী স্রোতে ভেসে যায় ষোড়শী শরীর;
পাষাণী অহল্যা ওরে, ফিরলি না আর !

ওই ফিরে আসে সৌদামিনী। টিউশন শেষে
বুকে ধরা বইখাতাগুলি কেমন লালিত্যময়,
ভালবাসাবাসি।
আজকে জলের স্রোতে প্রকৃত প্লাবন।
চল রাই, পার করে আসি।

হৃদয়

পার্থপ্রতিম আচার্য

যাওয়ার আগে মুখচোরা রোদ
ওই বাড়ির দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাড়ির কুলগাছে টুনটুনির হুটোপাটি,
অপরাজিতা ফুলের গন্ধে
শেষবেলায় হামি খাচ্ছে বোকা মৌমাছি।

ধূলি-ধূসর প্রান্তরে অকপট গোরু চরে,
জন্মাবধি মফস্‌সলের অনাত্মীয় খড়কুটোয়
জড়িয়ে যাওয়া অনাদৃত হৃদয়ের খোঁজে—
গাছতলায় বসে থাকে সৃষ্টিছাড়া মানুষ।

মানুষ, মানুষকে ভালবাসে,
আবার এই মানুষ হয়ে যায় তীক্ষ্ণ তরবারি...
তবু এক পশলা বৃষ্টির আশায় —
প্রতিদিন গান লেখে বউরা কালিদাস।

অবসন্ন দুঃখের ভাঁজে অল্প অল্প সুখ জেগে থাকে,
ঘৃণা থেকে প্রেম বেছে অসামান্য হাঁস—
দিনশেষে দিয়ে যায় ডানার স্পন্দন।

দুই বাড়ির মাঝে ঘাসপাতার জঙ্গল, বিষণ্ণ দেওয়াল...

জানালায় পর্দা ফেলে গান গায় যে
হে যুবক রোদ্দুর —
তার জন্য থেমে যাও আরও কিছুক্ষণ।

পাখি সম্পর্কে ভূমিকা

অর্ণব পণ্ডা

আজকাল চুপ থাকো খুব।
প্রতিরোধ করো আয়ুক্ষয়।
ঘরে বাইরে শত্রুও এড়াও।
হয়েছ শহরবাসী, গম্ভীর ও বোবা।
বিরক্ত করি না আর।
দূর মফস্‌সল থেকে আমি দেখি, পাখি যায়...
বৃষ্টি এলে ডানা ভিজে ভারী হয় বলে
আমাদের কার্নিশের নীচে এসে বসে।
মুখ ঘুরিয়ে একঝলক দেখছে আমায়!
সে দিন ছাত্রীর বইয়ে অকস্মাৎ চোখে পড়ে অদ্ভুত বিজ্ঞান এক
আমি যা জানতাম না আগে:
পাখিদের হাড়গুলি ফাঁপা হয়। খড়ের মতোই ফাঁপা।
এ জন্য পাখিরা খুব উড়ে বেড়াতে পারে স্বাভাবিক।

আমার কার্নিসে এসে বসতে এক দিন।
আমার পুস্তক পরে বিষ্ঠা ফেলেও স্নেহটি মেখেছ তুমি
আমার মায়ের হাতে।
জানালা থেকে লক্ষ করি অভ্যাসবশত প্রতিদিন
উড়ে যাচ্ছ উঁচু থেকে আরও উঁচু স্থানে স্থানে
ফাঁপা শিরদাঁড়া নিয়ে
স্বচ্ছন্দে বসেছ তুমি শহরের শীর্ষতম শহিদচূড়ায়।

ভিক্টর

সুদীপ বসু

খুব স্লো অন্ধকার চিরে সাইকেল চালিয়ে লোকটা বাড়ি ফেরে। ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। গোঙানি থেমে যায়। 'তোতোন .... আমার তোতোন....' 'তোতোন ... আমার তোতোন ...' ঘোড়াসাহেবের মাঠে চাপা জোছনায় ভিক্টর পাশ ফিরে শোয়। শেষদিকে মুখে রক্ত উঠে এসেছিল। 'জীবন অসম্ভব' — ভিক্টর জানিয়ে গেছে। লোকটা ভিক্টরকে সাবধানে ক্রস করে আসে।
'জীবন অসম্ভব' লোকটা মাথায় তোলে বাড়ি। 'টিভি নেই? কী গো? টিভি নেই তোমাদের?,' লোকটা চিৎকার করে। লোকটা আগুন নিয়ে খেলে। টিভি নেই? কার্টুন-ফার্টুন নেই? মিউজ়িক? কিছু তো একটা চালা...'

জলদর্পণ

সৌমিত বসু

কার কথা শুনে তুমি এত দূর পড়াতে এসেছ
এক-একটি অক্ষর গেঁথে তৈরি করা জলে
স্নান সেরে নিচ্ছেন শীলভদ্র, তুমি রজকিনী।
আমি পাড়ে বসে তাকিয়ে রয়েছি
জলে ডোবানো তোমার দু'খানি পায়ের দিকে।
কত আলতা অপচয়
কত শরীরের তাপ বুক ভরে নিঃশ্বাস মেখে
সে আজ ডুবেছে সহসা। আজ আচম্বিতে ঢেউ দেখে
সব মনে পড়ে যায়।

এক-বুক জলের ভেতর সংসারের হুটোপুটি। আমাদের নৌকা নেই,
১০০ দিনের কাজ নেই, মরে গেলে
ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। শুধু যখনই
গাছে গাছে ঘষা লেগে গেলে আলো জ্বলে ওঠে, তার বিদ্যুতেরা
কাঠকুড়ানিদের জিজ্ঞেস করে তারা বাড়ি ফিরে গেছে কি না
ঠিক তখনই আমাদের নবজন্ম হয়, তখনই
আমাদের মায়েরা কোল পেতে শুয়ে থাকে গাছের ছায়ায়
বনজঙ্গল ভেঙে নদীর কিনারে এসে ভাসে দেবশিশু।

কার কথা শুনে তুমি বিধ্বস্ত হয়েছ এত কাল
তোমার সিঁড়ির পাশে একমনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ভয়
তুমি তাকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে এসো।

নিজেই লিখে চলা সর্বনাশ

সুদীপ চক্রবর্তী

প্রাচীন সাইকেলে যেন কোনও জং নেই আর। শিং ভাঙা গোঁ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে সপ্তগ্রাম স্টেশনের দিকে। জেঠিমা কাঁদছে, বোনের কাতর অনুরোধ— 'এই শরীর নিয়ে কলকাতা যাস না দাদা।' এত যে মেঘের দল অথচ আমরা কেউ আটকাতে পারছি না আপনাকে। অবশ্য ঝড়কে কে কবে আটকাতে পেরেছে, বিদ্যুৎকে কী ভাবেই বা বাক্সবন্দি করতে পারে মানুষ। স্থবির হয়ে আছি, কাঁপছে সারা শরীর আর কোনও আশঙ্কা নেই আমাদের অন্তত। রগড় দেখতে যে ভাবে জমে যায় মানুষ, জনতার মধ্য থেকে ওঠে গুঞ্জন— পাগল হয়ে গেছে! মাথাটা গেছে পুরো! প্রেম, না। না। চোখের সামনে বাবাকে খুন। না। না। কবিতা। কত মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এই শেষবার আপনার ঠোঁট থেকে রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছি আমি। মুছিয়ে দিচ্ছি সব না পাওয়া, অতর্কিত অ্যাটাচির ধাক্কা। মুছিয়ে দিচ্ছি খাসির মাংস, ঝুরি আলুভাজা, চাটনি, সামান্য কিনতে না পারা। আর বিস্মিত চোখে দেখছি সর্বনাশ নিজেই লিখে চলেছে কবিতা। লিখে চলেছে — এ মাসেও মাইনে হবে না। লিখে চলেছে — লিস্ট থেকে নাম কেটে দেওয়া। লিখে চলেছে— গোপন ছুরিকাঘাত। লিখে চলেছে — দারিদ্র—গড়িয়াহাট, পাঁচটাকার মুড়ি, সব অপমান— কান্না। লিখে চলেছে— মাস গেলে তিন হাজার টাকার ওষুধ। লিখে চলেছে— ঈর্ষা, লিখে চলেছে — 'এতগুলো দীর্ঘ কবিতা লিখেছে, একটু যন্ত্রণা পাবে না।'

নকল

শর্মিষ্ঠা

চরাচরে কালোর ভিতর উন্মাদ
আলোর মতন লাগে তোমার এমনি সব
মেঘে পুঁতে ফেলা নক্ষত্র আর একটি দু'টি চাঁদ,
যাদের নিজের কোনও আলো নেই

অথচ এই রাত আসলে একটি যেমন তেমন আঁকা ছবি,
অনেক খুঁত তার ঢেকে যায় বাতাসে
জলভরা হাওয়ার মৌসুমি শব্দে
ঘুমিয়ে পড়ে মানুষ আর তাদের ছুঁয়ে থাকা বালিশ

হাওয়া দেয়, একটি দু'টি করে রাশি রাশি পাতা জড়ো হয় বনের একান্তে
জোয়ারের হাওয়ায় চোখ লেগে আসার আগে
ট্রাক থামিয়ে এক লাফে সে নামে
খোঁজে আগুন কিংবা চা।
পায় না। বন্ধ ধাবার দড়ির খাটে বসে হিম খায়

তার পর দেখে সে দৃশ্য
দৃশ্যও দেখে রাখে তাকে

বনের হাতায় নিজের মিথ্যে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে
চাঁদ আসলে, সত্যি সত্যি
নিজের ছায়া হবার চেষ্টা করে চলে নিরন্তর

সরণি

সীমা জানা

একা একা হেঁটে যাওয়া রাস্তায় সন্ধে নেমে এলে
ভিড় জমে ওঠে। নদী ও নৌকো, শেষ রাতের ব্যালকনি,
কুয়াশায় মুড়ে থাকা গাঢ় লাল ফুল, বিশ্বাসী ও বিশ্বাসের হননকারী
নানা লোকজন গায়ে গা ঘেঁষে হাঁটাচলা করে।
একে অন্যকে ধাক্কা দেয়
এক মধ্যবয়সি শবদেহ তুলে আনে শান্ত সমাধি চিরে

আমার শবের ভেতরেও একখানি রাস্তা ও সন্ধে রাখা থাকে।
সেখানেও কত গাছপালা, কপোত কপোতী, ক্লান্ত পক্ষিরাজ
পাশে তার নদ ও নদী মিলেমিশে এক হয়
বিকেলের আগে ঘুমন্ত নদীটিকে রেখে নদ চলে যায় দেশান্তরে
বৃষ্টি বুকে নিয়ে মেঘ নদীর ওপরে ওড়াওড়ি করে

একা একা হেঁটে যাওয়া রাস্তায় রাত নেমে আসে। গাঢ় অন্ধকার!
অপেক্ষায় থাকা চোখেরা শান্ত হয়, প্রিয়জন ফিরে আসে ঘরে
ফেরারি কঙ্কালের দাঁত, নখ নেমে আসে
শবের ওপরে। ঘুমের ভেতরে

অশনি তৎকাল

দীপা পান

একদা এক উপাখ্যানের কাঠ পুড়ে পুড়ে ছাই হল একা
একদা এক উপাখ্যানের নদী দূরে গিয়ে রেখে এল ঢেউ।
তার পর থেকে সব গল্প শেষ। পড়ে আছে নিরীহ শিকড়,
অভিঘাত তীব্র ছিল তাতে। আমার হৃদয়রেখা ছিল গাঢ়,

যার অভিসম্পাতে আজ পুষে রাখা অভিমান আলগা হয়।
অবহেলা থেকে আলগোছে তুলে রাখি ক্রোধের পোশাক
আগের পৃষ্ঠার থেকে চুরি করে রাখি অশনি তৎকাল
গভীর গভীরতর শ্বাস নিই। শান্ত হই নির্জন ঘরে...

এখনও সেই উপাখ্যানের কাঠ পুড়ে পুড়ে ছাই হয় একা
এখনও অনাদায়ী শরীরের জিভ সমোষ্ণরেখায় চরে।
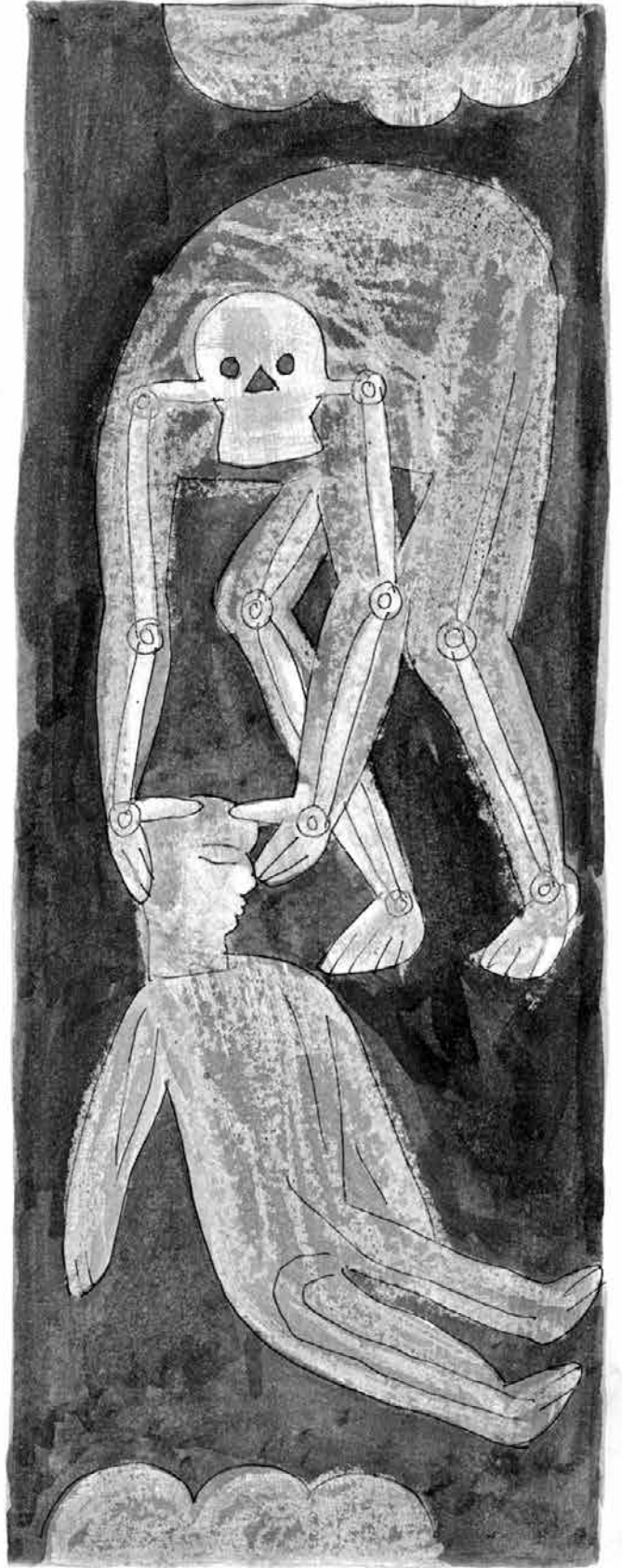
অনুনয়

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমায় নিয়ে নিচু পাহাড়দেশে যাব
মেঘের প্রান্তরে করব চাষ
শস্য দেব হাতে, পুষ্প ভোররাতে
সাদা ফুলের নাম চন্দ্রহাস
বর্ণহিম রঙে ঠোঁটের কোমলতা
কঠিনে কালো মাটি, আজ সোনা
তোমায় এটুকুই বলতে হবে, তুমি
আগের মতো ভালবাসছ না

তোমার শব্দেরা মন্দ্রে ভিড় করে
তাদের গেঁথে গেঁথে বাঁধব গান
শোনাব তন্দ্রায় বিষাদ আগমনি
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগবে টান
পোশাক খসে গেলে তুলিতে এঁকে দেব
কী রং নেবে, ভেবে দিন গোনা
তোমায় এসে শুধু বলতে হবে, আর
আগের মতো ভালবাসছ না

গন্ধ জমানোর পুরনো খেলা ফের
করব শুরু, আজও সে ঘ্রাণে বুঁদ?
স্বচ্ছ স্ফটিকের পাত্রে সঞ্চিত
সব অসুখ আর সব ওষুধ
আমায় শুধু এই জড়িয়ে থেকো, ভুলে
বোলো না কক্ষনও, আসছ না
সহজ কাজ, তুমি বলবে রোজ এসে
আমায় আর ভালবাসছ না

আবার এলাম ফিরে

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

আর কী বলার আছে, সব কথা হয়ে গেছে শেষ
পাতার বাঁশিটি নিয়ে চলে যাচ্ছি সীমানার পার
ভালবাসা দিয়ে যাচ্ছি মাঠেঘাটে সবুজ প্রান্তরে
সঙ্গে নেই দামি রত্ন, মণিমুক্তো পথে হারাবার।

তুমি গেয়েছিলে গান, বাতায়নে লেগে আছে সুর
পাখিদের সাথে নিয়ে পরিক্রমা, মুগ্ধ ভালবাসা
দিঙ্‌মূঢ় আমি একা, বুক জুড়ে বিষাদ স্বনন
আবর্তের মাঝে আছি স্বপ্নহীন নীল ভগ্ন আশা।

আমার সুখের জন্য চারুশীলা হাত পেতে আছে
আমি যত দিতে চাই, সে কিছু নেবে না তুমি জানো
আকাশের বুক জুড়ে মেঘমালা, অস্থির বাসনা
বিভ্রান্তির কালো দিন সব কিছু পলাশরাঙানো।

আবার এলাম ফিরে জানাই সাদর আবাহন
এসো বন্ধু ভালবেসে বুকের পারদ যেন নামে
এ জীবনে যাকে চাই সে এখন আনন্দ অতীত
আমার দৃষ্টির রথ চালাক সে, কখনও না থেমে।

কাকে কী বলব বলো, কেউ নেই শোনার মানুষ
দিগন্ত বদল করে সব কিছু সঁপে বসে আছি
অনুরাগে ভর করে উড়ে যায় স্বপ্নের ফানুস
জীবনের স্বপ্নঘরে নিরন্তর খেলা ‘কানামাছি’।
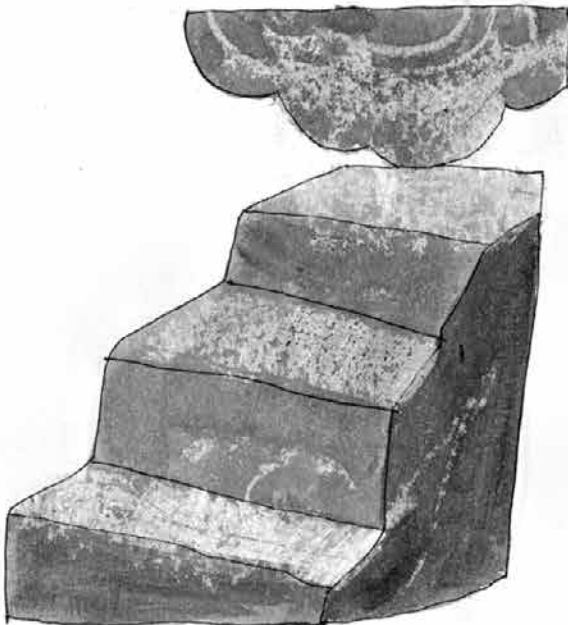
দূরত্ব

রাজকুমার রায়চৌধুরী

প্রিয় বিচ্ছেদ তোমার কাছে রেখে যাই মুগ্ধ নিঃশ্বাস,
ও ভুল বানানের জীবন, নিজস্ব ভাষায় ভাল থেকো ।
অন্ধ এ-লেখা তোমাকেই খোঁজে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের রঙে।

ক্রমশ গানের রূপটি প্রকাশ পায় স্পর্শের অধিক দূরে,
খুঁজি অন্ধকারে হিরের নথের লাফিয়ে ওঠা আলোটি।
মনে পড়ে — হারানো হাসি, রোদের ভেতর সবুজ গোলাপ
স্মরণীয় একটি রাগ কার কাছে রাখি, কোন শর্তে দু'হাতে?
তোমার সমগ্র রহস্য দু'পাশে জল ঠেলে ভাসে তরীরূপে,
তার গায়ে বেঁধে দিই স্বর্ণসীতাহার, আশ্চর্য প্রণয়পাশাটি।

সেই রঙিন ছোট্ট বন্দর শহরে তুমি ছিলে রাত জাগা ঢেউ,
শূন্যের মধ্যে উঠে, পূর্ণ সমাদরে বাড়াও তোমার বিস্তার।
সরু গলি আজও অভিসারে চলে জ্বলন্ত পলাশের রঙে...
স্তম্ভিত বাঁশি তোমাকে লিখছে তার ভাষায় বাতাসের ওঠানামায়
রোজ অভ্যাসবশে তোমার বাড়ির নামটি লিখি মহাশূন্যে।

অনন্ত চমকে চমকে ওঠে কম্পিত গ্রহণ ও দ্বিধার ছায়া।
তুমি মানে গোপন বিচ্ছেদের শেষ ছোঁওয়া, তুমি মানে জলের দাগ...

কাঁপে হলুদ পোস্টকার্ডে আঘাতের ক্ষতে নিঃসঙ্গ জগৎ।
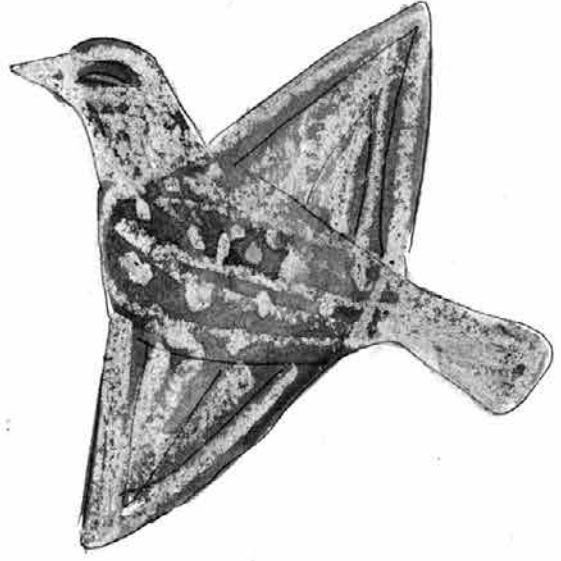
কর্মখালি বিষয়ক

কামরুজ্জামান

বায়োডেটা

রোজ একটা পাখি শুধু ওড়ে
হাওয়ায় ভেসে আসে তার পালক
দেখ উড়লাম। ছিন্ন বায়োডেটা ভেসে
পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চ

সে আমাকে, আমি তাকে তাকাই
চোখ বরাবর— এক মিনিট দু'সেকেন্ড
শিয়রে পালক খসে রোজই
পুরাতন দ্বিগুণ— নতুন জন্মায় হাফগুণ

আমরা দু'জন দু'জনের চোখে দেখি ভালবাসা
কেউ-ই জানি না— কে উড়বে আগে
দিব্যি খাচ্ছি, একে-অপরের পাঠানো খুদ...

নিয়োগপত্র

প্রতিটা ডাকবাক্সে জমা হয় বেকারত্বের হাহাকার
রক্তে আলোক বিচ্ছুরণ থাকতে থাকতে
একটা নিয়োগপত্র এনে দেবেন পিওন (অমিয়) কাকু?

দেখুন, দ্রুত অস্ত যাচ্ছে শেষ ডাক
বছর বছর দীর্ঘশ্বাস রেখে আমি বিলি হচ্ছি
শর্ত ভেঙে বিয়ারিং হচ্ছি আমি সমেত হলুদ ডাকঘর

আর দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী বিপথগামী ঝোড়ো পরিবার...

আলোছায়া টকিজ

সুজিত দাস

সব বিষণ্ণতার একটা করে ডাকনাম আছে।
ঝুপ্পুস কদমগাছের নাম রাধিকা। ইথারবাহিত পরকীয়া, ধরো যমুনা অথবা মেঘনা।
ব্রিজের ওপর থেকে অফিস-ফেরত ফোনকলের ডাকনামই তো রাসলীলা।
যৌবন আর দ্বিতীয় বসন্তের মধ্যে একটা ধর্মনিরপেক্ষ আলপথ আছে।
আর আছে হালকা পারদের আভাস। দুই ভ্রু-র মধ্যে, সার্জেনের ছুরি দিয়ে আঁকা।

এক-একটা রবিবারের ডাকনাম আধকিলো মাংস।
পাড়া কাঁপানো বাঁশি, প্রেশারে প্রেশারে অরুণমালিকা।
বিকেলগুলো টিউশন ফেরত বালিকার সাইকেল। উড়তা পনিটেল।
স্পিলবার্গের ছবির মতো বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁট,
স্তব্ধতার বিপ্রতীপে দিনের শেষ ট্রাম। রংচঙে পৃথিবীর বুক চিরে মৃদু লৌহরেখা। টুংটাং ঘণ্টাধ্বনি।

ওক কাস্কের ভেতরে রাখা
এই সব পুরনো বিষণ্ণতাকে আমি রুবি রায় নামে চিনি।
এদিকে সরোজিনী সঙ্ঘের ফুটবল টুর্নামেন্ট। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর।
ঘেমে ওঠা জার্সির ভেতর কেঁপে উঠছে গোলপোস্ট। মনে পড়ে রুবি রায়, ক্রসবারে তোমাকে, ট্রা লা লা লা...

এক-একটা নেশাতুর সন্ধ্যার ডাকনাম মংরা মাতাল।
পাথর কুঁদে বানানো পেশি, পেটের ওপর কষ্টিপাথরের ছয় থোকা দ্রাক্ষাফল।
খুনিয়া মোড়ের দিক থেকে ভেসে আসে দলছুট মাকনা হাতির বৃংহণ।
নিষ্পলক মংরার দৃষ্টি ভেসে যায় বাতাবাড়ির দিকে। এই উতল অরণ্যের ডাকনাম আলোছায়া টকিজ।
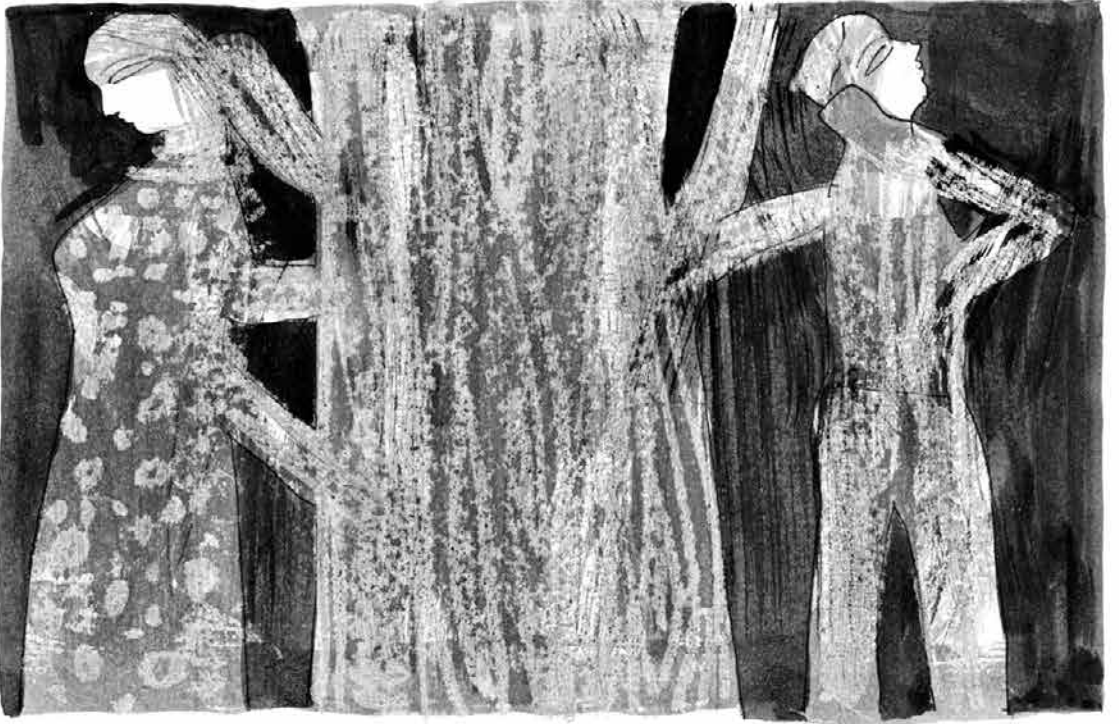
চাঁদের থালায়

তুষার ভট্টাচার্য

হাড়হাভাতে আমাদের এই ভাঙা ঘরবাড়ি,
ছাপোষা নুয়ে পড়া শামুক জীবনে
যদি কখনও মধ্যরাত্তিরে
পূর্ণিমার ঝকঝকে
রুপোলি চাঁদের থালায় ভেসে ওঠে
ধবধবে সাদা গরম ভাতের
গন্ধ মাখা ছবি
তবে ভুখা পেটে শূন্য টিনের থালা বাজাব
আনন্দ উল্লাসে;
আমাদের নুন ঘাম শ্রম অশ্রু জলের চিহ্ন মাখা
জীবনের ইতিকথা এখনও ফুটে ওঠে
প্রতিটি খুদ ভাতের দানায়
আর স্বপ্নপোড়া বিষাদের দিনগুলি কেটে যায়
অনাদরে অবহেলায়;
প্রতিনিয়ত আমাদের এই বেঁচে থাকা,
কষ্টের দিনগুজরান
প্রপিতামহ ঈশ্বর যদি কখনও
আদুড় গায়ে ধুলো কাদা মাটিতে নেমে এসে
এক বার দেখে যান!

শ্রীদুর্গা সহায়

রত্নদীপা দে ঘোষ

পৃথিবীর প্রথম তরঙ্গ পাঠ করে দেখি
যাকে এতদিন গোধূলি বলে জেনেছি
সে আসলে আকাশছোঁয়া নক্ষত্রগ্রাম!

পৃথিবীর আদিমূর্ছনা পাঠ করে দেখি, স্বয়ং ঋকবেদ!
প্রার্থনায় জড়ানো শ্রীদুর্গা সহায়। প্রাচীন গয়নার মতো
শাস্ত্রীয়, ঘড়া ভর্তি পিলসুজের পঙ্‌ক্তি।

সৌরফিনকির ছটা! দুই প্রান্তে লেখা সূর্যমন্ত্রের সেজবাতি।
নিখিলের লম্ফ পেরিয়ে দেখি রংবেরং অবয়ব, নিষ্ক্রমণের
শিরস্ত্রাণ! কুসুম-কুসুম সঙ্গীত, অনন্তকালের পাণ্ডুলিপি
ছুঁয়ে দেখি, মহাকালের চোখ, চোখের নদী!

মেঘলোকের নবগ্রহ ভেদ করে হাজির বিশ্ব-পুরোহিত! তাঁর
ডগোমগো পাঠ করে দেখি, টাটকা স্রোত! দুলছে ব্যক্তিগত
নোঙর! নৌকোর চাবিকাঠি। সামুদ্রিক আনচান, সাঁতারের
ভাদুগীতি শুনে দেখি, তপস্যায় জ্বলজ্বল সপ্তর্ষির শ্লোক।

মহাশূন্যের ডাকপিওন পাঠ করে দেখি রাঙামাটির রানার।
দেবালয়ের শুদ্ধহাসিটি মুখে! কণ্ঠে বসরাই মুক্তোর জলসা!

তোমাকে পাঠ করে দেখি, শাপলা বালিকা!
আশ্বাসের পিদিম জ্বেলে বকুলের রোদে বসে
ফকিরিচাঁপাকে শেখাচ্ছ একতারার দৈবঝুলি!

পাণ্ডুলিপি

রামকৃষ্ণ মহাপাত্র

এত যে অন্ধকার, এত আশ্চর্য নীরবতা
তুমি তাকেই আত্মস্থ করো রোজ!
নতজানু হও ফুলেদের কাছে,
তুমি তো জানো,
ফুলের ভেতর নিদ্রিত থাকে
অপরাহ্ণের কিছু আলো;
আমি তাকেই লিখে রাখি মহানভ শূন্যতা,
এই পৃথিবীর পাতায় পাতায়

আগুন ছড়ানো সব ঢেউয়ে...

চিরাচরিত

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

বিচ্ছেদকাতরতা নিয়ে তবুও সকাল
আসে বসে পিঁড়ি পেতে
ভেজাফুল বেলপাতা দুব্বো সাজায়
কী যেন কোথাও ছিল, নেই...
ফাঁকা হয়ে আসা এক চরাচর
এঁকে রাখে চিহ্ন স্মৃতির!
বারান্দাবাগানের ফুটে ওঠা
আকাশেতে রঙের বদল
সন্ধ্যার জমায়েত ওই পারে ঝলমল
এ সবের মাঝখান দিয়ে একা বয়ে চলা
শীর্ণ নদীর পাশে বাড়িটির গায়ে
শেওলা সবুজ কিছু গাঢ় হয়।
যা কিছু সহজ ছিল নৌকার মতো
জল তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে অবেলায়
বিরুদ্ধ স্রোত আর ভাসমান জংলি পাতা
ঝরে পড়া পাক খেতে খেতে ওই
ঘূর্ণি অতল খুঁজে ডুবে যাক।
ভেসে থাকা মানেই তো বেঁচে থাকা নয়
দু'-একটি শালিক চড়াই অবসরমতো
খুঁজেপেতে এ পাড়ার দানাপানি
ঠোঁটে মেখে উড়ে যাক অন্য পাড়ায়
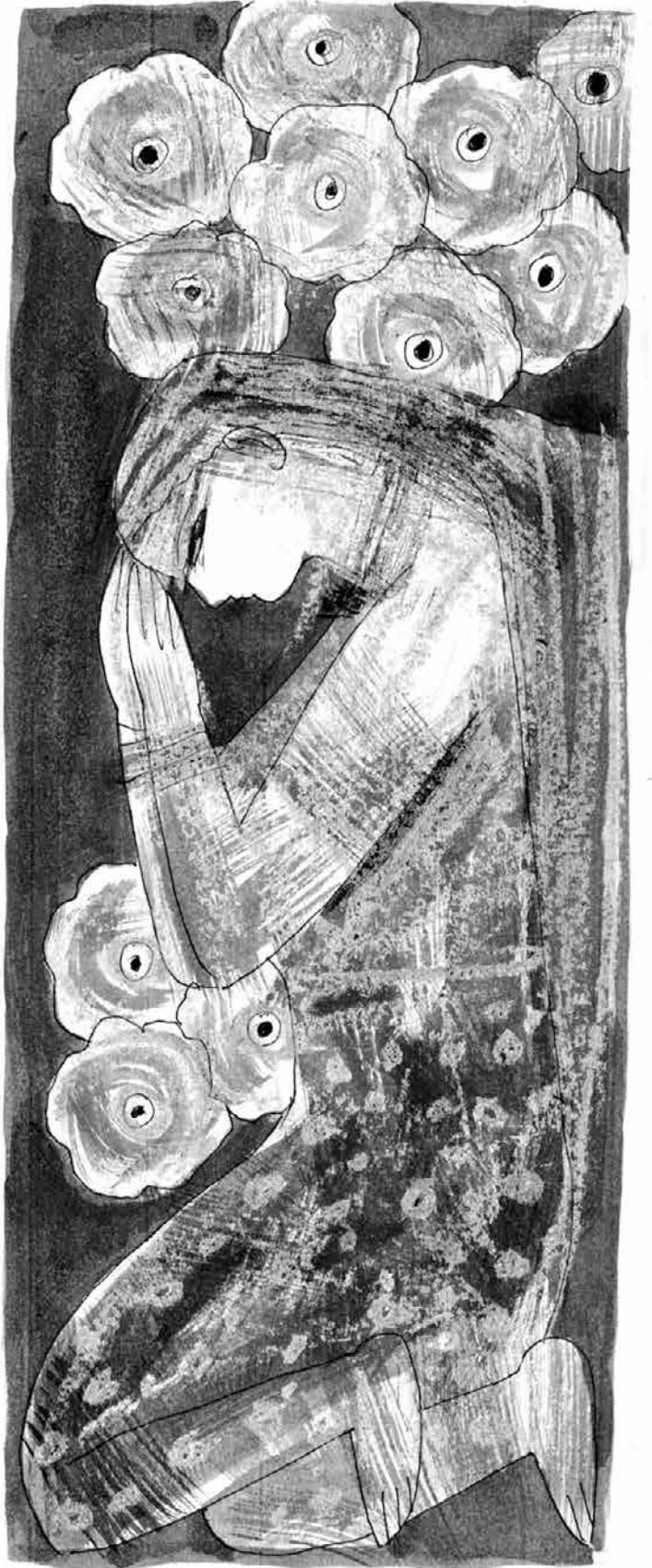
নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গা ভাসান

মলয় ঘোষ

সেখানে শরতের নরম রৌদ্রের গন্ধ বাতাসে ছড়ায়
মেঘের কলস উপুড় হয়ে আছে সারাটি দুপুর
ঘন নীল রং আকাশের গায়

গাঙ্গুলিদের ব্যস্তসমস্ত ঠাকুরদালান, মস্ত আয়োজন
প্রতিমাটি একচালা, কুমোরের নিপুণ হাতের শিল্পকলা
পেটোর তুলিতে আঁকা পুরাণ কাহিনির চালচিত্র
বরাসে-মধুখালির দ' থেকে বাউরিরা এনেছে তুলে ফুল
সদ্য ফোটা রাশি রাশি পদ্ম

ঢাকেও পড়েছে কাঠি, বোধনের শুরু শরতের তালবাদ্য
বনেদি বাড়িটিতে দুর্গাপুজোর হাঁকডাক, আসা-যাওয়া দিনরাত্র

পুজোর দালানে রাণুদির সবুজ শাড়িটি খুশিতে তুমুল
সুনয়নী রজনীগন্ধা গুঁজেছে নতুন খোঁপায়
সুবেশা রমণীরা হাসি আর গল্পে মশগুল

অদূরে অগোছালো চুলে-ঘেরা, মুখ-চোরা এক কিশোর
সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশে
শরতের দমকা বাতাসে মিশে নিজেকে রেখেছে আড়াল
রসুনচৌকিতে বাইশমালির দীনু শানাইয়ে তুলেছে আগমনি সুর
গ্রামখানি চেনা চেনা, ফিরে দেখা নিশ্চিন্দিপুর

শরতের রূপ রস স্পর্শ বর্ণ গন্ধে দেবীর চক্ষুদান
বিভূতিভূষণের দুর্গার কত না-মেটা সাধ, বোধনের আগেই ভাসান।

অন্তরে

সঙ্ঘমিত্রা হালদার

কে এক সর্বক্ষণের ঝুমঝুমি বেঁধে দিয়েছ অন্তরে
কী এক সর্বক্ষণের ঝুমঝুমি বেঁধে দিয়েছ অন্তরে
আমার উপায় নেই, উপায়ের গায়ে চোরকাঁটা জামা
যেদিকেই যাও কেটে ছড়ে হন্যে হবে

ব্যথা বেদনায় নদী নালাও শুকিয়ে আসছে, তবু
কে তুমি পরমানন্দ চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছ আমার দিকে

সদ্য ফোটা ভ্রূকুটি তোমার

শুধু আছে পড়ে আছে এই লাঞ্ছনার কোনও শেষ নেই

স্মৃতি

অর্পণ গুপ্ত

হাওয়ার ডাক পেয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখি।

শস্যের দানা ফেলে আজ সে খুঁটে খাবে রোদ।
নীচে পড়ে কংক্রিট খেত, ভাঙা ভাঙা মানুষের ছাঁচ

মাঝে তার আলোছায়া, খোলসে চিকন কারুকাজ।

ঠোঁট থেকে কুটো পড়ে জেগে ওঠে নদীর আকুতি...

মেঘের ওপরে মেঘ, পড়েছে আলোর ছায়া জলে
আচমকা ডানা মেলে, দিগন্তে কেঁপে ওঠে শোক

পাখির দু'চোখে তবু নীল
ডানা থেকে ঝরে যায়, কৈশোর। গোল্লাছুট। বিষাদ পালক...
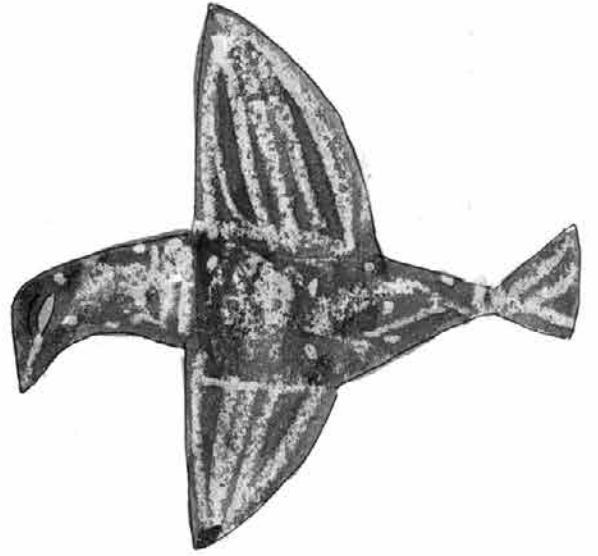
তান

ঋতব্রত মিত্র

সঞ্চয়ে কার টান পড়েছে? ক্রমাগত হচ্ছে কি ক্ষয়?
আমার থেকে আমিই যদি ধার নিতে চাই খানিক সময়?

বইছে সময়?— নাকি আমিই অখণ্ড বিখণ্ড কালে
বইতে থাকি?— সময় আমার অচলগতি কার আড়ালে!

কালপুরুষের নজরঘেরা এই কি সঠিক প্রকৃতিপাঠ?
পেশকারে তালরূপ বোঝাতে তানকারি তার এমন সপাট

বেতাল আমি। শাস্তি-স্বরূপ! সামনে মহামাংস প্রসাদ
চার মাত্রা। চৌগুণ লয়। বেদম তেহাই। অগম্য খাদ

তালি-খালির অধিক্রিয়া— আর কি তবে ফিরব সমে?
সত্ত্ব কখন ত্যাগ করে যায়, রাস্তা গড়ায় রজস্তমে

আকাশ থেকে পাতালপ্রবেশ— জীবন তো জীবন্ত বলেই
মৃদঙ্গে বোল— সুরলহরি এগিয়ে চলে মৃত্যু কোলে

গ্রহ থেকে আগ্রহ। যে রসঘন সে বিগ্রহসার
জাত্যভিমান ভুলিয়ে দেখায় বিন্দু থেকে নাদের প্রসার

জন্মাজন্মঅনিশ্চয়ে সময় বাঁধা সেই প্রসারে
সুখদুঃখের অলীক প্রতাপ যে বোঝে সে আপনি পারে

শূন্য থেকে পূর্ণে যাওয়ার চিরকালীন এই আহুতি
অধন্য তার দৃষ্টিপথে অকাতরে ছড়ায় দ্যুতি

পূর্ণ থেকে শূন্যে ফিরি? — সূত্র অভিধর্ম বিনয়
যুক্তিতে অসিদ্ধ তবু অনুভবে সিদ্ধ কি নয়?

স্থির হয়ে আছে

দেবব্রত দত্ত

কখন কীভাবে বদলে যাচ্ছে শব্দ রং অর্থ,
অসংলগ্ন লাগছে সব। আর আবেগ দিয়েও
তাদের স্পর্শ করা সম্ভব নয় ব্যর্থ রূপকথাগুলি।
দিনগুলো রাতের চেয়েও অনেক বেশি নিঃসঙ্গ।
নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে বেজে ওঠে
এত দিনের মূল্য দেওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা। যেন
নিজস্ব কোনও ভূমিকাই নেই জীবন যুদ্ধে!
আলাপ-চলন-বিস্তার ছাড়া সব কিছু বুঝতে পারা কঠিন।
মনে হলেই আবেগ গলে যায়, অজান্তেই
অনুভব করা যায় চোখ ভিজে গেছে। এই কান্না
আসলে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা ভবঘুরে পথিকটির।
কল্পনার সঙ্গে সংঘাত, স্বপ্নের সঙ্গে ছলনা, আর
বিশ্বাসের সঙ্গে প্রবঞ্চনা। কিন্তু তার পরও মানুষ
ফিরে যায় নিজেরই আশ্চর্য সৌরভ নিয়ে।
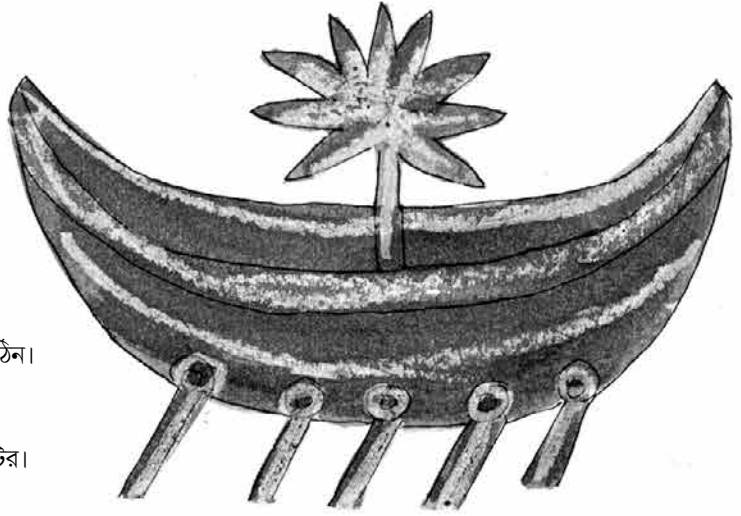
সমুদ্রমল্লার

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

এসো এবারের মতো, দূরত্ব ডেকেছে, যাবে যাও
নিজস্ব বারুদ ছেড়ে পা-দু'টি বাড়াও অনিশ্চয়ে

ও-পারে আকাশগঙ্গা, শালুক-নৌকোটি দোলে জলে
জল কি পাখির মতো ডানা মেলে ঝড়ের সময়ে

সুতীব্র গরমে জ্বলে পেরিয়েছ পাহাড়-পর্বত
ভীষণ দহনে কালো, সারা দেহ বিরহ-বিধুর

ভেবেছ দেখিনি কিছু, বুঝিনি তোমার দাহজ্বর
কপালে হাতের ছোঁয়া, ভেবে দেখো, অনন্য সন্তর

বৃষ্টি পড়ে ঝির ঝির, অথই সাগরে ভাসে বোধ
পিছল অগম্য পথ, ভাসমান নাবাল সুদূর

বাঁশিতে নিবিড় বাজে যে-বিজন উদাস দুপুর
না-শোনো না-শোনো, সাঁই, অনন্ত নির্জন সেই সুর

জানি তুমি অনির্দেশ যাবে বলে এসেছ সত্বর
ফুলের মৃত্যুতে কবে ব্যথা পায় ঘন নীল ঝিল

সম্পর্ক-সুগন্ধী ফুল ঝরে গেলে অনন্ত পাঁচিল...
দুটো বিন্দু এক হলে সময়ই শিকারি মহাচিল

শালুক-নৌকোটি দোলে অগাধ জলের তীরে বাঁধা
বাঁশিটি বেজেই চলে যতক্ষণ ভাঙে নদীপার

নদী তো চলন্ত গান, বসেছি জলধি নিয়ে কোলে
বাজাই অসীম ঢেউ, বেজে যায় সমুদ্রমল্লার...

অকালবোধন

দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি দাও ডানা ভাঙা পাখির পালক,
আমি তাতে এঁকে দিই চন্দন-তিলক।

তুমি দাও দাউদাউ সর্বগ্রাসী রাগ,
আমি তাতে লিখে রাখি চাবুকের দাগ।

তুমি দাও স্নানদৃশ্য, চুলে জমা মেঘ,
আমি ভাবি চাষা পায়ে ধানের আবেগ।

তুমি দাও মায়াঘন চোখে অপবাদ,
জোনাকির বুকে শুনি আলোর সংবাদ।

তুমি দাও পিপাসায় রক্ত মাখা তির,
আমি বুঝি বৃদ্ধ নদী ব্যথায় গভীর।

তুমি দাও ছেঁড়া পদ্য, প্রজ্বলিত ধূম,
ফুলের সাঁতারে লিখি ভ্রমরের ঘুম।

তুমি দাও মাতৃহারা শিশুর রোদন,
নীলপদ্মে আমি আঁকি অকালবোধন।
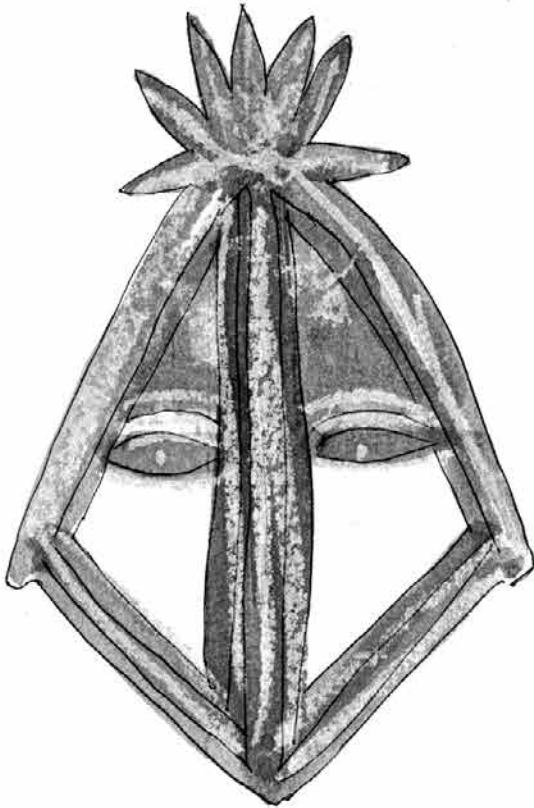
বুঝি কেউ কেউ

স্বাগতা দাশগুপ্ত

দাদার কাছে গিয়ে নালিশ করেন মেয়ে
কাটা নাকের রক্ত ঝরাতে ঝরাতে
দুনিয়ার কাছে কুৎসিততম ভগিনীটি
তাঁর দাদার কাছে যে বড্ড আদরের!
নাকের রক্ত গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বসন
প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ করছেন দাদা
এক জন রমণী বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাঁর নাক কেটে দেয়
এ কেমন কাপুরুষ?
আমাদের এই বিচিত্র দেশটায়
কোনও কোনও রামায়ণকার
সেই দাদা-বোনের কথা ভেবেছিলেন
তাই তাঁদের কলমে
একদিন শূর্পণখা নিজেই তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেন
সীতাকে দিয়ে রাবণের ছবি আঁকিয়ে
যা ছিল অসম্ভব রকমের জ্যান্ত
যা দেখে চোখ টাটিয়ে গেছিল এমনকি সীতাপতিরও
তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন

আমাদের এই বিচিত্র দেশটায়
আজও বুঝি কেউ একলা বসে
সেই দাদা-বোনের কথা কখনও কখনও ভাবেন

স্টিফেন ডেডালাসের ডাইরি

দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

“He wanted to cry quietly but not for himself: for the words, so beautiful and sad, like music.”
— James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man

সকালবেলা গেলেই যখন চলে
ফিরলে কেন বেআব্রু সন্ধ্যায়
আমার বিষাদ দুর্বিষহ হলে
তোমার বুকে মুখ লুকোতে চায়

কে জানে কোন পুরনো এক ক্ষত
বিনা নোটিস হঠাৎ দেবে হানা
একের পর এক ভুল করেছি যত
তারাই আমার গড়েছে আস্তানা

আজব এমন মানবজনম নিয়ে
কী করব তা ভাবার আগেই দেখি
বয়স বাড়ে; সময় কমে গিয়ে
বুঝিয়ে দেয় যা সত্য তা মেকি

তাও তো যাপন ছেঁড়া পাতার কালি
সমস্ত সুখ ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা
আমরা জানি হয়তো বনমালী
পরজন্মে হতেও পারেন রাধা

সকাল হলে যাদের যাবার কথা
তারাই ফিরে এসেছে সন্ধ্যায়
অন্তবিহীন আমার নীরবতা
শব্দ খুঁজে মুখ লুকোতে চায়॥
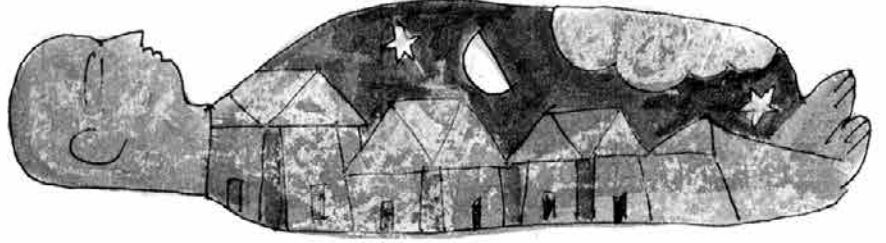
অনিত্য

স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়

গভীর শূন্যতা অলস ইঙ্গিতে
ঘুরিয়ে মারে দ্যাখো রাত দুপুর

আমাকে বলে দাও কতটা দূরে গেলে
অন্ধ বাদকের ক্লান্ত সুর
শুনতে পাব নাকি ভিক্ষা অন্নের
চাইব ভাগ আমি নির্বিকার
তবু তো চাওয়া হবে কিছুটা পাওয়া হবে
এমন খেলাধুলো সারাৎসার

বুঝিনি কিছু আমি আনত শহরের
চেতনাহীন এই ছলাকলায়
কীভাবে ভোর হয় রাত্রি নেমে আসে
নিথর দিন কাটে অবহেলায়

আমি তো উন্মুখ তাকিয়ে আছি দ্যাখো
নিয়তি চেরা মেঘ, হে গম্ভীর
উঠিয়ে তর্জনী বজ্ররেখা যেন
আমার দিকে বাণ করেছে স্থির

আমিও প্রস্তুত সফল আঘাতের
মধ্যে ডুবে যেতে আয়ুষ্মান
বিপুল আয়োজন, মধ্যে কিছু নেই
হাওয়ায় ছারখার দৈব গান
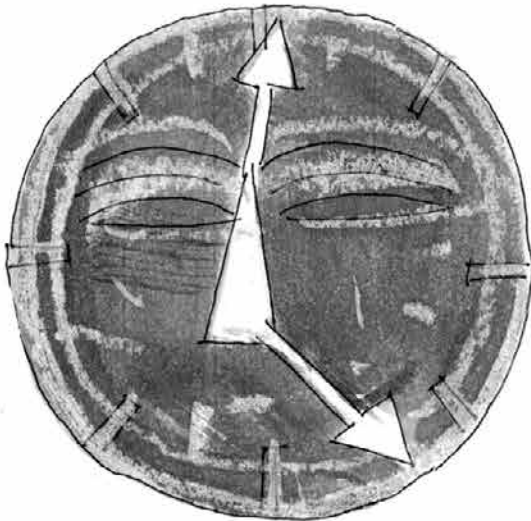
প্রারব্ধ

কমলেশ কুমার

আমাদের এ শহরে শীতকাল নেই কোনও।
নিস্তব্ধ কারখানা, মৃত্যু থেকে জন্ম পর্যন্ত চলে যাওয়া সুবিস্তৃত ট্রেনলাইন,
আর ঘুমন্ত অজগরের মতো পড়ে থাকা কালো রাস্তা আমাকে শাসায়।
নিয়ন আলোয় চোখ তুলে দেখি আকাশের নীলেও ভেসে বেড়াচ্ছে বিষের ক্রূরতা।
আমি ভুলতে পারি না শ্রমিক-সমিতির শূন্য চেয়ারে বসে থাকা
ক্ষীণজীবী বাবাকে, নৃশংসতম বিষাদ আগলে মরে যাওয়া মাকে।
এক দিন মন খারাপ হলে জ্যোৎস্নায় সাঁতার কাটতাম অবিরাম।
এখন ঘুমের শহরে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে টের পাই,
জমাট কুয়াশার ভিতর দিয়ে
আমি সাইকেল নিয়ে চলেছি তোমাদের পাড়ায়।
তোমার বাড়ির পাশে সেই বুড়ো অশ্বত্থ আর বিকারগ্রস্ত ঠাকুমাকে পাশ কাটিয়ে
ধীরে ধীরে আমি নরম আলো হয়ে উঠছি!
তোমার দু'টি চোখ আচ্ছন্ন বিস্ময়ে চাঁদের সাঁতার হয়ে জেগে থাকছে গোটা রাত।

সৃজনঘর থেকে বেরিয়ে, গতজন্মের অন্ধকার আর উপত্যকার গুহাকোণ পেরিয়ে এটুকু বুঝেছি,
স্বাভিমান আর রোদের ব্যাকুলতাকে চাইলেই আমরা বদলে দিতে পারি না।
যেমন রাত্রির প্রেক্ষাপট শেষ হয়ে এলেও
এই নশ্বর জীবনকে মুখরিত করে তুলতে পারি না আমরা।
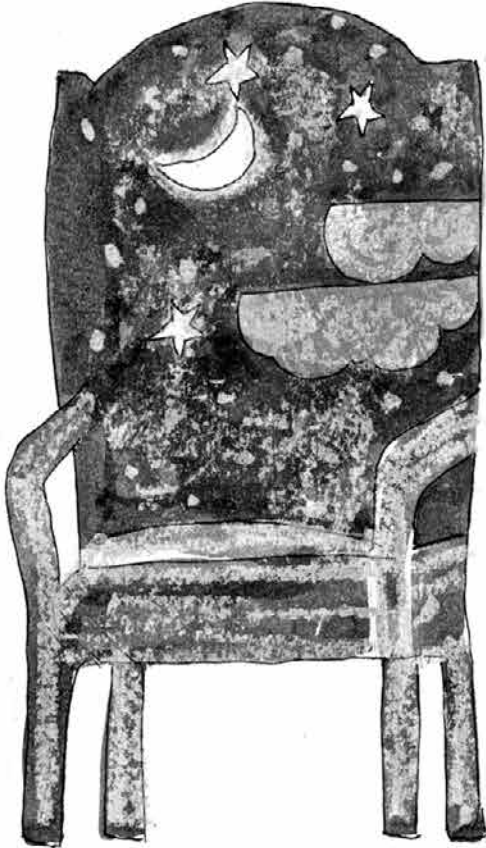
ছায়াডাক

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

সততই দেরি হয়ে যায়,
শেষ হয়ে যেতে যেতে কিছুই থাকে না!

সকলে গিয়েছে আজ সমুদ্রস্নানে...
কুয়োর গভীর থেকে খাঁজ ভেঙে ভেঙে
উঠোনে নামতে গিয়ে
আমার যে গড়াল দুপুর—

টেরাসের ঘেরাটোপে এখন কেবল
বাতাসের ঢেউ,
জ্যোৎস্না রয়েছে পড়ে বালির ওপর...

কাকে লিখে জানাব এ সব?
বিষাদের ফাঁকা এই হেতু...
অতল জলের আহ্বান...

পাখি পড়া গ্রাম

অরুণাভ রাহারায়

দিঘি দিয়ে ভেসে যায় পাখি পড়া গ্রাম
রসিকবিলের কাছে তোর ডাকনাম
শুনেছি হাওয়ার শব্দে বিকেলবেলায়
সাইবেরিয়ার পাখি বিষাদ মেলায়

মেলায় গানের সুর দূর দূর গ্রামে
এখানে লেখারা এসে হঠাৎই থামে
একটু জিরোয় ফের উঠে পড়ে ধীরে
নিজের জগতে আসে একাকী ফিরে

ফিরে এসে দেখে তার বন্ধুরা কুজন
পিছনে চালায় ছুরি, ওপরে স্বজন
গান তারা কেড়ে নেয়, সুর দেয় ছেঁটে
তাদের অভীপ্সাগুলো সশব্দে মেটে

মেটে যদি কী-বা আর করা যায় তবে
স্মৃতির সরণি দিয়ে হেঁটে যেতে হবে
বহু দূর বহু দূর পাখি পড়া গ্রামে
লেখারা জেগেছে আরও একই ডাকনামে

ডাকনামে ডাক দিই উত্তরও আসে
মাথায় দিয়েছে ঘূর্ণী চড়কের মাসে
বিষয় রয়েছে স্থির, কবিও অনড়
লেখাই আপন শুধু বাকি সব পর...

সেতু

রাজদীপ রায়

যার, অনর্থক প্রতীক্ষায়
চোখে জল চলে আসে

সে আজ আকাশে
        তারা
হয়ে ফুটে আছে।

দূর থেকে আমি তার
পিপাসার যোগ্য হয়ে উঠি...

প্রাতিস্বিক

তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়

হাওয়া ও পাথরে তুমি সহজ শোকের চিহ্ন সাজিয়ে রেখেছ।
আর কোনও মৃত্যু এসে তোমার উলঙ্গ চোখে জল হয়ে যায়?
আমি যে-জলের প্রতি চিরকাল নত তা তো চোখেরই ছায়ায়
জেগে থাকে। শোক-চিহ্ন হাওয়া ও পাথর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে
তোমার গার্হস্থ, রূপ ছুঁতে এল। তুমি কার নরক সরিয়ে
নিজের বীভৎস মূর্তি কালো স্বপ্নে খুঁজে পাচ্ছ? কার চিতা থেকে
পোড়া মাংস তুলে এনে একাকী শরীরে মাখছ মাথা ব্যতিরেকে?
হাওয়া ও পাথরে তুমি সহজ শোকের অস্থি কুড়িয়ে পেয়েছ।

তবু দুঃখবোধ থেকে আলাদা হওয়ার চেষ্টা অলক্ষ্যে এখনও
তোমায় স্বতন্ত্র রাখে। আলো হয়ে ওঠা মুখে অন্ধকার যাতে
পূর্বসূরিদের হাড় ছোঁয়াতে না পারে তার জন্য এই শ্রম।
পোড়া মাংস মাখা শেষে শরীরে গজিয়ে ওঠা অপাপ জখম
গূঢ় শুশ্রূষার বীজ বারবার রেখে যাচ্ছে অমিতায়ু হাতে।
এখন ধ্যানের নীচে শুশ্রূষার রতিশব্দ কান পেতে শোনো।

কোথায় জগৎ? শুধু সহজ শোকের চিহ্ন হাওয়া ও পাথরে।
সারা রাত সাদা স্বপ্নে পূর্বসূরিদের মৃত্যু ছাই হয়ে ওড়ে।

প্রস্থান

শুভদীপ দত্ত চৌধুরী

কত যে মর্মরধ্বনি, কত যে অতীতচারী রোদ
কত যে দুর্বারগতি, কত যে কৃতজ্ঞতাবোধ
পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাব অনশ্বর শীতে
বেদনার রম্যরজনীতে।

কী ভীষণ নির্লোভ সেই চলে যাওয়া,
উত্তরাধিকারহীন বয়ে যায় হাওয়া—
হু হু শব্দে কেঁপে ওঠে ঘোর অমানিশা
ঘুমিয়ে রয়েছে স্বাতী, চিত্রা, শতভিষা...

অপেক্ষা কোরো না আর, যাও তুমি ত্বরা,
স্মৃতিফলকের মতো মাথা তুলে থেকো

ও আমার অসমাপ্ত গানের অন্তরা

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

উপন্যাস

বজ্রযোগিনী

বিমল লামা

রণিতার একা বেড়াতে খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে হিমালয় পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। কিন্তু যুবতী মেয়ের একা একা বেড়ানোটা এখনও গা-সওয়া হয়নি দেশের। তবে হিমালয় অঞ্চলে চাপ তুলনায় কম। কারণ সেখানে বিদেশিনীরা আসে একা একা। স্থানীয়রা দেখতে অভ্যস্ত। তারই মাঝে দু'-এক জন দিশি মেম মিশে গেলে তেমন কিছু মনে করে না ওরা।

তবে এ বার পুজোয় ঠিক করেছে ডুয়ার্স যাবে। দিন কুড়ি ছুটি পাওয়া গেছে স্কুলে। প্রাইভেট স্কুল হলেও ছুটিটা এরা ভালই দেয়। বাচ্চা তার নেই। নেওয়ার ইচ্ছেও নেই। আর এ বার অর্কও থাকছে না। আফ্রিকা যাচ্ছে অফিসের কাজে। কাজেই...

কিন্তু কলকাতার পাবলিক যে এমন পিছু ধাওয়া করবে, সে আগে ভাবেনি। আসলে তার মনটা তো পালাই পালাই। এই মহানাগরিক কোলাহল থেকে। রোজকার চেনা গণ্ডির হাঁফ ধরা থেকে। তাই যখন ট্রেন দেখে মনে হয় বিরাট এক ফালি চাকা লাগানো কলকাতাই ছুটে চলেছে উত্তরে, একটা ধাক্কা লাগে বইকী।

এনজেপিতে নেমেও তাই। চার দিকে মুখর কলকাতা। লটবহরে আর কচিকাঁচাতে আরও যেন প্রখর তাদের কলকাতামি। আত্মীয়বন্ধুর দল বেড়ে আরও তা শক্তিশালী। আরও আগ্রাসী।

রণিতার প্রাণটা যেন আরও পালাই পালাই করতে লাগল। নিজের ব্যাকপ্যাক সামলে সে ছুটল গাড়ির খোঁজে। তার পর একটা কার বুক করে বেরিয়ে পড়ল ডুয়ার্সের উদ্দেশে। সেবক রোড ধরে গাড়ি তিস্তার নাগালে আসতেই যেন ধীরে ধীরে জুড়োতে শুরু করল রণিতার প্রাণ। আর করোনেশন ব্রিজ দিয়ে তিস্তা পার করতেই ভীষণ রকম নিরাপদ বোধ করল সে।

কিন্তু মূর্তি নদীর ধারে রিসর্ট পাড়ায় এসে আবার হতাশ রণিতা। যেন বনের ধার ঘেঁষে কলকাতা কলোনি গড়ে উঠেছে। সেই একই ভাষায় চেনা কোলাহল। দূরে এসে যেন আরও বেলাগাম। আরও ছ্যাবলা।

একটা রাত কাটিয়েই রণিতা রওনা দিল ঝালং-এর উদ্দেশে। মূর্তি নদী পেরিয়ে গভীর বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা। চাপড়ামারি বিরাট বন। কলকাতার ভিড়টা বোধহয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তেমন কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। গাড়িও প্রায় না থাকার মতোই। বাইক-সওয়ার একটা-দুটো স্থানীয় মুখ। বেশিরভাগই কিশোর কিংবা সদ্য তরুণ। বাহারি তাদের চুলের ছাঁট, তেমনই আজব চুলের রং। সবুজ রঙের চুলও দেখা গেল। মনে হল এই প্রথম ফ্যাশনের এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত ছেলেরা পিছনে ফেলে দিয়েছে মেয়েদের। এমনকি ডুয়ার্সের জঙ্গলেও।

রণিতা তার ড্রাইভারকে নিয়েও বিরক্ত। যেন বোবাকাঠি দিয়ে রেখেছে মুখে। কোনও প্রশ্ন করলে এক কথায় উত্তর দেয়। নিজের থেকে কিছুই বলে না। অথচ বয়সে তার মতোই হবে। পোশাক-আসাক আধুনিক। চুলের ছাঁট হালফ্যাশনের। তামাটে রং পর্যন্ত করা। কিন্তু বোবা।

বনের মাঝে খুনিয়া মোড়ে এসে দেখল পাশাপাশি দুটো চায়ের চালা। প্রাণটা ভীষণ চা চা করে উঠল। ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল রণিতা। ড্রাইভার নিঃশব্দে আদেশ পালন করল।

একটা চালায় চা খেতে বসল রণিতা। এই বনেরই কাঠের পাটা হবে, বেঞ্চির মতো ঠোকা। ঠেস দেওয়ার জন্য টানা বাঁশ পিঠের কাছে। একটাই। লোকে ঠেস দিয়ে দিয়ে পালিশ করে ফেলেছে।

দোকানি হেসে জিজ্ঞেস করে, "মোমো খাইয়ে গা? গরম হ্যায়।"

বাইশ-চব্বিশ বছরের যুবতী মেয়ে একটা। একাই মোমো পাকাচ্ছে। একটা ছোট ছেলে টোটোর পুরনো টায়ার নিয়ে খেলছে দোকানের মধ্যেই।

গরম মোমো সাদাটে গোলাপি চাটনি দিয়ে খেতে খেতে রণিতার মনে হল, লোকাল লাইফ!

তাই তো! স্থানীয় জনজীবনের তো কিছুই দেখা হল না। জায়গাটা তো শুধু গাছ নদী পাহাড় নয়। আসল তো মানুষ। সেই মানুষের জীবন জীবিকা ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি...

তখনই সে ঠিক করে ফেলল আর স্থানীয় ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঘুরবে না। আর

ভাবতেই তার আনন্দ হল যে, এই ড্রাইভারের নীরবতা থেকে মুক্তি পাবে।

রণিতা মোবাইলটা বার করে কার এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে নিল। আর ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিল, "চলে যাও। আমি আর যাব না।"

শুধু মাথা নেড়ে ড্রাইভার আর কোনও কথা না বলে বিদায় নিল। রণিতার ব্যাকপ্যাক নামিয়ে দিয়ে গেল তার পায়ের কাছে। রণিতা হতাশ মুখে চেয়ে রইল তার বাদামি মাশরুম চুলের দিকে।

মোমোর পর চা খেয়ে রণিতা জানতে চাইল, "ঝালং কা গাড়ি মিলেগা?"

দোকানি সামনের মোড়টা দেখিয়ে বলল, "মিলেগা। উঁহাসে।"

গাড়ি যখন এল দেখে রণিতার চোখ কপালে। বেশ বড় এসইউভি। তার ভেতরে তো কী, বাইরে ঝোলারও জায়গা নেই। অথচ হেল্পার যেন জাদুকর। কী ভীষণ তৎপরতায় তার ব্যাকপ্যাক ছাদে চালান করে দিল। আর ঝুলে থাকা দুটো লোককে টেনে নামিয়ে তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ভেতরে যে জায়গা ছিল তা নয়। কিন্তু রণিতা ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকতেই জায়গা তৈরি হয়ে গেল। আর সে গাড়ির সিট লোকের কোল মিলেমিশে কোথাও একটা বসে গেল। গাড়িও ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আগের মতো সেই একই বনপথ। কিন্তু একেবারেই উল্টো অনুভূতি। নির্জনতার বদলে ঠাসাঠাসি কলরব। হয়তো সেই একই সাবেক বিষয়ে। কিন্তু অন্য রকম মিশ্র ভাষায়— নেপালি হিন্দি সাদ্রি বাংলা। অচেনা তার নির্যাস। মিশ্র তার গন্ধ। আর ঠিকঠাক ঝালং-এ অবতরণ।

সকাল সকাল বেরিয়েছিল। ঝালং যখন পৌঁছল, মাত্র সকাল দশটা। হোটেলে মালপত্র রেখে হাঁটতে বেরোল রণিতা। বেরোনোর আগে একটা জয়েন্ট সিগারেট খেয়ে নিল জানলায় বসে। গা মাথা মন মেজাজ তখন ফুরফুরে। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামটা যেন ঝুলন সাজানো মণ্ডপ। কিংবা থিমের পুজো কোনও, আসল মডেলে সাজানো। ঘুরে দেখে আরও তার ভাল লাগল। আহা এই নৈঃশব্দ্য! এই অবসর! যেন থমকে দাঁড়িয়েছে সময় এখানে। যাতে কারও কোনও দেরি না হয়ে যায়।

তারই মধ্যে পরিপাটি সাজানো পুলিশ চৌকি। সমান সাজে হাসিখুশি মেয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার্স। ইউনিফর্ম যেন পুজোর জামা, পরে তাদের এতই আনন্দ। লোহার সাঁকো। আধা শান্ত নদী। পথের মাঝে ঝুলন মাপের গোল চক্কর। তারই এক বাঁকে রেস্তরাঁ। তার খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি কাঠের চেয়ার টেবিল। সেই সব দখল করে বসে আছে একদল স্থানীয় যুবক। কিন্তু পরিপূর্ণ পোশাকে। যেন কলেজ যাবে। অথবা অফিস।

রণিতা সটান ঢুকে গেল রেস্তরাঁয়। মেজাজে সে তখন মণিকর্ণিকা। কোনও কিছুতে পরোয়া নেই। ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কি এখানে বসতে পারি?"

ইংরেজিতে অবশ্য। ছেলের দল ব্যস্ত হয়ে বলল, "শিওর! শিওর!"

জায়গাও করে দিল তাকে নিজেরা পুনর্বিন্যস্ত হয়ে। রণিতা সহজ ভঙ্গিতে বসে বলল, "চা হবে?"

ছেলেগুলো চা-ই খাচ্ছিল। দু'-এক জন সিগারেট। একদল যুবা পুরুষ উৎসবের দিনে জ্যাকেট জুতো পরে শুধু চা খাচ্ছে, সেটাও কেমন বেমানান। অন্তত তার মতো একটা গাঁজা দেওয়া সিগারেটও তো টানতে পারত!

চা দিয়ে গেল এক সহাস্য কিশোরী। যেন সে ভীষণ খুশি হয়েছে রণিতা চা চেয়েছে বলে। আবার চা-টা তার সামনে নামিয়ে রেখে হাত জোড় করে তাকে নমস্কার করল। আর এক বার মিষ্টি হেসে সে চলে গেল ভেতরে। রণিতা চায়ে মন দিল।

এত ক্ষণ ছেলেগুলো কথা বলছিল। হাসি ঠাট্টা চলছিল। এ বার সবাই চুপ করে গেল। হয়তো তার বেয়াড়া উপস্থিতিতেই। সেই পরিবেশ সহজ করার জন্য রণিতা বলল, "আপনারা কথা বলুন না, আমি চা খেয়েই চলে যাব।" এ বার হিন্দিতে।

তাতে অবস্থা বদলাল না। কেমন পরিষ্কার অস্বস্তি নিয়ে ছেলেগুলো বসে রইল চুপ করে। তখন রণিতা আবার বলল, "সরি, ম্যায়নে আপলোগোঁকো ডিস্টার্ব কিয়া।"

"আরে নো নো। তা কেন। আপ চায় পিজিয়ে আরামসে। আপনি বেড়াতে এসেছেন?"

অনেকগুলো কথা বলে ফেলল এক জন। আর সবার মতো এরও মঙ্গোলিয়ান মুখ। খেলোয়াড়দের মতো স্বাস্থ্য। ঝুঁটিবাঁধা রং করা চুল। গায়ে কালো চামড়ার জ্যাকেট।

রণিতা বলল, "জি!"

"আকেলা?"

"জি।"

"এজেন্সিকে সাথ?"

"না।"

"তো?"

"একদম একলা।"

রণিতার অর্ধেক চা শেষ হয়ে গেল ওদের বোঝাতে যে সে আসলে একা একাই ঝালং এসেছে কলকাতা থেকে। শেষ পর্যন্ত বুঝল সবাই। তখন সেই প্রথম ছেলেটি সহজ হেসে বলল, "ফির তো আপ কুইন হো!"

"ইয়েস। আই অ্যাম রানি।"

এ বার সত্যিই সহজ হল পরিবেশ। হেসে উঠল সকলেই। প্রথম ছেলেটি হঠাৎ রণিতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আই অ্যাম কর্মা।"

রণিতা সাগ্রহে তার হাত ধরতেই শুরু হয়ে গেল পরিচয় পর্ব। সাত জন ছেলের নাম শুনল রণিতা। সকলেই 'হাই রানি, হ্যালো রানি' করতে করতে তাকে রণিতা থেকে রানিই বানিয়ে দিল।

এর পর হালকা মেজাজে আড্ডা চলল বেশ খানিক ক্ষণ। যেন কত দিনের বন্ধু তারা। রণিতার এক একটা প্রশ্নের সাত রকম উত্তর দিতে লাগল সাত জনে। রণিতা উত্তর দিয়ে গেল তাদের নানা প্রশ্নের। শেষে তারা জানতে চাইল, "আজকের প্রোগ্রাম কী?"

রণিতা জানাল, "সাইটসিইং-এ যাব ভাবছি।"

শুনে কর্মা হঠাৎ বলে বসল, "আমাদের সঙ্গে চলো।"

"তোমাদের সঙ্গে! কোথায়?"

"আমরা মানে আমরা তিন জন যাব। আমি, রবিন আর শেরিং। দুটো বাইক আছে।"

"যাবে কোথায়?"

"সাইটসিইং-এ। আর কোথায়!"

"কোন দিকে?"

"যাব বিন্দু আর তার আশপাশে।"

রণিতা বলল, "আমিও তো বিন্দুই যাব ভাবছি। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে..."

"হ্যাঁ, তো কী অসুবিধে?"

রণিতা কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "না মানে, একটু ভয় করছে।"

"ভয়! কিসের ভয়!"

রণিতা চুপ করে রইল। কর্মা অপেক্ষা করে রইল তার উত্তরের জন্য। কিন্তু রণিতা চুপ করেই আছে দেখে সে আবার বলল, "কিসের ভয়, বলো?"

রণিতা মৃদু স্বরে বলল, "যদি তোমরা আমায় রেপ করো!"

রণিতার কথা শুনে কর্মা, রবিন, শেরিং সহ সকলেই যেন আকাশ থেকে পড়ল। এমন ভাব করল যেন গোটা ডুয়ার্সে কেউ কখনও রেপ করেনি। হতবাক হয়ে চেয়ে রইল রণিতার দিকে। রণিতা চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল অপরাধীর মতো। যেন সে খুব অন্যায় কিছু বলে ফেলেছে। বেশ কিছু ক্ষণ চলল এই অচলাবস্থা। তার পর কর্মা হঠাৎ উঠে পকেট থেকে পার্স বের করে সবার বিল মিটিয়ে দিল। রণিতারও। তার পর রণিতার দিকে ফিরে বলল, "এক বার এসো আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"এসোই না।"

কর্মা খপ করে রণিতার হাতটা ধরে তাকে টেনে তুলল। তার পর তাকে নিয়ে বেরিয়ে এল রেস্তরাঁর বাইরে। পিছন পিছন বাকি ছেলেরাও বেরিয়ে এল।

উৎরাই পথে মিনিট তিনেক হেঁটে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল কর্মা। নতুন রং করা ছিমছাম পাকা বাড়ি। বাইরে অজস্র টবের ফুলে আলো হয়ে আছে সামনেটা। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে সটান ঢুকে গেল কর্মা। রণিতার দিকে ফিরে বলল, "ভেতরে এসো।"

তত ক্ষণে বাকি ছেলেরা চলে গেছে। আছে শুধু রবিন আর শেরিং। ওরাও ভেতরে গেল রণিতার সঙ্গে। ঢুকেই বসার ঘর। কার্পেট পাতা। সোফাসেট সেন্টার টেবিল। বৌদ্ধমতে সাজানো দেওয়াল সিলিং দরজা জানলা।

সোফা দেখিয়ে কর্মা বলল, "বোসো।"

বলেই সে ভেতরে চলে গেল। রবিন আর শেরিং এর সঙ্গে সোফায় বসল রণিতা। ওদের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। কিন্তু ওরাও ঠোঁট ওল্টাল।

কিছু ক্ষণের মধ্যেই কর্মা ফিরে এল। সঙ্গে তার গোটা পরিবার। বাবা মা দাদু ঠাকুরমা বৌদি আর এক বোন। রণিতার সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিল কর্মা। রণিতার পরিচয় দিল, "কুইন অফ কলকত্তা, আমার বন্ধু রানি।"

অস্বস্তিতে রণিতার জয়েন্টের নেশা নিমেষে উড়ে গেল। কর্মার পরিবার নানা ভাবে তাকে সম্মান জানাতে লাগলো। কেউ আদর করে। কেউ হাত ধরে। কেউবা জড়িয়ে ধরে। বিশেষ করে কর্মার বোন। রণিতাকে সে বলল, "আমারও ইচ্ছে তোমার মতো এক দিন একা একা বেড়াতে যাব। চলো আমার রুমটা দেখাই তোমাকে।"

এর পর রণিতার আধঘণ্টা পরিবারের সঙ্গেই কাটল। তাদের বাড়ির প্রতিটা ঘরেই সে গেল। রান্নাঘরে। শোবার ঘরে। পড়ার ঘরে। পুজোর ঘরে। চান ঘরে। অবশেষে যখন বাড়ির বাইরে বেরোল, তার গলায় সুদৃশ্য সিল্কের 'খদা'। পাহাড়ি রীতিতে গলায় উত্তরীয় দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছে লাচেন। কর্মার বোন।

দোরগোড়ায় তখন বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে কর্মা। একটায়। আর একটায় রবিন আর শেরিং। শেরিং-এর পিঠে গিটার। রণিতা বাইরে আসতেই কর্মা নাটক করে বলে, "হেই! আমরা বিন্দু যাচ্ছি। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

রণিতা দু'হাত তুলে লাফ দিয়ে বলল, "শিওর!"

কর্মা বলে, "এনি ডাউট?"

"নট অ্যাট অল! নট অ্যাট অল!"

বলতে বলতে রণিতা কর্মার বাইকে চড়ে বসে। লাচেন ওকে বিদায় জানায় টাটা করে। বাইকে স্টার্ট দিয়ে রওনা দেয় কর্মা। পিছনে রওনা দেয় রবিন।

একটা বাঁক ঘুরেই আবার একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কর্মা। তার সামনে একটা সাইনবোর্ড। বোর্ডে লেখা, ঝালং পুলিশ স্টেশন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদল পুরুষ আর মহিলা পুলিশ। তাদের এক অফিসারকে লক্ষ্য করে কর্মা বলে, "স্যর, এর কথাই বলছিলাম।"

অফিসার এগিয়ে এসে বলে, "ওহ! কুইন অফ কলকত্তা! ওকে ওকে। হ্যাপি জার্নি। কল মি ইফ এনি প্রবলেম। গিভ মি ইওর নাম্বার।"

রণিতা নিজের মোবাইল নাম্বার বলে। অফিসার মিসড কল দিয়ে বলেন, "সেভ ইট। ওসি ঝালং পি.এস।"

তার পর রওনা দেয় দুই বাইকে চার সওয়ার। লক্ষ্য, বাংলা তথা ভারতের শেষ গ্রাম বিন্দু। ভুটান সীমান্তে। জলঢাকা নদীর তীরে।

পাহাড়ি পথে বাইকে আগে কখনও ঘোরেনি রণিতা। গাড়িতে আরাম যতই হোক, প্রকৃতির সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। এসি হলে তো আরওই। নির্যাসটুকুও পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইক, সে মনে হয় প্রকৃতির নিজস্ব বাহন। ঘোড়ার মতো। শুধু তার বিকট শব্দটাই যা একটু খারাপ লাগে। বিশেষ করে এই রকম বুলেটের।

বিপরীত হাওয়ার স্রোতে ডানার মতো দুটো হাত মেলে দেয় রণিতা। মনে হয় গাছপালার ফাঁক গলে গলে সে উড়ে চলেছে সীমানার দিকে, যা লঙ্ঘন করতে আর কোনও বাধা নেই।

একটা চায়ের বিরতি নিল ওরা। আশ্চর্য এক চায়ের দোকানে। নদীর ওপর প্রায় ঝুলন্ত একটা দোকান। নীচে টলমলে এক তেলা বোল্ডারের ওপর খুঁটি গেড়ে বসানো। বোল্ডারে অবিরাম সগর্জন জলোচ্ছ্বাস। অনিশ্চিত চঞ্চল প্রকৃতি। অথচ মানুষ দিব্যি তাকে ভরসা করে ভাত চাপিয়েছে পরিবারের জন্য। অনাগত অতিথিদের জন্য।

কর্মা জিজ্ঞেস করে, "আর কী আছে?"

দোকানি সলজ্জ হেসে বলে, "কালো দাল, শুঁটকির আচার আর ভাত।"

"খাবে নাকি, রানি?"

রণিতা বলে, "ভাত খাব না। বাকি দুটো চেখে দেখতে পারি।"

তার পর খাবার আসে রণিতার জন্য। চিনেমাটির লাল ড্রাগন বাটিতে কালো দাল। স্টিলের চামচ ডুবোনো তাতে। পাশে ছোট্ট সাদা প্লেটে লাল টমেটোর চাটনি। আর বিরাট একটা কাপ ভর্তি ধোঁয়াওঠা চা। আর একটা সেদ্ধ রাঙালু। সবটা একটা বড় প্লেটে সাজানো।

দেখে এত মজা লাগে রণিতার যে, খাওয়ার আগে ছবি তোলে মোবাইলে। কর্মা এগিয়ে এসে বলে, "দাও, আমি তুলে দিচ্ছি।"

তার পর তো সে পাগলা কর্মা রীতিমতো উৎসব শুরু করে দেয়। ফোটো তোলার উৎসব। ট্রে ধরে, চামচ তুলে, হাঁ করে, দোকানির গলা ধরে... সম্ভাব্য সমস্ত ভঙ্গিতেই তার ছবি তোলে কর্মা। সঙ্গে শেরিং আর রবিন। হঠাৎ শেরিং গিটারটা ধরিয়ে দেয় তাকে। রবিন তার সানগ্লাসটা পরিয়ে দেয়। আর আবদার করে রক মিউজ়িক পোজ় দিতে। শেরিং বলে, "লাইক জিমি হেন্ড্রিক্স।"

এই ভাবে তার কয়েকশো ছবি তোলে ওরা। শেষে রণিতা ক্লান্ত হয়ে পড়লে কর্মা একগোছা বুনো ফুলের তোড়া এনে তার হাতে দেয়। আর শেরিং গিটার বাজিয়ে গান ধরে।

কোনও পাহাড়ি সুর। এই বন প্রকৃতির পাহাড়ি খোলার যেন আপন গান। যদিও তার বার্তাটা ধরতে পারে না রণিতা। ভাষাটা অজানা। গান শেষ হলে কর্মা অনুবাদ করে শোনায়—

"হয়তো ধুয়ে যাবে সব
এই নদীর জলে
তবু শিহরন থাকবে পাথরে
তুমি যে ওকে ছুঁয়েছিলে!"

রণিতা হেসে বলে, "ও! তাই! কিন্তু কই আমার তো পাথর জল কাউকেই ছোঁয়া হল না।"

"আরে আছে তো জলঢাকা। চলো।"

আবার ওরা রওনা দেয়। যেন কোনও যন্ত্র ঘোড়ায় চড়ে, যা উড়ে যায় শূন্যে দু'হাত মেলে দিলেই। সারা রাস্তা ডানার মতো হাত মেলে থাকে রণিতা। মনের গভীর থেকে আনন্দের স্রোত যেন উঠে এসে তাকে ভাসিয়ে দেয়। জীবনে এমন সময় কবে যে শেষ কেটেছিল সে মনে করতে পারে না। যেন স্বর্গটা আসলে ডুয়ার্সেই ছিল। এত দিন সে খবরটুকু পায়নি রণিতা।

বিন্দুতে যেন আর এক থিমের পুজোমণ্ডপ। আসল পাহাড় নদী ঝরনা দিয়ে সাজানো। জলঢাকা এখানে ঢাকা নয়। বরং সে-ই ঢেকে রেখেছে সব কিছু। কারণ লোকে বাকি সব ভুলে শুধু তাকেই দেখছে।

তার রূপ তার রোষ। আর তার রূপকথা।

মুগ্ধ হয়ে সে দিকেই চেয়েছিল রণিতা। কর্মা এসে তার হাতে দুটো চকলেট দিল। দেখতে একদম চকলেট বোমের মতো। রণিতা হেসে বলল, "খাব? না ফাটাব?"

কর্মা ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভুটান যাবে?"

রণিতা সেই কথাই ভাবছিল। নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে জল। যদিও বাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে জলঢাকা। কিন্তু বাঁধের ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ ওপারে ভুটান পাহাড়ের দিকে। কিন্তু সে পথে লোহার গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে এক উর্দিধারী। দু'এক জন ছাড়া সে কাউকেই যেতে দিচ্ছে না ওই পথে। সেদিকেই আঙুল দেখিয়ে রণিতা বলে, "ওই পথে?"

"হ্যাঁ।"

"যেতে দেবে?"

"সবাইকে না। কিন্তু তোমাকে দেবে।"

“কেন?”

“কারণ, তুমি হলে...” কর্মা শেরিং আর রবিনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রণিতাও জলঢাকার গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলে, “কুইন অব কলকত্তা।”

আসলে যদিও কর্মাই আসল কীর্তিকর্মা। সে-ই প্রহরীর সঙ্গে গুজুর ফুসুর করে ব্যবস্থা করল মৌখিক ছাড়পত্রের। আর ওরা চার জন রওনা দিল জলঢাকা ডিঙিয়ে ভুটান পাহাড়ের দিকে।

নদীটাই বর্ডার। ভারত আর ভুটানের মাঝে।

“নদীটা কার?” জানতে চায় রণিতা।

কর্মা বলে, “আজ থেকে তোমার!”

রণিতা বলে, “আরে তুমি এত ফ্লার্ট করছ কেন বলো তো! তোমার মতলবটা কী?”

কর্মা ব্যস্ত হয়ে বলে, “আরে না না। আমার কোনও মতলব নেই। ভাবলাম তোমাকে নদীটা দিয়ে দিই। নেবে না যখন, ছাড়ো। নদীটা সবার।”

এমনই আটভাট বকতে বকতে তারা পেরিয়ে যায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এক মুক্ত দেশ পেরিয়ে ঢুকে পড়ে এক নিষিদ্ধ দেশে। যদিও খাতায়-কলমে সে দেশ আর নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু খাতা-কলমের সঙ্গে তাল রেখে তো আর বাস্তব চলে না। বিশেষ করে মানুষের চেতনা। মানুষের বিশ্বাস। দস্তাবেজে সই করে রাতারাতি তা বদলে দেওয়া যায় না। সে যতই বড় আধিকারিক সই করুন না কেন।

কিন্তু প্রকৃতি এপারেও একই রকম। সেই বন-বাদাড়। পাহাড়ের খাড়া ঢাল। জলঢাকার অপর পাড়। কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যে রাস্তা তারও অবস্থা একেবারে আদিম। এ রাস্তায় মানুষের দক্ষ হাত তেমন পড়েছে বলে মনে হয় না। যেটুকু হয়েছে মানুষের পায়ে পায়েই হয়েছে। সুতরাং পথ চলা ওপারের মতো অত মসৃণ নয় এখানে। কিন্তু এটাই তো প্রকৃতির আদি রূপ, মানুষের কুশলী হস্তক্ষেপে যা কলুষিত হয়নি। বনবাসী জীবজন্তুরা কি রাস্তা বানায় নিজেদের চলাচলের জন্য! হাঁটতে কষ্ট হলেও রণিতার ভালই লাগে। তবু সে বলে একই রকম প্রকৃতির কথা।

“কী করে বুঝবে লোকে এটা আলাদা দেশ?”

“মানে?”

“মানে সেই একই তো পাহাড় জঙ্গল নদী। একই রকম ঠান্ডা বাতাস আর বুনো গন্ধ।”

কর্মা বলে, “দেশ আলাদা কি মাটিতে হয়! যত ক্ষণ না স্থানীয় মানুষ দেখতে পাচ্ছ, বুঝতে পারবে না আলাদা দেশ।”

রণিতা তাতেও দ্বিমত পোষণ করে। বলে, “সে-ও তো একই। সেই জিনস টি-শার্ট আর সোয়েটার জ্যাকেট। একই রকম ইউনিভার্সাল ফ্যাশনের।”

শেরিং বলে, “ভুটান তা নয়। লোক দেখলেই বুঝবে সে কথা।”

“কিন্তু লোক তো কোথাও দেখছি না। আর দেখলে কি সত্যিই বোঝা যাবে তফাতটা?”

এই নিয়েই তারা কথা বলে অনেক ক্ষণ। রণিতা এক রকম তর্কই করে ওদের সঙ্গে। তার মত, এই বিশ্বায়নের বাজারে সব গুলেমিলে একাকার।

শেষে কর্মা বিরক্ত হয়েই বলে, “আরে তুমি এঁড়ে তক্কো করছ কেন! বলছি তো ভুটান এক রকম নয়। আসল ভুটান দেখলে তুমি শক খেয়ে যাবে। হয়তো রাতে ঘুমোতেও পারবে না।”

রণিতা গলায় তাচ্ছিল্য এনে বলে, “উরিবাবা! তাই নাকি! তা দেখাও না আমায় তোমার সেই শকিং ভুটান।”

কর্মা মোবাইল বের করে সময় দেখে। বলে, “পারবে হাঁটতে! দেড় ঘণ্টা লাগবে যেতে। ফিরতে এক ঘণ্টা। মানে টোটাল আড়াই ঘণ্টা আপডাউন হাঁটা।”

“হ্যাঁ, কেন পারব না! এখন ক’টা বাজে?”

তখন বাজে বেলা দেড়টা। তিন ঘণ্টা মানে সাড়ে চারটে। আরও না হয় আধঘণ্টা ধরা গেল। যে কোনও অবস্থাতেই পাঁচটায় আবার ফিরে আসতে পারবে বিন্দুতে। সুতরাং সেই অজানা অভিযানে যাওয়াই ঠিক করল তারা। যদিও আপত্তি ছিল রবিনের। কিন্তু রণিতার জেদের কাছে টিকল না তার আপত্তি। তারা রওনা দিল মনস্থির করে।

যে রাস্তায় হাঁটছিল, সেটা ছেড়ে একটা চড়াই ধরল তারা। একেবারেই সরু রাস্তা। রাস্তাও ঠিক নয়। বনের ভেতর গাছপালা ঝোপঝাড় ঠেলে উঠে যাওয়া একটা মেটে রেখা। তারও কোথাও ভাঙা, কোথাও পথের মাঝেই আধ গাঁথা বোল্ডার। কোথাও ঝরা পাতার পুরু পরতে ঢাকা হড়কা ফাঁদ। পা দিলেই পিছলে যায়।

কর্মা খুকুরি দিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে রণিতার হাতে দিল। রণিতা অবাক হয়ে বলল, “এই ভোজালি কোথায় পেলে?”

“এটা ভোজালি নয় ম্যাডাম।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। ওটাকে ন্যাপলা বলে। তা পেলে কোথায়?”

“ন্যাপলা!”

“আরে হ্যাঁ। কলকাতায় এটাকে আমরা ন্যাপলা বলি।”

তিন যুবকই অবাক হয়ে বলল, “ন্যাপলা বলে এটাকে?”

কর্মা বলে, “তোমরা কত হ্যাটা করো নেপালিদের তাই না! আমাদের হাতিয়ারটাকে বল ন্যাপলা!”

“আরে এতে হ্যাটা করার কি আছে! মদকে যদি বাংলা বলা যায়, তো ভোজালিকে ন্যাপলা বলতে দোষ কী!”

কর্মা এ বার বেশ গলা চড়িয়ে বলে, “বলছি এটা ভোজালি নয়।”

“হ্যাঁ জানি। ন্যাপলা।”

“না, ন্যাপলা নয়!”

খুব জোরে চেঁচায় কর্মা। রীতিমতো উত্তেজিত লাগে তাকে। কিন্তু তার মেজাজের পরোয়াই করে না রণিতা। সে-ও চেঁচিয়ে বলে, “রোয়াব দেখাচ্ছ কাকে! গলা কাটবে নাকি আমার?”

কর্মা এ বার সত্যিই রেগে গিয়ে বলে, “এই রবিন, তোর এই বাঙালি বৌদিটাকে সামলা। না হলে আমি কিন্তু সত্যিই...”

রণিতা আরও গলা চড়িয়ে কর্মার দিকে তারই দেওয়া লাঠিটা বাগিয়ে বলে, “না হলে কি? গলা কাটবে আমার! দেখি কাটো। কাটো দেখি তোমার ন্যাপলায় কত ধার আর আমার গলায় কত হাড়।”

কর্মা হতাশায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে তার অস্ত্রটা। একটা বোল্ডারের ওপরে থেবড়ে বসে নকল কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলে, “ওরে কলকত্তাওয়ালি, এটা ন্যাপলা নয়। ভোজালি নয়। কেন কথাটা ঢুকছে না তোমার মাথায়!”

কর্মার কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে যায় রণিতা। সে বিব্রত মুখে এক বার কর্মার দিকে চায় এক বার বাকিদের দিকে। তার পর কর্মার কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, “তা এতে এত কান্নাকাটির কি আছে কাঞ্ছা! আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। আরে আমি জানি ওটা ন্যাপলা, নয় ভোজালি নয়। ওটা খুকুরি।”

কিন্তু কর্মা তাতেও শান্ত হয় না। সে আরও রেগে গিয়ে বলে, “আমি কাঞ্ছা নই। আমি বাড়ির বড় ছেলে। জেঠা।”

রণিতা বলে, “ওহো! সরি সরি। তুমি জ্যাঠা...”

“জ্যাঠা নয়। জেঠা। জেঠা। জে ই টি এইচ এ। জেঠা। বুঝেছ?”

“বুঝেছি বুঝেছি। এমন করে ছেলেমানুষি করে না জেঠা। ওঠো ওঠো।”

কর্মার হাত ধরে রণিতাই ওকে টেনে তোলে। নিজেই কুড়িয়ে এনে দেয় তার খুকুরিটা। তার হাতে ফেরত দিয়ে বলে, “তা জেঠা, এটা পেলে কোথায়?”

কর্মার জ্যাকেটের নীচে খুকুরির খাপ। সেই খাপে খুকুরিটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলে, “কলকত্তার বৌদি, তুমি কোথায় পেলে এই মাথাটা?”

রণিতা রবিন আর শেরিং এর দিকে তাকিয়ে বলে, “লাও ঠেলা!”

ওরা দু’জন তখন হেসে কুটোপাটি হচ্ছে কর্মা আর রণিতার নাটক দেখে। কর্মা জ্যাকেটটা টেনে সোজা করতে করতে বলে, “মাথাটা তোমার শরীরের অঙ্গ, তাই তো? তেমনই গোর্খার খুকুরি। শরীরের অঙ্গ। তাকে কোথাও পেতে হয় না। বুঝেছ! এখন চলো হাঁটা দাও। না হলে

জঙ্গলেই রাত্রিবাস করতে হবে।"

আবার শান্তি ফেরে দলে। আবার ওরা হাঁটা দেয় সেই ভিন্ন ভুটানের সন্ধানে। রীতিমতো অভিযানের পথে।

তবু রণিতা আগের সূত্র ধরে বলে, "আচ্ছা কর্মা, তুমি আমাকে কুইন অব কলকত্তা থেকে কলকত্তার বৌদি বানিয়ে দিলে যে?"

কর্মা হাসে। উত্তর দেয় না। রণিতাও নাছোড়। শেষে কর্মা বলে, "আমি জানি, তুমি হলে ওয়াইফ অব মিস্টার অর্কজিৎ চক্রবর্তী।"

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "কী করে জানলে?"

"কী করে আর! তোমার আইডিতেই লেখা আছে।"

"আমার আইডি দেখলে কোথায়?"

"দেখিনি। তুমি যে হোটেলে উঠেছ, তার ম্যানেজার বলল। ও আমার ভাই হয়। ফোন করেছিল।"

"বাপরে! গোটা ঝালং আমার খবর নিয়ে রেখেছে দেখছি।"

রবিন বলে, "রাখবে না কেন! তুমি তো আর যে সে লোক নও। তুমি হলে গিয়ে..."

চার জনেই একসঙ্গে জঙ্গল কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলে, "কুইন অব কলকত্তা।"

কিন্তু এই জোশ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই পথশ্রমে কাহিল হয়ে পড়ে রণিতা। সঙ্গের মাত্র এক লিটার জল শেষ হয়ে গেছে অনেক ক্ষণ। রাস্তায় কোথাও জল নেই। তার ওপর খিদেও পেয়েছে। বিন্দুতে সামান্য চাউমিন খেয়েছিল। আর দুটো চকলেট।

হিসাব মতো দেড় ঘণ্টায় পৌঁছানোর কথা। কিন্তু দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর দেখা যায়, জঙ্গলেই আছে। কর্মা বলে, "আমরা অনেক স্লো হেঁটেছি। আরও মিনিট কুড়ির পথ বাকি আছে।"

কিন্তু রণিতা থেবড়ে বসে পড়ে রাস্তার ওপর। তার শরীর আর নিচ্ছে না। হাঁটু কাঁপছে থরথর করে। খিদে তেষ্টা ক্লান্তি সবে মিলে আরও কুড়ি মিনিট পথ চলার মতো জোর তার নেই। এ দিকে পৌঁছে ফিরে আসার তাড়া আছে। ওখান থেকেই ফেরা যাবে কি না, সেই আলোচনাও করতে লাগল তারা।

কর্মা বলে, "আর বেশি দূর নয়। আর একটু কষ্ট করো। ওখানে জল পাবে। খাবারও পাবে কিছু না কিছু।"

হঠাৎ রবিন খালি জলের বোতলটা নিয়ে বলে, "তোমরা আস্তে আস্তে এসো। আমি এগিয়ে দেখছি একটু জল পাওয়া যায় কিনা।"

রবিন বোতল নিয়ে দ্রুত পায়ে মিলিয়ে যায় চড়াইপথে বনের ভেতর। রণিতা খানিক ধাতস্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। ধীরগতিতে হলেও এগোতে থাকে রবিনের পথেই।

মিনিট দশেক পর ধুপধাপ শব্দে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হয় রবিন। সহাস্য মুখে বোতলটা তুলে ধরে বলে, "পেয়ে গেছি।"

বোতলটা ভর্তি। কিন্তু জলে নয়। সাদা কোনও তরলে। শেরিং বলে, "ছাঙ?"

"দূর! ইয়াকের দুধ। একই সঙ্গে খাদ্য আবার পানীয়।"

বোতলটা সে তুলে দেয় রণিতার হাতে। রণিতা বোতলের ছিপি খুলে ঢকঢক করে ঢেলে দেয় গলায়। অর্ধেক খালি করে তার পরেই সে থামে। বাকিটার কর্মা এক ঢোক খেয়ে বলে, "পেলি কোথায়?"

রবিন নিজের গলায় এক ঢোক ঢেলে বলে, "একটা গোয়ালা যাচ্ছিল দুধ নিয়ে। ওই গ্রামেই যাচ্ছে বলল দুধ দিতে। ওর থেকেই কিনলাম।"

রণিতা তত ক্ষণে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে আবার। সেই পুরনো মেজাজে বলে, "চলো। আবার তো ফিরতে হবে।"

কর্মা বলে, "নিজেকে কি ইয়াক মনে হচ্ছে?"

রণিতা মুখ ভেঙিয়ে বলে, "না। কাঞ্ছা মনে হচ্ছে।"

আবার হাসতে হাসতে রওনা দিল তারা। আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল তাদের গন্তব্য। তিব্বতি শৈলীতে তৈরি পাথর মাটি কাঠের মিশেলে বানানো গ্রাম্য বসতবাড়ি। বেশ কয়েকটা ঘরের চাল আর দেওয়াল দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাঁশে বাঁধা রংবেরঙের একগুচ্ছ লম্বাটে পতাকা, লুঙ তা।

গ্রামের একদম কাছে এসে কর্মা একটু দাঁড়াল। দাঁড়াতে বলল বাকিদেরও। তার পর সে রণিতাকে বলল, "মনে মনে ভীষণ রকম শকিং কিছু দেখার জন্য তৈরি থাকো। তা হলে ঝটকা একটু কম লাগবে। না হলে রাতের ঘুমটা চৌপাট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।"

রণিতা বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, "তুমি তো ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।"

"না ভয়ের কিছু নেই। মনে মনে তৈরি হতে হতে এসো।"

তারা সবাই হাঁটা দিল গ্রামের প্রবেশ পথের দিকে। এখানে রাস্তাটা চওড়া। পাথর পেতে পরিপাটি করে বানিয়ে রেখেছে গ্রামের লোকে। সেই খাড়া পথের প্রান্তে কাঠ দিয়ে বানানো ছোট্ট একটা তোরণ। উজ্জ্বল লাল হলুদ আর নীল রঙে রাঙানো। তোরণের একদম সামনে এসে কর্মা দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়ালো রবিন আর শেরিংও। রণিতার জন্য মাঝের রাস্তা ছেড়ে। সে মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকাল তোরণের দিকে। আর সত্যি সত্যিই...

রণিতা আঁতকে উঠল দেখে। বুকটা কেমন ধড়াস করে উঠল হঠাৎ। বিস্ফারিত স্থির চোখে চেয়ে রইল তোরণের দিকে। যেন সে সত্যিই শক পেয়েছে।

তোরণের থাম দুটো অবিকল উত্থিত পুরুষাঙ্গের আদলে তৈরি। দেড় মানুষ সমান উঁচু। লাল টকটকে রং করা। নিখুঁত ভাবে তৈরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। মাটির কাছে গোড়ার দিকে একজোড়া পরিষ্কার অণ্ডকোষ। লিঙ্গের গায়ে পেঁচানো লতানে ড্রাগনের ছবি।

রণিতার চোখের পাতা পড়ে না। মুখের ওপর আচমকাই উঠে আসা প্রতিবর্তী হাত যেন পাথর হয়ে জমে গেছে সেখানেই। সে যত দেখে ততই শক পেতে থাকে ভেতরে ভেতরে।

রণিতাকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেগুলো গ্রামে ঢোকে সেই লিঙ্গতোরণ পেরিয়ে। মাথার ওপর ঘণ্টার মতো দোদুল্যমান আরও অসংখ্য ছোট ছোট লিঙ্গের ছোঁয়া মাথায় নিতে নিতে। ওখান থেকেই কর্মা রণিতার দিকে ফিরে বলে, "ভেতরে এসো। আরও আছে।"

সে আরও দেখে থামের মতো দুই লিঙ্গের মাঝে দড়ি টাঙানো। আর সেই দড়ি থেকে সারি সারি ঝুলছে আরও অনেক কাঠের তৈরি লিঙ্গ। নিখুঁত ভাবে তৈরি করা জোড়া জোড়া অণ্ডকোষ সমেত। মাপে ভুট্টা কি কলার মতো। হরেক রঙে রাঙানো। এমনই উচ্চতায় যে, আসতে যেতে মাথায় ঠেকবেই।

রণিতা আর এগোনোর মতো জোর সত্যিই পায় না। তবু সে এগোয়। চোখের সামনে বিরাজমান অসংখ্য উত্থিত পুরুষাঙ্গের দিকে চোখ রেখেই এগোয়। এক সময় সেও দুই মহালিঙ্গের মাঝখান দিয়ে মাথার ওপর দোদুল্যমান এক ঝাঁক পুরুষাঙ্গের ছোঁয়া কোনও রকমে বাঁচিয়ে গ্রামে গিয়ে ঢোকে। আর ঢোকার পর সামনেই যে ঘরটা দেখে তাতে আরও এক বার সে আঁতকে ওঠে। যেন সেকেন্ড স্ট্রোক হয় তার। সত্যিকারের ব্যথা ওঠে বুকে।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সহাস্য এক ফর্সা স্বাস্থ্যবতী যুবতী। আর তার দু'পাশের দেওয়ালে আঁকা আছে বিরাট বিরাট দুটো উত্থিত পুরুষাঙ্গ। রণিতা আবার স্থির হয়ে যায় এই দেয়ালচিত্র দেখে।

কর্মা ডাকে, "রানি! হ্যালো রানি!"

কানে ঢোকে কর্মার গলার আওয়াজ। কিন্তু তার অর্থ বোধগম্য হয় না। তাই সে সাড়াও দেয় না। দাঁড়িয়ে থাকে একই ভাবে। সামনের বাড়িটার দিকে চেয়ে। আর বাড়ির মালকিনও পাল্টা চেয়ে আছে রণিতার দিকে। সহাস্য মুখে। যেন বা রণিতারই কিছু বলার প্রতীক্ষায়। কিন্তু রণিতা...

শেষে কর্মার ইশারায় শেরিং গিয়ে ঠেলা দেয় রণিতাকে। আর টলিয়ে দেয় তার বিহ্বল একাগ্রতা। সে দেওয়ালচিত্র থেকে চোখ সরিয়ে তাকায় কর্মার দিকে। কর্মা চাপা স্বরে বলে, "ইউ আর ওভার রিঅ্যাকটিং, রানি!"

রণিতা চেষ্টা করে ধাতস্থ হতে। এগিয়ে যায় আরও কয়েক পা সেই দেওয়ালচিত্রের দিকে।

"নমস্তে! নমস্তে!"

"নমস্তে! নমস্তে!"

প্রচুর নমস্তে বিনিময় করে তারা ওই ভুটানি ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তত

ক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন এক পুরুষ মানুষও। পরনে তার ভুটানি পোশাক। যেমনটা রণিতা দেখেছে ছবিতে ভুটানের রাজাকে পরে থাকতে। অতটা দামি না হলেও ডিজ়াইন একই। কমবেশি একই প্রিন্ট। এমনকি রীতিমতো পালিশ করা চামড়ার কালো জুতো আর হাঁটুর উপর পর্যন্ত কালো মোজা পরে আছেন ভদ্রলোক। কিন্তু তার ভুটানি জোব্বাটি ভাঁজ করা লুঙ্গির কায়দায় এতটাই ওপর পর্যন্ত তোলা যে, মোজার ওপরে তার ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। রণিতা না ভেবে পারল না যে, আর একটু উপরেই ঝুলছে আরও একটা...

"নমস্তে!"

ভদ্রলোকও সমান হাস্যময়। অকারণেই কেমন যেন খুশি খুশি ভাব। যেন রণিতাকে দেখে তারা আপ্লুত।

কর্মা ওদের সঙ্গে কথা বলে। রণিতা তেমন মন দিয়ে শোনে না। তবু কানে আসে দুটো চেনা শব্দ— কেওয়াদাসি আর ভাত। তার পর কর্মা বলে, এখানে ওরা ভাত তরকারি দেবেন। মিনিট দশেক লাগবে রেডি করতে। তত ক্ষণ চলো গ্রামটা ঘুরে দেখি।

গ্রাম মানে বারো-চোদ্দো ঘর লোক হবে। প্রতি ঘরে দশ জন ধরলেও দেড়শো হবে না জনসংখ্যা। দেখেশুনে কৃষি আর পশুপালনই মনে হচ্ছে এদের জীবিকা। একেবারেই সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমনটা জলঢাকার ও পারেও দেখা যায়। দেখা যায় দার্জিলিং সিকিম নেপালেও। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে...

"ও মা!"

আবার চমকে ওঠে রণিতা। টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল আর একটু হলে। পড়ে না। কিন্তু... বলা যায় তৃতীয় শক লাগে সোজা বুকে। মাথাটা ঝিমঝিম করে পরিষ্কার। স্পষ্টতই সে এমন সিন করতে থাকে যে, কর্মা ব্যস্ত হয়ে বলে, "কী হল?"

কিন্তু সে আগেই বলেছে রণিতা ওভার রিঅ্যাক্ট করছে। তাই সে বলে, "কিছু না। পা-টা একটু পাথরে..."

যদিও সে তার চোখ তখনও সরায়নি তার ভিরমি খাওয়ার কারণ থেকে। আর তার দৃষ্টি অনুসরণ করেই কর্মা দেখতে পায়। দেখে এ বার কর্মারও মনে হয় ব্যাপারটা মাথা ঘোরার মতোই।

সম্পন্ন চাষির বাড়ি বোধহয়। বড়সড়। পরিপাটি। নতুন রং করা। পেল্লাই সদর দরজা। আর সদর দরজার ওপরেই স্থাপিত সেই মোক্ষম জিনিসটা। যেমন করে লোকে কামান রাখে দুর্গের অলিন্দে। ঠিক সেই কায়দায়। এবং প্রায় সেই মাপের কাঠের তৈরি পুরুষাঙ্গ। ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙের। যেন তাক করা আছে বহিরাগত শত্রুর দিকে। হঠাৎ দেখে রণিতার মনে হয়েছিল, যেন বা তারই দিকে। তাই সে টলে পড়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল তখন।

আচমকা কোলাহলে রণিতার নজর ঘুরে যায় অন্য দিকে। এক দল শিশু দলবেঁধে এসে পড়েছে পাশের জমিতে। ঘাস পাতার ওপর। এমন তারা হাসছে যেন জগতের সবচেয়ে মজাদার খেলাটাই তারা খেলছে।

রণিতারও ভীষণ স্বস্তি হয় এমন এক দল শিশুকে দেখে। মনে হয় এই হাসিই একমাত্র ধুয়ে দিতে পারে তার মাথার ভেতর জমে ওঠা এই পুরুষাঙ্গের আবর্জনা। তাই সে এগিয়ে যায় তাদের দিকে। নিচু হয়ে বসে যোগ দেয় তাদের অকারণ হাসির উৎসবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে, "তুমহারা নাম ক্যা হ্যায়?"

কিছু বলে শিশুটি। রণিতা বুঝতে পারে না। তাকে সে কাছে টেনে নেয়। আদর করে। হাত বুলিয়ে দেয় তার গালে চুলে। জামা কাপড়ে। গলায় সে সুতো পরেছে। সুতোয় একটা লকেট। লকেটটা হাতে ধরে রণিতা মুখের কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। আর দেখেই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় সেটা। ছেড়ে দেয় শিশুটাকেও। এমন করে হাত ঝাড়ে, হাত মোছে প্যান্টে, যেন নোংরা লেগেছে তার হাতে। দেখে শেরিং আর রবিন খুব হাসে।

লকেটটাই একটা উত্থিত পুরুষাঙ্গ। ছোট্ট। কড়ে আঙুলের মাপের। কিন্তু নিপুণ হাতের তৈরি। গোড়ায় গুলিজোড়ার কাছে রঙিন সুতোয় বাঁধা। যেন ভীষণ পবিত্র কিছু!

রণিতা ভাবে, বাপ রে! কেমন সব মানুষ এরা। শিশুদেরও ছাড়েনি। ভাবতে ভাবতে আর একটু এগিয়ে যায় সে। গ্রাম শেষ হয়ে খেত শুরু হয়। ধাপ চাষের খেত। নানা রকম আনাজ ফলে রয়েছে খেত উজ্জ্বল করে। খেতের শুরুতেই একটা গোয়ালঘর। গোয়ালে চারটে হৃষ্টপুষ্ট গরু। আর গরুগুলোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টাগুলোও কাঠের তৈরি পুরুষাঙ্গ।

রণিতা গোয়াল ঘরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে। নিজেই নিজের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দেয় বেশ কয়েক বার। তার পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে একটা পাথরের উপর। হতাশ মুখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। কী জানি মেঘের কী অবস্থা এখানে।

তার পরে সে খেয়াল করল ছেলেগুলো কেউ নেই ধারেপাশে। এক নির্জন ভুটানি খেতের প্রান্তে সে একাই বসে আছে ঘাসের উপর। সামনে তিন প্রধান রংয়ের একখণ্ড হিমালয়। আকাশের নীল সাদা আর নীচে ঘন সবুজ। বিকেলের রোদে এমন ঝকঝক করছে, যেন কাচের গোল পেপার ওয়েট-এর ভেতর বসে আছে রণিতা। দেখতে যতই ঘনবদ্ধ সুরক্ষিত লাগুক, আসলে তা ঠুনকো। বিশেষ করে এই সব মানুষের হাতে পড়ে, যারা কখন কী যে উৎপটাং কাণ্ড করে বসবে তার কোনও ঠিক নেই।

রণিতার ভাল লাগে দেখে যে, প্রকৃতি কত নিরুৎসুক! এখানে এই অদ্ভুত সংস্কৃতির গ্রামের বদলে কোনও সাঁওতাল গ্রাম কি মুসলিম গ্রাম থাকলেও প্রকৃতি একই রকম থাকত। মানুষ তাদের খেলনা পুতুল, কি ধ্বজা ঝান্ডা দিয়ে কিছুই তফাত ঘটাতে পারত না। এতটাই প্রকৃতির হজম শক্তি। যেমন হজম করেছে এখানে। এই আকাশ বাতাস পাহাড় নদীর কী-ই বা এসে যায় এই মানুষগুলোর এমন পুরুষাঙ্গ-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির জন্য।

রণিতা মনে মনে বলে নিজেকে, প্রকৃতির মতো হতে হবে। প্রকৃতির মতো। আসলে এটা তার নিজেকে সামলে তোলার উপায়। মনের ওপর ভীষণ চাপ দিয়েছে ভুটানের এই গ্রাম।

অথচ কী সুন্দর কেওয়াদাসি রেঁধেছেন এই ভদ্রমহিলা। সঙ্গে লাল সাদা ভাত। শুকনো মাংসের আচার। এমন যত্ন করে সহাস্য মুখে পরিবেশন করছেন যে, রণিতার বলতে ইচ্ছে করে, 'আর একটু ভাত দাও মা!' ভদ্রলোকও সমান স্নেহশীল। যেন বাবা-মা তাদের চার ছেলেমেয়েকে যত্ন করে খাইয়ে দিচ্ছে বিদায় জানানোর আগে। দুর্গম পাহাড়ি পথে যাবে তারা বিপদ-আপদ পেরিয়ে। কী জানি আবার কবে দেখা হবে! নাকি আর দেখা হবেই না কোনও দিন!

এমন কথাই বলেন মহিলা রণিতাকে জড়িয়ে ধরে। তার চোখের কোণে জল। রণিতারও মনটা নরম হয়ে আসে। ভাবে কী আশ্চর্য মানুষ! এইটুকুতেই এত! ভাতের দোকান বই তো নয়। ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেও এত গল্প রয়ে যায়! পবিত্র অশ্রু জমে ওঠে তারও চোখে।

সাহস পেয়ে রণিতা জিজ্ঞেস করে, গ্রামজুড়ে এই পুরুষাঙ্গ প্রদর্শনীর কথা। আর কথায় কথায় জানতে পারে, এ আসলে তাদের বিপন্নতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বল ভরসা। এমন জঙ্গলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন এক গ্রামে বাস করা নিরাপদ তো নয়। ভূত-প্রেত দত্যি দানো অশুভ আত্মা... এ সবের নজর যাতে গ্রামের ওপর না পড়তে পারে তাই এই ব্যবস্থা।

কর্মা বলে, "এই যেমন আমরা বাড়িতে দোকানে লেবু-লঙ্কা ঝোলাই। কিছু ভাড়া গাড়িতে ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে রাখে মালিক। তোমাদের ও দিকেও দেখেছি নির্মীয়মাণ বাড়িতে মুড়ো ঝাঁটা ভাঙা ঝুড়ি ঝোলে। সেই রকম আর কী। এঁরা এখানে এই বস্তুটিকে বেছেছেন। বাছাইটা একটু বেয়াড়া কিন্তু ভাবনাটা একই। পরিবারের মঙ্গল।"

বিদায় বেলায় আর এক প্রস্ত আলিঙ্গন করেন মহিলা রণিতাকে। আর তার গলায় পরিয়ে দেন লাল সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটা পুরুষাঙ্গ। সেই দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীরা। মূলত কিশোর-কিশোরী আর শিশুরা। যেন এ বার থেকে রণিতাও ঢুকে পড়ল এই বিচিত্র গ্রামের সুরক্ষা বলয়ের ভেতর।

বুকের উপর হাত দিয়ে রণিতা সত্যি সত্যিই অনুভব করে তার বাস্তবতা। ছোট্ট হলেও প্রকট তার কঠোরতা। সন্দেহাতীত তার নির্ভরযোগ্যতা। জিনিসটা ধীরে ধীরে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রণিতা। আর মনে মনে বলে, আমি কি এরই খোঁজে এত দূর এলাম!

ভুটানি ভদ্রলোক কর্মার হাতেও ধরিয়ে দেন একটা। বলেন, 'এই বনের পথে যাবে। সঙ্গে রাখো এটা। গুরু ডুকপা তোমাদের রক্ষা করবেন।'

কর্মা হাতে নিয়ে তুলে ধরে জিনিসটা। লাল রং করা কাঠের তৈরি। একদম প্রমাণ মাপের। গায়ে তার হলুদ ফিতে বাঁধা। কর্মার ভাব দেখে মনে হয় পুরস্কার পেল। আর তেমনই বাচ্চাগুলো। প্রবল হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করে কর্মাকে। কর্মাও তাদের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়। তারা সকলে এগিয়ে দিতে আসে সেই মহালিঙ্গ তোরণ পর্যন্ত। আর রণিতার মাথা বাঁচানো দেখে বলে, আসতে যেতে মাথায় এগুলো ঠেকানো জরুরি। সেই জন্যই এমন নিচু করে টাঙানো। অগত্যা রণিতাও দোদুল্যমান পুরুষাঙ্গগুলোয় মাথা ঠেকাতে ঠেকাতে বিদায় নেয় এই ভুটানি গ্রাম থেকে।

গ্রাম ছাড়ার পর দীর্ঘ ক্ষণ কেউ কোনও কথা বলে না। সেটা খানিক পথের অসুবিধেয়। খানিক বলার মতো কথা বাছতে না পারায়। শেষে এক খোলা জায়গায় পৌঁছে জল খেতে চায় রণিতা। কর্মা ওর হাতে জলের বোতল দিয়ে বলে, "কেমন লাগল শকিং ভুটান?"

রণিতা জল খায়। হাসে আপন মনে। তার পর বলে, "সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমটায় মনে হয়েছিল যেন গণধর্ষণের শিকার হলাম।"

"গণধর্ষণ!"

"আর কী! চার দিকে যদি এমন করে ধর্ষণযন্ত্র দেখা যায়, একটা মেয়ের আর কী মনে হতে পারে!"

কর্মা অবাক হয়ে বলে, "ধর্ষণযন্ত্র! ইউ আর ক্রেজ়ি রানি!"

রণিতা বলে, "না, সবটা দেখার পর এখন আর তা মনে হচ্ছে না।"

"তা এখন কী মনে হচ্ছে?"

রণিতা হেসে বলে, "এখন তো লেবু লঙ্কাই মনে হচ্ছে। দেখো না, গলায় পরেও তো আছি।" হাতে ধরে তুলে দেখায় রণিতা।

কর্মা নিজেরটাও ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "নাও, আমারটাও নাও।"

রণিতা হঠাৎ ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায়। কর্মাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলে, "ধ্যাত! অসভ্য!"

বলেই সে দৌড় দেয় উতরাই পথে। কর্মা বলে, "আরে, দাঁড়াও রানি। গুরু ডুকপা একা পেলে কিন্তু ছাড়বে না!"

এক সময় জলঢাকার চেনা ডাক কানে আসে। আর তাতেই অদ্ভুত শান্তি হয় রণিতার মনে। অস্থিরতাময় এক দিনের শেষে ঘরে ফেরার স্বস্তি আসে প্রাণে। আর তাতেই এত ক্ষণ সামলে রাখা ক্লান্তি পেয়ে বসে। আর সে লাঠি ফেলে বসে পড়ে একটা পাথরের উপর। রবিন বলে, "বসলে কেন, আর তো একটুখানি।"

রণিতা বলে, "আরে সেই জন্যই তো বসলাম। কাছেই বিন্দু। আর চাপ নেই।"

কর্মা বলে, "এই সব খরগোশি ভাবনা ছাড়ো। চলো ওঠো। যাব তো ঝালং। সে এখনও অনেক দূর।"

কথায় কথায় জানা যায়, গ্রামটার নাম প্রংচু।

আসলে রণিতা তার গাঁজা পোরা জয়েন্ট সিগারেটে টান দিয়েছে ও পারে বসে। জলঢাকার জলের মিহি ছিটা আর হিমেল হাওয়ায় তার ধুনকি তুঙ্গে। সে প্রংচু নাম আর তার সম্ভাব্য বাংলা মানে নিয়ে নানা রকম ইয়ার্কি করে। কর্মা তার দিকে তাকিয়ে, মাথার পাশে আঙুল নিয়ে স্ক্রু ঢিলে হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করে।

রণিতা রেগেমেগে বলে, "তুমি আমাকে ছিটিয়াল বললে?"

কর্মা রণিতার গলায় ঝোলানো লকেটটা তারই হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "গুরু ডুকপা তোমায় রক্ষা করুন।"

মুঠোর ভেতর লকেটের অনুভূতি সত্যিই অন্যমনস্ক করে দেয় রণিতাকে। সে শান্ত হয়ে ভাবতে থাকে কে এই গুরু ডুকপা। সে কথা কর্মাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলে, "চলো, রাস্তায় যেতে যেতে বলব।"

কিন্তু রাস্তায় সে কথা শোনা হয় না রণিতার। কারণ আচমকাই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। রাস্তায় বাইক রেখে তারা পাশেই একটা হোমস্টের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। রবিন ভিতরে চলে যায়। কিছু ক্ষণ পরে ফিরে আসে চার কাপ কফি নিয়ে। তারা কফি খেতে খেতে শেরিং-এর গান শোনে। রীতিমতো গিটার বাজিয়ে। সঙ্গতে রবিন প্লাস্টিকের চেয়ার বাজায়। তালে তালে তালি দেয় রণিতা। চাবি দিয়ে হেলমেট বাজায় কর্মা।

গানটা ধীর লয়ের পাহাড়ি সুরে। ঘুম ঘুম ভাব। শেষ হতেই রণিতা বলে, "রেশম ফিরিরি গাও তো। আমি নাচব।"

রণিতা যে এত ভাল নাচে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। রীতিমতো বর্ন ডান্সার। নাচে-গানে আসর পুরো জমজমাট। দ্বিতীয় গান শেষ হতে হতে দেখা যায় হোমস্টের সব লোক এসে বারান্দায় ভিড় জমিয়েছে। শুধু গেস্টরাই নয়, হোস্টরাও। উচ্ছ্বসিত হয়ে তারা প্রবল হাততালি দিয়ে ওঠে।

এর পর আসর ওদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ দর্শকদের মধ্যে অনেকেই নাচতে নেমে পড়ে। গাইতেও শুরু করে কেউ কেউ। এক জন তো শেরিংয়ের গিটার নিয়েও টানাটানি লাগিয়ে দেয়। রণিতা ভাবে, সব শালা জয়েন্ট পার্টি নাকি!

তত ক্ষণে বৃষ্টি ছেড়ে যায়। ওরা আসর গুটিয়ে বিদায় নেয়। লাভের মধ্যে কফির দাম নিতে চায় না হোমস্টের মালিক।

বাকি পথ নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে আসে ওরা। যদিও শেষ অংশে বাইকের হেডলাইট জ্বালাতে হয়। রণিতাকে ওর হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে কর্মা বলে, "ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি এক ঘণ্টা পরে তোমাকে নিতে আসব।"

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "নিতে আসব মানে?"

"আরে মা তোমাকে রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছে। ফোন করেছিল। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।"

"কিন্তু কর্মা, আমি..."

"কোনও কিন্তু টিন্তু নয়। রান্না হয়ে গেছে।"

রণিতাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে কর্মা বাইকে বিকট আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যায়। তখন মাত্র সন্ধে পৌনে ছ'টা।

কর্মার পরিবারের সঙ্গে সন্ধেটা ভালই কাটল রণিতার। একদম স্থানীয় খাবার খেল ওদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে। ভাত আর কালো ডাল। নিঙরো শাক আর পাহাড়ি মুরগির মাংস। কর্মার বাড়ির লোক এত কথা বলল, যেন তারা আসলে খেতে বসেনি। বসেছে কথা বলতে। খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। আর এই কথার স্রোতে ভেসে ভেসেই রণিতা জানতে পারল কর্মা বাড়ির বড় ছেলে হলেও বিয়ে করেনি। কিন্তু ওর মেজ ভাই সেরে ফেলেছে। যাকে সে কর্মার বৌদি ভেবেছিল, সে আসলে ভাইয়ের বউ। কর্মার বয়স ছাব্বিশ। মানে তার থেকে দু'বছরের ছোট। কর্মার বাবা স্কুল-শিক্ষক। মা-ও তাই। বোন কলেজে পড়ে ভাই মোবাইলের দোকান করেছে চালসায়।

এত সব তথ্য নিয়ে রণিতা হোটেলে ফিরে আসে রাত সাড়ে আটটায়। কর্মা আসে পৌঁছে দিতে। হেঁটেই। পথঘাট শুনশান। অন্ধকার। রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। মাতালও নয়। শুধু রণিতা আর কর্মা। রণিতা হঠাৎ কর্মার হাতটা ধরে। কর্মা চমকে উঠে তাকায় রণিতার দিকে। রণিতা হাসে। বলে, "তোমার মতো এক জন বন্ধু পাব এখানে কখনও ভাবিনি।"

কর্মা কোনও উত্তর দেয় না। হয়তো রণিতার স্পর্শ তাকে অন্যমনস্ক করেছে। আড়ষ্ট করে রাখে সে নিজের হাতটা। রণিতা বলে, "তুমি তো আমার চেয়ে ছোট দেখছি।"

কর্মা বলে, "তাই?"

"হ্যাঁ, আমার তো আটাশ হল।"

"বিয়ে তো করে ফেলেছ।"

"হ্যাঁ। তোমার ভাই চব্বিশেই করে ফেলল। কিন্তু তুমি করোনি কেন?"

কর্ম বলে, "করব যে দিন ইচ্ছে জাগবে।"

রণিতা গলায় দুষ্টুমি এনে বলে, "এখন কি ইচ্ছে জাগে না?"

কর্মা চুপ করে থাকে। রণিতা খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলে, "উত্তর দিলে না যে?"

কর্মা বলে, "না, বোঝার চেষ্টা করছি, তুমি প্রশ্ন করছ না

প্রস্তাব দিচ্ছ!”

রণিতা কর্মার হাতটা ছেড়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে বলে, “না বাবা, প্রস্তাব দিচ্ছি না। আজ সারাদিন যা গেল তার পর আর আমি তো ও সব ভাবতেই পারছি না।”

কর্মা বলে, “তা হলে গুড নাইট। তোমার হোটেল এসে গেল।”

রুমের তালা খুলতে খুলতে রণিতার মনে পড়ল গুরু ড্রুকপার কথা জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল কর্মাকে। ভুলে গেছে। অগত্যা বিছানায় গড়িয়ে পড়ে গুগল এর শরণাপন্ন হল। আর গুরু গুগল গুরু ড্রুকপা সম্পর্কে যা জানাল তাতে তো রণিতার চোখ কপালে!

সেই সঙ্গে ভীষণ আগ্রহও বেড়ে গেল ভুটান সম্পর্কে । ভুটানের এই বেয়াড়া সংস্কৃতি সম্পর্কে। সর্বোপরি গুরু ড্রুকপা কুনলে সম্পর্কে। ভাবতে অবাক লাগে রণিতার যে, সেই যুগে মানে আজ থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর আগে এমন এক আশ্চর্য মানুষের জন্ম হয়েছিল। তাও হিমালয়ের এই দুর্গম দেশে। পাশেই তো ভুটান। গুরু ড্রুকপার বিচরণ ক্ষেত্র। তাঁর কর্মভূমি। সেই দেশেরই এক দুর্গম গ্রামে সে ঘুরে এল। আর নিজের চোখে দেখে এল গুরু ড্রুকপার অর্ধসহস্রাধিক বছর আগে দিয়ে যাওয়া নির্দেশ আজও কেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে তার অনুগামীরা। দুষ্প্রাপ্য এক রীতি-পদ্ধতি জেনেও। আপাতদৃষ্টিতে চূড়ান্ত অশ্লীল জেনেও। দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছে তাকে।

কী ভাবে পারলেন গুরু ড্রুকপা! মানুষকে তিনি কী করে এই সব মেনে নিতে রাজি করালেন! আজ থেকে এত বছর আগে যখন মানুষের জীবন অনেক অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। ঘনবদ্ধ ছিল। সেই গুরুর সন্ধানে আরও একটু সময় ব্যয় করা যেতেই পারে।

ভাবতে ভাবতে রণিতা গুরু ড্রুকপা সম্পর্কে যা কিছু পেল সবই পড়তে লাগল আর পড়তে পড়তেই সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। হোটেলের ঘরে তখন হালকা আলো জ্বলছে। তার আবছা নীলিমায় স্বপ্নিল হয়ে আছে নরম ফোলা বিছানা বালিশ। লেপ কম্বল। তারই মখমলি আদরের ভেতর ডুবে যায় রণিতা। জানলার কাচে নিথর ডুয়ার্সের রাত। তারই পাশে দেওয়ালে একটা থাংকা। নিশ্চয়ই সস্তায় কেনা রাস্তার ধারের কোনও চোরা দোকান থেকে। এমন থাংকা দেখলে গুরু ড্রুকপা নিশ্চই তার ওপর পেচ্ছাপ করে দিতেন। যেমনটা তিনি দিয়েছিলেন সেই ভুটানি বৃদ্ধের থাংকার ওপর। যার ভেতর তিনি নির্মাণে খামতি দেখেছিলেন। মনে করেছিলেন এমন থাংকা মুতে দেওয়ারই যোগ্য। সেটাই করে আবার গুটিয়ে বৃদ্ধকে ফেরত দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে সে কথা এক গুম্ফার লামাকে বলেছিলেন। সেই লামা যখন থাংকাটি দেখতে চাইলেন, তখন থাংকা খুলে তো বৃদ্ধের চক্ষু ছানাবড়া। তার বিবর্ণ কমদামি থাংকা সোনালি আভায় ঝলমল করছে। যেন সে রেশমের ওপর সোনালি সুতোয় বোনা।

এর পর সেই বৃদ্ধ যদি ফিরে যেতেন গুরু ড্রুকপার কাছে, তার থাংকাটাকে এ ভাবে ধন্য করার জন্য তাঁকে প্রণাম জানাতেন, আর জানতে চাইতেন বদলে তিনি কী করতে পারেন গুরুর জন্য, তা হলে গুরু ড্রুকপা তাকে নিশ্চয়ই বলতেন এক বোতল মদ আর এক জন মেয়েমানুষ এনে দিতে। এমনই দুশ্চরিত্র ছিলেন গুরু ড্রুকপা কুনলে।

আর কী উৎকট গন্ধ গুরুর গায়ে। কত দিন যে চান করেননি তার ঠিক নেই। জামা কাপড় কাচেননি। তার ওপর অন্য লামা গুরুদের মতো মুণ্ডিত মস্তকও নন তিনি। উস্কোখুস্কো চুল দাড়ি শোভিত। আর সেই চুল দাড়ির ভেতরে যে উকুনের জনবিস্ফোরণ তা বলাই বাহুল্য। রণিতার বুকের ওপর যেন টুপটাপ ঝরে পড়ছে গুরুর উকুন। গুরু মদ খান। তামাক খান। ধূমপান করেন। পিঁয়াজ রসুন... ওহ্‌ঃ! দম আটকে আসে রণিতার। তার ওপর মেদবহুল শরীর গুরুর। অথচ পাথরের মতো শক্ত। মনে হয় বুকের ওপর মানব-ভাস্কর্য চেপে বসেছে। দম আটকে আসে রণিতার। শ্বাস নিতে পারে না। মাথাটাও এ দিক-ও দিক নাড়তে পারে না সে, এমন শক্ত করে গুরু ধরে রেখেছে। নাড়তে পারে না হাত পা। অথচ দম আটকে মরে যাওয়ার মতো তার অবস্থা। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে যায় রণিতা। কিন্তু তার গলা দিয়ে একফোঁটা আওয়াজ বেরোয় না। মনে হয় গলার ভেতরে গুরুর লম্বা জিভ ঢুকিয়ে বায়ুপথ বন্ধ করে রেখেছে। আর সে কিছুতেই বাঁচবে না বলেই মনে হয় রণিতার। শেষ চেষ্টা করার জন্য সে তৈরি হয়। শরীরের সব শক্তি এক করে চার হাত-পা গুটিয়ে সে এক প্রবল ঝটকা মারে গুরুকে আর গুরু ছিটকে পড়ে মেঝেয়। রণিতা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিছানার ওপর।

মোবাইলটা ছিটকে পড়েছে কাঠের মেঝেতে। স্ক্রিন জ্বলে আছে। তাতে গুরু ড্রুকপা কুনলের ক্রুদ্ধ মুখ। তখনও চেয়ে আছে রণিতার দিকে। ওটাই বুকের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল রণিতা। আর ওটুকুতেই কত কষ্ট পেল সে। সত্যি সত্যি গুরুর সান্নিধ্যে এলে কী না কী হত কে জানে!

ঘুরেফিরে সেই প্রশ্ন রণিতার মাথায় আবার আসে। এমন গুরু কী করে একটা গোটা জাতির মনে মস্তিষ্কে চেতনায় এমন করে গেঁড়ে বসতে পারল! যাকে আজও উপড়ে ফেলা যাচ্ছে না!

অনেক রাতে ঘুমিয়ে অনেক বেলায় ওঠাই রণিতার স্বভাব। কিন্তু আজ ঘুম ভেঙে যায় সকাল সকাল। ডেকে ডেকে ভাঙিয়ে দেয় কেউ। সমানে কানের কাছে ঠক ঠক ঠকা ঠক। চোখ খুলে তো অবাক রণিতা। কাচের শার্সিতে সমানে ঠুকরে যাচ্ছে একটা হলুদ পাখি। যেন সে আসতে চাইছে তার কাছে। বেশ খানিক ক্ষণ শুয়ে-শুয়ে পাখিটার কাণ্ড দেখল রণিতা। উজ্জ্বল হলুদ আর খয়েরি পাখিটার রং। ভীষণ মানানসই এই হিমালয়ের পাহাড়ি পরিবেশে। যেমন টয়ট্রেন। যেমন মনাস্ট্রি। যেমন হলুদ খয়েরি জোব্বা, বক্ষু পরা লামা।

ভাবতেই মনে মনে চমক লাগে রণিতার। গুরু ড্রুকপা কুনলে নয় তো! পাখির ছদ্মবেশে এসেছেন তার কাছে। রং দেখে তো বক্ষু পরেই এসেছে মনে হচ্ছে। স্বভাবেও এমন অস্থির। দেখাই যাক।

কিন্তু না। জানলার কাছে যেতেই ব্যাটা উড়ে পালাল। উনি হলে পালাতেন না। রণিতা নিজের মনে হাসে। ভাবে মাথার ভেতর ঢুকে বসেছেন গুরুমশাই।

তোয়ালে হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে রণিতা। আয়নায় নিজেকে দেখে খুঁটিয়ে। চোখে পড়ে গলায় ঝোলানো সেই ভুটানি লকেটটা। সেই মুহূর্তে তার ভীষণ অশ্লীল লাগে জিনিসটাকে। নিতান্তই একটা সেক্স টয় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এমনকি তার খেলতে ইচ্ছে করে খেলনাটা নিয়ে।

গলা থেকে খুলে সে হাতে নেয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। বাস্তবে খেলার পক্ষে নিতান্তই ছোট। কিন্তু কর্মা যেটা দিয়েছিল সেটা ছিল উপযুক্ত মাপের। একটু বড়র দিকেই। মনে পড়ল, সেটা ওর ব্যাগে আছে। কর্মা রাখতে দিয়েছিল। তার পর নিতে ভুলে গেছে।

রণিতা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ন্যাপস্যাকটা খুলে বের করে আনল কর্মার খেলনাটা। তার পর সেটা নিয়ে আবার ঢুকল বাথরুমে। আয়নার সামনে দাঁড়াল জিনিসটা হাতে নিয়ে। তার উজ্জ্বল ক্যাটকেটে রংটা ভীষণ আকর্ষক লাগছে। গায়ে জড়ানো হলুদ ফিতেটা খুলে রাখল সে। ভিজে গেলে শুকোতে আবার সময় লাগবে। তার পর খেলনাটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। বাগিয়ে ধরল নিজের মুখের কাছে।

এক বার মনে হল সক্কাল সক্কাল... চাও খায়নি এখনও। এ কী কাণ্ড সে করতে লাগল! তার কি মাথাটা...

কিন্তু সে ফিরে পেল না তার মনের জোর। সংযম যেন সেই মুহূর্তে তাকে ছেড়ে বহু দূর চলে গেছে। এখন সে অসহায় শিকার এই অদম্য দুর্বলতার। নিজের অজান্তেই সে পৌঁছে গেছে সেই চরম বিন্দু পর্যন্ত যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। পয়েন্ট অব নো রিটার্ন।

অগত্যা সে সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিল খেলনাটা। তার পর তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে বিছানায় ফিরে গেল জিনিসটা নিয়ে। এক হাতে শক্ত করে খেলনাটা ধরে সে তৈরি হল অপ্রতিরোধ্য সেই খেলায় মেতে ওঠার জন্য।

মসৃণ সেই অপরূপ প্রাপ্তবয়স্ক খেলনাটার ছোঁয়া লাগতেই রীতিমতো শিউরে ওঠে রণিতা। আর তার কল্পনায় ভেসে ওঠে একের পর এক পুরুষ মুখ। সচেতন ভাবেই সে চেষ্টা করে এক জনকে বেছে নিতে। কিন্তু পারে না। এমনই অস্থির বিভ্রান্ত লাগে। আনকোরা কর্মার মুখটাও এক

মুহূর্ত স্থির হয়েই সরে যায় তার কল্পনা থেকে। অবশেষে গুরু ভ্রুকপা কুনলেই যেন পরাস্ত করে তাড়িয়ে দেন সকলকে। তার পর বিজয়ীর পুরস্কার নিতে স্থির হয়ে উঠে আসেন তার সমগ্র সত্তা জুড়ে। রণিতা আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছে তার। যেন ওইটাই সে চেয়ে এসেছে আজীবন। ঠিক এতটাই গভীরতায় এই প্রিয় হিমালয়কে সে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বরাবর। আজ যেন সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল তার।

পর্বটা শেষ করার পর সর্বাঙ্গ শিথিল করে ধামসানো বিছানায় পড়ে থাকে রণিতা। চেষ্টা করে অসাড় হয়ে থাকতে। যাতে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বিভেদ রেখাকে ছুঁয়ে দেখতে পারে। কিন্তু তার এই দার্শনিক বিলাসিতা বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয় না। অচিরেই তাকে সাড়া দিতে হয় ধূমায়মান বাস্তবের ডাকে।

গরম চা! তাও খাঁটি দার্জিলিং। রংটা একটু পাতলা। কিন্তু দারুণ তার নির্যাস। সাদা প্লেটে কাপ ধরে নিয়ে এসেছে একটা ছেলে। একেবারে কচি ছেলে। দরজা খুলে তার হাত থেকে চা-টা নিয়ে রণিতা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে, "কী নাম তোমার?"

মিষ্টি হেসে ছেলেটা বলে, "সেওক।"

"সেবক! বাহ! সুন্দর নাম তো! চা টা তুমি করেছ?"

"না। দিদি করেছে।"

"কোথায় তোমার দিদি?"

"কিচন মা।"

"আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের কিচেনে?"

"আসুন।"

রণিতা চায়ের কাপ হাতেই সেবকের পিছুপিছু নামতে থাকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে বাড়ির বাইরে পাথরের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ঘুরে গেছে বাড়ির নীচতলার দিকে। সেখানেই ওদের কিচেন।

সেবকের দিদি তখন নিজেই চা খাচ্ছিল। বিরাট একটা লাল কফি মগে করে। রঙিন ছাপা লুঙ্গি বেশ কষে কোমরে জড়ানো। ওপরে শার্ট। পায়ে আকাশি চপ্পল। চুল খোলা। রণিতাকে দেখে এমন ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল যেন সে গোপনে কোনও নিষিদ্ধ কাজ করছিল। রণিতা তার হাত ধরে বলে, "তুমি সেবকের দিদি?"

দিদি তখন বিরাট উজ্জল একটা হাসি মুখে-চোখে ধরে রেখে তাকিয়ে আছে রণিতার দিকে। সেবক একটা কাঠের পিঁড়ে এগিয়ে দেয় রণিতার দিকে। রণিতা ওতেই বসে, প্রায় থেবড়ে বসার মতই। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে তারা মেতে ওঠে খোশগল্পে।

সেবকের দিদির নাম নিমা। সে কখনও কলকাতা দেখেনি। কিন্তু কলকাতা নিয়ে তার ভীষণ কৌতূহল। রণিতাকে সে এমন করে দেখে যেন সে একটা নমুনা। কলকাতার। রণিতা নিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে আসলে তা নয়। বরং অন্য রকম।

সেবক মৃদু স্বরে বলে, "হ্যাঁ। কলকাতা থেকে তো বহু লোক আসে। তারা আপনার মতো নয়।"

নিমা বলে, "আর একটু চা নেবে?"

রণিতা আর একটু চা নেয়। নিমা তখন তার চা শেষ করে ফেলেছে। কাপটা মুখের ওপর উপুড় করে তার তলানিটা মুখে ঢালছে। আর মুখ ভরে চিবোচ্ছে।

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "চা চিবোচ্ছ?"

নিমা দাঁত বার করে হাসে। তখন দেখা যায় সে আসলে ভাত চিবোচ্ছে। রণিতা আরও অবাক হয়ে বলে, "ভাত! চায়ে ভাত এল কোথা থেকে?"

নিমা হেসে বলে, "চা নাস্তা একসঙ্গে।"

"চায়ের মধ্যে ভাত দিয়ে?"

"হ্যাঁ। চায়ের মধ্যে একমুঠো বাসি ভাত দিয়ে দেবে। চা খাওয়াও হল। নাস্তাও হল।"

রণিতা তখনও সন্দিহান। আগের বিস্ময় ধরে রেখেই বলে, "কেমন লাগে?"

"খেয়েই দেখো। দেব একটু?"

"ভাত?"

"হ্যাঁ।"

রণিতা নিরুৎসুক আগ্রহে বলে, "দাও একটু দেখি!"

নিমা ডেকচি থেকে আধমুঠো ভাত তুলে রণিতার কাপে দিয়ে দেয়। নিমেষে ভাতগুলো তলিয়ে যায়। উঠে আসে চা এর উচ্চতা। আবার ভরে যায় তার আধ খালি কাপ। রণিতা নিয়ম মতোই চুমুক দিয়ে চা খায়। ভাতের নাগাল পায় না। এক সময় চা শেষ হয়ে ভাত বেরিয়ে আসে। তারপর দুধ চিনি মিষ্টি চা সহ ভাত মুখে নিয়ে চিবোতে থাকে রণিতা। নিমা সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে বলে, "কেমন?"

রণিতা বলে, "ভালই তো!"

সত্যি সত্যিই। খারাপ লাগে না রণিতার। পুরোটাই সে খেয়ে ফেলে।

হোটেলের রান্না ঘরে বসে আরও কিছু ক্ষণ গল্প করে ওরা। কলকাতার। ঝালং এর। ভুটানের। নিমা আর সেবক ভাই বোন। দু'জনেই কাজ করে এই হোটেলে। ওদের বাড়ি আর একটু নীচে। নিমা এখন নদীতে যাবে কাপড় কাচতে। চানও করবে। তার পর লাগতে হবে হোটেলের রান্নায়। গেস্ট এখন ফুল প্যাকড আছে।

রণিতা বলে, "নদী! কোন নদী?"

"ঝলুং খোলা।"

"আমিও যাব।"

"চলো। চানটাও করে নেবে।"

নিমা আর রণিতা রওনা দেয় ঝলুং খোলার দিকে। কিচেনের দায়িত্বে থাকে সেবক।

পাহাড়ি শুঁড়িপথ এঁকেবেঁকে নেমে গেছে খাড়া ঢাল বেয়ে। ধাপ চাষ এর সবজি খেতের পাশ দিয়ে। বিচ্ছিন্ন একটা বাঁশঝাড়ের গোলচক্কর ঘুরে। ছোট একটা কমলালেবুর বাগানের ভেতর দিয়ে। লেবু ধরে আছে গাছে গাছে। সবেমাত্র পাতিলেবুর সাইজ। নিমার প্ররোচনায় একটা ছিঁড়ে নিল রণিতা। পাতার চেয়ে বেশি সবুজ তার রং। খোসাসুদ্ধ বসিয়ে দিল এক কামড়। কষা স্বাদে বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ। আর তেমনই রামটক। দেখে হেসে কুটোপাটি নিমা। যেন সে ছোট্ট বালিকা, ঝলুং নদীর তীরে।

নদীতে জলের চেয়ে পাথর বেশি। যেন পাথরেরই নদী। জল তার উপজাত দ্রব্য। সামান্য বইছে মাঝখান চিরে। সেই ধারায় খাল কেটে আটকানো আছে এক জায়গায়। ঝোপঝাড় আর বোল্ডারের বেশ আড়ালও আছে এখানটায়। সেই ধরে জমানো জলেই কাপড় কাচে নিমা। চ্যাটালো একটা পাথরের ওপর জামাকাপড় ফেলে কাঠের একটা ছোট ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে...।

নিমা হেসে বলে, "ক্রিকেট ব্যাট নয় গো। মুগুর এটা। বল পিটি না। নোংরা পিটি। আমরা বলি মুংরো।"

"মুংরো! বাঃ! কী সুন্দর নামটা!"

নিমা বলে, "নামটা ভাল। কামটা ভাল নয়। দেখো কেমন দমাদম দমাদম...!"

নিমা নিজেই হাসে নিজের রসিকতায়। রণিতা বলে, "পিঠে পড়লে কেমন লাগবে?"

"নোংরা পিঠে পড়লে ভালই লাগবে!"

নিমা বসে বসে এক গামলা কাপড় কাচে। খোলার জলেই ধুয়ে নেয়। মুচড়ে নিংড়োয়। তার পর ওই অবস্থাতেই গামলায় গুটিয়ে রাখে। যেন উৎপন্ন ফসল কোনও। শখ করে রণিতাও মুগুর চালায় নিমার বেডশিট এর উপর। দু'পাশ থেকে ধরে দু'জনে মোচড়ায় প্রাণপণ। নিংড়ে বার করে আনে শুষে নেওয়া সব জল। তার পর নিমা স্নানের প্রস্তুতি নেয়।

পরনের লুঙ্গিটাই সে তুলে বুকের ওপর বেঁধে নেয় সামনে গিঁট মেরে। তার পর খুলে ফেলে শার্টটা। চটি খুলে নেমে যায় ঝলুং এর জমানো কুণ্ডজলের ভেতর। চ্যাটালো পাথরটার ওপর পা তুলে গোড়ালি ঘষে। তাতেও শান্তি না হওয়ায় সে ছোট একটা পাথর কুড়িয়ে সেটা দিয়ে ঘষতে থাকে গোড়ালি। রণিতা বলে, "ছাল উঠে যাবে তো!"

নিমা হাসে। কিছু বলে না। ঝলুং এর সবজেটে জলে রাজহংসীর মতো উজ্জ্বল লাগে নিমার ফর্সা গা হাত পা। বুক-পিঠ। রণিতারও ইচ্ছে করে

জলে নামতে। নিমা উস্কে যায় সমানে। তখন পরনে তার পালাজো। টি-শার্ট। ওপর দিয়ে আলতো একটা স্টোল। রণিতা এক সময় আর পারে না। স্টোলটা নামিয়ে রেখে লাফিয়ে পড়ে জলে। আর জলে নেমেই তোলপাড় করে ফেলে ঝুলুং এর জল। মাত্র এক কোমর গভীর কুণ্ডটা। কিন্তু রণিতা শরীর ভাসিয়ে দেয় তারই মধ্যে। চার হাত-পায়ে ছিটোতে থাকে জল। খলবল খলবল করে কোলাহল তোলে জলে। আর তেমনই সে চিৎকার করতে থাকে মনের আনন্দে। যেন সে তার কলকাতাকে ডেকে ডেকে দেখাতে চায়, কী কাণ্ডটাই না সে করছে দেখো ডুয়ার্সে একা একা বেড়াতে এসে!

"সাবুন?"

নিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। তার হাতে গোলাপি একটা সাবান। বাড়িয়ে দেয় রণিতার দিকে। রণিতা সাবানটা হাতে নিতে যায়। কিন্তু সেটা পিছলে পড়ে যায় কুণ্ডের জলে। সাবানের খোঁজে জলের দিকে তাকিয়েই আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে রণিতা। ভয়ে জড়িয়ে ধরে নিমাকে। টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে দু'জনেই। জলের মধ্যে কয়েক পাল্টি খেয়ে নেয়। রণিতা হাঁচড়পাঁচড় করে জল ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। নিমা বলে, "কে ভয়ো? আরে কী হল?"

রণিতা বলে, "জলে কী একটা জন্তু আছে।"

"জন্তু!"

"হ্যাঁ। এই লম্বা! কালো!"

নিমা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। রণিতা তত ক্ষণে জলের বাইরে। ভাল করে দেখে নিমা চাপাস্বরে বলে, "আরে, এ তো মাছা!"

"মাছা?"

"হ্যাঁ গো মাছ। বিরাট বড়। এক কিলো তো হবেই।"

কিন্তু সে মাছ নিমাকে নাকাল করে ছাড়ল। কিছুতেই সে আর ধরতে পারল না। মাছটা আটকে পড়েছে । পালাতেও পারছে না। কিন্তু নিমা তাকে ধরতেও পারছে না। রণিতা কুণ্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে বুদ্ধি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাছে আসছে না।

শেষে বিরক্ত হয়ে নিমা বলল, "দেখো তো, আশপাশে কোনও মানুষ দেখতে পাচ্ছ?"

চার দিকে জরিপ করে রণিতা বলল, "না, কেউ কোত্থাও নেই।"

"ঠিক আছে। এ বার দেখো কী করি!"

বলেই নিমা তার পরনের একমাত্র ছাপা লুঙ্গিটা খুলে ফেলল। প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা স্থানে এক যুবতী মেয়ে আপাদমস্তক উলঙ্গ হয়ে পড়ল রণিতার চোখের সামনে। তার পর সেই লুঙ্গির এক মুখ বেঁধে নিল গিঁট দিয়ে। অন্য মুখ দুই হাতে মেলে ধরে তার ভেতর মাছটাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করতে লাগল। রণিতা পাড়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল নিমাকে। মেয়েটার তো বিয়েও হয়নি। মানে তার নারীশরীরের নিয়মিত ব্যবহারে সে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত নয় এখনও। অথচ সেই শরীর নিয়ে তার কোনও মানসিক জটিলতা নেই। একেবারে শিশুর মতো। অথবা প্রকৃতিরই কোনও অপাপবিদ্ধ সন্তানের মতো। কিংবা মাঝামাঝি কিছু। হয়তো মৎস্যকন্যা কোনও, যে জানেই না চারিদিকে শিকারীরা ঘুরছে দাঁত নখ গুটিয়ে রেখে। একা পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নিমা হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে রণিতাকে। বলে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ! এসো আমাকে সাহায্য করো।"

রণিতার অদম্য ইচ্ছা তখন মাথায় চড়ে বসেছে। কী জানি এ সুযোগ আবার কোনও দিন আসবে কি না। একশ ভাগ প্রকৃতির হয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর। সুতরাং রণিতাও খুলে ফেলে তার টি-শার্ট। খুলে ফেলে পালাজো। নিমার মতো সেও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। আর শুরু করে ঝুলুং এর জলে মৎস্য শিকার। যেন আদিম যুগের দুই মানবী। হাত লাগিয়েছে মানব সভ্যতা গড়ে তোলার মহান কাজে। তাদের উচিত ছিল মানবী সভ্যতা গড়ে তোলা। কী জানি এ বার সেই গলদ শুধরে নেওয়ার কাজেই নামল কিনা রণিতা আর নিমা।

শেষ পর্যন্ত সাফল্য এল নিমার লুঙ্গির ভেতর। জলের বাইরে তুলতেই প্রবল ছটফটিয়ে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো মাছটা। কিন্তু তত ক্ষণে নিজেদের শক্তি ফিরে পেয়েছে দুই নারী। তারা তাকে সহজেই কাবু করে ফেলল।

রণিতা বলে, "রুই?"

"না গো। কালবোস।"

লুঙ্গির উল্টো মুখেও গিঁট মেরে পাড়ে ছুড়ে দেয় নিমা। তার পর যেন সে সংবিৎ ফিরে পায়। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে বলে, "এ মা! তুমিও! লোকে দেখলে কী ভাববে!"

রণিতা হঠাৎ নিমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ভাববে মেয়ে দুটো প্রেম করছে।"

নিমার ভীষণ বেয়াড়া লাগে রণিতার আলিঙ্গন। কিন্তু আবার ভালও লাগে। সে চুপ করে থাকে। রণিতা তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "কী সুন্দর তুমি নিমা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও কোনও দাগ নেই।"

নিমা খুব হাসে। কিছু বলে না। রণিতা জিজ্ঞেস করে, "এত হাসছ কেন?"

নিমা বলে, "মনে হচ্ছে তুমি কোনও ছেলের চোখ দিয়ে আমায় দেখছ।"

রণিতা তাকে আরও কষে ধরে বলে, "মনে হচ্ছে কি কোনও ছেলে তোমায় ধরে আছে?"

"না। তা মনে হচ্ছে না। এমন ফুলের মতো নরম তোমার শরীর!"

রণিতা বলে, "ও! তার মানে তোমার নিজেকে ছেলে মনে হচ্ছে! তাই না?"

নিমা আবার হাসে। কিছু বলে না। রণিতা বলে, "আচ্ছা নিমা, বলো তো, ছেলেদের বাদ দিয়ে মেয়েদের চলবে না?"

নিমা বলে, "চলবে না কেন! এমন কোনও কাজ আছে যা ছেলেরা পারে, কিন্তু মেয়েরা পারে না?"

"তাই তো! মেয়েরা সব পারে।"

তার পর নিমা ভাবনায় সামান্য হোঁচট খাওয়ার মতো করে বলে, "ওই একটা কাজ বাদ দিয়ে।"

"কোন কাজ?"

"বিছানায়!"

রণিতা বলে, "ধুর! ওটা কোনও ব্যাপার হল! তারও অনেক বিকল্প ব্যবস্থা আছে।"

"কিন্তু তাতে তো আর বাচ্চা হবে না!"

রণিতা কণ্ঠে হতাশা ফুটিয়ে বলে, "আর কত বাচ্চা বানাবে মানুষ, বলো তো! মানুষের ভারে তো পৃথিবী টলমল করছে!"

নিমা হাসে। তার পর বলে, "আচ্ছা, পৃথিবীটা যদি শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের হতো, তাতে কি ভাল হত?"

"জানি না। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হয় তা হলে!"

"কী ভাবে?"

কী ভাবে তা রণিতা বোঝানোর চেষ্টা করে নিমাকে। মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা সে বলে। রেলের মহিলা কামরা থেকে শুরু করে গার্লস হস্টেল, গার্লস স্কুল থেকে শুরু করে মহিলা জেল। সে সব জায়গায় তো এক ভাবে দেখলে এই এক্সপেরিমেন্টটাই চলে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা তেমন আশাপ্রদ নয়। তাই শুধু মেয়েদের একটা পৃথিবী হয়তো কাম্য নয় সে ভাবে।

নিমা বলে, "আজকাল শুনি তোমাদের ও দিকে মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে করে পরিবার গড়ছে! কেমন হয় সেই পরিবারগুলো?"

"ওগুলো সেই একই এক্সপেরিমেন্টের অঙ্গ। ফলাফল এখনও হাতে আসেনি..."

রণিতা আরও কী বলতেই যাচ্ছিল, নিমা হঠাৎ মুখে দুটো আঙুল দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা সিটি মারল। রণিতা চমকে উঠে ওকে ছেড়ে দেয়। তার বুকটা কাঁপতে শুরু করে নিমার কাণ্ড দেখে। বুকে হাত দিয়ে সে বলে, "কী হল?"

নিমা খুব হাসে রণিতার চমকে ওঠা দেখে। তার পর বলে, "সাড়া দিলাম। সেওক ডাকছে।"

সেবক ডাকছে শুনে রণিতা ব্যস্ত হয়ে তার জামাকাপড়ের খোঁজ

করে। কিন্তু নিমা ওকে আশ্বস্ত করে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। সেওক আসেনি। ওপর থেকেই সিটি মেরে সঙ্কেত দিয়েছে। রণিতা সেটা শুনতে না পেলেও নিমা শুনেছে। তাই সাড়া দিল সিটি বাজিয়ে।

তত ক্ষণে বেলা একটু বেড়েছে। সঙ্গে রোদ। আর বেড়েছে আলো। ঝুলুং নদীর সাদা নুড়ি পাথরের অববাহিকা ঝলমল করছে আলোয় আলোয়। জল আর পাথরের সঙ্গে মিশে সেই আলো বয়ে যাচ্ছে ভাটির দিকে। সে দিকে তাকিয়ে ঝিকমিক করে রণিতার চোখ। পায়ের তলায় ছোট বড় পাথরের ছোঁয়া অনুভব করতে করতে রণিতা উঠে আসে জল থেকে। নদীর পাড়ে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। কেন যেন তার একটুও সঙ্কোচ হয় না এই প্রকাশ্য নগ্নতায়। উল্টে ভীষণ উপভোগ করে অভিজ্ঞতাটা। মনে হয় এক যুবতী নারীর কাছে এ এক বিরাট পাওনা। চেয়েও তা সবাই পায় না। যদিও অধিকাংশই চাইতে ভুলে গেছে। এ চাওয়া পাপের সমান।

রণিতা ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে নামে নদীর পাতলা জলে পা ডুবিয়ে। তার নিজেকে মনে হয় আদিম যুগের কোনও এক মানবী, যে হেঁটে যাচ্ছে মানব সভ্যতার প্রবাহ বেয়ে। তার প্রতি পদক্ষেপে পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে সভ্যতার গতিপথ। এসে পড়ছে নতুন নতুন বাঁক। পশ্চাৎপটে বদলে বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি। তুষার ঢাকা হিমযুগ কখনও। কখনও পাতা ঝরা বসন্ত। রোদ জ্বলা মরুভূমি কখনও। কখনও অন্ধকার অরণ্য যুগ। আদিম মানবী পায়ে পায়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সে সব। যুগ থেকে যুগে যেন বিস্তৃত তার যাত্রাপথ। একই রকম সে বিরাজমান যুগে যুগে। সব যুগে। তার মৃত্যু নেই। বিনাশ নেই। নিত্য নতুন ভাবে সে টিকে আছে অনন্ত এই পৃথিবীর পথে। সে নারী। যাকে বাদ দিয়ে এক দিনও চলবে না এই সভ্যতা। অথচ সবাই তাকে বলে মানব সভ্যতা। মানবী সভ্যতা নয়।

নিজের মগ্নতার সঙ্গে অনেকটাই নেমে এসেছে রণিতা। বাঁকের মুখে বড় একটা পাথর। পাথরের ও পাশ থেকে আচমকাই বেরিয়ে আসে একটা লোক। সামনেই এক নগ্ন নারীকে দেখে এমন সে চমকে যায় যে, স্থির চোখে চেয়ে থাকে রণিতার দিকে। রণিতা শান্ত নির্লিপ্ত চোখে পাল্টা চেয়ে থাকে লোকটার দিকে। লোকটার চোখ মুখ দেখে মনে হয় সে ভয় পেয়েছে। স্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া তার দুই চোখে। রণিতা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে উদাসীন ভঙ্গিতে।

হঠাৎই লোকটা পিছন ফিরে দৌড় দেয় পড়ি কি মরি করে। আলগা নুড়ি পাথরে পা হড়কে পড়েও যায় এক বার। ঝেড়ে মেড়ে উঠে আবার সে দৌড় দেয় ঝুলুং এর ভাটির পথে। যেন ভুত দেখেছে কোনও।

লোকটার কাণ্ড দেখে রণিতার মগ্নতা কেটে যায়। তবুও তার কোনও হেলদোল দেখা যায় না নিজের নগ্নতা নিয়ে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে লোকটার ক্রমশ ছোট হতে হতে নুড়ি পাথর হয়ে যাওয়া। ঝুলুং এর জলে মিশে যাওয়া। তার পর শান্ত পায়ে ফিরে আসে নিমার কাছে। নিমা তত ক্ষণে শুকনো জামা কাপড় পরে ফেলেছে। রণিতার পালাজো আর টি-শার্ট নিংড়ে ঝেড়ে প্রায় আধ শুকনো করে ফেলেছে। রণিতাকে ফিরতে দেখে সে বলে, "এই, তুমি এমন উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ! লজ্জা করছে না?"

সে কথাই ভাবছিল রণিতা। এত দিন তো তার লজ্জা করত। কিন্তু আজ কেন করছে না! তার মনেই হচ্ছে না এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে। এমন করে নগ্ন হয়ে সে চাইলে দোকান-বাজারও যেতে পারে। ট্রেনে বাসে উঠতে পারে। কার বাপের কী!

সে বলে, "না!"

"না?"

"না!"

"সে কী কথা! তুমি এমন ভাবেই হোটেলে ফিরবে নাকি?"

রণিতা হেসে বলে, "আমার কোনও অসুবিধে নেই। তোমার আছে?"

নিমা উঠে আসে তার কাছে। তার টি-শার্টটা তার মাথায় গলিয়ে দিয়ে বলে, "আমার খুব অসুবিধে আছে। নাও হাতটা গলাও।"

নিমা ওকে টি-শার্ট টা পরিয়ে দেয়। তার পর রণিতার বটমলেস মূর্তি এক বার মন দিয়ে দেখে। পালাজোটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, "তোমাকে লাগছে কিন্তু হেব্বি সেক্সি। কোনও ছেলে দেখলে সে ঠিক থাকতে

পারবে না।”

রণিতা বলে, “হ্যাঁ, দেখলাম তো তার নমুনা।”

সেই পালিয়ে নুড়ি পাথর হয়ে যাওয়া লোকটার কথা বলে রণিতা। শুনে নিমা বেদম হাসে। আর বলে, “ও তোমাকে বোক্সি ভেবেছে!”

“বোক্সি?”

“বোক্সি আসলে পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি আত্মীয় কুটুম এর মধ্যেই কোন নারী হতে পারে যে গোপনে চর্চা করে ওই বিদ্যার। এক ধরনের কালাজাদু যা তাকে অলৌকিক শক্তি দেয়। সেই শক্তি পেতে গেলে তাকে নানা রকম কঠিন সাধনা করতে হয়। যার মধ্যে একটা হল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে খোলানালা বন-জঙ্গল শ্মশানের মতো অজায়গায় পূজা-অর্চনা করা। সাধারণত গভীর রাতে। একা একা বা অন্য শিক্ষানবিশদের সঙ্গে ছোট ছোট দলে। তবে দিনমানে করার চলও আছে। বিশেষ করে এমন একাকী নির্জন খোলার ধারে।”

গল্প শুনে রণিতা খুব মজা পায়। বলে, “তা হলে ওই লোকটা আমাকে বোক্সি স্টুডেন্ট ভাবল?”

“একদম।”

“তা হলে পরে কোথাও দেখা হলেও তো ভাববে আমি গোপনে বোক্সি?”

“ভাববেই তো!”

“অন্যদেরও বলবে সে কথা?”

“নিশ্চয়ই বলবে।”

“তখন গোপন সাধনা আর গোপন থাকবে না।”

“সেই জন্যই তো বোক্সিদের ওই ভাবে দেখে ফেলাটা বিপজ্জনক।”

“কেন?”

“কারণ বোক্সি তখন তাকে খেয়ে ফেলে।”

রণিতার ভীষণ মজা লাগে নিমার গল্প শুনে। সে খুব হাসে আর বলে, “মানে লোকটা ভাবল আমি ওকে খেয়ে ফেলব?”

“ঠিক তাই।”

রণিতা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, “ওরে বাবা! এতো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!”

নিমা আরও বলে, “আসলে লোকটা এখনও ভাবছে তুমি ওকে ছাড়বে না। ও যে পড়ে গেল, লোককে বলবে তুমি অসম্ভব লম্বা হাত বাড়িয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। যদি বাড়ি গিয়ে জ্বরে পড়ে তোমাকেই দায়ী করবে।”

“সে কী কথা নিমা! তুমি তো আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছ!”

হালকা হলেও গা ছমছম সত্যি সত্যিই করে রণিতার। নিমা আরও গল্প বলে বলে তার ভয়কে হাওয়া বাতাস দেয়। জ্বরে পড়লে লোকটা নাকি ঝাঁকরি ডাকবে।

“ঝাঁকরি মানে?”

“ওঝা। গুনিন। যারা ভূত ঝাড়ে। অশুভ আত্মাদের তাড়ায়। পশুপাখি বলি দিয়ে, পুজোপাশা করে। নাচ-গান করে। সারারাত চলে সে সব ভূত তাড়ানোর অনুষ্ঠান। গোটা গ্রাম জড়ো হয় সেই অনুষ্ঠান বাড়িতে। জেগে বসে থাকে সারারাত। এই অনুষ্ঠানকে বলে, চিন্তাবসা।”

“চিন্তা?”

নিমা বলে, “হ্যাঁ। ওদের বাড়িতে চিন্তা বসবে। মানে ওই রকম অনুষ্ঠান হবে।”

“ঝাঁকরি ডেকে?”

“হ্যাঁ।”

দিনমানে এই সব গল্প শুনে রণিতার ভয় ঠিক করে না, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতেও পারে না। রাতটার দখল নিয়েছিল গুরু ড্রুকপা কুনলে। দিনটা মনে হয় গেল পড়ে বোক্সির খপ্পরে। ভীষণ সম্ভাবনা যে আছে সে কথাও বলে নিমা। এমনকি বিপদেও পড়তে পারে রণিতা।

“বিপদ?”

নিমা ব্যাখ্যা করে। ঝাঁকরি এসে লোকটাকে জেরা করবে। কথায় কথায় ঠিক বার করে ফেলবে কাকে সে দেখেছিল। বেশির ভাগ সময়ই চেনা কেউই হয়। তখন ঝাঁকরি তার নামে ঝাড়ফুঁক পুজো চিন্তা নানা রকম করে লোকটাকে ভাল করার চেষ্টা করবে। যদি সে ভাল হয়ে গেল তো লোকে আর অত মাথা ঘামাবে না। শুধু একটু সাবধান থাকবে ওই সন্দেহভাজন থেকে। মানে ওই বোক্সিটার থেকে। আর যদি লোকটা মরে যায়...

রণিতা আঁতকে উঠে বলে, “মরে যাবে নাকি!”

নিমা নির্লিপ্ত স্বরে বলে, “মরতেই পারে! ওর তো সাতু চলে গেছে না!”

“কী চলে গেছে?”

“সাতু চলে গেছে। সাতু।”

“সাতু মানে?”

নিমা ঠিকমতো বোঝাতে পারে না সাতু মানে কি। সে বলে, “সাতু মানে... এই ধরো আত্মা। না আত্মা ঠিক নয়। আত্মার মতো। প্রাণবায়ু বলতে পারো। মানে ভেতরের আসল জিনিসটা যার জোরে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। সেটা চলে গেলে শরীরটা হয়তো বেঁচে থাকে কিন্তু ভেতরের আসল মানুষটা থাকে না। এই ভাবে শরীরটাও বেশি দিন বাঁচে না। যদি ঝাঁকরি কিছু করতে পারল তো পারল, না হলে লোকটা মরেই যায় ক'দিন পরে।”

রণিতা এ বার সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। তার ওই সামান্য নগ্নতা-বিলাস কি কারও মৃত্যুর কারণ হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত! কিন্তু নিমা ওকে বলে, “তার চেয়ে বড় ভয়ের কারণও আছে। লোকটা সত্যি মরে গেলে ওর বাড়ির লোকজন খোলাখুলি আক্রমণ করে বসতে পারে ওই বোক্সিকে। গ্রামের কিছু লোক তো সঙ্গ দেবেই। তখন সবাই মিলে প্রকাশ্য রাস্তায় পাগলা কুত্তার মতো লাঠিপেটা করে... আরে, সামলে সামলে!”

পা হড়কে গেছে রণিতার। সামলাতে সে পারে না। রাস্তার উপর সে পড়েই যায় ধাপ চাষের পাড়ে। হাত থেকে ছিটকে যায় মাছের লুঙ্গিটা। থেবড়ে বসে বেশ আরাম হয় রণিতার। তাই সে তখনই ওঠে না। নিমা হেসে বলে, “বসে কি আরাম হচ্ছে নাকি?”

রণিতা বলে, “সত্যিই আরাম হচ্ছে। তোমার এ সব গল্প শোনার পর আমার তো শুয়ে পড়া উচিত ছিল।”

“চলো, ওঠো। রুমে গিয়ে শোবে। দেখো কত ধুলো মেখেছ!”

রুমে ফিরে রণিতা গরম জলে আর এক বার চান করে নেয়। তার পর আয়নার সামনে বসে হালকা রূপচর্চা করতে করতে নিজেকে দেখে। ভাবে সত্যিই কি কেউ তাকে ডাইনি বলে সন্দেহ করতে পারে! তার এই যুবতী রূপের আড়ালে কি সত্যিই লুকিয়ে আছে এক কদাকার ডাইনি! আর সেটা যে কোনও দিন খোলসা করে দিতে পারে কোনও পোড়-খাওয়া ঝাঁকরি!

না! অনেক হল ডুয়ার্স! আজই কেটে পড়তে হবে এখান থেকে!

আর সত্যি সত্যিই গোছগাছ করে ফেলে রণিতা। মনে মনে তৈরি হয়ে নেয় ঝালং ছাড়ার জন্য। ভাবে হয়তো তাকে ড্রুকপা কুনলেই ডাকছেন ভুটান যাওয়ার জন্য! কিন্তু এই বিন্দুর পথে নয়। মূল রাস্তায়। ফুন্টসোলিং হয়ে।

শুনে কর্মা বলে, “সে কী! আজই চলে যাবে?”

আসলে কথা ছিল আজ আবার চার জনে বেরোবে কালকের মতো। ঝালং বিন্দুর আনাচে-কানাচে চিরুনি তল্লাশি চালাবে আনন্দের খোঁজে। বোঝার চেষ্টা করবে একটা নতুন জায়গায় গিয়ে পড়তে পারার যে আনন্দ তার আসল কারণ কী। সেই কারণ কি রাখা আছে সেই জায়গাটাতেই? নাকি আসলে তা আছে পর্যটকের নিজেরই প্রাণের ভেতর! না হলে সর্বত্র সেই আনন্দ খুঁজে পাবে কেন। যত দুর্গম সে গন্তব্য, ততই বেশি সেখানে পৌঁছতে পারার আনন্দ। কলকাতার ভিক্টোরিয়া তো কম সুন্দর নয়! কিন্তু কেদারনাথ দর্শন এর আনন্দ কি তাতে আসে!

ওরা ঝুলোঝুলি করে আর একটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য। এতটাই যে রণিতার সন্দেহ জাগে মনে। কথা শুরু হয়েছিল ওরা ওকে রেপ করতে পারে কি না তাই দিয়ে। এখন তাকে আটকে রাখার জেদ দেখে তো আবার সেই কথাই মাথায় আসছে। এ বার সে বলেই ফেলল, “তোমাদের মতলবটা কী বলো দেখি! এত জেদ করছ কেন?”

“রবিন বলে, মতলব একটা আছে!”

“আছে! কার?”

“আমাদের সবারই। বিশেষ করে কর্মার।”

“কর্মার মতলব! আমাকে নিয়ে?”

“হ্যাঁ।”

“কী সেই মতলব?”

কর্মা বারণ করেছিল খোলসা করতে। কিন্তু রণিতা চলে যাচ্ছে দেখে রবিন বলে ফেলে। আসলে আজ সন্ধ্যায় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে ওদের গ্রামে। কর্মার ইচ্ছে রণিতা ওখানে নাচুক। রেশম ফিরিরি বা অন্য কোনও নেপালি গানের সঙ্গে।

রণিতা অবাক হয়ে বলে, “আমি নাচব!”

“হ্যাঁ। একদম লাইভ। আমরা গাইব, বাজাব। অন দি স্টেজ।”

রণিতা বলে, “যাওবা এখানে থেকে যেতে পারতাম, এ বার আমি তো পালাবই। শেষে কি আমায় পচা ডিম টমেটো ছেঁড়া জুতো খাওয়াবে নাকি স্টেজে তুলে!”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রণিতাকে থেকে যেতেই হয়। কর্মা এমন অভিমান দেখায়, যেন সে তার কতদিনের প্রেমিকা।

আর তারই বুঝি দায় পড়েছে ওর মান ভাঙানোর। অগত্যা সে কর্মার চুলে আঙুল চালিয়ে বলে, “একটা শর্তে!”

“বলো কী?”

“কাল আমাকে বাইকে করে ফুন্টসোলিং পৌঁছে দিতে হবে।”

কর্মা হাসিমুখে বলে, “ডান!”

আর তখনই নিমা এসে হাজির প্লেটে দু’পিস মাছ নিয়ে। ওরা তখন চার জন। আধ পিস করে ভাগে পড়ে, রণিতা বলে, “আমি ধরেছি।”

“তাই! কী করে ধরলে?”

রণিতা তাকায় নিমার দিকে। নিমা হাসে। রণিতা বলে, “জাদু করে।”

“তুমি জাদু জানো নাকি!”

“শেখার জন্যই তো সাধনা করছি। আজ মাছ ধরলাম। পরে আরও বড় শিকার ধরব।”

কর্মা হঠাৎ বলে, “বোক্সির মতো কথা বোলো না তো!”

শুনে তো রণিতা আঁতকে ওঠে। নিমাও। কালবোস ভাজা গলায় আটকে যায় আর কী! শেষে জলটল খেয়ে বুক-পিঠ ডলে ধাতস্থ হয় রণিতা।

কিন্তু ঘুরতে বেরিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। কলেজ ছাড়ার পর রণিতা আর স্টেজে নাচেনি। আজ আবার... তাও অন্য দেশে। অন্য ভাষা আর সাংস্কৃতিক পরিবেশে।

লাচেন ওর মেকআপ আর্টিস্ট। নিজেরই সাজপোশাক গয়নাগাটি তাকে পরিয়ে দেয়। এক একটা করে পরায় আর বলে এর নাম হল, “চৌবন্দী চোলো।”

রণিতা দেখে দড়ি বাঁধা ফুলহাতা ব্লাউজ়। লাল সাদা ফুল ছাপ। নাম তার ঢাকা প্রিন্ট। শাড়ি খাটো করে। হাঁটুর সামান্য নীচে। কোমরে পাগড়ি পাকে পাকে ফুলে উঠেছে। এর নাম নাকি ‘পটুকি’। রুজ় মাখিয়ে আপেল গাল। টেনে বাঁধা চুল। লম্বা বেণী। আর কানের ওপর নকল সোনা, যেন কৌটোর ঢাকনা। নাম তার ‘চেপ্টে সুন’। গলায় রুপোলি মাদলের মতো লকেট দেওয়া সবুজ পুঁতির গুচ্ছমালা, ‘পোতে’। মাথায় টকটকে লাল সিঁদুর। লাচেন বলে, “এই হল নেপালি মেয়েদের জাতীয় সাজ। আর তুমি নাচবে মারুনি।”

“মারুনি!”

“নাচটার নাম। দেখো ভিডিয়ো।”

লাচেন ওকে মারুনি নাচের ভিডিয়ো দেখায়। আর ভাল ছাত্রীর মতো রণিতাও তুলে নেয় সেই নাচ।

সেদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রণিতা তো বিরাট হিট। লোকে তাকে এমন সম্মান দিচ্ছে যেন সে কোনও সেলেব্রিটি। যেন আপ্লুত তারা তাকে কাছে পেয়ে। আস্ত একটা টাকার মালা তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। তাতে দু’হাজার টাকার নোট পর্যন্ত দেখতে পেল রণিতা।

এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এসে তার হাতে একটা বই ধরিয়ে দিলেন। স্বরচিত কবিতা! যোগ করলেন, “গোটা দেশ আপনার মতো হলে জীবনটাই জলসা হয়ে যেত!”

ভিড়ের ভেতর কবিতাটা তেমন ধরতে পারল না রণিতা। কিন্তু বিরাট হেসে ধন্যবাদ দিল লোকটাকে। গলায় কত যে রংবেরঙের খদা পেল তার ঠিক নেই। অবশেষে যখন একা হল হোটেলের ঘরে, দেখল সাড়ে সাত হাজার টাকা জড়িয়ে আছে তার সারা গায়ে। অবাক হয়ে সে ভাবল, সেলেবরা কত সহজে টাকা কামায়।

কর্মার হিসেবে ঘণ্টা তিনেক লাগবে ঝালং থেকে বাইকে ফুন্টসোলিং পৌঁছতে। পথে এক ঘণ্টার বিরতি ধরলে চার ঘণ্টা। মানে সকাল ছটায় বেরোলে দশটার মধ্যে নিশ্চিত। তার পর যদি ওখান থেকে বারোটার মধ্যে গাড়ি ধরতে পারে, অন্ধকার নামার আগেই পারো পৌঁছে যাবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দুপুর বারোটাতেও ওরা ফুন্টসোলিং পৌঁছতে পারেনি। যদিও বেরিয়েছিল সময় মতোই। আসলে রণিতারই জন্য। আসার পথে কত জায়গায় চেয়েও দাঁড়াতে পারেনি। এ বার সেই আফসোস পুষিয়ে নিচ্ছে সুদে আসলে। তার ওপর হঠাৎ সে বলে বসে, “দাও, আমি চালাই।”

“পারো চালাতে?”

জানতে চায় কর্মা। রণিতা জানায় বুলেট কখনো চালায়নি। তবে বাইক চালাতে পারে। কর্মা আরও উস্কানি দিয়ে বলে, “তা হলে নিশ্চয়ই পারবে। বাকি ফাংশন সবই এক।”

তার পর ঘণ্টাখানেক রণিতাই বাইক চালায়। রণিতার রুকস্যাক পিঠে নিয়ে কর্মা বসে থাকে পিছনে। হেলমেট কেউই পরেনি। যদিও পাশে ঝোলানো আছে একটা।

বাইক তখন চাপড়ামারি অরণ্যের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। দু’পাশে বিকট জড়ানো বন আর নির্জন রাস্তা। অদৃশ্য ঝিঁঝিঁরা পাগলের মতো হল্লা করছে বনের মাথায়। দিনমানে! আর মাঝে মাঝেই পিচ রাস্তা ছেড়ে মাটির পথ ঢুকে গেছে বনের ভেতর। কাঁচা হলেও গাড়ি চলার উপযোগী। রণিতা হঠাৎই পিচ ছেড়ে বাঁ দিকে একটা মাটির রাস্তা ধরে। কর্মা বাধা দেওয়ার আগেই সে কয়েকশো মিটার ঢুকে পড়ে বনের ভেতর। ডাইনে-বাঁয়ে দুটো বাঁক পেরিয়ে। আর তখন রাস্তা থেকে আর তাদের দেখাও যায় না। কিন্তু বুলেটের বেয়াড়া আওয়াজে কাঁপতে থাকে বন।

কর্মা বলে, “এ ভাবে বনে ঢোকা উচিত না। আর ঢুকলেও এমন হল্লা করা ঠিক নয়।”

তখনই রণিতা স্টার্ট বন্ধ করে দেয়। চুপ করে যায় বাইক। আর সে বলে, “নামো।”

কর্মা নামলে সেও নামে। তার পর বাইকে স্ট্যান্ড দিয়ে বলে, “চলো।”

“কোথায়?”

“জঙ্গল সাফারি।”

“পাগল নাকি!”

“কেন! কী অসুবিধে?”

“তুমি মানে, ভুটান যাবে বলে... আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো!”

রণিতা বলে, “স্যাকটা রাখো বাইকের ওপর।”

কর্মা অনেক চেষ্টা করেও ক্ষান্ত করতে পারে না রণিতাকে। সে এক কিলোমিটার হলেও জঙ্গলে ট্রেক করবেই। অগত্যা...

আরও সরু প্রায় একটা শুঁড়িপথ ধরে হাঁটা দেয় দু’জনে। বনের আরও গভীরের দিকে। বাইক পিছনে পড়ে থাকে। পড়ে থাকে রণিতার রুকস্যাক। হেলমেট। যেন সে সব জীবনের গদ্যময় পিছুটান। মুক্তির পথে অন্তরায়। সামনেই কোথাও লুকোনো আছে মুক্তি। তারই খোঁজে এগিয়ে যায় রণিতা। কর্মাকে পেছনে ফেলে। যেন সেও অবাঞ্ছিত।

কর্মা চুপচাপ অনুসরণ করে রণিতাকে। মন ভরে দেখে তাকে পেছন থেকে। যেন রানির রিয়ার ভিউ। মনে মনে হাসে কর্মা। রণিতা পরে আছে কটন প্যান্ট, স্নিকার ভেস্ট আর ওপরে হাল্কা জ্যাকেট। চুলে পনিটেল। নির্মেদ রোগাটে চেহারা তার। কিন্তু গাঙ্গেয় কমনীয়তা তার সর্বাঙ্গে। এই বনের গভীরে নির্জনতায় তাকে দেখলে যে কোনও পুরুষের মতি বিগড়ে যেতে পারে। কিন্তু কর্মাকে তো সে আগেই মেরে রেখেছে সরাসরি সে

কথা বলে। স্পষ্ট কথার মানুষ এই কুইন অব কলকত্তা। তাই কর্মাও আর কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে পিছন থেকে চেপে ধরে রণিতার হাত। বলে, “আর না। এ বার চলো ফেরা যাক।”

রণিতা বলে, “কিন্তু এক কিলোমিটার তো হয়নি এখনো।”

কর্মা বলে, “সে জন্য নয়। আমার ঠিক লাগছে না।”

“কী ঠিক লাগছে না! ভয় করছে?”

কর্মা ইতস্তত করে বলে, “আমার নিজেকে ঠিক লাগছে না।”

“মানে?”

“মানে তুমি যে ভয়টা পাচ্ছিলে আমার সেটাই মাথায় আসছে।”

রণিতা বিভ্রান্ত হয়ে বলে, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ!”

কর্মা এ বার সরাসরি তাকায় রণিতার চোখের দিকে। এক বারও পলক না ফেলে বলে, “আমার তোমাকে রেপ করতে ইচ্ছে করছে!”

রণিতা হতবাক হয়ে কিছু ক্ষণ চেয়ে থাকে কর্মার দিকে। বেশ গম্ভীর হয়েই। তার পর হঠাৎ হেসে ফেলে ফিক করে। মাথা নেড়ে ঝুঁটি দুলিয়ে ডাইনেবাঁয়ে তাকায়। তার পর কর্মার চোয়ালটা ধরে বলে, “তোমার কি সে মুরোদ আছে, কাঞ্ছা?”

কর্মাও হাসে। মাথা চুলকে বলে, “এমনিতে নেই। কিন্তু তোমার উস্কানি আর আমি সহ্য করতে পারছি না।”

রণিতা বলে, “হেই! হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি তোমায় উস্কাচ্ছি?”

“তা ছাড়া আর কী! পিছন থেকে তোমাকে যে কী সেক্সি লাগছে সে আর কী বলব!”

রণিতা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়। সে কর্মার কাঁধটা ধরে তার মুখটা বনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সপ্রশ্রয় কণ্ঠে বলে, “স্টুপিড, তুমি আমার পিছন দেখছিলে এত ক্ষণ। চলো সামনে হাঁটো।”

এর পর মোবাইল ট্র্যাকার দেখে পুরো এক কিলোমিটার হাঁটে দু’জনে। ফিরেও আসে এক কিলোমিটার। আবার সেই সব গদ্যময় পিছুটানের কাছে। তার পর আবার রওনা দেয় বুলেটে চড়ে। রণিতা বলে, “জঙ্গলটুকু আমি চালাই?”

“ওকে!”

বলে কর্মা পিছনে চড়ে বসে।

বাইক স্টার্ট দিয়ে পিচ রাস্তায় উঠে এলে রণিতা বলে, “তুমি এমন আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন? তোমার মনে পাপ আছে! তাই না?”

কর্মা বলে, “আমি পাপী?”

“না হলে এমন করছ কেন? বন্ধু মনে করে সহজ হয়ে ধরতে পারছ না আমাকে?”

কর্মা হতাশ কণ্ঠে বলে, “ইউ আর ইনক্রেডিবল কুইন অব কলকত্তা!”

এ বার সে পিছন থেকে রণিতার কোমর জড়িয়ে ধরে। তার নরম সুগন্ধি কাঁধে চোয়াল রেখে বলে, “এত প্রশ্রয় দিও না আমাকে রানি। আমি নষ্ট হয়ে যাব।”

রণিতা কৃত্রিম উৎফুল্লতা দেখিয়ে বলে, “ওয়াও! আজকাল ছেলেরাও নষ্ট হচ্ছে নাকি! আমি তো জানতাম মাছ মাংস আর মেয়েরাই শুধু নষ্ট হয়!”

কর্মা বলে, “ঠিকই। আগে ছেলেরা নষ্ট হত না। কারণ তাদের নষ্ট করার মতো সবলা নারী ছিল না। এখন তোমার মতো পাওয়ার গার্লরা এসে সব হিসেব উল্টে দিচ্ছে।”

রণিতা হেসে বলে, “শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না এটা কমপ্লিমেন্ট না গালাগাল!”

কর্মা বলে, “এটা মেয়েদের ক্ষমতায়ন! এমপাওয়ারমেন্ট!”

রণিতা বলে, “আর শক্তিধরদের কাজই হল নষ্ট করা। তাই তো?”

“আনফরচুনেটলি, তাই! তোমার ভাল করার ক্ষমতা দেখে লোকে বুঝবে না তুমি কতটা শক্তিশালী। সেটা বুঝবে তোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা দেখে!”

রণিতা হেসে বলে, “বা! দারুণ বললে তো। একটা উদাহরণ দিতে পারবে?”

কর্মা বলে, “যেমন কুইন অব কলকত্তা!”

রণিতা হঠাৎ বলে ওঠে, “হেই হেই! হোল্ড! হোল্ড! তুমি অনেক বেশি এগিয়ে গেছ কর্মা। কন্ট্রোল ইয়োরসেল্ফ।”

কর্মা তার বাহুবেষ্টনী আলগা করে রণিতার কোমর ছেড়ে দেয়। নিজের চোয়াল প্রত্যাহার করে নেয় তার কাঁধের ওপর থেকে। বলে, “জঙ্গল শেষ। জংলিগিরিও শেষ। থামো এ বার। আমি চালাই।”

এতো সবের সম্মিলিত ফল হল, ওরা জয়গাঁও ঢোকে বেলা বারোটায়। রাস্তার উপরেই রণিতা দেখতে পায় বিরাট তোরণ। তিব্বতি শৈলীতে তৈরি নকশাদার রংচঙে প্রবেশপথ। কর্মা বলে, “ভুটান গেট!”

“মানে গেট পেরোলেই ভুটান?”

“একদম।”

“চলো, তা হলে সোজা ঢুকে যাই।”

কর্মা বলে, “আগে খেয়ে নাও।”

রণিতা জেদ করে, “ভুটানেই না হয় খাব। ভুটানি খাবার লাল ভাত আর এমাদাসি।”

কর্মা ওকে বলে ভুটানে জিনিসপত্রের দাম বেশি। অগত্যা ওরা গেট না পেরিয়ে বাঁয়ে বাঁক নেয়। সেখানেই একটা হোটেলে খেতে ঢোকে।

কর্মা বলে, “এখনই রওনা দিলে সন্ধের আগেই পারো পৌঁছে যাবে।”

“বাসে?”

“বাসে যেতে পারো। শেয়ারের ছোট গাড়িও পাবে।”

বিদায় বেলার কথাবার্তা ঝিমিয়ে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। পেটে খাবার পড়ায় তা আরও মন্থর হয়ে যায়। গরম ভাতের ভাপ যেন জমে থাকে স্বরযন্ত্রে। ভিজে ভিজে শোনায় কথাগুলো। যেন বা ভিজে ভিজে দেখায় চোখগুলোও।

কুইন অব কলকত্তা চুল ঠিক করার অছিলায় মুছে নেয় গোটা মুখ। চোখ। আর কর্মাকে আক্রমণ করে বলে, “তুমি কি এ বার কাঁদতে বসবে নাকি?”

কর্মা ম্লান হেসে বলে, “কী করব! তুমি মালটাই সে রকম।”

“মালটা?”

কর্মা বলে, “আমার জীবনে দেখা সেরা মানুষ তুমি।”

প্রকাশ্যেই এ বার চোখ মোছে কর্মা। ধরা গলায় বলে, “আর কি দেখা হবে কোনও দিন?”

রণিতা বলে, “আমার তো কাজ বাকি আছে তোমার সঙ্গে। দেখা হতেই হবে।”

“কাজ বাকি?”

“হ্যাঁ। তুমি আমাকে পাওয়ার গার্ল বললে, অথচ আমি তোমাকে কোনও পাওয়ারই দেখাতে পারলাম না।”

কর্মা হঠাৎ চেপে ধরে রণিতার হাত। চাপ দেয় খুব জোরে। আবেগঘন স্বরে বলে, “আমি অপেক্ষায় থাকব। তুমি আরও পাওয়ারফুল হয়ে ফিরে এসো।”

রণিতা স্যাকের পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে কর্মার হাতে দেয়। বলে, “তত দিন এটা সামলে রেখো।”

“কী এটা?”

“এটা তোমারই জিনিস। আমাকে রাখতে দিয়েছিলে তুমি।”

কর্মা প্যাকেটটা টিপে দেখে। বুঝতে পেরে সলজ্জ হাসে। মুখে বলে, “আমি আর এটা নিয়ে কী করব! রেখে দাও তোমারই কাজে লাগতে পারে।”

রণিতা কৌতুকে চোখ পাকিয়ে তাকায় কর্মার দিকে। প্যাকেটটা ফিরত ঠেলে দিয়ে বলে, “না স্যর, আমার দরকার নেই। আমি তো যাচ্ছিই গুরু ডুকপা কুনলের দেশে।”

পারো-গামী ছোট্ট একটা বাসে জানলার ধারে বসেছে রণিতা। খান কুড়ি আসন হবে বাসে। পাশের সিটে এসে বসে মুণ্ডিতমস্তক এক লামা। তার পোশাকে খয়েরি আর হলুদ রংয়ের এত থানকাপড় যে রণিতা প্রায় ঢাকাই পড়ে যায়। তবু রণিতার স্বস্তি হয় যে, কাপড়গুলো সুগন্ধী।

রণিতা বাইরে তাকায়। অবাক হয়ে দেখে এরই মধ্যে ফুন্টসোলিং ফুরিয়ে গেছে। ঘরবাড়ির আর দেখা নেই। শুরু হয়ে গেছে নির্জন বনপথ। যেন নগর সভ্যতা নাগালের বাইরে সরে যাচ্ছে দ্রুত। সত্যি সত্যি বুঝি বা

চলেছে এক নিষিদ্ধ দেশের নিষিদ্ধ নগরীর অভিমুখে। যা আছে কপালে দেখা যাবে মনে করে!

ঘণ্টাখানেক গোগ্রাসে দু'পাশের দৃশ্য গিলল রণিতা। তার পর সে খেয়াল করল ভীষণ রকম জনবিরল এই দেশ। সেই সঙ্গে বৃক্ষবহুল। এত বৃক্ষ যে বনটাকে অনন্ত মনে হয়। যেন গোটা দেশটাই এক বিরাট অরণ্য। সে অরণ্য ছড়িয়ে আছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে, তার পর আরও আরও পাহাড়ে, যা ধাপে ধাপে উঁচু হয়েছে ক্রমশ। বাড়তে বাড়তে একেবারে বরফের রাজ্যে। কিন্তু অরণ্যের খামতি নেই কোথাও। রুক্ষতা শব্দটাই বুঝিবা নেই এদেশের অভিধানে। এমনই স্নিগ্ধ এই দেশ।

"হা হা হা!"

চমকে ওঠে রণিতা। সহযাত্রী সজোরে ধাক্কা মেরেছেন তাকে। ইচ্ছে করে নয় অবশ্য। তিনি আসলে নিজেকে সামলাতে পারেননি। কানে ব্লু টুথ ইয়ার ফোন গুঁজে মোবাইলে কমেডি শো দেখছিলেন। নেট তো চলার কথা নয় এই বনে। ডাউনলোডেড নিশ্চয়ই। মানে আগেও দেখেছেন। তার পরেও এমন তার কৌতুকের তোড় যে হাসতে গিয়ে সহযাত্রীকে জখম করে ফেলার জোগাড়। যদিও রণিতার চমকে ওঠা দেখে নিজেকে সামলে নেন বক্ষু পরা লামা। হাসতে হাসতেই বলেন, "সরি। কমেডি শো। আপকা ইন্ডিয়াকা।"

মোবাইলটা তার দিকে ঘুরিয়ে দেখান লামাজি। রণিতা দেখে অ্যাপেলের আই ফোন, তাতে কমেডি সার্কাস এর কোনও এপিসোড চলছে। তিনি আবার বলেন, "ডোন্ট মাইন্ড। আই অ্যাম সরি।"

রণিতা বলে, "ইটস অল রাইট।"

লামাজি তার উপচানো বস্ত্ররাজি সামলে আবার গুছিয়ে বসেন। রণিতাও সোজা হয় সিটের উপর। পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ে লামাজির জুতো। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ দামি। চামড়ার তৈরি। ব্র্যান্ডেড তো হবেই। রণিতা মনে মনে ভাবে, কোটিপতি ভিখারি!

গেদু পৌঁছে বাস এক বার দাঁড়ায়। চায়ের বিরতি। যাত্রীরা নেমে সামনের দোকানে চায়ের খোঁজে ঢোকে। কিন্তু ভুটানি চা বহিরাগত কারওই ভাল লাগে না। তৃষ্ণা আরও বেড়ে যায়। রণিতারও। হঠাৎ সে লক্ষ করে কোণের দিকে একটা কেবিন। সেই কেবিনের লামাজি বসেছেন হাতে একটা পটেটো চিপসের প্যাকেট নিয়ে। সামনের টেবিলে একটা বিরাট কাচের গ্লাসে সাদা তরল। অন্য হাতে কমেডি শো তখনও চলছে।

আর কিছু করার না থাকায় রণিতা নিজেই এগিয়ে যায় কেবিনের দিকে। লামাজির সামনে বসে বলে, "হোয়াটস দিস?"

লামাজি মুখ তুলে তাকান। হেসে বলেন, "ছাং।"

"ছাং?"

"ইয়েস।"

"ও ক্যা হোতা হ্যায়?"

রণিতা দুটো চিপস তুলে নেয়। লামাজি জিজ্ঞেস করেন, "ছাং পিয়েঙ্গে?"

রণিতা বলে, "কিন্তু জিনিসটা কী?"

লামাজি বলেন, "এ কাইন্ড অব কোল্ড ড্রিংকস উইথ মাইল্ড অ্যালকোহল।"

"অ্যালকোহল!"

রণিতার বিস্ময় লামাজির কানে পৌঁছনোর আগেই অন্য শব্দ শোনা যায়, "রোস্টেড চিলি পর্ক।"

হোটেলের সেবিকা। চিনামাটির বাটিতে এক বাটি মাংস নিয়ে এসেছে। নামিয়ে রেখে দেয় দু'জনের মাঝখানে। যেন রণিতারও ভাগ আছে তাতে। লামাজিও হাত দেখিয়ে বলেন, "লিজিয়ে। চিলি পর্ক।"

তার পর হেসে বাংলায় যোগ করেন, "খুব বালো আছে!"

তার পর লামাজি নিজেই বাটিটা টেনে নেন নিজের দিকে। একটা পিস মুখে পুরে আয়েস করে চিবোতে থাকেন চোখ বুজে। রণিতা অবাক হয়ে যায় তাঁর কাণ্ড দেখে। এ কেমন বৌদ্ধ ভিক্ষুক! প্রকাশ্য দিবালোকে চায়ের দোকানে বসে মদ মাংস মারছে!

হঠাৎ আবার ফিরে আসে সেই দোকানের সেবিকা। রণিতার সামনে নামিয়ে রাখে একগ্লাস ছাং আর এক বাটি চিলি পর্ক। লামাজি হেসে বলেন, "খান। আমার তরফ থেকে।"

"কিন্তু..."

"নেশা হবে না। সামান্য। এক বালতি খেলে তবে যদি কিছু হয়।"

"কিন্তু..."

"আরে, খান খান। দেখবেন বাকি জার্নি কেমন সুহানা সফর হয়। মনে হবে বাসের আগে আগেই নিজেই উড়ে যাচ্ছেন!" হা হা করে হাসেন লামাজি।

রণিতা চুপ করে বসে থাকে খানিক ক্ষণ। মানসিক প্রস্তুতি নেয়। তার পর গ্লাসটা তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দেয়। একদম বিয়ারের স্বাদ। ভালই লাগে। তার পর চিলি পর্ক। ঝাল। কিন্তু ভাল। সে গুণ অবশ্য রাঁধুনির না শুয়োরের, তা রণিতা বুঝতে পারে না। পর্কের এটুকু স্বাদ যে কেউ বার করতে পারবে বলেই তার মনে হয়।

রণিতা তার গ্লাস শেষ করতে করতে লামাজি আরও এক গ্লাস আনিয়ে নেন। তার পর দু'জনে একই সঙ্গে মদ মাংস সাবাড় করে বাসে গিয়ে ওঠে। বাস ছেড়ে দেয়। গেদুর গঞ্জ পেরিয়ে আবার সেই অনন্ত বন পাহাড়। মুক্ত প্রকৃতির উদার আহ্বান।

যতই লামাজি বলুন নেশা হবে না, নেশা তো হয়েছেই। আর তারই আবেশে যেন ভাল লাগা ভীষণ বেড়ে গেছে তার। সব কিছুই তার দারুণ ভাল লাগছে। সেই সঙ্গে আরও সাহসী লাগছে নিজেকে। সেই সাহসে ভর করে সে লামাজিকে জিজ্ঞাসা করে, "আপ ভিখারি হ্যায়?"

লামাজি দু'চোখ বুজে খানিক হাসেন রণিতার কথা শুনে। কিন্তু উত্তর দেন না। রণিতা কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলে, "বলুন না, আপনি কি ভিখারি?"

লামাজি এ বার বলেন, "দোকানে তো দাম দিয়েই খেলাম।"

রণিতা বলে, "আমার খাবারের দামও তো দিলেন!"

"তবে?"

"সেই তো বলছি।"

"কী বলছেন?"

"আপনি তো বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে আছেন। অথচ মালদার লোকের মতো খরচা করছেন?"

লামাজি খানিক চুপ করে থেকে বলেন, "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।" তিন বার।

রণিতা বলে, "মানে বুঝলাম না?"

"এর মানে যে দিন বুঝে যাবেন সে দিন আপনিও বুদ্ধ হয়ে যাবেন।"

ছাং ভালই কাজ করেছে রণিতার ভিতর। তাই সে বেমালুম রসিকতা করে বলে, "বুদ্ধ? না বুদ্ধু?"

লামাজি হেসে বলেন, "বুদ্ধু থেকে বুদ্ধ।"

"হুম! তা আপনি নিজে কি বুদ্ধ হয়েছেন নাকি এখনও..."

লামাজি হেসে বলেন, "এখনও বুদ্ধুই আছি। তবে পথে নেমেছি অনেক দিন হল। অনেকটা পথ পেরিয়েও এসেছি।"

"কোন পথ?"

"বুদ্ধ পথ!"

রণিতা অসংলগ্ন মাথা নেড়ে বলে, "বুদ্ধ পথ! তা লক্ষ্যটা কী এই পথের?"

লামাজি কেমন একটা নাটকীয় স্মিত হাস্যে নিজের মুখ উদ্ভাসিত করে বলেন, "বুদ্ধই লক্ষ্য।"

যেন তিনি রণিতাকে বলছেন না কথাটা। কাউকেই বলছেন না। যেন কোনও ঘোষণা শোনাচ্ছেন। সত্যবাণী উচ্চারণ করছেন মরণশীল মানবজগতের উদ্দেশ্যে।

লামাজির ভাবে ভঙ্গিতে রণিতা সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কিছু ক্ষণের জন্য। সেই সময় বাসটা পেরোচ্ছিল একটা ছোট্ট জনপদ, আট-দশটা ঘরের একটা সমষ্টি। রাস্তার ধারে বাতিল আসবাব কি তৈজস এর মতো স্থির হয়ে বসে আছে কয়েক জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কাছাকাছি মনের সুখে ধুলো ঘাঁটছে একদল শিশু। তারই ফাঁকে সাংসারিক ব্যস্ততায় মগ্ন যুবাপুরুষ যুবতী নারী। যেন জীবন পথের জীবন্ত রেখাচিত্র আঁকা আছে পথের ধারে।

লামাজিও সে দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তার আধা দৈবিক ভঙ্গি ধরে রেখেই বলেন, “এই তো জীবন চিত্র। শিশু বৃদ্ধ হবে। পুনর্জন্মের চক্র পথে আবার শিশু হবে। সেই শিশু আবার বৃদ্ধ হবে। আবার শিশু... আবার বৃদ্ধ... আবার শিশু... আবার... চলতেই থাকবে অনন্তকাল!”

রণিতা বলে, “আপনি এই চক্র থেকে মুক্তি চান। তাই তো?”

“হ্যাঁ!”

“তাই সন্ন্যাসী হয়েছেন?”

“ঠিক।”

“কিন্তু কিছুই তো ত্যাগ করেননি।”

“কেন আমি তো গৃহত্যাগ করেছি! বৌ বাচ্চা ঘর-পরিবারের মোহ ত্যাগ করেছি।”

রণিতা হেসে বলে, “কিন্তু মদ মাংস সবই তো খাচ্ছেন। দামি ব্র্যান্ডের ভোগ্যপণ্য পোশাক-আসাক ব্যবহার করছেন!”

লামাজি গলা নামিয়ে বলেন, “অ্যাম অলসো গ্রেট ইন বেড।”

রণিতা একদমই চমকায় না তার কথা শুনে। সংক্ষেপে বলে, “আই বেট ইউ আর।”

লামাজি তার মুণ্ডিত মস্তক দুলিয়ে নির্লজ্জের মতো হেসে বেমালুম বলে বসেন, “ইউ ক্যান গিভ মি আ ট্রাই।”

রণিতা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে লামাজির দিকে। তার বিশ্বাসই হয় না এক বক্ষু পরা নেড়ে লামা তাকে খোলাখুলি কু-প্রস্তাব দিচ্ছে। তার পরেই যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠেন গুরু ড্রুকপা কুনলে।

পরমুহূর্তেই তীব্র শিহরন ছুটে যায় তার সারা গায়ে। তবে কি সত্যি সত্যিই সে দেখা পেল সেই পাগলা গুরুর!

নিজের ভেতরকার আলোড়ন চোখে-মুখে ফুটতে দেয় না রণিতা। চুপ করে বসে থাকে সামনের দিকে চেয়ে। কোনও কথা বলে না। লামাজিও ব্যস্ত হয়ে পড়েন ইন্ডিয়ান কমেডি শোয়ে। কানে হেডফোন গুঁজে কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকেন আগের মতোই।

বাস চলতে থাকে। সহযাত্রীরা কথা বলতে থাকে। ভুটানের বন লম্বা হতে থাকে। পাহাড় আরও বড় হতে থাকে। সঙ্গে বাড়তে থাকে ঠান্ডা। তবু রণিতা তেমন আর জোর পায় না কথা বলার। বসে থাকে জড়োসড়ো হয়ে। যেন প্রবল সেই লামাজি তার পাশে, যার উত্থিত লিঙ্গ প্রায় জাতীয় প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা গোটা দেশের!

রণিতার হঠাৎই ভাবনাচিন্তার দিক দিশা বদলে যায়। পাশে বসা সহযাত্রীটির সব কিছুই তার অন্য রকম লাগে। মানে সাদা চোখে যা দেখছে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু মনে হয়। তার এই বেশবাস, এই ধরনধারণ, এই চলন বলন, সবই মনে হয় আসলে আসল নয়। এ-সব তার ক্যামোফ্লেজ মাত্র। ছদ্ম আবরণ। যা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েই ধারণ করে আছেন। তার মতো মানুষদের বোকা বানানোর জন্য।

এ রকম আরও কত কী ভাবনায় আর কল্পনায় মশগুল হয়ে থাকে রণিতা। যেন সে আসলে এক কল্পলোকে এসে পড়েছে। এই বন পাহাড়, এই আকাশ-বাতাস, তার সুগন্ধ, সবই যেন কাল্পনিক। এমনকি, এই বাস, তার যাত্রী সকল কোনও কিছুই আসলে আসল নয়। বিশেষ করেই আসল নয় তার পাশে বসা মানুষটি। হয়তো সে বাতাসে ফোলানো চিনা পুতুল কোনও। হাওয়া বেরিয়ে গেলেই ছোট্ট রঙিন রুমালের মতো পড়ে থাকবে তার পাশের সিটে।

হঠাৎই তার ভীষণ পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করে লামাজিকে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তার নগ্ন ত্বক। একটু চিমটি কেটে, একটু পিন ফুটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তার গায়ে। ছল করে সে চেষ্টা করার কথাই সে ভাবছিল, হঠাৎ বিকট শব্দ করে বাস দাঁড়িয়ে যায়। ভয়ার্ত এক শোরগোল ওঠে বাসের ভেতর। চমকে উঠে সামনে তাকায় রণিতা। বাসচালকও সমান উত্তেজিত!

একটা বোল্ডার গড়িয়ে এসে ঢুকে গেছে বাসের তলায়। আটকে পড়েছে নীচের যন্ত্রাংশে কোথাও। তাকে না সরালে বাস এগোবে না। তাই যাত্রী সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে নেমে দাঁড়াতে! ঘোষণার ভঙ্গিতে বলেন বাসের খালাসি। আর সবাই নেমে আসে মুক্ত বনপ্রকৃতির মধ্যে। বাসকর্মীরা লেগে পড়ে বোল্ডার ছাড়ানোর কাজে।

লামাজি হঠাৎ বলেন, “টয়লেট! টয়লেট!”

ব্যস্ত হয়ে এ দিক ও দিক তাকান। কিন্তু শুধু বন আর বন দু’পাশে। সরু শুঁড়িপথ ঢুকে গেছে বনের ভেতর। সেই পথে তিনি হাঁটা দেন। রণিতা হঠাৎ বলে, “আমিও যাব!”

লামাজি তার দিকে না তাকিয়েই বলেন, “এসো।”

দুজনে শুঁড়িপথে প্রায় একশো পা ঢুকে যায় বনের ভেতর। উতরাই এর দিকে। নিশ্চিত যখন হয় আর কেউ দেখতে পাবে না, লামাজি বলেন, “তুমি ওই পাশে যাও।”

নিজে অন্য পাশে খানিক সরে যান আড়ালের দিকে।

কম্ম সেরে যখন দু’জনে আবার ফিরতি পথে, লামাজি হঠাৎ বলেন, “সিগ্রেট পিয়েঙ্গে?”

“কিন্তু নিষিদ্ধ না এ দেশে?”

লামাজি তার ঝোলা থেকে কিং সাইজ় সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলেন, “ওটাই তো আমার ভাল লাগে না এ দেশের।”

“তা হলে?”

“এখানে বনের ভেতর কে দেখছে!”

একটা বার করে নিজে ধরান। প্যাকেট আর লাইটার এগিয়ে দেন রণিতার দিকে। রণিতাও ধরায় একটা। টান দিয়ে মেজাজ সত্যি ফুরফুরে হয়ে যায়। ছাং-এর অন্তিম রেশটুকু যেন সঙ্গত পেয়ে আবার চনমনে হয়ে ওঠে। একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রণিতা বলে, “আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।”

“কী প্রশ্ন?”

“আপনি কি ভিক্ষু?”

লামাজি খানিক ক্ষণ চুপ করে থাকেন। তার পর লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, “ইয়েস। আই অ্যাম!”

রণিতা বলে, “তা হলে এই লাক্সারি?”

লামাজি নিজের দিকে এক বার তাকিয়ে বলেন, “ভিক্ষে করেই পাওয়া এ সব।”

“তাই!”

“একদম। আমার অনুগামীরা দিয়েছে।”

রণিতা বলে, “টাকা?”

“টাকাও দিয়েছে।”

“কিন্তু এই সব ভিক্ষা গ্রহণ করে আপনি কি পথভ্রষ্ট হচ্ছেন না?”

লামাজি সিগারেটের শেষটা জুতোর তলায় পিষতে পিষতে বলেন, “পথভ্রষ্ট হচ্ছি হয়তো, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি না।”

“মানে?”

“মানে লক্ষ্য আমার একই আছে। বুদ্ধ। কিন্তু আমার পথটা হয়তো অন্যদের থেকে আলাদা।”

“মানে ভোগবিলাসে ভরা!”

লামাজি আবার হাসেন। শান্ত স্বরে বলেন, “যাকে তুমি ভোগবিলাস বলছ, আমি তাকে পরিষেবা বলি।”

রণিতা অবাক হয়ে বলে, “পরিষেবা!”

“হ্যাঁ।”

“কী ভাবে?”

লামাজি ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, “আমি যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে সহবাস করি, তুমি তাকে সম্ভোগ বলবে, তাই তো?”

“আপনি কি তাকে পরিষেবা বলবেন?”

“অবশ্যই। তুমি মেয়েটার দিক থেকে দেখো। সে যদি অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষায় পীড়িত থাকে আর আমি তার পীড়া দূর করি, তা কি পরিষেবা নয়?”

রণিতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, “ইন্টারেস্টিং!”

লামাজি যোগ করেন, “সে যদি নিঃসন্তান হয় আর আমি তাকে সন্তান লাভে সাহায্য করি, তা কি পরিষেবা নয়?”

“আর মদ মাংস সিগারেট খেয়ে কার কি উপকার করেন?”

“কেন এই সব জিনিসের ব্যবসা যারা করে। এ ক্ষেত্রে পরিষেবা

আরও মহৎ। কারণ, আমি নিজের ক্ষতি করে সিগারেট বিক্রেতার উপকার করছি।”

রণিতা এ বার লামাজির সামনে হাত জোড় করে বলে, “গুরুদেব, চলুন যাওয়া যাক। বাস চলে গেলে বাঘ ভাল্লুকের সেবায় লেগে যাব।”

লামাজি হেসে বলেন, “তাতেও আমার কোনও আপত্তি নেই।”

রণিতা বলে, “আমার খুব আপত্তি আছে। চলুন।”

অবশেষে বাস আবার ছাড়ে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়ার অস্থিরতা তৈরি হয় মনের ভেতর। গোটা বাসে নিঃশব্দ একটা উসখুস ভাব অনুভূত হয়। শুধু লামাজি একাই মনে হয় নির্বিকার। চোখ বুজে বসে আছেন শিরদাঁড়া সোজা করে। সিটে পিঠ না দিয়ে। যেন ধ্যানস্থ।

এত শত বন পাহাড় পেরিয়ে বাস যে এমন এক আলোকোজ্জ্বল নগরীতে এসে পৌঁছল বিশ্বাসই হয় না রণিতার। জনবিরল এক ছবির মতো শহর। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি। যেন নাগরিক জীবনের কোনও নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই পড়েনি এখানে। অথচ নগর। পরিপূর্ণ একটা নগর। বহুতল হোটেল আবাসন বিমান বন্দর, এমনকি নাইট ক্লাব সমৃদ্ধ একটা আধুনিক শহর। অথচ ভিড় নেই, কোলাহল নেই, দূষণ নেই, জঞ্জাল নেই। এমন শহরও তা হলে হতে পারে! অবাক রণিতা।

বাস থেকে নেমে লামাজি জিজ্ঞেস করেন, “কোথায় যাবেন?”

রণিতা বলে, “হোটেল বুক করা আছে। হংকং মার্কেটে।”

“ঠিক আছে। যদি আমাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করে কাল টাকসাং মনস্ট্রিতে চলে আসবেন।”

বলেই লামাজি অদৃশ্য হয়ে যান আলো-আঁধারির ভেতর। যেন কোনও সিনেমার অশরীরী চরিত্র।

রণিতা তার রুকস্যাক পিঠে নিয়ে হাঁটা দেয় হংকং মার্কেটের দিকে। সেখানেই বুক করা আছে তার হোটেল। হোটেল বাড়িটা দেখেই তার মন ভাল হয়ে যায়। ইটের পাকাবাড়ি হলেও উদার ভাবে কাঠের ব্যবহার তার গড়নে। কাঠের উপর খোদাই করা সূক্ষ্ম কারুকার্য। তাতে মিহি রঙের ব্যবহার। যেন ঠিক হোটেল নয় সেই অর্থে। অংশত বুঝি বা মনাস্ট্রি। দেবালয়। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে তার সমাহিত স্থাপত্যের দিকে তাকিয়ে সেই রকম অনুভূতি হল রণিতার। আরও মনে হল, আর যাই হোক, ফুর্তি করার জায়গা এটা নয়। মধুচন্দ্রিমা যাপনের তো নয়ই। কেমন একটা যেন ভক্তিভাব চলে আসে মনের মধ্যে। নিজের মনেই এক বার হেসে নিয়ে হোটেলে ঢোকে রণিতা।

ভেতরের পরিবেশ সমান শান্ত-সৌম্য হলেও বাইরের আধা দেবালয় ভাবটা নেই। বরং সংযত বাণিজ্যের মনোরম আয়োজন। ‘ঘো’ পরা পুরুষরা ‘কি’ পরা মেয়েরা ব্যবসা সামলাচ্ছে হাসিমুখে। মৃদু শব্দে স্থানীয় সঙ্গীত বেজে চলেছে নেপথ্যে। এক হাসিমুখ বিনয়ী তরুণ রণিতাকে তার রুমে পৌঁছে দিয়ে আসে। বয়ে দেয় তার স্যাক আর ব্যাগ। রণিতা তাকেই ভারতীয় খাবার রুটি তরকারি ওমলেটে অর্ডার দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেয়। তার পর উদার ভাবে কাঠ ব্যবহার করে তৈরি একটা সোফায় বসে জরিপ করে তার ঘরটা।

সেই চার দেওয়ালে ঘেরা ঘর। কিন্তু একই রকম নয়। গড়নে এবং অনুভবে বিজাতীয়। মনেই হয় বাড়ি থেকে অনেক দূরে কোথাও আছে। অভ্যস্থ সহজতার ঘেরাটোপের বাইরে কোথাও। যেখানে তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় কখন সেই সদ্য চেনা তরুণ আসবে জল নিয়ে সেই আশায়।

আর সে যখন আসে, খাবার আনে কিন্তু জল আনে না। সে কথা তাকে বলতেই সে লজ্জায় আর অপরাধ বোধে এমন ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে পড়ে যে রণিতার মনে হয়, ইস্! না বললেই হত। তবে কি সেও আসলে বুঝেছে যে, সে রানির সেবায় নিরত আছে!

ছুট্টে গিয়ে জল নিয়ে সে ফিরে এলে রণিতা জানায়, সে আর রাতে কিছু খাবে না। ঘুমিয়ে পড়বে তক্ষুনি।

তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ায় ঘুমও ভাঙেও তাড়াতাড়ি। তখনও পুরো সকাল হয়নি। রণিতা চোখে মুখে জল দিয়ে বাইরে আসে। মনে হয় গোটা শহর যেন ঘুমের আবেশে কাতর। হালকা কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো ঢেকে রেখেছে শহরটাকে। রণিতার ভাবতে ভাল লাগে, ছোট্ট মিষ্টি পারোটাকে। আহা! যদি এখানেই থাকা যেত পাকাপাকি ভাবে!

“ম্যাডাম, ট্যাক্সি?”

রাস্তায় রণিতার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় একটা কালো গাড়ি। চালকের আসনে যিনি, তিনিও ম্যাডাম। মানে মহিলা চালক। রণিতা তার দিকে তাকাতেই সে চওড়া হেসে বলে, “টাকসাং জাইয়েগা? টাইগার্স নেস্ট?”

আর তখনই রণিতার মনে পড়ে লামাজির কথা। তিনি তো ওখানেই ডেকেছিলেন। যদি অবশ্য তাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেই ইচ্ছে তো তার মনে এক বারও জাগেনি। তবে বাঘের বাসা দেখার ইচ্ছে তার বহু দিনের। সেই জগদ্বিখ্যাত টাকসাং মনাস্ট্রি। দ্য টাইগার্স নেস্ট। এখন হাতের কাছে সেই আমন্ত্রণ পেতেই হুহু করে ওঠে প্রাণটা। দরদাম করে গাড়িতে চড়ে বসে রণিতা। বিলকুল খালি পেটে আর পকেটে। সে কথা গাড়ির চালককে বলতেই সে বলে, “কোই বাত নেহি, লৌটকে দিজিয়ে গা।”

আর বেশি না ভেবে রওনা দেয় রণিতা। ঘড়িতে তখনও ছ’টা বাজেনি। রাস্তায় লোক বেরোয়নি, দোকানপাটও খোলেনি।

ঘড়িতে সাতটা বাজার আগেই রণিতা পৌঁছে যায় বেস ক্যাম্পে। তার পর পাহাড়ি বনপথে ঘণ্টাদুয়েক হাঁটা। তার গাড়ির চালক আঙুল তুলে রাস্তা দেখিয়ে বলে, “ওয়ে টু দ্য টাইগার্স নেস্ট।”

রণিতা সে দিকেই তাকিয়ে ছিল। অবাক হয়ে সে ভাবছিল, নামটি বেমানান। বাঘের পক্ষে ওই জায়গায় পৌঁছনো সম্ভব নয়। একমাত্র ডানাওয়ালা জীবই পারবে ওইখানে বাসা করতে। আর পারবে মানুষ। যাকে কোনও কিছু থেকে বিরত করা যায় না। ফলে ওটা মানুষেরই বাসা, নয়তো ড্রাগনের, যার কল্পনার উড়ানে কোথাও কোনও অসম্ভব নেই।

“হোয়াই ডোন্ট ইউ কল ইট আ ড্রাগনস নেস্ট?”

মহিলা ড্রাইভার হেসে বলেন, “বিকস ইট ইজ় টাইগার্স নেস্ট।”

রণিতা হেসে বলে, “ওয়েল সেড। বাট হোয়াই?”

তখন তার চালক তাকে গল্প শোনায় টাকসাং এর। আসলে উড়ন্ত জীবই ছিল বাঘটা। সেই উড়ন্ত বাঘের, আসলে বাঘিনীর পিঠে চড়েই গুরু রিনপোচে তিব্বত থেকে এসেছিলেন ভুটানে। অবতরণ করেছিলেন ওই পাহাড়ের খাঁজে। সেখানে অনেক গুহা ছিল। এখনও আছে। তারই একটায় তিনি ধ্যান করেছিলেন তিন বছর তিন মাস তিন দিন তিন ঘণ্টা। সে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার কথা। পরে রাজা সেখানে মন্দির বানিয়ে দেন।

“কিন্তু আমি কি একা যাব?” জানতে চায় রণিতা।

তার মহিলা চালক বলে, “সেই তো ভাল। গুরু রিনপোচেকে অনুভব করতে পারবেন মনের ভিতর।”

রণিতা ফিরে তাকায় পথের দিকে। পাতলা বনের ভেতর দিয়ে পথ চলে গেছে চড়াইয়ের দিকে। রাতের কুয়াশা তখনও জমে আছে গাছপালার ফাঁকে। আড়াল করে রেখেছে গন্তব্যের নিশান দিশা। কলকাতায় বেড়ে ওঠা একাকী যুবতীর পক্ষে... যতই সে হোক কুইন অব কলকত্তা!

“ভয়ের কোনও...”

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রবল ভাবে না না করে ওঠে চালক। যেন সে সন্দেহ তুলে রণিতা অপমান করছে তার দেশটাকে। তার দেশে কারও কোনও বিপদ নেই। শিশু বৃদ্ধ মহিলা ধনী গরিব... কারও না। তবু রণিতা বলে, “বাঘ ভাল্লুক?”

“আরে, যাচ্ছই তো বাঘের বাসায়!”

“ভাল্লুক?”

“ভাল্লুককে বাঘেই তাড়াবে।”

রণিতা তবু বলে, “আর যদি ইয়েতি বেরোয়?”

মহিলা চালক তুমুল হেসে বলে, “তা হলে খবর দিয়ো। আমিও দেখতে যাব। কোনও দিন দেখিনি।”

তার পর একটা লাঠি ধরিয়ে দেয় সে রণিতার হাতে। হেসে বলে, “মারার জন্য নয়। হাঁটার জন্য।”

সঙ্গে দেয় একটা বিস্কুটের প্যাকেট। দুটো কলা একটা আপেল আর

জলের বোতল। বলে, "এতেই তোমার হয়ে যাবে।"

রণিতা সব নিয়ে ধীর পায়ে রওনা দেয় কুয়াশাঘেরা নির্জন বনপথের দিকে। তাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে আসে তার চালক। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, "ফেরার পথে দেখবে কত ভিড়। বাসে গাড়িতে দোকানপাটে মেলা বসে যাবে এখানে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। ওই জন্যই তো বলছি। তখন তুমি গুরু রিনপোচেকে অনুভব করতেই পারবে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখার মতো। যার সবই আছে, শুধু বাঘের আত্মাটাই নেই।"

"ইউ আর আ গ্রেট গাইড!" বলে রণিতা।

"থ্যাঙ্কস। তোমার যেতে আসতে হয়তো পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। আমাকে এখানেই পাবে। হ্যাপি জার্নি।"

বলে বিদায় নেয় তার গাড়ির মহিলা চালক। যাবার আগে সে নিজের নাম বলে যায় রণিতাকে, যাতে তাকে পরে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।

এর পর রণিতা একাই এগিয়ে যায় কুয়াশার পথে। গাছগাছালির ফাঁকফোকর গলে। এলোমেলো বোল্ডারের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে। উঠতে থাকে রণিতা। বহু ব্যবহারে পথ যদিও মসৃণ। সারা দুনিয়ার মানুষ হাঁটে এ পথে। পৃথিবীর সব বড় ব্র্যান্ডের জুতো পায়ে, হলফ করেই বলা যায়। কারণ গরিব বিদেশি আসতে পারে না এ দেশে। ঢোকার টিকিট চড়া দামে কিনতে হয়। ভারতীয়দের দেওয়া হয় ছাড়ের সুবিধে। না পেলে হয়তো রণিতাও আসতে পারত না।

কিন্তু এই সব ভাবনা এক সময় উধাও হয়ে যায় তার মাথা থেকে। পথ পাশের কোনও প্রাচীন বোল্ডার ছুঁয়ে হয়তো সে তখন শিহরিত। দেড় হাজার বছর আগেও নিশ্চয়ই তেমনই ছিল এই বোল্ডার। কথা বলতে পারলে কত কী সে বলত। রণিতা বোল্ডারের গায়ে হাত বুলিয়ে তার কানে কানে বলে, "আমার নাম রণিতা। কুইন অব কলকত্তা।"

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা উন্মুক্ত পাথুরে চাতালের ওপর এসে পড়ে রণিতা। উল্টো দিকের পাহাড়ে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে সে। ছবিতে বহু বার দেখেছে। তবু সামনাসামনি দেখার শিহরন আটকানো যায় না। এমন এক দম বন্ধ করা অবিশ্বাস্য অবস্থান এই টাকসাং মনাস্ট্রির, যেন সত্যিই কোনও রূপকথার রহস্য-ঘেরা দুর্গ। যা পুরোপুরি সত্যি নয়। আবার মিথ্যেও নয় একদমই। কারণ চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছে কেমন বিকট বিপজ্জনক ভঙ্গিতে আটকে আছে পাহাড়ের খাঁজে। যদিও তার একাংশ ঢাকা পড়ে আছে সাদা কুয়াশার ভেতর। মনে হয় সত্যিই তো কোনও অলৌকিক উড়ন্ত জীবের সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না এই দেবালয় নির্মাণ করা। মানুষ নয়, স্বয়ং দেবতাই যেন নির্মাণ করেছেন এই সৌধ, একেবারেই দৈবশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে।

এই ভিউ পয়েন্ট এর পর পথ নেমে গেছে লোহার রেলিং ঘেরা অসংখ্য পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। একটা সরু লম্বা স্বর্গীয় জলস্রোতের মতো ঝরনা পর্যন্ত। ঝরনা পেরিয়ে পথ আবার উঠেছে সিঁড়ি বেয়ে। সরাসরি মূল মন্দিরের দিকে। প্রবেশ পথে প্রাচীন বৃক্ষের মায়াজাল জড়িয়ে রেখেছে পাথুরে দেওয়াল। সামনেই হলুদ দরজার ওপর ইংরেজিতে লেখা, 'ওপেন!'

রণিতা ভাবে, কখনও কি বন্ধ হয় এই দরজা! কখন? আর কেনই বা! একটা মানুষও তো নেই স্বাগত জানানোর জন্য। অথবা তাকে আটকানোর জন্য। রণিতা অন্যমনস্ক ভাবে পায়ে পায়ে ঢুকে যায় মন্দির চত্বরের ভেতর।

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড গোছের একটা অনুভুতি হয় তার। সেই কবেকার পড়া ছোট্ট অ্যালিস মনে হয় নিজেকে। আস্ত একটা ওয়ান্ডারল্যান্ড এই টাকসাং। বাঘের বাসা। নিশ্চয়ই লুকিয়ে কোথাও বসে আছে সেই বাঘ। হয়তো তারই অপেক্ষায়। তার ডেস্টিনি তাকে ডেকে এনেছে এই পথে। সুদূর কলকাতা থেকে। একা একা। এক্কেবারে বাঘের গুহায়। তার ক্ষুধার্ত দর্শনের সামনে।

রণিতা ধীর পায়ে এলোমেলো হেঁটে বেড়ায়। চোখ তার দেওয়ালে সিলিংয়ে। ছবি থাংকা কারুকাজ। লাল সোনালি মূর্তি। পাথুরে উঠোন সিঁড়ি। ছোট ছোট সাঁকো। এই গৃহ থেকে ওই গৃহ। সেখান থেকে আরও অভ্যন্তরে। সব পেরিয়ে সেই আদিম গুহাগুলো। সেখানে এক সময় ধ্যান করে গেছেন গুরু রিনপোচে। রণিতা ঢুকেও পড়ে একটা গুহার ভেতর। একজন দু'জন লামা শান্ত পায়ে কখনও হেঁটে যাচ্ছেন এ দিক ও দিক। তারা কেউই ফিরে তাকাচ্ছেন না রণিতার দিকে। আসলে যেন তার অস্তিত্বই নেই সেখানে। অথবা তার কল্পনার মতোই সে অদৃশ্য এক সত্তা। রূপকথার ছোট্ট অ্যালিস। যে সবাইকে দেখতে পেলেও তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।। তাই কেউ কিছু বলছে না। বলবেও না। যাই করুক, যেখানেই সে যাক।

ভাবনাটা কেমন দৃঢ় হয়ে বসে রণিতার মনের ভেতর। তার পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে করে সত্যি সে অদৃশ্য কি না। এক জন তরুণ লামাকে আসতে দেখে সে তার পথ আটকে দাঁড়ায়। গায়ে এসে পড়ে কি না দেখতে চায়। কিন্তু লামাটি হঠাৎই মাঝপথ থেকে ফিরে যায়।

রণিতা ভাবে, গুহাগুলোতে প্রবেশ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ। ঢুকতে গেলে বাধা দেবে যদি দেখতে পায়। আর অদৃশ্য হলে...

রণিতা সত্যি সত্যিই ঢুকে পড়ে একটা গুহার ভেতর। কিন্তু কেউ বাধা দেয় না। সে আরও গভীরে চলে যায়। বিরাট একটা গুহা। তার ভেতরের দিকটা সরু হয়ে চলে গেছে আরও অন্ধকার গভীরের দিকে। একটা সুড়ঙ্গের মতো লাগছে। সুড়ঙ্গের ভেতর অন্ধকারে যেন রাখা আছে অনন্ত কৌতূহল। হয়তো প্রাণঘাতী। অথবা অলীক। তবু তীব্র টান অনুভব করে রণিতা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সুড়ঙ্গের গভীরের দিকে।

এক সময় সে খেয়াল করে মনাস্ট্রির ধূপের হালকা মিষ্টি মাদক গন্ধ ভেসে আসছে সুড়ঙ্গ থেকে। আসছে মৃদু শব্দ। গভীর মায়াবী স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের। অপার্থিব যন্ত্রানুষঙ্গের। সঙ্গে বিলম্বিত লয়ে মৃদু ড্রামের। যেন বা পুজোয় বসেছেন একদল লামা। গুরু রিনপোচের আরাধনা করছে তারা সমবেত স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে। ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গেরই ভেতরে কোথাও। চাইলে সেও গিয়ে যোগ দিতে পারে এই যৌথ প্রার্থনায়।

আরও গভীরের দিকে এগিয়ে যায় রণিতা। আলোআঁধারির ছায়াছবিও যেন সে থেকে থেকে নাচতে দেখে অন্ধকার সুড়ঙ্গের দেওয়ালে। শুধু তাকেই হাতছানি দিয়ে যাওয়ার অছিলায়।

আরও এগিয়ে যায় রণিতা। সামনে আর কিছুই সে দেখতে পায় না বিকট অন্ধকার ছাড়া। তবু তীব্র অনুভব হয় আসলে সে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে। সেটুকু পেরিয়ে গেলেই ওপাশে আলোকিত নতুন এক কক্ষ দেখতে পাবে। হয়তো সেখানেই রাখা আছে তার সব কৌতূহলের অবসান। তার সব মনোবিকারের উপশম। তাই সে মনস্থির করে আর পিছোবে না। যা হোক হবে। আন্দাজেই সে পা ফেলবে এই অন্ধ চৌকাঠের ওপাশে।

পা বাড়িয়ে ফেলতেই যাচ্ছিল রণিতা। হঠাৎ কেউ তাকে পেছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে শূন্যে তুলে নেয়। যেমন করে রাবণ হয়তো পুষ্পকে তুলেছিল সীতাকে। রণিতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন সে শূন্যপথে উড়ে বেরিয়ে আসে গুহার বাইরে। দিনের উদার আলোর ভেতর। তার পর মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়েই দেখে সামনে সেই কালকের বাসের লামাজি। চওড়া হেসে চেয়ে আছেন তার দিকে।

রণিতা খানিক সময় নেয় ধাতস্থ হতে। তার পর নতুন করে অবাক হয়ে বলে, "আপনি আমাকে কোলে তুলে নিলেন?"

লামাজি বলেন, "হ্যাঁ। আর খুব ভাল লাগল তোমার শরীরের ছোঁয়া। কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভাল লাগাটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র।"

"আচ্ছা! তা আসল উদ্দেশ্যটা কী ছিল?"

"তোমার প্রাণ বাঁচানো।"

"কেন? আমার কি প্রাণহানি হতে যাচ্ছিল?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট!"

"কেন? ওখানে কী আছে?"

লামাজি বলেন, "ওখানে এক শয়তানের আত্মা কয়েদ আছে। সেই আদিকাল থেকেই। তার কোনও শরীরের অবলম্বন নেই বলে সে গুহার বাইরে বেরোতে পারে না। সে-ই তোমাকে ডাকছিল। কাছে পেলে তোমার শরীর ধারণ করে সে বেরিয়ে আসত।"

রণিতা ভয় আর কৌতুক মিশিয়ে বলে, “ওরে বাবা!”

লামাজি হেসে বলেন, “বিশ্বাস না হলে কোরো না। কিন্তু জীবন বাজি ধরে পরীক্ষা করতে যেয়ো না।”

রণিতা তার হালকা মেজাজ ধরে রেখেই বলে, “না না। একদম না। আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ইয়ে, মানে পরিষেবার জন্য।”

লামাজিও রসিক। হেসে বলেন, “তুমি চাইলে আমি আরও অন্য পরিষেবাও দিতে পারি।”

রণিতা চোখ পাকিয়ে বলে, “এখানে? এই বাঘের বাসায়?”

লামাজি তার দিকে ফিরে তাকান অবাক হয়ে। তার পর বুঝতে পেরে হেসে বলেন, “আরে আমি তা বলছি না।”

“না?”

“না রে বাবা। তুমি খুব ফক্কড় মেয়ে আছ।”

“তা হলে কী পরিষেবার কথা বলছেন?”

“এই যেমন, চা-নাস্তা খাওয়াতে পারি। ভগবানের প্রসাদ দিতে পারি। তোমার জন্য প্রার্থনা করতে পারি। এমনকি তুমি চাইলে দীক্ষাও দিতে পারি।”

রণিতা বলে, “একটু চা পেলে ভালই হত।”

লামাজি হেসে বলেন, “এসো আমার সঙ্গে।”

লামাজি রওনা দেন মূল ইমারতের দিকে, সবচেয়ে বড় যে ভবনটি। তার বিরাট খোলা দরজা দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। হল এর মাঝামাঝি এক বিরাট সোনালি বাঘের মূর্তি। রণিতা বলে, “এই সেই উড়ন্ত বাঘ?”

লামাজি বলেন, “বাঘিনী। তোমার মতো!”

রণিতা খুব হাসে লামাজির কথা শুনে। তার ধড়াচুড়া হুলিয়া কালকের মতই আছে। কিন্তু কথাবার্তা অন্যরকম ঠেকছে যেন। খুব স্বাভাবিক কোনও পুরুষ মানুষের মতো। যুবাপুরুষ।

রণিতার হাসি থামলে তিনি আবার বলেন, “রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেস!”

রণিতা আবার হাসতে হাসতে বলে, “ইউ মিন ম্যান ইটার?”

লামাজি বলেন, “যাদের বাঘে খায়, তারা মোক্ষ পায়।”

“তাই! কেন?”

“কারণ, তাদের এই নশ্বর দেহ তখন নষ্ট হয় না। জীবের সেবায় লাগে।”

রণিতা আবার পুরনো প্রসঙ্গের সূত্র পায় কথার মধ্যে। তবু সে কথা সে তোলে না। কারণ কথাটা হয়তো সত্যিই। বৌদ্ধদের মধ্যে শূন্য সমাধির চল আছে। মৃতদেহ নষ্ট না করে পাহাড়ের ওপর শূন্য স্থানে ফেলে রাখা হয়। পশুপাখির আহারের জন্য। হয়তো লামাজি সে কথাই বলছেন।

সে বিতর্ক তুলে উল্টো কথা বলে, “একই কথা তো বাঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?”

“মানে?”

“মানে, মানুষ যদি বাঘ মেরে খায় তাতে তো বাঘেরই পুণ্য। মানুষের সেবায় লাগে।”

লামাজী বলেন, “ভগবান বুদ্ধ মাংস খেতে নিষেধ করেননি। কিন্তু মাংস খাওয়ার জন্য পশু হত্যা করতে বারণ করেছেন। তাই কোনও পশুকে খাওয়ার জন্য হত্যা করাটা ঠিক নয়।”

রণিতা হালকা ব্যঙ্গের সুরে বলে, “তাহলে তো গোটারি, পিগারি, পোল্ট্রি সবই পাপ। তাই না?”

“বৌদ্ধ হলে অবশ্যই পাপ।”

“তাই যদি...”

“আরে সামলে...”

রণিতা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। লামাজি তাকে ধরে ফেলেন। প্রায় তার পুরো দেহভার লামাজি দুই হাতে নিয়ে তাকে আবার সোজা করে দাঁড় করান। হেসে বলেন, “তুমি বড্ড তর্ক করো। তা না করে বরং বিশ্বাস করো।”

রণিতা সোজাসুজি লামাজির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, “আপনাকে?”

লামাজি তখনও ধরে আছেন রণিতার বাহু। তার দিকে পাল্টা তাকিয়ে বলেন, “ভগবান বুদ্ধকে।”

রণিতা বলে, “করব। একটা শর্তে।”

“কী শর্ত?”

“যদি আমাকে ছেড়ে দেন।”

লামাজি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন রণিতার দুই বাহু। সলজ্জ হেসে বলেন, “সরি!”

রণিতা কিছু বলে না। কিন্তু তখনও সে অনুভব করে চলেছে লামাজির পুরুষালি বলিষ্ঠতার ছোঁয়াগুলো। যেন কোনও চৈনিক যোদ্ধা। পাহাড় পর্বত জয় করে বেড়ানোর পথে তাকে রক্ষা করেছে বিপদের হাত থেকে। রণিতা হেসে বলে, “জাস্ট কিডিং!”

“আই নো। চলো, চা খাওয়া যাক।”

পাথরের মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠে দু’জনে। বিরাট কাঠের দরজা পেরিয়ে ঢোকে একটা ঘরে। বেশ বড় ঘর। মোটা পাথরের দেওয়ালে ইমারতের মজবুতি অনুভব করা যায় চার পাশ ঘিরে। ধূপের হালকা সুগন্ধে ভরা ঘর। দেওয়ালে অসংখ্য থাংকা। সিলিংয়ে অসম্ভব মোটা কাঠের কাঠামো। এক ধারে বিছানা। তার ওপর লেপ কম্বল থাক করে রাখা। একটা কাঠের তাকে বইপত্র। কিন্তু সবচেয়ে চোখ টানছে যে জিনিসটা, তা হল একটা গিটার । ঠিক বিছানার পাশে।

“বোসো!”

বসার জন্য রণিতাকে একটা কাঠের টুল দেন লামাজি। তার ওপর উলের বাহারি আসন পাতা। বসতে বসতে রণিতা বলে, “গিটার!”

“চায়!”

এক কিশোর লামা দু’পেয়ালা চা নিয়ে এসেছে। আসলে কাপ। চিনামাটির। কিন্তু গড়ন দেখে পেয়ালা ভাবতেই ভাল লাগে রণিতার। সঙ্গে বাটিতে শুকনো চিঁড়ে। এক ডেলা মিছরি।

কিশোর লামা বিদায় নিলে লামাজি বলেন, “খাও। এখানে তো এই খাবারই পাবে।”

“আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়?”

লামাজি হাসেন। বলেন, “ছাং আর চিলি পর্কের খোঁটা দিচ্ছ?” চায়ে একটা চুমুক দিয়ে আবার বলেন, “আই অ্যাম আ বেগার, নট চুজ়ার। তাই কোনও কষ্ট নেই।”

উত্তর দেয় না রণিতা। চায়ে চুমুক দেয়। ঘি-মাখন এর ঘন মিষ্টি চা। পানীয় কম খাদ্য বেশি। একমুঠো চিঁড়ে হাতে নিল রণিতা। ক’টা মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল, “গিটার কে বাজায়?”

লামাজি গিটার হাতে নিয়ে বলেন, “শুনবে?”

তার পর বাঘের বাসার নিভৃত কক্ষে বিদেশি যন্ত্রের টুংটাং শব্দ ওঠে। আধো অন্ধকার সেই ঘরের ভেতর বসে সব কিছু অলীক লাগে রণিতার। সকালে পারো থেকে বেরিয়ে সে বোধহয় একটু বেশিই দূরে চলে এসেছে। একটু বেশিই উঁচুতে। এতটাই যে মাটির কাছের বাস্তবতাগুলো এখানে খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। সূক্ষ্ম হতে হতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমা প্রায় ছাড়াতে বসেছে এই প্রাচীন গুম্ফার নিভৃত কক্ষে। কিছুই আর সত্যি মনে হচ্ছে না। মিথ্যেও মনে হচ্ছে না কোনও কিছু। শুধু মনে হচ্ছে সবটাই বায়বীয়। চোখে দেখা গেলেও হয়তো হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে না।

“অরিজিৎ সিং?”

চা মুখে নিয়ে আঁতকে ওঠে রণিতা। লামাজি বলেন কী! অরিজিৎ সিংয়ের গান গাইবেন! তাও এই টাকসাং... রণিতার মনে হয় বদহজমেই মরে যাবে সে আজ। যদিও লামাজি আর তার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করেন না। মৃদু চাপাস্বরে গান ধরেন, “আজ সে তেরি সারি গলিয়া মেরি হো গয়ী/আজ সে মেরা ঘর তেরা হো গয়া...”

রণিতা চিঁড়ে চিবোনো ভুলে চেয়ে থাকে লামাজির দিকে। এই মুণ্ডিত মস্তক। এই হলুদ মেরুন জোব্বা। এই সরু চোখের মঙ্গোলীয় মুখ। এই প্রাচীন মনাস্ট্রির নিভৃত কক্ষ। আর তারই মুখে অরিজিৎ সিংয়ের গান! তাকিয়ে থাকতেও যেন ভয় ভয় লাগে তার। সে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরে অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে বাস্তবের মাটি পাথর গাছপালা। সে সবের ঊর্ধ্বে কোনও এক অলীক লোকে সে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য এক সঙ্গীতশিল্পীর গান শুনছে। শুনছে আর মুগ্ধ

হচ্ছে। শুনছে আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। ভীষণ রকম ব্যক্তিগত লাগছে তার অনুভূতিগুলো। গানের কথাগুলো—

“তেরা কান্ধে কা যো তিল হ্যায়/ তেরে সিনে মে জো দিল হ্যায় / তেরে বিজলি কা জো বিল হ্যায়...”

লামাজি ভীষণ সততার সঙ্গে বলছেন, “আজ সে মেরা হো গ্যায়া।”

রণিতার কাঁধে সত্যিই তিল আছে, সেটা যেন উসখুস করছে হঠাৎ। চুলকোচ্ছে খুব। শার্টের তলায় হাত দিয়ে সে স্পর্শ করে নিজের তিলটা। কেমন যেন উত্তেজিত মনে হচ্ছে আজ কালো দানাটাকে। যেন ফুলে উঠে ঢোবা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বুকের ভেতর যে দিল, তা ধড়াস ধড়াস করছে। স্পষ্টতই ভয়ে। তার মনে হচ্ছে এক নিষিদ্ধ দেশের চরম নিষিদ্ধ অন্দরমহলে ঢুকে এসে সে যেন অপবিত্র করে দিচ্ছে সব কিছু। লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে তার সমস্ত অনুশাসন। বিধিনিষেধ। নিজেকে যেন মনে হচ্ছে কোনও উন্মত্ত বন্দুকবাজ। দেবালয়ের ভেতর ঢুকে এসে গুলিবর্ষণ করছে প্রার্থনারত মানুষের ওপর। থামতে পারছে না এই ভেবে যে, থামলেই সে নিজে শেষ হয়ে যাবে। চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে সে নিজেই।

রণিতা আর সহ্য করতে পারে না। কাপটা রেখে তীব্র বেগে ঘুরে দাঁড়ায় লামাজির দিকে। সোজা তার কাছে গিয়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে তার মাথাটা। নিজের দুটো ঠোঁট চেপে ধরে লামাজির ঠোঁটের উপর। যত জোরে পারে চেপে ধরে থামিয়ে দেয় তাঁর প্রাণঘাতী গান। তার দিল তখন এমন লাফাচ্ছে বুকের ভেতর মনে হয় ফেটে বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে।

লামাজি তত ক্ষণে গিটার ফেলে জড়িয়ে ধরেছেন রণিতার কোমর। বলিষ্ঠ দুই বাহুর পেষণে অজগরের মতো তাকে টেনে নিচ্ছেন নিজের গ্রাসের ভেতর। যেন তাকে আস্ত গিলে খাবেন।

রণিতা ঠোঁটের ওপর থেকে পিছলে লামাজির মুখ নেমে আসে তার বুকের উপর। তার উন্মত্ত সেই দিলের খোঁজে যেন গভীর ভাবে ডুবে যায় তার খাঁজের মাঝে। রণিতা তার মুণ্ডিত মস্তক দুই হাতে চেপে ধরে যেন ফাটিয়ে ফেলতে চায় নিজেরই বুকের উপর। দুই তরফে প্রচণ্ড পেষণের মাঝে হঠাৎই মনে হয় কানে আসে কোনও ডাক। কিন্তু সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না কারওই। তাই দু’জনেই তারা অগ্রাহ্য করে সেই ডাক। আর তার পরেই ভারী কিছু মাথায় এসে পড়ার অনুভূতি হয় রণিতার। যন্ত্রণায় তার মন ঘুরে যায়। আবেশ থিতিয়ে যায়। আর কানে আসে কোনও ক্রুদ্ধ কণ্ঠ বলছে, “সাংগে ওয়াংগেল!”

তাড়াতাড়ি রণিতা ছেড়ে দেয় লামাজিকে। লামাজিও তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। সামনে এক বয়স্ক লামা দাঁড়িয়ে। দেখেই মনে হয় উচ্চপদস্থ কোনও মানুষ। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে আরও জনাতিনেক লামা। তারা সকলেই তাকিয়ে আছে দু’জনের দিকে। কুকর্মের মাঝপথে ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো মুখ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু’জনে।

বয়স্ক লামা কিছু বলেন অজানা ভাষায়। তখন এক জন এগিয়ে এসে রণিতার মাথা পরীক্ষা করে। তার আঙুলের ডগায় রক্ত উঠে আসে। দেখে বয়স্ক লামা ইঙ্গিতে তাকে নিয়ে যেতে বলেন। আঙুলে রক্ত লাগা লামা বলেন, “মেরে সাথ আইয়ে।”

রণিতা তার লামাজির দিকে এক বার তাকায়। লামাজি বিষণ্ণ চোখে পাল্টা তাকান তাঁর দিকে। রণিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নীচের একটা ঘরে এসে রণিতার ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দেয় এক জন। তার পর মাথা ঘিরে বেঁধে দেয় একটা সাদা কাপড়ের পটি। হাতে জলের পাত্র দিয়ে বলে, “আপ ভাগ যাইয়ে। সাংগে কো নহি ছোড়েগা গুরুজি।”

রণিতা ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে মন্দিরের গেট পেরিয়ে। মনে হয় যেন সে বহিষ্কৃত হল। বিতাড়িত। ফিরে আবার আসতে চাইলে হয়তো তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তার চেয়ে বড় চিন্তা লামাজিকে ওরা কী করবে। সাংগে না কী তার নাম। সাংগে ওয়াংগেল।

ওরা বলছে গুরুজি সাংগেকে ছাড়বে না। কী করবে! মারধোর করবে! নির্বাসনে পাঠাবে! রণিতার কোনও ধারণাই নেই কী শাস্তি হতে পারে এখানে। এক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের বিধিবদ্ধ শাস্তি কী তা সে জানে না। আর জানে না বলেই আরও বেশি চিন্তা হয় তার।

রণিতার মনে হয় সাংগেকে বিপদে ফেলে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সে আবার ফিরে আসে মনাস্ট্রির দিকে। হলুদ গেট পেরিয়ে সে আবার ঢুকে আসে ভেতরে। মূল বাড়ির দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে এক জন লামা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। কিন্তু রণিতা তাকে গ্রাহ্যই করে না। এক রকম ধাক্কা দিয়েই তাকে সরিয়ে দেয় পথ থেকে। এক দৌড়ে সে পার হয় পাথরের সিঁড়িগুলো। তার পর সটান গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই গিটার রাখা ঘরে।

তাকে দেখে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সাংগে লামা। গুরুজিও ঘুরে দাঁড়ান তার দিকে। রণিতা তাঁর সামনে হাতজোড় করে বলে, “গুরুজি! সাংগে ইজ় ইনোসেন্ট। দোষ আমারই। আমি ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ওকে কিস করতে গেছিলাম। আমাকে শাস্তি দিন যদি দিতে হয়। ওকে ক্ষমা করে দিন। প্লিজ় গুরুজি।”

গুরুজি তার কথার কোনও উত্তর দেন না। সাংগের দিকে ফিরে কিছু বলেন। সাংগে তখন চরম বিব্রত। সে ব্যস্ত হয়ে রণিতার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে দরজার দিকে ঠেলার ভঙ্গি করে বলে, “প্লিজ় রানি। বি কোয়ায়েট।”

রণিতা অবাক হয়ে তাকায় সাংগের দিকে। সেও ওকে রানি বলে ডাকছে! কী করে জানল সে কথা। হয়তো সে-ই বলেছে। মনে নেই।

সাংগে হালকা ঠেলা দেয় রণিতার কাঁধে। রণিতা তার ঠেলা অগ্রাহ্য করে বলে, “লেট মি টক টু গুরুজি, সাংগে!”

কিন্তু গুরুজি তার সঙ্গে কথা বলার কোনও আগ্রহ দেখান না। সাংগেও চায় না রণিতা তা করুক। কিন্তু রণিতা নাছোড়।

বাধ্য হয়েই এক রকম জোর খাটায় সাংগে। গুরুজির সামনেই তার দুটো বাহু চেপে ধরে। তার গায়ে গা ঠেকিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে যায় দরজার দিকে। তার পর সিঁড়ি বেয়ে নীচের বাঁধানো চত্বরে। অন্য লামারা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে দু’জনের দিকে। সাংগে রণিতাকে টানতে টানতে একতলার হল ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। এক্কেবারে সেই সোনালি বাঘিনীর সামনে।

রণিতা তখনও অস্থির ভঙ্গিতে সাংগেকে বাধা দিচ্ছে। আর বলে যাচ্ছে, “কিন্তু আমার জন্য তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত নয় সাংগে। গুরুজিকে সে কথা বলতে দাও আমায়।”

সাংগে হঠাৎ রণিতার ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে। এক্কেবারে দু’পাটি দাত দিয়ে। রণিতা শান্ত হলে সে দাঁত সরিয়ে ঠোঁট দিয়ে ধরে তার ঠোঁটজোড়া। ও ভাবেই স্থির হয়ে থাকে বেশ কিছু ক্ষণ। তার পর খুব ধীরে আলগা দেয়। বিচ্ছিন্ন করে। তার পর গভীর চোখে তার দিকে চেয়ে বলে, “এ বার তো আমার দোষ। আমার প্রাপ্য শাস্তি আমায় পেতে দাও।”

রণিতা অনেক ক্ষণ চেয়ে থাকে তার দিকে। তার পর বলে, “একটা শর্তে।”

“বলো কী?”

“তোমার মোবাইল নাম্বার দাও।”

দু’জনে নম্বর দেওয়া-নেওয়া করে। তার পর সাংগে রণিতাকে এগিয়ে দেয় সদর দরজা পর্যন্ত। এক রকম তার পিঠে ভরসার হাত রেখেই। যেন প্রিয়জনকে রোজকার মতো বিদায় জানাতে এসেছে দরজায়। দিন শেষ হলে আবার যে ফিরে আসবে বাসায়। তার কাছে। যেমন রোজ আসে। ভালবাসার অভ্যেসে প্রতিষ্ঠিত রোজনামচা যেন।

রণিতা নিজেই অবাক হয়ে যায় নিজেকে দেখে। টাকসাং ছেড়ে আসতে যেন মোচড় দিয়ে ওঠে তার বুকটা। বারবার সে ফিরে তাকায়। সাংগে তখনও দাঁড়িয়ে সদর দরজায়। ডান হাত তুলে আছে উপরে। টা টা করছে না আশীর্বাদ, বোঝা যায় না। হয়তো অভয় দিচ্ছে। নিজেই নিজেকে। রণিতার তো আসলে কোনও ভয় নেই।

ভিউ পয়েন্টে ফিরে এসে রণিতা দেখে বেশ কিছু দর্শনার্থী ওখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাকে ফিরে আসতে দেখে অনেকেই অবাক। মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে আরওই। গায়ে পড়ে নানা প্রশ্ন করছে তারা। রণিতাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিথ্যে কথা বলতে হয়, “পড়ে গেছিলাম।”

সেও বিশ্রাম নেয় খানিক। পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে মনাস্ট্রির দিকে ফিরে। তার মোহময়তা একই রকম বিপজ্জনক দেখাচ্ছে। এত যে কাণ্ড সে করে এল, ওখানে তার কোনও ছাপই নেই। হয়তো গুরুজি এত ক্ষণে শুদ্ধীকরণ সম্পন্ন করেছেন। সাংগেকেও নিশ্চয়ই শুনিয়ে দিয়েছেন শাস্তির বিধান।

নীচে গাড়ির সেই মহিলা চালকও উদ্বিগ্ন রণিতার মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে। তাকেও মিথ্যে বলে রণিতা। পড়ে গেছিলাম। কিন্তু সে যেন ঠিক বিশ্বাস করে না তার কথা। টাকসাং এর দিকে জোড়হাত করে বলে, "কখনও কারও রক্ত ঝরেনি এ পথে।"

হোটেলে ফিরে চালকের পাওনা মিটিয়ে দেয় রণিতা। বেলা দুটো বেজে গেছে। রুমের দরজা বন্ধ করে একা হতেই রাজ্যের দুশ্চিন্তা গ্রাস করে তাকে। সাংগের দেওয়া নম্বরে বারবার ডায়াল করে। কিন্তু নট রিচেবল শোনে বারবার। মানে তো অগম্য। কিন্তু আসলে তো তা নয় সে এখন জানে। বাইরে থেকে চোখে পড়া সব মূর্ত বিমূর্ত বাধাই তো সে লঙ্ঘন করে বসে আছে। অগম্য যে বলছে, হয়তো তা সাময়িক।

আরও দুটো রাত রণিতা কাটিয়ে দেয় হোটেলে। দাঁতে দাঁত চেপে। কিন্তু সাংগের কোনও খবরই সে পায় না। তার নম্বরে অসংখ্য বার ডায়াল করেও তাকে ধরতে পারে না। এত দিনে তার উদ্বেগের পাহাড় বাড়তে বাড়তে বোধ হয় টাকসাং-এর উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে। রণিতার মনে হয় এর বেশি আর সম্ভব নয়। তাই পারোর হোটেলে চতুর্থ রাত ভোর হতেই সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতোই। যেন সে কোনও ঘোরের মধ্যে আছে। টাকসাং থেকে ফেরার পর এই ঘোর তার কাটেনি বললেই চলে। কখনও বা কেটে গেলে সে নিজেকে হাজার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে, ঘরের মেয়ে ঘরে ফেরো। কিন্তু পারেনি। যুক্তি জাল বেশি ছড়ানোর আগেই ঘোরের গ্রাসে গিয়ে পড়েছে আবার। সেই ঘোর এখন চরম আকারে মাথার ভেতর। তাই হেঁটে যাওয়ার ধৈর্যও তার নেই। গাড়ি থেকে নেমেই ভাড়া নেয় একটা ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চড়ে লাঠি হাতে রওনা দেয় রণিতা। বাঘের বাসার উদ্দেশে। যেন সে আজ একটা হেস্তনেস্ত করেই ফিরবে।

আজ কুয়াশা যেন আরও ঘন। আরও ভারী। বন পাহাড় গাছ রাস্তা চার পাশ আবছায়ার আড়ালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দিনের ঝলসানো রোদেও যাকে মায়াময় লাগে আজ যেন তা অলৌকিক। সেই অলৌকিক এর ভেতর রওনা দেয় রণিতা।

ঘোড়াওয়ালা বলে, "বর্ফবারি হো সকতা হ্যায়।"

"ইস অক্টোবর মে?"

"আজ সে নভেম্বর লগ গয়া ম্যাডাম!"

তাই তো! রণিতার খেয়াল নেই। দিন-তারিখের হিসেবও সে গুলিয়ে ফেলেছে। নভেম্বরে হিমালয়ে তুষারপাত খুবই সম্ভব। অসম্ভব ঠান্ডা আজ। কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে। সে বলে, "কোই বাত নহি। আগে বড়িয়ে।"

কিছু ক্ষণ পথ চলার পর রণিতার মনে হয় ঘোড়াটা বড্ড আস্তে যাচ্ছে। সে কথা ঘোড়াওয়ালাকে বলতেই সে একটু গতি বাড়ায়। আসলে তো ঘোড়াওয়ালা হেঁটে যাচ্ছে। তার গতিই ঘোড়ার গতি। তাই সে গতি বাড়াতে ঘোড়াও গতি বাড়ায়।

এক সময় ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে ঘোড়াওয়ালা। ঘোড়ার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। তার পর পিছন পিছন। শেষে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে বলে, "চলিয়ে হম আতে হ্যায়। ঘোড়ে কো পতা হ্যায় কাঁহা যানা হ্যায়।"

ঘোড়ার দড়ি নিজের হাতে গুটিয়ে নেয় রণিতা। আর গোড়ালি দিয়ে দু'বার আঘাত করে ঘোড়ার পেটে। এ বার ঘোড়া সত্যিই সত্যিই গতি নেয়। যা যথেষ্ট আস্তে হলেও মানুষের সাধ্যাতীত। রণিতা প্রসন্ন মনে সামনে তাকায়।

হাতের কাছের ঝোপঝাড় বোল্ডার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সামনের রাস্তাও নয়। কোথাও কোনও বাঁক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ঘোড়া রাস্তা চেনে। তাই সে এগিয়ে তরতর করে ঢুকে যায় ঘন সাদা কুয়াশার ভেতর।

এক সময় সত্যিই তুষারপাত শুরু হয়। তার মাথার ওপর, ঘোড়ার

ঘাড়ের ওপর ঝরঝর করে পড়তে থাকে শুকনো বরফের ঝুরো। কিছু ক্ষণের মধ্যেই বরফ এর পরত জমে ওঠে রণিতার গায়ে মাথায়। ঘোড়ার কেশরে পিঠে। চার পাশের ঝোপে জঙ্গলে পাথরে বোল্ডারে। আর সেই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে অবিরাম। নীরবে। কানে আসে শুধু পাথরের ওপর ঘোড়ার নাল বাঁধানো খুরের গতিছন্দের শব্দ।

হয়তো রণিতার পক্ষে এত সব কিছু একটু বেশিই হয়ে যায়। বুকের ভেতর চরম বিপন্নতা ধুকপুক করতে থাকে। বরফের ধারাপাতে ঝাপসা হয়ে আসে চোখ। কুয়াশার ঘনঘটা আরও ঘিরে ধরে তাকে। এক সময় সে ঘোড়ার লাগাম আলগা দিয়ে শিথিল করে ফেলে নিজেকে। যাক ঘোড়া তাকে নিয়ে যেখানে যাওয়ার। কিন্তু সে শিথিলতা বেশি ক্ষণ কাবু করে রাখতে পারে না রণিতাকে। অবিলম্বে সে সংবিৎ ফিরে পায়। দেখে ঘোড়া তার দাঁড়িয়ে আছে এক খোলা চত্বরে। যেখান থেকে সামনেটা শূন্য সাদা খাদ মনে হচ্ছে।

রণিতা বুঝতে পারে এটাই সেই ভিউ পয়েন্ট। যেখান থেকে সোজা সামনে দেখা যায় বাঘের বাসা। কিন্তু এখন ঘন কুয়াশার সাদা অন্ধকারে সবই আচ্ছন্ন। কোথাও কোনও দিক দিশা নেই। শুধু রেলিং বাঁধানো সিঁড়ির মাথাটা সামনে দেখা যাচ্ছে। তুষারাচ্ছন্ন এক অতল পথের মতো নেমে গেছে কোন অজানার দিকে। যদিও রণিতা জানে, আসলে গেছে এক পাহাড়ি জলপ্রপাতের দিকে। যার সামনে দিয়েই পথ চলে গেছে টাকসাং গুম্ফার দিকে। জল পড়ার শব্দ শুনতেও পাচ্ছে রণিতা।

কিন্তু ওই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ঘোড়ায় চড়ে নামতে তার ভরসা হয় না। তাই সে ঘোড়া থেকে নামে। ঝাঁকুনিতে ঝুরঝুর করে খসে পড়ে বরফ। গা থেকে মাথা থেকে। ঘোড়ার গায়ের গুলো সে নিজেই ঝেড়ে দেয় গ্লাভস পরা হাত দিয়ে। তার পর ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে নামতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে । ঘোড়ার আগে আগে। যেন সে নিজেই আসলে ঘোড়াওয়ালি। আর ঘোড়ারও তেমনই আচরণ। বশীভূত দাসের মতো অনুসরণ করে রণিতাকে।

জলপ্রপাতের মুখোমুখি সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে রণিতা চেয়ে থাকে জলধারার দিকে। পাশে অনুগত এক ঘোড়া। জলধারার উৎস কুয়াশায় ঢাকা। যেন সাদা মেঘ নেমে এসেছে সেই পর্যন্ত। অথবা ওরা উঠে এসেছে মেঘ পর্যন্ত। আর কয়েক পা গেলেই মেঘলোক।

রণিতা দাঁড়িয়ে থাকে ঝরনার মুখোমুখি। মন দিয়ে দেখে তার মরণঝাঁপ। সে জানে ঝরনা কখনও মরে না। মেঘদূতেরা আবার তাকে তুলে এনে ছেড়ে দেয় প্রপাতের মাথায়। জীবন চক্রের অন্তহীনতায় আটকে পড়ার জন্য। যেমন সাংগে তাকে বলেছিল। আসলে মানুষেরই মতো। বারবার মরবে বারবার জন্মাবে। আটকে থাকবে আবদ্ধ চক্রে। মুক্তি পাবে না। কখনও মোক্ষলাভ হবে না। যদি না বুদ্ধের শরণ নাও।

কথাগুলো আসলে রণিতা নিজেকেই বলে। ঝরনার শব্দে ভাল করে শুনতে পায় না নিজের কথাই।

সাঁকোর রেলিঙে পা দিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে রণিতা। তার লম্বা গ্রীবায় চাপড় দিয়ে বলে, "চল, এগো!"

কিন্তু সমানে পিছুডাক দিয়ে যায় ঝরনা। যেন সে কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না সাংগের কাছে। সব অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায় রণিতার ঘোড়া। রণিতাকে পিঠে নিয়ে। সে-ই এখন রণিতার ভরসা। কারণ সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পুরু তুষারের চাদরে ঢেকে যাচ্ছে চারিপাশ। তবুও ঘোড়া এগোচ্ছে একরোখা ভঙ্গিতে। কারণ সে জানে কোথায় যেতে হবে তার একাকী সওয়ারিকে নিয়ে।

ঘোড়ার ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকে রণিতা। আলগা করে ধরে থাকে লাগাম। ঘোড়া এগিয়ে চলে আপন মনে। বাঁধানো সিঁড়ির দু'পাশের লোহার রেলিং পেরিয়ে ঘোড়া আবার চলে আসে সপাট পথে। রণিতা জানে সেই হলুদ দরজা আর বেশি দূরে নয়। কল্পনায় যেন সে দেখতেও পায় দরজার ওপর ইংরেজিতে লেখা, 'ওপেন'।

কিন্তু অনেক ক্ষণ পথ চলার পরও সে দরজা আসে না। রণিতার হিসেবে এতটা সময় লাগার কথা নয়। যদিও সে ঘড়ি দেখেনি। পুরোটাই আন্দাজ। হয়তো তার আন্দাজে ভুল আছে। ঘোড়া তো স্থানীয়। নিশ্চয়ই বহু বার যাতায়াত করেছে এই পথে। তার তো ভুল হওয়ার কথা নয়। এই সব ভেবে রণিতা ধৈর্য ধরে বসে থাকে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া এগোতে থাকে আপন মনে। পাথরের উপর খটরখট শব্দ তুলে।

কিন্তু এক সময় রণিতা নিশ্চিত হয় ভুল হয়েছে। ঘোড়া তাকে ভুল পথে কোথাও নিয়ে চলে এসেছে।

অথচ তার ভয় করে না একটুও। মনে হয় টাকসাং গুম্ফার কাছাকাছি কোথাও সে আছে। সেই সোনার বাঘিনী তাকে রক্ষা করবে।

রক্ষা হয়তো করবে। কিন্তু কষ্ট যা করার তাকেই করতে হবে। শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে হবে এই দুর্যোগ কাটা পর্যন্ত। ব্যস্ত হয়ে এ দিক ও দিক ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেলেই বিপদ আরও বাড়বে।

অগত্যা একটা প্রাকৃতিক প্রতীক্ষালয় খুঁজতে লাগল রণিতা। অবিরাম তুষারপাত আর কুয়াশার মিলিত ঘনঘটায় আচ্ছন্ন চার দিক। তার মধ্যে পাহাড়ি গুহার মতো বিরাট কিছু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবু রণিতা খুঁজে পেল একটা। বিরাট কিছু না হলেও কাজ চলে যাবে দু'জনের। সে আর তার ঘোড়া।

এত ক্ষণ পর মাথা বাঁচল তার। গা বাঁচল ঘোড়ার। পাহাড়ের চমৎকার এক ঝুলবারান্দা। তার নীচে আশ্রয়। পায়ের তলায় তখনও মাটি। চার পাশে বরফের পুরু পরত। এখানে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় মাটি ফিরে পাওয়ার মতো অনুভূতি হল রণিতার। এটুকুতেই কত স্বস্তি! ঘোড়ার চোখেও সেই স্বস্তির ছায়া।

একটা বোল্ডারের ওপর বসল রণিতা। নামাল তার ন্যাপস্যাক। স্যাকে বিস্কুটের প্যাকেট। জলের বোতল। ক'টা বিস্কুট নিজে খেয়ে বাকিটা খাইয়ে দিল ঘোড়াকে। ঘোড়া যদিও ঘাস খেতে লেগে গেছে এর মধ্যেই।

এক ভাবে বেশ কিছু ক্ষণ বসে থাকার পর রণিতা খানিক ধাতস্থ হল। অবকাশ পেল তার মন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করার। আর সে বুঝতে পারল, সে আসলে বিপন্ন। ভীষণ রকম বিপন্ন। এতটাই যে মারা পড়ার ভয়ও আছে। ঘোড়াটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে ভয় পেয়েছে। দুর্যোগ নিশ্চয়ই কেটে যাবে সকালের মধ্যে। তত ক্ষণ শুধু অপেক্ষা করা।

রণিতা তাই ঠিক করল। চুপ করে শুয়ে বসে সাংগের কথা ভাববে। মোবাইলের সিগন্যাল না থাকলেও গেম খেলা যাবে। গান শোনা যাবে। গল্প উপন্যাস ডাউনলোড করা আছে। পড়া যাবে নির্বিঘ্নে।

যদিও বাস্তবে মানব চরিত্র অনুযায়ী অতটা নির্লিপ্ত হতে পারল না রণিতা। এই প্রাকৃতিক আশ্রয়ের আনাচে কানাচে অনুসন্ধান চালাতে লাগল। আর খুঁজেও পেল কাঠকুটো ডাল পাতা মিলিয়ে বেশ কিছু জ্বালানি। অধিকাংশই ভিজে। শুকনোগুলো বেছে বেছে আগুন জ্বালল রণিতা। সিগারেট লাইটার ছিল তার স্যাকে। ভিজেগুলো সাজিয়ে দিল আগুনের চারপাশে। শুকিয়ে যাবে।

উচ্চতায় এক ফুটও নয় আগুনের। অথচ প্রভাতী সূর্যের মতো ভরসাদার। কোথাও পড়েছিল রণিতা, আগুন শুধু আলো আর উত্তাপই দেয় না, ভয়ও পোড়ায়। তাই হয়তো তুষারের ফাঁকে হিমেল রাত নামতে দেখেও সে ভয় পেল না।

একটু পরেই কালো হয়ে গেল সব সাদা। দিনেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না সাদা পর্দার জন্য। রাতেও সব ঢাকা নিশ্ছিদ্র কালো পর্দায়। শুধু এই গুহার ভেতর নীরবে কম্পমান জীবনের উষ্ণতা। পৃথিবীর শেষ রংয়ের নীরবতা। বাদামি ঘোড়া, দুধে-আলতা মানবী আর তাদের রংবেরঙের সাজ। নীল লাগাম, রামধনু টুপি, হলুদ জ্যাকেট... আর লাল সোনালি আগুন।

স্মার্ট ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে রণিতার মনে হল যেন আজ প্রকৃতি নিজেই খেলতে নেমেছে। তাই বাকি সবার খেলা বন্ধ। অন্য কোনও শব্দ নেই তুষারপাতের শব্দ ছাড়া। আবার অন্য রকম এই গুহার ভেতরটা। সেখানে আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ হচ্ছে চড়চড় করে। শ্বাস ফেলছে ঘোড়া। আশ্চর্যের ব্যাপার, রণিতা ঘুমিয়ে পড়ল। আগুনের পাশে ঘোড়ার কাছে গুটিসুটি পশমিনা পেতে সে ঘুমিয়ে পড়ল দিব্যি। আর ঘুম তার ভাঙল না যত ক্ষণ না এক দল মানুষের কোলাহল উঠল তাকে ঘিরে। তত ক্ষণে দুর্যোগ কেটে আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠব উঠব করছে। সামনেটা ঘোড়া আর মানুষের ভিড়।

উদ্ধারকারী বাহিনী এসেছে তার খোঁজে। দলে তার ঘোড়াওয়ালা। গাড়ির চালক। পুলিশ আর সরকারি আধিকারিক। সাংবাদিকও দু'জন। ছবি তুলছে। রণিতার। ঘোড়ার। মরা আগুনের। বিস্কুটের প্যাকেট জলের বোতল পশমিনার বিছানা... সব কিছুর। প্রশ্ন অবিরাম।

রণিতার ইচ্ছা ছিল টাকসাং যাবে। সেই ইচ্ছা প্রকাশ করল মৃদু ভাবে। কিন্তু পুলিশ অফিসার প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "এনাফ ইজ় এনাফ ম্যাডাম। প্লিজ় কোঅপারেট।"

অগত্যা যেন সফল অভিযাত্রী দলের মধ্যমণি হয়ে রণিতা নেমে এল নীচে। সেখানে আরও বড় একটা দল অপেক্ষা করছিল যেন তাকেই স্বাগত জানানোর জন্য। কয়েকটা সিল্কের খদা কারা যেন পরিয়ে দিল তার গলায়। ছবি তোলার হুড়োহুড়ি রীতিমতো। মনে হল টিভি চ্যানেলও আছে একাধিক। কী এমন সে করল যে এত মাতামাতি!

গোটা দিন এই চলল রণিতাকে নিয়ে। যেন সে কোনও কাণ্ডই করে ফেলেছে গত রাতে। যা কিনা কালো বা সোনালি, কোনও এক অক্ষরে লেখা থাকবে এ দেশের ইতিহাসে। তারই নথি তৈরির কাজে ব্যস্ততায় কাটল তার সারা দিন। প্রথমে হাসপাতাল। তার পর থানা। সেখান থেকে কোনও সরকারি আধিকারিকের দপ্তরে। শেষে এক টিভি চ্যানেলের স্টুডিয়োয়। সেজেগুজে ইন্টারভিউ। রাতে হোটেলে ফিরে টিভি চালিয়ে নিজেই নিজেকে দেখে জীবনে প্রথম বার। সকালের খবরের কাগজের পাতায় রঙিন ছবিসহ রোমহর্ষক প্রতিবেদন।

কাগজ হাতে চা খেতে খেতে রণিতা ভাবছিল এত সব কাণ্ড, এর পর কি আর আবার যাওয়া যাবে সাংগের খোঁজে! ওখানে গেলেই তো লোকে আবার ছেঁকে ধরবে। আর সাংগেরও তো খবর পাওয়ার কথা। যদি না কারারুদ্ধ হয়ে থাকে অবশ্য।

ভাবতে ভাবতেই সাংগের ফোন। তাড়াতাড়ি ফোন তুলে রণিতা ব্যস্ত হয়ে বলে, "হ্যালো।"

ও পাশে সত্যিই সাংগে। আবেগের তোড়ে সে কথা বলতে পারছে না ঠিকমতো। কোনও রকমে শুধু সে জানতে চায় রণিতার এই দুঃসাহসিক অভিযান তারই খোঁজে কিনা। রণিতা শান্ত স্বরে বলে, "তোমার কী মনে হয়?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

রণিতা বলে, "একেবারেই তাই।"

সাংগে বলে, "জীবনটাও তো যেতে পারত!"

রণিতা হেসে বলে, "ভাবতাম তোমার সেবায় জীবন দিলাম।"

সাংগে প্রশ্রয় মেশানো স্বরে বলে, "ফক্কড় মেয়ে!"

ফোন রেখে রণিতার আর আনন্দের শেষ নেই। কারণ সাংগে আসছে তার কাছে। কেন আসছে। এসে কী করবে দু'জনের কেউই জানে না। শুধু জানে দেখা হবে আবার অবশেষে। যার আশা রণিতা প্রায় ছাড়তে বসেছিল।

সাংগে এল সঙ্গে একটা ঢাউস ব্যাগ নিয়ে। কাঁধে গিটার। যদিও পরনে তার সেই লামাদের হলুদ মেরুন বক্ষু। মুণ্ডিত মস্তক। মুখে চওড়া হাসি।

রুমের দরজা খুলেই প্রথমে রণিতা অবাক হয়ে গেল এই দৃশ্য দেখে। কিন্তু অবাক হওয়ার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই সাংগে ভেতরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। আর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে।

সাংগে ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে আরে, করো কী! গুরুজি তোমার পিছনে।"

রণিতা হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিল। তার পর সলজ্জ হেসে তার ন্যাড়া মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল, "স্টুপিড!"

আবার সে জড়িয়ে ধরল সাংগেকে। এ বার তার কোলেই উঠে পড়ল এক রকম। রণিতা জানে সাংগে তার ভার বহন করতে পারবে সহজেই।

দরজার কাছেই ওই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল তারা অনেক ক্ষণ। রণিতারও ছাড়তে ইচ্ছে করে না তাকে। সেও যেন ভীষণ খুশি হয় তাকে কোলে নিতে পেরে।

যাই হোক, রণিতা তো আর সত্যিই শিশু নয়। আর দু'জনের মাঝে বাৎসল্যের ভূমিকাও নেই কোথাও। ভূমিকা যার আছে, সে ধীরে ধীরে সক্রিয় হতে লাগল দুজনেরই শরীরের ভেতর। সেটা বুঝতে পেরেই সাংগে এক সময় নামিয়ে দিল রণিতাকে। রণিতাও কষ্টেসৃষ্টে সামলে নিল নিজেকে। বলল, "বোসো।"

সাংগে ব্যাগ আর গিটার নামিয়ে রাখল এক পাশে। রণিতা জিজ্ঞেস করল, "ওরা ছেড়ে দিল?"

"তাড়িয়ে দিল।"

"আমি তো ভাবলাম আটকে রাখবে। অত্যাচার করবে। আরও না কত কী করবে!"

সাংগে হেসে বলে, "মানে মধ্যযুগীয় ট্রিটমেন্ট দেবে?"

"হ্যাঁ। ওই রকমই কিছু।"

"সে যুগ তো আমরা পেরিয়ে এসেছি। তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এটা তো ভুটান।"

সাংগে বলে, "ভুটান কি ভেবেছ সেই যুগেই পড়ে আছে?"

"নেই?"

সাংগে শুধু হাসে। উত্তর দেয় না। রণিতা ফোন করে চায়ের অর্ডার দেয়। সাংগে বলে, "বরং বিয়ার বলো।"

রণিতা আবার ফোন করে চায়ের বদলে বিয়ার বলে। সঙ্গে পটেটো চিপস।

বিয়ারে চুমুক দিয়ে রণিতা বলে, "এর পর কী করবে?"

"বাড়ি যাব।"

"বাড়ি! কোথায় বাড়ি তোমার?"

"লাদাখ।"

"লেহ?"

"না। পাদুম।"

"পাদুম! সেটা কোথায়?"

"জাঁসকারে। পদ্মসম্ভব এর নামে নাম। পাদুম। কারগিল থেকে একদিনের রাস্তা।"

"হেঁটে?"

সাংগে হেসে বলে, ""না রে বাবা। গাড়ি চলে। বাস লরি চলে। চালালে রেলও চলবে।"

রণিতার হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো লাগতে শুরু করে। এত কাণ্ড সে করে বসল এর জন্য। এখন সে বাড়ি চলে যাবে বলছে! কণ্ঠে খানিক বিপন্নতা ফুটিয়ে সে বলে, "আর আমি?"

সাংগে কিছু ক্ষণ চেয়ে রইল রণিতার দিকে। তার পর বলল, "চাইলে যেতে পারো আমার সঙ্গে!"

রণিতা হঠাৎ খুশি হয়ে বলল, "নেবে আমাকে সঙ্গে?"

"হোয়াই নট!"

তার পর বিয়ার খেতে খেতে দু'জনে ঠিক করে পর দিনই রওনা দেবে পাদুম-এর উদ্দেশে।

রাতে রুমের দরজা বন্ধ করে রণিতা ঘুমোনোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুম আসে না। বদলে তার মাথার ভেতর ঢুকে আসেন গুরু ড্রুকপা কুনলে। যেন এত দিনে আবার সুযোগ হয়েছে তাঁর রণিতার চেতনায় উঁকি দেওয়ার। অথচ রণিতা তো... ভাবতেই হঠাৎ তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আসলে তো সে গুরু ড্রুকপার খোঁজেই মরণপণ অভিযানে নেমেছে। এই সাংগে ওয়াংগেল তো আসলে তাঁরই প্রতীক। যেন এই যুগের গুরু ড্রুকপা কুনলে। গুরু ড্রুকপাও তো বহিষ্কৃত ছিলেন মূল ধারার সাধনপথ থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক আচার বিচারকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। বদলে প্রতিষ্ঠান তাকে বহিষ্কার করেছিল। তাঁর কোনও গুম্ফা ছিল না। মন্দির মনাস্ট্রি ছিল না। মানুষ আর প্রকৃতিকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। নিরাভরণ সত্যকে তার অকৃত্রিম রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে ছিলেন। পেরেও তো ছিলেন। না হলে আজকের ভুটান এইরূপে প্রতীয়মান হত না পৃথিবীর কাছে। ভুটান নিষিদ্ধ দেশ ছিল, কারণ পৃথিবী তাকে নিষিদ্ধ করেছিল বলে নয়, বরং সে-ই নিষিদ্ধ করেছিল অবশিষ্ট পৃথিবীকে। যেন গোটা দেশটাই আসলে এক বিরাট গুরু ড্রুকপা কুনলে। যে অনায়াসে প্যান্ট খুলে নিজের উত্থিত পুরুষাঙ্গ

দেখিয়ে তাচ্ছিল্য করতে পারে গোটা বিশ্বকে।

আর ঘুমোতে পারল না রণিতা। তার ইচ্ছে করছে এক্ষুনি সাংগের সঙ্গে কথা বলতে। সে অন্য রুম নিয়েছে এই হোটেলেই। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে এত ক্ষণে। তবু ফোন করল রণিতা।

সে ফোন ধরে বলল, "এনি ইমার্জেন্সি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ইমার্জেন্সি।"

"হোয়াট?"

রণিতা বলে, "আরে আমি তো ভুটান এসেছিলাম চিমি লাখাং দেখতে। কাল যদি চলে যাই তা হলে তো আর দেখাই হবে না।"

সাংগে বলে, "ঠিক আছে, কাল চিমি লাখাং ঘুরে আসব। এমনিতেও কাল যাওয়া হচ্ছে না।"

"কেন?"

"দিল্লির ফ্লাইট ক্যানসেল।"

"থ্যাঙ্ক গড! তা হলে গুড নাইট।"

গুরু ড্রুকপার লকেট এখনও রণিতার গলায়। সেটাই মুঠোয় ধরে রণিতা মনে মনে রওনা দিল তাঁর সঙ্গে। দুর্গম হিমালয়ের বিপদসঙ্কুল পথে-বিপথে। যদিও সে সব গায়ে লাগে না পাহাড়ের মায়াময় রূপ সৌন্দর্যের ভেতর। বদলে প্রাণে আসে অফুরন্ত গান আর কবিতা। গায়ে হাতে পায়ে আসে আনন্দনৃত্যের ছন্দ। অন্তঃকরণ যেন আকাশের মতো। সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। জাগতিক কলঙ্কের নাগালের বাইরে। পথ চলাকে মনে হয় অলৌকিক উড়ান।

পরদিন সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে রওনা দিল দু'জনে। চিমি লাখাং যেতে আসতে ছ'ঘণ্টা। ঘোরাঘুরির যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আর সাংগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর একটা মহড়াও হয়ে যাবে। পাদুম তো আসলে অনেক দূর। কী জানি অতটা দূর যেতে পারবে কি না সে!

সাংগে জানতে চায়, "চিমি লাখাং দর্শনে কারা যায় জানো?"

"জানি।"

"তুমি কি সেই জন্যই যাচ্ছ?"

"না।"

"তা হলে?"

এর উত্তর বিস্তারিত দিল রণিতা। বিন্দুর ও পারে ভুটানের এক দুর্গম গ্রাম দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাকে শোনাল। সেখানেই সে প্রথম শোনে গুরু ড্রুকপা কুনলের নাম। আর পরে জানতে পারে চিমি লাখাং-এই তাঁর অধিষ্ঠান। সেখানেই তাঁর লীলাক্ষেত্র। তাঁর মন্দির।

সাংগে গাড়িতে যেতে যেতে আরও গল্প বলে রণিতাকে। গুরু ড্রুকপা কুনলের। তার গানের কবিতার। আর আপাত আশ্চর্য কার্যকলাপের।

রণিতা জিজ্ঞেস করে সাংগেকে, "তিব্বতে এ সব আছে?"

"না।"

"কিন্তু গুরু ড্রুকপা তো তিব্বত থেকেই এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি নিজের দেশে জিনিসটা চালু করলেন না কেন?"

সাংগে হেসে বলে, "তিনি তো তিব্বতে ধর্ম প্রচার করেননি। তিনি সেই কাজ করতেই ভুটানে এসেছিলেন। সেটাই করেছেন।"

রণিতা বলে, "আসলে কি মনে হয় না তিনি ভুটানের মেয়েদের নির্বিচারে রেপ করেছেন?"

সাংগে খুব হাসে। বলে, "আমার উত্তর তুমি জানো।"

রণিতা সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, "ঠিক ঠিক। তিনি তো পরিষেবা প্রদান করেছেন।"

"শুধু তাই নয়, সে সব মেয়েরা তাঁর কৃপায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল।"

"মানে মোক্ষলাভ?"

"বলতে পারো।"

"আর সন্তানলাভ?"

সাংগে হেসে বলে, "সে তো স্বাভাবিক। এমন একজন মহান গুরুর সন্তান গর্ভে ধারণ ছিল গর্বের বিষয়।"

"হুমম! তিনি তো দেবতুল্য। দেবতাদের ছাড় আছে রেপ করার। হিন্দু মাইথোলজি তো এই সব গল্পেই ভরপুর। কিন্তু বুদ্ধিজ়মে যে এত সব কাণ্ড আছে তা জানতাম না।"

সাংগে হাসে রণিতার কথা শুনে। কিছু বলে না। তারা কথা বলছিল হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে। গাড়ির ড্রাইভারটাও জানে এই দুটো ভাষা। এক মাঝবয়সি 'ঘো' পরা ভুটানি। রিয়ার ভিউ মিররে তার একফালি মুখেও কৌতুকের ঝিলিক। শেষে সেও মুখ খোলে, "গুরুজির সব গল্প শুনলে আরও চমকে যাবেন ম্যাডাম।"

রণিতা বলে, "আমি এমনিতেই কম কিছু চমকাইনি। তবে আরও চমকাতে রাজি আছি। আপনার স্টকে কিছু থাকলে বলুন।"

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়, "এক বার গুরু ড্রুকপা কুনলে এক নানারিতে গেছেন। শুধু সন্ন্যাসিনীদের একটা মঠ। সেখানে এক অল্পবয়সি সন্ন্যাসিনীকে তাঁর ভাল লেগে যায়। তাই তিনি তাকে কৃপা করলেন। এবং সে গর্ভবতী হল। কিন্তু যেহেতু গুরু ড্রুকপা কুনলের কৃপা, তাই মঠ তা মেনে নিল। সেটা দেখে অন্য সন্ন্যাসিনীরাও সুকৌশলে যে যার পছন্দমতো সুযোগ নিল আর সকলেই গর্ভবতী হয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই বলল গুরু ড্রুকপা কুনলে তাকে কৃপা করেছেন। এই খবর শুনে গুরু ড্রুকপা কুনলে ক্রুদ্ধ হলেন। আর ছুটে এলেন মঠে সেই সব মিথ্যেবাদী সন্ন্যাসিনীদের খবর নিতে। কিন্তু তাঁর সামনে প্রথম জন বাদে আর কেউ দাঁড়াতে পারল না। সকলেই মঠ ছেড়ে পালাল।"

রণিতা ঠিক বুঝতে পারলো না এটা হাসির গল্প কি না। তবু সাংগে আর ড্রাইভার হাসছে দেখে সেও হাসল। ওপর ওপর। তার পর বলল, "মানে গুরুজি দায়িত্ব নিয়ে মঠটা তুলে দিলেন। তাই তো?"

ড্রাইভার বলে, "হয়তো সেটাই ছিল গুরুর উদ্দেশ্য।"

"মানে?"

"মানে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে, ওই মঠের মেয়েরা সবাই ভণ্ড সন্ন্যাসিনী। তাই এমন মঠ রাখার কোনও দরকার নেই।"

"অ্যামেজ়িং!"

বলতে বলতে রণিতা বাইরে তাকায়। পুনাখার সেই দুর্গ দেখা যাচ্ছে সংকোশ নদীর অপর পাড়ে। যেন এক রূপকথার রহস্যপুরী। অন্তহীন কিস্‌সা কাহিনিতে ভরা এক বর্ণাঢ্য প্রাসাদ, যার ভেতর আজও হয়তো ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় সেই সব বিগত দিনের চরিত্ররা।

সবাই বলে, ভুটান অন্য কোনও দেশের মতো নয়। একদম অন্য রকম। যেন এই পৃথিবীর অংশ নয়।

চিমি লাখাং পৌঁছে রণিতা অতটা অবাক হয় না। কারণ আগেই সে একটা গ্রামে এ সব দেখে এসেছে। এখানে তারই অনেক পরিশীলিত রূপ সে দেখতে পায়। যে নমুনাগুলো তারা ওখানে উপহার হিসেবে পেয়েছিল, সেগুলোই এখানে স্মারক। দোকানগুলো সব পুরুষাঙ্গ দিয়ে ঠেসে ভরা। ডিসপ্লে কেসে সুন্দর করে সাজানো। বেশ উচ্চমূল্য। এই সব পুরুষাঙ্গ নিয়ে কোনও যৌনতার ভাব নেই এখানে। আসলে বাণিজ্যিক পণ্য।

মূলমন্দির অবশ্য গুরু ড্রুকপা কুনলের প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি শুধু একটা চোর্তেনই তৈরি করেছিলেন। আশপাশের মাটি পাথর দিয়ে গাঁথা একটা আট-দশ ফুট উঁচু স্তূপ। দোচুলার এক দুষ্ট রাক্ষসীকে এই পর্যন্ত তাড়া করে এনে এখানেই মাটিতে পুঁতেছিলেন। আর সেই জায়গায় বানিয়েছিলেন এই স্তূপ।

রণিতা সেই স্তূপের সামনেই মাটিতে পদ্মাসনে বসে যায়। সাংগেকে বলে, "আমি একটু ধ্যান করি এখানে বসে। তুমি ঘুরে এসো।"

সাংগে একটু অবাকই হয় রণিতার কাণ্ড দেখে। মুখে কিছু বলে না। মূল মন্দিরের ভেতর চলে যায় তার চেনা এক লামার সঙ্গে দেখা করতে। রণিতা শিরদাঁড়া সোজা করে চোখ বন্ধ করে। গভীর শ্বাস নিয়ে নিজের ভেতর টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে চিমি লাখাং-এর অদৃশ্য আত্মাটাকে। যার ভেতর হয়তো আজও ভেসে আছে গুরু ড্রুকপা কুনলের গায়ের গন্ধ।

রণিতা মনসংযোগ করতে পারে না। হালকা কোলাহল আসে তার কানে। দর্শনার্থীদের। যাদের অর্ধেক বিদেশি। অর্ধেক স্থানীয়। জাতীয় পোশাক কিরা পরিহিত ভুটানি যুবতীরা শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রার্থনার চাকা ঘোরাচ্ছে। হয়তো মনে

মনে চাইছে যা চাইতে এসেছে। মূলত সন্তান। যা না হলে সমাজে বাঁজা বদনাম। মেয়েদের অবস্থা সর্বত্রই এক।

এ সব ভাবনা মাথা থেকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করে রণিতা। ভাবার চেষ্টা করে গুরুর কথা। তাঁর লীলার কথা। নিজের ভাবনাটাকে বেঁধে নেওয়ার চেষ্টা করে গুরু ড্রুকপা কুনলের তিরের ডগায় যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন সুদূর তিব্বত থেকে আর তা এসে পড়েছিল এই ভুটান দেশে। সেই কোন মধ্যযুগে। যখন ভুটান ছিল দৈত্যদানো পিশাচ আর ডাকিনীদের দ্বারা উপদ্রুত এক ভয়ঙ্কর দেশ। সাধারণ মানুষ তাদের অত্যাচারে চরম বিপন্ন জীবন যাপন করত। আর তখনই তার নিক্ষিপ্ত তির খুঁজতে খুঁজতে গুরু ড্রুকপা কুনলে এসে পড়লেন এই দেশে। নিজের অসীম শক্তি আর গভীর জ্ঞান নিয়ে। বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেও তাঁর পিঠে তির ধনুক। সঙ্গী একটি কুকুর। আর তাঁর সর্ব প্রধান অস্ত্র প্রজ্ঞার জ্বলন্ত বজ্র— ফ্লেমিং থান্ডারবোল্ট অব উইজ়ডম— যা আসলে তাঁর পুরুষাঙ্গেরই নাম। এই প্রজ্ঞার বজ্রই এখন এ দেশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আর গুরু ড্রুকপা কুনলেই এ দেশের সর্বকালের সেরা বৌদ্ধ গুরু, যাঁর গ্রহণযোগ্যতা এখনও ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত। স্বীকৃত।

কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নটাই উঠে আসে রণিতার মনে। যার উত্তর তার কাছে পরিষ্কার নয়।

কফিশপে বসে রণিতা জিজ্ঞেস করে সাংগেকে। সাংগে বলে, “সে যুগের সেটাই ছিল রেভোলিউশন। বিপ্লব। আর তিনিই ছিলেন এই ধারার বিপ্লবীদের মধ্যে প্রধান।”

“এই রকম কি আরও ছিলেন নাকি?”

“অনেক। তারা প্রাতিষ্ঠানিক আচারসর্বস্বতাকে অস্বীকার করেছিলেন। বদলে আন্তরিক সততার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। যেখানে কোনও ভণিতা নেই। আত্মপ্রবঞ্চনা নেই।”

রণিতা কফিতে মন দেয়। অনেক ক্ষণ কথা বলে না। তার পর সাংগের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, “একটা কথা জিজ্ঞেসা করব?”

“কী?”

“এই রকম পাগলা গুরুরা কি এখনও আছেন?”

“অবশ্যই আছেন।”

রণিতা চোখেমুখে নকল গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে ঠোঁট বেঁকায়। সাংগে বলে, “কী হল?”

রণিতা চিন্তিত মুখ করে বলে, “মনে হচ্ছে আমি তেমনই এক পাগলা গুরুর পাল্লায় পড়েছি। তাই না? এখন কি আছে আমার কপালে কে জানে!”

সাংগে কোনও উত্তর দেয় না। কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে শুধু হাসে।

রণিতা কফির মগটা সজোরে নামিয়ে হঠাৎ বলে, “আজ ফিরব না।”

“সকালে যে দিল্লির ফ্লাইট বুক করা আছে!”

“ক্যানসেল করে দাও। পরশু যাব।”

“কিন্তু আজ এখানে থেকেই বা কী করবে!”

রণিতা গায়ের স্টোলটা আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বলে, “দেশটাকে জানব। জানি না আর কখনও আসা হবে কি না। এখন চলো, ওঠো।”

দেশটাকে জানতে রণিতা পাশের গ্রামে হাজির হয় গিয়ে। সঙ্গে সাংগে। সে পুরোদস্তুর লামা। অচেনা গ্রামেও তার সম্মান। অনেকেই হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানায় তাকে। তাদের মধ্যে গ্রামের যুবতী মেয়েরাও আছে। তেমনই এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে রণিতা বলে, “নিশ্চয়ই তোমার একে কৃপা করতে ইচ্ছে করছে?”

“না।”

“না কেন?”

“তুমি তো আছ!”

“স্টুপিড!”

বলেই রণিতা সাংগের বাহুতে একটা থাপ্পড় মারে। সেই কাণ্ড দেখে গ্রামের লোক তো অবাক। এক জন লামাকে...

দু’জনে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে ওখান থেকে। গ্রামের অন্য দিকটায় গিয়ে দেখে সেখানে ছোটখাটো জটলা। গ্রাম এখানে শেষ হয়েছে। মনোরম গাছপালা ঘেরা একটা ছোট্ট মাঠ। মাঠের ধারেই জটলা। জটলার ভেতর গিয়ে তো চোখ কপালে রণিতার। সেখানে বিরাট মাটির উনুন। উনুনে কাঠ জ্বলছে উদার ভাবে। আগুনে বসানো বিরাট অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। পুরো কালো। তার ওপর একটা গামলা চাপানো। গামলায় জল। হাঁড়ি আর গামলার মাঝের ফাঁক ভিজে কাপড় জড়িয়ে বন্ধ করা। এই সমস্ত আয়োজন এর তদারকি করছেন এক জন কিরা পরিহিতা মাঝবয়সি মহিলা। তাঁকে সাহায্য করছে একই পোশাক পরা এক যুবতী। মনে হয় মা মেয়ে।

এক দিক থেকে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে আছে ভিড়টা। ভিড়ের আশি ভাগ বিদেশি। যুবক যুবতী থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা। বাকি অর্ধচক্র ফাঁকা। ছবি তোলার জন্য। যাতে অবাঞ্ছিত ভিড় ছবি নষ্ট না করে। কারণ দর্শকদের প্রায় সবারই হাতে ক্যামেরা। মোবাইল। এমনকি ট্রাইপড লাগানো পেশাদার ক্যামেরাও খান তিনেক।

দেখেশুনে রণিতা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শিশুদের মতো অধৈর্য হয়ে সাংগেকে জিজ্ঞেস করে, “কী হচ্ছে এখানে?”

সাংগে বলে, “রসের কারখানা। ফুর্তিরস তৈরি হচ্ছে। দেখবে চেখে?”

রণিতা চোখ গোল গোল করে বলে, “মদ?”

“হ্যাঁ মদই, কিন্তু নাম অন্য।”

“কী নাম?”

“আরা।”

“আরা!”

“আরকও বলতে পারো।”

“আরক! আরকই বটে।”

“তবে সাহেবরা বলে এগ ভদকা।”

“এগ ভদকা! কেন?”

মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে রণিতা ভিডিয়ো করে। সাংগে তাকে গল্প বলে ভুটানি আরার। তৈরি হয় গম ভুট্টা সিলেট চাল বার্লি ইত্যাদি দিয়ে। প্রথমে সেদ্ধ করে ইস্ট দিয়ে গেঁজানো হয়। তার পর ফোটানো হয় ওই রকম হাঁড়িতে। তারই বাষ্প ঠান্ডা করে ধরা হয় ভেতরের পাত্রে। সেটাই আরা। পরিবেশন করা হয় গরম গরম। অনেক সময় ডিমের পোচ বা ভুজিয়া মিশিয়ে। তাই সাহেবরা বলে, এগ ভদকা। রণিতা জানতে চায়, “নেশা হয়?”

“পরীক্ষা প্রার্থনীয়।”

বিদেশিরা সবাই ইংরেজিভাষী নয়। স্থানীয়রাও কথা বলে যাচ্ছে। ফলে এক মজাদার কোলাহল তৈরি হয়েছে আরা উৎপাদনকে ঘিরে। যার কোনও অর্থই বোধ হয় বোধগম্য হচ্ছে না কারও। কিন্তু তাতে অসুবিধেরও কিছু নেই। নতুন কিছু দেখতে পাওয়ার কৌতূহল আনন্দ আর বিস্ময়ে চকচক করছে সবার মুখ। রণিতার মতো আরও নানা দেশের যুবতীরাও ছেলেমানুষি করছে সেখানে। হয়তো যুবকরা খেয়ালও করছে সে সব। সাংগের মতো।

এক সময় গামলা নামানো হয় হাঁড়ির ওপর থেকে। হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আর একটা তিজেল। তিজেলে ধরা লিটার দুয়েক স্বচ্ছ তরল। ভিড়ের মধ্যমণি আরা।

ভিড়ের সামনে একটা কাঠের লম্বা বেঞ্চির উপর তিজেলটা নামিয়ে রাখেন ভদ্রমহিলা। তার পর আরও দুটো। পরপর তিনটে তিজেল। তাতে সাত আট লিটার হবে আরা। হামলে পড়েছে সমস্ত ক্যামেরা তার উপর। তারই মধ্যে সহকারী যুবতী মেয়েটি কোত্থেকে বার করে ফেলেছে অসংখ্য চিনামাটির ছোট ছোট বাটি। একটা অ্যালুমিনিয়ামের কুপড়ো হাতায় সামান্য আরা তোলেন ভদ্রমহিলা। ছিটিয়ে দেন উনুনে। আর অমনি লাফিয়ে ওঠে আগুন। যেন আরা নয়, পেট্রোল দিয়েছেন। ভদ্রমহিলা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, “সি দ্য পাওয়ার অব আরা!”

সমবেত হাততালির শব্দ ওঠে ভিড় থেকে। ভদ্রমহিলা চরণামৃতের মতো সামান্য আরা ঢালেন নিজের হাতের তালুর উপর। চেটে নেন

জিভ দিয়ে। তার পর জিভে টাকরায় শব্দ তুলে এমন মুখভঙ্গি করেন যে আবার উল্লাসে ফেটে পড়ে ভিড়। চিৎকার ওঠে। সিটি পড়ে।

তত ক্ষণে দ্রুত হাতে একের পর এক বাটিগুলোয় আরা ঢেলে চলেছে মেয়ে। একটা ছোট পাত্র থেকে আগেই ভেজে রাখা ডিমের ভুজিয়াও দিল তার মধ্যে। শেষে এক চামচ করে মাখন।

এ বার ভদ্রমহিলা ভিড়ের উদ্দেশ্যে দুই হাত প্রসারিত করে বলেন, "দিস ইজ় এগ ভদকা। ভুটানিজ় আরা। প্লিজ় হেলপ ইয়োরসেলভ্‌স।"

মহিলার কথাটা পড়তে পায় না মাটিতে। তার আগেই সবাই হাতে হাতে তুলে নেয় বাটিগুলো। সাংগেও তুলেছে দুটো। একটা দেয় রণিতার হাতে।

যে যার ভাগ হাতে নিয়ে একটু ছড়িয়ে গেছে। আরার আয়োজন ঘিরে এ বার পূর্ণ চক্রে দাঁড়িয়ে গেছে সবাই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখোমুখি। সবার হাতে ছোট ছোট চিনামাটির রঙিন বাটি। চোখেমুখে মিশ্র ঔজ্জ্বল্য। আনন্দ। যেন অমৃতের ভাগ পাওয়া গেছে অবশেষে।

সকলে একযোগে বাটি তুলে ধরে চিৎকার করে ওঠে। কী বলে বোঝা যায় না। হয়তো 'চিয়ার্স' বলে। আসলে টোস্ট করে যে যার ভাষায়। যে যার আরাধ্যকে। হয়তো রণিতা সাংগের উদ্দেশ্যে বাটি তুলে ধরে বলে, "উল্লাস!"

সাংগে বলে, "টু গুরু ড্রুকপা কুনলে লেগপা!"

রণিতা চুমুক দেয় বাটিতে। তখনও গরম। মুখের ভেতর এসে পড়ে ডিমের অংশ। কড়া মাখনের স্বাদ আর গন্ধ। সঙ্গে মিলেমিশে একাকার অ্যালকোহলের স্বাদ আর তেজ। গলা দিয়ে নামতে নামতে জানান দিয়ে যায়, ভুটান অন্য কোনও দেশের মতো নয়।

অনেকেই প্রথম বাটি শেষ করে দ্বিতীয় বাটি নিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো তিনেও পৌঁছে গেছে। যেমন সাংগে। রণিতা প্রথমটা শেষ করেই বেশ মজা পেতে শুরু করেছে। আর এক বাটি নিলেই সে একদম...

"ধরো।"

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই সাংগে তার হাতে দ্বিতীয় বাটিটা ধরিয়ে দেয়।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখা গেল সমস্ত জোগান নিঃশেষিত। অবশ্য চাহিদাও বোধহয় আর নেই। কারণ সকলেই পরিপূর্ণ তৃপ্ত বলে মনে হচ্ছে। সেই পূর্ণতার ছাপ চোখে মুখে স্পষ্ট। হাবে ভাবেই বোঝা যাচ্ছে আর কোনও খেদ নেই কারও মনে। অথবা শরীরে। এখন এই পর্ব সাঙ্গ করলেই হয়। তেমনই ভাবসাব লোকের। যদিও সবার তা নয়।

আরার মালকিন কিছু বলবেন। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সবাই তার দিকে মন দিলে তিনি বলেন, "ভুটানে আরা বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তাই এর কোনও দাম নেই। কিন্তু যদি আপনারা আমার পরিষেবার মূল্য দিতে চান, এই পাত্রে দেবেন। যার যা ইচ্ছে। না দিলেও কোনও অসুবিধে নেই।"

একটা সুদৃশ্য গোল পাত্র মেয়েটি নামিয়ে রাখে বেঞ্চের ওপর। লোকে উদারভাবে টাকা বার করে দিতে থাকে সেই পাত্রে। প্রচুর বিদেশি মুদ্রাও জমে সেখানে। সাংগেও বেশ কিছু ভুটানি নোট রেখে দেয় পাত্রে। রণিতা অবাক হয়ে ভাবে, 'বাহ! ভালই তো!'

এর পর ভিড়টা ভেঙে যায়। রয়ে যায় মাত্র আট দশ জন। তাদের সকলেই যুবক যুবতী। যদিও তারা একটা দলের নয়। কেউ একা। কেউ দোকা। তার মধ্যে সাংগে আর রণিতাও আছে।

হঠাৎ মেঘ জমে ভুটানের আকাশে। ঘিরে ধরে কুয়াশা। আর সেই মগ্ন উপবন যেন গড়িয়ে পড়ে যায় কোন শীতল অতল খাদে। চেয়ার বেঞ্চ সাজিয়ে সকলেই ঘিরে বসে আরার আগুন। আগুন জ্বলছে ভেতরেও। সব মিলিয়ে যেন এক অন্য সময়। যা আগে কখনও আসেনি জীবনে।

সাংগে পরিপূর্ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু। ধড়াচূড়া সমেত। তাই এ বার সে আকর্ষণের কেন্দ্রে। সবাই তাকে দেখেছে আরা খেতে। রণিতার সঙ্গে সাবলীল বন্ধুর মতো মিশতে। অপার কৌতূহল সে তৈরি করেছে সাহেবদের মনে। বিশেষ করে মেমসাহেবদের মনে।

এখন সে প্রশ্নবাণে জর্জরিত। আর টিকতে না পেরে সাংগে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও আরার প্রভাব কাটেনি। তারই ঝোঁকে হয়তো এক স্বর্ণকেশী মেমসাহেব তাকে টেনে ধরে। যেন তার দাবি আছে সাংগের ওপর। সাংগে বলে, "রিলাক্স স্টেলা। জাস্ট কামিং।"

রণিতা ভাবে, 'ও মা! নামও জানা হয়ে গেছে!'

স্টেলা ছেড়ে দেয়। সাংগে গিয়ে গ্রামের ভেতর ঢোকে। ফিরে আসে মিনিট দশেক পরে। সঙ্গে একটা লোক। লোকটার কোলে এক কার্টন বিয়ার। গলায় পটেটো চিপসের মালা। বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রাখে পুরোটা। লোকটা চলে যাবার পর সাংগে সবার উদ্দেশ্যে বলে, "প্লিজ হেল্প ইয়োরসেলভ্‌স।"

আর এক প্রস্ত উল্লাস ধ্বনিত হয় কুয়াশাঘেরা কুঞ্জবনে। প্রত্যেকেই একটা করে বিয়ারের বোতল হাতে নেয় আর টোস্ট করে বলে, "টু সাংগে ওয়াংগেল।"

তিনটে উনুন জ্বলছিল। এখন দুটো নিভে গেছে। একটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওরাই। আবহাওয়া খারাপ হয়েছে। দিনও শেষের পথে। তাই ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। এমনকি গ্রামের বাচ্চারা যারা একটু আগেও লাঠি খেলছিল নিজেদের মধ্যে, তারাও উধাও। কুয়াশা আরও ঘন। ঠান্ডা আরও নাছোড়। কিন্তু কিছুতেই আজ কাবু করতে পারছে না এদের। কারণ এরা বয়সে নবীন। চরিত্রে আন্তর্জাতিক। মেজাজে বেদুইন।

কুয়াশা যতই ঘন হোক, সূর্যের অস্তিত্ব ঠিক টের পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে সূর্যের বিদায়ও অনুভূত হয়। কালো হয়ে আসে চার পাশের কুয়াশা। উজ্জ্বল হয় আরার আগুন। পাহাড়ি কাঠের জটলা ঘিরে শিখারা যেন মাতাল হয়ে নাচছে।

হঠাৎ কানে আসে গান। মৃদু মগ্ন স্বরে গান ধরেছে এক জন— 'কান্ট্রি রোডস টেক মি হোম টু দ্য প্লেস আই বিলং...'

গায়ক এর কণ্ঠে এমন এক আকুলতা ছিল যে কেউ আর কথা বলে না। শব্দ করে না। শুধু এক জন বলে, "লাউডার, ব্রো!"

গান শেষ হলে স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি পড়ে। গাইছিল জেসন। আমেরিকা থেকে একাই এসেছে ইন্ডিয়া দেখতে। সঙ্গে জুড়ে নিয়েছে নেপাল ভুটান। সে জন্মগায়ক। গান না গেয়ে থাকতে পারে না। এখন পড়ে পাওয়া শ্রোতাদল পেয়ে সুযোগ আর ছাড়েনি।

যদিও শ্রোতাদল দ্বিতীয় গানের জন্য আর অনুরোধ করে না। কারণ ভাল গান সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়। আর চুপ করে থাকার মেজাজ এখন কারও নেই। কত কী জানার আছে। জানানোর আছে। তাই হাততালি শেষ হওয়ামাত্র ড্যারেন সাংগেকে উদ্দেশ্য করে বলে, "আর ইউ আ মঙ্ক?"

সে কৌতূহল সবারই। তাই এই প্রশ্নটা সবাই সমর্থন করে। কিন্তু উত্তর দেয় অন্য জন। স্টেলা। সে বলে, "অফ কোর্স হি ইজ় আ মঙ্ক।"

মানে এই প্রশ্ন সে আগেই করেছে সাংগেকে। আর উত্তরটাও জেনে বসে আছে। রণিতা ভাবে, 'হুমম্! চালু মাল মেয়ে!'

পরের প্রশ্ন আসে আমেলিয়ার কাছ থেকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "আর ইউ প্লেয়িং গুরু ড্রুকপা কুনলে হিয়ার ইন পুনাখা?"

রণিতা আর সহ্য করতে পারে না। এ বার সেও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "নট প্লেয়িং। হি ইজ় গুরু ড্রুকপা কুনলে ইন রিয়াল।"

"ইন রিয়াল! হাউ ডু ইউ নো দ্যাট? সিন হিজ় থান্ডারবোল্ট?"

কথাগুলো বলে স্টেলা নিজেও হাসে বেসামাল হয়ে। বাকিরাও যোগ দেয়। কিন্তু রণিতা দমার পাত্রী নয়। সে বলে, "ট্রাই ফর ইয়োরসেল্ফ।"

স্টেলা নির্লজ্জ দাঁত বার করে বলে, "আই অ্যাম ডাইং টু।"

বিয়ার খেতে খেতে এসব আলোচনাই করে তারা। সাংগে-পর্ব চলে বহু ক্ষণ। তার পর একে একে সবারই পালা আসে। রণিতারও। এক জাপানি যুগল আছে দলে। কাইতো আর হারুকি। তাদেরও পর্ব চলে অনেক ক্ষণ। কারণ তারা বৌদ্ধ। গুরু ড্রুকপাও তাই। জাপানে গুরুর বাজার কেমন তা নিয়ে কথা হয়। নানা প্রশ্নের উত্তর দেয় তারা। তাতেই জানা যায় জাপানে রীতিমতো উৎসব হয় পুরুষাঙ্গ নিয়ে। সেখানে পুরুষাঙ্গের মন্দিরও আছে।

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "এই রকম! লাইক চিমি লাখাং?"

"না, ঠিক এই রকম না। অন্য রকম।"

রণিতা নিজের জায়গা ছেড়ে গিয়ে বসে হারুকি আর কাইতোর

মাঝখানে। ভুটানি বিয়ারের বলে বলীয়ান হয়ে সে জাপানি যুবার হাত ধরে বলে, "বলো বলো। সেই গল্প বলো।"

শোনার আগ্রহ সবারই। তাই সবাই মনোযোগ দেয় হারুকি আর কাইতোর দিকে। হারুকি শুরু করে গল্প।

আসলে গোটা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল কিংবদন্তি দিয়ে। প্রাচীন কালে টোকিওর অদূরে কাওয়াসাকি গ্রামে বাস করত এক সুন্দরী যুবতী। বহু পুরুষের সঙ্গে এক শয়তানও তার প্রেমে পড়ে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয় এক যুবকের সঙ্গে। তখন সেই শয়তান গিয়ে আশ্রয় নেয় মেয়েটির যোনির ভেতর। ফুলশয্যার রাতে বরমশাই সঙ্গম করতেই তার পুরুষাঙ্গ ভেতর থেকে কামড়ে ছিঁড়ে নেয় সেই শয়তান। মেয়েটি আবার একা হয়ে পড়ে। কিছু দিন পর মেয়েটি আর এক বার বিয়ে করে। কিন্তু এ বারও বেচারা বরের একই অবস্থা হয়। তখন মেয়েটি সাহায্যের জন্য যায় গ্রামের কামারের কাছে। কামার তাকে একটা লোহার পুরুষাঙ্গ বানিয়ে দেয়। সেই পুরুষাঙ্গ ভেতরে প্রবেশ করাতেই শয়তান জোরসে কামড় দেয়। আর তাতেই বেটার সব দাঁত ভেঙে যায়। সে বেরিয়ে পালায় মেয়েটাকে ছেড়ে।

হারুকি কথা শেষ করতে পারে না। তার আগেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ে হেসে হেসে কুপোকাত হয় বেশ কয়েক জন। বিয়ারের বোতল উল্টে ফেলে কেউ। কেউ হেঁচকি তুলে শ্বাস আটকে মরার অবস্থা। কেউ বা আগুন ছিটকে ফেলে চার দিকে। বাইরে থেকে কেউ দেখলে ভাবত সন্ধেরাতে নিশ্চয়ই ভূতে ভর করেছে ছেলেমেয়েগুলোকে। অন্য সময় হলে হয়তো এতটা হত না। কিন্তু এখন আরার ওপর বিয়ার চড়ে ব্যাপার খানিক ভৌতিকই করে তুলেছে। সেই ভূতেরই প্ররোচনাতেই হয়তো ড্যারেল সবার হয়ে এক বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, "আজকে কেউ হোটেলে ফিরব না। সারারাত এখানেই এনজয় করব। ঠিক আছে গাইজ়?"

সমবেত চিৎকার ওঠে, "ঠিক আছে! ঠিক আছে!"

রণিতা আর সাংগে তো হোটেলই নেয়নি। ওদের শুধু গাড়ি আছে সঙ্গে। ড্রাইভার নিশ্চয়ই খচবে। ওকে বলে দেওয়া দরকার কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়তে। এই সব ভাবছিল সাংগে।

হঠাৎ কানে আসে ড্যারেল এর গলা, "হ্যালো, ডিকে! শুনছ?"

"ডি কে!"

"ড্রুকপা কুনলে!"

আবার এক প্রস্ত হাসির হল্লা ওঠে আগুন ঘিরে। কুয়াশা বোধহয় একটু কেটেছে। কারণ আগুনের লালচে আভায় দেখা যাচ্ছে কুঞ্জবনের গাছগুলো।

ড্যারেল বলে, "আরও বিয়ার লাগবে বস। আর রাতে খিদেও তো পাবে।"

সবার উদ্দেশ্যে বলে, "কিছু কিছু টাকা ছাড়ো সবাই। বিয়ার আর খাবারের জন্য। সোরা, প্লিজ় টাকা তোলো।"

সের্গেই, ভাদিম আর সোরা তিন জনের দল এসেছে আমেরিকা থেকে। নেপালে ওদের দলে জুড়েছে ড্যারেল। জার্মানির ছেলে। এখানে সে-ই এক রকম দলপতি। স্বনিযুক্ত যদিও।

সোরা আর সের্গেই টাকা তোলে। মুঠো করে পুরোটা তুলে দেয় সাংগের হাতে। গোনেও না। সাংগে টাকাগুলো নিয়ে চলে যায় গ্রামের দিকে। বলে যায়, "হেই হারুকি, বাকি গল্প আমি ফিরলে বলবে। ওকে?"

"ওকে, ডিকে।"

আবার সবাই হাসে একপ্রস্ত। সাংগে চলে যায়। লাফাতে লাফাতে স্টেলা ওর পিছু নেয়। রণিতা মনে মনে বলে, 'মাগিটা!'

সেই ফাঁকে জেসন আরও ক'টা গান গেয়ে নেয়। আপন মনেই। কেউ গাইতে বলে না। কেউ শুনছে কি না জানেও না। তবু সে গায়। কেউ কেউ জল ত্যাগ করে আসে লালচে আভা পড়া জঙ্গলের দিক থেকে। অ্যামেলিয়াও যায় একটু তফাতে। ভাদিম বিয়ারের বোতল উপুড় করে আকাশের দিকে চেয়ে শেষ বিন্দুটা টানার চেষ্টা করে শব্দ করে। সোরা তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, "বি কোয়ায়েট। লিসন!"

রণিতা মোবাইল ঘাঁটে। সের্গেই এর মতো। ফোন যদিও অকেজো। নো সিগন্যাল।

এই করে চল্লিশ মিনিট পার হয়ে যায়। তবু ফেরে না সাংগে আর স্টেলা। রণিতা ভাবে, হোটেলে গেল নাকি! আগুনও প্রায় নিভে এসেছে। কাঠও শেষের মুখে। অথচ...

গ্রামের অন্ধকার গলিপথে হঠাৎ টর্চের আলো দেখা যায়। সাংগে আর স্টেলা ফিরছে। সঙ্গে আরও চার-পাঁচ জন লোক। তারা বিয়ারের ছ'টা কার্টন বয়ে এনেছে। ব্যাগে ঠাসা চিপস ভুজিয়া চানাচুর... এক জনের পিঠে এক বোঝা জ্বালানি কাঠ। সাংগের পিঠে গিটার।

এক জনকে দেখিয়ে সাংগে বলে, "ইনি গ্রামের মুখিয়া। কিছু বলবেন।"

মুখিয়া মাঝবয়সি ভুটানি ভদ্রলোক। যথারীতি 'ঘো' পরিহিত। সঙ্গে জুতো মোজা। হাতে একটা খাতা। তিনি বলেন, "আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের সুখ সুবিধে দেখা আমাদের কর্তব্য। এখানে এনজয় করুন। কোনও অসুবিধে নেই। শুধু দেখবেন গ্রামের লোকে যেন কোনও কমপ্লেন করার সুযোগ না পায়। গুড নাইট।"

মুখিয়া একাই ফিরে যান। বাকিদের সাংগে পয়সা দেয়। তারা বলে যায়, একঘণ্টা পরে খাবার দিয়ে যাবে। রণিতা বলে, "কী খাবার?"

"জাসা মারু অ্যান্ড রেড রাইস।"

"হোয়াট ইজ় জাসা মারু?"

"স্পাইসি চিকেন।"

সাংগে নিজেই আগুনে কিছু কাঠ গুঁজে দেয়। আগুন আবার চাঙ্গা হয়। বিয়ারের বোতল তুলে নিয়েছে যে যার মতো। ফলে মানুষগুলোও চাঙ্গা। এ বার সাংগে নিজেই স্টেলার পাশে বসে হারুকিকে বলে, "তার পর কী হল শয়তানটার?"

"তার পর শয়তান তো পালাল মেয়েটাকে ছেড়ে। আর মেয়েটা নাকি বিয়ে করে সেই কামারকে। পরে সেই লোহার পুরুষাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় একটা মন্দিরে। সেই মন্দিরটার নাম হলো কানায়াম মন্দির। প্রতিবছর এখানে উৎসব হয়। কানামারা মাৎসুরি। লৌহ পুরুষাঙ্গের উৎসব। ফেস্টিভাল অব দ্য আয়রন ফেলাস।"

আর সবার মতো রণিতাও অবাক হয়ে গল্প শোনে। সে বলে, "সেই উৎসবে কী হয়?"

"উৎসবে শোভাযাত্রা বেরোয় 'মিকোশি' নিয়ে। মিকোশি মানে কাঠের ছোট মন্দির, যা লোকে বহন করে কাঁধে তুলে। আর সেই মন্দিরে থাকে আট-দশ ফুটের বিরাট পুরুষাঙ্গ। বেশ কয়েকটা। এল জি বি টি আর যৌনকর্মী ছাড়াও আজকাল হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যোগ দেয় উৎসবে। পুরুষাঙ্গের আদলে তৈরি হরেক রকম জিনিস পাওয়া যায় মেলায়। টুপি জামা স্মারক।"

ড্যারেল বলে, "তুমি গেছ ওখানে?"

হারুকি বলে, "হ্যাঁ। কাইতোর তো বাড়িই ওখানে। কাওয়াসাকিতে। যদিও এখন কাইতো টোকিওতেই থাকে।"

"কবে হয় বলো তো? নেক্সট ইয়ার ওখানেই দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।"

স্টেলা বলে, "আমার নামটাও লিখে নাও। আর সাংগেরটাও।"

সাংগে বলে, "আরে না না। আমি যাব না।"

"কেন যাবে না? ওখানে তো তোমারই যাওয়া দরকার সবার আগে।"

"কেন?"

"তা হলে বুঝতে পারবে জিনিসটার পেটেন্ট তোমরা নিয়ে রাখোনি। আরও নানা জায়গায় হয় তার পুজো।"

রণিতার রাগ ধরে যায় স্টেলার আদিখ্যেতা দেখে। কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে সাংগের জন্য। কী জানি সাংগেটা কী ভাবছে। নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দিয়েছে। চল্লিশ মিনিট অন্ধকারে... সে স্টেলাকে বলে, "তা হলে তুমি বাড়ি ফিরে এই রকম একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরো তোমার দেশে।"

"অফকোর্স। আর সাংগেই হবে সেই মন্দিরের পুরোহিত।"

বিয়ারের বোতলেই কামড় বসিয়ে দেয় রণিতা। রাগে। লোহার একটা পেলে ঢুকিয়ে দিত স্টেলার মুখে। দাঁত ভেঙে মরত শয়তান মাগিটা।

কথা আর বাড়ল না। কারণ তখনই চলে এল জাসা মারু আর লাল

ভাত। ভাতের দিকে কেউ হাত বাড়াল না। চিকেন সবাই তুলে নিল একটা দুটো করে। সঙ্গে বিয়ারের নতুন বোতল।

জেসন আবার গান ধরল। এ বার সাংগের গিটার বাজিয়ে। আগুনে কাঠ দিল কাইতো। তার বোধ হয় বেশি শীত করছে। কারণ সে বিয়ার খাচ্ছে না। আরা আর অবশিষ্ট নেই পেটে। বিয়ার তার সহ্য হয় না। সে কথা বলছিল সাংগেকে। সাংগে আরার অর্ডার দিয়ে এসেছে গ্রামে।

ঝাল চিকেন আসার পর বিয়ারে নতুন জোয়ার এল। সকলেই চিকেন দিয়ে বিয়ার খেতে লাগল সোৎসাহে। এমন ঝাল ভুটানি রান্না, রণিতা ভেবেছিল কেউ বোধহয় খেতেই পারবে না। কিন্তু দেখা গেল সকলেই দিব্যি খাচ্ছে। জেসন তো হাতায় তুলে ঝোলও পান করছে। শিল্পী মানুষ!

চিকেন-পর্ব শেষ হতে কিছু ক্ষণ সময় লাগলো। ভাত রয়ে গেল অধরাই। জাসা মারু শেষ। বিয়ারের অবশ্য অভাব নেই। চাখনাও আছে অফুরান। সুতরাং কারও কোনও চিন্তা নেই। ড্যারেল হঠাৎ বলল, "তা হলে ডিকে একাই জিনিসটার পেটেন্ট নিয়েছে এমন নয়।"

স্টেলা হাত পা নেড়ে জিভ ছড়িয়ে বলল, "নো নো। ইটস নট ইয়েট পেটেন্টেড।"

ভাদিম বলে, "ক্যান ইউজ় ফর ফ্রি?"

হাসির রোল ওঠে। স্টেলা বলে, "ফ্রি ফ্রি ফ্রি।"

ড্যারেল বলে, "আচ্ছা এমন গল্প আর কারও জানা আছে। লাইক কানামারা মাৎসুরি। চিমি লাখাং?"

এই প্রশ্নের উত্তর এত এল যে এতটা আশা করেনি কেউ। মোটামুটি গোটা বিশ্বের খবর পাওয়া গেল। আর জানা গেল, জাপানে এমন মন্দির উৎসব অন্তত চার জায়গায় আছে। এ ছাড়া কোরিয়া থাইল্যান্ড মঙ্গোলিয়া... এমনকি ইরানেও এমন নিদর্শন নাকি আছে। আর ইন্ডিয়ার তো কথাই নেই। মন্তব্যটা অবশ্য ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি রণিতা করেনি। করেছে স্টেলা। সুতরাং প্রতিক্রিয়া রণিতাই দেখায়, "কেন, এ কথা বলছ কেন?"

স্টেলা বলে, "খাজুরাহো! খাজুরাহো!"

"খাজুরাহোটা শিল্পকলা। স্কাল্পচার।"

"নো ডাউট। কিন্তু তার সাবজেক্ট? পিয়োর সেক্সুয়ালিটি। ইভেন গ্রুপ সেক্স! ইন দোজ় ডেজ়!"

"বাট দ্যাট ডাজ় নট রিপ্রেজ়েন্ট দ্য সোসাইটি। ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল সেকালের রাজাদের মধ্যে। যারা ব্যক্তিগত বেশ্যালয় বানিয়ে রাখত নিজের বাসগৃহে।"

"হোয়াটএভার! ইট হ্যাপেন্স ওনলি ইন ইন্ডিয়া।"

"না। তা কেন..."

কথা আবার এখানেই থেমে যায়। কারণ কাইতোর জন্য সুখবর আসে। অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান ভর্তি আরা। লিটার তিনেক হবে। মানে সবারই হয়ে যাবে। সঙ্গে কয়েক ডজন ডিম সেদ্ধ।

বিয়ার ফেলে এ বার সবাই আরা খেতে চায়। ঢেলে খাওয়ার জন্য কাগজের গ্লাস এনেছে। সাংগের কাছে পয়সা নিয়ে চলে যায় লোকটি।

কাইতো এক ফোঁটা বিয়ার ছোঁয়নি। তাই আরা তার জন্য। একটা খালি বিয়ারের বোতলে ভরে আরা দেওয়া হয় কাইতোকে। বাকিটা সবার। সকলেই নেশার মধ্যে আছে। তবুও আরার ভাগ কেউ ছাড়ে না। বিয়ার তো বাড়ি গিয়েও পাওয়া যাবে। কিন্তু এগ ভদকা একমাত্র ভুটানেই মেলে। আর ভুটানে বারবার আসা যায় না। দেশটা এখনও আংশিক নিষিদ্ধই আছে। কিন্তু তার ভেতরে যে এত উদারতা, আগে কেউ ভাবতে পারেনি।

আরও নানা হাসি ঠাট্টার কথা হয়। সবাই হাসে। কারও হাসি থামতেই চায় না। সাংগে কোনও শব্দ করে না। তার ছড়ানো হাসি লেগে থাকে তার বেরিয়ে আসা সাদা দাঁতের সারিতে। বুজে যাওয়া দুটো চোখের সঙ্কীর্ণ চেরা পথে। হয়তো আরা আর বিয়ারের ভূমিকা আছে তাতে। আগুনের লালচে আভায় অলৌকিক দেখাচ্ছে তার মূর্তি। যতই রসিকতা করে ডিকে বলে বাকিরা ডাকুক তাকে।

ড্যারেল তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "হেই ডিকে! আর ইউ ইন আ ফ্যান্টাসি?"

আবার হেসে ওঠে সবাই। যদিও তার কোনও প্রভাব পড়ে না সাংগের ওপর। সে তেমনই বসে থাকে আগুনের সামনে। শিরদাঁড়া সোজা করে পদ্মাসনে।

কে যেন বলে, "লাফিং বুদ্ধা!"

ব্যাপারটা পছন্দ হয় না রণিতার। মনে হয় সাংগের সম্মানহানি হচ্ছে। তাই সে উঠে যায় তার কাছে। ধাক্কা দিয়ে তার ধ্যান ভাঙাবে বলে। কিন্তু কাছে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে রণিতা। আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে যায় তার শিরদাঁড়া দিয়ে।

সাংগের দু'চোখের সরু ফালি দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। লাল হলুদ আগুন।

সাংগেকে স্পর্শ করতে তার আর সাহস হয় না। পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যায় সেই আগুন। রণিতা অবাক চোখে তাকায় বাকিদের দিকে। কিন্তু কেউ দেখেছে বলে মনে হচ্ছে না। ফিরে এসে চুপচাপ বসে পড়ে নিজের জায়গায়। তাকিয়ে থাকে সাংগের দিকে। তার সেই মুখভাব তেমনই স্থির। যেন নিরেট ভাস্কর্য কোনও। রণিতার ভেতরটা কেমন হু হু করতে থাকে। বেঞ্চের ওপর সোজা হয়ে সে বসতে পারে না। নেমে আসে মাটির উপর। ধুলো মাটির ওপর থেবড়ে বসে দুটো পা সামনে ছড়িয়ে। চোখ নিবদ্ধ সাংগের ওপর। বিশেষ করে তার চোখ দুটোর ওপর। আবার যদি চোখে পড়ে সেই আগুন। সাংগের নিজস্ব আগুন। বাকিদের দেখাতে পারবে তক্ষুনি ডেকে। সেই প্রত্যাশা নিয়ে প্রস্তুত হয় রণিতা। কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে। যেন এটা তার কর্তব্য। তার ডিউটি।

কিন্তু আর কিছুই ঘটল না। রণিতা অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিয়ারের একটা নতুন বোতল খুলে বসল আগুনের কাছে। ভুলেই গেল সাংগে আর তার আগুনকে। সে আর তাকাচ্ছে না সাংগের দিকে।

আচমকাই তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসে জঙ্গলের দিক থেকে। সকলেই চমকে উঠে সে দিকে তাকায়। স্টেলা গেছিল বাথরুম করতে। সে-ই দৌড়ে ফিরে আসছে চিৎকার করতে করতে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ আগুন পেরিয়ে ও পাশে, সাংগের দিকে। বাহু প্রসারিত সেদিকেই। প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে কাঁপতে কাঁপতে বলছে, "ও মাই গড! ও মাই গড! ও মাই গড!"

সাংগের কাছাকাছি এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় বড় চোখ করে সে চেয়ে আছে সাংগের দিকে। চোখেমুখে আতঙ্ক। তার গোটা শরীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে থরথর করে। রণিতাই সবার আগে উঠে গিয়ে ধরে স্টেলাকে। সে রণিতাকে আঁকড়ে ধরে নিজের ধরাশায়ী হওয়া রোধ করে। আরও বেশ কয়েক জন এসে পড়ে স্টেলার কাছে। সবার বিস্মিত প্রশ্ন, "হোয়াটস দ্য ম্যাটার?"

স্টেলা বিস্ফারিত চোখে সাংগের দিকে তাকিয়ে বলে, "হি ওয়াজ় ইন দ্য এয়ার!"

"হোয়াট! কী বললে?"

"আই সোয়্যার। সত্যি আমি দেখলাম। ও দিকে বাথরুম সেরে যেই এ দিকে ফিরেছি, দেখি সাংগে বসে বসেই শূন্যে ভাসছে।"

"কই, এখন তো ভাসছে না!"

"না। আমি চিৎকার করতেই ও ধীরে ধীরে নেমে এল। তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তাই দেখতে পাওনি।"

সবাই আবার সাংগের দিকে ফিরে তাকায়। তার সেই লাফিং বুদ্ধা মুখভাব তখনও একই রকম। দাঁতের সারি। চোখের চেরা ফালি। যেন জীবন্ত ভাস্কর্য একটা। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল তাকে নিয়ে, যেন সে সবের কিছুই সে জানে না।

সের্গেই হঠাৎ বলে, "হি ইজ় অ্যাস্লিপ, ম্যান। লুকস লাইক ওভারডোজ়। হেই রানি, ওয়েক হিম আপ।"

কিন্তু রণিতা সাংগেকে ডাকার সাহস দেখায় না। উল্টে সে বলে, একটু আগে সেও এক অলৌকিক কাণ্ড দেখেছিল তার মুখে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল।

"অল বুলশিট! ছাড়ো! সরো!"

বলতে বলতে সাংগের দিকে এগিয়ে যায় ড্যারেল। তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সরিয়ে নেয় হাত। যেন বিদ্যুতের ঝটকা লেগেছে। কিংবা তীব্র ছ্যাঁকা।

অনেকগুলো আতঙ্কিত কণ্ঠ এক সঙ্গে বলে, "কী হল?"

ড্যারেল স্থির হয়ে আছে মূর্তির মতো। চেয়ে আছে সাংগের দিকে। হাত তখনও তার উঁচু করা। ওই অবস্থাতেই সবার মুখগুলো সে দেখে নেয়। তার পর ধীরে ধীরে সে স্পর্শ পরে সাংগের কাঁধ। কিন্তু এ বার আর সে হাত সরিয়ে নেয় না। সবই স্বাভাবিক মনে হয়। সে বিড়বিড় করে বলে, "ইটস ওকে! ইটস ওকে! রিল্যাক্স!"

গোটা পর্বে সাংগে একই রকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বসে থাকে। যেন সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা সমাধিস্থ হয়েছে ওখানে বসেই। তাই তাকে জাগিয়ে তুলতেও বেশ বেগ পেতে হয় ড্যারেলকে। রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করতে হয় বেশ কিছু ক্ষণ ধরে। তার পরই হঠাৎ সাংগে ধড়মড়িয়ে ওঠে। উঠেই পালানোর উপক্রম করে। পর ক্ষণেই আবার ধাতস্থ হয়ে থেমে যায়। শান্ত চোখে তাকায় সবার দিকে যারা বিচিত্র মুখভাব করে পাল্টা চেয়ে আছে তার দিকে। সে অবাক হয়ে বলে, "হোয়াট? হোয়াই আর ইউ অল স্টেয়ারিং অ্যাট মি?"

"ডোন্ট নো হোয়াই?"

"নো।"

ভাদিম তার সামনে বসে পড়ে বলে, "এই মেয়েগুলো বলছে তোমাকে শূন্যে ভাসতে দেখেছে। তোমার চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল। তুমি কী বলো এ ব্যাপারে?"

সাংগে বিস্মিত মুখে ঘুরে ফিরে তাকায় সবার দিকে। যেন সে বুঝতেই পারছে না ভাদিম কী বলছে। সে কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে, "এ সব তুমি কী বলছ, ভাদিম?"

ভাদিম আরও গলা তুলে বলে, "সেটাই তো জানতে চাইছি। এরা এ সব কী বলছে! তুমি কি সত্যিই শূন্যে ভাসছিলে? চোখ দিয়ে আগুন বার করছিলে?"

সাংগে বলে, "কে বলেছে এ সব?"

"এই যে! স্টেলা বলেছে। রানি বলেছে।"

সাংগে বিস্মিত চোখে এক বার তাকায় রণিতার দিকে। এক বার স্টেলার দিকে। তার পর হেসে বলে, "আই আন্ডারস্ট্যান্ড!"

"আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট?"

সাংগে বলে, "দিস ইজ় আরা এফেক্ট! আরা এফেক্ট!"

"আরা এফেক্ট?"

"ইয়েস।"

সাংগে ওদের বোঝানোর চেষ্টা করে, আসলে ও সব কিছুই ঘটেনি। আরার ওপর বিয়ার আর বিয়ারের ওপর আরা, তার পর আবার বিয়ার পড়ে মাথার ভেতর এক ধরনের ভ্রম তৈরি হয়েছে। যেমনটা হয়ে থাকে ড্রাগের নেশায়। তারই প্রভাব পড়েছে মেয়ে দুটোর ওপর। সাংগে জোর দিয়ে বলে, "নাথিং বাট হ্যালুসিনেশন।"

এই যুক্তি সকলে মেনেও নেয়। এমনকি হালকা ধমকও দেয় ভাদিম মেয়েদুটোকে। রসিকতা করে বলে,

"আর একটু টানো, দেখবে আমরা সবাই হাওয়ায় ভাসছি। লাইক এঞ্জেলস অব আরা। হা হা হা..."

হাসিতে উদার ভাবে যোগ দেয় সবাই। একটু যেন বেশিই বেসামাল হয়ে। আচমকাই মনের ভেতর ঢুকে আসা তালকাটা ভাবটা সবাই সরিয়ে ফেলতে চায় জোর করে। রাত এখনও অনেকটা বাকি।

স্টেলা তেমন করে যোগ দেয় না হাসিতে। রণিতাও না। কেমন বোকা বনে যাওয়ার মতো ভাব করে তারা চেয়ে থাকে সাংগের দিকে। দেখা যায় ড্যারেলও চুপ করে বসে আছে বেঞ্চের ওপর। হাতে বিয়ারের বোতল। মাথা নিচু করে। রণিতা তার কাছে গিয়ে বসে। চাপা স্বরে কানের কাছে বলে, "ড্যারেল!"

ড্যারেল মুখ তুলে তাকায়। তার দু'চোখে কোনও কৌতুক নেই। মৃদুস্বরে সে বলে, "আই বিলিভ ইউ।"

"ইউ ডু?"

"ইয়া।"

"হোয়াই?"

ড্যারেল বলে, "আমি যখন ওকে প্রথম বার ছুঁলাম জোর ঝটকা খেলাম। লাইক ইলেকট্রিক শক।"

"হুমম্!"

"কিছু একটা ব্যাপার আছে ওর মধ্যে।"

হঠাৎ হারুকি গলা তুলে বলে, "লিসন গাইজ়, আমার একটা কথা বলার আছে। রাত বারোটা বাজতে আর কয়েক সেকেন্ড বাকি। ঠিক বারোটায় আমি আমার লেডিকে কিস করব। আশা করি কেউ আপত্তি করবে না।"

কথাগুলো বলে হারুকি একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসে। মঞ্চে ওঠার মতো ভঙ্গি করে। তার ইশারায় উঠে আসে কাইতো। দু'জনে একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভাবেই।

হঠাৎ সোরা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "কাম অন সের্গেই।"

আর চুম্বনে আবদ্ধ হয় সোরা আর সের্গেই, হারুকি আর কাইতোর পাশেই। অ্যামেলিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আই অ্যাম ফ্রি গাইজ়। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড।"

আর অমনি পড়ি কি মরি করে ভাদিম দৌড়য় তার কাছে। দু'জনে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে চুম্বন উদযাপন শুরু করে।

স্টেলা রণিতাকে কাঁধ দিয়ে হালকা ধাক্কা মেরে সাংগেকে দেখিয়ে বলে, "উইল ইউ গো আর শ্যাল আই?"

রণিতা উদার চোখে স্টেলার দিকে তাকিয়ে বলে, "গো অ্যাহেড।"

"থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ!"

বলতে বলতে স্টেলা ছোট ছোট কৌতুকপূর্ণ কদম ফেলে এগিয়ে যায় সাংগের দিকে। তার পর সাংগে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার কোলে বসে গভীর ভাবে চুমু খায় তাকে। রণিতাও হাততালি দেয়। সাদা মনেই দেয়। গিটার বাজিয়ে গান ধরে জেসন, "কাম অ্যান্ড সিট বাই মাই সাইড/ ইফ ইউ লাভ মি/ ডু নট হেসেন টু বিড মি অ্যা ডিউ/ বাট রিমেম্বার দ্য রেড রিভার ভ্যালি।"

রণিতা গিয়ে বসে জেসনের পাশে। তার দিকে নরম করে তাকিয়ে হাসে। জেসনও হাসে গানের মধ্যেই। তার দাড়ি আছে তামাটে। এখন আগুনের ছটায় ব্রোঞ্জের মতো লাগছে। গোটা মুখটাই যেন ব্রোঞ্জের গ্রিক ভাস্কর্য। আগে বুঝতে পারেনি রণিতা। এখন কাছ থেকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স ভীষণ কম। সবার চেয়ে ছোট বোধহয় এখানে।

গান শেষ হলে রণিতা বলে, "নাইস সং। কার গান গো?"

"মাইকেল মার্ফি।"

"ওহ্!""

জেসন হঠাৎ বলে, "ইউ আর সো বিউটিফুল, রানি!"

"থ্যাঙ্কস।"

তার পর সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে জেসন বলে, "মে আই কিস ইউ?"

রণিতা খানিক হকচকিয়ে যায়। তার পর শান্ত স্বাভাবিক স্বরে বলে, "শিওর।"

জেসন কিস করে রণিতাকে। তবে ওদের মতো গভীর নয়। প্রবল তো নয়ই। খুবই হালকা। যেন স্নেহ চুম্বন। সরেও যায় সঙ্গে সঙ্গে। রণিতা বলে, "এইটুকু?"

জেসন হেসে বলে, "ওয়ান্ট মোর?"

"নো থ্যাঙ্কস।"

ও দিকে চুম্বন পর্ব তখনও চলছে। আরও তা প্রগাঢ় হয়েছে। আরও সাহসী। বিশেষ করে অ্যামেলিয়া আর ভাদিম। তারা চুম্বনের পরবর্তী ধাপে পৌঁছে গেছে। ভাদিমের হাত দুটো বিভ্রান্তের মতো হাতড়ে চলেছে অ্যামেলিয়ার গোটা শরীর। অ্যামেলিয়াও উদারভাবে ঢেলে দিচ্ছে প্রশ্রয়। তার হাত দুটো যেন ভাদিমের হাত দুটোর পথপ্রদর্শক।

হারুকি আর কাইতোর কোনও অস্থিরতা নেই। তারা যেমন শুরু করেছিল প্রায় তেমনই আছে এখনও। দেখে মনে হয় তেমনই থাকবে অনেক ক্ষণ।

সের্গেই আর সোরা যেন এক দ্বৈরথে নেমেছে। কে বেশি আদর দেখাতে পারে। ভীষণ জমেছে তাদের রসায়ন। অথচ কোনও ছ্যাবলামো নেই।

সাংগে আর স্টেলাকে দেখে মনে হচ্ছে মা আর শিশু। সাংগে সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিচ্ছে। আর স্টেলা তার পরীক্ষা নিচ্ছে ভরপুর। সাংগের গলা ধরে এক রকম ঝুলে ঝুলে সে তাকে আদর করছে। সাংগে আবার ফিরে গেছে তার লাফিং বুদ্ধা মুদ্রায়। যেন সে এক পার্কে বসানো মূর্তি। ঝুলোঝুলির জন্যই তৈরি করা।

জেসন আবার গান ধরেছে, "আই অ্যাম আ ম্যান অব মিনস বাই নো মিনস/ কিং অব দ্য রোড..."

ড্যারেল একমাত্র যে কাউকে কিস করেনি এখনও। যেন তার আগ্রহও নেই। পা ফাঁক করে বেঞ্চে বসে আছে গোটা শরীর সামনে ঝুঁকিয়ে। দু'পায়ের মাঝে হাতে ঝুলছে একটা বিয়ারের বোতল। সেই রণিতাকে বলেছিল, 'আই বিলিভ ইউ'। রণিতা তার কাছে গিয়ে বসবেই ভাবছিল, হঠাৎ সে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। সামান্য গলা তুলে বলে, "ওকে গাইজ়। নাও এন্ড দিস।"

কিন্তু কেউ কর্ণপাত করে না। তখন সে কাছে গিয়ে টেনে টেনে জোড় গুলোকে ছাড়াতে থাকে। সাংগের কাছ থেকে স্টেলাকে। সোরার কাছ থেকে সের্গেইকে আর কাইতোকে...। হঠাৎ খেয়াল হয় একটা জোড়া নেই সেখানে। ভাদিম আর অ্যামেলিয়া। খানিক উত্তেজিত হয়ে সে বলে, "হোয়ার্স ভাদিম অ্যান্ড অ্যামি?"

জেসন গিটার নামিয়ে রেখে বলে, "গন!"

"গন হোয়্যার?"

জেসন জঙ্গলের দিকে ইশারা করে সামান্য কৌতুক মিশিয়ে বলে, "ইনটু দ্য ডার্ক!"

ড্যারেল সে দিকে ফিরে তাকায়। বুঝতে পেরে সেও হাসে সামান্য। নিজের মনেই বলে, "লং লিভ ডিকে!"

আবার যে যার জায়গায় ফিরে বসেছে। বিয়ার তুলে নিয়েছে হাতে। কেউ কেউ ডিমও। সাংগে তেমনই বসে আছে মাটিতে। লাফিং বুদ্ধা মেজাজ থেকে বেরিয়ে এসে সেও ডিমের খোসা ছাড়াচ্ছে। স্টেলা তার পাশেই বসে আছে মাটিতে। মাটিতে বসেছে সের্গেই আর সোরাও। পাশাপাশি। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে বনের দিকে। দেখছে ভাদিম আর অ্যামি ফিরল কি না। হয়তো ভাবছে বুদ্ধিটা মাথায় আগে এলে তারাও যেতে পারত। এখন ড্যারেলটা আর যেতে দেবে না।

জেসন গিটারটা সাংগের হাতে দিয়ে বলে, "একটা গান শোনাও।"

সাংগে বিনা বাক্যব্যয়ে শুরু হয়ে যায়, "জব কোই বাত বিগড় যায়ে/ জব কোই মুশকিল পড় যায়ে..."

হয়তো গানটা কেউ বোঝে না। কিন্তু সুরটা শুনে কান খাড়া করে সবাই। একদমই যে চেনা সুর। পাশ থেকে স্টেলা গলা মেলায়, "ইফ ইউ মিস দ্য ট্রেন আই অ্যাম অন/ ইউ উইল নো দ্যাট আই অ্যাম গন/ ইউ ক্যান হিয়ার দ্য হুইসেল ব্লো/ এ হান্ড্রেড মাইলস..."

সাংগের গিটারের বিটসের সঙ্গে হিন্দি ইংরেজি লিরিক এমন মিশে যায়, যেন এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ চুম্বন সেটাই। থাকতে না পেরে গলা মেলায় জেসনও। সে-ই হাতের ইশারায় গলা মেলাতে বলে বাকিদেরকেও। আর একে একে সবাই গাইতে শুরু করে গানটা। সাংগে আর রণিতা হিন্দিটা গায়। বাকিরা ইংরেজি। আর জাপানি জোড়া তালে তালে নাচতে থাকে একে অপরের কাঁধ কোমর ধরে।

এত জমে যায় ব্যাপারটা যে কেউ আর থামতেই চায় না। গান শেষ হতেই আবার কেউ না কেউ ধরে ফেলে শুরু থেকে। আর সানন্দে শুরু হয়ে যায় সবাই। একই গান বারবার বারবার। কত বার যে তারা গায়, তার ঠিক নেই। ক্রমশ যোগ হতে থাকে সঙ্গত। হাততালি দেয়। কাঠের বেঞ্চি। বিয়ারের বোতল। সঙ্গে গিটার। আশ্চর্য এক অর্কেস্ট্রা যেন দানা বাঁধে দাউ দাউ আগুন ঘিরে। ক্লান্তি নেই হারুকি আর কাইতোর। নেচেই চলে তারা আগুনের লাল সোনালি আভা গায়ে জড়িয়ে। কারও খেয়ালই নেই যে ভাদিম আর অ্যামেলিয়া জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি।

ড্যারেলই আবার নেতার ভূমিকা নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়। দু'হাত তুলে অর্কেস্ট্রা থামাতেই যাচ্ছিল হঠাৎ তার পেছনে চাপা আর্তনাদ ওঠে। পিছন ফিরে দেখে অ্যামেলিয়া এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁটের ওপর হাত রেখে চাপাস্বরে বলছে, "ও মাই গড! ও মাই গড!"

ভাদিম কিছু না বললেও, তারও চোখেমুখে আতঙ্কিত বিস্ময়। দু'জনেই চেয়ে আছে সাংগের দিকে। ড্যারেল বলে, "হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

অ্যামেলিয়া বলে, "সাংগে!"

"সাংগে হোয়াট?"

"ওকে যে দেখলাম জঙ্গলে! আমাদের থেকে একটু দূরেই ছিল একটা মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটাকে চিনতে পারিনি। ভাবলাম স্টেলা বা রানি হবে। কিন্তু সবাই তো এখানেই আছে দেখছি। কত ক্ষণ আছে?"

ড্যারেল বলে, "প্রথম থেকেই আছে। সাংগেই তো লিড দিচ্ছে আগাগোড়া।"

বিভ্রান্ত অ্যামেলিয়া। ভাদিমও একমত অ্যামেলিয়ার সঙ্গে। জঙ্গলে সাংগেই ছিল। এই ন্যাড়া মাথা, এই বেশবাস তো আর গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। যতই অন্ধকার থাক। ড্যারেল বলে, "চলো দেখে আসি।"

"আমার ভয় করছে।"

"তুমি বোসো। আমি আর ভাদিম যাচ্ছি।"

অ্যামেলিয়া বসে বসে গান শোনে। ড্যারেল আর ভাদিম চুপচাপ এগিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে। মোবাইলের টর্চ জ্বেলে।

নিজেদের জায়গাটা দেখিয়ে ভাদিম বলে, "আমি আর অ্যামি এইখানটা ছিলাম। আর এই বোল্ডারটার ও পাশে সাংগে...। আরে ওই তো! দেখো দেখো নড়ছে!"

উত্তেজনায় ধরে আসে ভাদিমের গলা। দু'জনেই মোবাইলের টর্চের আলো ফেলে বোল্ডারটার দিকে। আর সত্যি সত্যিই ও পাশে কিছু নড়ছে মনে হয়। অন্ধকারে মিশে আছে মিশকালো কোনও জীব। আলো পড়ে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে চারটে চোখ।

সেই দিকে আলো ধরে আরও কয়েক পা এগিয়ে যায় ড্যারেল। আর দেখে সত্যিই সেখানে দুটো জীব সঙ্গমরত। তবে মানুষ নয়। দুটো রোমশ কুকুর। মিশকালো। এত বড় যে ভাল্লুক মনে হয়। ড্যারেলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে দেখছে। আর তীক্ষ্ণ দাঁত বার করে চাপাস্বরে হুমকি দিচ্ছে, গরর...গরর...!

হাড় হিম হয়ে যায় ড্যারেলের। ধীরে ধীরে সে পিছন পায়ে সরে আসে তাদের কাছ থেকে। জঙ্গলের বাইরে এসে ভাদিমকে চাপা গলায় বলে, "তোমার সাংগে মনে হল?"

ভাদিম নিজের টুঁটি চেপে ধরে বলে, "আই সোয়্যার। আমি কথাও বলেছিলাম ওর সঙ্গে। রসিকতা করে বললাম, 'হেই ডিকে, গট ইট?'"

"উত্তর দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলেছিল?"

"কী বলেছিলাম মনে পড়ছে না। তবে রেসপন্স করেছিল। হান্ড্রেড পার্সেন্ট।"

দু'জনে ফিরে এসে পাশাপাশি বসে। তখনও একই গান চলছে। সোরা গলা তুলে বলছে, "ইটস ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস, গাইজ়। লং লং ওয়ে টু গো। নেভার থিঙ্ক অব স্টপিং। নেভার নেভার।"

ড্যারেল চাপা গলায় বলে, "হোয়াট ডু ইউ থিংক? এনি মিস্ট্রি?"

"রহস্য তো আছেই। ও পুরো মানুষ নয়। হয় ভগবান, নয় শয়তান।"

"অর এ ব্লেন্ড অব অল থ্রি।"

"আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।"

"মেয়েগুলোর উপর নজর রেখো।"

"রানি তো ওর সঙ্গেই এসেছে।"

"না। রাস্তায় আলাপ দিন কয়েক আগে।"

"রানি বলল?"

"হ্যাঁ।"

এই সব আলোচনা যাকে নিয়ে সে তখন আনন্দে বিভোর। হিন্দি ছেড়ে এখন সেও ইংরেজি ধরেছে, "লর্ড আই অ্যাম ওয়ান, লর্ড আই অ্যাম টু/ লর্ড আই অ্যাম থ্রি, লর্ড আই অ্যাম ফোর..."

ড্যারেল বলে, “শুনছ গানের কথাগুলো?”

ভাদিম বলে, “গানটা কে বেছেছে?”

“ও নিজেই, আবার কে!”

“হুম। ইচ্ছে করেই মনে হচ্ছে।”

“হুম। বার্তা দিচ্ছে।”

টেনশনে নতুন বোতল খোলে ড্যারেল। ভাদিমও। একদমে আধ খালি করে দু’জনেই। তার পর ভাদিম বলে, “ভুটানের ভ্যাম্পায়ার!”

ড্যারেল হেঁচকি তুলে কেশে ওঠে। বিস্ফারিত চোখে তাকায় ভাদিমের দিকে। উত্তেজনা চাপার চেষ্টা করে বলে, “তোমার মাথায় এল কথাটা?”

“হ্যাঁ। ভাম্পায়ার অথবা ওয়্যার উল্ফ। ওগুলো আসলে কুকুর নয় নেকড়ে। ওরই আসল রূপ!” কথাগুলো বলতে বলতে ভাদিম উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

ড্যারেল বলে, “হেই ভাদিম! কাম ডাউন! কাম ডাউন! ইউ আর গোয়িং টু ফার। লুক অ্যাট হিম। সাচ ইনোসেন্ট ফেস। মনে হয় ও ভ্যাম্পায়ার কি ওয়্যার উল্ফ হতে পারে?”

“ইনোসেন্ট ফেস! ওটাই তো চিন্তার বিষয়।”

তার পর হঠাৎ বলে, “স্টেলাকে ডাকো তো! ওকে কিস করছিল না! দেখো ওর ঘাড়ে গলায় কোনও কামড়ের দাগ টাগ...”

“স্টপ ইট ভাদিম। টকিং বুলশিট। কী যা তা বকে যাচ্ছ। চুপ করে বোসো।”

ভাদিম নিজের হাতের তালু দিয়ে মুখ ঘষতে থাকে বারবার। থমথম করছে মুখটা। চোখটা কেন জানি ছলছলে । হয়তো আতঙ্কে। ড্যারেল ভাবে, এর সঙ্গে আর এ ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়। তাই সে উঠে গিয়ে অ্যামেলিয়ার পাশে বসে। সে তখন ভয় ভাবনা কাটিয়ে গান ধরছে অল্প অল্প। ড্যারেল ভাবে, সেই ভাল। সেও বসে বসে বিয়ারের বোতল বাজায় আংটি ঠুকে ঠুকে।

আরা আর বিয়ারের সম্মিলিত দমের জোরে পাঁচশো মাইলের গানের দূরত্ব মনে হচ্ছিল শেষ করেই ছাড়বে ওরা।

রাত ভোর হওয়ার আগেই কিন্তু হঠাৎই ছেদ পড়ে যায় সাংগে গিটার নামিয়ে রাখায়। তাকে চাগানোর চেষ্টা করে কয়েক জন। কিন্তু পারে না। হারুকি আর কাইতোও নাচ থামিয়ে বসে পড়েছে। সাংগে গিটারটা জেসনের দিকে বাড়িয়ে বলে, “প্লিজ় প্লে দ্য নেক্সট।”

জেসন গিটার বাগিয়ে ধরে টুংটাং করতে থাকে। পরিশ্রান্ত শিল্পীরা বিয়ারে চুমুক দিতে থাকে। সাংগে উঠে হাঁটা দেয় জঙ্গলের দিকে। কাউকে কিচ্ছু না বলে। দেখে ভাদিম ছুটে আসে ড্যারেলের কাছে। চাপা স্বরে বলে, “লুক!”

“নজর রাখো। চুপচাপ।”

দু’জনে নজর রাখে জঙ্গলের দিকে। বারবার তাকায় পিছন ফিরে। হিসেব রাখে এক একটা মিনিটের। আর উত্তেজনায় তাদের দম আটকে যাওয়ার অবস্থা হয় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। বিশেষ করে ভাদিমের। খেয়াল করলে তার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখতে পেত যে কেউ। কিন্তু এখানে সবাই নেশাগ্রস্ত। রাত পেকে রঙিন। শেষে ড্যারেলই ওকে বলে, “চলো, এগিয়ে দেখি।”

ভয়ে ভয়ে হলেও ভাদিম রাজি হয়। আর দু’জনে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায় কয়েক পা। ওখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করে আরও মিনিট পাঁচেক। তবু সাংগে ফেরে না। পেচ্ছাপ করতে একটা মানুষের কত ক্ষণ লাগে! পায়খানা করতেও লাগার কথা নয় এত সময়। শেষে ড্যারেল বলে, “মোবাইলের টর্চ জ্বালাও। চলো, আর একটু যাই।”

দুটো মোবাইল টর্চের আলো কাঁপতে কাঁপতে এগোতে থাকে জঙ্গলের দিকে। গাছপালা পেরিয়ে বেশ খানিকটা ঢুকে আসে তারা। ভাদিম আর অ্যামেলিয়ার সেই লীলাক্ষেত্র পর্যন্ত। একটু দূরেই সেই বোল্ডার যার ও পাশে দুটো রোমশ জন্তুকেও ব্যস্ত দেখেছিল ওরা দু’জনে। ভয়ে ভয়ে দু’জনেই আলো ফেলে সেই দিকে।

কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার মেঝের ওপর কাঁকর মাটি নুড়িপাথর। ছেঁড়া কাগজ কাঠকুটো আবর্জনা। হয়তো লোমও পড়ে আছে ওখানে। আছে লালারস। কী রক্তের দাগ। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে

পরীক্ষা করবে কি না ভাবছিল দু'জনে, আচমকা পিছনে ঘাড়ের কাছে জান্তব হুঙ্কার ওঠে, "'গরর্...'"

আর্ত চিৎকার করে পালাতে যায় ভাদিম। আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ছিটকে পড়ে তার মোবাইল। ড্যারেল দ্রুত পিছন ফিরে আলো ফেলে। দেখে পেট চেপে হাসছে সাংগে। কৌতুকে পুরো বুজে গেছে তার চোখ দুটো। বিরাট হাঁ করে দাঁত বের করে হাসছে। যেন লাফিং বুদ্ধা চরমে। ড্যারেল রাগ দেখিয়ে বলে, "হোয়াট ননসেন্স, সাংগে। হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ডুইং ইউ থিঙ্ক?"

সাংগে তবু থামাতে পারে না নিজের হাসি। বহু কষ্টে সামলে উঠে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় ভাদিমকে। সে তখনও পড়ে আছে মাটিতে। কিন্তু ভাদিম সাংগেকে এগিয়ে আসতে দেখে আরও ভয় পেয়ে যায়। হাত পা ছুড়ে ড্যারেলকে বলে, "স্টপ হিম! স্টপ হিম!"

সাংগে এ বার একটু থমকে যায়। বিভ্রান্ত হয়ে তাকায় দু'জনের দিকে। ড্যারেল ভাদিমকে টেনে তোলে। কুড়িয়ে এনে দেয় তার তখনও জ্বলন্ত ফোনটা। তার পর দাঁড়ায় সাংগের মুখোমুখি। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে ড্যারেল বলে, "এত ক্ষণ কী করছিলে জঙ্গলে?"

খানিক লজ্জা নিয়ে সাংগে বলে, "আরে হঠাৎ বড় পেয়ে গেছিল। তাই বসেছিলাম ওই খানটায়। তোমরা আসছ দেখে সরে গেলাম সাইডে। তোমরা এগিয়ে গেলে। ভাবলাম একটু মজা করি। কিন্তু ভাদিম এমন রিঅ্যাক্ট করবে বুঝতে পারিনি। সরি!"

ভাবভঙ্গি তবুও বদলায় না দু'জনের। সাংগের মনে হয়, ওরা সন্দেহ করছে ওকে। বিশ্বাস করছে না তার কথা। কিন্তু কেন! কোনও মেয়েও তো আসেনি তার সঙ্গে। সে আবার বলে, "এনিথিং রং?"

তারও কোনও উত্তর দেয় না কেউ। কেমন একরোখা এঁড়ে ভঙ্গিতে তাকায় তার দিকে। ভাদিম জিজ্ঞেস করে, "টিস্যু পেপার কোথায় পেলে?"

"পকেটে ছিল। আরও আছে। লাগলে বোলো।"

"এখানে বিয়ারও খাচ্ছিলে?"

"না, বোতলে জল এনেছিলাম... কিন্তু তোমরা কী বলতে চাইছ বলো তো? আমি তো একাই..."

"জানি।"

"তা হলে সমস্যাটা কী?"

ড্যারেল আর কোনও উত্তর দেয় না। সাংগেকে অগ্রাহ্য করে ফেলে রেখে চলে যায় ভাদিমকে নিয়ে। সাংগে বিভ্রান্ত হয়ে আরও কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে একা একা। তার পর ফিরে এসে কমে আসা আগুনের যত্ন নেয় খানিক। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায় সেই আগুনেই। তার পর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে মাটিতে। আয়েস করে ছাড়তে থাকে ধোঁয়া। দেখে স্টেলা বলে, "স্মোকিং ইজ় ব্যানড ইন ভুটান। ইউ ডোন্ট নো স্টুপিড!"

সাংগে হেসে বলে, "কেউ তো দেখছে না। কারও কোনও ক্ষতিও হচ্ছে না।"

"তাই! তা হলে দাও না দেখি আমাকেও একটা।"

স্টেলা একটা সিগারেট ধরায়। প্যাকেট আর ফেরত যায় না সাংগের হাতে। ঘুরতে থাকে হাতে হাতে। শেষে দেখা যায় ড্যারেল আর ভাদিমও ধরিয়েছে। দেখে সাংগের ভাল লাগে। হাতের আগুন তুলে সে অভিবাদন জানায়। যদিও ওরা নির্লিপ্তই থাকে।

এরপর জেসন প্রস্তাব দেয়, প্রত্যেকে নিজের মাতৃভাষায় একটা করে গান করুক। প্রস্তাব পাশও হয়ে যায়। আর শুরু হয় রণিতাকে দিয়ে। রণিতা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত একটা বাউল গান গায়। মিলন হবে কত দিনে। সাংগে গিটার বাজায়। নাচে সের্গেই আর কাইতো। এর পর একে একে গাওয়া হয় জাপানি গান। ফরাসি গান। জার্মান গান। ইংরেজি হিন্দি তিব্বতি...।

এক সময় শেষের শুরু অনুভব করা যায় আকাশে বাতাসে। বোঝা যায় রাত আর বেশি বাকি নেই। গানও গাওয়া হয়ে গেছে সবার। বলা হয়ে গেছে যার যা বলার ছিল। শোনার ছিল যা কিছু সবই শোনা হয়ে গেছে। অন্তত এক নজরে তাই মনে হচ্ছে। তবু কারও কারও মনে সঙ্গোপনে রয়ে যায় একটা দুটো অতৃপ্তি। সাংগে এখনও জানে না ড্যারেল ভাদিম কেন এমন ব্যবহার করল। ও দিকে ওই দু'জনও জানে না, সাংগে কী লুকোচ্ছে ওদের কাছে। স্টেলার ইচ্ছে থাকলেও জানা হল না বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে শুতে কেমন লাগে। রণিতারও ঠিক করা হল না, সে পাদুম যাবে কি না। আর, সবার মনে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল, সাংগে কি সত্যি সাধারণ একটা মানুষ? নাকি...।

কাইতো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ছোট একটা স্পিচ দেব। মে আই হ্যাভ ইয়োর অ্যাটেনশন প্লিজ়?"

সমস্বরে, "গো অ্যাহেড! গো অ্যাহেড!"

কাইতো বলে, "আজকের রাত হিরের রাত। ডায়মন্ড নাইট। সারাজীবন বহুমূল্য লকেটের মতো ঝুলিয়ে রাখব বুকে।"

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত। হাততালি থামলে কাইতো আবার বলে, "একটু পরে বিদায় নিতে হবে ভাবলেই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। তাই আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

"বলে ফেলো! বলে ফেলো!"

"আর একটা দিন কি আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না? আসলে দুটো দিন। কালকের দিন তো ঘুমিয়ে কাটবে। পরশু আমি আর হারুকি একটা ট্রেকিং করব। দোচুলা টু চিমি লাখাং। একুশ কিলোমিটার। আমার প্রস্তাব, সবাই যাই ট্রেকিং-এ। গুরু ড্রুকপা কুনলে ওই পথেই তাড়া করেছিলেন সেই ডেমনকে চিমি লাখাং পর্যন্ত। তোমরা কী বলো?"

জানা গেল, ড্যারেলদের চার জনের সে প্ল্যান ছিলই। তারা যাবে। বাকি রইল স্টেলা, অ্যামেলিয়া, রণিতা আর সাংগে। স্টেলা আর অ্যামেলিয়া জানালো, তারা রাজি। রণিতারও কোনও আপত্তি নেই। এর পর সাংগের কথা আর কেউ জিজ্ঞাসাই করলো না। স্টেলা তার গলা ধরে বলল, "না গেলে আমি ডেমন হয়ে তোমায় অ্যাটাক করব।"

রণিতা ভাবল, যাক বেচারা! অনেক দূর থেকে এসেছে। সারা রাতে সে কেমন নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। অথচ তার মাথার ঠিক ছিল না আসার সময়। সাংগে ওয়াংগেল-এর রূপ ধরে গুরু ড্রুকপা কুনলেই তার কাছে এসেছেন মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারলেই যেন জীবনের সার্থকতা। রাতে তার কিছু অলৌকিক নমুনাও দেখিয়েছে সাংগে। অথচ এখন মনে হচ্ছে, সে তো সবার। যতটা তার, ততটাই স্টেলার। স্টেলা সাহসিনী। সে-ই আগে যাবে। আগে পাবে। এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। শেষ রাতের দিকে ঝিমিয়ে পড়েছিল সকলেই। নেশা আগুন আর ক্লান্তির কাছে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। কেউ তো ধুলোর ওপর রীতিমতো টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। কেউ ঠেস দিয়ে, কেউ মাথা ঝুলিয়ে ঢুলছিল নিঃশব্দে। একমাত্র সাংগেই তখনও শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছিল পদ্মাসনে। হয়তো সে ধ্যান করছিল চোখ বুজে।

হঠাৎ সবার চটকা ভাঙে হারুকির গোলমালে। সে ব্যস্ত হয়ে বলছে, "কাইতোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যালো, শুনছ! কাইতো ইজ় মিসিং।"

"দেখো হয়তো টয়লেটে গেছে।"

"ভোর হল। মর্নিংওয়াকে গেল হয়তো।"

"কোথায় আর যাবে, রাতও তো আর নেই!"

কিন্তু হারুকি জানায়, সে সব দেখে এসেছে। জঙ্গলে, গ্রামের রাস্তায়, খেতে কোত্থাও নেই। এমনকি ও পাশে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। স্নান করার মতো। সেখানেও নেই।

গুরুত্বটা এ বার উপলব্ধি করে একে একে সবাই। ঝিমুনি কেটে যায় সবারই। ধড়মড়িয়ে উঠে আর একপ্রস্ত অনুসন্ধানে বেরোয় তখনই। বিশেষ করে, জঙ্গলের দিকটায় যায় বেশির ভাগ। সাংগে রণিতা আর স্টেলা যায় গ্রামের দিকে।

ঘণ্টাখানেক পর আবার সবাই জড়ো হয় আগুনের কাছে। তত ক্ষণে দিনের আলো ফুটে গেছে। নিভে গেছে আগুন। অদৃশ্য পাখিরা ডাকছে গাছে গাছে। সবই ঠিকঠাক। শুধু কাইতো যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে। কোথাও কোনও সঙ্কেত না রেখেই।

হঠাৎ সাংগেকে উদ্দেশ্য করে ভাদিম বলে, “তুমি তো জানো কাইতো কোথায় আছে! জানো না?”

সাংগে হতবাক হয়ে বলে, “মানে?”

“মানে বলছি, তোমার তো ম্যাজিক পাওয়ার আছে। তাই না! এখন সেই পাওয়ারটা কাজে লাগিয়ে বলো না, কাইতো কোথায় আছে?”

সাংগে আরও অবাক হয়ে বলে, “ম্যাজিক পাওয়ার! আমার! কে বলল তোমাকে?”

“কেন! তুমিই তো নমুনা দেখাচ্ছিলে। চোখ দিয়ে আগুন বার করছিলে। শূন্যে ভাসছিলে। জঙ্গলে উল্কের রূপ ধরে আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে!”

স্টেলা হঠাৎ রাগ দেখিয়ে বলে, “হোয়াট বুলশিট ভাদিম! আমার হ্যালুসিনেশন হয়েছিল নেশার ঘোরে। রানিরও তাই। ভুল দেখেছিলাম।”

ভাদিম আরও প্রবল দেহভঙ্গি করে বলে, “এইসব ও-ই বুঝিয়েছে, তাই না? আমি বলছি ওর ব্ল্যাক ম্যাজিক পাওয়ার আছে। ও-ই কোথাও গুম করেছে কাইতোকে। ওকে চাপ দাও। ওই বলতে পারবে।”

“শাট আপ!”

রণিতার গলা। এত জোরে সে চিৎকার করেছে যে, সত্যি চুপ করে গেছে ভাদিম। গ্রামের দু’-এক জন বেরিয়েছে এ দিক ও দিক। তারাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ওদের। রণিতা আরও বলে, “এনাফ। নাও লেটস গো টু দ্য পুলিশ।”

“পুলিশ!”

কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছেন গ্রামের মুখিয়া। তিনি ভীষণ বিব্রত। কারণ তাঁদের এই অনুমতি দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাঁকেই। তাই পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে তিনি একটা অনুসন্ধান দল পাঠালেন জঙ্গলে। যদি জীবজন্তুতে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে তো কিছু অবশেষ হলেও পাওয়া যাবে।

“ও মাই গড! এমন কি হতে পারে?”

“নিশ্চয়ই পারে। জঙ্গলে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। কিন্তু কোনও শয়তান যদি নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে উদ্ধার করা মুশকিল।”

“শয়তান?”

“হ্যাঁ। সে সবও আছে। কখনও বা তারা মানুষকে তুলে নিয়ে যায়। বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের।”

জেসন বলে, “কিডন্যাপও তো হয়ে থাকতে পারে?”

মুখিয়া বলেন, “ওটা ভুটানে হয় না। কিন্তু আপনাদের অনুপ্রেরণায় তেমন কেউ করে থাকলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।”

কারও মুখে আর কোনও কথা নেই। জঙ্গল থেকে অনুসন্ধানী দল ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মুখিয়ার নির্দেশে দু’জন লোক রাতের আবর্জনা পরিষ্কার করছে। বিয়ারের অসংখ্য বোতল সমেত।

হারুকি হঠাৎ বলে, “আমার আর একটা সম্ভাবনা মাথায় আসছে।”

সবাই সপ্রশ্ন মুখে তাকায় ওর দিকে। হারুকি বলে, “কাইতোর বাবা খুব পাওয়ারফুল লোক। ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। শুনেছিলাম ওর বাবা লোক লাগিয়েছে আমাদের পেছনে। কিন্তু ওরা যে খুঁজতে খুঁজতে ভুটান চলে আসতে পারে এটা আমি ভাবিনি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, সেটা হতেও পারে। হয়তো ওরাই চুপচাপ তুলে নিয়ে গেছে কাইতোকে।”

ড্যারেল বলে, “সেটা হলে তবুও ভাল। কিন্তু অন্যগুলো হলে তো...”

জঙ্গল থেকে অনুসন্ধানী দল ফেরার আগেই পুলিশ চলে আসে। গ্রামেরই কেউ খবর দিয়েছে হয়তো। অফিসার খুবই চটপটে লোক। ফালতু কথার সময় নষ্ট না করে কাইতোর ছবি চেয়ে নেন হারুকির কাছে। মোবাইলে সেটাই পাঠিয়ে দেন অন্যান্য আউট পোস্টে। থানায়। তার পর শুরু করেন জিজ্ঞাসাবাদ। শেষে বলেন, “সবাইকে থানায় যেতে হবে।”

“অ্যারেস্ট?”

“নো। ওনলি ইন্টারোগেশন। প্লিজ় কোঅপারেট।”

কিন্তু একটাই পুলিশের গাড়ি। হেঁটেই যেতে হবে সবাইকে। ওদের সঙ্গে হাঁটবে দু’জন পুলিশও। অফিসার ফিরে যান তাঁর গাড়িতে।

থানায় পৌঁছতে লাগে আধঘণ্টা। বসিয়ে রাখে এক ঘণ্টা। তার পর নাম ঠিকানা ব্যক্তিগত বিবরণ কাগজপত্র ইত্যাদি লেখালিখি গোছগাছ করতে আরও একঘণ্টা। তার পর গিয়ে নাকি শুরু হবে জিজ্ঞাসাবাদ। খেতে দেয় চা আর বিস্কুট।

নিজেদের মধ্যে ওরা আর তেমন কথা বলে না। দেখে মনে হচ্ছে আবার সবাই অচেনা হয়ে গেছে একে অপরের কাছে। হারুকি ছাড়া বাকিদের চোখে মুখে উদ্বেগও তেমন নেই। কেউ বা স্পষ্টতই বিরক্ত। ড্যারেল তো জিজ্ঞেসই করে বসল জার্মান দূতাবাস দপ্তরে যোগাযোগ করবে কি না। রণিতা ভাবে, ইন্ডিয়া হলে এত ক্ষণ চড় খেয়ে যেত ড্যারেল। কিন্তু ভুটান পুলিশের ধৈর্য প্রশংসনীয়। হাসিমুখেই অফিসার জানায়, “নো নিড।”

আসলে পরে জানা গেল জিজ্ঞাসাবাদ করতে বড় অফিসারদের দল আসছে পারো থেকে। তারা এসে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যায়। তার মধ্যে থানার সামান্য আয়োজনেই তাদের সারতে হয় জরুরি কাজ কর্ম। হাত মুখ ধোয়া। পায়খানা বাথরুম। আর পুলিশরা খেতে দেয় লাল ভাত, হলুদ ডাল আর সাদা তরকারি। সেটুকু খাবার পর কেউ আর জেগে বসে থাকতে পারে না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলতে থাকে অনেকেই।

অবশেষে ডাক আসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। প্রথমে হারুকি। তাকে ডেকে নিয়ে যান এক জন পুলিশকর্মী। ভেতরে অফিসারের চেম্বারে। পারো থেকে আসা বিশেষ দলের সামনে। যেন চাকরির ইন্টারভিউ।

হারুকি বেরোয় প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে। চোখ মুখ তার বিধ্বস্ত। কৌতূহলে সবাই সজাগ হয়ে মুখ তুলে তাকায় তার দিকে। কিন্তু পুলিশ তাকে অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়। হয়তো প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, তাই।

এর পর একে একে ডাক পড়ে সবারই। কাউকে দশ মিনিট, কাউকে আধঘণ্টা কি তারও বেশি জেরা করে পুলিশের বিশেষ দল। মাঝে চায়ের বিরতিও হয় একটা। তাদেরও দেওয়া হয় চা বিস্কুট। জিজ্ঞাসাবাদ সম্পূর্ণ হতে বেজে যায় রাত সাড়ে আটটা। পরিবেশন করা হয় রাতের খাবার। আবারও লাল ভাত, সাদা তরকারি আর হলুদ ডাল।

সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটা আসে রাতের খাওয়া শেষ হওয়ার পর। এক জন অফিসার এসে জানায়, “আজকের রাতটা আপনাদের থানাতেই থাকতে হবে।”

কথাটা শুনে মুখ শুকিয়ে যায় সবারই। কিন্তু কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। ঘুমে আর ক্লান্তিতে মাথাও ঠিকমতো কাজ করছে না। শেষে অফিসার আবার বলেন, “এনি কোশ্চেন?”

রণিতা জিজ্ঞাসা করে, “আর উই অ্যারেস্টেড?”

“নো। ওনলি ডিটেন্ড ফর ইন্টারোগেশন।”

অফিসার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, “স্পেশাল টিম কাল সকালে আবার কথা বলবে আপনাদের সঙ্গে। আজকের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হবে রাতে। তার পর। অনেক রাত হল। আপনাদের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এই মিটিং হলে। আমার সঙ্গে আসুন।”

বড় একটা হলঘরের মেঝের ওপর ঢালা বিছানা। একটা করে বালিশ, একটা করে কম্বল। পায়খানা বাথরুম খাবার জল দেখিয়ে দেন অফিসার। তার পর বলেন, “দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকবে। বাইরে একজন সেন্ট্রি থাকবে বসে। বিশেষ প্রয়োজনে ডাকতে পারেন তাকে। গুড নাইট।”

কাঠের মেঝের ওপর পুলিশি জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে যান অফিসার। বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দেন দরজা। হ্যাশবোল্ট আটকানোর ধাতব শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে হলঘরের শূন্যতায়। পরপর তালা আর চাবির বুক মোচড়ানো যুগলবন্দি। মনে পড়ে এই সংক্রান্ত টিভি শোয়ের কথা। পৃথিবীর কুখ্যাত সব বন্দিশিবিরের কথা। তিল তিল করে ঝলমলে একটা মানুষের জন্বিতে পরিণত হওয়ার কথা।

দমিত কান্নার শব্দ ভেসে ওঠে হলঘরের উঁচু চালের দিকে। সবাই দেখে নিজের দু’হাঁটুর উপর মাথা ঝুলিয়ে কাঁদছে ভাদিম। তার পাশেই বসে আছে অ্যামেলিয়া। ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার কথা সে ভাবছেও না। কেউই সে চেষ্টা করে না। সকলেই কাঁদছে ভেতরে ভেতরে। তাই ভাদিমকে কাঁদতে দেখে যেন

স্বস্তিই হয় সবার। কেঁদে হালকা হওয়ার স্বস্তি।

প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা টানা জেগে থাকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়েছে সবার ওপর। মাথার ভেতরটা ভীষণ ঘোলাটে লাগছে। মাথাটাকে মনে হচ্ছে যেন জলে পড়ে যাওয়া স্মার্টফোন। হয় একেবারেই কাজ করছে না। অথবা এলোমেলো করছে। ভুলভাল করছে।

তবু জেদ করে কথা বলে তারা। কাকে কী জিজ্ঞেস করল ওরা কথা বলে সেই নিয়ে। আর অবশেষে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, পুলিশ ওদের কথা বিশ্বাস করছে না। ওদের সন্দেহ একটা কিছু গোপন কথা আছেই, যা তারা কেউই পুলিশের কাছে স্বীকার করছে না। কী সেই গোপন কথা? সেটা না জানা পর্যন্ত পুলিশ রেহাই দেবে না।

ড্যারেল বলে, "সত্যিই কি আছে এমন কোনও গোপন কথা?"

ভাদিম চোখের জল মুছে গলা চড়িয়ে বলে, "অবশ্যই আছে। আমাদের মধ্যেই এক জন বা দু'জন জানে সে কথা। তারা সে কথা গোপন করে ফাঁসাচ্ছে আমাদের সবাইকে।"

ভাদিমের ইঙ্গিত কার দিকে সবাই জানে। তাই কেউ আর কোনও কথা বলে না। বিকট নীরবতা সকলে সহ্য করে বেশ কিছু ক্ষণ। শেষে সাংগে নিজেই বলে, "ভাদিমের সন্দেহ আমাকে। কিন্তু..."

ভাদিম তাকে শেষ করতে না দিয়েই বলে, "শুধু তুমি নও। আরও আছে।"

"কে?"

ভাদিম উত্তর দেয় না।

ড্যারেল আবার বলে, "কে বলো! কাকে তোমার সন্দেহ?"

"হারুকি।"

সকলে হতবাক ভাদিমের কথা শুনে। বেশ কয়েকটা বিস্মিত কণ্ঠ শোনা যায়, "হারুকি! হারুকি!"

ভাদিম যুক্তি দেয়, "কাইতো বিরাট ধনীর মেয়ে। ওকে হারুকি ফুসলিয়ে ভাগিয়ে এনেছে। একটা চক্রের অংশ হিসেবে। আরও লোক আছে ওর দলে। হয়তো মুক্তিপণের জন্য। অথবা অন্য কোনও স্বার্থ। রাজনৈতিক অথবা ব্যবসায়িক..."

কথা শেষ করতে পারে না ভাদিম। তার আগেই হারুকি ছুটে এসে তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারে। পাল্টা আক্রমণ করে ভাদিম। আর দু'জনের জড়িয়ে পড়ে উন্মত্ত হাতাহাতিতে। বাকিরা বহুকষ্টে তাদের থামায়। কিন্তু তার আগেই রক্ত ঝরে গেছে। দু'জনেরই ঠোঁটের কোণে রক্তের ধারা।

এর পরেও আশ্চর্য শান্তিতে ঘুমায় সবাই। ভাদিম আর হারুকিও। মাঝে কোনও রকম বিঘ্ন ছাড়াই এক ঘুমে সকাল হয়। চোখ মেলেই জানলায় দেখা যায় অপূর্ব এক হিমেলি প্রভাত। নীলে আর সবুজে বিশ্বজোড়া পেন্টিং-এর একাংশ। ভাবতেও ভাল লাগে সবার, আমিও এর অংশ।

ঘণ্টাখানেক পর চা-বিস্কুট পর্ব শেষ হলে ডাক পড়ে অফিসে। দু'জন পুলিশ এসে সবাইকে নিয়ে যায়। অফিসারের ঘরের মেঝেতে একটা প্লাস্টিক পাতা। তার ওপর কাদামাখা কিছু জিনিস। রক্তের দাগ মিশে আছে তার ভেতর। সে দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অফিসার বলেন, "দেখুন তো চিনতে পারেন কি না?"

সে দিকে এক ঝলক তাকিয়েই আঁতকে ওঠে সবাই। দেখেই সবার মনে পড়ে ওগুলোই তো পরেছিল কাইতো। গোলাপি উলের টুপি। সবুজ স্টোল। পাশে একটা বিয়ারের বোতল।

হারুকি ব্যস্ত হয়ে সেগুলো ধরতে গেলে অফিসার বাধা দেন। বলেন, "হাত দেবেন না। এগুলো এখন এভিডেন্স।"

হারুকি বলে, "আর কিছু পাওয়া যায়নি? মোবাইল পার্স...?"

"না। মূল্যবান কিছু পাওয়া যায়নি।"

"এগুলো কোথায়...?"

"জঙ্গলে। খুঁজে পেয়েছে মুখিয়ার অনুসন্ধানী দল।"

ড্যারেল বলে, "এর থেকে আপনারা কী সিদ্ধান্ত করছেন?"

অফিসার বলেন, "কিচ্ছু না। আপনাদের মতামতটা বলুন। ওই বিয়ারের বোতলে কিন্তু বিয়ার নেই। তলায় একটু আরা পড়ে আছে। তাই কি হওয়ার কথা?"

"হ্যাঁ। কাইতো তো বিয়ার খায়নি। বিয়ারের বোতলে আরাই খাচ্ছিল।"

"হুমম্। তা হলে এগুলো কাইতোরই! তাই তো?"

সে ব্যাপারে কেউ কোনও সন্দেহ প্রকাশ করে না। অফিসার বলেন, "আপনারা হলঘরে ওয়েট করুন।"

ভাদিম জানতে চায়, "আমাদের কি আজও ডিটেন করা হবে?"

"না। শুধু পাসপোর্টগুলো জমা রাখতে হবে। আর কিছু দিন ভুটান ছাড়তে পারবেন না।"

"সে কী!"

সকলেই চমকে ওঠে অফিসারের কথা শুনে। উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চায়, "কত দিন?"

"যত দিন না আপনাদের পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হচ্ছে। আর হ্যাঁ। ডেলি হাজিরা কিন্তু চলবে। ঠিক আছে?"

জেসন জানতে চায়, "পুনাখা ছাড়তে পারব তো?"

"শিওর। ভুটানের ভেতরে যে কোনও জায়গায় যেতে পারবেন। হাজিরা লোকাল থানায় দিলেই হবে।"

হলঘরে ফিরে আসে সবাই। ভুটানি ভূমিরূপের মতো ধামসানো বিছানায় গিয়ে বসে যে যার মতো। দেয়ালে পিঠ দিয়ে নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ভাবতে থাকে, এ কী হয়ে গেল!

দশ জন বন্ধু বান্ধবী একটা ঘরে বসে আছে আর কোথাও কোনও কথা নেই, এই বিকট অবস্থা নিজেরাই সহ্য করতে পারে না। সকলেই চায় ভেঙে পড়ুক এই নৈঃশব্দ্য। কিন্তু বলার মতো কোন কথা কেউ খুঁজে পায় না। অবশেষে যেন কত যুগ যুগান্তর পার করে কানে আসে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শান্ত স্বর, "গুরু ড্রুকপা কুনলে ডাকছেন। চলো তাঁর পথ অনুসরণ করি।"

প্রস্তাবে সকলেই রাজি হয়। ভুটানে আটকে যখন থাকতেই হবে গুরুর পথে ট্রেক করে নেওয়াই ভাল। যদিও সে দিনটা কেটে যায় পাসপোর্ট জমা দিয়ে পুলিশি ঝামেলা মেটাতেই। পর দিন সবাই চলে যায় দোচুলা। সেখান থেকে আবার চিমি লাখাং ফিরবে একুশ কিলোমিটার হেঁটে। বনপথে। যে পথে এক দিন নিজের শিকারকে তাড়া করেছিলেন গুরু ড্রুকপা কুনলে।

মনোরম বনপথে নেমে সবারই মন ভাল হয়ে যায়। যাত্রা শুরুর আগে সাংগে সবাইকে বলে, "একটু ধ্যান করে নাও। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও নামাও গুরু ড্রুকপা কুনলের পথে।"

বলে সে নিজেই ধ্যানে বসে যায়। এক্কেবারে জঙ্গলের মধ্যে। ঝোপ কাঁটা পোকামাকড়ের পরোয়া না করেই। পদ্মাসনে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে সে চোখ বন্ধ করে। আর আশ্চর্য স্বরে শুরু করে মন্ত্রোচ্চারণ। মঙ্গোলীয় থ্রোট সং এর মতো শোনায় তার স্তোত্র পাঠ। যেন শরীরের কোনও গভীর স্থান থেকে উঠে আসছে শব্দ। ঠোঁট মুখ নয়। গলা বা পেটও নয়। আরও কোনও গভীর স্থান থেকে। যা একমাত্র কঠোর সাধনার দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব। আবছা করে মনে হয় কুণ্ডলিনীর জাগরণ সংক্রান্ত কোনও কিছু হবে হয়তো!

সাংগের এমন মন্ত্রোচ্চারণ দেখে খানিক ঘাবড়েই যায় তার বন্ধুরা। রণিতাও । তবু সে-ই সবার আগে ধ্যানের মুদ্রায় বসে যায় সাংগের সামনে। তারই দিকে মুখ করে। একে একে বসে যায় বাকিরাও। চোখ বন্ধ করে। দু'কানে শুধু সাংগের অপার্থিব স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। যা ধীরে ধীরে ঢুকে আসে মাথার মধ্যে। যার বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও সাড়া জাগে প্রাণের ভেতর। নিজের মতো করেই মনে হয় গভীর বার্তা আছে এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে। হয়তো বলছে, ভয় নেই! ভয় নেই!

চোখ বন্ধ করে কত ক্ষণ বসে থাকে খেয়াল নেই। এক সময়ের রণিতার মনে হয়, তার চার পাশের জঙ্গল আরও ঘন হয়ে উঠেছে। এতটাই যে সূর্যের আলো ঢুকছে না ভেতরে। সেই অন্ধকারে ওঁৎ পেতে বসে আছে ভয়ঙ্কর সব মাংসাশী রাক্ষসেরা। রক্তপিপাসু প্রেতেরা। অসহায় মানুষ নিরীহ শিকারের মতো যাচ্ছে সেই বনপথ ধরে। মওকা বুঝে পাশের কোনও ঝোপ থেকে আচমকাই কোনও শ্বাপদ ঝাঁপিয়ে

পড়ছে কোনও হতভাগ্যের ওপর। আর তাকে বিরাট হাঁ-এর ভেতর কামড়ে ধরে মিলিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকের অন্ধকারে। গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে মানুষের দলটা। তবু এই পথ এড়াতে পারে না মানুষ। সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বড় দলে যাতায়াত করে। হাতে অস্ত্র রাখে। রক্ষী নিয়োগ করে। পশুর টোপ সাজায় চারপাশে। মশাল হাতে হাঁটে। আর নিরন্তর প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে। তবুও রোধ করা যায় না ভবিতব্য। বারবার প্রতিবার শুধু অর্ধেক দলই পৌঁছতে পারে গন্তব্যে।

তার পর হঠাৎ এক দিন যখন ভয়ে জড়োসড়ো মানুষ বনের ভেতর অসহায়, হঠাৎ তীব্র আলোয় ঝলসে ওঠে চার দিক। হতবাক মানুষ মুখ তুলে তাকায়। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় একটা তীব্র আলোর শকট যেন পেরিয়ে গেল আকাশপথে। সে শুধু এক খণ্ড মুহূর্তের জন্য। কিন্তু ওটুকুতেই বল-ভরসা জাগে মানুষের প্রাণে। মনে হয় যেন এক শুভ বার্তা এসেছে তাদের জন্য। তাদের রক্ষাকর্তা আসছেন কোনও আগুনের রথে চড়ে। তারই অগ্রদূত জানিয়ে দিয়ে গেল তাদের সেই মহামানব এর আগমনবার্তা।

আর তাতেই যেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে বনের দৈত্যদানোরা। এ বার শিকারে বেরিয়ে আসে স্বয়ং দলনেত্রী, লোরো দুয়েম। এরই একচ্ছত্র শাসন এই দোচুলা পাস আর তার আশপাশের অঞ্চলে। থিম্পু আর পুনাখার মাঝ বরাবর সে বসে আছে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। যারা বেঁচে আছে একটাই মাত্র খাদ্য খেয়ে। মানুষের মাংস। আর একটাই মাত্র পানীয় পান করে, মানুষের রক্ত।

হতভাগ্য মানুষের দলটাও সেদিন বিরাট। যেন অফুরন্ত খাদ্য আর পানীয়ের যোগান। লোরো দুয়েম আর তার দলের কোনও অভাব হবে না রক্ত মাংসের। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষগুলোর উপর। আর নির্বিচারে ছিঁড়ে নিতে থাকে তাদের মাংস। চার দিকে ছড়াতে থাকে তাদের রক্ত। অসহায় মানুষগুলো মাটিতে পড়ে থেকে শুধু অপেক্ষা করে লোরো দুয়েম এর দাঁতের জন্য। তার নখের জন্য। সহজপাচ্য সুস্বাদু আহারের মতো তার পেটে যাওয়ার জন্য।

আর ঠিক তখনই...!

এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন বজ্রপাত হল একেবারে কানের কাছে। চোখের সামনে। তীব্র আলোর উদ্ভাসে ঝলসে গেল চারদিক। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল মাটি। আর লোরো দুয়েম তার দলবল সহ হকচকিয়ে স্থির হয়ে গেল পাথরের মূর্তির মতো। ঘাড়ে কামড় বসাতে যাচ্ছিল যে যুবতী মেয়েটার, সে তার হাতে ধরাই রয়ে গেল। খসে পড়ল মাটিতে। আর সেই মেয়েটি গুটি গুটি সরে গেল তার দিকে যাকে দেখে লোরো দুয়েম এমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

সে এক সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পরনে তার রংবেরঙের জোব্বা। পিঠে তূণের ভেতর তির। কাঁধে ঝোলানো ধনুক। লাল লাল চোখে সক্রোধে সে তাকিয়ে আছে লোরো দুয়েম এর দিকে। লোরো দুয়েম পাল্টা তার দিকে । আবির্ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কিছু করবেন। ভয়ঙ্কর কিছু নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু কী!

তটস্থ মানুষগুলো অপেক্ষায় চেয়ে আছে সন্ন্যাসীর দিকে। চেয়ে আছে প্রেতেরা, রাক্ষসেরা, দানোরা। আর চেয়ে আছে তাদের দুরাচারী দলনেত্রী।

আর তখনই সন্ন্যাসীর সমগ্র দেহ যেন রূপান্তরিত হয় এক আলোর কুণ্ডে। সেই কুণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে এমন তীব্র আলো যে দ্রুত চোখ বন্ধ করে ফেলে মানুষগুলো। শ্বাপদগুলো আর্তচিৎকারে কাঁপিয়ে তোলে গোটা বন। কানে তালা ধরে যায় মানুষ গুলোর। আর তার পরেই কানে আসে কুকুরের ডাক। যেন আতঙ্কে পরিত্রাহি ডাক ছেড়েছে অসংখ্য কুকুর।

কুকুর কোত্থেকে এল! কৌতূহলে চোখ মেলে মানুষগুলো। আর দেখে, সামনের সমস্ত শ্বাপদেরা কুকুরের রূপ ধারণ করেছে। কুকুর হয়ে গেছে লোরো দুয়েম নিজেও। আর লেজ গুটিয়ে দৌড় দিয়েছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাদের তাড়া করেছেন। কিন্তু তাঁরও আগে তাঁর দেহের জ্যোতি পিছু ধাওয়া করেছে ওদের। প্রজ্জ্বলিত প্রচণ্ড বজ্রের মতো তাঁর তেজ ধেয়ে যাচ্ছে কুকুরগুলোকে লক্ষ্য করে। আর সন্ন্যাসী নিজে এগিয়ে চলেছেন তাঁর বজ্রানলের পিছু পিছু।

কৌতূহলী মানুষগুলো পিছু নেয় সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী কুকুররূপী শয়তানগুলোর পিছু ধাওয়া করে পেরোতে থাকেন বনপথ। খাল বন পাহাড় টিলা। লাফিয়ে পার করেন ঝোরা খাদ ভঞ্জ্যাং। তিরের বেগে অতিক্রম করেন বিস্তীর্ণ উপত্যকা। অবশেষে কৌতূহলী মানুষজনের চোখের সামনে মাটিতে ঠেসে ধরেন লোরো দুয়েমকে। আর সেখানেই তাকে পুঁতে ফেলেন মাটির ভেতর। সেই সঙ্গে তার অনুগামী এক লক্ষ কুকুরকেও। সন্ন্যাসী বজ্রনির্ঘোষে হুংকার দিয়ে বলেন, "চি মেদ...! চি মেদ...! কুকুর নাই ...! কুকুর নাই...!"

তার আগুনের বজ্র তখনও দাউদাউ করে জ্বলছে ঊর্ধ্বমুখে। তারই ছটায় উদ্ভাসিত চার দিক। ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসে সন্ন্যাসীর ক্রোধ। শান্ত হয়ে আসে তার আগুনের বজ্র। ক্রমশ নিভতে থাকে তার আগুন। ছোট হতে থাকে আকারে। তখনও তা লগ্ন সন্ন্যাসীর শরীরের সঙ্গে।

হতবাক মানুষ এক সময় লক্ষ করে সেই আগুনের বজ্র ছোট হতে হতে হারিয়ে যায় সন্ন্যাসীর পোশাকের তলায়। কেউ কেউ লক্ষ্য করে আসলে তার নিম্নাঙ্গের পোশাকের তলায়। যেন আসলে তা তাঁরই পুরুষাঙ্গ। কর্ম সম্পন্ন করে আবার গুটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তার গোপন গুপ্তস্থানে।

আনন্দে ভক্তিতে আত্মহারা মানুষজন সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর সামনে। সকলেই আর্তস্বরে আবেদন জানায়, "আমাদের ছেড়ে যেয়ো না প্রভু। ছেড়ে যেয়ো না। আর যে অস্ত্র দেখালে তা আর এক বার দেখাও। আর এক বার।"

আর তখনই সন্ন্যাসী বজ্রকণ্ঠে বললেন, "আমি গুরু ড্রুকপা কুনলে। আমাকে মান্য করো। আমি তোমাদের রক্ষা করব। প্রজ্বলিত জ্ঞানের বজ্র দিয়ে।"

বলেই তিনি আবার বার করেন তাঁর আভাময় পুরুষাঙ্গ। আর সেই পুরুষাঙ্গ দিয়ে সবার মাথায় ঘা মেরে মেরে তিনি তাদের অভয় দেন।

রণিতার মনে হয়, তার মাথায়ও এসে পড়েছে এক আঘাত। শক্ত আর ভারী কোনও কিছুর আলতো আঘাত। আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতো চোখ মেলে রণিতা। দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে সাংগে। তার হাতে একটা লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে সে রণিতার মাথায় আলতো আঘাত করে বলছে, "ওঠো, জাগো!"

এক মুহূর্তের জন্য রণিতার মনে হয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং গুরু ড্রুকপা কুনলে। আর তিনি তাঁর উত্থিত বজ্রটি চাপিয়ে রেখেছেন তার মাথায়। কানে আসে সাংগে বলছে, "সমাধিস্থ হয়ে গেলে নাকি! এমন ধ্যান কোথায় শিখলে?"

এর পর দোচুলা থেকে রওনা হয় গোটা দল। লক্ষ্য চিমি লাখাং। দূরত্ব একুশ কিলোমিটার। আর যাবে সেই পথে, যে পথে একদিন রাক্ষসী লোরো দুয়েমকে তাড়া করেছিলেন গুরু ড্রুকপা কুনলে।

যাত্রা শুরুর কিছু পরেই মেঘ জমে আসে আকাশে। দিনের আলো কমে অন্ধকার করে দেয় চার পাশ। পথের বন ঢাকা অংশে রাতের আভাস ফোটে যেন। সঙ্গে রহস্য বাষ্পের মতো কুয়াশা।

পাকদণ্ডী শুঁড়িপথে একের পিছে এক জন করে চলে দলটা। ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ বক্ররেখায়। দূরত্ব বাড়ে একে অপরের কাছ থেকে। প্রত্যেকেই নিজের চার পাশে অনুভব করে একান্ত ব্যক্তিগত নির্জনতা। একাকিত্ব। যেন সে একাই বেরিয়েছে পথে।

রণিতার ভীষণ ভাল লাগে অনুভূতিটা। ইচ্ছে করেই সে পিছিয়ে যায় ধীরে ধীরে। আর সবার পিছনে পড়ে যায় এক সময়। এতটাই যে, সে আর দলের শব্দ শুনতে পায় না। কোনও আভাস পায় না এতগুলো মানুষের অস্তিত্বের। বদলে এক বিবশ করা একাকিত্ব যেন কুয়াশার ছদ্মবেশে ঘিরে আছে চার দিক থেকে। সেই কুয়াশার ভেতর পাঁচমেশালি গন্ধ। ভেষজ আদিম নির্যাস আর কার যেন গোপন ছোঁয়া।

আশ্চর্য শিহরন খেলে যায় রণিতার সারা শরীরে। মনে হয় কোনও অজানা দেশের অচেনা বেপাড়ায় ঢুকে পড়েছে বিনা অনুমতিতে।

এখন সবাই তাকে লুকিয়ে দেখছে। নজর রাখছে তার গতিবিধির উপর। হয়তো গোপনে...

চমকে ওঠে রণিতা। চকিতে ফিরে দেখে একটা রোমশ জন্তু। থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চেয়ে আছে তার দিকে। এত বিরাট তার চেহারা আর ঘন কালো লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা শরীর যে, রণিতার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু সেই ভয় আবার কেটেও যায় প্রাণীটার চোখের দিকে তাকিয়ে। আশ্চর্য মায়াবী চাহনি তার। যেন বন্ধুত্ব করতে চায়।

আসলে কুকুর একটা। ভুটানি কুকুর। আগেও দেখেছে এমন দশাসই চেহারার নিরীহ জীবগুলোকে। কিন্তু এই গহিন বনে কোত্থেকে এল! কিংবদন্তি মতে, এ তো নো ডগ জ়োন হওয়ার কথা। রাক্ষসী লোরো দুয়েম কুকুরের ছদ্মবেশেই পালিয়েছিল এই পথে। তবে কি বেছে বেছে তাকেই ধরল রাক্ষসীটা। এতগুলো দেশি বিদেশি মদ্দামরদ থাকতে! আবার পরক্ষণেই মনে হয়, গুরু দ্রুকপা কুনলেরও সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল একটা কুকুর। সেই কুকুরও হতে পারে এটা। স্বয়ং গুরুজি একে পাঠিয়েছেন রণিতার সুরক্ষার জন্য।

এমনটা ভাবতেই রণিতার মনে ভীষণ ভরসা জাগে। নির্ভয়ে সে হাত বাড়ায়। আর কুকুরটা এগিয়ে এসে নিজের মাথা ঠেকায় তার হাতে। সস্নেহে চেটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রণিতা বলে, “ফ্রেন্ড! ওকে! তোর নাম দিলাম আরা। চল, সামনে এগো।”

বলে রণিতা একটু পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। আর কুকুরটা যেন কত বাংলা বোঝে, এমন ভাব করে এগিয়ে যায় রণিতাকে অতিক্রম করে। রণিতা হাঁটা দেয় তার পিছনে।

আরা কিন্তু সত্যিই রণিতাকে ছেড়ে যায় না। খানিকটা করে এগিয়ে যায়। আবার দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রণিতার জন্য। সে কাছে এলে আবার হাঁটা দেয় আগে আগে।

এমন এক অনুগত সঙ্গী পেয়ে খুব খুশি হয় রণিতা। নিরাপত্তারক্ষীও মনে হয় আরাকে। কিন্তু একাকিত্ব একদম নষ্ট হয়ে যায়। ঘুচে যায় ভয়। শুকনো পাতার মতো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে আরার চার চারটে ভারী পায়ের তলায়। চেয়েও রণিতা ফেরত পায় না সেই রোমাঞ্চ। পিছু ছাড়াতে পারে না আরার।

অথচ চার পাশ ঢেকে গেছে ঘন কুয়াশায়। কয়েক পা দূরেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছু। আদিম এক গন্ধ উঠে আসছে অরণ্যের মেঝে থেকে। অথচ রণিতার মনে হচ্ছে সবটাই যেন সাজানো বাগানের নকল ঝুলন খেলা। এই বিস্তীর্ণ হিমালয় আসলে মায়ের কাদামাখা ছেঁড়া শাড়ি। এই পাকদণ্ডী পথ কাঠের গুঁড়ো ফেলে সে নিজেই বানিয়েছে নিজের জন্য।

খানিক ক্ষুণ্ণই হয় রণিতা মনে মনে। তার পর দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝপথে। পাশেই একটা বোল্ডারের উপর বসে পড়ে। বোতল খুলে জল খায়। একটা বিস্কুট। বসেই থাকে সেখানে। অনেক ক্ষণ। সামনের দিকে তাকিয়ে। যেখানে কুয়াশার ভেতর হয়তো তার অপেক্ষায় বসে আছে আরা। থাকুক! সে একা হতে চায় আবার। চলে যাক আরা তাকে ছেড়ে।

মিনিট দশেক বসে থাকার পরও যখন আরার দেখা মেলে না, তখন আবার ভয় করে রণিতার। আর সে মনে মনে খুশি হয়। সে তো ভয় পেতে চায় একাকী এই বনে। শত্রুকেও, মিত্রকেও। প্রেতকেও, ওঝাকেও। তবেই না রোমাঞ্চ! তবেই না উন্মোচিত হবে নতুন এক অন্তর্দৃষ্টি! নতুন করে দেখতে শিখবে জগৎটাকে। তার চেয়েও বড় কথা, নিজেকে। তা হলে আবার শুরু করা যেতে পারে পথ চলা, নিজের সঙ্গে একা একা।

উঠতেই যাচ্ছিল রণিতা, হঠাৎ পেছন কে যেন পরিষ্কার ঢোঁক গিলল। কোঁৎ! আতঙ্কে প্রাণটা যেন বেরিয়ে গেল খাঁচা ছেড়ে। চমকে উঠে পিছন দিকে ফিরে দেখে আবার সেই বিকট রোমশ জন্তুটা। যার সে নিজেই নাম দিয়েছে আরা। বসে আছে কুকুরমুখো মাইকের মতো। যেন সে মানুষ নয়, একটা বিরাট চোঙা।

“বাপস্! কিন্তু পিছনে এলি কী করে?”

প্রশ্নটা নিজের কানে আসতেই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে রণিতার। অত বড় জন্তুটা! সত্যিই তো! কী করে গেল পেছনে! সে তো সারাক্ষণ সামনের দিকেই তাকিয়ে বসেছিল। কুয়াশা ঘন ঠিক আছে। রাস্তা তো এটাই। যদিও এটা মানুষের রাস্তা। জীবজন্তুর রাস্তা লাগে না হয়তো। কী জানি!

সন্দিগ্ধ চোখে রণিতা তাকায় আরার দিকে। সেই মায়াবী চাহনি মেলে সে পাল্টা চেয়ে আছে তার দিকে। এই চাহনির ভেতর ছলনার মিশেল কল্পনাও করা যায় না।

তবু সন্দেহ জাগে বৈকি রণিতার মনে। লোরো দুয়েমকে শেষ বারের মতো কুকুর রূপেই তো দেখা গেছিল! তার ওপর রণিতার দেওয়া বিস্কুট চেটেও দেখে না আরা। রণিতা ভাবে, তা খাবে কেন! রক্তমাংসের পিপাসা তোমার বুকে।

নিজেই নিজের মাথায় চাঁটি মেরে হাঁটা দেয় রণিতা। এ বার সে আগে আগে, আরা তার পিছন পিছন। রণিতা ভাবে, সেই ভাল। কিন্তু আবারও উবে যায় তার ভয়। কেটে যায় একাকিত্বের রোম্যান্টিকতা। শুকনো পাতা সমানে ভাঙতে থাকে আরা। মৃদু অথচ বিরামহীন এক কোলাহল অনুসরণ করতে থাকে রণিতাকে পায়ে পায়ে। যেন এই উৎপাত জড়িয়ে আছে আসলে তার নিজেরই পায়ে।

হাঁটতে হাঁটতে রণিতা একসময় খেয়াল করে শুকনো পাতার শব্দ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। সে পিছন ফিরে দেখে কুয়াশার আবছায়ার ভিতর বিরাট কালো দেহ নিয়ে মাটি শুঁকছে আরা। কিন্তু সে ডাকে না। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। আর অনুভব করে পদে পদে মাটি শুঁকতে গিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে আরা। এই সুযোগ, ভেবে রণিতাও দ্রুত পা চালায়। আর এক সময় সত্যিই আর কোনও সাড়া পাওয়া যায় না আরার।

আবার সেই একাকিত্ব ঘিরে আসে রণিতাকে। সঙ্গে নির্জন নৈঃশব্দ্য। গা ছমছমে রোমাঞ্চ। আবার ভয় করে রণিতার। আবার তার ভীষণ ভাল লাগে ভয় পেতে। প্রেতকেও! সখাকেও!

এই ভয়বিলাসে গা ভাসিয়ে অনেক ক্ষণ পথ চলে রণিতা। সত্যিই আর বিঘ্ন ঘটাতে আসে না কেউ। বহু ক্ষণ আরার কোনও দেখা নেই। দেখা নেই তার সঙ্গী-সাথীদেরও। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কারও। এমনকি ডাকলেও না।

কারণ এক সময় রণিতাকে বাধ্য হয়েই ডাক দিতে হয় গলা তুলে। তার পর আরও গলা চড়িয়ে। তার পর সর্ব শক্তি দিয়ে।

“শুনছ... হ্যালো.. সাং-গে! শুনতে পাচ্ছ?”

দোটানায় ফেঁসে গেছে রণিতা। সামনে রাস্তা দু’ভাগ হয়ে দু’দিকে চলে গেছে। কোনটা তার পথ, সে চিনতে পারছে না। এই বনের মধ্যে ভুল পথে পা দিয়ে দিলে সে হয়তো আর খুঁজেই পাবে না তার দলকে। তার দলও খুঁজে পাবে না তাকে। তাই আন্দাজে কোনও একটা পথ বেছে নেওয়ার ঝুঁকির সামনে বিহ্বল হয়ে পড়ে রণিতা। দো-রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে। এমনকি সে পিছন ফিরে আরার নাম ধরেও ডাকে বেশ কয়েক বার। কিন্তু কোনও দিক থেকেই সাড়া মেলে না। তার ডাকের প্রত্যুত্তরে নির্জন বনটা যেন আরও থমথমে হয় যায়। আরও গা ছমছমে!

যে আরাকে তার ভীষণ সন্দেহ, তাকেই এখন মনে হয় শেষ ভরসা। কারণ বাকি সবাই এগিয়ে গেছে। তার পিছনে আছে একমাত্র আরা। হয়তো সে এসে পড়বে এক্ষুনি। আর পথের গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারবে কোন পথে গেছে বাকিরা। কুকুরের চেয়ে বড় পথপ্রদর্শক তো আর কেউ নেই!

কিন্তু আরাও আসে না। বদলে আসে এক হিমশীতল পাহাড়ি বাতাস। সে বাতাস মৃদু শব্দ তোলে। গাছের মাথায় মাথায় হালকা আলোড়ন তোলে কুয়াশার ভেতর। তাতেই বদলে বদলে যায় কুয়াশার ঘনত্ব। সেই সঙ্গে চার পাশের দৃশ্যপট। কখনও অনেকটা খুলে যায় দৃষ্টিপথ, কখনও নিজেকে যেন লুপ্ত করে দেয় নিজেরই কাছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলায় গন্ধ। কখনও মিষ্টি, কখনও আবার বোঁটকা প্রাণিজ। যেন কাছাকাছি আছে কেউ। খুব কাছাকাছি। রণিতা দেখতে না পেলেও তাকে সে দেখছে বরাবর। দেখছে তার ওপর নীচ, দেখছে মাংসপেশি।

রণিতার ভয় এ বার আতঙ্কের আকার নেয়। কুয়াশার ঠেলায়

নিজেকে অন্ধ মনে হয়। পড়ে আছে অচেনা নির্জন এক বনপথের মাঝবরাবর। জানে না কোন পথ নিরাপদ, কোন পথে বিপদ।

রণিতা আর স্থির থাকতে পারে না। তার আচরণে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বেড়ে যায় তার হৃদস্পন্দন। এ দিক ও দিক চরকি খায় নিজেরই চার পাশে। যে দিকটা পিছন, সে দিকেই সন্দেহ জাগে। তাই পিছনে ফিরতে হয় বারবার। আর তাতেই চরকি আর থামে না। থামতে চায় না। যেন সে-ও এক আরা। নিজেরই অস্বস্তির পিছু ধাওয়া করে যে অবিরাম ঘুরে যায় নিজেরই চার পাশে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চিৎকার করতে শুরু করে রণিতা। চিৎকার করতে করতে তার গলা ভেঙে যায়। বুজে আসে কান্নায়। তার পরও আরও কয়েক পাক ঘুরে অবশেষে পড়ে যায় রণিতা। রীতিমতো আছড়ে পড়ে শুকনো পাতার ওপর। তার পর নিজেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে টানটান। আর ভীষণ স্বস্তি হয় সেই ভঙ্গিমায়। কারণ পিছনে আর কোনও আড়াল থাকে না। পৃথিবীর পিঠে পিঠ দিয়ে সে চোখের সামনে দেখে সমগ্র পৃথিবীটাকে। যদিও তখন ঘন হয়েছে কুয়াশা গাছের মাথায়। তার ভেতরে দেখা যাচ্ছে ডাল পাতার কালচে নকশা। নকশার ভেতর কোনও সঙ্কেত! লুকোনো বার্তা! অথবা এক ঝাঁক উড়ন্ত কুকুর।

রণিতার মনে হয় সত্যিই তাই। বনের মাথায় যে কুয়াশার আবছা জগৎ তার ভেতর যেন সঞ্চরমাণ হাজার হাজার কুকুর। অলৌকিক ছায়া জীবের মতো তারা চলাফেরা করছে আকাশের ঘোলাটে পটে। শূন্যে ভর করে দৌড়ে যাচ্ছে গাছের মাথায় মাথায়। অথবা উড়েই হয়তো যাচ্ছে বাতাসে। এত নীচ থেকে সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে সঞ্চরমাণ। হাজার হাজার! অনেক হাজার! হয়তো একশো হাজার! ততগুলোই তো ছিল রাক্ষসী লোরো দুয়েম এর দলে। তারাই এ বার ঘিরে ধরেছে রণিতাকে একাকী বনের ভেতর। আর তো কোনও উপায় দেখছে না সে ঘরের মেয়েকে নিরাপদে ঘরে ফেরানোর।

রণিতা ইষ্টমন্ত্রের মতো জপ করতে থাকে গুরু ডুকপা কুনলের নাম। রক্ষা করো! রক্ষা করো! রক্ষা করো হে মহাগুরু! জাগ্রত করো তোমার আগুনের বজ্র। ধ্বংস করো দত্যি দানো ভূত প্রেত।

রণিতা চোখ বন্ধ করে ফেলে। তবু উড়ন্ত কুকুরের ছবি ঘুরতে থাকে তার মাথার ভেতর। তাই চোখে কিছু না পড়লেও কানে আসে তাদের জিভ চাটার শব্দ। গায়ে লাগে তাদের শ্বাস ফেলার বাতাস। নাকে আসে বোঁটকা জান্তব গন্ধ। ত্বকে লাগে তাদের রক্তের উত্তাপ। স্পষ্ট ঘষা খায় লম্বা শক্ত তারের মতো লোম। তার গালে, তার মুখে।

আতঙ্কে চমকে উঠে সে চোখ মেলে, আর দেখে বিশাল এক কালো জন্তু তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকছে। আড়ষ্ট হয়ে থাকে রণিতা। ভাবে এ বার সে কামড়ে ধরবে তার টুঁটি। মরার আগে শেষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয় সে মনে মনে। তার পর শরীরের সব শক্তি এক করে দুই পা গুটিয়ে প্রচণ্ড এক জোড়া পায়ের লাথি মারে জন্তুটাকে। অত বড় শরীরটা নিয়ে ছিটকে পড়ে জন্তুটা। রণিতা উঠে বসে ঝটপট আর দেখে খানিক দূরে থেবড়ে কুঁইকুঁই করছে আরা। তার দু'চোখে আহত অভিমান। দেখে মন খারাপ হয়ে যায় রণিতার। তখনই সে ওঠে না। বসে বসেই আরাকে বলে, "সরি সরি! বুঝতে পারিনি। আয় আয় কাছে আয়।"

কিন্তু আরা আসে না। এক ভাবে বসে থাকে ওখানেই। রণিতার কানে আসে মানুষের কণ্ঠ, "আহা! কী ভালবাসা!" পিছন ফিরে দেখে সাংগে বসে আছে খানিকটা উপরে, একটা বোল্ডারের ওপর। সে কৌতুকে হাসছে রণিতার দিকে তাকিয়ে। সে বিভ্রান্ত হয়ে বলে, "তুমি কোথা থেকে আবির্ভূত হলে?"

"ফিরছ না দেখে তোমার খোঁজে ফিরে এলাম।"

"আর আরা?"

"আরা তো আনিনি। চলো ওঠো, নীচে গ্রামে হয়তো পাবে!"

"আরে এই কুকুরটার কথা বলছি। ওর নাম দিয়েছি আরা।"

"ও আচ্ছা। ও তো আমার সঙ্গেই এল।"

"কিন্তু ও যে আমার পিছন পিছন আসছিল!"

"তুমি রাস্তায় ঘুমোচ্ছ দেখে হয়তো ওভারটেক করেছে।"

রণিতা আবার বিভ্রান্ত মুখে তাকায় আরার দিকে। ঠিক বিশ্বাস হয় না তার কুকুরটাকে। কেমন যেন ভুতুড়ে রহস্যময় আচরণ! আগে গিয়ে পিছনে আবার পিছিয়ে গিয়ে আগে, কী করে করছে এগুলো যদি না ও উড়তে পারে!

মাথার ওপর তাকায় রণিতা। কুয়াশা খানিক কেটেছে। এ বার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জন্তুগুলোকে। হিমালয়ের হনুমান। ঝুলে বসে আছে ডালে ডালে। বাচ্চারা হুটোপাটি করছে বড়দের চারিপাশে। রণিতা বলে, "ভুটানে আগে সবাই উড়তে পারত, তাই না?"

"মানে?"

"মানে এই যেমন উড়ন্ত বাঘের পিঠে চড়ে ভুটানে এলেন গুরু রিনপোচে। উড়ে এলেন গুরু ডুকপা কুনলে। উড়ে পালাল লোরো দুয়েম। এখনই কুকুর বাঁদর..."

"ব্যঙ্গ করছ?"

"একেবারেই না। আমি নিজের চোখে দেখলাম আকাশে কুকুর উড়ছে।"

সাংগে অবাক হওয়ার ভান করে বলে, "আরা?"

"না, আরা না। আরও আরও অনেক।"

"কিন্তু এত ক্ষণ কি তার প্রভাব থাকবে! আরা তো খেয়েছ সেই গত পরশু না তরশু দিন।"

রণিতা সাংগের দিকে কিছু কাঠকুটো ছুড়ে বলে, "আমি ইয়ার্কি মারছি না স্টুপিড।"

সাংগে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক ঝেড়ে বলে, "আচ্ছা ওঠো, এখন যাওয়া যাক।"

সে কাছে এসে রণিতার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। রণিতা তার হাতটা ধরে। সাংগে এতো জোরে টান মারে যে সে তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। সাংগে অন্য হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলে, "ভয় পেয়েছিলে?"

পুরুষালি গরম শ্বাস এসে পড়ে রণিতার কানের লতির ওপর। যেন আগুন আছে তার ভেতরে। এত গরম, যে গরম করে দেয় রণিতার কানদুটো। সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তার জোব্বা। এ বার সাংগে যেন সর্বনাশ করে দেয় তার। নিজের আগুনে ঠোঁটদুটো ঠেকিয়ে দেয় তার কানের লতির উপর। ধরা গলায় বলে, "ভয় পেয়েছিলে?"

রণিতা আরও কুঁকড়ে গিয়ে বলে, "ভীষণ!"

"এখনও ভয় করছে?"

"হ্যাঁ!"

সাংগে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে রণিতাকে। নিজের বুকের ওপর তাকে পিষতে পিষতে বলে, "এখনও ভয় করছে?"

এক সুখময় যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে সে বলে, "হ্যাঁ! এখনও ভয় করছে!"

সাংগে এ বার কামড়ে ধরে রণিতার ঠোঁট দুটো। নিজের দুটো হাত গলিয়ে দেয় তার জ্যাকেটের তলায়। ইনার ভেস্টের ভেতরে। তার উত্তপ্ত ত্বকের ওপর নিজের দশটা ঠান্ডা আঙুলের চাপ চারিয়ে দিয়ে বলে, "এখনও কি ভয় করছে?"

রণিতা বাঘের গ্রাসে নিরীহ হরিণীর মতো সমর্পিত হতে হতে বলে, "এখনও আমার ভয় করছে! ভীষণ ভয় করছে! ভীষণ..."

সাংগে তার বলশালী দশ আঙুলের জাদু ছড়াতে ছড়াতে বলে, "ভয় পেয়ো না। তুমি গুরু ডুকপা কুনলের পথে এসেছ। এ পথে ভয় নেই। আছে শুধু গান। আছে কবিতা। আর পরম আনন্দ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ঝরনাধারার মতো আনন্দ। অবগাহন করো সেই আনন্দ ঝরনায়। হরিণীর মতো কুঁকড়ে যেয়ো না। নিজেকে মেলে ধরো বাঘিনীর মতো। যেন তুমি নিজেই আহার করছ, কারও আহার হয়ে পড়ছ না।"

কী যেন বুঝে রণিতা হঠাৎ আগ্রাসী হয়ে সাংগেকে চেপে ধরে। সুখানুভূতির আশ্লেষে ককিয়ে উঠে সাংগে বলে, "দ্যাটস ইট!"

এর পর কুয়াশা আবার এত ঘন হয়ে ঘিরে আসে যে বেচারা আরা আর কিছুই দেখতে পায় না। মানুষ দুটো যেন সাদা চাদর চাপা

দিয়ে শুয়ে পড়ে বনের মাঝখানে। সেই সাদা চাদরের ভেতর নানা রঙের ঘূর্ণায়মান আভাস। বিস্তৃত জোব্বার হলুদ মেরুন, জ্যাকেটের লাল, ডেনিমের নীল। জুতো টুপি মাফলার... আরও কত শত রঙের ছিটে। কুয়াশার ভেতর রঙের উৎসবে মেতেছে ওরা। এতই বেসামাল সে উৎসব, যে রঙের টুকরা-টাকরা ছিটকে ছিটকে এসে পড়ে আরার সামনে। মুখ নিচু করে ঘ্রাণ নেয় আরা, তার পর জুলজুল করে চেয়ে থাকে সেই রংয়ের উথালপাথাল ঢিবির দিকে। যেন এক বহুবর্ণ নির্মীয়মাণ চোর্তেন। পবিত্র স্তূপ, যা গুরু ড্রুকপা কুনলে নিজের হাতে নির্মাণ করেছেন এই ভুটানের মাটিতে। যাতে আর কখনও কেউ ভয় না পায় এই বনের পথে। যতই সে একা হোক! যতই সে নাচার হোক!

“তা হলে কাইতো হারিয়ে গেল কী করে?”

সাংগে নিজের জোব্বা থেকে কাঠকুটো, পাতার টুকরো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে, “কাইতো হারায়নি। আর যদি হারিয়ে গিয়েও থাকে, তাতে ভুটানের কোনও হাত নেই।”

“তবে কার হাত আছে?”

“ঠিক জানি না। হতে পারে জাপানের।”

রণিতা আর কিছু বলে না। সে তখনও বসে আছে ঝরা পাতার ভেষজগন্ধী তপ্ত বিছানায়। যেন সেখানেই আজ রাত্রিবাস। সাংগে তাড়া দিয়ে বলে, “ওঠো।”

“আমি হাঁটতে পারব না।”

“তা হলে কি তোমায় কোলে করে বইতে হবে?”

আদুরে গলায় রণিতা বলে, “হুঁ!”

“ও আচ্ছা। তা আরার পিঠে চড়বে, না আমার?”

“তোমার!”

“ঠিক আছে তাই হবে।”

সাংগে সত্যি সত্যি রণিতাকে পিঠে তুলে নেয় আর অবলীলায় হাঁটা দেয় ডানদিকের উৎরাই পথে। সে পথ গেছে তাহোগাং গ্রামে। সেই গ্রামেই আজ রাত্রিবাস। তাঁবুতে।

প্রায় মিনিটদশেক রণিতাকে বহন করে সাংগে। হয়তো আরও করত। এক সময় রণিতাই বলে, “অনেক হয়েছে। এ বার নামাও।”

সাংগে নামায়। মাটিতে নেমে তার দিকে পিঠ করে রণিতা বলে, “এসো, এ বার আমি তোমায় বইব।”

“পারবে?”

“আগে হয়তো পারতাম না। এখন পারব।”

“কেন, এখন এমন কী হল?”

রণিতা সাংগের চোখে চোখ রেখে বলে, “তুমি যে আমায় বাঘিনী বানিয়ে দিলে!”

রণিতার কথা শুনে সাংগে হঠাত ভাবুক হয়ে পড়ে। সে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার দুটো কাঁধের উপর হাত রেখে কপালে কপালে ঠেকিয়ে বলে, “তুমি জন্মগত বাঘিনী, রানি। হরিণীর দলে মিশে আছ হরিণী সেজে।”

“আমার জন্মকথাও জেনে গেলে?”

“ইয়ার্কি নয়, সত্যি বলছি। গুরু ড্রুকপা কুনলের কৃপায় মেয়ে তো আমি কম দেখিনি। কিন্তু তুমি আর কারও মতো নও। একেবারে আলাদা। যেন একটা...”

দু’জনেই এক সঙ্গে বলে ওঠে, “ভুটান!”

আর খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে নির্মল আনন্দে। সেই দেখে আরার কী আনন্দ! তাদের ঘিরে সেও বেশ কয়েক বার লাফিয়ে নেয় তিড়িংবিড়িং। আদুরে স্বরে ডেকে নেয় কয়েকবার, ‘গেউগেউ গেউগেউ!’

যেন সে-ও শামিল এই আনন্দ কলহাস্যে।

গন্তব্যের এত কাছে ছিল ভাবতেই পারেনি রণিতা। দিন শেষ হয়ে এসেছে। কুয়াশা কেটে যেন পর্দা সরে গেছে নিসর্গ থেকে। আর কালচে ঘন সবুজের মাঝে দেখা যাচ্ছে একগুচ্ছ সাদা ভুটানি ঘরবাড়ি। গ্রামের নাম তহোগাং। অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখছে রণিতা, আর মনে হচ্ছে যেন সেই রহস্য আজও অটুট এখানে। কত সহজেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে, এ পথেই পালিয়ে ছিল রাক্ষসী লোরো দুয়েম পুনাখার দিকে। পিছু ধাওয়া করেছিলেন গুরু ড্রুকপা কুনলে। হয়তো এই ঘরগুলোই ছিল এখানে সে দিনও। জানলা ফাঁক করে তারা লুকিয়ে দেখেছিল উড়ন্ত কুকুরের ঝাঁক। দেখেছিল গুরু ড্রুকপা কুনলের প্রজ্বলিত জ্ঞানের বজ্র, যার ঝাপসা খবর আগেই তারা পেয়েছিল। লোকমুখে শোনা গেছিল সেই অলৌকিক সংবাদ। খানিক দূরেই আছে আর এক গ্রাম, চাংদানা। সেই গ্রামেই ছেওয়াং-এর বাড়িতে উড়ে এসে নাকি পড়েছিল এক আশ্চর্য তির। তখনও আগুন জ্বলছিল সেই তিরে। এসে গেঁথে গেছিল তাদের দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির কাঠে। ছেওয়াংয়ের যুবতী বৌয়ের নাম পেলসাং। সে-ই যত্ন করে তুলে রেখেছিল তিরটা। পুজো করত রোজ দেবতার মতো। কেন যেন তার মনে হয়েছিল, এই তির দৈবযোগে যুক্ত কোনও দিব্য পুরুষের সঙ্গে। সেই দিব্য জনেরই প্রতীক মনে করে সে দেবতার আসনে বসিয়েছিল তিরটাকে। আর তার কয়েক দিন পরেই এই কাণ্ড। আকাশে উড়ন্ত কুকুরের ঝাঁক, তার পিছনে...

রণিতা অবাক হয়ে শুনছিল সাংগের কথা। যেন সে কোনও ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বেছে তোলা গল্প, শুধু তারই জন্যে। যে কলকাতার কনভেন্টে পড়তে গিয়ে ছোটবেলায় মিস করেছে এই সব কিছু। এখন সে এত বয়সে এসে ক্ষতিপূরণ করছে সেই হারানো ছেলেবেলার। আর একটুও বেয়াড়া লাগছে না তার। কোথাও কোনও সন্দেহ নেই। পাকামো নেই। যেন সত্যিই একজোড়া বিনুনি বাঁধা ছোট্ট বালিকা সে। আর সাংগে তার শতবর্ষজীবী ঠাকুরমা। যে গোটা জগতের সমস্ত রোমাঞ্চ একরাশ অদৃশ্য সূক্ষ্ম কালো পিঁপড়ের মত ছেড়ে দিয়েছে তার সারা গায়ে। তারা শিহরন জাগিয়ে তুলেছে তার শিরায় শিরায়। বুকে মাথায়। অন্তরাত্মায়।

রণিতা বলে, “আমরা কি চাংদানা গ্রামে যাব?”

“যাব, কিন্তু আজ নয়। কাল।”

“ওখানে কি এখনও আছে সেই বাড়িটা? কী যেন নাম বললে মেয়েটার?”

“পেলসাং।”

“হ্যাঁ, পেলসাং। তার বাড়ি...”

“আছে। শুধু তাই নয়, সেই সিঁড়ির কাঠটাও আছে। যেটাতে তিরটা এসে গেঁথে গেছিল। আর আছে পেলসাং-এর বংশধর।”

পেলসাং-এর বংশধর আছে শুনে রণিতার সারা গায়ে এমন শিহরন ওঠে, যে সে কথা বলতে পারে না। বেশ সময় নেয় ধাতস্থ হতে। কেমন যেন বোকা বিস্মিত মুখ করে সাংগের দিকে তাকায়। দেখে সাংগে বলে, “বিশ্বাস হচ্ছে না?”

রণিতা কেমন ভাবালুতার ঘোরে চলে গিয়ে বলে, “আমি কি আর কোনও দিন কলকাতা ফিরে যেতে পারব?”

“মানে?”

“মানে আমার মনে হচ্ছে আমি পাঁচশো বছর পিছিয়ে এসে পড়েছি পনেরো শতকের কোনও এক আধাবাস্তব জাদুর দেশে। আর সেখানেই আটকে পড়েছি চিরকালের মতো। কাইন্ড অব টাইম ট্রাভেল গন রং!”

সাংগে মুখ টিপে হাসে রণিতার কথা শুনে। তার পর বলে, “ওভার-রিঅ্যাক্টিং, রানি!”

রণিতা বলে, “হয়তো তাই। কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই আমার ফিলিং। আমি ভাবতেই পারছি না পেলসাং-এর বংশধরের সঙ্গে আমার দেখা হবে। সেই পেলসাং, যার সঙ্গে গুরু ড্রুকপা কুনলে...”

সাংগে তাড়াতাড়ি বলে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুরু ড্রুকপা কুনলে তাকে কৃপা করেছিলেন। তার গর্ভে নিজের সন্তান দিয়ে তাকে ধন্য করেছিলেন।”

“তা হলে! তার মানে সে ড্রুকপা কুনলের বংশধর! তাই না?”

“হ্যাঁ, আনঅফিশিয়ালি তাই।”

“তবে! ভাবা যায়!”

কিন্তু রণিতা ভেবেই চলে। এই ভাবনা তার মাথা থেকে আর যায় না। তার মনে হয় রাত্রিবাসটা চাংদানাতে করলেই ভাল হত। সেই বাড়িতে। পারলে সেই ঘরে, যে ঘরে তিনি শুয়ে ছিলেন পেলসাং-এর সঙ্গে।

“ওরা হোমস্টে দেয় না?”

“না। ওটা এখন মন্দিরের মতো। লোকে দর্শন করতে যায়।”

“আর সেই তিরটা! ওটা আছে?”

“না। এখন চলো, এ বার অন্ধকার নামবে।”

এগিয়ে যায় সাংগে। এগিয়ে যায় আরাও। ছোট ছোট ভাবুক পায়ে অনুসরণ করে রণিতা। আসন্ন অন্ধকারের আবছায়া ধরে এসেছে মাটির কাঁচা রাস্তায়। দু'পাশের আগাছার সারিতে। যেন এক সান্ধ্য যুগের ভেতর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে কোনও গল্পকথার গ্রামের দিকে। যেখানে আজও পুতুল নাচের মতো জীবনযাপন করে চলেছে প্রাচীন সব চরিত্র। সাজঘরে গেলেই যাদের ছুঁয়ে দেখা যায়। প্রশ্ন করা যায়। পুরু প্রসাধনের নীচে অনুভব করা যায় তাদের নরম মাংস। যেন আসলে সবই সত্যি। কোনও কল্পনাই আসলে কাল্পনিক নয়।

আগুন ঘিরে সন্ধ্যা যাপন করছে পর্যটকেরা। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলে। কত কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল। গান ধরেছে কেউ বা। হয়তো জেসনের মতো কেউ। তাদের ঘিরে আদিম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর উড়ন্ত জীবেরা চক্কর কাটছে তাদের চার দিকে। হয়তো অপেক্ষায় আছে কখন আগুন নেভে। সেকথা জানেই না মানুষগুলো।

“আরও কাঠ দাও। বাড়াও আগুনটা!” অদ্ভুত বিপন্নতা রণিতার স্বরে। যেন আগুন বড় না হলে তার খুব অসুবিধে হয়ে যাবে। ড্যারেল বলে, “কেন, তোমার কি শীত করছে?”

“না।”

“তা হলে! ভয় করছে?”

রণিতা চুপ করে থাকে। ভয় তো তার করছে না। সে তো গুরু ড্রুকপা কুনলের পথে এসেছে। তা হলে ভয় কিসের!

সোরা রণিতার হাতে একটা গ্লাস দিয়ে বলে, “এটা নাও। সব অস্থিরতা চলে যাবে।”

“কী এটা?”

“আরা আরা!”

“আরা! আরে, আরা কোথায় গেল!”

এ দিক ও দিক তাকায় রণিতা। আর দেখতে পায় আরা আছে কাছেই। একটা মাটির ঢিবি, নির্মাণ সামগ্রী হয়তো, তারই চুড়োয় বসে আছে আরা। ঘাড় সোজা করে। কান খাড়া করে। কেমন যেন সন্দেহজনক ভঙ্গিতে। যেন বা ছদ্মবেশী গুপ্তচর! সদা সতর্ক ইন্দ্রিয়, ভেতরের কথা জানার ব্যাকুলতায়।

হয়তো তাই। সন্দেহজনক গতিবিধি কুকুরটার। রণিতার ধারণা, আরা উড়তে পারে। একা এক জনের পক্ষে এক লক্ষ কুকুরকে কব্জা করা কি সম্ভব! একটা দুটো পালিয়ে বেঁচে যেতেই পারে। হয়তো সেই সময় থেকেই আরাও আছে এই নিসর্গের অংশ হয়ে। ছদ্মবেশে তাদেরই এক জন হয়ে, যারা তার জাতিকে ধ্বংস করেছিল। কে জানে কী মতলবে!

যাই হোক বেচারা খায়নি কিছুই সারা দিন। সোরার প্লেটে মাংস পড়ে আছে দু'টুকরো। সে দুটো নিয়ে রণিতা গেল আরার কাছে। একটা পাতা কুড়িয়ে তার ওপর দিল মাংস দুটো। আরা মুখ নামিয়ে শুঁকল। কিন্তু খেল না। রণিতা মনে মনে ভাবল, তা খাবে কেন! এ তো মুরগির মাংস। আর একটা পাতা দিয়ে ডোঙা বানিয়ে তাতে ঢেলে দিল সামান্য আরা। ধরল আবার তার সামনে। সে আবার শুঁকল। কিন্তু খেল না। রণিতা ভাবে, তা রুচবে কেন! এমন ঠান্ডা পানীয়...

সাবেকি কিরা পরা এক তরুণী, ভ্রমণ সংস্থার কর্মচারী হবে, পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রণিতার কাণ্ড দেখে। খুব মজা পাওয়া হাসি হেসে বলল, “ম্যাডাম, কুত্তে কো শরাব পিলা রহি হে!”

রণিতা বলল, “ও কুত্তা নেহি, আরা হে।”

তরুণী বোধহয় খুব রসিক। আরও হেসে বলে, “আরা কো কুত্তা খিলা রহে হ্যায়?”

রণিতার বোধহয় নেশা হয়েছে। সে খানিক জড়ানো উচ্চারণে বলল, “আর ইউ শিওর হি ইজ় আ ডগ?”

তরুণী রণিতাকে চমকে দিয়ে বলে, “আই অ্যাম শিওর হি ইজ় নট আ ডগ।”

“নো?”

“নো।”

“দেন! হু ইজ় হি?”

তরুণী হেসে হেসেই বলে, “শি ইজ় আ বিচ।”

বিচ শুনে আঁতকে ওঠে রণিতা। সান অব আ বিচ নয়, স্বয়ং বিচ। তা হলে তো আরওই চিন্তার বিষয়।

রণিতার আঁতকে ওঠা দেখে খানিকটা বিব্রতই হয় তরুণী। সে বলে, “এনিথিং রং ম্যাডাম?”

রণিতা বলে, “এই ডগ, মানে বিচটা কি এই গ্রামেই থাকে?”

“না।”

“ওকে আগে দেখেছ?”

“না। এই প্রথম দেখছি।”

রণিতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, আরা আসলে কুকুর নয়। কোনও ছদ্মবেশী! কিন্তু এখনও সমান মায়াবী তার চোখ। কত আন্তরিক ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। রণিতার চিন্তা হচ্ছে সে কিছু খাচ্ছে না বলে। সে মেয়েটিকে বলে, “ও খাচ্ছে না কেন?”

“পেট ভরা হয়তো।”

“কিন্তু সারাদিন তো আমার সঙ্গেই আছে।”

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মেয়েটি বলে, “আধা বুনো কুকুর। জঙ্গলে শিকার করে খায় এরা।”

আবার চমকে উঠে রণিতা বলে, “কাঁচা মাংস! আর রক্ত?”

মেয়েটি হেসে বলে, “ওকে আর কে রেঁধে দেবে!”

কেউ ডাকে মেয়েটিকে। মেয়েটি “এক্সকিউজ় মি,” বলে চলে যায়। হঠাৎ রণিতার মনে হল কেউ যেন লোরো বলে ডাকল ওকে। সেই রাক্ষসীর নামে নাম! সে ব্যস্ত হয়ে মেয়েটিকে ফিরে ডাকে, “এই শোনো, শোনো!”

“ইয়েস ম্যাডাম।”

“কী নামে ডাকল তোমায়?”

“ডোলো।”

“ডোলো?”

“ডোলো ইয়েস। এনি প্রবলেম?”

“নো নো। ইটস ওকে। সরি ডোলো। সরি!”

ডোলো চলে গেল। রণিতা আরার দিকে ফিরে বলল, “আমায় কি তোরা পাগল করে ছাড়বি?”

আরা একই রকম মায়াবী চোখে চেয়ে থাকে রণিতার দিকে। যেন তার কথা বুঝেই লেজ নাড়ে অনুগতের মতো। কেমন আপন মনে হয় আরাকে। ভালবাসতে ইচ্ছে করে তাকে, কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বোলাতে। যেন ভয়টাই তার আকর্ষণের মূল শক্তি। নিয়তির শিকার বোধ হয় এমনটাই অনুভব করে। শিকারিকে আপন মনে হয় সবচেয়ে বেশি। জীবনের পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় শিকার হওয়া। আর কারও নয়, একান্ত তারই শিকার হওয়া!

সেই ব্যাকুলতাই কি আজ তাকে অমন দুর্বল করে দিয়েছিল সাংগের সামনে। না হলে সেই বনপথের মাঝখানে, দিনের আলোয় ট্রেক রাস্তার ওপর ও রকম ঘটে! যে রাস্তা ধরে এত লোক হেঁটে এসেছে আজকেই, দেশ বিদেশের অতিথিরা, জনা পঞ্চাশেক তো হবেই! আরা ছিল পাশেই, অন্তহীন প্ররোচনার মতো। একটি বারের জন্যও তো সে জায়গা ছেড়ে নড়েনি। সমানে বসে বসে উপভোগ করেছে তার শিকার হওয়া। পর্যুদস্ত হওয়া।

শেষ পর্যন্ত হার মেনেই নেয় রণিতা। আরার মাথায় হাত বোলায়। গলায় গায়ে আদর দেয়। মাংসের টুকরোটা তুলে নিয়ে তার মুখে দেয়। এ বার আরা আপত্তিও করে না। খেয়ে নেয়। পাতায় ঢালা আরাও চেটে নেয়। রণিতা আর একটু ঢেলে দেয়। সেটাও চেটে নেয়। আবার দেয়। আবার... আবার...। অনেকটা আরা টেনে নেয় আরা। তার পর গোল হয়ে গুটিয়ে বসে নিজের কোলে মাথা গোঁজে। যেন সে এ বার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। কারণ বশ্যতা শিকার করে নিয়েছে এই মানবী।

রণিতা ফিরে আসে আগুনের কাছে। বন্ধুদের কাছে। সেখানে

সাংগেও বসে আছে। আগুনের কাছেই জল। হাতের কাছে আরা। প্লেটে মাংস পনির বাদাম। বিয়ারও আছে। চাইলে রাম হুইস্কিও... আয়োজন ত্রুটিহীন। পেশাদারি দক্ষতায় সম্পন্ন। হয়তো সেই জন্যই প্রাণ নেই। কিংবা কাইতো পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চলে গেছে সবার প্রাণ।

অগত্যা তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে যে যার মতো। দু'জন করে শোওয়ার ব্যবস্থা। অন্যান্য দলেও একে একে কমতে থাকে মানুষজন। বুগিয়ালের মতো চত্বরে ছ'-সাতটা আগুনের কুণ্ড তখনও জ্বলছে। কিন্তু জেগে আছে শুধু একা রণিতা, তারই একটা আগুনের কাছে। সীমানা বরাবর গোল করে লাগানো তাঁবুগুলো অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যেন আলোকিত ফানুস এক একটা। ভেতরে মানুষ নিয়ে এ বার উড়ে যাবে আকাশে। ঘুরিয়ে আনবে মাথার ওপর আড়ালে রয়ে যাওয়া অন্য এক স্পট থেকে। যেন সেটাও ভ্রমণ চুক্তির অঙ্গ এখানে। আশ্চর্য এক ভ্রমণ চুক্তি, যার পুরোটা বাস্তব নয়। পুরোটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পরিসর পেরিয়ে আরও কিছুটা আছে জেনে বুঝে নেওয়ার জন্য। সেটাই বুঝি বা শেষ আকর্ষণ। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ! তারই কাউন্টডাউন শুরু হচ্ছে এ বার!

কেন যেন এ সব কথাই মাথায় আসে রণিতার। ঘুম পাচ্ছে তার। তবু উঠতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ ভাল লাগছে এই একাকিত্ব। এই নিরাপদ বিপন্নতা।

পায়ের শব্দে পিছন ফিরে দেখে সেই মেয়েটা। রণিতা বলে, "এসো লোরো।"

"আমার নাম ডোলো, ম্যাডাম।"

"সরি সরি, ডোলো। এসো।"

তার পাশে বসতে বসতে ডোলো বলে, "ঘুমোতে যাবেন না?"

"উঠতে ইচ্ছে করছে না। জীবনে এমন রাত তো আর কখনও আসবে না!"

"আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানে রাত কেমন হয়?"

রণিতা কলকাতার গল্প বলে ডোলোকে। কলকাতার কলরব। উদ্‌ভ্রান্ত নাগরিকতা। উদ্দামতা, মাদকতা। চাকচিক্য... সব কিছুই বলে নেতিবাচক ভঙ্গিতে। কিন্তু ডোলোর ভীষণ ভাল লাগে সে সব। তার আফসোস এই সব থেকে সে বঞ্চিত। সে কথা সে বলেও ফেলে, "যদি আপনার সঙ্গে জীবনটা অদল বদল করতে পারতাম!"

রণিতা হেসে বলে, "আমি কিন্তু রাজি আছি।"

ডোলো বলে, "আমিও তো রাজি। তা হলে আটকাচ্ছে কোথায়?"

"কোথাও আটকাচ্ছে না। রাজি আছ তো বলো। আমি আমার বরকে ফোন করে বলছি, আমার বদলে এক ভুটানি বৌ নিয়ে থাকো কলকাতায়। আর আমি তোমার বদলে এক ভুটানি বর নিয়ে থেকে যাই ভুটানে।"

রণিতার কথা শুনে ডোলো হাসতে হাসতে বলে, "এই, আমার কিন্তু বর নেই।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ইয়ার্কি থাকে না। রণিতা বুঝতে পারে ডোলো সিরিয়াস। সত্যিই সে কলকাতায় চাকরি করতে চায়। তাকে অনুরোধ করে একটা কাজ দেখে দেওয়ার জন্য। রণিতা ওর ফোন নম্বর, ইমেল আইডি চেয়ে নেয়। কথা দেয় তেমন কিছু পেলে তাকে জানাবে। শেষে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু কেন, ডোলো?"

উত্তর দেয় না ডোলো। হাঁটুর ওপরে থুতনি রেখে অনেক ক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থাকে নিভে আসা আগুনটার দিকে। তার পর ধীরে ধীরে বলে, "যে কারণে তুমি এখানে আসতে চাও। তোমার ওখানে দম আটকে আসে। আমার এখানে।"

রণিতা ডোলোর হাত ধরে। ঠান্ডা নরম হাত। অথচ কত বলশালী মনে হয়। চুপ করে বসে থাকে অনেক ক্ষণ। এক সময় রণিতা বলে, "বিয়ার খাবে?"

ডোলো এক বার পিছন ফিরে দেখে, ওদের অফিস কাম কিচেনের দিকে। তার পর বলে, "দাও।"

রণিতা একটা ক্যান সরিয়ে রেখেছিল পরে খাবে বলে। সেটাই ডোলোকে দেয়। ডোলো অভ্যস্ত হাতে ক্যান খুলে চুমুক দেয়। রণিতা পটেটো চিপসের একটা প্যাকেট এগিয়ে দেয় তার দিকে। বিয়ার শেষ করে ডোলো উঠে দাঁড়ায়। বলে, "চলো, তোমাকে তোমার টেন্টে পৌঁছে দিই।"

"না, আমি যেতে পারব। তুমি যাও। সারাদিন অনেক খেটেছ।"

ডোলো বলে, "আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। এক বার জঙ্গলের দিকে যাব।"

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "সে কী! এত রাতে কেন যাবে জঙ্গলে?"

"যাবে আমার সঙ্গে? নিজের চোখে দেখবে কেন।"

বুগিয়ালের ঢাল বেয়ে নেমে যায় দুই যুবতী। সামনে গভীর বন, জগতের সব অন্ধকার জড়ো করে জমে আছে যেন নিরেট পাথর হয়ে। তারই দোরগোড়ায় ডোলো নিয়ে আসে রণিতাকে। একটা পাথরের গুহার ভেতর। টর্চ জ্বালে। সেই আলোয় রণিতা দেখে একটা কালো পাথর, স্থাপিত বিকটদর্শন দেবতার মতো। ধূপ বাতি খদা দিয়ে পূজিত।

ডোলো এক মুঠো ধূপ বার করে জ্বালায়। একটা প্রদীপ। তার পর প্রণাম করে ভক্তিভরে। করজোড়ে, চোখ বন্ধ করে। রণিতা সেই সামান্য আলোয় দেখে তার মঙ্গোলীয় মুখ। কী অপূর্ব লাগছে ডোলোকে। এই বিকট অরণ্যের ধারে, এক আদিম গুহার ভেতর। রাত-বিরেতে। নিশাচরের চাপা কলরবে মুখর পাহাড়ি আরণ্যক নিসর্গ। মাথার ওপর নিশ্চয়ই উড়ছে ওরা।

রণিতার গায়ে কাঁটা দেয়। ডোলোকে তার ভয় ভয় করে। সে তখনও চোখ খোলেনি। রণিতার মনে পড়ে যায় ঝালং-এর বোক্সির গল্প। তাদের কালা জাদুর সাধনা। ডোলো চোখ মেললে সে কথাই সে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি বোক্সি?"

ডোলো কেমন যেন মুখ করে বলে, "আর কত সম্মান দেবে আমাকে! একটু আগে লোরো বলে ডাকছিলে না?"

রণিতা ডোলোর হাত ধরে বলে, "তুমি দুঃখ পেলে, ডোলো?"

"না তো। দুঃখ পাব কেন। আমি লোরো বা বোক্সি না হলেও ওদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে।"

রণিতা অবাক হয়ে বলে, "মানে?"

"মানে তোমাদের ইন্ডিয়ায় যেমন আর্য অনার্য, সেই রকম। মনে করো এরাই এখানকার অনার্য। আর্যদের দ্বারা উৎপাটিত, অবমানিত।"

রণিতা কোনও কথা বলে না। শুধু চেয়ে থাকে ডোলোর দিকে। তার সারা গা দিয়ে অনুভব করে পরিবেশের রোমাঞ্চ। যেন শিহরনের অদৃশ্য পিঁপড়েগুলো রোমকূপ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে একের পর এক। শিরা ধমনী বেয়ে পৌঁছে যাচ্ছে বুকে পেটে মাথায়। হাড়ে মাংসে মজ্জায়। আর আধঘুমন্ত আধচেনা নিজেরই একান্ত আপন অবচেতনায়। কানে আসে ডোলো বলছে, "তোমাদের দেশে এখনও তো রাক্ষসের পুজো হয়। হয় না? মনে করো আমি এ দেশের রাক্ষসের উপাসক।"

রণিতা বলে, "আমি একটা ধূপ জ্বালাই?"

"নিশ্চয়ই।"

গুহা থেকে বেরিয়ে রণিতা বলে, "হেঁয়ালি না করে সোজা বলো তো এ সব কী ব্যাপার?"

ফানুসের মতো উদ্ভাসিত তাঁবু গুলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে ডোলো বলে, "আমার পরিবার 'বোন' ধর্মের অনুগামী। গুহায় আমাদের দেবতা।" 'বোন' ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে ডোলো বলে, বৌদ্ধরা আসার আগে এই ধর্মই প্রচলিত ছিল এখানে। এমনকি তিব্বতেও। বৌদ্ধরাই ওদের শেষ করে। কাউকে ধর্মান্তরিত করে। কাউকে নিকেশ করে। কাউকে বা ভূতপ্রেত বানিয়ে ছেড়ে দেয় গল্পকথার কল্পলোকে।

রণিতার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় নেওয়ার আগে তার চোখে চোখ রেখে ডোলো বলে, "রাক্ষসী লোরো দুয়েম তাদেরই এক জন। শুভরাত্রি!"

রণিতার ঠোঁট দুটো নড়ে শুধু। বেরিয়ে আসে নির্লিপ্ত শব্দ, "শুভরাত্রি!"

তাঁবুর ভেতর পাশাপাশি দুটো বিছানা পাতা ক্যাম্প খাটে। কিন্তু

দুটোই ফাঁকা। শুনেছিল স্টেলা থাকবে ওর সঙ্গে। কে জানে কোথায় গেল! আর মাথা না ঘামিয়ে শুয়ে পড়ে রণিতা। সারাদিনের ক্লান্তি ঘুম হয়ে চেপে আসে তার ওপর। কাবু করে ফেলে তাকে প্রায় পুরোপুরি। কিন্তু কোথায় যেন বাধা পায় নিরঙ্কুশ ঘুম। ঘুমের ভেতরকার শূন্যতা যেন ঠিক শূন্য নয়। আবছায়ারা সঞ্চরমাণ রয়েছে তার ভেতরে। আভাসে আন্দাজে ঠাহর করা যায় তাদের গতিবিধি। তাদের উপস্থাপনা। যেন যাত্রার মাঠে চটের ঘেরাটোপের বাইরে বসে কোনও পৌরাণিক পালার আবছা অভিনয় দেখছে। লুকিয়ে। অন্ধকারে একা একা। অনেকটা দূর থেকে।

চোখ বন্ধ করে অনেক ক্ষণ পড়ে থাকে রণিতা। কিন্তু তার আধো-ঘুম অবস্থা একই রকম রয়ে যায়। শেষে তাঁবুর বাইরে কোনও শব্দে সে চোখ মেলে। দেখে ভেতরের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। রিচার্জেবল আলো। ঝিমিয়ে পড়েছে। হয়তো তারই মতো। ঘুম দরকার তারও। আর মনে হয় ঘুমিয়ে পড়বে এ বার পুরোপুরি। তখন অন্ধকারে...

অগত্যা উঠে পড়ে রণিতা। সোজা তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। চার দিক শুনশান। সব তাঁবুই ম্লান হয়েছে আগের চেয়ে। আগুনগুলো তখনও জ্বলছে মৃদু। অথবা শিখাহীন অঙ্গার উজ্জ্বল হয়ে আছে অন্ধকারে।

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সংখ্যায় বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। খুব জোর ছ'টা সাতটা আগুন ছিল মনে আছে। এখন তো গুনে দেখলো রণিতা, তেরোটা! কী করে হল! কোনও মানুষজনের তো দেখা নেই কাছাকাছি!

কাছ থেকে দেখার জন্য রণিতা এগিয়ে যায় আগুনের দিকে। নিভে এসেছে। ক'টা কাঠ দিয়ে দেয় সে। পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া। তার পর দপ করে জ্বলে ওঠে আগুন। দেখে ভাল লাগে রণিতার। সে এগিয়ে যায় পরের আগুনটার দিকে। তাকেও উস্কে দেয় নতুন কাঠ দিয়ে। একে একে সে একাই যত্ন নেয় তেরোটা আগুনেরই। আর শেষ আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখে সে তাঁবু থেকে বহু দূর চলে এসেছে। বুগিয়ালের শেষ প্রান্তে। কাছেই সেই বনরেখা যার প্রান্ত ছুঁয়ে সেই গুহা। যেখানে ধূপ জ্বেলে দিয়ে গেছে সে কিছু ক্ষণ আগেই। কী জানি কেন, রণিতাকে ভীষণ টানে গুহাটা। মনে হয় আর এক বার দর্শন করে আসে সেই পর্যুদস্ত দেবতার। কলকাতার মহিষাসুরের মতই সে অবমানিত! অপবাদিত!

আশ্চর্য, তার একটুও ভয় করে না। মনে হয় পাড়ার দোকানেই যাচ্ছে বিস্কুট কিনতে, দিনমানে। যা সে আগেও করেছে বহু শত বার। সেই রকমই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গুহার দিকে পা বাড়ায় রণিতা।

গুহার কাছাকাছি একটা গুঞ্জনধ্বনি যেন শুনতে পায় রণিতা। ভীষণ কৌতূহলী হয়ে সে আরও এগিয়ে যায়। গুহার মুখে এসে দেখে ভেতরে পুজো চলছে। বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে মাঝখানে। হোমাগ্নির মতো। আগুন ঘিরে অনেক নারী-পুরুষ। দেখে মনে হয় স্থানীয় মানুষজন। যদিও খানিক পুরনো দিনের মতো বেশভূষা চুল চেহারা। সকলেই ভক্তিভরে হাতজোড় করে বসে আছে। মন্ত্র পাঠ করছেন এক জন পুরোহিত। আসলে শমন। তান্ত্রিক পুরোহিত। পুরুষ কিন্তু বিনুনি করা লম্বা চুল। গলায় একগুচ্ছ রঙিন পাথরের মালা। পরনে সাদা জোব্বা। কোমরবন্ধ। হাতে রঙিন ফিতে সুতো ইত্যাদি বাঁধা একটা দণ্ড। শমনের আদিম মুখে লোলচর্মের সহস্র ভাঁজ। কোটরাগত ওল্টানো দুই চোখে অপ্রকৃতিস্থ ঘোলাটে ভাব। দ্রুত চাপা উচ্চারণে অবিরাম মন্ত্র পাঠ করে যাচ্ছেন। ধূপধুনো ধোঁয়ায় ভরে গেছে গুহার ভেতরটা। মনে হয় যেন সব কিছু ঘটে চলেছে ঘন কুয়াশার ভেতরে। আবছায়ার আড়ালে। কিন্তু আগুনের উজ্জ্বল বৈপরীত্যে।

তবু রণিতা আড়াল নেয়। গুহামুখের এক পাশে পাথরের খাঁজের ভেতর লুকিয়ে পড়ে। লুকিয়ে দেখতে থাকে ভেতরের কর্মকাণ্ড।

হঠাৎ পশুর ডাক কানে আসে। খেয়াল করে একটা বিরাট কালো শুয়োর। বুনো কি না বুঝতে পারে না। দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। তার গায়ে দড়ি বাঁধা। গলায় সাদা সিল্কের খদা পরানো।

গুহার দেওয়ালে আঁকা একটা স্বস্তিকা চিহ্নের ওপর হাত রাখেন তান্ত্রিক পুরোহিত। আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কাঁপুনি ওঠে তার সারা শরীর জুড়ে। মাথাটা হেলে যায় পিছন দিকে। আর কী করে যেন, রণিতা পরিষ্কার দেখতে পায় তার চোখ দুটো উল্টে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে এক্ষুনি তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে আছড়ে পড়বেন। সেই উত্তেজনা উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। অস্থির চাঞ্চল্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সকলে। চার দিকে উৎকণ্ঠা। আর তখনই...

চমকে ওঠে রণিতা। আচমকাই একটা কোলাহল ভেসে আসে পিছন দিক থেকে। রণিতা চকিতে পিছন ফিরে দেখে এক দল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, হাতে অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসছে। মারমুখী তাদের ভঙ্গি। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, তাদের পুরোভাগে স্বয়ং সাংগে।

রণিতা কিছু বোঝার আগেই তারা হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে গুহার ভেতর। নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার ওঠে ভেতরে। আগুনের ওপরে বোধহয় ভারী কিছু গিয়ে পড়ে। নিমেষে নিভে যায় আগুন। কিন্তু আগুনের ফুলকি ভরে যায় গোটা গুহায়। সেই ফুলকি ওড়া আলো-আঁধারির ভেতর হুড়োহুড়ি শুরু করে অসংখ্য মানবিক অবয়ব। তারস্বরে চিৎকার করে অজানা ভাষায়। কাঠ ধাতু পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ আসে কানে।

এ বার রণিতা সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। পাথরের খাঁজ থেকে বেরিয়ে সে পালাতে যায়। তখনই যেন লোহার হাত দিয়ে সজোরে কেউ টিপে ধরে তার গলা। সে চিৎকার করে ওঠে যন্ত্রণায় আর কানে আসে চেনা কণ্ঠে কেউ বলছে, “কী হল! কী হল রানি? চিৎকার করছ কেন?”

রণিতা চোখ মেলে দেখে সাংগে ঝুঁকে আছে তার ওপর। শান্ত চোখে চেয়ে আছে, যেন কত দিনকার বন্ধু। পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে আছে স্টেলা। রিচার্জেবল আলোয় উজ্জ্বল রঙিন তাঁবুর ভেতরটা। রণিতা কিছু বলে না। সাংগে নিজেই বলে, “স্বপ্ন দেখছিলে বোধহয়। পাশ ফিরে শোও, ঠিক হয়ে যাবে। গুড নাইট।”

সাংগে বেরিয়ে যায়। পাশের বিছানায় শুয়ে কম্বল চাপা দিয়ে স্টেলা বলে, “গুড নাইট, স্লিপ টাইট!”

কিন্তু রণিতা ঘুমোয় না। কিছু ক্ষণ শুয়ে থাকে চুপ করে। তার পর সে বাইরে এসে দাঁড়ায়, চুপিসাড়ে। উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁবুগুলো, জীবন্ত ফানুসের মতো। সামনের চত্বরে নিভে এসেছে আগুনগুলো। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। এক দুই তিন... গুনতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দেয় রণিতার। ঠান্ডা হিমেল স্রোত বয়ে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে। কারণ আগুন আছে তেরোটাই।

রণিতা আবার তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ে। স্টেলার বিছানায় গিয়ে বসে। সে তখনও ঘুমায়নি। স্টেলা চোখ মেলে বলে, “কিছু বলবে?”

রণিতা নির্লিপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, “কোথায় ছিলে এত ক্ষণ?”

“সাংগের সঙ্গে।”

“অন্য তাঁবুতে?”

“না, জঙ্গলে। ওই যে ওখানে একটা গুহামন্দির আছে না, ওইখানে।”

“গুহায় কিছু দেখলে?”

“দেখলাম তো। ধূপ, বাতি জ্বলছে।”

“আর?”

“আর কিছু না। আমরা উল্টো দিকে একটা সুন্দর জায়গা দেখে সেখানেই বসলাম।”

“বসলাম মানে?”

স্টেলা এ বার উঠে বসে। বেশ খানিক বিরক্তি দেখিয়ে বলে, “তুমি এত জেরা করছ কেন বলো তো! হোয়াটস রং?”

রণিতা একই রকম নির্লিপ্ত গলায় বলে, “সরি! নাথিংস রং। গুড নাইট!” তার পর হেসে বলে, “স্লিপ টাইট!”

নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে রণিতা। কান পেতে শোনে বাইরে থেকে ভেসে আসা নানা রকম শব্দ। কিছু চেনা। বেশির ভাগই অচেনা। কে জানে কোন শব্দের কী মানে। সবই কি নিছক শব্দ! না কি আছে কিছু বার্তা। কিছু সতর্কতা! অথবা দুর্বোধ্য কিছু হুমকি!

সকালে আবার সবই মনোরম। মুখর চার দিক বিশ্ব বাউন্ডুলে সমাবেশে। চা নাস্তা প্রাতঃকৃত্য। শরীরচর্চা প্রার্থনা যোগব্যায়াম। তার পর আবার গতিমান কারবাঁ।

কিন্তু রণিতা খেয়াল করল, এক ঘণ্টাও লাগল না গোটা দলটার নিসর্গের ভেতর বিলীন হয়ে যেতে। এতগুলো মানুষ, সঙ্গে মালবাহী খচ্চর ডজনখানেক, এমনকি তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার অনুরণন পর্যন্ত নেই বাতাসে। কত সহজে মানুষকে একা করে দেয় এই অরণ্য।

তিলোগাং-এ গিয়ে আবার দেখা হয় সবার সঙ্গে। সেখানে চায়ের বিরতি। শান্ত সমাহিত নির্জন গ্রামটা হঠাৎ কেমন কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে। এক চলমান বহুভাষিক আন্তর্জাতিক কোলাহল। যেন দূষণ ফেরি করে বেড়াচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। পৌঁছে দিচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামে। ভাল ব্যাপার, কোন গ্রামই গ্রহণ করছে না সে দূষণ। তারা চলে গেলেই স্মৃতির ঘরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সব অস্থিরতা। যা কিছু বহিরাগত, সব।

হয়তো সত্যি নয় পুরোটা। কাউকে বা দূষিত করে দিয়ে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। তাদের চেতনার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে উদ্‌ভ্রান্ত মেট্রো ভাইরাস। তখন ডোলোর মতো নব প্রজন্ম অশান্ত হয়ে উঠছে এই প্রশান্তির আতিশয্যে।

কিন্তু ডোলোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, রণিতা ভাবতে পারেনি। চাংদানা, যেখানে পড়েছিল গুরু ডুকপা কুনলের তির, সেখানেই নাকি তার মামার বাড়ি। তাদের আগেই সে সেখানে পৌঁছে গেছে। ডোলো রণিতাকে দেখেই ছুটে আসে তার দিকে। তাকে দেখে রণিতা ভাবে, এত উজ্জ্বলও মানুষ হাসতে পারে!

তার পর তো সে বিরাট ঝুলোঝুলি। তার মামার বাড়ি যেতেই হবে রণিতা বলে, “আরে, আমি পেলসাং-এর বাড়ি যাব।”

“পেলসাং আমার আত্মীয়। আমি পরে নিয়ে যাব।”

“কিন্তু দল তো চলে যাবে!”

“যাক না, তুমি কাল যেয়ো।”

“আমি রাস্তা চিনি না।”

“আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।”

“হোটেলে আমার মালপত্র...”

“সব থাকবে, কেউ নেবে না।”

“কিন্তু ডোলো...”

“কোনও কিন্তু নয়।”

এমন করে সে জড়িয়ে ধরে রণিতাকে, যেন সে মায়ের পেটের বোন। কোনও সঙ্কোচ নেই, কোনও দূরত্ব নেই, যেন তাকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দের সীমা নেই। তেমনই ওর মামার বাড়ির লোকগুলো। ‘আমার কলকাতার দিদি’ বলে ডোলো দিব্যি তাকে ভিড়িয়ে দিল পরিবারে। বাচ্চা থেকে বুড়ো, পরিবারের আট জন সদস্যই তাকে মেনে নিল নবম সদস্য হিসেবে। যেন চাইলে সে থেকে যেতে পারে আজীবন। গুরুর তিরের কাছাকাছি। তারই বংশধরের প্রতিবেশে।

রণিতা অবাক হল দেখে ট্যুর গাইড ছাড়া কেউই তার খোঁজ করল না। ডোলো গাইডকে জানিয়ে দিল রণিতা কাল ফিরবে। গাইড চলে গেল গোটা দলকে নিয়ে। সাংগে যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। কাল রাত থেকে তার আচরণ হঠাৎ বদলে গেছে। কী জানি, হয়তো সেই গুহামন্দিরে তার আসল রূপ দেখে ফেলেছে সে। সেও বুঝেছে ধরা পড়ে গেছে!

ডোলোর মামার বাড়ি যেন তারই মামার বাড়ি। যদিও ছোটমামা রণিতার চেয়েও ছোট। অবিবাহিত। ডোলো বলে, “আমার মামি হয় এখানে রয়ে যাওয়ার পথ কিন্তু খোলা আছে।”

“তা হলে কি তোমার পথটাও খুলে যাবে ভাবছ?”

“না বাবা! আমি সেকেন্ড হ্যান্ড মাল নেব না।”

“মাল কী গো! আমার ইঞ্জিনিয়ার বর। জানো কত ট্যালেন্টেড!”

মামার বাড়িতে সবাই জাতীয় পোশাক পরে আছে। ছেলেরা ঘো, মেয়েরা কিরা। মেয়েদের পোশাক রণিতার ভালই লাগে। মেজ মামির এক সেট নিজে পরেও নেয়। কিন্তু ছেলেদের পোশাকটা তার অসম্পূর্ণ মনে হয়। উঠতে বসতে ওই ভাবে হাঁটুর উপর পর্যন্ত বেরিয়ে থাকার মধ্যে একটা অসভ্যতা আছে। অথচ ঊর্ধ্বাঙ্গে কাপড়ের আধিক্য। এই পোশাকের জন্যই বোধহয় ডোলোর ছোট মামাকে তার ঠিক পছন্দ হয় না। অথচ দেখতে মন্দ নয়। চেহারা ভীষণ ভাল। নাম তার কর্মা। রণিতা ভাবে ঘুরে ফিরে আবার সেই কর্মা। মনে পড়ে, সে কর্মাকে কথা দিয়ে এসেছে, শক্তি বাড়িয়ে সে ফিরে যাবে ডুয়ার্সে। কর্মা তাকে নিতে

আসবে সীমান্তে, তার বাইক চড়ে। হয়তো সে কাল পরশু চলে যেতে পারত। কিন্তু কাইতো জড়িয়ে রেখেছে আইনি ঝামেলায়। চিমি লাখাং ফিরে থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা আজই। যাকগে, যা হওয়ার হবে! ভাবে রণিতা।

সন্ধেটা দারুণ কাটে ডোলোর মামার পরিবারের সঙ্গে। তিন মামা দুই মামি দাদু দিদা। আর দিদার মা। সঙ্গে চার জন শিশু। ওদের ধরলে পরিবারে বারো জন সদস্য। তবে তাদের বয়স নগণ্য। সবচেয়ে বড়টাই তিন পেরোয়নি এখনও। ও দিকে দিদার মা, একশো হল বোধহয়। এক ছাদের তলায় চার পুরুষের বাস। অথবা চার নারীর। মানে প্রজন্ম আর কী! দারুণ ব্যাপার তো বটেই।

রণিতার এর চেয়েও মজা লাগে দেখে যে, একতলায় গোয়ালঘর। গোয়ালঘর নয়, রীতিমতো পশুশালা। সেখানে গরু ছাগল ভেড়া মুরগি শুয়োর খচ্চর... কী নেই। বাইরে দিয়ে আলগোছে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি। পশুশালার প্রবেশপথ বাড়ির পিছন দিকে। ফলে সামনে থেকে বাড়িটা দেখতে আর সব ভুটানি বাড়ির মতোই। এমন এক বাস্তুকারের তৈরি, যিনি সারা জীবন মাত্র দু'রকমের ইমারতই বানিয়েছেন, দুর্গ অথবা মন্দির। বসতবাড়ি বানাতে গিয়ে তিনি এই দুইয়ের মিশেল ঘটিয়েছেন। তাই ভুটানের সব ইমারতই দেখে মনে হয় অংশত মন্দির, অংশত দুর্গ।

শুনে ডোলো বলে, "ভাল বললে তো। নাও এটা খেয়ে বলো তো কেমন হয়েছে।"

রণিতা খেতে বসেছে সবার সঙ্গে। দোতলার বড় হল ঘরে, মেঝের ওপর। গালিচা পেতে। পরিবারের সবাই। পিকনিক পিকনিক ভাব। দুই মামি পরিবেশন করছে। লাল ভাত, এমাদাসি, ডাল আর শুয়োরের মাংস। রণিতা বলে, "সবই নিজেদের উৎপাদন, তাই না?"

"অলমোস্ট।"

সবাই মিলে তাদের কাজকর্ম, খেতিবাড়ির বিবরণ দেয়। কৃষি পশুপালন ছাড়াও টুকটাক বস্ত্র বয়নও আছে। খাদ্যসামগ্রী সবই গৃহজাত। দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যবসা আছে।

"দরকারি সরঞ্জাম কোথায় পাও?"

"প্রায় সবই গ্রামে পাওয়া যায়। না হলে পাশের গ্রামে।"

"মানে আপনারা কোনও কিছুর জন্যই পরনির্ভর নন?"

একটুও না ভেবে ডোলোর দাদু বলেন, "না!"

"মানে কলকাতা দিল্লি তো দূর, পারো পুনাখা থিম্পুরও দরকার নেই আপনাদের।"

রণিতার কথা শুনে হাসেন বৃদ্ধ। বাকিরাও মজা পায়। বড়মামা উত্তর দেন, "ডিপেন্ডস।"

"অন?"

"অন ইয়োর অ্যাস্পিরেশনস।"

রণিতা ভাবে, বুনো এক গেঁয়ো চাষা ইংরেজিতে থিয়োরি দিচ্ছে। এও কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। সে কৌতূহল দেখিয়ে বলে, "যেমন?"

"যেমন, যদি আমার বাবার কথা বলেন, তাঁর কাউকে দরকার নেই। যদি আমার কথা বলেন, সামান্য অসুবিধে হবে, কিন্তু চালিয়ে নেব।"

তার পর তিনি ডোলোর দিকে তাকিয়ে বলেন, "যদি আমার এই ভাগনির কথা বলেন, ওর গোটা বিশ্বকে দরকার।"

রণিতা হাসে। বলে, "গ্লোবালাইজ্‌ড?"

"হয়তো তাই, কিন্তু আমাদের এখানে বলে, স্পয়েল্ট।"

রণিতা ডোলোর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলে, "স্পয়েল্ট চাইল্ড?"

ডোলো বলে, "জেনারেশন গ্যাপ!"

রাতে এক বিছানায় শোয় দু'জনে। চাপাস্বরে গল্প করে অনেক রাত পর্যন্ত। ভুটান আর কলকাতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু প্রাসঙ্গিক মনে হয়, সব বিষয়ে। শেষে এক দার্শনিক ঐকমত্যে পৌঁছয় দু'জনে, প্রকৃতিগত ভাবে সব মানুষই যাযাবর। তাকে এক জায়গায় আটকে রাখতে হাজার বাঁধন লাগে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক। এমনকি রাজনৈতিকও। তবুও অনেককেই আটকে রাখা যায় না। সব বাঁধন ছিন্ন করে তারা ঠিক বেরিয়ে পড়ে পথে। বেরিয়ে যে সব সময় ভাল হয় তা নয়, কিন্তু না বেরিয়ে সে পারে না।

সকালে রণিতা যায় গুরু ড্রুকপা কুনলের স্মৃতিবিজড়িত কাষ্ঠখণ্ড দেখতে। গিয়ে দেখে খণ্ড নয়, গোটা সিঁড়িটাই রাখা আছে ছেশমের ভেতরে।

"ছেশম মানে অল্টার। দেবতার থান বলতে পারো," এখানে গাইডের কাজ করে ডোলো।

বাড়িটা এখনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীনেই আছে। বর্তমান মালিক খান্ডু। বাড়ি তার চারতলা।

"তখনও কি চার তলাই ছিল?" জিজ্ঞেস করে রণিতা।

"যখন তির এসে পড়েছিল?"

"হ্যাঁ?"

"না, তখন দোতলা ছিল। এই বারো ফুটের সিঁড়ি দিয়েই দোতলায় উঠত।"

"গুরু ড্রুকপা কুনলেও উঠেছিলেন এই সিঁড়ি দিয়ে?"

"শুধু ওঠেননি, পেলসাংকে রেপও করেছিলেন এই ঘরেই। হয়তো এই বিছানাতেই!"

"রেপ!"

"হতেও পারে। পেলসাং রাজি ছিল কি না, সে তো আর জানার উপায় নেই।"

তার পর ডোলো ড্রুকপা কুনলে আর পেলসাং ভুত্রিমোর প্রথম সাক্ষাতের গল্প বলে। গুরুজি পেলসাংকে নাকি তিব্বতে থাকতেই স্বপ্নে দেখেছিলেন। ধোঁয়াটে চেহারার এক ভুটানি নারী তাকে তির নিক্ষেপ করতে বলছে। সকালে উঠেই তিনি ভুটানের দিকে তির ছোঁড়েন। তার পর বেরিয়ে পড়েন সেই তিরের খোঁজে।

"মজার ব্যাপারটা কী জানো?"

"কী?"

"তিরটা উড়ে এসেছিল ঠিক একশো উনসত্তর কিলোমিটার পথ।"

"এতে মজার ব্যাপারটা কী?"

"দেখছ না ফিগারটা! এর মধ্যে সিক্সটি নাইন আছে। সিম্বলিক!"

কথাগুলো বলে ডোলো খুব হাসে। বোঝাই যায় তার শ্রদ্ধা কম। যদিও এই পরিবার তার আত্মীয়তার পরিসরের মধ্যেই পড়ে। আসলে তো সে বুদ্ধিস্ট নয়। হয়তো সেই জন্যই।

"তার পর বলো?"

"তার পর একশো উনসত্তর কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গুরু ড্রুকপা কুনলে এসে হাজির হলেন ছেওয়াং-এর বাড়িতে।"

"ছেওয়াং?"

"তোয়েব ছেওয়াং। পেলসাং এর স্বামী।"

"ও আচ্ছা।"

"গুরু ড্রুকপা কুনলে ছেওয়াংকে তার তিরের কথা বললেন এবং সেটি ফেরত চাইলেন। ছেওয়াং তাকে অনুরোধ করলেন তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে। আর জানালেন সেই তির তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধাভরে রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে ছেশমের ভেতরে স্থাপন করেছে। পুজো করে সে তার নিয়মিত।"

শুনে গুরু তার স্ত্রীকে দেখতে চাইলেন। পেলসাং সামনে এসে দাঁড়াতেই তাকে দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। হয়তো ভাবেন এই তো সেই ধূমাবতী যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিল। কিন্তু সামনাসামনি তাকে ধোঁয়াটে লাগে না মোটেই। সদ্য প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল পুষ্পের মতো মুখমণ্ডল বিশিষ্ট এক যুবতী সে। তাকে দেখেই গুরু ড্রুকপা কুনলে গান ধরেন—
দেখি যে তির আমার/ হয়নি ভ্রষ্ট একেবারে/ আমায় যে এনেছে ডেকে/ এই যৌবনবতীর মুক্ত দ্বারে/ ওহে আমার গৃহকর্তা, ছেওয়াং/ বাইরে এখন ভাগো তুমি/ এই মুহূর্তে এর সঙ্গে/ যৌনসঙ্গম করব আমি।"

শুনে রণিতা বলে, "বাপ রে!"

"তবে আর বলছি কী!"

"এমন সরাসরি?"

"গুরু তেমনই ছিলেন। কোনও রাখঢাক নেই। কোনও মেয়েকে পছন্দ হলে সরাসরি প্রস্তাব দিতেন। বিশেষ করে ডাকিনীর লক্ষণযুক্ত

নারীদের প্রতি তিনি ভীষণ আকৃষ্ট হতেন। পেলসাং ছিল তেমনই।"

"ডাকিনী?"

"হ্যাঁ। ডাকিনী লক্ষণযুক্ত। নেগেটিভ কিছু না। এরা সেক্সি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমতীও হত। বা এখনও হয়।"

রণিতা রসিকতা করে বলে, "যেমন তুমি?"

ডোলো বলে, "তোমার মতো অতটা নই!"

"হেই! আমি ডাকিনী?"

"লক্ষণ মিলিয়ে দেখো। তার পর তুমিও তো এসেছ সেই প্রতীকী তিরের সন্ধানে। তাই না? যেমন এসেছিলেন গুরু ডুকপা কুনলে। সেই যুগে। হিস্ট্রি রিপিটিং ইটসেল্ফ!"

তখন রণিতা হাত বাড়িয়ে সিঁড়িটা স্পর্শ করেছে। সাধারণ কাঠের তৈরি বারো ফুটের এক সিঁড়ি। তার এগারোটা ধাপ। কিন্তু ডোলোর নেপথ্য ভাষ্যের মতো মন্ত্রকথার জাদুতে মনে হচ্ছে যেন সে এক ইতিহাসের সেতুবন্ধন। রণিতা সওয়ার সেই সিঁড়িতে। ইতিহাসের এক ফিরতি পথের যাত্রায় নেমেছে একাকী।

মগ্ন নিঝুম এক মেঘলা সকাল। অথবা দিনশেষের বিষণ্ণ আলো। সেই একই আধা বাস্তব রহস্যঘন নিসর্গ। তারই ভেতর মরণশীল ক্ষুদ্র চরিত্র গুটিকয়েক। চরিত্ররাও জানে সে কথা। জানে সে রইবে না এই হাড়ে-মাংসে। নিসর্গের মাটি-পাথরের মতো। কিংবা এই আলো আর আঁধারের মতো। তাই তার গল্প চাই! গান চাই! কবিতা চাই! চাই কিংবদন্তি। তারই ভেতরে সে বয়ে যাবে পাল্লা দিয়ে এই আলো-আঁধারের ভেতর। এই নিসর্গের নীরবতার ভেতর। অর্ধসহস্র বছর পরেও কোনও বহিরাগত তার ফেলে যাওয়া জীবাশ্ম ছুঁয়ে শিউরে উঠবে তপ্ত শরীরের তীব্র প্রতিক্রিয়ায়।

আর তাতেই রণিতা চমকে উঠে সরিয়ে নেয় হাত। যেন ছেঁকা লেগেছে। অথবা ইলেকট্রিক শক। ডোলো বলে, "কী হল?"

রণিতা কোনও উত্তর দেয় না। চুপ করে সে সামনের দিকে চেয়ে থাকে কিছু ক্ষণ। তার পর যেন বর্তমানে ফিরে এসে বলে, "তখন ছেওয়াং কী করল?"

"ছেওয়াং তখন তাই করল, যা একজন পুরুষের করা উচিত। সঙ্গিনীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিপক্ষে যতই সে ডুকপা কুনলে থাকুন। ছেওয়াং ক্রোধে অন্ধ হয়ে আক্রমণ করল তারই অতিথিকে। রীতিমতো শাণিত তরোয়াল নিয়ে। তত ক্ষণে কামোন্মত্ত গুরু যুবতী পেলসাং-এর গায়ে হাত দিয়ে দিয়েছেন। জড়িয়ে ধরেছেন তাকে। সেই অবস্থাতেই তরোয়াল চালিয়ে দিয়েছে ছেওয়াং।"

গল্প শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে পড়ে রণিতা। কেমন যেন করতে থাকে তার সারা গা। বিশেষ করে স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো। যা তার নির্মাণের সমস্ত অহঙ্কারকে নস্যাৎ করে তাকে পর্যবসিত করে রক্তমাংসের এক সামান্য স্ত্রী জীবে, ঠিক সেই রকম অনুভূতি হতে থাকে রণিতার। তার ছায়া হয়তো পড়েছে তার চোখে মুখে। ত্বকের আভায়, নাকের পাটায়। ঠোঁটজোড়ার স্ফীতিতে। নয়নতারার প্রসারণে। তাই গল্প থামিয়ে ডোলো বলে, "আর ইউ ওকে রানি?"

রণিতা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে অপ্রস্তুত হেসে বলে, "অ্যাম গুড! অ্যাম গুড! বলো বলো তার পর বলো!"

কিন্তু হঠাৎ কেউ নীচতলা থেকে ডোলোকে ডাকে।

"এক্ষুনি আসছি!" বলে সে দৌড়ে নেমে যায়।

রণিতা একা দাঁড়িয়ে থাকে সেই রহস্যময় সিঁড়ির সামনে। যাকে কোনও ভাবেই সিঁড়ি মনে হচ্ছে না। কারণ ছেশমের সুসজ্জিত বর্ণময় থানে মাত্র ফুট দুয়েক দেখা যাচ্ছে সিঁড়িটার। বাকিটা চোখের আড়ালে। ছেশমের পিছনের দেওয়ালেরও পিছনে কোথাও আছে। যেটুকু দৃশ্যমান, তাতেও সিল্কের একাধিক খদা জড়ানো। তার সামনে ধূপ বাতি পিতলের প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ওপরে গোলাকার টুপির মতো খোরলো অবিরাম ঘুরে চলেছে। বহিরঙ্গের আন্দোলন বলতে ওটুকুই। বাকি সব স্থির। যেন ইতিহাসের জাদুঘরে সংরক্ষিত একখণ্ড সময়। ওপর ওপর যা নিষ্প্রাণ। জড়তাগ্রস্ত।

অথচ তার অভিঘাত সামলাতে না পেরে রণিতা কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। ডোলো চলে যাওয়ার পর আরও তীব্র হয়েছে তার অস্থিরতা, যেন বা তাকে একা পেয়ে...

কিছু একটা অবলম্বনের খোঁজে আকুল হয়ে ওঠে রণিতার প্রাণ। মনে হয় পা দুটো পারছে না তার ভার বহন করতে। দেহযন্ত্র পারছে না ভারসাম্য ধরে রাখতে।

হয়তো রণিতা পড়েই যেত ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। তখনই একটা অবলম্বন পেয়ে যায় গায়ের কাছেই। পিছন দিকে। যেন ঠেস দেওয়ার মতো একটা স্তম্ভ মেঝে ফুঁড়ে উঠে এসেছে শুধু তারই জন্য। ইমারতি ভরসা নিয়ে হালকা স্পর্শ দিয়েছে তার পিঠে। রণিতা পিছন ফিরে দেখে এক সন্ন্যাসী পুরুষ। গভীর মেরুনের ওপর স্বর্ণাভ উত্তরীয়ের ঔজ্জ্বল্য। মসৃণ ত্বকে ঢাকা বলিষ্ঠ বাহুর পূর্ণ নগ্নতা ছুঁয়ে আছে তাকে। রণিতা নিঃসঙ্কোচে সেই বাহু আঁকড়ে ধরে বিস্মিত স্বরে বলে, "সাংগে!"

সাংগে রণিতার ভরসা ফিরিয়ে আনে তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুর বেষ্টনীতে। অর্ধ নিমীলিত চোখে, যেন দৈব স্বরে স্মিত হেসে বলে, "তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে এলাম!"

রণিতা কিছু বলে না। নিজেকে গুটিয়ে আরও কমনীয় করে সঁপে দেয় সাংগের সন্ন্যাসী সাজের ভেতর। সাংগে তার দুই হাতের বেষ্টনীর ভেতর রণিতাকে গ্রাস করে নিতে নিতে বলে, "কাল রাতে ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি কোনও এক স্তরে এক দেবী দর্শন হল!"

"দেবী?"

"হ্যাঁ, কোনও হিন্দু দেবী। তোমাদের কলকাতায় যেমন হয়। দুর্গা কি কালী পুজোর সময়।"

"তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ! কাল আবার দেখলাম। প্রচুর ধোঁয়া উঠছে এক জোড়া ধুনুচি থেকে। হোমাগ্নি জ্বলছে দাউ দাউ করে। সেই আগুন আর ধোঁয়ার বর্ণময় আবছায়ার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকা দেবীর মুখ। কখনও বা আগুনের ছটায় ঝলসে উঠছে তাঁর মায়াময় দুটো চোখ। কখনও আবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার জালে।"

"তার পর?"

সাংগে এ বার দু'হাতে, যেন অঞ্জলি করে তুলে ধরে রণিতার মুখ। তার পর ভীষণ মগ্ন স্বরে বলে, "হঠাৎ কেউ এক রাশ ধুনো ফেলে আগুনে, আর ঝলসে লাফিয়ে ওঠে আগুন। তখন সেই সুগন্ধি ধোঁয়া ভেদ করে দেখতে পাই দেবীর সম্পূর্ণ মুখ।"

"আঃ লাগছে!"

সাংগে গুরুত্ব দেয় না রণিতার ব্যথাকে। আরও জোরে সে আঁকড়ে ধরে তার মুখ। নিজের মুখের আরও কাছে এনে অপার্থিব স্বরে বলে, "এই মুখ! এই মুখ! তোমার এই ধূমাবতী মুখ। মনে হল তুমি আমায় ডাকছ। আর ঘুমোতে পারিনি। ভোররাতে বেরিয়ে একটা দুধের গাড়ি ধরে ফিরে এলাম অর্ধেক পথ। বাকি অর্ধেক হেঁটে এসেছি পাগলের মতো। শুধু তুমি ডাকছ বলে। এখন বলো রানি, কেন ডাকছিলে আমায়? কেন?"

বলতে বলতে সাংগে অসংখ্য চুম্বন এঁকে দিতে লাগল রণিতার মাথায়, কপালে। সমস্ত মুখমণ্ডলে। অস্বাভাবিক তার ভঙ্গি। যেন খানিক অপ্রকৃতিস্থ!

নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই তাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে সাংগে। যেন সে শিকার ধরেছে। পাছে কেউ কেড়ে নেয়, সেই তার ভয়!

সাংগের অসংলগ্নতায় যেন আবার ফিরে আসে রণিতার জৈব বিপন্নতা। ক্ষীণ ভাবে মাথা তুলতে উদ্যত তার নাগরিক অহঙ্কারেরা আবার বিলীন হয়ে যায় সর্বজনীন আদিমতার ভেতর। ছিন্ন ইতিহাসের অনুষঙ্গ আবার টেনে ধরে রণিতা বলে, "ছেওয়াং! ছেওয়াং!"

সাংগে আরও আগ্রাসী হতে হতে বলে, "হে আমার গৃহকর্তা ছেওয়াং। বাইরে এখন ভাগো তুমি...!"

রণিতা কোনও রকমে দম নিয়ে বলে, "তরোয়াল! তরোয়াল! ওর হাতে তরোয়াল!"

সাংগে বাঁ হাত দিয়ে রণিতাকে জড়িয়ে ধরে ডান হাত শূন্যে ঘুরিয়ে বলে, "ও আমার কাছে টিনের তরোয়াল। এখনই আমি দুমড়ে গিঁট মেরে

দিচ্ছি ওর হাতিয়ারে।”

তার পর সত্যিই আর কোনও বাধা আসে না কোনও দিক থেকেই। এক পাশে পাতা ছিল একটা তক্তপোশ। তার ওপর থাক করে রাখা অনেকগুলো বহুবর্ণ লেপ কম্বল। সে সব তছনছ করে সাংগে রণিতাকে নিয়ে তোলে তার ওপর। লেপ কম্বল বালিশ কুশন আর দু'জনের জামা কাপড় এলোমেলো হয়ে যেন গড়ে তোলে হিমালয়ের এক ক্ষুদ্র নরম প্রতিরূপ। তক্তপোশের উপর অযত্নে ছড়ানো এক রঙিন হিমালয়। তাতে পাহাড় পর্বত নদী নালা সবই আছে। আছে তার উত্থান-পতন। রহস্য রোমাঞ্চ আর কিংবদন্তির গোপনীয়তা। আর আছে তার আনাচে কানাচে জাদু! যে জাদু বসে আছে এক সুপ্ত কিন্তু অনন্ত প্রতীক্ষায়। আদিম সেই জাদুর সুপ্তি হয়তো রণিতার বহিরাগত ছোঁয়ায় ভেঙে গেছে। হিমালয়ের মগ্নতা ঠেলে এখন তারা উঠে আসছে। হয়তো তারই শব্দে চমকে ওঠে রণিতা। সাংগের আগ্রাসনের নিচে শরীর কুঁকড়ে সে বলে, “কিসের গোলমাল?”

অধীর স্বরে সাংগে বলে, “ছাড়ো না! আমার দিকে মন দাও।”

“কিন্তু কোলাহল...”

“কাছেই গুম্ফা। সেখানে প্রার্থনা হচ্ছে। তারই শব্দ।”

তাতেও রণিতার মন ফেরে না। আবার সে জানলার দিকে চেয়ে বলে, “দেখো! দেখো!”

তখন খোলা জানলা দিয়ে গলগল করে ঢুকে আসছে ধোঁয়া। ভরে দিচ্ছে ঘর। জমে যাচ্ছে দেয়ালে, মেঝেতে, ছেশমে। তক্তপোশে। আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে সাংগের সাজানো ঝুলন-হিমালয়। দম আটকে দিচ্ছে রণিতার। কোনও রকম সে বলে, “ধোঁয়া! ধোঁয়া!”

সাংগে তার কথাগুলোই যেন কামড়ে ধরে বলে, “ধোঁয়া নয়, মেঘ। তুমি এখন মেঘলোকে আছো। উন্মীলিত করো নিজের অন্তর্দৃষ্টি। অবলোকন করো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন লোকের স্বরূপ।”

ধোঁয়া নয় মেঘ, শুনে রণিতার স্বস্তি হয়। কিন্তু কেমন যেন ঝিম ধরে যাচ্ছে তার মাথার ভেতর। ঘুম ঘুম ভাব। কানে আসছে অবিরাম দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রীয় বাদ্যযন্ত্রের সমবেত অনুষঙ্গ। তালে তালে সেই মন্ত্র তার কানের কাছে আওড়াতে শুরু করেছে সাংগে। তার এক বর্ণও রণিতা বুঝতে পারছে না। অথচ তার সারা শরীর জুড়ে খেলে বেড়াচ্ছে সাংগের সারা শরীর। তারা দু'জনেই এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, কারও গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই।

“কী বলছ তুমি? কী বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!”

এ কথা বলার পরেই রণিতা খেয়াল করে, এ বার সে সব বুঝতে পারছে। সাংগে ঠিক হিন্দিতেই বলছে না কি ইংরেজিতে, তা সে জানে না। কিন্তু বুঝতে পারছে তার সব কথা। সে বলছে, “তুমি তোমার সুকর্ম সুচিন্তা আর সদ্ভাবনার গুনে এই মহাকালের পথে এক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছ। এই মহাকালের পথে তুমি দর্শন করবে একত্রিশটি স্তরে সাজানো আলাদা আলাদা একত্রিশটি লোকের সংক্ষিপ্ত ঝলক। খেয়াল করো এই পৃথিবীর অলোক ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি মহাজাগতিক শূন্যলোকের দিকে।”

হঠাৎ রণিতার বুকের ভেতর এক বিরাট শূন্যতা ঢুকে আসে। ভারহীন অতল পতনের মতো খাঁ খাঁ করে ভেতরটা। সে দু'হাতে তীব্র ভাবে আঁকড়ে ধরে সাংগেকে। আকুল কণ্ঠে বলে, “আমাকে ধরো! আমাকে ধরো! আমি পড়ে যাচ্ছি! পড়ে যাচ্ছি!”

বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোরালো বেষ্টনী রণিতা অনুভব করে নিজের দেহকাণ্ড ঘিরে। কানে আসে সাংগের মগ্ন স্বর, “পড়ে নয়, উঠে যাচ্ছ তুমি। খেয়াল করো গতি উর্ধ্বমুখী, অধোমুখী নয়। এই তো আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি অরূপলোকের প্রথম স্তর। দেখতে পাচ্ছ কী অপূর্ব দেব-দেবীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন চার দিকে।”

রণিতা কিছুই দেখতে পায় না। শুধু মনে হয় তার চার পাশ দিয়ে মেঘেরা তীব্রবেগে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। আর সে সত্যিই উঠে যাচ্ছে আকাশের অভিমুখে। যেন মহাশূন্যের ভেতর এক লক্ষ্যবিন্দুর দিকে। সেখানে পৌঁছনোর তীব্র আকুলতায় পাগল হয়ে যাচ্ছে, অথচ সে বলছে, “গন্তব্য গৌণ। যাত্রাই মুখ্য। উপভোগ করো এই জয়যাত্রা। জয়ের অভিমুখে যাত্রা। জয় হাসিল হলে যাত্রা শেষ হয়ে যাবে।”

সেই চেষ্টাতেই মন দেয় রণিতা। থাকে থাকে একত্রিশটি স্তরে সাজানো একত্রিশটি লোকের স্বরূপ দর্শন। তাকে সাহায্য করে সাংগে। ধাপে ধাপে তাকে এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে তুলে নিয়ে যায়। আর নিজেই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে, “কেমন লাগছে? কেমন লাগছে বলো?”

রণিতা মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিজেকে প্রসারিত করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা আকাশ জুড়ে। অস্ফুট স্বরে বলে, “মনে হচ্ছে স্বর্গের কাছাকাছি এসে গেছি।”

“কিন্তু সেটাই লক্ষ্য নয়। স্বর্গের পরেও আরও স্তর আছে। আছে আরও নানা লোক। সেই মতো উঁচু করো নিজের লক্ষ্য। আরও উচুঁ! আরও উচুঁ!”

স্বর্গাদপি গরীয়সী, কথাটা মাথায় আসে রণিতার। তার পরই হঠাৎ যেন হাল ছেড়ে বসে। হাত-পা শিথিল করে বলে, “আমি পারব না। আমি চাই না।”

আচমকাই শিকারি বাঘের মতো সাংগে খামচে ধরে তাকে। তার বলিষ্ঠ শরীরের সব শক্তি এক করে রণিতাকে টেনে ধরে উঁচু করে সে। অনেকটা উঁচু করে। তার পর অনিয়মিত শ্বাস ফেলে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, “পারবে পারবে! তুমি তোমার সুকর্ম সুচিন্তা আর সদ্ভাবনার গুণে সে যোগ্যতা অর্জন করেছ। তুমি আর সামান্য মানবী নও। তুমি...”

কথাগুলো বলতে যেন ভীষণ পরিশ্রম হয় সাংগের। হাঁপিয়ে ওঠে এমন যে কথা শেষ করতে পারে না। বিস্মিত কণ্ঠে অনিতা নিজেই বলে, “মানবী নই! তা হলে আমি কী?”

“তুমি হলে খামগ্রোমা।”

“মানে?”

“মানে ডাকিনী।”

“ডাকিনী?”

“হ্যাঁ, তুমি আর সামান্য মানবী নও। তুমি দেবীতুল্য ডাকিনী। তুমি... বজ্রযোগিনী!”

রণিতার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। তীব্র শিহরনের স্রোত বয়ে যায় তার শিরদাঁড়া বেয়ে। অস্থির স্বরে সে উচ্চারণ করতে থাকে, “বজ্রযোগিনী! বজ্রযোগিনী!”

হঠাৎ কার আর্তচিৎকারে সংবিৎ ফেরে তার। মাথা তুলে দেখে ডোলো ধরে আছে তার কাঁধদুটো। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। অবাক স্বরে সে বলছে, “কী হল রানি? কী হল?”

রণিতা তাকায় নিজের চারপাশে। পরিপাটি সাজানো ঘর লন্ডভন্ড করে ছেড়েছে সে। নিজের পোশাক-আসাকও আধখোলা। স্খলিত। পাল্টা সে অবাক চোখে তাকায় ডোলোর দিকে। ডোলো আবার বলে, “কী হল? তুমি এমন করছ কেন?”

রণিতা কোনও রকমে বলে, “সাংগে কোথায় গেল?”

ডোলো আরও অবাক হয়ে বলে, “সাংগে এল কখন, যে সে কোথাও যাবে?”

রণিতা আবার ফিরে তাকায় নিজের চার পাশে। থাক করে রাখা লেপ কম্বল সব এলোমেলো। ধামসানো। মেঝেয়

লুটোচ্ছে তক্তপোশ উপচে। গড়িয়ে পড়ে গেছে বালিশ কুশন। আর সেই ধামসানো সাম্রাজ্যের মাঝে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে নিজে। কিন্তু সাংগে কোথাও নেই। অথচ প্রার্থনাসঙ্গীত তখনও শোনা যাচ্ছে। পাতলা মেঘের সর ঢুকে আসছে জানলা দিয়ে। তেমনই ধড়াস ধড়াস করছে তার বুক। বাতাসে দৈব সুগন্ধ মিশে আছে আগের মতোই।

ডোলো তাকে টেনে তোলে। সোজা করে বসায়। উদ্বেগ দেখিয়ে বলে, “শরীর খারাপ লাগছে?”

রণিতা বলে, “মাথাটা...”

ডোলো হেসে বলে, “হ্যাঁ, ওটাই বিগড়েছে মনে হচ্ছে। নাও, এখন একটু হেল্প করো। খাভু দেখলে মারবে দু'জনকেই।”

“খাভু কে?”

“বাড়ির মালিক। সম্পর্কে আমার আশেং।”

“আশেং?”

“সর্ট অব আঙ্কল।”

রণিতা একটু ভাবিত স্বরে বলে, “উনি কি ওপরে এসেছিলেন?”

“না রে বাবা, কেউ আসেনি। আমি আর আন্টি তো দরজার সামনেই বসে ছিলাম।”

রণিতা বসেই থাকে তক্তপোশের উপর। নিজের চুল চেহারা পোশাক-আসাক ঠিক করে। সারা শরীর জুড়ে এখনও প্রকট সাংগের ছোঁয়াগুলো। আদর আগ্রাসন দংশন... অথচ ডোলো বলছে...

হঠাৎ সে ডোলোর হাতটা চেপে ধরে। তার চোখে চোখ রেখে বলে, “তুমি কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছ থেকে। বলো আমায়, কী ব্যাপার? আমি তো পাগল হয়ে যাইনি!”

ডোলো শান্ত ভঙ্গিতে রণিতার কাঁধে হাত রাখে। অনুতপ্ত স্বরে বলে, “তোমাকে একা রেখে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি।”

“কেন?”

ডোলো সামান্য ইতস্তত করে বলে, “আসলে বহু প্রাচীন বাড়ি তো। কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সঙ্গে গল্পকথা কিংবদন্তি কানাঘুষো...”

রণিতা ভীষণ আগ্রাসী ভঙ্গিতে বলে, “কী বলতে চাইছ? ভূতে আমায় রেপ করে গেল!”

এমন তীব্র প্রতিক্রিয়াতেও ডোলো কোনও ভাবান্তর দেখায় না। তেমনই শান্ত স্বরে সে বলে, “ব্যাপারটা অত মোটা দাগের নয়। বাতাস এখানে অনেক সূক্ষ্ম। আরও সূক্ষ্ম তার ভেতরকার আনাগোনা। সামান্য মানুষ তার খেই পায় না। কিন্তু আভাস পায়!”

রণিতা ভাবে, তবে কি ডাকিনী বলেই তার সঙ্গে এ সব হল! সে নাকি সামান্য মানবী নয়। সে জিজ্ঞেস করে, “বজ্রযোগিনী ব্যাপারটা কী?”

“তিনি এক জন দেবী।”

“ডাকিনী?”

“বলতে পারো।”

তার পর হঠাৎ মনে পড়ার মতো করে বলে, “এই তোমাকে তো গল্পটা তার পর বলাই হয়নি।”

“কোন গল্প?”

“ওই যে গুরু ড্রুকপা কুনলে পেলসাংকে দেখে গান করলেন। তার পর...”

“আমি জানি।”

“জানো?”

“হ্যাঁ।”

“কী হল বলো তো?”

“কী আর, ছেওয়াং তরোয়াল নিয়ে গুরুকে মারতে গেল। আর গুরু তার তরোয়ালে গিঁট মেরে দিলেন। তখন ছেওয়াং হাতজোড় করে বলল, ‘আমার বৌও আপনার, বাড়িও আপনার। যত দিন ইচ্ছে থাকুন এখানেই। আমি আপনার চাকর। আপনার সেবাই আমার ধর্ম।’”

ডোলো অবাক হয়ে বলে, “বাঃ! কী করে জানলে?”

“ডাকিনীরা সব জানে!”

ডোলো হেসে বলল, “তার পর কী হল বলো তো?”

“কী আর হবে, গুরু ড্রুকপা কুনলে পেলসাং-এর পেট করে দিলেন। আর সেই বাচ্চার দশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এখানেই বসবাস করে গেলেন।”

“ঠিকই। গুরু যে ক'দিন ভুটানে ছিলেন, বেশির ভাগ সময় এখানেই থাকতেন। তিনি ‘পাঁচ হাজার নারীর সন্ন্যাসী’ নামে পরিচিত হলেও পেলসাং-এর আলাদা জায়গা ছিল তার মনে।”

“হবেই তো। পেলসাং যে ডাকিনী...”

গুরুর গল্পে মেতে ওঠে তারা। তার গল্প যেন ধর্মগ্রন্থ পাঠ। গল্পে মারদাঙ্গা খুনখারাপি সবই আছে। কিন্তু ধর্মের প্রলেপে তা মধুর, সহজপাচ্য এবং সর্বজনীন। প্রশান্ত করে দেয় মনটাকে। স্বাভাবিক করে দেয় শ্বাস-প্রশ্বাস। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব করে খায় দায় ঘুরে বেড়ায়। আর গল্প করে আরও। আরও আরও প্রশ্ন করে, “কোথায় সেই তির এখন? ছেওয়াং-এর গিঁট মারা তরবারিটাই বা কোথায়? কোথায় গুরুর ছেলে?”

ডোলো সাধ্যমতো উত্তর দেয়। গুরুর ছেলে ড্রুংসে। তিনিও এক সন্ন্যাসী। মজার ব্যাপার, তিনি তিব্বত গেছিলেন। থাকতেন রালুং মনাস্ট্রিতে, যেখানে থাকতেন গুরু ড্রুকপা কুনলে স্বয়ং। পরে ফিরে এসে ড্রুংসে নিজেই থিম্পুতে প্রতিষ্ঠা করেন ট্যাঙ্গো মনাস্ট্রি। সেখানেই রাখা আছে গুরু ড্রুকপা কুনলের তির। ছেওয়াং-এর তরোয়াল আর গুরুর আঙুলের ছাপওয়ালা পাথর।

আশপাশের চত্বরেই গোটা দিন কাটিয়ে দেয় রণিতা। খানিক ওপরেই মনাস্ট্রি। তার লাগোয়া এলাকা। আর পেলসাং এর বাড়ি, বাগান, খামার। আর পশুশালা। ডোলো কখনও বা সঙ্গ দেয়। বেশির ভাগ সময় রণিতা একা একাই ঘুরে বেড়ায়। দৃশ্যত। কিন্তু আসলে তার ভাবনার ভেতর অনেক সঙ্গী। স্বয়ং গুরু ড্রুকপা কুনলে। যুবতী পেলসাং। তার নিয়তির শিকার স্বামী ছেওয়াং। শিশু ড্রুংসে। এই একই চৌহদ্দির ভেতরে ওরা ঘুরে বেড়িয়েছে এক দিন। সেই হারিয়ে যাওয়া পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে পায়ে পা মেলায় রণিতা। কখনও বা পড়েও যায় কারও পায়ের ওপর পা। তখন নিজেকে তার মতোই মনে হয়। হয়তো পেলসাং হেঁটে চলেছে লঙ্কাখেতের দিকে। সঙ্গে ছোট ছোট পা ফেলে ড্রুংসে। তার বয়স তখন দশ কি বারো। তার বাবা চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। বদলে তাকে তুলে দিয়ে যাচ্ছে আর এক বাবার হাতে। ছেওয়াং। বলে যাচ্ছে, ‘বড় হয়ে রালুং যাবি। দেখে আসবি তোর বাপের ছোটবেলা।’ ছেলের চোখের জল।

বিচ্ছেদ বেদনায় বিষণ্ণ পেলসাং। অবশেষে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশায় আশান্বিত ছেওয়াং। কিন্তু সে জানে পেলসাং আর সাধারণ মানবী নয়। এমনকি ডাকিনীর লক্ষণযুক্ত সামান্যা নারীও সে নয়। সে এখন বজ্রযোগিনী। সে কি পারবে এই নারীর তেজ ও দীপ্তি ধারণ করতে! মানুষ হয়ে এক দেবীর সঙ্গে সহবাস করতে! সংসার করতে!

রণিতা ভাবে, তার বর কী পারবে! সময় তো হল ঘরে ফেরার।

সে দিন সন্ধের মুখে রণিতা চিমি লাখাং ফিরে এল। ফিরতে ফিরতে তার মাথায় ফিরে এল পুলিশি ঝামেলার কথা। থানায় রোজ হাজিরা দেওয়ার কথা। তাড়াতাড়ি ভাড়াগাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেল থানায়। যে শান্তি সেখানে পেল, তেমন বোধহয় গোটা জীবনে কমই পেয়েছে।

হাসিমুখে পরমাত্মীয়ের মতো পুলিশ অফিসার জানাল, কাইতো জাপানে তার বাড়ি পৌঁছে গেছে। সব ঝুটঝামেলা শেষ। হোটেলে ফিরে নিজের জিনিসপত্র বুঝে নিল রণিতা। রাতের খাওয়া সেরে একা ঘরে বসল হুইস্কি নিয়ে। ইচ্ছে পর্যালোচনা। কিন্তু সে তা করতে পারল না। কারণ তার দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখে, মুণ্ডিত মস্তক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

“সাংগে!”

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল নামটা তার মুখ দিয়ে। উচ্চারণে স্পষ্ট পুলক, যার কোনও কারণ সে নিজেই খুঁজে পেল না। বরং খানিকটা বিব্রত হল নিজের এমন প্রতিক্রিয়ায়।

অবশ্য সাংগেও পুলকিত। যেন হারানো আপনজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আবার, যার আশা বুঝি বা সে ছেড়েই বসেছিল।

তার পর নির্লিপ্ত কণ্ঠে রণিতা বলে, “এসো।”

সাংগে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বলে, “সারাদিন কী করলে?”

রণিতা বলে, “চাংদানাতেই ছিলাম। ডোলোর মামারবাড়ি।”

তার পর রণিতা আচমকাই জিজ্ঞেস করে, “তুমি কি আজ চাংদানা গেছিলে? সকালের দিকে?”

সাংগে অবাক হয়ে বলে, “কালই তো ওখানে গেছিলাম। আজ আবার...”

তার পর কিছু একটা অসংলগ্নতা অনুমান করে চুপ করে যায়। রণিতার চোখ দুটো জরিপ করে বলে, “এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?”

রণিতা সরাসরি বলে, “তোমাকে ওখানে দেখলাম তো! তাই।”

সাংগে হাসে। যেন ব্যঙ্গ ফোটে তার হাসিতে। কিছু বলে না। রণিতা বলে, “হাসছ কেন?”

“তোমার কলকাতার চোখে সব মঙ্গোলিয়ানই একই রকম দেখতে!

তাই না?”

“মানে?”

“মানে অন্য কাউকে দেখেছ, ভাবছ আমি।”

রণিতা হাসার উপক্রম করে বলে, “হতে পারে। তার ওপর ম্যাজিকে ভরা দেশ তোমাদের! কে যে কখন কার রূপ ধারণ করে, বোঝা মুশকিল।”

সাংগে নির্মল হেসে বলে, “ঠিকই! কে যে কে, কে বলে দেবে! আমি যে আমি, তুমিই বা বুঝবে কী করে! আর তুমি যে তুমি, আমিই বা বুঝব কী করে!”

রণিতাও হাসে এ বার। কণ্ঠে স্বস্তি ঝরিয়ে বলে, “যাক গে। আমি কাল সকালেই ভুটান ছেড়ে বাড়ির পথ ধরব।”

“বাড়ির পথ?”

“হ্যাঁ। তোমার আপত্তি আছে?”

“কিন্তু কথা তো ছিল পাদুম যাবে, আমার বাড়ি?”

“সে আর এ যাত্রায় হল না। নেক্সট টাইম।”

“কিন্তু আমি তো তোমার জন্য বসে আছি, এক সঙ্গে যাব বলে!”

রণিতা কোনও উত্তর দেয় না। চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে থাকে। সাংগে হঠাৎ উঠে আসে তার কাছে। তার হাতটা ধরে বলে, “আজ রাতে কি একটু আশ্রয় দেবে? তোমার সঙ্গে কাজটা তো পুরো করাই হল না।”

“কেন স্টেলা কি আশ্রয় দেয়নি?”

“আরে ছাড়ো ওদের কথা। পর্ন স্টারের মতো আচরণ করে। ভাল লাগে না। তা ছাড়া তুমি হলে বজ্রযোগিনী।”

রণিতা চমকে উঠে তাকায় সাংগের দিকে। এক হাতে ধরে আছে নিজেরই চুলের মুঠি, অন্য হাতে চিরুনি। দুটো হাতই তোলা মাথার ওপর, যেন নাচের ভঙ্গিতে। পালাজ়ো আর টি শার্টের ওপর জ্যাকেট পরে আছে রণিতা। জ্যাকেটের চেন খোলা। উন্মুক্ত আহ্বানের মতো লাগছে তার বুকদুটো।

আর থাকতে না পেরে সাংগে জড়িয়ে ধরে তার কোমর। নিজের বুকের ওপর তাকে পিষতে পিষতে কিস করতে যায় তাকে। এত যে চমকে উঠেছিল রণিতা, যেন সে খেয়ালই করেনি।

মুখ নামিয়ে ক্ষুধার্ত বাছুরের মতো করতে থাকে সাংগে। কিন্তু রণিতা তো গাভী নয়। তাই তাকে সামলাতে সে হিমশিম খেয়ে যায়। শেষে পা গুটিয়ে একটা লাথিই কষিয়ে দেয় লামাজির পেটে। ছিটকে পড়ে সে তার মুণ্ডিত মস্তক নিয়ে। কার্পেটের ওপর। আর পড়েই থাকে ও ভাবে। আহত মুখ করে কাঁদো-কাঁদো চোখে চেয়ে থাকে রণিতার দিকে। রণিতা তাড়াতাড়ি ওর কাছে এসে বলে, “সরি সরি! কিছু মনে কোরো না। লাগেনি তো!”

সে নিজেই টানাটানি করে সাংগেকে দাঁড় করায়। কিন্তু সে উঠেই দরজা খুলে চলে যেতে উদ্যত হয়। রণিতা বলে, “একটা কথা বলে যাও। তুমি আমায় বজ্রযোগিনী বললে কেন?”

সাংগে বেজার মুখে বলে, “তোমার মধ্যে ডাকিনীর লক্ষণ আছে। তুমি চাইলেই বজ্রযোগিনী হতে পারো। তাই বললাম। গুড নাইট!”

সাংগে চলে যায়। রণিতা দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে তার পিছন মূর্তির দিকে। হোটেলের করিডোর আলোকিত সুড়ঙ্গের মতো লাগে। সুড়ঙ্গের দূর প্রান্তে এক উজ্জ্বল সোনালি বুদ্ধমূর্তি। সুড়ঙ্গ যেন বুদ্ধ-পথ! সেই পথে হেঁটে চলে যায় এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। এক ডাকিনী দাঁড়িয়ে থাকে পথের মাঝে। দৃষ্টি তার নিবদ্ধ ভগবান বুদ্ধের ওপর। বুদ্ধ পাল্টা চেয়ে আছেন তারই দিকে। যেন সে কোনও সামান্য মানবী নয়। সে বজ্রযোগিনী!

দরজা বন্ধ করেও ভাবনাগুলো ঘোঁট পাকাতে থাকে রণিতার মাথার ভেতর। সে সবের ওপর উদার ভাবে হুইস্কি ঢেলে সে তাদের দাবিয়ে দেয় তখনকার মতো। তার পর জোড়া কম্বলের তলায় চিৎপাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এক ঘুমে সকাল। ঘুম ভেঙেই তার সাংগের কথা মনে পড়ে। ধড়মড়িয়ে ছুটে যায়। রিসেপশনে। জানতে পারে সাংগে ওয়াংয়েল ঘণ্টাদুয়েক আগেই চেক আউট করে বেরিয়ে গেছে।

ফোন লাগায় রণিতা। সুইচড অফ। যেন একটা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে তার স্মার্ট ফোনটা। যদিও আশ্বাসবাণী শোনায় ‘ইউ ক্যান ট্রাই লেটার’।

রণিতা ভাবে লেটার লিখতে বলছে, না পরে চেষ্টা করতে বলছে! যাই হোক, সে কোনওটাই করবে না।

কথা ছিল কর্মা আসবে তাকে নিতে। ফুন্টসোলিং এ। কিন্তু রণিতার সে ইচ্ছেও করছে না। তাই সে কর্মাকে মেসেজ করে জানিয়ে দিল, সে পারো থেকে ফ্লাইটে সোজা কলকাতা চলে যাচ্ছে।

সেই মতো সে বেরিয়েও গেল গাড়ি নিয়ে, সোজা পারো। পিছনের সিটে একা বসে অনুভব করল তার দূরত্ব বাড়ছে। চিমি লাখাং, চাংদানা, ডোলো, পেলসাং... সবার থেকে সে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু গুরু ড্রুকপা কুনলে...

গলায় হাত দিল রণিতা। সেই কড়ে আঙুল মাপের লিঙ্গ-লকেট এখনও ঝুলছে তার গলায়। হয়তো ওটার জন্যই এমন মনে হচ্ছে। একে ভুটানের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। লকেটটা সে খুলে নিল গলা থেকে। চায়ের বিরতির সময় সেই দোকানের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে চলে এল।

বিকেল তিনটে চল্লিশের ফ্লাইটে টিকিট পেয়েছে। এখন বাজে সাড়ে বারোটা। তাই সে পারোর বাজারে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক বার গেলও সেই হোটেলে, যেখানে সে ছিল। আদর করে মালিক চা খাওয়াল। টাকসাঙের বনে হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে গল্প করল অনেক। রণিতারও যেন আবার নতুন করে মনে পড়ল সেই সব গল্প। ভাল লাগাগুলো আরও গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভাবনার ভেতর। যতই সে ছেড়ে চলে যাক দেশটাকে, ভুটান আসলে ঢুকে বসে আছে তার চেতনার মধ্যে। হয়তো আর কোনও দিনই সে উপড়ে ফেলতে পারবে না একে। যত দিন বাঁচবে সে রয়ে যাবে ভেতরে ভেতরে ভুটানি হয়ে। ভুটানের বজ্রযোগিনী হয়ে।

এয়ারপোর্টে লাউঞ্জে বসেছিল। ঘোষণা শুনে উঠতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ এক পুলিশ অফিসার এসে তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বলেন, “ম্যাডাম, ইউ লেফট ইট ইন দ্য টি শপ অ্যাট শেমতোখা।”

রণিতা অবাক হয়। তত ক্ষণে অফিসার চলে গেছেন। সে মোড়কটা খুলে দেখে ভেতরে সেই লিঙ্গ-লকেট। এত করেও সে পিছু ছাড়াতে পারল না। সে আবার গলায় পরে নেয় সেটা। তার পর গিয়ে প্লেন ধরে।

কলকাতা ফিরে হতবাক হয়ে যায় রণিতা। ভীষণ অচেনা লাগে তার শহরটাকে। ভালবাসার শহর সে কোনও দিনই ছিল না তার কাছে, কিন্তু বিতৃষ্ণাও কিছু ছিল না। মেনে নিয়েছিল এক ভাবে। কিন্তু এখন যেন বিদ্রোহে বেঁকে যায় তার অন্তরাত্মা। ক্যাবের ভেতর যানজটের মাঝে আটকে পড়ে মনে হয় মরেও যেতে পারে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে তিন দিন আর বেরোয় না। শুধু জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতা দেখে। দীর্ঘদিনের বাস্তু। আবার ধাতস্থ হতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এক সময় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে প্রায় পুরোটাই। আবার আগের জীবনে খাপ খেয়ে বসতে শুরু করে রণিতা। দোকান বাজার বন্ধুবান্ধব পার্টি আড্ডা আত্মীয়দের সঙ্গ সাহচর্য। আর নিয়ম করে অর্ককে ফোন। তিন মাস হল সে বিদেশে। আরও তিন মাস পর ফিরবে। শহরটাকে আবার ভাল লাগতে শুরু করে খাবলা খাবলা করে। গঙ্গার ধার গড়ের মাঠ। ভোরের শান্তি গভীর রাতের তড়িদাহত মগ্নতা...

দিনদশেক পরে অবস্থা যখন প্রায় পুরোটাই স্বাভাবিক, ডোরবেল বেজে ওঠে সন্ধেরাতে। রণিতা একাই ছিল ফ্ল্যাটে, যেমন থাকে বেশির ভাগ সময়। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে বাইরে। রণিতার হাতে একটা লম্বা খাম দিয়ে চলে যায় সে। খামের উপর লেখা— জি পি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি।

দরজা বন্ধ করে আবার ব্যালকনির দিকে ফিরতে ফিরতে ধীরগতিতে খাম খোলে রণিতা। ভাঁজ করা কাগজ বার করে ভেতর থেকে। তার পর ভাঁজ খুলে মেলে ধরে ব্যালকনির আলোয়।

বেতের তৈরি শখের চেয়ার পাতা ছিল ব্যালকনিতে। তারই ওপর ধপাস করে পড়ে যায় রণিতা। যেন তার হাড়ের কাঠামোর সব জোড়

খুলে গেছে। গোটা একটা মানুষ থেকে সে হয়ে গেছে খোলা হাড় আর মাংসের একটা বস্তা। অথচ জ্যান্ত আছে তখনও।

ওই অবস্থাতেই কাগজটা তুলে ধরে দ্বিতীয় বার। ভালো করে দেখে ভুল দেখলো কি না। না, ঠিকই তো দেখেছে। লেখা আছে, প্রেগনেন্সি কালার টেস্ট। রেজ়াল্ট : পজ়িটিভ।

পিরিয়ড মিস করায় টেস্ট করতে দিয়েছিল। কিন্তু সে এই ফল আশা করেনি। কারণ তেমন তো কিছুই ঘটেনি গত তিন মাস। তা হলে!

আচমকাই ভীষণ শোরগোল পড়ে যায় নীচের রাস্তায়। কারা যেন চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। একযোগে। মনে হয় কোনও আদিম হানাদারের দল হানা দিয়েছে তার বাসস্থান লক্ষ্য করে।

রণিতা চেষ্টা করেও উঠতে পারে না। অকেজো হয়ে পড়েছে তার হাত পা, পেশিতন্ত্র।

তবু সে চেয়ার থেকে গড়িয়ে নামে মেঝের ওপর। বিকলাঙ্গের মতো ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যায় ব্যালকনির প্রান্তে। হাত বাড়িয়ে গ্রিলটা ধরে বহু কষ্টে। তার পর গ্রিলের ফাঁকে মুখ ঠেসে দেখার চেষ্টা করে নীচে। কিন্তু সাত তলার ওপর থেকে তেমন কিছুই দেখতে পায় না। শুধু আগুনের একটা আভা। তার ওপর ধোঁয়ার রাশ। কিসের যেন উৎকট গন্ধ নিয়ে উঠে আসে তার দিকে।

রণিতা নিজেকে টেনেহিঁচড়ে আরও উঁচু হওয়ার চেষ্টা করে। দেখার চেষ্টা করে তার বারান্দার নীচে কী হচ্ছে। আর তখনই চার দিক কেঁপে ওঠে তীব্র বিস্ফোরণে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ন্ত দৈত্যের মতো ধেয়ে আসে তার দিকে। আত্মরক্ষার জন্য সরে যাওয়ার চেষ্টা করে রণিতা। ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে মেঝের ওপর। মাথা ঠুকে যায় দেওয়ালে। অন্ধকার নেমে আসে মাথার ভেতর। মনে হয় তলিয়ে পড়ে যাচ্ছে অনেক নীচে কোথাও। অতল কোনও খাদের ভেতর। অন্তহীন অন্ধকার এক খাড়াখাড়ি সুড়ঙ্গের পথে যেন।

কত ক্ষণ এ ভাবে পড়েছিল খেয়াল নেই। এক সময় চোখ মেলে চায়। ব্যালকনির সাদা চাঁদের মতো আলো জ্বলছে। তখনও কানে আসছে কোলাহল। কিন্তু দূর থেকে। সে আবার মাথা তোলে। গ্রিলের ফাঁকে মুখ রেখে তাকায় বাইরে। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে শোরগোল। আলোকোজ্জ্বল কোনও দেবতা বসে আছেন ঝলমলে সিংহাসনে। তাকে ঘিরে আনন্দে নৃত্য করছে তার ভক্তদল। চার পাশে আলো আর ধোঁয়া। থেকে থেকে বাজির বিস্ফোরণ, আর সমবেত জয়ধ্বনি!

অনেক ঠাহর করেও রণিতা চিনতে পারে না দেবতাকে। শুধু বহিরঙ্গের কিছু লক্ষণ আভাসে অনুমান করতে পারে। আর তার কল্পনায় ভেসে ওঠে গুরু ডুকপা কুনলের মূর্তি। সে অবাক হয়ে ভাবে, 'কলকাতায়!'

দেবতা গলির বাঁকে আড়াল হয়ে যাওয়ার পরও কোলাহল কানে আসে। যখন সে ঘরের দিকে মুখ ফেরায়, তার পেছনে বাজতে থাকে আবহসঙ্গীতের মতো। এত দূর থেকে কেমন বিজাতীয় শোনায় কলকাতার এই গলিপথে। যেন চাংদানার সেই মনাস্ট্রির প্রার্থনাসঙ্গীত! বৌদ্ধধর্মীয় যন্ত্রানুষঙ্গে ভর করে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছে কলকাতার অভিজাত পাড়ার গলিপথে।

রণিতা বিকলাঙ্গের মতো মেঝেতে শরীর ঘষটে ঘরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে। রাতবাতির আবছা রঙিন আলোয় ভরে আছে শোওয়ার ঘর। ছায়া ছায়া আসবাব, বিছানা বালিশ গৃহসজ্জা। দেওয়াল-ছবির চওড়া ফ্রেম, আদিম মুখোশের ছায়া। এই সবের মধ্যেই বিছানার শিয়রের কাছে হঠাৎ একটা মুখ ভেসে ওঠে। ধড়াস করে ওঠে রণিতার বুকটা। চকিতে মনে হয় চাংদানার পেলসাংকে সে দেখতে পেল। আলুথালু বেশ, স্খলিত কেশরাজি আর ধূমাবতী মুখ। যেন এক জন্মডাকিনী তার সাজঘরে প্রস্তুত হচ্ছে পুরোদস্তুর বজ্রযোগিনীতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠার জন্য। কারণ তার সময় হয়েছে আসল রূপে বিকশিত হওয়ার। ডাক এসেছে গুরুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করার।

ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠে রণিতা দৃশ্যতই। তার সন্দেহ হয় পেলসাং না অন্য কাউকে সে দেখল আলো-আঁধারির ভেতর! আর এক বার সে ঠাহর করে দেখতে চায় এই ধূমাবতীকে।

শরীরের সব শক্তি এক করে সে আধসোজা করে নিজের নাচার শরীরটাকে। গলা যত দূর পারে লম্বা করে তাকায় ভিতর ঘরের আবছায়ার দিকে। আর দেখে, যা সে আশঙ্কা করেছিল, ঠিক তাই।

গভীর ছায়া পড়েছে বেডরুমের দেওয়াল জোড়া আয়নায়। সে ছায়ার ভেতর অনন্ত আদিম এক অরণ্যের রহস্যময় আভাস। তারই ভেতর একাকার হয়ে আছে এক ধূমাবতী!

বজ্রযোগিনী যে আসলে পেলসাং নয়।

রণিতা নিজেই!

শিল্পী: রৌদ্র মিত্র

প্রাকৃতিক, শিল্পী: নন্দলাল বসু

সৌজন্য: সুবীর মিত্র

কলকাতা ময়দানে রাজা রামমোহন রায়ের পুষ্পসজ্জিত মূর্তি

প্রথম বাঙালি বিশ্বনাগরিক

সেমন্তী ঘোষ

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, ১৮৩১ সাল। ইংল্যান্ডে শেষ-শীত, তখনও ঠান্ডাকে জমাট বেঁধে পাহারা দিচ্ছে মেঘকুয়াশা। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যযুগের প্রত্যুষ গড়িয়ে দ্বিপ্রহরের দিকে গড়িয়ে চলেছে উনিশ শতক। এরই মধ্যে বিলিতি বন্দরের কুয়াশা ছিঁড়ে ভেসে এল একটি জাহাজ, উপনিবেশ-ভুবন থেকে সুদূর সাগরপথ পাড়ি দিয়ে। লিভারপুল বন্দরে শান্ত পায়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন সৌম্যদর্শন এক বাঙালি প্রৌঢ়, বয়স তখন তাঁর ঊনষাট হব-হব। পরনে সম্ভ্রান্ত রাজকীয় বেশ, হাঁটছেন একটু খুঁড়িয়ে। খুঁড়িয়ে, কেননা অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে আসার পথে আফ্রিকার দক্ষিণ শহর কেপটাউনে একটা ছোট দুর্ঘটনায় পড়ে পায়ে চোট পেয়েছেন। লিভারপুল বন্দরে নেমে আহত পায়ে ধীরগতিতে হেঁটে ইংল্যান্ড-ভূমিতে প্রবেশ করতে করতে সেই 'মহামহিম' দেখলেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে বন্দরে সে দিন বিরাট জনসমাগম।

তিনি যে বেশ এক জন মহামহিম, প্রথম দর্শনেই তা বোঝা যায়। বন্দরের সাধারণ কর্মীরাও এক নজর তাকিয়েই বুঝে ফেলে, এসেছেন বিরাট কেউ, নিশ্চয়ই কোনও নেতা... না কি রাজা কোনও? এসেছেন ভারত থেকে। পিছনে রয়েছে বহু সহগামী, সহকারী। তার মধ্যে রক্ষক-অনুচর-ভৃত্য ছাড়াও দেখা গেল কয়েকটি দুধেল গরু— 'রাজা'র জন্য ভারত থেকে বিলেতে তাদেরও নিয়ে আসতে হয়েছে! পাশেই হাঁটছেন বন্ধুবর জেমস সাদারল্যান্ড— নাবিক থেকে সাংবাদিক হয়ে গিয়ে যিনি তখন 'ইন্ডিয়া'র সঙ্গে ইংল্যান্ডের পরিচয় করাতে কোমর বেঁধে ব্যস্ত। রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ডের মাটিতে অবতরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই সাদারল্যান্ডই ক্রমে লিপিবদ্ধ করে দুই দেশে প্রকাশ করবেন, এমনকি কলকাতার কাগজেও।

দেখা গেল, ওঁর আগমন-সংবাদটি খবর হিসেবে বেশ বড়। কিন্তু

কেন? এলিট ভারতীয়রা তো সেই সময়ে মাঝে মাঝেই ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রাখার সুযোগ পাচ্ছিলেন— সে দিক দিয়ে দেখলে এক জন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের বিলেতে আগমন এতটা 'বিশেষ সংবাদ' কেন হবে? আসলে ইনি যে-সে মানুষ নন, ইনি যে রাজা রামমোহন রায়। একক, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। তাঁর আসার খবর পর দিন ছাপা হল বিলেতের খবরের কাগজগুলির প্রথম পাতায়। পৌঁছনোমাত্র অসংখ্য দর্শনার্থী এবং বিবিধ কাজের তালিকায় ঠাসা হয়ে গেল তাঁর নিজস্ব 'ক্যালেন্ডারে' বিলেতবাসের প্রতিটি দিন। এমনকি সেই সব ঘোরাঘুরি, সভাসমিতি, অতিথি-অভ্যাগতর কথাও আলাদা করে ছাপা হতে থাকল রোজকার খবরের কাগজে।

তার থেকেই আজ আমরা জানতে পারি যে লিভারপুল থেকে যখন ট্রেনে করে ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি, সেখানেও তাঁকে দেখতে কেমন ভিড় জমে গিয়েছিল, আর সেই ভিড়ের মধ্যে ছিলেন শয়ে শয়ে শ্রমিক। এত বেশি তাঁদের সংখ্যা যে, পুলিশ বাহিনীকে এসে পরিস্থিতি সামলাতে হয়েছিল। লন্ডনে গেলেন যখন, পথে যেখানেই থামলেন বিশ্রাম কিংবা খাবারের জন্য, লোক জমে গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু'-তিনটে পার্টি থাকছিল। পার্টি মানেই বাড়ির সামনে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। অনেকেই হয়তো শেষ অবধি দেখা পাচ্ছিলেন না। সেই ব্যর্থমনোরথ দর্শনপ্রার্থীর তালিকাও কম চমকপ্রদ নয়। সেই তালিকায় এমনকি ছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে পর্যন্ত— ভারতের ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের উৎসাহী প্রবর্তক হিসেবে যাঁর নাম আমাদের মুখে মুখে ফেরে!

নিজের 'সেলিব্রিটি স্টেটাস'-এর চোটে রামমোহন নিজেই বিব্রত হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে। ডিনারে কী খাচ্ছেন, অভ্যাগতদের সঙ্গে কী 'স্মল টক' করছেন, সবই এমন ভাবে 'সংবাদ' হয়ে যেত, এবং মাঝে মাঝে 'ভুল সংবাদ'ও বেরোত যে, রামমোহন রায় শেষ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে *টাইমস* পত্রিকাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে আর কোনও খবর না ছাপানোর জন্য। গবেষকরা বলছেন, তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশের পর এত চিঠি আসতে শুরু করে সংবাদপত্র দফতরগুলিতে, তা প্রকাশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পত্রিকাগুলি নোটিস ছাপিয়ে দেয় যে, ব্যস এই পর্যন্তই, তাঁর বিষয়ে আর বেশি চিঠি ছাপা হবে না।

এমনই সেলিব্রিটি ভারতীয় মানুষটি যে, তাঁর দর্শনে অতি আগ্রহী ছিলেন ইংলন্ডের রাজামশাই নিজেও। কিং উইলিয়াম রামমোহনকে ডাক পাঠিয়েছিলেন ১৮৩১ সালের অগস্ট মাসে লন্ডন ব্রিজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য! ভাবা যায়! মনীষী হলেও ভারতের 'নেটিভ', গায়ের রংটাও সাদা নয়, খোদ রাজার সঙ্গে রয়্যাল প্যাভিলিয়নে একসঙ্গে বসে লন্ডন ব্রিজের ঝাঁপ খোলা দেখার জন্য এমন লোককে সনির্বন্ধ আহ্বান!

বাকি সবাই সেখানে বিদেশি, তাঁদের সঙ্গে একাসনে গিয়ে বসলেন রামমোহন। রানি বিশেষ মুগ্ধ হলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। দেখা গেল, হাউস অব লর্ডস-এর সদস্যরাও রামমোহনে আকৃষ্ট! আকর্ষণের ব্যাপারটা এতটাই গড়াল যে, তার একটা খারাপ ফলও হল। ও দেশে রামমোহনের অন্য র‍্যাডিকাল বন্ধুরা বিষয়টা মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না। তার চেয়ে বরং ব্রিটিশ রাজপরিবারের 'ব্ল্যাকশিপ', হাবেভাবে বিদ্রোহী, 'অন্য রকম' মানুষ, ডিউক অব সাসেক্স-এর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুতা তাঁদের প্রীত করল অনেক বেশি। সত্যি কথা বলতে, রামমোহনের নিজেরও অনেক বেশি মনোমত হল ডিউকের সঙ্গ। দু'জনেই লিবারাল। দু'জনেই ইংরেজ উপনিবেশের সমর্থক, এবং সেই উপনিবেশ-ঘেরাটোপের মধ্য থেকেই অনুন্নত দেশগুলির সমাজের জন্য পরিবর্তন আনতে, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উৎসুক। দু'জনেই মনে করছিলেন, কেবল ভারতের মতো কলোনি নয়, এমনকি উন্নত দেশের— আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের— জন্যও দরকার সামাজিক সংস্কার, মানুষের 'অধিকার' সম্প্রসারণ।

উপনিবেশের মানুষ রামমোহন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, উপনিবেশে তাঁর কোনও আপত্তি তো নেই-ই, বরং বিশেষ সম্মতি আছে! রাজকীয় কিংবা এলিট বৃত্তেই যাঁর ঘোরাফেরা, চলনবলনও সে রকমই। ফলে আজকের অর্থে 'র‍্যাডিকাল' বলা সম্ভবই না তাঁকে, প্রগতিশীল পরিচিতি দেওয়ার বিরুদ্ধেও অনেক পণ্ডিত তর্ক তুলেছেন।

5 Cumberland Terrace
Regents Park July 13th 1831

My dear and worthy Sir

I delayed answering your kind communication untill to-day in the expectation of hearing further from Dr Bowring. By a note just received from him I find that there will be no excursion on Saturday or Sunday next. Dr B. will have communicated all the particulars to you. I am sorry to observe that you were under an impression that I [illegible]

you. I hope you will excuse me when I say that in entertaining such a thought you did injustice to my feelings. Wishing you happy and uninterrupted health. I remain my dear Sir

Yours most faithfully
Rammohun Roy

Jeremy Bentham Esq

আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংগ্রহশালায় রাজা রামমোহনের লেখা চিঠি

ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি

কিন্তু একটা হক কথা হল— কোনও শব্দের মানেই চিরকাল এক রকম থাকে না। ১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকের সমাজ কিন্তু রামমোহন এবং তাঁর বিদেশি বন্ধুবৃত্তের মধ্যে অনেককেই 'র‍্যাডিকাল' নাম দিয়েছিল। সেই শব্দের ব্যঞ্জনা তখন আলাদা। কিন্তু ব্রিটিশ র‍্যাডিকালরা রামমোহনের মতো ভারতীয়কে হঠাৎ নিজেদের সঙ্গে এত একাত্ম করে নিলেন কেন সে কালের 'র‍্যাডিকাল' বৃত্তে? কেন তাঁরা এতখানি পাত্তা দিলেন এঁকে? ভারতের সমাজের সংস্কার চাইছেন রামমোহন, সতীদাহ আইন তত দিনে পাশ হয়ে আছে— কিন্তু এগুলোই কি রামমোহনের জনপ্রিয়তা কিংবা আবেদন তৈরির পক্ষে যথেষ্ট? সেই সময় কত জন উপনিবেশের এই সব সংস্কারের খবর রাখতেন, কিংবা আদৌ কেয়ার করতেন ভারত সম্পর্কে? ভারতের নারীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে?

আসল কথা সেটা নয়। রামমোহনের জনপ্রিয়তার পিছনে একটা অন্য কারণ ছিল। সেটা বেশ গুরুতর। সংবাদপত্রের কল্যাণে তত দিনে ইংরেজদের জানা হয়ে গিয়েছে, ইংল্যান্ডের সমাজ বিষয়েও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ভাবছেন রামমোহন রায়। ইংল্যান্ডের মানুষের সঙ্গে খ্রিস্টীয় চার্চ ও ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পর্কে সমস্যা নিয়ে এমন কথা বলছেন, যা ছুঁয়ে যাচ্ছে সে দেশের সাধারণতম মানুষটির জীবনও। বলছেন, ধর্মের নামে, বিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি চলবে না, সামাজিক অনুশাসনের বাড়াবাড়িও চলবে না। ঈশ্বর ও জিশুকে ভক্তি করার মানে কি হাজার গন্ডা অনুশাসনে নিজেদের জীবনটাকে বেঁধে ফেলা?— রামমোহনের সোজা প্রশ্ন। এবং তখনকার দিনের ইংরেজ সমাজের পক্ষে অতীব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

শুধু তা-ই নয়। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতে যে ভারতীয় মানুষটির এত কদর এত আদর ইংরেজ সমাজে, তিনি কেবল ইংল্যান্ডের 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন' ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংশোধনের চিন্তা করছেন না, তার মধ্যে একই সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বলছেন দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির দুরবস্থার কথাও। তিনি উপনিবেশের সমর্থক হতে পারেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের তিনি সমানে মনে করিয়ে দেন যে, ভারত কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, দুটো জায়গাই ইংরেজদের শাসনাধীন বলেই 'শাসক'-এর দায়িত্বও অনেকখানি— 'তাদের' অনেক কিছু করার আছে 'আমাদের' জন্য, সেগুলো করতে হবে! একটু কায়দা করে বললে, এ যেন প্রথম বিশ্বের কাছে তৃতীয় বিশ্বের স্বার্থ নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি। এ যেন বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে উন্নত বনাম অনুন্নত দেশের পার্থক্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা!

রামমোহন রায় সম্পর্কে কত রকম বিশেষণ চালু আছে আমাদের ইতিহাসে, সমাজে, সাহিত্যে। কিন্তু সবচেয়ে প্রাথমিক যে বিশেষণটা তিনি দাবি করেন— নিশ্চিত ভাবেই সেটা 'বিশ্বনাগরিক'। পিছিয়ে থাকা দেশের কথা তিনি তো জানেন নিজের শিকড় দিয়ে। আবার এগিয়ে থাকা দেশের অন্ধকার কোণগুলোও তিনি দেখতে পান সহজেই, তাঁর অভিজ্ঞতাসিঞ্চিত মনীষা দিয়ে। তাঁর প্রবল যুক্তিবোধ তাঁকে সমানে এক রকমের ভবিষ্যৎ-চিন্তার দিকে ঠেলতে থাকে— যে ভবিষ্যৎ আরও মানবিক, আরও সহনীয়। তিনিই যে 'প্রথম ভারতীয়' যাকে বিশ্বনাগরিক বলা যায়, এ কথা হয়তো আমাদের অবাক করে না। কিন্তু আর-একটু এগিয়ে আর একটা কথাও বলা যায়। কেবল ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর প্রেক্ষিতেই তিনি বোধহয় 'অন্যতম প্রথম' বিশ্বনাগরিক। তিনি যে ভাবে বিভিন্ন দুনিয়াকে একই গভীরতায় জানতেন বা চিনতেন সেই সময়, যে অনায়াস ভঙ্গিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্কটের সমাধানের জন্য ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মে প্রস্তুত থাকতেন— উনিশ শতকের গোড়ায় তার তুল্য অনেক মানুষের কথা আমরা জানি কি? এমনকি, অন্যান্য দেশেও? রামমোহন রায়ের বাকি সব কাজ, সব ভাবনা, সব লেখালিখিকে আমরা এই প্রিজ়ম-এর তলায় ফেলে দেখলে বুঝব যে, আমাদের পরিচিত প্রথম 'আধুনিক' মানুষ, প্রথম 'সমাজ সংস্কারক' মানুষটি আসলে আরও অনেক বেশি কিছু— সব ক্ষেত্রে সফল না হলেও তাঁর চর্চার জগৎটি ছিল আক্ষরিক অর্থে বিশ্বমানের। আজ থেকে দুশো বছর আগে তিনি কী কী করছিলেন, তার একটা সামান্য পরিচয়ই বলে দেয় যে, তাঁর মধ্যে যে ভাবটি বইছিল, যে মনটি ফুটছিল, যে মননচর্চার ধরনটি তিনি অভ্যেস করছিলেন— তা এক নতুন গোত্রের বিশ্বমানবতা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের আগে যার অস্তিত্ব ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না।

রামমোহন এমন মানুষ হতে পেরেছিলেন ইউরোপ-আমেরিকার সান্নিধ্যে এবং পশ্চিমি জ্ঞানের বলয়ের ভিতরের সদস্য হতে পেরেই—

এ কথা আমরা কতই পড়েছি, জেনেছি। কিন্তু এখানেও একটা তর্ক আছে। নিজের দেশীয় সংস্কৃতির ভিতের উপর এতখানি শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের জন্য মন খুলে দেওয়া, এত দূরের সব সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবশালী লোকদের কাছেও কেবলমাত্র নিজের মননের জোরে এমন বিশিষ্ট হয়ে ওঠা: এ সব কি কোনও নিছক শুকনো জ্ঞানচর্চার ব্যাপার হতে পারে— সে প্রাচ্য জ্ঞানই হোক, আর পাশ্চাত্য জ্ঞানই হোক? আসল কথাটা হল— এর মধ্যে আছে একটা মানসিকতা। যে-কোনও বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানচর্চার 'আধার' হয়ে ওঠে যে মানসিকতা। তাকে বাদ দিয়ে এমন অর্জন কখনওই সম্ভব নয়।

সুতরাং এ বার প্রশ্ন হল: আজ তাঁর জন্মের আড়াইশো বছর পূর্তির ঢাকঢোলের মধ্যে তাঁর যথার্থ গুরুত্ব আমরা বুঝছি তো? তাঁর মানসিক গড়নটি আলাদা করে খেয়াল করছি তো? উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এমন একটি অসাধারণ বিশ্বায়িত, প্রসারিত মন যে, এই বাংলায়— হুগলি জেলার ছোট একটি জনপদে— জন্ম নিয়ে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়েছিল, আমরা উত্তরসূরি হিসেবে তার যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি তো?

রামমোহনের বিশ্ববোধ নিয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। ভাবনার গোড়াটা ধরার পক্ষে তাঁর ধর্মচিন্তা নিয়েই দু'-চার কথা বলা যাক। ভাবা যাক, বাঙালি ব্রাহ্মণবাড়ির পড়ুয়া যখন ঠিক করলেন তাঁর দর্শনচিন্তা ও ধর্মচিন্তা নিয়ে বই লিখবেন, কী লিখলেন তিনি, আর কী ভাবেই-বা লিখলেন।

১৮০৪ সালে তাঁর প্রথম বইটিই রচিত হল ফার্সি ভাষায়, তুহ্ফাত-উল-মুয়াহিদিন, এবং তার ভূমিকাটি লেখা হল আরবি ভাষায়। বাংলা নয়, সংস্কৃত নয়, ইংরেজিও নয়— ফার্সি এবং আরবি। কেন হঠাৎ ফার্সি? ফার্সি অবশ্য তখন দেশের প্রধান ভাষাগুলোর একটি বলেই গণ্য হত। আঠারো শতক শেষ হলেও এই ভাষার একটা 'সরকারি' গ্রহণযোগ্যতা থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু না, কোনও বাইরের চাপে নয়, রামমোহন স্ব-ইচ্ছাতেই অনেকগুলি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন— সংস্কৃত, ফার্সি, আরবি, ইংরেজি, গ্রিক এবং হিব্রু। তালিকাটিই বলে দেয় যে, কোনও বাইরের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক ছিল না এর। কিছু ভাষা নিজের পরিবার পরিমণ্ডলেই শিখতে পেরেছিলেন, হুগলি জেলার রাধানগরের ব্রাহ্মণ বালকটি সংস্কৃত শিখেছিলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে এক স্থানীয় পণ্ডিতের কাছে। তার সঙ্গে আরবি, ফার্সি ও ইসলাম দর্শন পড়তে তিনি চলে গিয়েছিলেন পটনা। ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর আত্যন্তিক আগ্রহের সঙ্গে এই বিবিধ ভাষাজ্ঞান মেলার ফলে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মূল ভাষায় মন দিয়ে পড়ে ফেললেন তিনি। এবং হিন্দু, বৌদ্ধ,

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অটল, অবিচল

ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের এই সম্মিলিত পড়াশোনা তাঁকে একটা গভীর ভাবনার দিকে ঠেলে দিল। তুহফাত-উল-মুয়াহিদিন, অর্থাৎ 'ফার্সি ভাষায় একটি ছোট লেখা'র মধ্যে নানা ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ভরকেন্দ্রটি রইল একটি আদর্শ ও উদ্দেশ্য: এই বিশ্বে এক সর্বজনীন ধর্ম আছে, এক ঈশ্বর নির্মাণ করেছেন এই জগৎ এবং জাগতিক প্রাণসমূহ, তাই নানা ধর্মের মধ্যে সংস্কার ও অন্ধতা থেকে বাইরে বেরনোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের— আমাদের সকলকে।

সহজ কথা নয়। ১৮০৪ সালে ধর্মীয় সংস্কার বস্তুটির গুরুত্ব খুব বেশি, প্রায় ধর্মের মতোই। সংস্কারই ঐতিহ্য, সংস্কারই আত্মপরিচয় এবং সমাজপরিচয়, সংস্কারই সংস্কৃতি। (আজও কি তার থেকে খুব বেশি এগিয়েছি আমরা?) তাকে বাদ দিয়ে দিলে অস্তিত্বের তারটা বাঁধা হবে কোথায়? প্রবল বিরোধিতা ফুঁসে উঠল রামমোহনের এই গ্রন্থের অভিঘাতে। তিনি কিন্তু অটল, অবিচল।

ধর্মবোধ এবং ঈশ্বরবিশ্বাস মিলে আদ্যন্ত আস্তিক মানুষ রামমোহন। আস্তিকতার সঙ্গে সংস্কারবিরোধিতা যে কতটাই যুক্তিতে যুক্তিতে জড়ানো, সেটাই হয়তো আসল শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রইল এই বইয়ের মধ্যে। সে দিক দিয়েই তাঁর পরবর্তী কালের ভাবনায়, কাজে, ব্রাহ্মদর্শনের গ্রন্থনার সঙ্গে এই প্রথম বইয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আশ্চর্য কথা, যে ভাবনার স্রোত ১৮০৪ থেকে ১৮৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু অবধি প্রবাহিত হল, তাঁর এই একবাদী ধর্মমত ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের জন্ম দিল, ব্রাহ্মধর্মের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হল, ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভাগাভাগি পর্যন্ত হয়ে গেল— সেই এত কিছুর মধ্যে তুহফাত বইটির অনুবাদ কিন্তু সহজে হল না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হল ১৮৮৩ সাল অবধি। রামমোহনের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর প্রকাশিত ইংরেজি সেই অনুবাদের নাম হল মূল বইটির থেকে অনেক আলাদা— 'গিফট টু দ্য বিলিভার্স'।

এত দেরি কেন? কেনই-বা বাংলাতে এর অনুবাদ হল না তখন? কারণটা অস্পষ্ট। তুহফাত-বিরোধিতার তীব্রতার জন্যই কি রামমোহন নিজে এই বইয়ের অনুবাদে উৎসাহ দেখাননি? পরবর্তী কালে অন্যরাই-বা কেন কাজটা আরও তাড়াতাড়ি করেননি? নাকি, তুহফাত-এর মধ্যে যে নানা ধর্মাদর্শের এক ও অভিন্ন মূলে পৌঁছনোর বার্তাটি আসলে এত অন্য রকম— ভারতীয়তা, দেশীয়তা বা জাতীয়তার যে আগ্রহ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল, তার থেকে এতটা দূরবর্তী যে, সংস্কারকরা এ বিষয়ে উৎসাহ দেখাননি?

যে সময়ে বিদেশি সংস্কৃতি ও সভ্যতার মুখোমুখি হয়ে ভারতের আদি 'জাতি'-সত্তার সন্ধান শুরু হচ্ছে, সেই সময়ে রামমোহন রায়ের

রাজা রামমোহনের সমাধির গায়ে তাঁর পরিচিতি সংবলিত প্রস্তরফলক

এই ফার্সি দর্শন বই লেখার বিষয়টি আশ্চর্যই বটে। আরও আশ্চর্য, হিন্দু ধর্মের আস্তিকতাকে কোরানের কাব্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, কিংবা বেদান্ত দর্শনের আলোচনার মধ্যে কোরানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা। আস্তিকতাকে পৌত্তলিকতা কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে আলাদা করাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই তত্ত্ব তিনি পরে কেনোপনিষদ আলোচনার মধ্যে আরও অনেক দূর আলোচনা করবেন।

আসল কথা, রামমোহন যেন দেশের মাটিতে প্রোথিত থেকেও সেই মাটিকে দেখছিলেন অনেক উপর থেকে। নিজের সমাজ, ধর্ম, দর্শনকে দেখছিলেন যেন দূর থেকে— অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে। তিনি ভারতীয় ধর্মদর্শন আলোচনা করছেন, কিন্তু অ-ভারতীয় ধর্মদর্শনে শিক্ষার কারণে তাঁর সেই আলোচনা উঠে আসছিল একটা উচ্চতর তলে। একে আমরা বলতেই পারি আন্তর্জাতিক ভারতীয়তা।

'বিশ্বমানব' শব্দটা আমরা আজকাল হালকা ভাবে ব্যবহার করি, ভেবে দেখি না ভাল করে এর মূল অর্থটা কী। বিশ্বমানব-দেরও কিন্তু দেশপরিচয় থাকে, ধর্মপরিচয় থাকে, সংস্কৃতির শিকড় থাকে শক্তপোক্ত। কিন্তু শিকড় যখন কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দেয়, তার উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে শিকড়টাকেও তখন অন্য রকম লাগে, অন্য ছবি পাওয়া যায়। রামমোহন সেটাই করতে পেরেছিলেন।

উপর থেকে নীচের দিকে দেখলে কি কেবল নিজেরটুকুই দেখা যায়? না। অন্যদেরও দেখা যায় খুব আলাদা একটা দৃষ্টিকোণ থেকে। কেমন করে অন্যরা ছড়িয়ে আছেন, কেমন করে তাঁদের ডালপালাতেও জট পাকিয়েছে, ধুলোয় ভরে গিয়েছে সে সব ডালপালা। রামমোহন তাই দেখতে পেয়ে যান বিদেশি সমাজের ঘুণধরা অংশটাও, বিশেষ করে ধর্মের নামে যে ঘুণপোকা ছড়াতে থাকে, জড়াতে থাকে মানুষের জীবনকে।

ইউনিটারি খ্রিস্টানরা এই সময়ে বিলেতের সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অধিকার করতেন, এ ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন। তাঁদের গুরুত্বের অনেক কারণের মধ্যে একটা— সংবাদপত্রের স্বাধীন ভূমিকায় বিশ্বাস করতেন তাঁরা। 'প্রিন্ট-সভ্যতা' তখন প্রসারিত হতে শুরু করেছে, সংবাদপত্র উনিশ শতকের শুরুতে এক বিশেষ শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সে দিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, রাষ্ট্রের পাশাপাশি এক ধরনের নাগরিক সমাজ তৈরি হয়ে উঠছিল তাঁদের নেতৃত্বে। অন্ধ বিশ্বাসের উল্টো দিকে যে যুক্তিবাদী সমাজ, তাতেই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। সুতরাং রামমোহন রায় সহজেই আকৃষ্ট হলেন তাঁদের প্রতি, এবং তাঁরা মুগ্ধ হলেন রামমোহনকে নিয়ে। ১৮১৯ সালে ব্রিটেনে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে একটি আইন তৈরি হয়, তার নাম ছয় আইন। প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন সমাজের একাংশ, প্রধানত ইউনিটারিস্টরা, জেমস সিল্ক বাকিংহামের নেতৃত্বে। নিজেদের মতের প্রচারে বাকিংহাম ব্যবহার করেন রামমোহনের যুক্তি: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে রামমোহনের ক্ষুরধার বক্তব্য। এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে, রামমোহনের 'মিরাত-উল-আকবর' নামে ফার্সি সংবাদপত্রিকার উপরও পড়েছিল আইনের কোপ। আশ্চর্য নয়। তাঁর এই পত্রিকায় যে সমানে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ছাপা হত— খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সমালোচনাও!

বেদান্ত নিয়ে লেখালিখির শুরুতেই কিছু স্কটিশ ইউনিটারি খ্রিস্টানের সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব হয়। ট্রিনিটি বা খ্রিস্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদের বিরোধী ছিলেন এঁরা। রামমোহনের যুক্তিবাদী ভাবনা তাঁদের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। ইউনিটারিয়ানরা তখন নতুন-পাওয়া নতুন-চেনা ভারত নামের দেশে ইউনিটারি প্রভাব প্রচারে অতীব উদগ্রীব। তাঁদের কাজকর্মের ব্যস্ততা কলকাতায়— খ্রিস্ট সমাজের ইউনিটারি ধারাটিই তাঁরা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই সময়ে ক্যালকাটা ইউনিটারিয়ান কমিটি তৈরিতে সাহায্য করেন রামমোহন। এঁদের ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাতে শুরু করেন। দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে যান ভিনদেশি সংস্কৃতির এই বলয়ে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাই তো সবটা নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বের ফাঁকে উঁকি দিতে থাকে আসল সমাজটাও, ধর্মের বেশে মোহ এসে কী ভাবে মানুষকে ধরে এবং ভিতরে ভিতরে মারে।

রামমোহন দেখতে পান, কী ভাবে মিশনারিদের একটা অংশ নৈতিক ধর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন 'ডকট্রিনাল' বা শাস্ত্রীয় ধর্মের কূটকচালিকে। হ্যাঁ, ঠিক হিন্দু সমাজের মতোই। রামমোহন জোরগলায় ইউনিটারি সভায় গিয়ে বলতে শুরু করেন যে, জিশুর প্রকৃত বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সব 'ডকট্রিন', তাই নৈতিক ধর্মের বাইরে ধর্মের আলাদা আচারগত কোনও মাহাত্ম্য তৈরি করা অনুচিত। সভাসমিতির ভাষণে, লিখিত আলোচনায় বারংবার তিনি বলতে থাকেন, জিশুকে ঈশ্বরপ্রেরিত মানুষ হিসেবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর জীবনের বদলে তাঁর বার্তাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সেটাতেই সমাজের কল্যাণ। খ্রিস্টীয় সমাজে খ্রিস্টের বাণীই মেনে চলা দরকার, অথচ ঘটছে ঠিক তার উল্টোটা!

এই যে অতিরিক্ত শাস্ত্রনির্ভরতা, মানুষের প্রয়োজন ও মঙ্গলের আগে শাস্ত্রের কথাকে বসানো এবং বসাতে গিয়ে অনেক সময় ধর্মের মূলকথাটার উল্টো দিকে হাঁটা— এর মধ্যে একটা সাংঘাতিক সর্বনাশ আছে, দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। এ-ও দেখছিলেন যে, সেই সর্বনাশটা কোনও ছোট বলয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পৃথিবীর বুকে মানুষকে ভাগাভাগি করে দেওয়ার অত্যন্ত সুবিধাজনক বন্দোবস্ত। তুহফাত-এ তিনি বলেছেন 'সেকটারিয়ানিজ়ম' কী ভাবে 'ইউনিভার্সাল ফেথ'-এর বারোটা বাজাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলি, ১৮২০ সালে টমাস জেফারসন লিখেছিলেন 'দ্য লাইফ অ্যান্ড মরালস অব জিসাস অব নাজ়ারেথ', যার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল রক্ষণশীল খ্রিস্টান সমাজ। অনেক দিক দিয়ে রামমোহনের তুহফাত-এর বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় ছিল এই বইটি। জিশুর জীবনের যা কিছু 'মির‍্যাকল' খ্রিস্টানদের ধর্মানুষ্ঠানের মূল, সব বাদ পড়ল এতে, রইল পড়ে জিশুবার্তার মানবিক নির্যাসটুকু। জোসেফ প্রিস্টলির মাধ্যমে জেফারসনের এই বইয়ের প্রচার হল বিলেতের সঙ্গে আমেরিকাতেও। রামমোহন মিলে গেলেন এই মতের সঙ্গে। জেফারসনের মতের সপক্ষে তিনি লিখলেন 'রিয়েল খ্রিস্টান' কাকে বলে, কে হতে পারেন। ট্রিনিটি-ধারা নস্যাৎ করে রামমোহনও লিখলেন, 'কেবল খ্রিস্টের বার্তাকেই যিনি অন্তরে গ্রহণ করবেন, তিনিই তো খ্রিস্টান।' দারিদ্র, কুসংস্কার আর সব রকম অন্যায় থেকে মুক্ত করার জন্যই দরকার এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস— অদ্বৈতে ফিরে যাওয়া, ইউনিটারিজ়ম-এ বিশ্বাস রাখা।

মনেপ্রাণে আস্তিক, সেই কারণেই কুসংস্কারবিরোধী

এবং এই 'ঐশী নৈতিকতা'র যুক্তি কোনও বিশেষ ধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। বেদান্তই হোক, ইসলামই হোক কিংবা খ্রিস্টধর্মই হোক— সব ধর্মের গোড়ায় যে একটা মানবিক সমাজের দিকে এগোনোর চেষ্টা থাকে, তার প্রথম সূত্র এই ঐশী নৈতিকতার যুক্তি। নানা দেশে নানা মতে এই একই চেষ্টা যখন প্রস্ফুটিত হয়, তাদের মধ্যে সংযোগের জায়গাটা ঠিকমতো বের করে ফেলে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরি করাটাই হয়তো হতে পারে একটা আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট। সেটাই ঘটেছিল ১৮২০ ও ১৮৩০-এর দশকে, বাঙালি মনীষার হাত ধরে। ইংল্যান্ডে বা ভারতে যখন তিনি খ্রিস্টধর্মের আলোচনা করছিলেন, ইউরোপীয় লেখক-আলোচকদের বক্তব্যের রেফারেন্স দিচ্ছিলেন নিজের মতটি তুলে ধরার সময়। আবার সেই একই মত যখন হিন্দু সমাজের সম্পর্কে উচ্চারণ করছিলেন, তখন হিন্দুমান্য শাস্ত্রের মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে পড়ছিলেন। এই ছিল তাঁর 'স্কলারশিপ'-এর বিস্তার। বয়স যতই বাড়ছিল, ততই তাঁর মধ্যে জাগতিক প্রশ্ন বাড়ছিল, ধর্মের নানা চেহারা অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে যাচ্ছিলেন অর্থনীতি আর রাজনীতির এক অভিন্ন চেহারার সন্ধানে। এই দিক থেকে দেখলে, রামমোহনকে ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট-এর প্রাণপুরুষ বললে খুব অত্যুক্তি হবে কি?

শেষে একটা কথা না বললেই নয়। হিন্দুসমাজ সংস্কারক রামমোহন রায় চির দিন পৈতে পরেছেন, অসুস্থতার সময়ে তাঁর শিয়রে বসে কাউকে না কাউকে ওম-ধ্বনি বলে যেতে হয়েছে, বিলেতে মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি সকলকে বলে গিয়েছেন যাতে চার্চ-গ্রাউন্ডে তাঁকে সমাধিস্থ করা না হয়, যেন খ্রিস্টীয় মতে শেষকৃত্য না করে হিন্দুমত আচরিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ, সংস্কার কিন্তু এই 'সংস্কারক'-কে ঘিরে ছিল শেষ পর্যন্ত। তাঁর চরিত্রের এই সব বৈপরীত্য-সমাহার নিয়ে কম আলোচনা-গবেষণা হয়নি। তবে আজ পিছনে তাকিয়ে মনে হয়, তিনি কোথায় কতটা কম করেছিলেন, কতটা করতে পারেননি, তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশি জরুরি তিনি কতটা করতে পেরেছিলেন, সেটাই ঠিক ভাবে উপলব্ধি ও অনুভব করা। কোনটা কুধর্ম, কোনটা কুসংস্কার, কোনটা সমাজের পক্ষে চরম ক্ষতিকর ও অন্যায়, অন্য মানুষের বেঁচে থাকা ও সম্মান রক্ষা করে চলার অন্তরায় কোন-কোনখানে— এই বিবেচনাবোধটি তিনি নিজের মধ্যে জারি রেখেছিলেন, এবং তার উপর ভর করে নিয়ে এক কঠিন সমাজের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন, এইটুকুই বোধহয় আজ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, কিংবা যথেষ্টরও বেশি। কেননা, বহুসংস্কৃতির বোধসিঞ্চিত বিবেচনা ও সক্রিয়তা— আজও পর্যন্ত যাকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বনাগরিকতার পরিচয় বলা যায়, তার কাছাকাছি তো আমরা এখনও পৌঁছতেই পারিনি!

হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশে সোয়াট নদীর উপত্যকা

দেশের নাম পাকিস্তান

অগ্নি রায়

এখানকার বাতাসে চিকমিক করে ইতিহাসের অভ্র। হিন্দুকুশ, কারাকোরাম ঘিরে রেখেছে এর সুপ্রাচীন সভ্যতাকে। সিন্ধু অববাহিকার ঝিলাম, চেনাব, শতদ্রু নদী বয়ে যায় পাথরবন্তী হয়ে যুগযুগান্ত ধরে। কাবাবের উমদা খুশবু, উর্দু ভাষার মায়াজাল তৈরি করে চলে মেহমান নওয়াজির অপূর্ব আলেখ্য, কালজয়ী সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলার দিশামুখ।

আবার এখানেই তো বারবার চরম বৈপরীত্যে বেজে উঠেছে পঞ্চম স্বর। রাষ্ট্রের মগজ ধোলাইয়ে নিঃশব্দ ফিঁদায়ে অপেক্ষা করছে সীমান্তে শীত-গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে, প্রতিবেশীকে ছোবল দেওয়ার অপেক্ষায়। রচিত হয়েছে দ্বেষ, হিংসা, ধর্মের নামে রক্তপাত, বেহশ্‌ত-এর হাতছানিতে ভূখণ্ডকে রঞ্জিত করার কালবেলা। কালাশনিকভ-এর মুখ একটা সময়ে নিজেদের দিকেই ঘুরে গিয়েছে, আজ রুটি আনতে নুন ফুরিয়ে যাচ্ছে, নাভিশ্বাস ওঠা দেশটির।

দেশটির নাম পাকিস্তান। যার লাহৌর নগরীর হীরামন্ডিতে রাত নামছে। হীরামন্ডি, অবিভক্ত পাকিস্তানের এক সময়ের প্রসিদ্ধ যৌনপল্লি, এখনও যেখানে যথেষ্ট অন্ধকার। আলো এসে পড়ছে অদূরের লাহৌর ফোর্ট-এর লাগোয়া বাদশাহি সমাধি থেকে। তার ঠিক পাশেই চারতলা বুটিক রেস্তরাঁ, নাম 'কাক্কুজ় নেস্ট'। মালিক জাভেদ ইমরান, এক যৌনকর্মীর সন্তান। প্রবল পরিশ্রম, রুচি, স্বোপার্জিত শিক্ষায় তৈরি করেছেন এই অভিনব রেস্তরাঁ, যা দেখে মনে হবে পুরোটাই যেন এক আর্ট গ্যালারি! ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে স্থাপত্য, চিত্রকলা, হরেক ইনস্টেলশন— নির্দিষ্ট ছকভাঙা।

উপরমহলের অনেক মানুষ শাহিন শাহি কাবাব, খাইবার চরসি টিক্কা, লাহৌরি চিকেন তাওয়া, নমকিন গোস্ত-এর অমৃতস্বাদ নিতে আসেন এখানে। খাওয়ার সঙ্গে চলে চিত্তচটুল গসিপ! ফলে জাভেদ ইমরান শুধুমাত্র শিল্পরসিকই নন, তাঁর জেবে জমা হয়ে রয়েছে

পাকিস্তানের ‘ক্রিম দে লাঁ ক্রিম’-দের নানা গপ্পো।

লাহৌরে রাত গভীর হচ্ছে। আমরা বসে রয়েছি রুফ টপে তারার চাঁদোয়ার নীচে। সঙ্গে এসেছেন পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ডি জি শামিমা পরভেজ। বিদেশে উচ্চশিক্ষা শেষ করে কয়েক মাস হল ইসলামাবাদে সরকারি দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন এই নীলনয়না, এখনও তাঁর ভাল করে জানাশোনা হয়নি এখানকার রাজনীতির জটিল স্তরবিন্যাস। তাই তাঁর অন্যতম ‘খবরি’ হলেন এই জাভেদভাই, যিনি আপাতত টেব্‌ল জোড়া বিরিয়ানির অন্য প্রান্তে বসে গিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে খোশ আড্ডায়। বলছেন, “ইমরানের সঙ্গে বেনজির ভুট্টোর সম্পর্ক তো বেশ ভালই ছিল, আপনারা অনেকেই জানেন না। ইমরান লেডি কিলার অল্পবয়স থেকেই, আর বেনজিরও তখন আগুনে রূপসি! কার মনে কী ছিল আল্লাহই জানেন! কিন্তু বেনজির হঠাৎই তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ইমরানের সম্বন্ধ পাতাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন! নিজেই ফোন করে ইমরানকে প্রস্তাব দিলেন, সেই বন্ধুর হয়ে। হতভম্ব ইমরান তা তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিয়েছিলেন তো বটেই, তাঁদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটাও খারাপ হয়ে যায় চিরতরে।”

॥ ২ ॥

এ সেই সময়ের কথা, যখন ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক শুধরোনোর জন্য সাংবাদিকদের আদানপ্রদানে বিশ্বাস রাখা হত। মনে করা হত, সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে সরকারের সাজানো সত্যকে তুলে ধরে শান্তির পায়রা ওড়ানো যাবে। তত দিনে রাওয়ালপিন্ডিতে এক আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছেন বেনজির ভুট্টো, তাঁর স্বামী আসিফ আলি জ়ারদারি মসনদে বসেছেন বছর তিনেক হয়ে গিয়েছে। ইমরান খান তখন বিরোধী তুর্কি। তালিবানের সঙ্গে যুদ্ধ কার্যত শেষ বলে বুক চাপড়াচ্ছেন জ়ারদারি এবং আফগানিস্তানে হামিদ কারজ়াই। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মন্দের ভাল, দীর্ঘ সাত বছর ব্যবধানের পর নয়াদিল্লি সফর সেরেছেন জ়ারদারি। ইউপিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়, এস এম কৃষ্ণের ইসলামাবাদ সফরে যাতায়াত, দুর্লভ নয়।

সন্ত্রাসের আতঙ্ক জয় করে স্কুলে আসে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (আজাদ কাশ্মীর), তালিবানের সন্ত্রাসে বিধ্বস্ত সোয়াট উপত্যকা, লাহৌরের যুবসমাজের উদ্দীপনা, সন্ত্রাস মোকাবিলায় পাক সেনার সক্রিয়তা দেখতে জ়ারদারি সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লি থেকে পৌঁছেছি প্রথমেই ইসলামাবাদে।

অন্যান্য দেশের মতো, পাকিস্তানের ভিসা এক বার আপনার পকেটে চলে এল, আর আপনি আহ্লাদিত হয়ে ভাবলেন, লাহৌরের কাবাব চেখে, করাচিতে দাউদ ইব্রাহিমের আস্তানাটা দেখে (যদিও সেখানে দাউদ কোথায় থাকতেন তা আমার-আপনার জানার কথাই নয়!) এক বার বালুচিস্তানেও কন্ডাক্টেড ট্যুর সেরে নেবেন, তবে আপনার সে ভ্রমণেচ্ছায় বালি! কেউ হয়তো ভিসা পাবেন শুধুমাত্র ইসলামাবাদের। অথবা বরাত ভাল থাকলে ইসলামাবাদ আর পঞ্জাব প্রদেশ বা লাহৌরের। করাচি কোনও অজ্ঞাত কারণে পাওয়া যাবেই না ধরে রাখুন, আর পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের তো প্রশ্নই নেই।

এহেন রাওয়ালপিন্ডির ভিসা ছাড়াই কী ভাবে সেখানে গিয়েছিলেম, সে বৃত্তান্তে পরে আসছি। আপাতত ‘আ টেল অব টু সিটিজ়’-এর কথা। ইসলামাবাদ এবং রাওয়ালপিন্ডি— এই দুই শহরের কথা। যারা একে-অপরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। একটি নতুন রাজধানী তার রাজবেশ পরে, অন্যটি মলিন প্রাচীন রাজধানী। এদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র মাইল বিশেক, কিন্তু কী যে আমূল ফারাক দুই শহরের গঠন বিন্যাস চরিত্রে, সে না দেখলে বোঝা মুশকিল!

পিন্ডির ভিতর দিয়ে আপনি হাঁটছেন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলে আর খেয়াল থাকবে না যে, বিদেশে রয়েছেন। উত্তর ভারতের যে-কোনও ভিড়ভাট্টাময় সদর শহরের মধ্য দিয়ে হাঁটার সঙ্গে যার কোনও তফাত নেই। রাস্তা সরু হয়ে গিয়ে ফল সব্জির বাজারের পথরোধ করবে। মাঝে মধ্যেই রাস্তার এ ধারে ও ধারে গজিয়ে ওঠা মিনার, গম্বুজ, মসজিদ। তবে সবই প্রাচীন হাড় বের করা, জরাগ্রস্ত। গাছপালার প্রাচুর্যও নেই, মাঝে মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উদ্যান। যা শহরটাকে দু’বেলা দু’মুঠো অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

আর তার অনতিদূরেই ইসলামাবাদ, যেন মটমট করছে রাজগর্বে। স্কেলে নিখুঁত হিসেব করে টানা দর্পিত অ্যাসফল্টের রাস্তা, কোনও পিন পড়ে থাকলেও বহু দূর থেকে দেখা যায়। রাস্তার দু’ধারে এক মাপে ছাঁটা ঠাসা গাছগাছালির সারি। যত্ন আর নৈপুণ্যের ছাপ সর্বত্র। দিল্লির জামা মসজিদকে পাশে নেহাত লিলিপুট মনে হবে, এমন বিশালাকায় শাহ ফয়জ়ল মসজিদ। প্রায় এক লক্ষ মানুষের সঙ্কুলান হয় এর ভিতর। উত্তরে মারগলা পর্বতশ্রেণি আর দক্ষিণে রাওয়াল লেক-এর মধ্যে ছবির মতো সাজানো এই ইসলামাবাদের শহর এলাকা। সাধারণ মানুষের থাকার জায়গা নয় ইসলামাবাদ। মন্ত্রী-সান্ত্রী, আমলা, সরকারি বড় বড় অফিস, বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ঠাঁই পেয়েছে এখানে।

আসলে স্বাধীনতার পরই ইসলামাবাদ গড়ার চিন্তা মাথায় আসে প্রশাসকদের। বাণিজ্যনগরী করাচির পক্ষে দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৫৯ সালে সরকার তাই নতুন শহর গড়ার কমিটি বানায়। বাছা হয় আথেন্স-এর প্রখ্যাত নগর-নির্মাতা সংস্থা ডক্সিয়াডেস অ্যাসোসিয়েশনকে। আসেন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি এবং নগর-নির্মাতা এডওয়ার্ড ডুরেল স্টোন। ১৯৬৪ সালের মধ্যে কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসে।

ইসলামাবাদে সবচেয়ে বেশি করে যেটা চোখে পড়ে, তা এর ঘন সবুজ বর্ণ। ভিত গড়ার সময়েই পোঁতা হয়েছিল ষাট লাখ গাছের চারা। ফলে এখন মনে হয় যেন নিবিড় অরণ্যের মধ্যেই তৈরি হয়েছে এই শহর। কোনও বাড়িই উঁচু নয়, খুব বেশি হলে দোতলা। বাড়ির এই অভিজাত অনুচ্চতা দেখেছিলাম আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি-তে।

বেনজির ভুট্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছনোর আগেই বাস দাঁড় করানো হল দামেন-এ-কোহ-র একটি ছাদবাগানে। মারগলা পাহাড়ের এক শীর্ষবিন্দুতে এই পর্যটনস্থলটির স্থান মাহাত্ম্য— এর প্যানোরামিক ভিউ। নীচে যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গোটা ইসলামাবাদই। জেগে রয়েছে স্পর্ধিত শাহ ফয়জ়ল মসজিদের সুউচ্চ মিনার। সবুজের ফাঁকফোকরে সাদা সরকারি ভবনগুলি। গাইড জানান, এই অতিকায় মসজিদটি বানিয়েছিলেন তুরস্কের এক স্থপতি, নাম

দামেন-এ কোহ-এর ছাদ-বাগান থেকে দেখা ইসলামাবাদ

ভালাত দোলোকে। তর্কযোগ্য ভাবে এটি নিঃসন্দেহে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহদাকার মসজিদ, পাকিস্তানের শান। উপর থেকে এর প্রসারিত ছাদ দেখলে মনে হয়, গভীর অরণ্যের মাঝে এক অতিকায় তাঁবু পাতা রয়েছে। এই মসজিদ তৈরির জন্য বিপুল অর্থ (৫ কোটি ডলার) জুগিয়েছিল সৌদি আরব।

বাস চলছে কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউয়ের চকচকে রাস্তার উপর দিয়ে। বাইরে যেন লুটিয়ান দিল্লির দোসর সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন, সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং, মোগল স্থাপত্যে তৈরি প্রধানমন্ত্রীর অফিস বিল্ডিং। তবে নয়াদিল্লির একাংশের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও আবহাওয়া একবারেই আলাদা। নীলচে পাহাড়ের প্রেক্ষাপট এবং আকাশের প্রতিফলনে যেন এক স্তিমিত নীলিমা শহরকে ধারণ করে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭ হাজার ফিট উপরে যে বাতাস বইছে, তাও বেশ টাটকা। শীতে নাকি মাঝে মাঝে তুষারপাত হয়, গোটা বছরই রাতে স্বস্তিদায়ক ঠান্ডা।

নান্দনিক লে আউট-এ তৈরি এই শহর বিভক্ত আটটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে। প্রশাসনিক, কূটনৈতিক, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি। ব্যক্তি আবাসনগুলি পৃথক অঞ্চলে, সেখানে এই আবাসন কেন্দ্রিক দোকান-বাজার, শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, খেলার জায়গা। শহরের প্রধান বাণিজ্য অঞ্চলটির নাম ব্লু এরিয়া। দিনে গমগম করে দোকান, প্লাজ়া, বিপণি, রেস্তরাঁ, অফিস। তবে বাজার ছড়িয়ে রয়েছে শহরের সর্বত্র। হঠাৎ কোনও ব্যক্তি এই চোখ জুড়নো শহরে নামলে বুঝতেই পারবেন না, এই দেশে দু'টি রুটি কিনতে গেলেও জেব খালি হয়ে যায় নিম্নবিত্ত মানুষের। সরকারের বিরুদ্ধে ধিকিধিকি রোষ জ্বলতেই থাকে, যাকে অন্য ভাবে কাজে লাগায় কট্টরপন্থী মোল্লাতন্ত্র, আইএসআই, জঙ্গি রিক্রুটার শাখা।

ইসলামাবাদে যতটুকু দেখাতে চাইছে প্রশাসন, ততটুকুই নজরে আসছে। কিন্তু তাতে তো সাংবাদিকের পেট ভরে না! দেখা গেল একটা দিন সকালটা ফাঁকা, কোনও মিটিং নেই। অর্থাৎ পাঁচতারা হোটেলে আলস্যের জন্য সকাল ধার্য! চাইলে হোটেল চত্বরে আকাশ ছোঁয়া দামের কার্পেট নেড়েচেড়ে দেখাও যেতে পারে। অবশ্য এগুলি পিন্ডির বাজারে অর্ধেক দামে পাওয়া যায়। এক বন্ধু সাংবাদিকের সঙ্গে আগের রাতেই পরিকল্পনা করা ছিল। ফলে সকালে প্রায় রাত পোশাকে, যেন বাইরে একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছি, এ ভাবে হোটেলের মূল ফটক থেকে বড় রাস্তায় নামলাম আমরা। সাদা পোশাকে দু'জন পাকিস্তানি নিরাপত্তাকর্মী যে লাউঞ্জে বসে চব্বিশ ঘণ্টা ভারতীয় সাংবাকিদের নজর রাখছে, তা আমরা এসেই টের পাই। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরনোর আনন্দটাও প্রাপ্তি হল! বাইরে এসে অটো এবং সোজা পিন্ডি! ইসলামাবাদ থেকে সাড়ে চোদ্দো কিলোমিটার দুরে এই আদি শহরটি ধুলি ধূসরিত। বিশ্বের আদি শক্তির সঙ্গে এর যোগ তো রয়েছেই। প্রস্তর যুগের গোড়ার দিককার কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে রাওয়ালপিন্ডির নিকটবর্তী সোয়ান উপত্যকায়। যার বয়স পাঁচ লক্ষ বছর!

আর আজ যে জনপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তারও বয়স কম নয়। চতুর্দশ শতকে এটি ধ্বংস করে ফের গড়া হয়। মোগল নির্মিত শহরটিতে ব্রিটিশরা আসে উনিশ শতকে। রাওয়ালপিন্ডিকে গড়ে তোলা হয় সেনাশহর হিসেবে। নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার সুরক্ষিত রাখার জন্য এখানে নিযুক্ত হয় হাজার হাজার সেনা। আজও এই শহরে সেই সেনা বুটের শব্দ। পাকিস্তান সেনার সদর দফতর আজও পিন্ডিতেই। প্রাচীন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশে লাহৌর থেকে ২৭৫ কিলোমিটার এবং পেশোয়ার থেকে একশো বাষট্টি কিলোমিটার দূরে পিন্ডি। বিভিন্ন প্রদেশের সন্ধিস্থলে এর অবস্থান। তাই এখানকার বাজারগুলির বৈচিত্রও দেখার মতো। কাশ্মীর সিলভার, শাল, জ্যাকেট, বোখারা কার্পেট, হাতে

সেলাই কুর্তা, উলের কাফতান, বেতের ঝুড়ি, মহার্ঘ কাঠের আসবাব। এই পিন্ডিরই উত্তরে রয়েছে নয়নাভিরাম শৈলশহর মুরি, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে সাত হাজার ফুট। শীতে সেখানে এতই বরফ পড়ে যে, নানাবিধ উইন্টার স্পোর্ট-এর চলও নাকি রয়েছে। তবে সেখানকার সেরা সময় বসন্ত, যা পাইনের গন্ধময়। তখন বহু রঙের ফুলে ছেয়ে থাকে উপত্যকা।

অ্যাবটাবাদও পিন্ডির উত্তরেই, গোটা বিশ্বকে বোকা বানিয়ে যেখানে ডেরা বেঁধেছিলেন ওসামা বিন লাদেন। পিন্ডি থেকে লাহৌরে যাওয়ার পথে দূরে নজরে এসেছিল সেই অ্যাবটাবাদ। পাহাড়, টিলা, ঝর্না, লেক, গ্লেসিয়ারের এক সৌন্দর্য সম্মেলন যেন। আত্মগোপনের আদর্শস্থলই বটে! সেনার নাকের ডগায়!

॥ ৩ ॥

পাকিস্তানে এলাম, অথচ উর্দু নিয়ে দু'-চার কথা বললাম না, তা কি হয়! এখানকার সড়ক এবং জাতীয় ভাষা উর্দু, যা এ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মানুষকে এক করে রেখেছে। যার যা-ই মাতৃভাষা হোক না কেন, সুদূর উত্তরের চিত্রাল, গিলগিট, স্কারফু থেকে শুরু করে দক্ষিণে করাচি, থাট্টা পর্যন্ত ম ম করছে উর্দুর সৌরভে। তুরস্ক থেকে আসা এই 'উর্দু' শব্দটির অর্থ সেনা বা শিবির। পণ্ডিতদের মতে এক হাজার বছর ধরে পঞ্জাবের আশপাশের স্থানীয় ভাষার সঙ্গে এই শিবিরের ভাষার মিলমিশে তৈরি হয়েছে এই নতুন উর্দু। হয়ে উঠছে কাব্যময়, সুমধুর, নরম। আর গত সাতশো বছরের বিভিন্ন শিল্প-সাহিত্যের ধারক, উর্দুর প্রাচীন আঁতুড়ঘর লাহৌর। ঝিলামকে পাশে রেখে ইসলামাবাদ থেকে ছ'ঘণ্টার ড্রাইভে রাভি নদীর কূলে এই খানদানি শহর। পুরনো দিল্লির যমজ বলেও যাকে ভুল হতে পারে।

প্রায় দু'কোটি মানুষের বসবাস এই লাহৌর শহরে। করাচির পর এটিই পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। দেড়শো খ্রিস্টাব্দে টলেমির লেখা জিওগ্রাফিয়াতে এই ভূখণ্ডের প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায় 'লাবোকলা' নামে। সিন্ধু, রাভি, ঝিলাম এবং চেনাব নদীর সূত্রে গড়ে ওঠা এই লাবোকলা। গজনির সুলতান মামুদ লাহৌর দখল করেন একাদশ শতকের প্রথমার্ধে। গজনি-অধিকৃত লাহৌর তখন রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল। এই সময় থেকেই পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী হিসাবে লাহৌরের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। এই শহর হয়ে ওঠে গোটা উপমহাদেশে ইসলামিক প্রভাব ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ষোড়শ শতাব্দী থেকে লাহৌর এই অবিভক্ত রাষ্ট্রে প্রতিপত্তির শিখরে ওঠে, মোগল পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার গরিমাও খর্ব হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় শিখ শাসক রঞ্জিত সিংহ নিজেকে পঞ্জাবের মহারাজা

আমন সেতু, এর অন্য পারেই ভারত
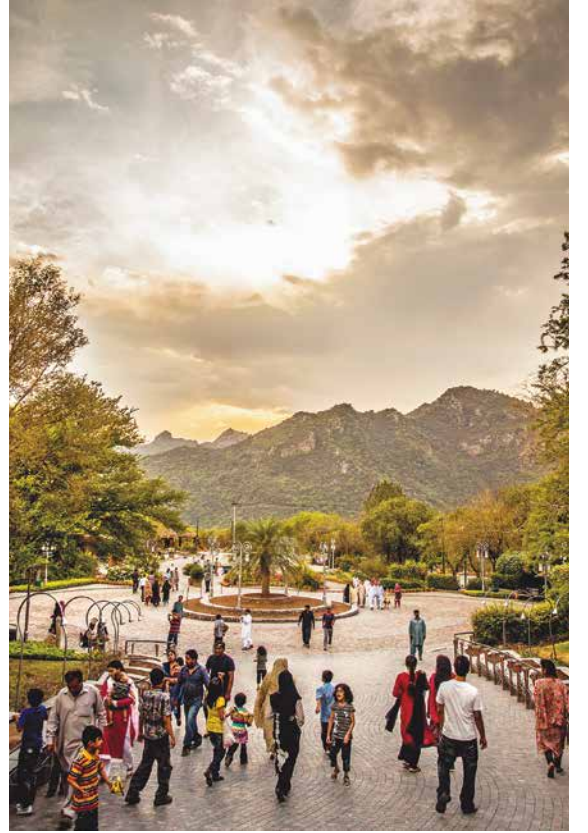
গোধূলির আলোয় দামেন-এ-কোহ

হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁর সেনাদল লাহৌরে ঢুকে তছনছ করে, ভেঙে ফেলে বিভিন্ন পুরনো ইসলামিক সৌধ ও স্তম্ভ। বাদশাহি মসজিদ ধুলোয় মিশে যায়। ব্রিটিশ অধিকৃত লাহৌরে পৌঁছে এক লেখক ১৮৪৯-এ শহরটিকে বর্ণনা করেছিলেন ধ্বংসস্তূপ হিসেবে।

তবে সেই বর্ণনা একটু বাড়াবাড়িই। আজও লাহৌর উজ্জ্বল তার খানদান নিয়ে। স্মৃতিতে আমূল আচ্ছন্ন হয়ে। আর সেই স্মৃতিকে ধরে রেখেছে পাকিস্তানের প্রাচীনতম সংগ্রহশালা লাহৌর মিউজ়িয়াম। বাইরে সাড়ে চোদ্দো ফিটের ব্রোঞ্জনির্মিত কামান 'জ়মজ়মা', যাঁকে তাঁর উপন্যাস 'কিম'-এ অক্ষয় করে রেখেছেন রুডিয়ার্ড কিপলিং। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে এই কামান অগ্নিগোলা বর্ষণ করেছিল প্রথম বার। যার গায়ে খোদাই রয়েছে পারসি কবিতার লাইন। তার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিলেন সঙ্গী গাইড— 'ড্রাগনের মতো ভয়ঙ্কর, পাহাড়ের মতো বিশাল'।

১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ ইসলামিক রাষ্ট্রের ডাক দিয়েছিল এই লাহৌর থেকেই। সেখানে এখন মিনার-এ-পাকিস্তান। অনতিদূরে লাহৌর ফোর্ট দেখলেই বোঝা যায় কত ইতিহাস এবং ঝড়-জল-বন্যা সহ্য করেছে তার অসম্ভব মজবুত প্রাচীর। বারবার ভাঙা এবং গড়া হয়েছে এই দুর্গ। শেষ পর্যন্ত বাদশা আকবর ১৫৬৬ সালে তৈরি করেন এর বর্তমান মজবুত কাঠামোটি। এর পর জাহাঙ্গির, শাহজাহান এবং ঔরঙ্গজেব নিজেদের পছন্দের সিলমোহর লাগিয়েছেন। তিরিশ একরের এই দুর্গের ভিতর আপনি সময়যানে অনায়াসে চলে যেতে পারেন মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে। মায়াবাস্তবে দেখতে পাবেন দিওয়ান-ই-আম-এর উপরের উঁচু বারান্দায় শাহজাহানকে! যিনি ঝুঁকে দেখছেন নীচে জমায়েত প্রজাসাধারণকে, যারা এসেছে বিভিন্ন বিবাদের নিষ্পত্তি চেয়ে।

তবে শাহজাহান নন, লাহৌরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চতুর্থ মোগল সেলিম, ওরফে জাহাঙ্গিরের প্রেম। এই শহর এমনিতেই গল্পবাগীশ! তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব, এখান থেকে

ইসলামাবাদের শাহ ফয়জ়ল মসজিদে একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারেন প্রায় এক লক্ষ মানুষ

মাত্র পাঁচশো কিমি দূরবর্তী পেশোয়ার সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তা মনে পড়ে গেল লাহৌরে পা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় ঘোরার পরই। আলী সাহেবের ওই মোক্ষম লাইনগুলি লাহৌরেও একই ভাবে সত্য যেন। ...*'গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে। মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নূতনও লাগিয়ে দেয়। ...কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবান্তর— মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ঐ তার অজুহাত।'*

এই শহরে মানুষের গল্পকথায় আর বাতাসে আজও ভেসে বেড়ায় সেই বিষাদের সুর, যার নাম আনারকলি। সেলিমের সঙ্গে সেই হরিণীচঞ্চল নর্তকীর অসমাপ্ত প্রেম প্রজন্মবাহিত হয়ে গড়ে তুলেছে এক লাহৌরকাব্য। আনারকলিকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছিলেন আকবর, কিন্তু সেলিমের মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারেননি। আনারকলির কবরের কাছেই তৈরি হয় তাঁর নামে শহরের সবচেয়ে রঙিন এবং সমৃদ্ধ এক বাজার। যার বিস্তীর্ণ এলাকার অলি-গলি-পাকস্থলি উপচে পড়ছে রংবেরঙের কাচের চুড়ি, সিল্কের পোশাক, ল্যাপিস লাজুলির মালা, চামড়া আর কাপড়ের উপর নিপুণ শিল্প। এক অতৃপ্ত আত্মার প্রেমকে সাজাতে এই আয়োজন, যে হয়তো এখনও ফিরে আসে এই স্মৃতির শহরে।

॥ ৪ ॥

আনারকলি বাজারের মেজাজই আলাদা। প্রাণবন্ত, রঙের বিস্ফারে মোহময়, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খুশবুদার মশল্লা থেকে আতর-তামাকের মেদুর গন্ধ। সেই সঙ্গে উপচে পড়া ভিড়।

ভারতীয় উপমহাদেশের টিকে থাকা বাজারের মধ্যে সম্ভবত প্রাচীনতম এই আনারকলি বাজারের পেটের ভিতর আমরা। লাহৌরের পাঁচতারা হোটেলে পৌঁছনোর পর তিন রকম মাংসের ছ'রকম কাবাব, চার রকম বিরিয়ানি, ফিরনি, চাট, খানদানি পাকিস্তানি মিষ্টি, গোলাপবাহার পান আর শরবতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের দিল খুশ! দিল্লি থেকে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁদের কাছে লাহৌরের গলিতে গলিতে পুরনো দিল্লির মেজাজ ও মৌতাত।

তবে ইসলামাবাদের মতোই লাহৌরেও দেখি হোটেলের লাউঞ্জে পাঠান স্যুট পরা উদাসীন মুখের জনাকয়েক মানুষ গোটা দিনই বসে থাকেন। সরকারি বাস এবং পাক কর্তাদের ছাড়া একা হোটেল থেকে আশপাশে, এমনকি সিগারেট দেশলাই কিনতে আমরা বেরোলেও যাঁরা একটু সময়ের ব্যবধানে উঠে পিছনে আসতে থাকেন! আবার আমরা ঢুকলে তাঁরাও স্বস্থানে! আনারকলি বাজারেও যে তাঁদেরই দেখা পাব, তার আন্দাজ ছিল না। বিভিন্ন রকম সিল্ক, পশমের বস্ত্রসম্ভার, হস্তশিল্প, মশলা, আতর নিয়ে নতুন আনারকলি বাজার। আর পাকিস্তানের খানদানি খাবার আর সেই সংক্রান্ত মশলাপাতি কাঁচামালের পশরা হল পুরনো আনারকলি বাজার। একটি দোকানে দাঁড়িয়ে দরদস্তুর করে পরের দোকানে যাচ্ছি, আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে দু'টি পাঠানস্যুট। তাঁদের অতিকায় চেহারা। এ বার পাল্টা নজর রাখতে গিয়ে দেখছি, আমরা দোকানে ঢুকে কথাবার্তা বলছি যখন, এই দুই পাঠানি তখন পান খাচ্ছে, সিগারেট ধরাচ্ছে, পার্ক করা কোনও স্কুটারের উপর বসে আড্ডা জমাচ্ছে। শরীরে যেন পরম আলস্য, কোনও তাড়াই নেই কোথাও যাওয়ার। চোখাচোখি হলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

আইএসআই-এর লোক? হঠাৎই যেন গোটা বিষয়টা চারপাশের উজ্জ্বল দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গেল। এ সবের কথা এত দিন তো শুনে-পড়ে আসছি পাকিস্তান সম্পর্কে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মজারই! একটা চোর-পুলিশ খেলার গন্ধ যেন!

ব্যাপারটা আরও মজাদার হয়ে উঠল আনারকলি বাজার সফর শেষ করে গাড়িতে ওঠার সময়। আমরা গিয়েছিলাম ন'জন। তাদের মধ্যে এক জন সাংবাদিকের পরিবারের অনেক জ্ঞাতিগুষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে লাহৌরে।
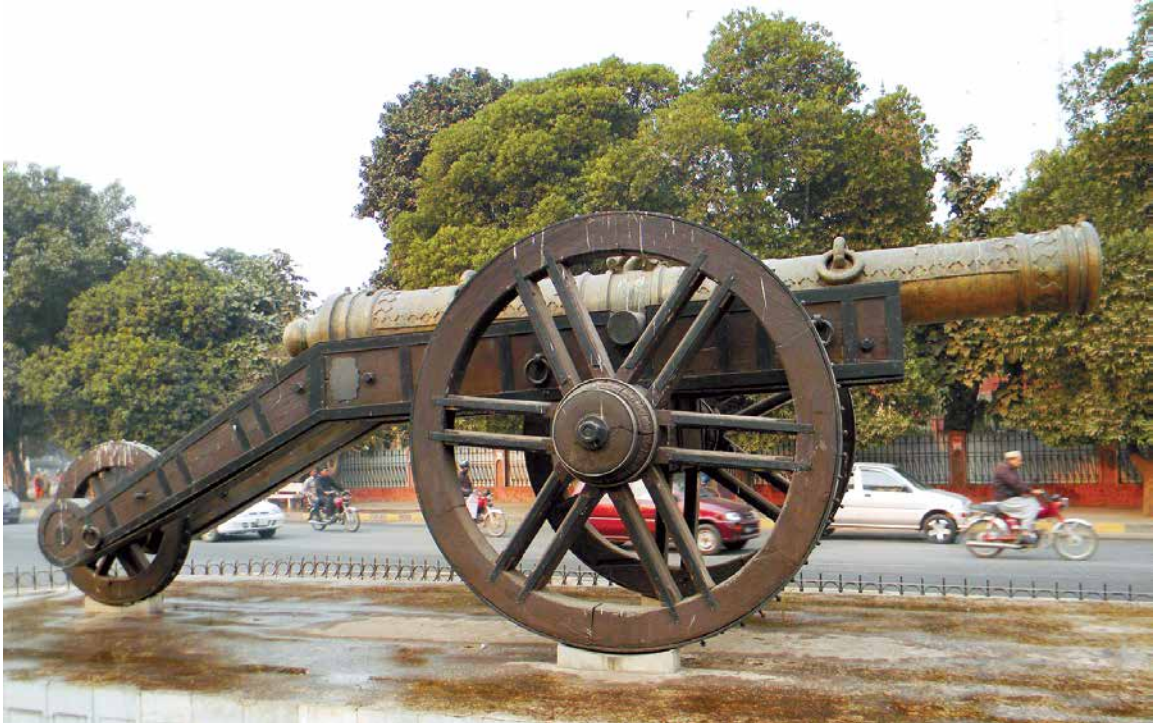
লাহৌর মিউজ়িয়ামের বাইরে ব্রোঞ্জনির্মিত কামান 'জ়মজ়মা', যার উল্লেখ আছে রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর উপন্যাস 'কিম'-এ

দেশভাগের আগে পিতৃপুরুষ থাকতেন এখানেই। সে কারণে ওই সাংবাদিক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর হোটেলে ফিরছেন না। দু'দিন আত্মীয়দের সঙ্গে কাটিয়ে সোজা দিল্লিগামী বিমান ধরবেন। ফলে তিনি কোন ফাঁকে ভিড়ের মধ্যে চলে গিয়েছেন, পাকিস্তানের টিকটিকিরা ধরতে পারেননি। সমস্যা শুরু হল নির্ধারিত বাসে ওঠার পর। সমস্ত আপাত আলস্য এবং আড়াল ঝেড়ে ফেলে এই দুই ব্যক্তি রীতিমতো জেরা শুরু করেছেন আমাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় অফিসারকে। মোদ্দা বক্তব্য, তোমরা এলে ন'জন। ফিরছ আট! ব্যাপারটা কী? আর এক জন কে? কোথায় গেল? তার পরিচয় কী?

ব্যাপারটা প্রায় ঝগড়ার পর্যায়েই, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, জবাবে সন্তুষ্ট না হলে আমাদের ছাড়ার হুকুম নেই হেডকোয়ার্টার থেকে, সে যতই মেহমান হই। আমাদের সঙ্গী অফিসারটি খুবই পোক্ত লোক এ ব্যাপারে, অতীতে বহু বার এসে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়েছেন নিশ্চয়ই। জানেন এ সব সময়ে কী করতে হয়। তা ছাড়া পাকিস্তানি কোনও অতিথি এসে দিল্লিতে হাওয়া হয়ে গেলেও হয়তো এমনটাই করা হয় আমাদের দেশে। এ খেলা দু'দেশের গুপ্তচরবাহিনীর নিজস্ব!

শেষ পর্যন্ত দু'ঘণ্টা বাদানুবাদ এবং ফোন সংযোগের পর আমাদের ফিরতে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই চোর-পুলিশ খেলায় ততক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আমাদের কেউ কেউ, সেই রাতেই লাহৌরের নিশিজীবন দেখতে, একটি পাকিস্তানি-আমেরিকান যুবকের সঙ্গে গেটের ওই সতর্ক 'প্রহরীদের' চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল!

ভোরে ফিরে দেখি, বেচারারা ওই লাউঞ্জেই ঘুমিয়ে কাদা। আইএসআই হলেও মানুষ তো!

॥ ৫ ॥

হিন্দকুশ পর্বত চূড়া এই বসন্ত-গ্রীষ্মের মৈথুনকালেও রুপোলি হয়ে রয়েছে। সূর্য এখন মাঝ-আকাশে। তারই আলোয় ঝলসাচ্ছে পাহাড়ি নদী সোয়াট। ভারত থেকে পত্রকার এসেছে শুনে একটি দু'টি করে সন্ত্রাসদগ্ধ ছায়া পড়ছে। দাঁড়িয়ে আছি পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে সোয়াট উপত্যকার কাজাঘেলা গ্রামে।

ইসলামাবাদ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে পেশোয়ারে এই উপত্যকা। আগে-পিছে চারটি করে অটোমেটিক মেশিনগান শোভিত ভ্যান মিছিল করে লাহৌর থেকে আজাদ কাশ্মীর হয়ে এই নয়নাভিরাম উপত্যকায় পৌঁছেছি। আগে যেখানে মানুষ আসতেন মধুচন্দ্রিমা করতে, এখন তা মৃত্যু উপত্যকা। অব্যর্থ মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের সেই লাইনগুলো— *'কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে/ আজ রাতে ঢের মেধ হিম হয়ে আছে দিকে দিকে।/ পাহাড়ের নীচে— তাহাদের কারু-কারু মণিবন্ধে ঘড়ি/ সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে ধীরে ঘুরাতেছে; / চাঁদের আলোর নীচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী/ কিছুক্ষণ কথা কবে...'*

গত দু'বছরে কোনও কথা বলেনি এই গ্রামের ষোড়শী মিনাজ বানু। প্রবল শক পেয়ে কার্যত বোবা। এই মিনাজের বাড়ির সামনের মোড়ে ল্যাম্পপোস্টগুলির সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা। সামনে দাঁড়ানো মিনাজের দৃষ্টি পলকহীন ভাবে দিগন্তে। মিনাজ ছিল মহাজনের জমিতে ভাগচাষ করা দরিদ্র পরিবারটির প্রাণবিন্দু। সে চাইত লেখাপড়া শিখে শহরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতেই আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছিল মিনাজ। মন খারাপ কাটাতে গুনগুন করে পাহাড়ি গান গাওয়া, বাড়ির লোকেদের দেখভাল করা আর বন্ধ জানলা ফাঁক করে বাইরের বিভীষিকা দেখাটাই ধরে নিয়েছিল ভবিতব্য। কিন্তু আল্লাতালা আরও কিছু লিখে রেখেছিলেন মিনাজের জন্য। এক দিন হঠাৎই অমোঘ ফরমান আসে এক তালিবান নেতার কাছ থেকে। বার্তা সংক্ষিপ্ত, মিনাজকে চাই। বিপদ বুঝে সেই রাতেই পিছনের দরজা দিয়ে তালিবানদের চোখ এড়িয়ে মিনাজকে নিয়ে পালিয়ে যান আম্মা। প্রাণ হাতে করে।

মিনাজকে না পেয়ে গভীর রাতে বিছানা থেকে তিন ঘুমন্ত ভাইকে টেনে বের করে এনে বাপের সামনে প্রত্যেকের কান কেটে দেওয়া হয়। শুনলাম, কান কাটা নাকি পাকিস্তানি তালিবানের সেরা প্রমোদ! এখানেই শেষ নয়। গ্রামবাসীদের ডেকে এনে দীর্ঘ অত্যাচারের পর ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মুণ্ডুচ্ছেদ। মুণ্ডু নিয়ে চলে এই রাস্তার মোড়ে উন্মত্ত উল্লাস। তার

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে শ্রীনগর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাস

পর থেকেই কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে উচ্ছল কিশোরী মিনাজের।

এই নয়নাভিরাম নিসর্গ দেখে বোঝা অসম্ভব, গত কয়েক বছরে প্রায় আড়াই হাজার নিরীহ মানুষের লাশ পড়েছে এই তালিবানি কুরুক্ষেত্রে। এখানকার মোট ৩৫ লাখের মধ্যে প্রায় ২৮ লাখ মানুষ কোনও মতে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এখানকার প্রতিটি গ্রামই ছিল ওসামা বিন লাদেন তৈরির কারখানা।

নোটবুক পেনসিল খুলব কী, ক্যালাইডোস্কোপের ঘূর্ণনের মতো দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটছে যেন। জ়ারদারি সরকার দেখাতে এনেছে যে, এখানে আপাতত শান্তিকল্যাণ। বন্ধ করে দেওয়া স্কুল-কলেজ আবার খোলা হয়েছে। সোয়াট নামেই উপত্যকা। আগে-পিছে সর্বত্র টিলা। এটি যে পর্যটনকেন্দ্র ছিল, তার চিহ্ন বহন করছে বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেল, যার বেশির ভাগই বদলে গিয়েছে সেনাশিবিরে।

এ রকমই একটি হোটেল পাইথন। সেটি আবার জঙ্গিদের মগজধোলাই কেন্দ্র। পোশাকি নাম, 'ডির‍্যাডিকালাইজ়েশন সেন্টার'। সামরিক মনস্তত্ত্ববিদ, সাধারণ মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, বিভিন্ন পেশার মানুষ— সব মিলিয়ে এক বিরাট আয়োজন। গোটা সোয়াট জুড়েই রয়েছে এমন বেশ কিছু সেন্টার। এখানকার কর্মসূচির নাম 'মিশাল'। এক একটি মডিউল, তিন মাসের। তিন মাস পর যদি দেখা যায়, জিহাদের ভূত মাথা থেকে নেমেছে, তা হলে রয়েছে পরের ধাপ অর্থাৎ, জীবিকার সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা। টিউবলাইট তৈরি থেকে কম্পিউটার চালানো— এক-একটি ঘরে শেখানো হচ্ছে এক-এক রকম কাজ। পুরোটাই অবশ্য সামরিক বাহিনীর প্রবল উপস্থিতিতে। ব্রিগেডিয়ার কামারন জলিল জানালেন, পুনর্বাসনের এই কর্মশালা থেকে এখনও পর্যন্ত ২৬১ জন পাক-তালিবান নেতাকে 'সুস্থ' করে পরিবারে ফেরত পাঠানো গিয়েছে। বাড়িতে পাঠানোর পরেও অবশ্যই নজরদারি বজায় রেখেছে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। তালিবানদের এই পাঠশালা দেখলে হঠাৎ করে মনে হবে যেন বয়স্ক শিক্ষার আসর! একটি কক্ষে মন দিয়ে জনা চল্লিশেক প্রাক্তন তালিবান গম্ভীর মুখে এক সমাজবিজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনছে! অন্য একটি ঘরে মাউস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেউ দেখছে, কী ভাবে কোরানের অপব্যাখ্যা করে সন্ত্রাসবাদের আমদানি করছে জিহাদিরা! কোথাও মন দিয়ে ইলেকট্রিক সার্কিট ঠিক করা হচ্ছে! কালাশনিকভ ছেড়ে মাস কয়েক হল কম্পিউটারের মাউস হাতে নেওয়া ফৈয়জ় আলি খানের চোখ দুটো এখন নিভে এসেছে! পুস্তু ভাষায় বললেন, "আমার বোনের বরের পাল্লায় পড়ে এই রাস্তায় এসেছিলাম। ও বলত, 'যে আমার সঙ্গে থাকবে না তাকেই মেরে দেব।' দিতও তাই। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা নিজ়ামে আতেহ্ (শরিয়তি আইনের জন্য আন্দোলন)-এর দাবিতে আমিও নেমে গেলাম ওদের পথে। মিস্ত্রির কাজ ছেড়ে এই মানুষ মারার খেলায় নেমেছিলাম তখন...' পাশে বসা রহমত আলি খান-এর গল্পটা পৃথক। সাঙ্কোটা গ্রামে বোন আর বাবা-মা'র সঙ্গে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাত রহমত। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখে নিয়েছিল। ২০০৯ সালে মৌলানা ফয়জুল্লার বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রাম এবং পরিবারেও পরিবর্তন আসে। তার কথায়, "বন্দুক দেখালে সবাই বশ হয়ে যেত। এটা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। অনেক লুঠপাট করেছি তখন।" 'মিশাল'-এর মনোবিজ্ঞানীদের দাওয়াই-এ অনেকটাই 'স্বাভাবিক' হয়েছেন, নিজেই কবুল করছেন রহমত।

আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পাকিস্তানি সেনার মালাখন্ড ডিভিশনের কর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাভেদ ইকবাল। নিরবচ্ছিন্ন ধূমপায়ী, একটি থেকে পরেরটি ধরাচ্ছেন। তবে তাঁর স্নায়ু এবং শরীরী ভাষা হিমশীতল। গত কয়েক বছরে তালিবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালিয়েছে পাক বাহিনী, তার নেতৃত্বে ছিলেন এই ইকবাল। তাঁর লড়াই ছিল সে সময়ে পাকিস্তানের 'তেহরিক-ই-নাফাজ-ই-শরিয়ত-ই-মোহাম্মাদি' নামে তালিবান গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা মৌলানা ফয়জুল্লার সঙ্গে। রেডিয়ো কাজাঘেলা (এফ এম চ্যানেল)-র পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সে। ওই রেডিয়ো চ্যানেলের মাধ্যমে তালিবানদের মতাদর্শ প্রচার করত ফয়জুল্লা। মতাদর্শের স্লোগান ছিল 'নিজামে আতেহ্।' পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোকে ভেঙে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল নিজস্ব ঢঙের শরিয়তি কানুন। ইকবালের কথায়, "আফগানিস্তান থেকে আসা তালিবান নেতাদের সঙ্গে মিলেই সোয়াটে সন্ত্রাসের পত্তন ঘটানো হয়েছিল। সামরিক অপারেশনের পর এখন ফয়জুল্লা ফিরে গিয়েছে আফগানিস্তানে।"

ভারত থেকে 'পত্রকার' এসেছে শুনে কাজাঘেলা গ্রামের মালাখন্ডি ডিভিশনের সেনা ছাউনিতে একটি দু'টি করে মানুষের মুখ উঁকি দিচ্ছে, অবশ্যই পাক সেনার তত্ত্বাবধানে। নীল পাঠান স্যুট পরা পক্ককেশ, কিন্তু এখনও যথেষ্ট ঋজু হায়দর আলির ঠাকুরদা ছিলেন ইংরেজ আমলের খান বাহাদুর। বিরাট ভিক্টোরিয়ান বাংলো, প্রচুর প্রতাপ। "সমস্ত সম্পত্তি প্রথমে বাজেয়াপ্ত, পরে ছেড়ে যাওয়ার সময় কার্যত ধ্বংস করে গিয়ে গিয়েছে ওরা। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে..." বলতে বলতে শীর্ণকায় বৃদ্ধের চোখ জ্বলে উঠল, 'পরিবারের সবাইকে বের করে কসাইয়ের মতো কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে। মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। আজও তাদের কোনও খোঁজ নেই। সামনে যে রাস্তা দেখছেন পাহাড়ে মিশে গিয়েছে, ওখান দিয়েই কাটা মুন্ডু নিয়ে মিছিল করত ওরা!"

আপাত ভাবে জীবনযাত্রা চলছে ঢিমে তালে। সেনার বজ্র-আঁটুনির মধ্যেই স্কুল-কলেজ, দোকান-হাট খুলেছে। খোঁজ করে দেখেছি, যা

যেখানে জঙ্গিদের মাথা থেকে তাড়ানো হয় জিহাদের ভূত

তালিবানদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত অস্ত্রের সম্ভার

আজও খোলাই রয়েছে।

এই গ্রামেরই 'আবেদ শাহিদ প্রাইভেট স্কুল'-এ নীল ইউনিফর্ম পরা একরাশ নিষ্পাপ বাচ্চার মুখোমুখি হয়ে তখন অবশ্য এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল যে, এই শান্তি টিকবে তো! প্রত্যেকটি ক্লাসে ঢুকতেই, একরাশ নীল ফুলের মতোই উঠে দাঁড়িয়ে তারা সুর করে বলছে, "সেলামালেকুম, থ্যাঙ্ক ইউ..." চিৎকার করে পুস্তু ভাষায় নামতাও পড়ে শোনাচ্ছে। না, ভয়ডরের লেশমাত্রও কিন্তু নেই তাদের কচি কণ্ঠস্বরে। বরঞ্চ বয়সোচিত চাপল্য। আতঙ্কের হিমশীতলতাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে ওই অমল ধবল (নাকি এখানে নীল!) শৈশব।

নয়াদিল্লির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্রিফিং রুমে বসে, একটি পাকিস্তানের মধ্যে বহু পাকিস্তানের তত্ত্ব বিভিন্ন কূটনীতিবিদের মুখে বহু প্রসঙ্গে শুনেছিলাম তার আগে। মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা সেই প্রথম। সোয়াটে আসার আগে লাহৌরের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত লাইব্রেরিতে বসে ভারত-পাকিস্তান বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সোয়াট উপত্যকার ওই মিনাজ নামের মেয়েটির থেকে তারা কত দূরে থাকে? কায়দ-ই-আজম ক্যাম্পাসে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠরত প্রতি দশটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে পাঁচ জনেরই ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে পশ্চিমের কোনও দেশে। উচ্চপদস্থ অফিসার, রাজনীতিক বা ধনী ব্যবসায়ীর এই সন্তানদের মানস গঠনের সঙ্গে আপাত ভাবে কোনও তফাতই পাওয়া যাবে না দিল্লি বা মুম্বইয়ের কলেজ-ক্যান্টিনের প্রাণোচ্ছলতার।

এই সোয়াটে তিরতির করে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর মতো সব সময়ই যেন আতঙ্কের চোরাস্রোত। আর তার মধ্যেই ঢালু মাঠে ব্যাট-বল নিয়ে আবার আফ্রিদি হওয়ার স্বপ্নও দেখে বাচ্চারা! এই দৃশ্য আজও সমসাময়িক।

একটি সুর বার বার যতটা সম্ভব জোরালো করে আজও বাজানো হয় পাকিস্তানে; জ়ারদারির সেই জমানা পেরিয়ে, নওয়াজ শরিফ বা ইমরান খান বা হাল আমলের শেহবাজ শরিফ পর্যন্ত যার বদল নেই; আফগানিস্তানে ফের তালিবান সরকার হওয়ার পরেও যে কথা ইসলামাবাদ আজও বলে চলেছে; সেটি হল, দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় শিকার পাকিস্তান নিজে। লাহৌরের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানকার কাফেটেরিয়ার নবীন প্রজন্ম, 'আজাদ' কাশ্মীরের শেষ চেকপোস্ট চাকোটি— যার সামনেই নিয়ন্ত্রণরেখা এবং ও পারে দৃশ্যমান ভারতীয় পতাকা সমৃদ্ধ চেকপোস্ট— সোয়াট উপত্যকার কাজাঘেলা গ্রাম, সর্বত্রই সে দিন দেখে এসেছিলাম সেই সন্ত্রাসের চাপা আতঙ্ক।

ভারতীয় সাংবাদিকদের আতিথ্য দিয়ে সে বার একটি কথা শুধু মুখে বলতে পারেনি রাওয়ালপিন্ডির সেনা হেডকোয়ার্টার, ইসলামাবাদের বিদেশ মন্ত্রক। তা হল, নিজেরা সন্ত্রাস-জর্জরিত হয়েও অত্যন্ত সুচারু পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রযন্ত্রের পুঁজি ও নৈপুণ্যে, সীমান্তের অন্য পারে সেই একই সন্ত্রাস পাচার করে যায় তারা আজও। যার কোনও অন্ত নেই।

পাক সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের চাকা সে দিন এক সময় ফেরার জন্য ঘুরতে শুরু করেছিল। একটু একটু করে উঠে গিয়েছিলাম সোয়াট থেকে। চাকার ঘূর্ণনে তৈরি হওয়া প্রবল বাতাসের চাপ সামলাতে সামলাতে যাঁরা হাত নাড়ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন সেখানকার সামরিক অফিসার-আমলা কর্তারা, তেমনই মেশিনগান ছেড়ে মেশিন মেরামতির কাজে হাত দেওয়া জঙ্গিরাও! হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে দলে দলে আসা শিশু। যারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মৃত্যুভয়হীন।

কাশ্মীরে যত বারই গিয়েছি, এক ধরনের মন খারাপ তৈরি হয়েছে ফেরার সময়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর গিয়ে বা সোয়াট উপত্যকার অভিজ্ঞতার পর, মনে হয়েছিল, নিয়ন্ত্রণরেখার এ-পারেই হোক বা ও-পার— যুদ্ধক্ষেত্র চোখে দেখার বিষাদ দু'ক্ষেত্রেই বোধহয় একই রকম!

গ ল্প

মেয়ে দেখতে এসে

ইন্দ্রনীল সান্যাল

মিলন জিজ্ঞেস করল পিউকে, "সকালবেলার অতিথিকে চায়ের সঙ্গে কী দেওয়া যায় বল তো?"

সাতাশ বছরের মেয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "উফ বাবা! তুমি এই নিয়ে বেশি ভেবো না তো!"

সাতান্ন বছরের বাবার দুশ্চিন্তা যায়নি। সে বলল, "শুধু চা-বিস্কুট দেওয়া ঠিক হবে না। অঘোর মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে শিঙাড়া আর চমচম নিয়ে আসব? নাকি হিঙের কচুরি আর ছোলার ডাল?"

"চঞ্চলের মা, আই মিন কাকিমা জানেন যে, তুমি বা আমি ভাল রান্না করতে পারি না। যা খুশি দিয়ো। উনি কিছু মনে করবেন না," পিউ বিরক্ত।

"আর তোর বয়ফ্রেন্ড চঞ্চল?" ময়দা মাখতে মাখতে বলল কবিতা, মিলনের ছেলেবেলার বন্ধু, "ভাবী জামাই আসছে মেয়ে দেখতে। হোক না লাভ ম্যারেজ। জম্পেশ খ্যাটনের আয়োজন না করলে মেয়ের বাড়ির প্রেস্টিজ থাকবে?"

পিউ আর মিলন হাওড়ার শক্তিনগরের যে বাড়িতে ভাড়া থাকে, তার কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকে পঞ্চাশ বছরের কবিতা। ওর বর

সন্তোষ শক্তিনগরের 'ইন্ডিয়া জুটমিল'-এর ম্যানেজার। সন্তোষ আর কবিতার এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে একা বসে থাকতে বিরক্ত লাগে বলে কবিতা রোজ বিকেলে দেশতুতো ভাই মিলনের বাড়ি চলে আসে।

দেশতুতো, কারণ কবিতা আর মিলনের আদি বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে। বিয়ের পরে সেখান থেকে হাওড়ার শক্তিনগরে চলে আসে কবিতা। সেটা পঁচিশ বছর আগের কথা। বাইশ বছর আগে সন্দেশখালি ছাড়ে মিলন, সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ে পিউ। কবিতার অনুরোধে ওর বর সন্তোষ 'ইন্ডিয়া জুটমিল'-এ লেবারের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিল মিলনকে। এত বছর ধরে রগড়ে মিলন এখন সুপারভাইজ়ার।

শক্তিনগরকে শহর বলা যাবে না। কারণ, খাতায় কলমে এটা পঞ্চায়েত এলাকা। পঞ্চায়েত ভোটের সময় গোটা দুয়েক লাশ পড়া সাধারণ ঘটনা। শক্তিনগরকে গ্রাম বলা যাবে না। কারণ, মাটির বাড়ির স্নেহশীতল ছায়া, ধানখেতের শ্যামলিমা, বা 'আমাদের ছোট নদী'-র রোম্যান্টিকতা নেই। শক্তিনগরকে মফস্‌সল বলা যাবে না। কারণ, দেবদারু বীথির সারল্য, গার্লস কলেজের লাজুক তরুণীবেলা বা খেলার মাঠের দামাল কৈশোর নেই। এখানে রাস্তা মানে খানাখন্দ, খেলার মাঠ মানে সিন্ডিকেটের থাবা, কলেজ মানে গোষ্ঠীকোন্দল, মাঠ মানে গাঁজা আর চুল্লুর ঠেক, বসতবাড়ি মানে ক্রিকেট বেটিং বা মধুচক্র। এই রকম জায়গাকে শহরতলি বলে। সবাই যেখানে মুখোশ পরে বাঁচে। সবাই।

সন্দেশখালি এ রকম ছিল না। দুই বা আড়াই দশক আগেও সেখানে বেঁচে থাকার জন্যে প্রবল পরিশ্রম করতে হত। আজও করতে হয়। নদী ও ভেড়ি বেষ্টিত এলাকার মানুষ হিসেবে মিলন আর কবিতার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মিল চোখে পড়ার মতো। কম বয়স থেকে গায়েগতরে খেটে দু'জনের চেহারাই পেশিবহুল। কবিতার গায়ের রং পরিষ্কার হলেও মিলন ময়লা। পিউয়ের ভাগ্য ভাল যে, সে মিলনের চেহারা বা রং পায়নি।

কবিতার বলা জম্পেশ খ্যাঁটনের প্রসঙ্গ পিউয়ের মনে ধরেছে। সে বলল, "চঞ্চল মোগলাই খেতে ভালবাসে। ফুড ডেলিভারি অ্যাপে অর্ডার করব?"

"না!" আপত্তি করে কবিতা, "আমি মোগলাই পরোটা বানাচ্ছি।"

কবিতার পরিকল্পনা কানে ঢোকেনি পিউয়ের। সে ভাবছে অন্য কথা...

পিউয়ের সঙ্গে চঞ্চলের আলাপ মণীন্দ্রনাথ কলেজে। পিউ আর্টস পড়তে ঢুকেছিল। কমার্সের ছেলে চঞ্চল তার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র। ওর বাড়ি বৈঠকখানা বাজারে। বাবা মারা গেছে। মায়ের নাম সুমিত্রা। সে মণীন্দ্রনাথ কলেজেরই বাংলার অধ্যাপক।

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর চাকরি খুঁজতে গিয়ে পিউ আর চঞ্চল বুঝতে পারল, কলকাতা শহরে তাদের জন্যে কোনও চাকরি নেই। চঞ্চল কমার্স পড়ার সময় অনলাইনে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি বাগিয়েছিল। তার জোরে চাকরি জুটিয়েছে হায়দরাবাদে। পিউ কোনও চাকরি পায়নি। তবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে হায়দরাবাদের ফিল্ম সিটিতে মেগা সিরিয়ালের রিসার্চের কাজ জুটিয়েছে। আপাতত ওয়ার্ক ফ্রম হোম। হায়দরাবাদের শিফ্‌ট করার পরে অফিসে গিয়ে কাজ করতে হবে। রিসার্চের কাজে পিউকে সাহায্য করছে সুমিত্রা।

দুই বাড়ির সবাই জানে যে, ছেলেমেয়ে বিয়ে করে ফুড়ুত! আজকের এই মেয়ে দেখতে আসার আয়োজন নিতান্তই নিয়মরক্ষা। পিউকে আগে দেখলেও মিলনকে আজ প্রথম দেখবে সুমিত্রা। কবিতাকেও। মিলনও আজ প্রথম দেখবে চঞ্চল আর সুমিত্রাকে।

"কী ভাবছিস রে?" পিউয়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল কবিতা।

চমকে উঠে পিউ বলল, "কিছু না।"

"কী ভাবছিস বল!" ধমক দিল কবিতা।

কী ভাবছিল বলা যাবে না। প্রসঙ্গ বদলাতে পিউ বলল, "ফুড ডেলিভারি অ্যাপে কী আনানো যায় ভাবছিলাম।"

"বললাম তো, মোগলাই পরোটা ভাজছি। কিস্যু আনাতে হবে না।"

ময়দা মাখা শেষ করে সেদ্ধ আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে কবিতা, "সঙ্গে আলুর দম। তুই সাজুগুজু করে নে। আগেকার দিনে একেই 'পাত্রী দেখতে আসা' বলত। সে সব তোরা তুলে দিয়েছিস।"

"তুলে দিয়ে ভালই করেছে," বসার ঘরে নতুন পর্দা লাগাতে লাগাতে কর্কশ গলায় বলল মিলন, "মেয়ে বা ছেলে দেখার মতো এই জঘন্য নিয়ম উঠে গেলেই মঙ্গল।"

পিউ বলল, "চুপ করো, ওঁরা এসে গেছেন। রিকশা থেকে নামছেন।"

মিলন পর্দা লাগানোর কাজ শেষ করল।

কবিতা বলল, "মোগলাই পরোটা মোটামুটি রেডি। আমি বাড়ি থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে ভাজব।"

পিউ বলল, "পিসি, তোমাকে বাড়ি যেতে হবে না। আমার কোনও একটা শাড়ি পরে নাও। তুমি না থাকলে বাবা ওঁদের সামনে আজেবাজে বকবে।"

"ভাল বলেছিস," টুক করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল কবিতা।

মিলন পরে আছে লুঙ্গি আর ফতুয়া। মসৃণ গালে আফটার শেভ লোশন থাবড়ে নিল। একমাথা চুলে টেরি বাগিয়ে আপনমনে বলল, "চুলটা কেটে এলে হত," তার পর দরজা খুলে বলল, "আসুন। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

॥ ২ ॥

বৈঠকখানায় ঢুকল সুমিত্রা আর চঞ্চল। সাতান্ন বছরের সুমিত্রাকে দেখলেই মনে হয়, জাঁদরেল টাইপের মহিলা। একা হাতে ছেলে মানুষ করার অভিজ্ঞতা ছাপ রেখে গেছে ভুরুর কুঞ্চনে আর কপালের ভাঁজে।

বসার ঘরের প্রতিটি কোণে চোখ বুলিয়ে সোফায় বসে সুমিত্রা বলল, "আপনাদের বাড়ি বাস রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে। রিকশা ভাড়া কুড়ি টাকা।"

"আমি কত কষ্ট করে কলেজ করেছি সেটা ভাবুন ম্যাম," হাসছে পিউ, "আপনি তো দেরি হলেই বকাবকি করতেন!"

সুমিত্রা বলল, "কষ্ট আমিও কিছু কম করিনি।"

"তোমরা কি এখন স্ট্রাগলের প্রতিযোগিতা শুরু করবে?" বিরক্তিতে ঘাড় ঝাঁকায় চঞ্চল, "হ্যাঁ রে পিউ, কিছু খাওয়াবি না?"

পিউ উত্তর দেওয়ার আগেই রান্নাঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল কবিতা, "আপনাদের জন্যে মোগলাই পরোটা রেডি হচ্ছে।"

কবিতার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা বলল, "আপনাকে চিনতে পারলাম না!"

পিউ তাড়াহুড়ো করে বলল, "কবিতা পিসি বাবার ছোটবেলার বন্ধু। দু'জনেরই আদি বাড়ি সন্দেশখালি।"

কবিতাকে হাতজোড় করে নমস্কার করল সুমিত্রা। কবিতা প্রতি-নমস্কার করে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রান্নাঘর থেকে মোগলাই ভাজার ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে।

সুমিত্রা পিউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেগা সিরিয়ালের রিসার্চের কাজ কেমন চলছে?"

"চলছে মোটামুটি..." ইতস্তত করে পিউ, "আপনাকে তো প্রথম দিকের রিসার্চ ওয়ার্কগুলো পড়িয়েছিলাম। আমার কাজ হল রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের স্বল্প-পরিচিত, কিন্তু ইন্টারেস্টিং কাহিনি খুঁজে বের করা। তার পর সেটার ওপরে ডিটেলে রিসার্চ করে মেটিরিয়ালটা ওদের মেল করে দেওয়া। ওদের স্টোরি ডেভেলপার টিমের যদি মেটিরিয়াল পছন্দ হয়, তা হলে সেটা গল্পে ইনকর্পোরেট করে। দশটা রিসার্চ ওয়ার্ক পাঠালে একটা সিলেক্টেড হয়। পরিশ্রম খুব, তবে টাকা ভালই দেয়।"

"আমি লাস্ট যেটা পড়েছিলাম, সেটা যেন কী ছিল?" জিজ্ঞেস করল সুমিত্রা।

"পাশা খেলা নিয়ে একটা লেখা। ওটা সিলেক্টেড। এখন ইল আর ইলাকে নিয়ে পড়াশোনা করছি।"

"ছোট করে বল। ফ্যাকচুয়াল এরর আছে কি না শুনে নিই।"

পিউ বলল, "বৈবস্বত মনু আর তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধা নিঃসন্তান ছিলেন। মনু তাই সন্তান কামনা করে দেবতা মিত্র বরুণের যজ্ঞ করছিলেন। মনুর ইচ্ছে ছেলে হোক, শ্রদ্ধার ইচ্ছে মেয়ে। শ্রদ্ধা তাঁর ইচ্ছের কথা যজ্ঞের হোতাদের বললেন। যজ্ঞের ফলে কন্যাসন্তানের জন্ম হল। তার নাম

রাখা হল ইলা। ছেলের বদলে মেয়ে পেয়ে মনু ক্ষুব্ধ হয়ে বশিষ্ঠকে নালিশ করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, 'আমার তপস্যার বলে তোমার ছেলেই হবে।' তার পর তিনি ভগবান বিষ্ণুর স্তব শুরু করলেন। বিষ্ণুর আশীর্বাদে মেয়েটি ছেলে হয়ে গেল এবং তার নাম হল সুদ্যুম্ন বা ইল।"

"'ইল' মানে মাছ?' নাকি 'অসুস্থ?' নাকি অসুস্থ মাছ?" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে মিলন।

সুমিত্রার ভুরু কুঁচকে গেছে। গভীর শ্বাস নিয়ে সে পিউকে বলল, "তার পর?"

সুমিত্রার মুড জানে পিউ। সে বাবাকে দাবড়ানি দিল, "তুমি চুপ করবে?" তার পর সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইল একবার বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়ে উমাবনে এলেন। এই বনের নিয়ম হল, কোনও পুরুষ প্রবেশ করা মাত্র সে মেয়ে হয়ে যাবে। ইল এই নিয়ম জানতেন না। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে বনে প্রবেশ করা মাত্র মেয়ে হয়ে গেলেন এবং অতীতের কথা ভুলে উমাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।"

পিউয়ের গল্প শুনে মিলন সোফায় বসে হাঁটু নাচাচ্ছে আর ফিকফিক করে হাসছে। তার দিকে ফিরে সুমিত্রা বলল, "আমাদের কথাবার্তা আপনার ভাল লাগছে না, তাই না? স্যরি। আমরা বরং অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি।"

"না না, ঠিক আছে! লেবার চরিয়ে খাই তো! সাহিত্য-ফাহিত্য বুঝি না। আপনারা কথা বলুন," বলল মিলন।

'ফাহিত্য' শব্দটি গায়ে লেগেছে বাংলার অধ্যাপকের। সুমিত্রা বলল, "মেয়ে দেখতে এসে 'ফাইত্য' করা ঠিক নয়। আমি বরং আপনার কাছ থেকে সংসারের খবর শুনি। কোন ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে যাব, এটা জানা জরুরি।"

লজ্জায় পিউয়ের মুখ লাল। চঞ্চল মায়ের দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে। সুমিত্রা রেগে গেলে কী হতে পারে, সে জানে।

মিলনের বিকার নেই। সে বলল, "বাবার চাষের জমি ছিল। ক্লাস সিক্স অবধি পড়ে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। বাবা জমির কাজে জুতে দিল। তার পরে বাবা-মায়ের ইচ্ছেয় অল্প বয়সে বিয়ে। বৌয়ের নাম ছিল মায়া।"

"ছিল মানে?" জিজ্ঞেস করল সুমিত্রা।

"পিউ হতে গিয়ে মায়া মারা যায়। সেই জমানায় বাড়িতে বাচ্চা হত। লোকাল ধাইমা সামলাতে পারেনি।"

"আহা রে!"

"বাবা-মা আগু-পিছু মারা গেল দু'হাজার সালে। তখন পিউয়ের বয়স পাঁচ। কবিতা বাপের বাড়ি গিয়ে আমার অবস্থা দেখে বলেছিল, 'তুই আমাদের ওখানে চল। তোর জীবনটা তো নষ্টই হল। মেয়েটার জীবন যেন নষ্ট না হয়।'"

"আর-একটা বিয়ে করার কথা ভাবেননি?" নরম গলায় জিজ্ঞেস করল সুমিত্রা।

"অনেক মেয়েরই বাবা ঘুরঘুর করেছিল। বৌ-মরা হতে পারি, এক মেয়ের বাবা হতে পারি, গরিব হতে পারি— তবে পুরুষ মানুষ তো! বাঁকা হলেও সোনার আংটি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলন, "কিন্তু তত দিনে আমার জীবনে একটাই টার্গেট। পিউকে মানুষ করা। পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে সেই যে সন্দেশখালি ছাড়লাম, আর ফেরত যাইনি। বসতবাড়ি আর জমি বেচে চলে এলাম এখানে। কবিতার বর লেবারের কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। ওই লাইনে ঘষতে ঘষতে এত দূর এসেছি।"

॥ ৩ ॥

মিলনের কথা শুনতে শুনতে সবাই চুপ করে গেছে। নৈঃশব্দ্যের অস্বস্তি কাটাতে চঞ্চল বলল, "রান্নাঘর থেকে ভালই গন্ধ আসছে।"

সুমিত্রা ছেলের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "হ্যাংলামো করিস না," তার পর পিউয়ের দিকে ফিরে বলল, "তুই গল্পের বাকিটা শোনা।"

পিউ একটু ভেবে বলল, "সুন্দরী ইলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন চন্দ্রদেবের পুত্র বুধ। তিনি জানতেন যে, ইলা অতীতের কথা ভুলে গেছেন। বুধ তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধরে কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে?' ইলা বললেন, 'আপনি কে? আমিই-বা কে?' বুধ বললেন, 'তোমার নাম ইলা। আমি বুধ, বিদ্বান ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে ভালবাসি।' এই কথা শুনে ইলা বুধের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলেন এবং সেখানে এক বছর এক সঙ্গে কাটালেন। তখন তাঁদের সন্তান পুরুরবা-র জন্ম হল।"

পিউয়ের কথা শুনে হাসছে মিলন। পাত্তা না দিয়ে পিউ বলছে, "ওদিকে ইলকে খুঁজে না পেয়ে সবাই চিন্তিত। মহর্ষি বশিষ্ঠ ধ্যানযোগে সব জানতে পেরে, ইলকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে শিবের স্তব শুরু করলেন। স্তবে খুশি হয়ে শিব দর্শন দিলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন, 'ইলের পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিন।' শিব বললেন, 'আমার নিয়ম তো ভাঙা যাবে না। তবে ইক্ষ্বাকু যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তা হলে সেই যজ্ঞের ফলে ইলা কিছুকাল নারী আর কিছুকাল পুরুষ থাকবে। এর পর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে ইলা যখন ইল হয়ে গেলেন, তখন তাঁর মনে পড়ে গেল বাবা-মা এবং বৌ-বাচ্চার কথা। কিন্তু নিজের অতীত, অর্থাৎ ইলার কথা আর মনে পড়ল না।"

মিলনের এই আলোচনা পছন্দ হচ্ছে না। সে পিউকে বলল, "মোগলাই পরোটা ভাজতে তোর পিসি কত সময় নেবে?"

কথাটা শুনতে পেয়ে রান্নাঘর থেকে কবিতা হাঁক পাড়ল, "পিউ! নিয়ে যা।"

ডাক শুনে পিউ রান্নাঘরে গেল। ট্রে-তে তিন প্লেট গরমাগরম মোগলাই পরোটা আর তিন বাটি আলুর দম নিয়ে ফিরল। চঞ্চল লোভীর মতো নিজের প্লেট তুলে নিল। পিউ একটা প্লেট এগিয়ে দিল সুমিত্রার দিকে। নিজে নিল একটা প্লেট।

মিলন সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাজ়ব্যান্ডের কী হয়েছিল?"

"সিগারেট খেত খুব। সেই থেকে গলায় ক্যানসার।" এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ল সুমিত্রা, "অপারেশন, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি— সব কিছু করেও এক বছরের বেশি বাঁচেনি।"

রান্নাঘরের পর্দা ফাঁক করে ইশারায় মিলনকে ডাকছে কবিতা। মিলন সে দিকে এক পলক তাকিয়ে আপনমনে বলল, "এই রোগটা এত বেড়েছে..."

পর্দা সরিয়ে আবার হাত নেড়ে ডাকছে কবিতা। সুমিত্রা বলছে, "চঞ্চলের বাবা চলে যাওয়ার পরে আমাকে আর ছেলেকে বৈঠকখানা বাজারের শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। আমি এক ইঞ্চি জমি ছাড়িনি। চঞ্চলকে ট্যাঁকে গুঁজে লড়াই চালিয়েছি। একা হাতে ছেলে মানুষ করার পাশাপাশি অধ্যাপনা করেছি। এত রকম চাপে খিটখিটে আর অথরিটেটিভ হয়ে গেছি। প্লিজ়, কিছু মনে করবেন না!"

"মানুষের কত রকমের সমস্যা!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলন। সোফা থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢোকে।

সুমিত্রার খাওয়া শেষ। সে বলল, "চঞ্চল আর পিউয়ের বিয়েটা মিটে গেলে এক বার সন্দেশখালি যাব। ওখানে নাকি 'অমানুষ' সিনেমার শুটিং হয়েছিল। জায়গাটা এখনও গ্রাম আছে?"

"আমি নিজেই বাইশ বছর যাইনি," রান্নাঘর থেকে চেঁচাল মিলন।

খালি প্লেট আর বাটি ট্রে-তে রেখে সোফা থেকে উঠেছে সুমিত্রা। বসার ঘরের অন্য প্রান্তের দেওয়ালে ফিট করা বেসিনের দিকে যেতে যেতে বলছে, "আপনার বোন কবিতার বাড়িতে উঠলে আপত্তি নেই তো?"

মিলন উত্তর দিল না। সোফার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা দেখল, চঞ্চল আর পিউ নিচু গলায় প্রেম করছে। সুমিত্রার প্রশ্ন বা মিলনের নীরবতা খেয়াল করেনি।

বেসিনে মুখ ধুয়ে প্রশ্নটা আবার করল সুমিত্রা। আবারও কোনও উত্তর না পেয়ে রান্নাঘরের পর্দা সরাল। এবং ভিতরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

মেঝেয় লুটোচ্ছে কবিতার শাড়ির আঁচল। ব্লাউজ় আর অন্তর্বাস সরিয়ে কবিতার স্তনে বরফ ঘষছে মিলন। যন্ত্রণায় কবিতার মুখ কুঁচকে আছে। বোঝা যাচ্ছে, কড়া থেকে তেল ছিটকে কবিতার বাম স্তনের কিছুটা অংশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

সুমিত্রাকে দেখে এক ধাক্কায় মিলনকে সরিয়ে দিল কবিতা। মিলন অবাক হয়ে বলল,

"কী হল?" তার পর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল সুমিত্রা তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বরফ জমা গলায় সুমিত্রা বলল, "আপনারা ভাই-বোন? তা হবে! এই রকম ইমার্জেন্সিতে আমি কিন্তু বরফ ঘষার জন্যে পিউকে ডাকতাম," তার পর এক ঝটকায় পর্দা নামিয়ে বলল, "চঞ্চল, ওঠ। বাড়িতে অতিথি আছে জেনেও যারা অসভ্যতা করে, তাদের থেকে দূরে থাকাই বেটার।"

॥ ৪ ॥

বাইরে অন্ধকার। বিকেল গড়িয়েছে সন্ধ্যায়। শক্তিনগরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। শুধু মিলনের বাড়ির কোনও আলো জ্বলছে না। সুমিত্রা অনেক আগেই বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। পিউয়ের অনুরোধে যেতে পারেনি। মেয়েটা হাউহাউ করে কাঁদছে আর বলছে, "আপনি যা দেখেছেন, সেটা ভুল। বিশ্বাস করুন!"

সুমিত্রা নিশ্চুপ বসে আছে। চঞ্চল তো বলেই বসল, "আমরা চলে যাওয়ার পরে আপনারা এ সব করলে পারতেন।"

"কী করেছি আমরা?" ঝাঁজিয়ে উঠেও নিজেকে সামলে নেয় কবিতা। ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে, সে বসার ঘরে এসেছে।

মিলন বিনীত ভাবে বলে, "এর মধ্যে দোষ কোথায়? আমরা ভাই-বোন।"

"আপনাদের মতো অনেক ভাই-বোন আমার দেখা আছে," হিসহিস করে বলল সুমিত্রা, "ইংরেজিতে একে বলে 'ইনসেস্ট।' বাংলায় 'অজাচার।' এই রকম ফ্যামিলির মেয়েকে আমি ছেলের বৌ হিসেবে মানতে পারব না।"

"কাকিমা, প্লিজ়," সুমিত্রার হাত ধরে কাঁদছে পিউ, "আমি চঞ্চলকে ভালবাসি।"

"আমিও তোমাকে ভালবাসি পিউ," বলল চঞ্চল, "কিন্তু মা যা দেখেছেন, তার পরে আমার কিছু বলার থাকে? তুমিই বলো?"

"আপনি যা দেখেছেন, সেটা ভুল," চিৎকার করে পিউ। বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, "ও বাবা! তুমি সত্যিটা বলে দিচ্ছ না কেন?"

"চুপ কর!" মেয়ের গালে থাপ্পড় কষায় মিলন।

পিউকে হ্যাঁচকা টানে মিলনের কাছ থেকে সরিয়ে চঞ্চল বলল, "বাবা হয়েছেন বলেই গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার জন্মায়নি। জানোয়ার কোথাকার!"

"এনাফ হয়েছে!" কবিতা বোমার মতো ফেটে পড়ল, "এবার তা হলে সত্যি কথাটা বলেই দিই। মিলন পিউয়ের বাবা নয়। ও পিউয়ের মা, আমার দিদির মতো। বোনের ব্রেস্ট পুড়ে গেলে দিদি যদি বরফ ঘষে দেয়, তা হলে প্রবলেম কোথায়?"

"মানে?" চিৎকার করছে সুমিত্রা, "আপনারা লেসবিয়ান কাপল হয়ে নিজেদের ভাই-বোন বলে চালাচ্ছেন? যতই লিবারাল হই না কেন, এই ফ্যামিলির মেয়েকে বাড়ির বৌ করলে সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।"

মিলন মাথা নিচু করে বসেছিল। সোফা থেকে উঠে, বসার ঘরের আলো জ্বালিয়ে বলল, "যে পরিচয় লুকিয়ে এত বছর বেঁচে আছি আজ সেটা বলতে হচ্ছে। শুনুন তা হলে।"

সুমিত্রা আর চঞ্চল বেরিয়ে যাচ্ছিল। মিলনের কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আমার নাম মিলি," হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছছে মিলন, "আমার বিয়ে হয়েছিল সুভাষ মণ্ডলের সঙ্গে, উনিশশো পঁচানব্বই সালে। ও ভেড়ি পাহারার কাজ করত। বিয়ের পাঁচ মাসের মাথায় মাছ চোরদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মরে যায়। ভেড়ি মালিক ওখানকার পঞ্চায়েত প্রধান। আমাকে থোক টাকা দিয়ে বলেছিল, 'থানা-পুলিশ করিস না। সুবিধে করতে পারবি না। যা দিলাম, নিয়ে চুপ করে যা।' বুড়ো বাবা-মা ছাড়া আমার কেউ ছিল না। মেনে নিতে বাধ্য হই। কারণ, পিউ তখন পেটে। সেই বছরই হেলথ সেন্টারে পিউয়ের জন্ম হয়।"

"তখন যে বললেন বাড়িতে বাচ্চা হয়েছিল!" চশমার ফাঁক দিয়ে মিলনকে দেখছে সুমিত্রা।

"ওটা বানানো গল্প দিদি। আমাকে যেটা সারা জীবন বলে যেতে হয়েছে। ফিউচারেও বলে যেতে হবে।"

সুমিত্রা আর মিলনের কথার মধ্যে পিউ টুক করে চঞ্চলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মিলন বাবু হয়ে সোফায় বসে বলল, "মেয়েকে নিয়ে হেলথ সেন্টার থেকে বাড়ি ফেরার পর আসল সমস্যা শুরু হল। রাতবিরেতে ব্যাটাছেলেরা বাড়ির বাইরে থেকে ফিসফিস করে বলত, 'এক বার চল। অনেক টাকা দেব।'"

"আপনাকে দেখে মেয়ে বলে মনে হয় না," সুমিত্রা এখনও সন্তুষ্ট নয়।

"আমি একে ব্যাটামুখো, তার ওপরে খেটে খেটে শরীর কাঠের মতো শক্ত। এক বেলা খেতে পেতাম বলে কোথাও কোনও উঁচুনিচু নেই।"

কথা শুনে সুমিত্রা আর চঞ্চল মাথা নামিয়েছে। মিলন হাঁটু নাচাতে নাচাতে বলল, "সবটা আগে শুনুন, তার পরে লজ্জা করবেন। পরের দিকে দিনের বেলাও লোকের আসা শুরু হল। আমাকে ওরা দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেবে। অনেক টাকা মাইনে। আমার বাবা-মা আড়কাঠিগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করত। ওরা যত দিন বেঁচেছিল, অসুবিধে হয়নি। বাপ-মা মরে যাওয়ার পরে ঝামেলা শুরু হল। গ্রামের লোকেরা আমাকে চার বার রেপও করে।"

সুমিত্রা অবাক হয়ে মিলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পিউ মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদছে। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মিলন বলল, "কবিতার বিয়ে হয়েছিল শক্তিনগরে। ও আমার সব কথাই জানত। এক বার বাপের বাড়ি গিয়ে বলল, 'শক্তিনগর চলো। আমার বর জুটমিলে লেবারের কাজ জুটিয়ে দেবে।' আমি বলেছিলাম, সেখানেও তো আমি এক টুকরো মাংস ছাড়া কিছু না। আর কারখানা এমন জায়গা, যেখানে মনে করা হয় মেয়েরা কাজের যোগ্য নয়। মাসের মধ্যে পাঁচটা কাজের দিন নষ্ট করবে, পেটে বাচ্চা এলে এক বছর বসিয়ে মাইনে দিতে হবে। তা ছাড়া ছেলে আর মেয়ের মাইনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কবিতা বলেছিল, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছ যখন, এগুলো মেনে নিতে হবে।' ওর কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেল শালা! জমানো টাকা আঁচলে বেঁধে, পাঁচ বছরের পিউকে ট্যাঁকে গুঁজে দু'হাজার সালে সন্দেশখালি ছেড়ে চলে এলাম কবিতার শ্বশুরবাড়ি। এখানেই এক মাথা চুল মুড়িয়ে কদমছাঁট করলাম, জামাপ্যান্ট পরতে শিখলাম, কর্কশ গলায় কথা বলা অভ্যেস করলাম; কথায় কথায় খিস্তি করা, বিড়ি খাওয়া, দাড়ি কামানো শিখলাম। সন্তোষ আমাকে গাইড করত। সন্তোষই কাজ জুটিয়ে দিল। সেই থেকে আপনাদের ওই ইলা আর ইলের গল্প চলছে।"

"আপনার এই ব্যাপারটা কে কে জানে?" জিজ্ঞেস করল সুমিত্রা।

"এত দিন পিউ, কবিতা আর সন্তোষ ছাড়া কেউ জানত না। আজ আপনাদের বলতে বাধ্য হলাম। বুকে তেলের ছিটে লেগে কবিতা কাতরাচ্ছিল। আগুপিছু না ভেবে বরফ ঘষছিলাম। তার পরিণতি এই হবে, বুঝতে পারিনি।"

সুমিত্রার কপালে ভাঁজ, "পরিচয় বদলে ফেলা সোজা। কিন্তু পরিচয়পত্র জোগাড় করতে তো সমস্যা হওয়ার কথা! তাই না?"

"সেটা দু' হাজার সাল দিদি!" হো-হো হাসছে মিলন, "আজ থেকে বাইশ বছর আগের কথা। নানা কার্ডের ঝামেলা তখনও শুরুই হয়নি।"

সুমিত্রা আপন মনে বলল, "আমি এত দিন ভাবতাম সিঙ্গল মাদার হিসেবে খুব স্ট্রাগল করেছি! হায় রে! আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।"

"আপনি নয়, তুমি বলো দিদি," সোফা থেকে উঠে লেদ মেশিন চালানো কেঠো হাত সুমিত্রার পিঠে রাখে মিলন।

মিলনের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা বলে, "বিয়েটা হয়ে গেলে... মানে, যদি বিয়েটা হয়... তুমি কি আবার মিলিতে ফেরত যাবে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলন বলে, "এক জীবনে দু'রকম ভাবে বেঁচে দেখলাম তো! মেয়ে হওয়া খুব অসুবিধের। আমি মিলন হয়েই বাকি জীবনটা কাটাব। বিয়ের পরে বেয়াইয়ের এইটুকু খুঁত মাফ করে দিয়ো।"

শিল্পী: প্রসেনজিৎ নাথ

প্র ব ন্ধ

দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন, দূরে রাষ্ট্রপতি ভবন, নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক

দিল্লি, দোস্তি, দাস্তান

প্রেমাংশু চৌধুরী

ঘড়ির কাঁটায় ভোর ছ'টা। শহর কলকাতা তখন আড়মোড়া ভাঙছে। ঠিক একশো দশ বছর আগের কথা। সালটা ১৯১২। 'লিপইয়ার' বলে ক্যালেন্ডারে একটি অতিরিক্ত দিন ছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি। সে দিনই সাতসকালে লন্ডন থেকে সেক্রেটারি অব স্টেটের টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল কলকাতায়। এডউইন লুটিয়ানসকেই দিল্লির টাউন প্ল্যানিং কমিটিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। এর পরে আর ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ কী করে আপত্তি তোলেন!

মাস দুয়েক আগেই কলকাতা থেকে দেশের রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। ব্রিটেনের রাজা ও রানি দিল্লির করোনেশন পার্কের 'দরবার' থেকে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী সরালেই তো আর হবে না! নতুন রাজধানী তৈরি করতে হবে তো! দিল্লির কোথায় নতুন রাজধানী তৈরি হবে, তা ঠিক করতেই লন্ডন থেকে টাউন প্ল্যানিং কমিটি পাঠানো হবে।

কারা সেই টাউন প্ল্যানিং কমিটিতে থাকবেন, তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। শেষে তিন জনের নাম ঠিক হল। ব্রিটিশ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জন আলেকজান্ডার ব্রডি, লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন জর্জ সুইনটন এবং নামজাদা স্থপতি বা আর্কিটেক্ট এডউইন লুটিয়ানস, ইতিহাস পরে যাঁকে 'দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ স্থপতি' বলে আখ্যা দেবে। যাঁর নাম জুড়ে নয়াদিল্লির আদরের ডাকনাম হবে 'লুটিয়ানসের দিল্লি'।

দশ-বারো দিনের মধ্যে বাকিংহাম প্যালেস থেকে রাজার ছাড়পত্র এসে গেল। সঙ্গে মন্তব্য 'এক্সেলেন্ট'! ১৩ মার্চ সংবাদপত্রে খবরটা ছাপা হল। ভারতে ব্রিটিশ রাজ-এর নতুন রাজধানীর পরিকল্পনা করতে তিন জন দিল্লি রওনা হবেন। খুশি মনে লুটিয়ানস তাঁর বহু দিনের পুরনো বন্ধু হার্বার্ট বেকারকে চিঠি লিখলেন—'দিল্লি ঠিক হয়ে গিয়েছে! আমি ২৭

গ্রেট প্লেস, অধুনা বিজয় চক থেকে রাইসিনা হিলসের মাথায় ভাইসরয় হাউস, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ভবন। ডানদিকে নর্থ ব্লক, বাঁ দিকে সাউথ ব্লক

মার্চ রওনা হচ্ছি! এ এক সুবর্ণ সুযোগ।'

হার্বার্ট বেকার নিজেও নামজাদা স্থপতি। দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে তাঁর তৈরি চোখ জুড়নো স্থাপত্য। তিনি তখন প্রিটোরিয়ায় ইউনিয়ন বিল্ডিংস তৈরিতে ব্যস্ত। বয়সে সাত বছরের ছোট হলেও প্রিয় বন্ধুর চিঠি পেয়ে বেকার খুশিই হলেন। আবার একটু মন খারাপও হল। কারণ, লুটিয়ানস লিখেছেন, 'তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ মজা হত!'

দুই বন্ধুর কেউই জানতেন না, বেকারকেও কিছু দিনের মধ্যে দিল্লি রওনা হতে হবে। লুটিয়ানসের সঙ্গে তাঁকেও নয়াদিল্লি গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাতে হবে। আর সেই কাজ করতে গিয়েই দুই বন্ধুর এমন কলহ বাঁধবে যে, রাইসিনা হিলস-এ কান পাতা দায় হবে। সে গল্প পরে।

****

কথায় বলে, 'দরিয়া, বাদল, বাদশা'—এই তিন মিলে শহর তৈরি হয়। দিল্লিতে কোনও কালেই বাদশার কমতি হয়নি। তাই ব্রিটিশদের নয়াদিল্লি তৈরির আগে দিল্লির বুকে সাত বার নগর পত্তন হয়েছিল। এখন যেখানে কুতুব মিনার, তার কাছেই ছিল পৃথ্বীরাজ চহ্বাণের তোমর রাজত্বে তৈরি লাল কোট বা কিলা রাই পিথোরা। খিলজিরা এসে নতুন শহর, সিরি তৈরি করেন। তুঘলকদের হাতে গড়ে উঠেছিল তুঘলকাবাদ। মহম্মদ বিন তুঘলক সাজালেন জাহাপনাহ্‌। হুমায়ুনের তৈরি শেরগড় বা 'পুরানা কিলা'-য় শের শাহ সুরি রাজত্ব করেছিলেন। শাহজাহান তৈরি করেন লাল কেল্লা ও তাকে ঘিরে শাহজাহানাবাদ। এর পর ব্রিটিশ রাজত্বে তৈরি হল নয়াদিল্লি। ব্রিটিশদের প্রথম থেকেই মনোবাসনা ছিল, নতুন রাজধানী দিল্লি আগের সাত শহর, এমনকি মোগলদেরও টেক্কা দেবে।

২৮ মার্চ মার্সেইল থেকে বম্বের জাহাজ ছাড়ল। তেতাল্লিশ বছরের লুটিয়ানস নতুন শহর গড়তে চলেছেন। সঙ্গে ব্রডি ও সুইনটন। একমাত্র সুইনটন ছাড়া আর কারও ভারতে আসার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তিন সাহেবের মূলত দুটো কাজ ছিল। এক, দিল্লির ঠিক কোথায় রাজধানী শহর তৈরি হবে, সেই জায়গাটা চিহ্নিত করা। দুই, ওই জায়গায় নতুন শহরের একটা মোটামুটি পরিকল্পনা ছকে ফেলা।

ভারতে রওনা হওয়ার আগে লুটিয়ানসদের ডাক পড়ল বাকিংহাম প্যালেসে। রাজা পঞ্চম জর্জের প্রাসাদে। রাজা মনে করিয়ে দিলেন, তিনি ও রানি গিয়ে করোনেশন পার্কে দিল্লির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এসেছেন বলে সেখানেই রাজধানী তৈরি করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর-একটি কথা। দিল্লির 'রিজ' বা জঙ্গলে ঘেরা, উঁচুনিচু পাথুরে এলাকায় যেন শহর তৈরি না হয়। কারণ, ওই এলাকা সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমি। তাই পবিত্র।

লুটিয়ানস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এমন চোখ ধাঁধানো ভাইসরয় হাউস তৈরি করবেন যে, তা মোগলদের কেল্লাকেও হার মানাবে। গোটা দিল্লি সে দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে! তিনি কি আর তখন জানতেন, তাঁর বন্ধু বেকারের জেদের ঠেলায় তাঁর পছন্দ মতো জায়গাতেই ভাইসরয় হাউস তৈরি করতে পারবেন না!

****

'দৃষ্টিপাত'-এ যাযাবর লিখেছিলেন, 'নয়াদিল্লির রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম। ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন মসৃণ পীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জালস্তূপের দ্বারা পঙ্কিল নয়।...মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক—সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ প্রসারিত।'

লুটিয়ানস ও বেকার ভেবেছিলেন, তাঁদের দিল্লি আমেরিকার ওয়াশিংটন ক্যাপিটল কমপ্লেক্স, প্যারিসের শঁসে লিজে অ্যাভিনিউকে মনে পড়াবে। দুই বন্ধু যেমন ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তেমন তৈরি করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ষাটের দশকের পরে নতুন রাস্তা, নতুন সরকারি ভবন তৈরি হয়েছে। কৃষি ভবন, উদ্যোগ ভবনের মতো ইমারত নির্মাণ হয়েছে। এখন আবার সে সব ভেঙে নতুন সচিবালয় তৈরি হচ্ছে। কারণ, নরেন্দ্র মোদী নতুন করে সেন্ট্রাল ভিস্টা সাজিয়ে

ব্রিটিশদের তৈরি সে দিনের কাউন্সিল হাউস, বর্তমান সংসদ ভবন, যার বয়স নব্বই বছর পেরিয়েছে

তুলতে চান।

ব্রিটিশদের তৈরি ভাইসরয় হাউস এখন রাষ্ট্রপতি ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত কিংসওয়ের নাম এখন রাজপথ। তাকে ঘিরে দু'পাশের এলাকার নামই সেন্ট্রাল ভিস্টা। রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে দুই সচিবালয়— নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, বিদেশ মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নর্থ ব্লকে অর্থ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, কর্মিবর্গ দফতর।

ব্রিটিশদের তৈরি কাউন্সিল হাউস বা বর্তমান সংসদ ভবনের বয়স নব্বই পেরিয়েছে। তাই তৈরি হচ্ছে নতুন সংসদ ভবন। নতুন সচিবালয়ও। সেন্ট্রাল ভিস্টায় ষাটের দশকে তৈরি একাধিক সরকারি ভবন ভেঙে ফেলা হবে। ভবিষ্যতে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকে আর সরকারি কাজকর্ম হবে না। সেখানে জাদুঘর তৈরি হবে। একটিতে থাকবে ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের নিদর্শন। অন্যটিতে সিপাহি বিদ্রোহের পরের কালখণ্ড। তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতির নতুন বাসভবন।

নরেন্দ্র মোদীর পছন্দের স্থপতি বিমল পটেল এই সমস্ত নকশা তৈরি করেছেন। পটেল বারবার একটা কথাই বলছেন, তিনি যা করছেন, আজ লুটিয়ানস ও বেকার বেঁচে থাকলে ঠিক এমনটাই করতেন।

****

একটা দশ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে আট ইঞ্চি চওড়া কাগজ। তার উপরেই দ্রুত পেন চালিয়ে লুটিয়ানস নতুন দিল্লির সেন্ট্রাল ভিস্টার প্রথম নকশা এঁকেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন বন্ধু বেকারকে। ছোট্ট কাগজে হাতে আঁকা সেই নকশা থেকে নতুন দিল্লির নকশার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। রাইসিনা হিলসের উপরে ভাইসরয় হাউস, সেখান থেকে কিংসওয়ে নেমে সোজা চলে গিয়েছে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত। দু'পাশে সরকারের সচিবালয়। রাস্তার দু'ধারে গাছগাছালি, ফোয়ারা। তার আগে অবশ্য রাইসিনা হিলস খুঁজে বের করতেই ঘাম ছুটে গিয়েছিল।

বম্বেতে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে টাউন প্ল্যানিং কমিটির তিন কর্তা যখন দিল্লিতে এলেন, তখন উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছে। কাজ শুরু হল। কোথায় রাজধানী হবে, তার জন্য যেমন খুশি জায়গা পছন্দ করে ফেললেই হল না। সেখানে জল সরবরাহ করা যাবে কি না, নিকাশি ব্যবস্থা কেমন হবে, বৃষ্টি হলে জল জমে যাবে কি না, সড়ক, রেল যোগাযোগ— সবই খেয়াল রাখতে হবে।

তিন সাহেব ভোর সওয়া পাঁচটায় উঠে পড়তেন। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে, মেডেন'স হোটেলে এক কাপ চা খেয়ে দুটো, তিনটে ফোর্ড ল্যান্ডৌলেট বা দ্য দিয়োঁ-বুতোঁ গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়তেন। দিল্লিতে তখন কতটুকুই-বা পাকা সড়ক! মাঝে মাঝেই গাড়ি ছেড়ে হাতির পিঠে চাপতে হত। শাহজাহানাবাদের উত্তরে, দক্ষিণে বা যমুনার পূর্ব পাড়ে তখন শুধুই জঙ্গল। বাঁদর, বেবুন, হরিণ, শেয়াল, শজারু, কচ্ছপ, শকুন থেকে হাতি, হায়েনা, চিতারও দেখা মেলে। সাপখোপ তো রয়েইছে। তারই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। রোদ চড়তে শুরু করলে সাড়ে ন'টা নাগাদ তিন সাহেব ঘেমেনেয়ে ফিরে আসতেন। ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে আর এক দফা স্নান। তার পর প্রাতরাশ সেরে বেলা এগারোটা থেকে মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি পর্যন্ত অফিসে বসেই কাজ। রোদের তাপে বিকেল পর্যন্তও অফিসেই বন্দি থাকতে হত। রোদ পড়লে বিকেল পাঁচটা নাগাদ গাড়ি চেপে ফের বেরিয়ে পড়তেন তাঁরা। ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। আরও এক বার স্নান করে নৈশভোজ। এত কাজের চাপ ছিল যে, অন্য কিছুর জন্য সময়ই মিলত না।

সব দিক দেখেশুনে ঠিক হল, নতুন দিল্লি হবে শাহজাহানাবাদের দক্ষিণে, মালচা-র কাছে। কারণ, যমুনার পূর্ব পাড়ে শহর হলে সেখানে নদীর জল ঢুকে পড়ার ভয় রয়েছে। যে করোনেশন পার্ক এলাকায় রাজা পঞ্চম জর্জের দরবার বসেছিল, সেখানে জমি অধিগ্রহণ করতে বেশ খরচ। অতএব মালচার কাছে রাইসিনা হিলসের উপরে উঁচু জমিতে তৈরি হবে ভাইসরয় হাউস। ব্রিটিশ রাজের দর্পের প্রতীক।

****

প্রথম বার দিল্লিতে পা রাখার অভিজ্ঞতা অবশ্য ব্রিটিশ কর্তাদের

কাছে সুখকর হয়নি। রাইসিনা হিলসে রাজধানী তৈরির সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ সদলবদলে দিল্লির রেল স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। দিনটা ছিল ২৩ ডিসেম্বর। বড়দিনের দু'দিন আগের ঘটনা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ভাইসরয় ও তাঁর স্ত্রী বিরাট এক হাতির পিঠে রুপোর হাওদায় উঠলেন। পিছনে অন্যরাও হাতির পিঠে সওয়ার। আগে আগে ব্যান্ড পার্টি চলেছে।

শাহজাহানের শহরে ঢুকতেই ভাইসরয়ের মনটা খচখচ করতে শুরু করল। তত দিনে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লির চাঁদনি চকে পৌঁছে হার্ডিঞ্জ তাঁর স্ত্রী-কে বলেই ফেললেন, 'মনে হচ্ছে, কিছু একটা অশুভ হতে চলেছে।' এই চাঁদনি চকেই অওরঙ্গজেব তাঁর ভাই দারাশুকোকে হত্যা করার আগে ভিখিরির পোশাকে, নোংরা হাতির পিঠে চড়িয়ে শহরের মানুষের সামনে ঘুরিয়েছিলেন।

আশঙ্কাই সত্যি হল। তিনশো গজ মতো এগোতেই প্রচণ্ড শব্দ ও ধোঁয়ায় চাঁদনি চক কেঁপে উঠল। ভাইসরয় মাহুতকে নির্দেশ দিলেন, 'এগিয়ে চলো'। কিন্তু তাঁর পিছনে ছাতা ধরে থাকা চোবদারের রক্তাক্ত শরীর তখন হাওদার দড়ি থেকে ঝুলছে। হার্ডিঞ্জেরও ঘাড়, কাঁধ ও পিঠ থেকে রক্ত ঝরছে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারালেন হার্ডিঞ্জ। অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁকে হাওদা থেকে নামিয়ে মোটরগাড়িতে চাপানো হল। ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানীতে প্রথম পা রাখার সন্ধিক্ষণেই যেন ব্রিটিশদের বিদায়ধ্বনি বেজে উঠল।

এডউইন লুটিয়ান্স

****

যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এ রাইসিনা হিলসের বর্ণনায় লেখা হয়েছিল, "মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়ের হাউসের লৌহদ্বার অবধি প্রসারিত। তারই দুপাশে সেক্রেটারিয়টের দুই মহলা—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা 'জলতরঙ্গ' ছাঁচে গড়া এক-এক জোড়া সন্দেশ।"
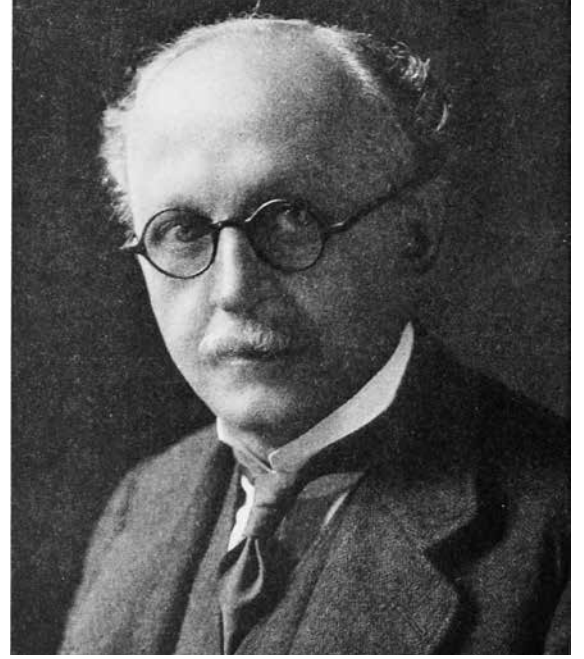
প্রথমে ঠিক হয়েছিল, নতুন দিল্লির রাইসিনা হিলসের উপরে শুধু ভাইরসয় হাউসই তৈরি হবে। যাতে গোটা শহর থেকে তা চোখে পড়ে।

ইম্পিরিয়াল দিল্লির প্রাথমিক রূপদানে সহায়তা করেছিল ব্রিটিশ স্থপতিদের যে গোষ্ঠী
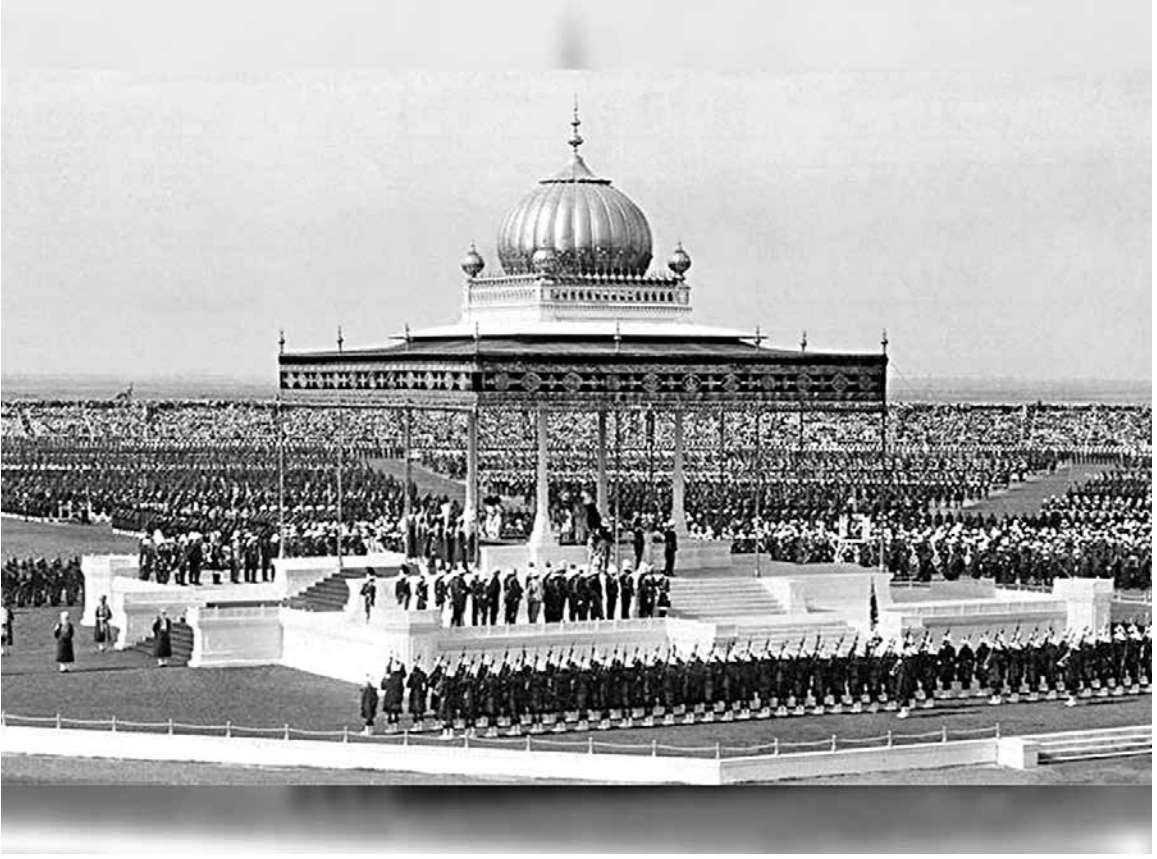
১৯১১-র দিল্লি দরবার। এখান থেকেই ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়

লুটিয়ানসের মাথায় প্রথম থেকেই এই নকশা ঘুরছিল। রাইসিনা হিলস থেকে নেমেই সামনে থাকবে বিরাট চওড়া গ্রেট প্লেস। এখন যার নাম বিজয় চক। তার দু'পাশে সচিবালয়। হার্ডিঞ্জেরও বরাবরই ইচ্ছে ছিল, রাইসিনা হিলসের উপরে মাথার মুকুটের মতো ভাইসরয় হাউস তৈরি হবে। ওই টিলার উপরে অন্য কিছু তৈরি হলে ভাইসরয় হাউস দেখতে গিয়ে বাধা আসবে।

লুটিয়ানসের প্রিয় বন্ধু হার্বার্ট বেকার তত দিনে দিল্লিতে চলে এসেছেন। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোনের ছোট ছেলে ভিসকাউন্ট গ্ল্যাডস্টোন দক্ষিণ আফ্রিকায় গভর্নর জেনারেল থাকার সুবাদে বেকারের প্রিটোরিয়ায় কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় উঁচু পাহাড়ি এলাকায় বিশাল ভবন তৈরি করেছিলেন বেকার। গ্ল্যাডস্টোনের মত ছিল, বেকারকে লুটিয়ানসের সঙ্গে কাজে নামানো হোক। লুটিয়ানসও ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন, তিনি যতই বড় স্থপতি হোন না কেন, চার বছরের সময়সীমার মধ্যে তাঁর পক্ষে সব কাজ একার পক্ষে করা মুশকিল। দিল্লির সব কিছুর নকশা তৈরি করা তিনি একা পেরে উঠবেন না। তাই বেকারের উপরে দায়িত্ব পড়ল সচিবালয় তৈরি করার।

দুই বন্ধুর বিবাদের প্রথম চিত্রনাট্য তৈরি হল। বেকার প্রস্তাব দিলেন, রাইসিনা হিলসের উপরেই, ভাইসরয় হাউসের সামনে দু'টি সচিবালয় তৈরি হোক। রাইসিনার উপরেই একই সমতলে ভাইসরয় হাউসের সঙ্গে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক তৈরি হলে, ক্ষমতার একটিই কেন্দ্র প্রতীত হবে। লুটিয়ানস প্রথমে আপত্তি তুললেন। কারণ, তা হলে রাইসিনা হিলসের ঠিক মাঝখানে ভাইসরয় হাউস তৈরি হবে না। তা পিছনে ঠেলে দিতে হবে। পাহাড়ের উপরে অতখানি এলাকা সমান করতে হলে খরচও বেড়ে যাবে। পরে অবশ্য মেনে নিলেন। ঠিক হল, নীচ থেকে রাইসিনা হিলসে ওঠার রাস্তার ঢাল এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে গোটা ভাইসরয় হাউস দেখা যায়।

কাজ এগোতে লুটিয়ানসের মাথায় বাজ পড়ল। বেকার সচিবালয় তৈরির সময় এতটাই খাড়া ঢাল তৈরি করেছেন যে, আধ মাইল দূর থেকে ভাইসরয় হাউসের পোর্টিকো চোখেই পড়ছে না। তিনি ভেবেছিলেন, রাইসিনা হিলসের সামনে গ্রেট প্লেস থেকে মানুষ তাঁর রূপকথার প্রাসাদের মতো তৈরি ভাইসরয় হাউসের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকবে। দেখা গেল, গ্রেট প্লেস থেকে বেকারের তৈরি যমজ সচিবালয়, নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের মাঝখান দিয়ে শুধু ভাইসরয়ের গম্বুজখানাই দেখা যাচ্ছে। ঢাল বেয়ে উপরে উঠে না আসা পর্যন্ত গোটা ভাইসরয় হাউস দেখাই যাচ্ছে না। এক সময় যে বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তুমি দিল্লিতে সঙ্গে থাকলে বেশ মজা হত,' সেই বন্ধুই কিনা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল! লুটিয়ানস মনের দুঃখে স্ত্রী এমিলিকে চিঠি লিখলেন— 'বেকারের সঙ্গে কাজ করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। এমন ভাবে কাজ করেছে যে, শুধু প্রাসাদের গম্বুজটাই দেখা যাচ্ছে।'

কিছুদিনের মধ্যেই দুই বন্ধুর কলহ প্রকাশ্যে চলে এল। পত্রপত্রিকায় রীতিমতো কার্টুন ছাপা হল এডউইন লুটিয়ানস বনাম হার্বার্ট বেকারের বিবাদ নিয়ে। লুটিয়ানস বেকারকে চিঠি লিখে তোপ দাগলেন, 'যে ভুল হয়েছে, হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করে এর মেরামত করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর জন্য আসল দোষীকে ঠিক চেনে নেবে। তোমাকে প্রিয় বন্ধু বলে মনে করতাম। স্নেহ করতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমার উপরে ভরসা করতে গিয়ে দিল্লিতে অনেক কাজ পণ্ড হল। বিশ্বাস করে ভুল করেছিলাম।' বেকার জবাবে লিখলেন, 'অকারণে পুরনো বিতর্ক খুঁচিয়ে তুলে লাভ নেই বন্ধু। ভুল হয়ে থাকলে তোমাকেও তার দায় নিতে হবে!'

তত দিনে দিল্লির ভাগ্যের সঙ্গে দুই দোস্তের ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছে। দু'জনেই জানতেন, এর পরেও তাঁদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। লুটিয়ানস তাই বেকারকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এর পরেও আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। যতখানি সম্ভব ভাল ভাবেই সেটা করার চেষ্টা করব। তবে একবার ভরসা ও বিশ্বাস চলে গেল, আর সুন্দর সকাল ফিরে আসে না।'

লুটিয়ানস ঠিকই বুঝেছিলেন। ভরসা আর ফেরেনি। দুই বন্ধুর আবার কলহ বেঁধেছিল। সে গল্পে একটু পরেই ফিরছি।

****

হয় অতিমারি, নয় যুদ্ধ। দিল্লির নির্মাণের সঙ্গে যেন দুর্যোগের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ।

নরেন্দ্র মোদী রাজধানী দিল্লির সেন্ট্রাল ভিস্টা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনার পরেই অতিমারি ধাক্কা দিল। প্রশ্ন উঠল, কেন এই অতিমারির মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে খরচ না করে সেন্ট্রাল ভিস্টার পিছনে বিশ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে?

ব্রিটিশ রাজের দিল্লির কাজ শুরুর পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। প্রশ্ন উঠল, যুদ্ধের বাজারে নতুন রাজধানী তৈরির পিছনে কেন এত অপচয় হবে? প্রথমে খরচ ধরা হয়েছিল ৪০ লক্ষ পাউন্ড। যুদ্ধ শুরুর চার মাস আগে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিটিশ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে দিল্লি নির্মাণের জন্য ছ'বছরে ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০০ পাউন্ড খরচের অনুমতি চাইলেন। এত অর্থ? প্রশ্ন তুললেন হার্ডিঞ্জের পূর্বসূরি লর্ড কার্জন। হার্ডিঞ্জের মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, কার্জনের মতলবটা কী? নিজের উত্তরসূরিকে অস্বস্তিতে ফেলা?

নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করা কঠিন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের শিল্পপতিরা অর্থ অপচয়ের নিন্দা প্রস্তাব পাশ করলেন। এক শিল্পপতি
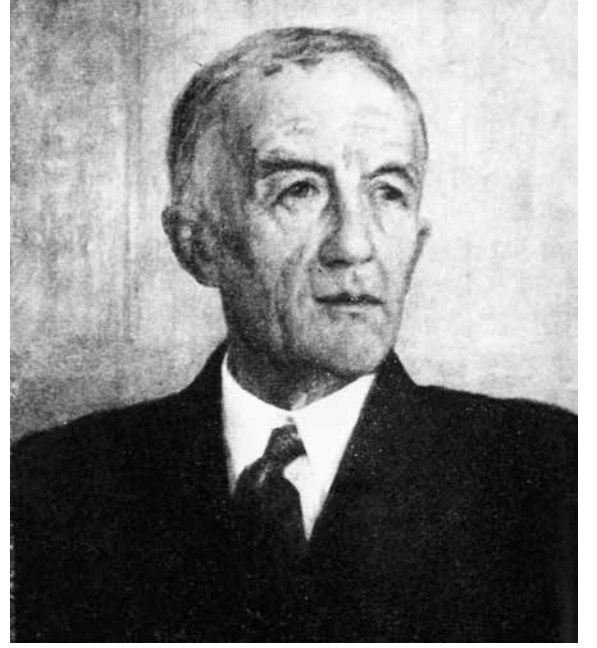
হার্বার্ট বেকার

সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেছিলেন, লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রশাসনের অবস্থা সেই লোকটার মতো, যে নিজের স্ত্রী-কে ছেড়ে অন্য সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার পরে নিজের সংসারের জন্য দু'-চার পয়সা রেখে বাকি সব অর্থ নতুন সঙ্গিনীর পিছনে খরচ করে! প্রাক্তন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই কাজ চলেছিল নতুন রাজধানীর

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাইসিনা হিলসের সামনে উল্লসিত দিল্লির মানুষ

ভাইসরয়, কলকাতার ইউরোপীয়রা বাজে খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

কাজ অবশ্য থেমে থাকল না। ব্রিটিশদের দিল্লি তৈরির জন্য 'ইম্পেরিয়াল দিল্লি কমিটি' তৈরি হল। দিল্লির চিফ কমিশনার উইলিয়াম ম্যালকম হেইলি হলেন তার প্রেসিডেন্ট। দিল্লিতে এই হেইলি সাহেবের নামে নামাঙ্কিত রাস্তাতেই এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিশালা বঙ্গভবন অবস্থিত।

যুদ্ধ শুরু হল। অর্থের জোগানে টান পড়ল। ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, পাথর কাটার কারিগর, কুলির সংখ্যা কমে এল। ১৯১৩-১৪ সালে কাজ শুরুর পরে দিল্লির রাজধানী নির্মাণে ২০ থেকে ২২ হাজার লোককে কাজে লাগানো হয়েছিল। যুদ্ধের ঠেলায় দু'তিন বছরের মধ্যে কর্মী সংখ্যা ৮ হাজারে নেমে গেল। সে সময় সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া অস্টেন চেম্বারলিনের মত ছিল, দিল্লিতে রাজধানী সরানোটাই ভুল। হার্ডিঞ্জের পদে তখন চেমসফোর্ড। চেম্বারলিন তাঁকে চিঠি লিখে নতুন করে দিল্লি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বললেন। কার্জন আবার বাগড়া দিলেন। তাঁর মত ছিল, এমনিতেই সাত মাস শিমলা থেকে সরকার চলে। সরকারি আমলারা সেখানেই সারা বছর কাটিয়ে দিতে পারেন। দিল্লির দরকারই নেই। শিমলায় জোর ঠান্ডা পড়লে কর্তারা দিল্লিতে নেমে আসবেন। তার জন্য দিল্লির সিভিল লাইনসে যেটুকু অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট।

হার্ডিঞ্জ তত দিনে নিজেকে নতুন দিল্লির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ভেবে ফেলেছেন। ভাইসরয়ের পদ থেকে বিদায় নিলেও দিল্লি নিয়ে তাঁর উৎসাহে কমতি ছিল না। তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। দিল্লির কাজ থামতে দেওয়া যায় না। বাকিংহাম প্যালেসের অন্দরে ঝড় উঠল। রাজা জর্জ জানিয়ে দিলেন, তিনি কোনও ভাবেই দিল্লির মূল পরিকল্পনায় বদল হতে দেবেন না। দিল্লি দরবারে তিনি যে শপথ করেছেন, তাতে বদল হলে ভারতীয়দের সামনে ব্রিটিশদের সম্মান থাকবে না। ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে রাজ-বার্তা জানিয়ে দেওয়া হল।

এর পরে আর দিল্লির রথ ঠেকায় কে! শেষ পর্যন্ত খরচ বেড়ে ১ কোটি পাউন্ড ছুঁয়েছিল। জওহরলাল নেহরু নিন্দা করেছিলেন এই বাহুল্যের। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, অর্থের অপচয়। একই সঙ্গে কলকাতা, শিমলা, দিল্লিতে ভাইসরয়ের প্রাসাদ তৈরির ক্ষমতা গরিব ভারতের নেই।

কাজ এগোতে থাকল। বাকি ছিল নামকরণ। ব্রিটিশ রাজের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে ঠিক হলেও নতুন রাজধানীর নাম কী হবে, তা স্থির হয়নি। খাতায়-কলমে 'ইম্পেরিয়াল দিল্লি' বলেই কাজ চলছে। ১৯২৬-এর ৯ নভেম্বর বৈঠক বসল। নানা সাহেবের নানা মত। রাইসিনা, নিউ দিল্লি, দিল্লি সাউথ। দিল্লিতে নতুন রাজধানী ঘোষণার ১৫ বছর পরে ব্রিটিশ সম্রাট তার নতুন নামে সিলমোহর দিলেন। বছরের শেষ রাতে 'ইম্পেরিয়াল দিল্লি' হল 'নিউ দিল্লি' বা নয়াদিল্লি।

****

গোল বাড়ি। শ্যামবাজারের বিখ্যাত কষা মাংসের ঠিকানা নয়। এক প্রয়াত বাঙালি বাম সাংসদ নয়াদিল্লির বর্তমান সংসদ ভবনকে এ নামেই ডাকতেন। যা আদতে ছিল ব্রিটিশদের কাউন্সিল হাউস। বৃত্তাকার এই ভবনের বয়স ৯০ পেরিয়েছে। শরীরে জরার ছাপ। পাশেই তৈরি হচ্ছে নতুন সংসদ ভবন। বৃত্তাকার নয়, তিনকোণা।

নতুন সংসদ ভবনের স্থপতি বিমল পটেল ব্রিটিশদের কাউন্সিল হাউস তৈরির ইতিহাস জানতে রবার্ট গ্র্যান্ট আরভিংয়ের লেখা 'ইন্ডিয়ান সামার—লুটিয়ানস, বেকার অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল দিল্লি' বইটি খুলে বসেছিলেন। কী কাণ্ড! ব্রিটিশদের তৈরি কাউন্সিল হাউস তৈরির সময়ও প্রথমে তিনকোণা ভবন তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। আর তা নিয়ে আবার কলহে জড়িয়ে পড়েছিলেন দুই বন্ধু। হার্বার্ট বেকার ও এডউইন লুটিয়ানস। দিল্লির দুই রূপকার।

প্রথমে ভাইসরয় হাউস, অধুনা রাষ্ট্রপতি ভবনের চত্বরের মধ্যেই ছোট মাপের কাউন্সিল হাউস তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পরে বড় মাপের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তৈরির প্রয়োজন পড়ল। ভাইসরয় হাউসের বাইরে, রাইসিনা হিলসের সামনে গ্রেট প্লেসের এক পাশে কাউন্সিল হাউসের জায়গা ঠিক হল। ১৯২১-এর ১২ ফেব্রুয়ারি রাজার সত্তর বছরের খুড়ো ডিউক অব কনট কাউন্সিল হাউসের শিলান্যাস করলেন। সংসদ ভবনে হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজিতে খোদাই করা সেই শিলার এখনও দেখা মেলে।

বেকার ভেবেছিলেন, কাউন্সিল হাউস হবে তিন কোনা। ত্রিভুজের মতো আকৃতির। সেই ত্রিভুজের এক-একটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে এক হাজার ফুট। এক-একটি বাহুতে থাকবে এক একটি কক্ষ— লেজিসলেটিভ

অ্যাসেম্বলি, কাউন্সিল অব স্টেটস এবং চেম্বার অব প্রিন্সেস। মাঝখানে গম্বুজ, ব্রিটিশ রাজের প্রতীক, যার ছাতার তলায় সব কিছু।

বন্ধু লুটিয়ানস আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, কাউন্সিল হাউস হবে বৃত্তাকার। কলোসিয়ামের মতো। বেকারের নকশা তিনি খারিজ করে দিলেন। বললেন, সবটাই ভুল। অত্যধিক খুঁটিনাটিতে ভর্তি, জটিল। মাইকেলেঞ্জেলো বা স্বয়ং ঈশ্বর এসেও এর অর্থ উদ্ধার করতে পারবেন না। বেকারের রাইসিনা হিলসের উপরেই ভাইসরয় হাউসের সামনে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক তৈরির দাবি লুটিয়ানসকে মেনে নিতে হয়েছিল। এবার লুটিয়ানসেরই জিত হল। বেকারকে হার মানতে হল। লুটিয়ানস গর্বভরে সবাইকে জানালেন, এই বারে তিনি যেমনটা চেয়েছেন, কাউন্সিল তেমনটাই তৈরি হবে। বেকার হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তাঁকে ক্রিকেটের আম্পায়ার 'আউট' করে দিয়েছেন।

কাজ শুরু হল। ৫৭০ মিটার ব্যাসের বৃত্তাকার ভবন। একতলায় বৃত্তাকার করিডর। দোতলায় ১৪৪টি স্তম্ভ ঘেরা। বৃত্তাকার দালান। নিন্দুকরা কুৎসা করতে ছাড়েননি। কেউ বললেন, ভায়া, এ যে ষাঁড়ের লড়াইয়ের ময়দান! কেউ ফুট কাটলেন, এত দীর্ঘ করিডর যে ট্রামলাইন পাততে হবে। বেকার নিজেও খুশি ছিলেন না। লুটিয়ানসের তৈরি এই নকশা তাঁর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নালিশ করলেন, এই গোল বাড়ি বানাতে গিয়ে খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর সেন্ট্রাল ভিস্টার আধুনিক নকশা

নতুন ত্রিকোণাকার সংসদ ভবন

বিবাদকে সাক্ষী রেখেই ভারতীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক বিবাদের পীঠস্থান তৈরি হল। কাউন্সিল হাউস, স্বাধীন ভারতের সংসদ ভবন। শিলান্যাসের ছয় বছরের মধ্যে উদ্বোধন হয়ে গেল। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে অধিবেশন বসল। ১৯২৭-এর ১৬ মার্চ একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটল। ছাদ থেকে একটা ছয় ইঞ্চি বর্গাকার মাপের টাইল এসে এক সদস্যের ডেস্কে আছড়ে পড়ল। সিমেন্ট ঠিকমতো জোড়া লাগেনি। কেউ হতাহত হননি। তাই কিছু ক্ষণের মধ্যেই ফের কাজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এর এক মাসের মধ্যেই আবার... না আর কোনও টালি নয়, একেবারে বোমা আছড়ে পড়ল কাউন্সিল হাউসে।

১৯২৯-এর ৮ এপ্রিল। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির গ্যালারিতে এসে বসলেন দুই বন্ধু। ভগত সিংহ ও বটুকেশ্বর দত্ত। কিছু ক্ষণের মধ্যেই দুটো বোমার কান ফাটানো শব্দ। কেঁপে উঠল লুটিয়ানসের গোল বাড়ি।

****

'আনলাকি থার্টিন'!

১৯৩১-এ ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ তারিখ।

দিল্লির আকাশে সেদিন কালো মেঘ। এমনিতেই কনকনে ঠান্ডা। তার উপরে বৃষ্টি। তার মধ্যেই কেরানি, চাপরাশিরা নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লকের দালানে, ছাদে ভিড় জমিয়েছেন। ঠেলাঠেলি চলছে। নয়াদিল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে সেদিন পাঁচ হাজার অতিথি আমন্ত্রিত। একত্রিশটি তোপধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হল ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে। কিন্তু ওই যে অশুভ তেরোর গেরো। লাউড স্পিকার খারাপ হয়ে গেল। লর্ড আরউইনের ছোট্ট বক্তৃতার বেশির ভাগটাই শোনা গেল না।

অস্ট্রেলিয়া, নিউজ়িল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা থেকে চারটি স্তম্ভ বা 'ডমিনিয়ন কলাম' উপহার দেওয়া হয়েছিল দিল্লিকে। সেই স্তম্ভ কোথায় বসবে, তা নিয়েও দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ বেঁধেছিল। লুটিয়ানস চেয়েছিলেন, গ্রেট প্লেস, অধুনা বিজয় চকে-এ থাকবে চারটি স্তম্ভ। বেকার বললেন, না, ওই চার স্তম্ভ বসবে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের সামনে। এই বেলা বেকারের জয় হয়েছিল। চার দেশের প্রতিনিধি একসঙ্গে বোতাম টিপলেন। চার স্তম্ভের সামনে পর্দা নেমে গেল। ব্যান্ড বেজে উঠল—'গড সেভ দ্য কিং'। পরের দিন লাল কেল্লায় মহাভোজের আয়োজন হয়েছিল। নতুন দিল্লি তৈরির সময় যে সব ঠিকাদার বরাত পেয়েছিলেন, তাঁরা গোটা পুরনো দিল্লিকে পেটপুরে খাওয়ালেন।

কে কখন হামলা চালাবে, সেই ভয়ে দিল্লির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তদানীন্তন ডিউক এবং ডাচেস অব ইয়র্ক, ষষ্ঠ জর্জ ও এলিজাবেথ, আসেননি। পরবর্তী কালে তাঁরা বাকিংহামের রাজা ও রানি হবেন। তাঁরাই ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ভাইসরয় লর্ড আরউনের হাতেই দিল্লির উদ্বোধন হয়েছিল।

****

নয়াদিল্লির উদ্বোধনের ঠিক দু'দিন পরের ঘটনা। বেলা দুটো বেজে বিশ মিনিট। এক প্রবীণ রাইসিনা হিলসের উপরে ভাইসরয় হাউসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাষট্টি বছরের মানুষটির খালি গায়ে শাল জড়ানো। খাটো ধুতি। হাতে বাঁশের লাঠি। কিছু দিন আগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নিঃশর্তে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাঁকে ভাইসরয়ের স্টাডিতে নিয়ে যাওয়া হল। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার আরউইন দেখলেন, এই প্রবীণের গোল চশমার মোটা কাচের পিছনের চোখজোড়ায় কোনও ভয়ডর নেই। ব্রিটিশ রাজের নতুন রাজধানী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েও তাঁর কাছ থেকে এক চিলতে সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারেনি।

ব্রিটিশ রাজের দর্পের প্রতীক নয়াদিল্লি সেই বিকেলে মহাত্মা গান্ধীর সামনে মাথা নত করল।

তথ্যঋণ

ইন্ডিয়ান সামার: লুটিয়ানস, বেকার অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল দিল্লি, রবার্ট গ্র্যান্ট আরভিং

দৃষ্টিপাত, যাযাবর

সংসদের জাদুঘর, গ্রন্থাগারের নথিসামগ্রী

গল্প

সিংহাসন

সৌভিক গুহসরকার

বড় ঝাঁ-চকচকে দামি গাড়িটা বাঁক নিয়ে তেজি নীল ঘোড়ার মতো অফিসের চত্বরে ঢোকমাত্র দাঁড়িয়ে উঠল গেটের দু'জন দরোয়ান। তারা স্যালুট করল। গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন রঞ্জন দস্তিদার। গাড়িটা পোর্টিকোর সামনে রঞ্জনকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বেসমেন্টে। রঞ্জন সোজা লিফটে করে উঠে গেলেন সতেরো তলায়। লিফটে একটা বড় আয়না আছে। সাধারণত লিফট ফাঁকা থাকলে রঞ্জন নিজের চেহারা ওই আয়নায় দেখা পছন্দ করেন। আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেছেন। পৌনে ন'টায়। লিফটে লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে সাড়ে ন'টার পর থেকে। এই দিগ্বিজয় টাওয়ার্সের অন্য অফিসগুলো ওই সময় থেকেই শুরু হয়। কিন্তু রঞ্জন আজ আগে এসেছেন, তাই লিফট ফাঁকা। সতেরো তলায় উঠতে-উঠতে লিফটের আয়নায় তিনি

নিজেকে ভাল করে দেখে নিচ্ছেন। চুলটা নুন-মরিচ। চামড়া এখনও টানটান। গোঁফ? এখনও সেই আগের মতোই ব্যক্তিত্বময়। কালো কোট-প্যান্ট, সাদা শার্ট, লাল টাই। সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। এই হল এক জন বড়কর্তার চেহারা। এই চেহারাটা তাঁর আছে। তাই গত বারো বছর ধরে ভুবনেশ্বরের এই কলিঙ্গকিরণ স্টিল লিমিটেড-এর সিইও-র কুর্সিতে তিনি বসে ছিলেন। কিন্তু আজ সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন। আজ তাঁর রিটায়ারমেন্ট। ষাট বছর বয়স হয়েছে তাঁর। অথচ রঞ্জন জানেন, আরও বছর পাঁচেক দৌড়নোর ক্ষমতা রয়েছে। লিফটের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হলেন আরও এক বার। লিফট সতেরো তলায় পৌঁছল। দরজা খুলল। রাজত্বের দিকে পা বাড়ালেন বিদায়ী রাজা।

॥ ২ ॥

অফিস এখনও ফাঁকা। লোকজন একটু পর থেকেই আসতে শুরু করবে। সাধারণত অন্যান্য দিন রঞ্জন এগারোটার পরে ঢোকেন। কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা। আজ এই অফিসে তাঁর শেষ দিন। বিস্তর কাগজপত্র গোছগাছ করতে হবে। ড্রয়ারগুলো খুলে দেখে নিতে হবে। গত কয়েক দিন ধরে অফিসের অনেকেই তাঁকে নানা রকমের বিদায়ী উপহার দিয়ে চলেছে, সেগুলো ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে হবে।

রঞ্জন তাঁর ঘরে ঢুকলেন। প্রশস্ত ঘর। মাটিতে কার্পেট। গাঢ় ম্যাজেন্টা দেওয়ালে সুদৃশ্য সাদা তাক। সেখানে নানা রকমের বই সাজানো। দেওয়ালের এক দিকে ঝুলছে তিন-চারটি তৈলচিত্র। ঘরের মাঝখানে একটা বড় সেগুন কাঠের টেবিল। পুরনো আমলের। টেবিলের সঙ্গে মানানসই চামড়ায় মোড়া একটা অসাধারণ সুন্দর একটি চেয়ার। চেয়ারটি এই অফিস-রাজ্যের সিংহাসন। এই সিংহাসন লাভের আশায় কত কর্মী কাজ করে চলেছে নিরন্তর। তিরিশ জনের মধ্যে এক জন পাবে। তবে দৌড়চ্ছে ওই তিরিশ জনই। কার ভাগ্যে ছিঁড়বে শিকে? রঞ্জন দস্তিদারের ভাগ্যে ছিঁড়েছিল। আজ থেকে বারো বছর আগে। তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ। রাজনীতি বা চাটুকারিতা নয়, সোজাসুজি কর্মদক্ষতায় তিনি জিতে নিয়েছিলেন ম্যানেজমেন্টের আস্থা। নিন্দুকেরা অবশ্য সব কিছুর মধ্যেই জটিল রাজনীতি ও পদলেহনের গন্ধ পেয়ে থাকেন, কিন্তু রঞ্জন দস্তিদারের বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণতার ব্যাপারে তাঁর পরম শত্রুরাও ক্রমশ মেনে নিয়েছে— হ্যাঁ লোকটা কাজ জানে বটে। অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই জানে।

সেই আটচল্লিশ বছর বয়স থেকে আজ ষাট— এত দ্রুত কেটে গেল বারো বছর? একটা গভীর ঘোরের ভেতর দিয়ে যেন শেষ হয়ে গেল সিংহাসনের মেয়াদ! খারাপ সময় যত দ্রুত কেটে যায়, ততই মঙ্গল, কিন্তু ভাল সময় দ্রুত কেটে যাওয়াটা আনন্দের কথা নয়। ভাল সময় চলতে থাকুক, দীর্ঘ উপন্যাসের মতো। পাতার পর পাতা জুড়ে। বারো বছর কি খুব কম সময়? এত দিন রঞ্জন দস্তিদার এ সব নিয়ে কিছুই ভাবেননি। আজ রিটায়ারমেন্টের দিন মনে হল তাঁর, আরও একটু সময় পেলে ভাল হত।

রঞ্জন ঘরে ঢোকার একটু পরেই ঢুকলেন মিসেস চন্দ্রাণী বেহেরা। তিনি বহু কাল ধরে রঞ্জনের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। মিসেস বেহেরা মিষ্টি হেসে বললেন, "গ্রিটিংস স্যর! আমি সব ফাইল আলাদা করে রেখেছি, যেগুলো আপনি চেক করবেন বলেছিলেন। আর দুটো প্যাকেজিং বাক্স আমি আনিয়ে রেখেছি, যাতে আপনার গিফটগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারেন।"

রঞ্জন হেসে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস বেহেরা! আপনি ছাড়া আমার এই এত বছরের কাজকর্ম এত মসৃণ ভাবে হত না। সত্যিই আপনি যা করেছেন আমার জন্য..."

মিসেস বেহেরা বললেন, "না না স্যর, এ ভাবে বলবেন না। আমার সৌভাগ্য যে, আমি আপনার আন্ডারে কাজ করতে পেরেছি। কত কিছু শিখেছি আপনার কাছ থেকে। বাই দ্য ওয়ে, কফি খাবেন? কফি বলব?"

রঞ্জন প্রসন্ন মুখে বললেন, "বলুন।"

মিসেস বেহেরা বেরিয়ে গেলেন। রঞ্জন ভাবলেন, কথাটা ঠিক। তাঁর কাছ থেকে এই অফিসের বহু লোকে বহু কিছু শিখেছে। বারো বছরে তিনি এই স্টিল কোম্পানিকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন! এই কোম্পানিতে তাঁর অবদান তো মিথ্যে নয়!

"আসব?" দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন গুরুচরণ মহাপাত্র।

"আরে চরণ, এসো এসো।"

"স্যর, সব ঠিকঠাক? কিছু সাহায্য করতে পারি?"

"কাল থেকে এই সব তোমার জিম্মায় চরণ, আমার যা বলার তোমায় বলেছি। তুমিই আমার সবচেয়ে পছন্দের ক্যান্ডিডেট। এই কোম্পানির দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে থাকবে। সেইটা সৎ ভাবে করবে। এটুকুই সাহায্য চাই।"

"স্যর, আপনার কাছ থেকে যা শিখেছি, তার তুলনা নেই। শুধু ভয় একটাই, এ কোম্পানিকে আপনি যে ভাবে গত বারো বছর ধরে চালিয়েছেন, সে রকম ভাবে আমি চালাতে পারব তো?"

"অফ কোর্স পারবে। আর পারবে বলেই তো আমি তোমায় বেছেছি। অনেকেই এই দৌড়ে ছিল। কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর কাছে আমি তোমার নাম সাজেস্ট করেছি। আমি জানি তুমিই পারবে। আমার শুভেচ্ছা রইল তোমার সঙ্গে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর। এটা আমার কাছে খুব আনন্দের এবং গর্বের যে, আপনি আমার নাম রেকমেন্ড করেছিলেন।"

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন রঞ্জন। তিনি জানেন সবটাই। তিনিই পারেন মানুষের ভাগ্য ঠিক করে দিতে। দিয়েওছেন বহু বার। অনেকেরই। তার মধ্যে গুরুচরণ মহাপাত্র এক জন। গুরুচরণের বয়স এখন একান্ন। প্রায় দশ বছর ধরে এই কোম্পানিতে রয়েছেন তিনি। পরিশ্রমী, বিনয়ী এবং বুদ্ধিমান লোক। তিনি অন্ধের মতো রঞ্জনের লবি ধরে এগিয়েছেন। সুতরাং অন্যান্য আরও সম্ভাবনাময় ও যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও রঞ্জন গুরুচরণকেই এগিয়ে দিয়েছেন বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর কাছে। বাকিটায় অবশ্য তাঁর কোনও হাত নেই। ওটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত। তবে কোম্পানিতে কানাঘুষো— আর ডি মানে রঞ্জন দস্তিদার যাঁকে রেকমেন্ড করবেন, বোর্ড তাঁকেই মনোনীত করবে।

"স্যর, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আমি অন্য কয়েকটা কাজ সেরে লাঞ্চে দেখা করব।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন গুরুচরণ। রঞ্জন জানেন, আজ ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ রয়েছে। অফিস সাজানো হচ্ছে। চারদিকে একটা উৎসব-উৎসব ভাব।

॥ ৩ ॥

লাঞ্চের সময় এল। অফিসের সব কর্মী জড়ো হল অফিসের বড় কনফারেন্স রুমে। সেখানে প্রথমে কেক কাটা হল। তার পর কোনও কোনও কর্মী শেয়ার করলেন রঞ্জন স্যরের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

তরুণ সিংভি বললেন, "লোক হিসেবে ভাল, বস হিসেবে কড়া।"

সবাই হেসে উঠলেন।

অর্চনা নায়েক বললেন, "উনি শিক্ষকের মতো, ভুল করার জন্য বহু বকুনিও খেয়েছি, ভালবাসাও পেয়েছি।"

প্রত্যুত্তরে মনোজ রানা বললেন, "আমার ভাগে বকুনি বেশি, ভালবাসা কম।"

আবার হাসি।

কলিগদের পীড়াপীড়িতে সাদিক মহম্মদ আবার সবার সামনে রঞ্জন স্যরের নকল করে দেখালেন। তাতে আরও জমে উঠল অফিসের এই বিদায়ী-পার্টি।

এ সবের পর জমে উঠল খাওয়াদাওয়া। হাসি-ঠাট্টা। গান।

সব শেষ হতে হতে বিকেল সাড়ে চারটে বেজে গেল। শেষ বারের মতো নিজের ঘরে ঢুকলেন রঞ্জন। নিজের সব কিছু গুছিয়ে নিলেন। এক কাপ কফি অর্ডার করলেন। কফি খেতে খেতে চামড়ার চেয়ারটিতে হেলান দিয়ে

তার হাতল দুটোয় হাত বোলাতে লাগলেন। বড় চেনা হাতল দুটো। কী সুন্দর মসৃণ আরামদায়ক চামড়া। নরম। কোমল। এই চেয়ারটি তাঁর মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। এই চেয়ারটি যেন বিক্রমাদিত্যের সেই রাজসিংহাসন। এই চেয়ারটিতে বসে তিনি নিজের জীবনের কত অসামান্য সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যখন তাঁর ছেলে ভাবছিল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে না মেডিসিন, তখন এই চেয়ার থেকে ফোন করে তিনি বলেছিলেন, "কম্পিউটার সায়েন্স পড়ো।" আজ সেই ছেলে আমেরিকায় কত বড় চাকরি করছে। যখন তাঁর মেয়ে ঠিক করল, সে নর্মাল পড়াশোনার দিকে যেতে চায় না, তখন এই চেয়ারে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর মেয়ে ফ্যাশন ডিজ়াইনিং পড়বে। সেই মেয়ে আজ চেন্নাইয়ে একটা বড় ফ্যাশন হাউসে কাজ করছে। আর কোম্পানি যে বার লোকসানে রান করছিল, সে বার ডিরেক্টরদের বোর্ডে যে প্রস্তাবটি রঞ্জন দিয়েছিলেন, সেটি তো এই চেয়ারে বসেই মিসেস বেহেরাকে ডিক্টেট করেছিলেন। সেই একটা প্রোপোজ়াল এই কোম্পানির নকশা চিরতরে পালটে দেয়। কোম্পানি বিপুল লাভের মুখ দেখে। তাঁর সেই প্রস্তাবটিকে তো আজও এই অফিসে 'দ্য গোল্ডেন প্রোপোজ়াল অব রঞ্জন দস্তিদার' বলে অভিহিত করা হয়। রঞ্জন জানেন যে, এই চেয়ারটি তাঁর সত্তার অংশ, তাঁর শরীরের অঙ্গ, তাঁর মাথার মুকুট।

সব কিছু গোছগাছ করে বেরনোর আগে রঞ্জন শেষ বারের মতো চেয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার চামড়ার শরীরে হাত বোলালেন। আদর করলেন। তার পর বেরিয়ে গেলেন। কোম্পানির নীল গাড়িটা তাঁকে কোম্পানির ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়ে এল। দিন পনেরোর মধ্যে ওটা খালি করে উনি এবং ওঁর স্ত্রী প্রিয়ম্বদা চলে যাবেন ভুবনেশ্বরের রাঙামাটিয়া রোডে নিজেদের ফ্ল্যাটে।

॥ ৪ ॥

দেড় মাস পর এক দুপুরে নিজের খয়েরি রঙের গাড়িতে চড়ে কলিঙ্গকিরণ স্টিল লিমিটেড-এর অফিসে গিয়ে পৌঁছলেন রঞ্জন। অফিসের গেটের সামনে তাঁর গাড়ির ড্রাইভার বাঁক নিতে যাবে, এমন সময় দরোয়ান হাত নেড়ে আটকাল। গাড়ির কাচ নামালেন রঞ্জন। ভুরু কুঁচকে দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? আটকালে কেন?"

দরোয়ান কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "কী বলি স্যর, বাইরের গাড়ি ঢোকার নিয়ম নেই।"

রঞ্জন বুঝলেন। তিনি বললেন, "ও আমাকে পোর্টিকোর সামনে নামিয়েই বাইরে চলে যাবে।"

দরোয়ান লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়াল। এক মাস আগেই যাঁর গাড়ি ঢুকলে, উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকত, তাকে আজ তাঁর গাড়িকেই আটকাতে হচ্ছে! কিন্তু কী আর করা যাবে। নিয়ম তো নিয়মই। সবাইকে তা মানতে হয়।

গাড়ি ঢুকে গেল ভেতরে।

পোর্টিকোর সামনে নেমে ড্রাইভারকে রঞ্জন বললেন, "যাদব, বাইরে পার্ক করো। আমি ফোন করলে চলে আসবে এখানে। কেউ আটকালে বলবে, অফিসের রিসেপশনে ফোন করে কথা বলে নিতে।"

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল।

লিফটে উঠলেন রঞ্জন। আজ লিফটে ভিড় আছে। জনা ছয়েক লোক। আয়নাটা ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। সতেরো তলা পৌঁছতে এতটা সময় লাগে বুঝি? আগে তো লাগত না!

অফিসের রিসেপশনে তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি। মধুবন্তী না কী যেন নাম। কোনও দিন রঞ্জন এর সঙ্গে সে ভাবে কথা বলেননি। আজ বললেন, "চরণ আছে নাকি? ওকে একটু বলো তো যে, আমি এসেছি।"

রিসেপশনিস্ট ইন্টারকমে কাকে যেন কী বলল। বেরিয়ে এলেন মিসেস বেহেরা।

"আরে, স্যর! হঠাৎ! এ তো দারুণ সারপ্রাইজ়!"

"কী খবর তোমার?"

"স্যর, চলছে। আপনি কি চরণ স্যরের সঙ্গে দেখা করবেন?"

"চরণ আছে?"

"ইয়েস স্যর। আছেন। একটা মিটিংয়ে। আপনি ভেতরে আসুন না!"

"মিসেস বেহেরা, আমি তো এখন বাইরের লোক, ঢুকলে অসুবিধে হবে না তো?"

"কী যে বলেন স্যর! আপনি শুধু ভিজ়িটরের খাতায় একটা সই করে দিন।"

মিসেস বেহেরার পেছন পেছন ঢুকলেন কালো কোট-প্যান্ট, সাদা শার্ট আর লাল টাই পরিহিত রঞ্জন দস্তিদার। কে বলবে তিনি আজও এ অফিসের বড়কর্তা নন? অনেকেই নিজেদের কিউবিকল থেকে উঠে এসে কথা বলে গেল। রঞ্জন দস্তিদার রক্তের ভেতর আবার একটা স্রোত খুঁজে পেলেন। এটা তিনি 'মিস' করছিলেন। রঞ্জন জানেন যে, এই অফিসেই তাঁর সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ। বাড়িতে বা অন্যত্র সেটা নেই। অফিস তাঁকে নেশাগ্রস্ত করে। তাঁকে তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে তোলে।

"আসুন স্যর। এখানে বসুন। চরণ স্যরের হয়ে গেলেই ডাকবেন।"

মিসেস বেহেরা রঞ্জনকে কাচ-ঘেরা ভিজ়িটরস রুমে বসিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই নীল কল্কা-করা কাপে এল তাঁর পছন্দের চিনি-ছাড়া ব্ল্যাক কফি। রঞ্জন মনে মনে খুশি হলেন। মিসেস বেহেরা এখনও তাঁর পছন্দের কথা মনে রেখেছেন!

বেশিক্ষণ বসতে হল না। গুরুচরণ নিজে বেরিয়ে এসে রঞ্জনকে খাতির করে তাঁর নতুন-পাওয়া বড়কর্তার ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে গুরুচরণ বসলেন সিংহাসনে আর রঞ্জন বসলেন উল্টো দিকে।

গুরুচরণ মহাপাত্র বললেন, "বলুন স্যর, আপনার কী সেবা করতে পারি?"

রঞ্জন, গুরুচরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার চলছে কেমন?"

"স্যর, আপনার দেখানো পথে হাঁটছি। এই সিস্টেমটাকে তো এ দিক থেকে এ ভাবে দেখিনি কখনও। তবে একটা কথা তো আমি জানি যে, কোথাও যদি আটকাই, আপনি আছেন গাইড করার জন্য।"

অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ হাসি হাসলেন রঞ্জন।

গুরুচরণ আবার বললেন, "বলুন স্যর, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

রঞ্জন একটু ইতস্তত করলেন, "আসলে"... গলা ঝাড়লেন... "মানে"...

"আপনি এত হেজ়িটেট করছেন কেন স্যর? বলুন না?"

রঞ্জন গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আমার ওই চেয়ারটায় আমি কি একটু বসতে পারি, চরণ?"

গুরুচরণ একটু থমকে গেলেন।

"বুঝলাম না স্যর, কী বলছেন!"

"বলছি যে, ওই যে চেয়ারটায় তুমি বসে আছ, ওখানে তো আমি এত বছর ধরে বসেছি। এটা একটা অভ্যেস মতো হয়ে গেছে। কয়েক দিন আগে রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখলাম, বুঝলে। দেখলাম, চেয়ারটা আকাশে একটা বিরাট বড় পাখির মতো ডানা মেলে উড়ছে আর আমায় ডাকছে, আয়, আয়, আয়। আমিও লিফটে করে উঠছি, উঠছি, উঠছি। কিন্তু হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনের মধ্যে একটা অশান্তি হল। দেড়মাস কেটে গেছে, এটায় বসিনি। অথচ গত বারো বছর ধরে তো এটাতেই বসেছি। পরে আমি ভাবলাম যে, এক বার গিয়ে এই চেয়ারটায় বসি। তা হলে হয়তো মনটা শান্ত হবে। তাই চলে এলাম আর কী! এখন ওই চেয়ারটায় একটু বসেই ফিরে যাব।"

গুরুচরণের ভুরু কুঁচকে গেল। হাসিটাও নিভন্ত। তিনি বললেন, "কিন্তু স্যর, এটা তো আর সম্ভব নয়..."

"কী সম্ভব নয়?" জিজ্ঞেস করল রঞ্জন।

"এই চেয়ারে বসা তো আর সম্ভব নয়, স্যর!"

"কেন?"

"কারণ স্যর, এটায় তো আমি এখন বসছি।"

হেসে ফেললেন রঞ্জন।

"আরে বাবা, তোমার চেয়ার তোমারই থাকবে। আমি তো মিনিট কয়েক বসে চলে যাব। আমি তো আর এই চেয়ার নিয়ে নেব না।"

"না স্যর, এটা হয় না। এ রকম করা যায় না। এটা আপনি বলবেন না।"

‘আরে দূর বাবা! তোমাকে বোঝাতে পারছি না,” একটু কি গলা তুললেন রঞ্জন?

“স্যর, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এটা আপনি চাইবেন না। আমি কিন্তু এটা আপনাকে করতে দিতে পারব না। এটা নিয়মবিরুদ্ধ।”

“নিয়ম” শব্দটা হঠাৎ যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল রঞ্জনের মাথায়। তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, “শোনো গুরুচরণ, আমায় তুমি নিয়ম শেখাতে এসো না। তুমি এই চেয়ারে বসে আছো কার কৃপায়, তা জানো তো? রাজদীপ সাক্সেনা, অনুপম মোহান্তি, রবিকিষণ পান্ডিয়া— এরাও ছিল। কিন্তু আমি তোমার নাম সাজেস্ট করেছিলাম।”

“আমি সব জানি স্যর। আপনিও তো আমায় দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন! কিন্তু সে সব কথা আমি আর এখন তুলতে চাই না। আপনি আমার নাম বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এ সাজেস্ট করেছিলেন এবং আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতারও তো একটা সীমা আছে! আমার মনে হয় সেটা পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি কোনও ভাবেই আপনাকে এই চেয়ারে আর বসতে দিতে পারি না।”

“কেন পারো না, চরণ? আলবত পারো। চাইলেই পারো!” টেবিলে চাপড় মেরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন রঞ্জন।

“ঠিক বলেছেন, স্যর। পারি। অবশ্যই পারি, কিন্তু দেব না। তার কারণ, এখন এই চেয়ারটা আমার। এখানে বসার অধিকার শুধু আমার আর এই অধিকারে অন্য কারও হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করতে পারব না। আপনি একটা অবাস্তব প্রস্তাব করছেন স্যর। এটার কোনও মানেই হয় না। এটা স্রেফ পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়,” ধৈর্য হারালেন গুরুচরণ মহাপাত্র। তাঁর গলাও তীক্ষ্ণ ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। রঞ্জনের হুঙ্কারের প্রত্যুত্তরে এ যেন পাল্টা-হুঙ্কার!

এই গুরুচরণকে এর আগে দেখেননি রঞ্জন। তিনি চরণের বিনয়ী নম্র দিকটার সঙ্গেই পরিচিত।

যে লোকটা গত দশ বছর ধরে তাঁর পায়ে পায়ে কুকুরের মতো ঘুরেছে, তাঁর প্রতিটি কথাকে হুকুম বলে মেনে নিয়েছে, তাঁর প্রতিটি পরামর্শ বেদবাক্য বলে গ্রহণ করেছে, সেই চরণ তাঁর সঙ্গে এই ভাবে কথা বলবে! এটা কী করে হয়? এটা অসম্ভব।

রঞ্জন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এক ঝটকায় চাবুকের মতো উঠে দাঁড়ালেন। চরণকে শিক্ষা দিতেই হবে! প্রতিক্রিয়ায় হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়ালেন গুরুচরণও। রঞ্জন বাঘের মতো গুরুচরণের দিকে হেঁটে গিয়ে থাবা দিয়ে তাঁর শার্টের কলারটা ধরলেন।

রঞ্জনের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে গুরুচরণ বিপর্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, “স্যর, এটা কী করছেন আপনি?”

মুখের রেখায় কঠিনতম অভিব্যক্তি হেনে রঞ্জন বলে উঠলেন, “চরণ, ইউ স্কাউন্ড্রেল! আমায় আটকাবে তুমি? নিয়ম দেখাবে তুমি? তোমার কি ধারণা আছে রঞ্জন দস্তিদার লোকটা কে?”

উগ্র থাবায় গুরুচরণের কলার চেপে, একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে তাঁকে চেয়ারটির সামনে থেকে সরিয়ে দিতে গেলেন রঞ্জন। কিন্তু পারলেন না।

গুরুচরণ এবার কঠোর হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোয়াল শক্ত, নেকড়ের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ। তিনি এ বার পাল্টা বলপ্রয়োগ করতে লাগলেন। দু’হাত দিয়ে চেপে ধরলেন রঞ্জন দস্তিদারের আগুনের মতো লালরঙের টাই।

চলল ধাক্কাধাক্কি। ধস্তাধস্তি। হাতাহাতি।

রঞ্জন মরিয়া, তিনি চেয়ারে বসবেনই। গুরুচরণও অটল, কিছুতেই বসতে দেবেন না।

আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে এই ভাবেই কি প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষ মশালের বিবর্ণ হলুদ আলোয় গুহার অধিকার নিয়ে লড়াই করত? নবীন দলপতির সঙ্গে বিরোধ বাঁধত প্রাচীন দলপতির? কে জানে? সে সব ইতিহাসের কথা। বহু পুরাতন ঘটনা। আর ওই যে চেয়ারটি— যাকে নিয়ে এত কিছু, সেই চেয়ারটি কি তখন হাসছিল? চেয়ারটি কি তখন রঞ্জনের জন্য ব্যথিত হচ্ছিল? চামড়ার নীচে স্পঞ্জের ভেতরে কি চেয়ারটিও জমিয়ে রাখছিল গোপন অশ্রু? নীরব পক্ষপাত?

গুরুচরণের একটি বলিষ্ঠ ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন রঞ্জন। কার্পেটের ওপর। তাঁর সোনালি ফ্রেমের চশমাটি উড়ে গিয়ে পড়ল এক ধারে। তাঁর কোট-প্যান্ট-টাই-চুল বিধ্বস্ত। তিনি কার্পেটের ওপর বসে হাঁপাতে লাগলেন। গুরুচরণ চশমা কুড়িয়ে এনে রঞ্জনকে দিলেন। তার পর রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিলেন নিজের হাতখানা।

“স্যর!”

রঞ্জন, গুরুচরণের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন মাটি থেকে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে চশমা পরলেন। তার পর চুল ঠিক করতে লাগলেন।

গুরুচরণ তাঁর টেবিলে রাখা জলভর্তি কাচের গেলাস তুলে দিলেন রঞ্জনের হাতে।

রঞ্জন ঢকঢক করে খেলেন।

গুরুচরণ গেলাসটা আবার তাঁর টেবিলে রেখে দিলেন।

“স্যর!”

রঞ্জন তাঁর হতভম্ব ঘোলাটে চোখ রাখলেন গুরুচরণের শাণিত ঝকঝকে চোখে।

“স্যর, এ সব কথা কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে সম্মান করি। একটা বিনীত অনুরোধ রইল, আপনি আর এখানে আসবেন না।”

রঞ্জন একটা আয়না খুঁজছিলেন তাঁর নিজের চেহারাটা দেখার জন্য। এই ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে একটা বড় আয়না রয়েছে, তিনি জানেন। বারো বছর ধরে তিনি সেখানে নিজের সফল মুখ দেখেছেন। কিন্তু ওই আয়নাটা বড়কর্তাদের জন্য। এখন আর তাঁর নয়।

রঞ্জন কথা বললেন না। তিনি ঘামছিলেন। চামড়ার গভীরে থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর ভেতরের সিংহাসনটা আজ নড়ে গেছে। চিরুনির দাঁতের মতো মটকে ভেঙে গেছে।

পকেট থেকে দুধ-সাদা রুমাল বের করে, মুখ মুছে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দিগ্বিজয় টাওয়ার্সের লিফটে ভিড়। রঞ্জন পোর্টিকোতে যাদবকে ডাকেননি আর। এবার সোজা হেঁটে বাইরের পার্কিং লট থেকে গাড়িতে চড়বেন।

তাঁর সমস্ত যাওয়া শেষ হল, এ বার তাঁর শুধু ফেরার পালা।

শিল্পী: সৌমেন দাস